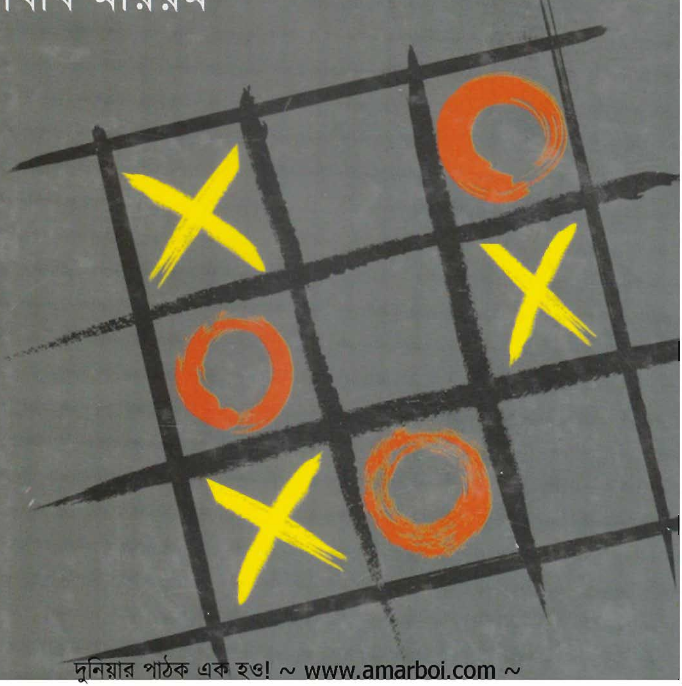
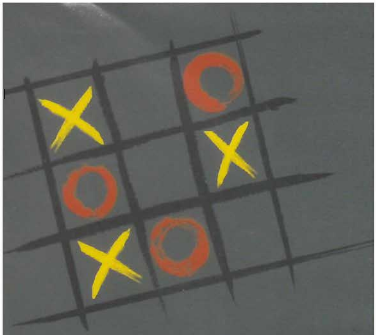
রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ

ড. সুলতান মাহমুদ
বিবি মরিয়ম





জ্ঞানার্জন প্রত্যয়টি ব্যাপক। জ্ঞানের কোনো পরিসীমা নির্ধারণ করা যায় না। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিষয়ে মানুষের জানার আগ্রহ স্বভাবতই বেশি। তথ্যপ্রযুক্তির যুগে বাংলা ভাষায় রাজনীতি অভিধানের আকাঙ্ক্ষা অনেক। বিশেষ করে আধুনিক বিশ্বায়নের যুগে রাজনীতি ও কূটনীতিবিষয়ক জ্ঞানপিপাসা প্রতিটি মানুষের মধ্যেই লক্ষ্য করা যায়। কারণ নাগরিক জীবনের প্রতিটি ধাপেই রাজনীতি সংশ্লিষ্টতা রয়েছে। রাজনীতিবিদ্যায় রাজনীতি ও কূটনীতিবিষয়ক অসীম শব্দসম্ভার রয়েছে। সেগুলো সুনির্দিষ্টভাবে গোছানো আকারে পাওয়া কঠিন। আর সেকারণেই সমাজের বিভিন্ন স্তরের নাগরিকদের জানার আগ্রহ অনুভব করে 'রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ' গ্রন্থটি সম্পাদনার ক্ষুদ্র প্রয়াসটি হাতে নেয়ার সাহস করেছিলাম। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক ইস্যু, রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যয় নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গীতে এবং নির্ভুলভাবে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। বস্তুনিষ্ঠ তথ্য উপস্থাপনে আমরা ছিলাম অঙ্গীকারবদ্ধ। দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক কর্মীবাহিনী, রাজনীতিবিদ্যা ও সমাজবিদ্যার শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী এবং সর্বস্তরের জ্ঞানপিপাসু বুদ্ধিজীবী ও সাধারণ পাঠকদের জ্ঞানের খোরাক মেটাতে পুস্তকটি অন্যতম সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে আশা রাখছি। সহজ ও প্রাঞ্জল ভাষায় রাজনীতি ও কূটনীতিবিষয়ক শব্দসম্ভারের একটি বৃহত্তম সংকলন হিসেবে বিবেচনা করা যাবে।

ড. সুলতান মাহমুদ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০০৩ সালে অনার্স ও ২০০৪ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি (উভয়টিতে প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান) লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১৩ সালে বাংলাদেশে রাজনৈতিক উন্নয়নের সমস্যা ও সম্ভাবনা বিষয়ে পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন। বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব প্রফেশনাল স্টাডিজ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত গবেষণা জার্নাল *Development Compilation* (উন্নয়ন সংকলন) এর নির্বাহী সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করেন। বর্তমানে তিনি সমসাময়িক ইস্যুতে দেশের গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় পত্রিকাগুলোতে নিয়মিত কলাম লেখেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে প্রকাশিত গবেষণা প্রবন্ধের সংখ্যা দশটি। পাবনা জেলার সদর থানার শ্রীকৃষ্টপুর গ্রামে তাঁর জন্ম। পিতা মো. শামসুল হক সোনালী ব্যাংক কর্মকর্তা এবং মাতা মিনারা হক গৃহিণী। স্ত্রী কামরুন নাহার সুখী ও একমাত্র পুত্র সায়ান সাদিদ শুদ্ধকে নিয়ে তাঁর সংসার।



বিবি মরিয়ম
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক পদে কর্মরত। উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ থেকে ২০০২ সালে অনার্স ও ২০০৩ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি লাভ করেন। পরবর্তীতে তিনি ২০১৪ সালে বাংলাদেশে অধ্যাদেশের মাধ্যমে আইন প্রনয়ণের প্রবণতা বিষয়ে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত জার্নালে তাঁর একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশিত। বর্তমানে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সেমিনারে অংশগ্রহণ ও সাম্প্রতিক বাংলাদেশের রাজনীতি বিশ্লেষণসহ নানাবিধ গবেষণাকর্মে নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস নোয়াখালী জেলার কোম্পানীগঞ্জ উপজেলার চরকাঁকড়া গ্রামে। স্বামী আতিকুল ইসলাম শুভ, একমাত্র পুত্র নাফিজ ও শ্বশুর-শ্বাশুরিকে নিয়ে তাঁর সংসার।



রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ

রাজনৈতিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক ঘটনা, রাজনৈতিক দর্শন, রাজনৈতিক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব, আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক ঘটনা ও কূটনৈতিক যাবতীয় বিষয় নিয়ে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা অংশগ্রহণকারী এবং সর্বস্তরের সাধারণ পাঠকদের জন্য রচিত।

রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ

ড. সুলতান মাহমুদ
বিবি মরিয়ম
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

আলেয়া বুক ডিপো
বস্তুনিষ্ঠ প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান

প্রথম প্রকাশ
ফেব্রুয়ারি ২০১৫

রাজনীতি ও কূটনীতিক কোষ
ড. সুলতান মাহমুদ
বিবি মরিয়ম

প্রকাশক
কাওছার আহমেদ
আলেয়া বুক ডিপো
৩৮/২ক, বাংলাবাজার
ঢাকা ১১০০
৯৫৫৬৮৫৪
aleyabookdepot@yahoo.com

কম্পোজ
মঞ্জুরি কম্পিউটার
বাংলাবাজার, ঢাকা
প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন
মুদ্রণ
একুশে প্রিন্টার্স
বাংলাবাজার, ঢাকা

উপমা প্রকাশ : নীলক্ষেত, ঢাকা
০১৫৫২৩১৬৫৫৯

কল্লোল : নীলক্ষেত, ঢাকা

কলকাতা পরিবেশক
রীতা ইন্টারন্যাশনাল
ফোন : ৯৮৩০৪৩৯৬৭৯, ৯৮৩৬০৪৬০৬৭

মূল্য : ৫৫০ টাকা

RAJNITI O KUTNITIKOSH by Dr. Sultan Mahmud, Bibi Mariom Published by Kawsar Ahmed, Aleya Book Depot, 38/2ka Banglabazar, Dhaka 1100. Cover Designed by Mobarak Hossain Liton Price : Taka Five Hundard Fifty only. US $20

ISBN 978 984 8934 86 9

উৎসর্গ

বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা যাদের অবদান

ভূমিকা

বর্তমানে 'রাজনীতি' প্রত্যয়টি সমাজ-জীবনের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশে পরিণত হয়েছে। রাজনীতির পাশাপাশি 'কূটনীতি'-র ধারণাটিও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিসরে নাগরিক-জীবনের অবিভাজ্য অংশবিশেষ। এ কথা বললে ভুল হবে না যে, রাজনীতি ও কূটনীতি-বিষয়ক বহুমাত্রিক ধারা বিশ্বব্যাপী প্রবাহমান। তথ্য-প্রযুক্তি ও ইন্টারনেটের বদৌলতে রাজনীতি ও কূটনীতি-বিষয়ক সচেতনতার পাশাপাশি এ সংক্রান্ত জ্ঞানপিপাসা নাগরিক-জীবনে ক্রমেই বেড়ে চলেছে। ফলে সচেতনতা সৃষ্টির প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে এবং জ্ঞানপিপাসার খোরাক হিসেবে রাজনীতি ও কূটনীতি-বিষয়ক রচনার অভাব বাংলাদেশে যথেষ্ট। এমন অভাব অনুভবের ক্ষেত্র আমার নিজের মধ্যেও রয়েছে। এমন অভাব পূরণ ও জ্ঞানপিপাসার খোরাক হিসেবে *রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ* গ্রন্থটি একটি অনন্য সহায়ক হিসেবে বিবেচিত হবে বলে আমি আশা রাখি।

আমার স্নেহধন্য প্রিয় ছাত্র বর্তমানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ড. সুলতান মাহমুদ রানা ও প্রিয় ছাত্রী উক্ত বিভাগের প্রভাষক বিবি মরিয়ম রচিত 'রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ' পাণ্ডুলিপিটি পড়ে আমি অভিভূত হয়েছি। পাশাপাশি আমি নিশ্চিত হয়েছি যে, তারা দুজনেই এই কাজটি সমাপ্ত করতে প্রচুর পরিশ্রম এবং পড়াশোনা করেছেন। তাছাড়া পাণ্ডুলিপিটি তৈরি ও বই প্রকাশের বিষয়ে সবসময়ই তারা আমার নিকট শরণাপন্ন হয়েছেন। আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি ভালো পরামর্শ এবং সহযোগিতার।

বইটিতে রাজনীতি ও কূটনীতির বহুমাত্রিক দিক নিয়ে বিভিন্ন আঙ্গিকে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। প্রসঙ্গসূত্রে রাজনীতির পাশাপাশি ইতিহাস, ঐতিহ্য, সমাজ-সংস্কৃতি এবং অর্থনীতির নানা দিক বইটিতে স্থান পেয়েছে। আমার কাছে মনে হয়েছে, পাঠক্রমকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে যথাযথ বিষয়বস্তু নির্ধারণের মাধ্যমে মেধানির্ভর ও দূরদর্শী আলোচনা উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন লেখকদ্বয়। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের একটি বই রচনার জন্য আমি নিজে আমার স্নেহভাজন ছাত্র ও সহকর্মী ড. সুলতান মাহমুদ রানাকে উৎসাহিত করেছিলাম। ফলে এই বইয়ের কাজ শেষ হওয়াতে আমি একটু বেশি খুশী হয়েছি।

বর্তমানকালের লেখক, পাঠক, গবেষক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং সচেতন নাগরিকসমষ্টির রাজনীতি ও কূটনীতি-বিষয়ক জানার আগ্রহ মেটাতে *রাজনীতি* ও

কূটনীতিকোষ গ্রন্থটি একটি অনবদ্য রচনা বলেই আমার বিশ্বাস। কারণ বাংলা ভাষায় গঠনমূলক, অনুপুঙ্খ, উপযুক্ত এবং আকর্ষণীয় ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে রাজনীতি ও কূটনীতি-বিষয়ক গ্রন্থের যথেষ্ট অভাব রয়েছে। আর এই অভাব মেটাতে অনেকখানিই সার্থক ও সক্ষম হবে বইটি। আমি আশা করব, সমাজের সর্বস্তরের নাগরিকই বইটি পড়বেন। আমি লেখকদ্বয়ের জীবনের সফলতা কামনা করছি।

ড. মো. মকসুদুর রহমান
প্রফেসর
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী

পূর্বকথন

বাংলার কৃষক-মেহনতি মানুষের দীর্ঘদিনের শোষণ-নিপীড়নের সংগ্রাম ও বিদ্রোহের ফল একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ। দীর্ঘ ২৩ বছরের রাজনৈতিক আন্দোলন-সংগ্রাম ও ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে বাঙালি জাতির সবচেয়ে বড় অর্জন বাংলাদেশের মহান স্বাধীনতা। আমাদের যত গৌরব আছে তার মধ্যে শ্রেষ্ঠতম অর্জন ও উজ্জ্বলতম ঘটনা হচ্ছে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ এবং পাকিস্তানি উপনিবেশিকতা তথা নব্য উপনেবিশিকতার মুক্তি। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে নিজেদের শাসনক্ষমতা বজায় রাখার স্বার্থে এই ভূমির ইতিহাসকে তাদের মতো করে গড়ে তুলেছিল। ইতিহাস বিকৃতিতে ইংরেজদের দোষারোপ করলেও ১৯৪৭-পরবর্তী পাকিস্তানে কিংবা '৭১-পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে জাতি, সমাজ, রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক উন্নতি, সংস্কৃতির সমৃদ্ধি, জনগণতান্ত্রিক রাজনীতি গড়ে তোলার প্রশ্নে যে বুনিয়াদই প্রকৃত ইতিহাস তুলে ধরা ও তাকে কষ্টিপাথরে যাচাই-বাছাই করে উন্নত সমাজ-রাষ্ট্র গঠনে দিকনির্দেশনার পথপ্রদর্শকের ভূমিকায় আনার কথা ছিল। কিন্তু সেক্ষেত্রেও তা হয়ে ওঠেনি। তার অন্যতম কারণ বলা যায় জনগণের সত্যিকারের প্রতিনিধিত্বশীল রাষ্ট্রশক্তির অভাব।

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের শাসনতন্ত্র রচিত হয় লক্ষ প্রাণের রক্তের বিনিময়ে। রক্তের অক্ষরে লেখা সেই সংবিধানকে রাজনীতিবিদ্যার ইতিহাসে সমসাময়িক কালের সবচেয়ে আধুনিক শাসনতন্ত্র হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। কিন্তু তারপর বারবার সংবিধানে কাটাছেড়া হয়েছে, সামরিক-বেসামরিক শাসকরা নিজেদের প্রয়োজনে বদলিয়ে নিয়েছেন। পাশাপাশি বিভন্ন সময়ে ইতিহাস বদলানোর অপচেষ্টা হয়েছে। ফলে মানুষের প্রকৃত ইতিহাস এবং তথ্য জানার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে।

তবে সংবিধান বদলালেও, ইতিহাস বিকৃত করা হলেও, বদলায়নি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণা, বদলায়নি উন্নয়নের আকাঙ্ক্ষা এবং আগ্রহ। আর এই কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণায়, উন্নয়নের অনন্ত পথযাত্রায় রাজনীতি প্রত্যয়টি নাগরিক-জীবনে ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তার করে চলেছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের রাজনীতিতে আতঙ্ক, সন্ত্রাস নাগরিক-জীবনের অবিভাজ্য অংশে পরিণত হওয়ায় 'রাজনীতি' ধারণাটির প্রতি নাগরিকদের একদিকে আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে, অন্যদিকে এর প্রতি তাদের অনিহাও বেড়ে চলেছে। একদিকে আকাঙ্ক্ষা, অন্যদিকে অনিহা- এমন উভয় বিপরীতমূখী দিককে বিবেচনায় রেখে নাগরিকদের রাজনীতি সচেতনতাও বেড়ে চলেছে।

এমন এক সময় ছিল যখন বড় রাষ্ট্রগুলো ছোট রাষ্ট্র বা পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্রে নিজস্ব উপনিবেশ স্থাপন করে ও তাদের আধিপত্য বিস্তার, গ্রাস বা করায়ত্ত্ব করার চেষ্টায় লিপ্ত থাকত। কিন্তু সে সময় গত হয়েছে। তারা এখন সরাসরি উপনিবেশ স্থাপন করে না। তবে রাজনীতিতে কূটনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে। তথ্য-প্রযুক্তির যুগে রাজনীতি জাতীয় পর্যায় থেকে আন্তর্জাতিক পরিসরে সহজেই বিস্তার লাভ করায় কূটনৈতিক তৎপরতা এবং এর প্রভাবও যথেষ্ট মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। এ কারণেই বর্তমান সময়ে রাজনীতি ও কূটনীতি প্রত্যয় দুটিকে আলাদা করা যায় না। মূলত 'রাজনীতি' প্রত্যয়টির মধ্যেই 'কূটনীতি' একটি ক্ষুদ্র প্রত্যয় মাত্র।

বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। ক্রমে দেশকে এগিয়ে নিতে হলে যেমন অভ্যন্তরীণ পরিবেশ ও ব্যবসা-বাণিজ্যের অগ্রগতি নিশ্চিত করার লক্ষ্য রয়েছে, তেমনি বৈদেশিক সম্পর্কেরও উন্নয়ন ঘটানোর তাগিদ রয়েছে যথেষ্ট। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শক্তিধর দেশগুলোর ক্ষমতা বিন্যাসের ওপর বাংলাদেশের স্বাধীন-সার্বভৌম অবস্থান টিকিয়ে রাখার বাস্তবতা নির্ভর করছে। এসব সূত্র ধরে আধুনিককালে যেকোনো দেশের জাতীয় রাজনীতি আন্তর্জাতিক রাজনীতি থেকে আলাদা কোনো বিষয় নয়। এটি একটি পারস্পরিক সম্পর্ক, যা রাজনীতি ও কূটনীতি দ্বারা প্রতিনিয়ত প্রভাবিত হচ্ছে। রাজনীতি হলো শাসক ও শাসিতের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ক যা দ্বারা রাষ্ট্রের ক্ষমতা ও সম্পদের বণ্টন সুষ্ঠু ও সুষমভাবে সম্পাদিত হয়। এক কথায় বলা যায়, মূল্যের কর্তৃত্ববাদী বণ্টনই হলো রাজনীতি। আর কূটনীতি হলো এমন এক ধরনের কৌশল যা দ্বারা দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। অনেক সময় বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কোনো দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য কূটনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। সুতরাং এ দিক থেকে বিচার করলে রাজনীতি ও কূটনীতির গুরুত্ব অপরিসীম।

রাজনীতি ও কূটনীতির এই অপরিসীম গুরুত্ব অনুভব করে রাজনীতির পাশাপাশি প্রসঙ্গসূত্রে ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি এবং সমকালীন কূটনৈতিক বিষয়াবলীর সংকলনে 'রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ' গ্রন্থটি রচনার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলাম। ইতিপূর্বে সংশ্লিষ্ট ইস্যুতে প্রকাশিত পুস্তকসমূহে প্রসঙ্গভিত্তিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ঘাটতি থাকায় নতুনভাবে ভিন্ন আঙ্গিকে পুস্তকটি প্রকাশ করা হলো। রাজনীতি, কূটনীতি এবং এ সংক্রান্ত যাবতীয় তাত্ত্বিক ধারণাসহ অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী, চুক্তি, জোট, প্রণালী, সভ্যতা, সম্মেলন ও প্রাসঙ্গিক কাঠামো সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উপস্থাপন করা হয়েছে। সংগৃহীত বিষয়গুলোর সতর্ক ও মনোযোগী পাঠ চিন্তাশীল পাঠককে রাজনীতি ও কূটনীতি সম্পর্কে যেমন ওয়াকিবহাল করবে তেমনি সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর ওপর সরবরাহ করবে বিস্তারিত তথ্য এবং গভীর বিশ্লেষণ। বইটি থেকে সাধারণ পাঠক, বিশ্লেষক, গবেষক, নীতি-নির্ধারক, শিক্ষক-শিক্ষার্থী এবং চাকুরী প্রার্থীসহ সর্বস্তরের পাঠকগণ উপকৃত ও প্রয়োজনীয় তথ্য লাভে সক্ষম হবেন বলে আশা করা যায়। সাম্প্রতিক রাজনীতি ও কূটনীতিতে আগ্রহী পাঠকরা যদি এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত তথ্যগুলো পাঠ করে তাদের

জ্ঞান-পিপাসা ও কৌতূহল নিবারণের মধ্য দিয়ে উপকৃত হতে পারেন, তাহলে এ গ্রন্থ রচনা সার্থকতা পাবে। গ্রন্থটির ওপর আলোচনা, সমালোচনা ও পাঠক প্রতিক্রিয়াকে আমরা স্বাগত জানাই। এই গ্রন্থের ত্রুটি, দুর্বলতা ও ব্যর্থতা প্রভৃতি সকল দায়-দায়িত্ব একান্তই আমাদের। বিদ্যমান সকল ধরনের ত্রুটি এবং দুর্বলতা ভবিষ্যতে সংশোধনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করছি। অনেক চেষ্টা ও সাবধানতা অবলম্বনের পরও মুদ্রণ-পরবর্তী ভুল-ভ্রান্তি থাকতেই পারে। সে ক্ষেত্রে পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের আশা রইলো।

বইটি লেখার জন্য শ্রদ্ধেয় শিক্ষক ড. মো. মকসুদুর রহমান স্যার আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করেছেন এবং বিভিন্ন তথ্য সরবরাহ করে সর্বাত্মক সহযোগিতা করেছেন। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধযোগ্য। আমাদের আপনজন ও যারা আমাদেরকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন তাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি। নিজস্ব উদ্যোগে প্রকাশক, 'আলেয়া বুক ডিপো'-এর স্বত্বাধিকারী জনাব কাওসার আহমেদ যত্ন সহকারে বইটি প্রকাশের যথাযথ উদ্যোগ গ্রহণ করে আমাদের কৃতজ্ঞতার বন্ধনে আবদ্ধ করেছেন।

গ্রন্থটি সম্পাদনের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন পুস্তক-পুস্তিকা, পত্র-পত্রিকা ও সাময়িকী থেকে অসংখ্য তথ্য গ্রহণ করেছি। উক্ত প্রকাশনাসমূহের সংকলক, সম্পাদক, লেখক ও অনুবাদক সকলের নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি। তবে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা হলেও সেগুলো *রাজনীতি ও কূটনীতিকোষ* গ্রন্থে অর্ন্তভুক্ত করার সময় কিছুটা পরিচর্যা ও পরিমার্জন করা হয়েছে। ক্ষেত্রবিশেষে সুনির্দিষ্টভাবে কৃতজ্ঞতা স্বীকারে কোনোরূপ কার্পণ্য করা হয়নি। সর্বোপরি আশা করি, এ গ্রন্থে সন্নিবেশিত প্রতিটি বিষয়ে পাঠকগণ বিষয়বস্তু ও তথ্যগত নতুনত্বের ছোঁয়া পাবেন।

একুশে বইমেলা
ফেব্রুয়ারি ২০১৫।

ড. সুলতান মাহমুদ
বিবি মরিয়ম

সূচিপত্র

অক্ষশক্তি (Axis Power)

অক্ষশক্তি বলতে পক্ষ বা ঐক্যকে বোঝানো হয়। বিশেষ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় গড়ে ওঠা জার্মানি, ইতালি ও জাপানের ঐক্যজোট বিশ্বে অক্ষশক্তি নামে পরিচিত। ১৯৩৬ সালে ইতালি যখন আবিসিনিয়া আক্রমণ করে তখন স্পেন ও জার্মানি ব্যতীত ইউরোপের সকল রাষ্ট্রই ইতালির বিরোধিতা করে। তখন থেকেই ইতালি ও জার্মানির ঐক্য ও সহযোগিতা আরম্ভ হয়। এই ঐক্যকে রোম-বার্লিন অক্ষশক্তিও বলা হয়। পরবর্তীতে জাপানও এই অক্ষশক্তিতে যোগদান করে।

অক্সফাম (OXFAM)

ব্রিটেনের বিখ্যাত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী দাতব্য সংস্থা। বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের পর যেসব যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল তার পুনর্গঠনে এ সংস্থাটি বিশেষভাবে সাহায্য-সহযোগিতা করে।

অগাস্টা ও ড্যাস্টে কেলেঙ্কারি (Augusta and *Dasti* Scandal)

ইতালির প্রতিরক্ষা গ্রুপের নাম অগাস্টা এবং ফরাসি বিমান প্রস্তুতকারক কোম্পানির নাম ড্যামেস্ট। ন্যাটো মহাসচিব উইলি ক্লজ (১৯৮৮-৮৯) বেলজিয়ামের অর্থনৈতিক বিষয়ক মন্ত্রী থাকাকালীন বেলজিয়াম সামরিক বাহিনীর অস্ত্র ক্রয়ে কন্ট্রাক্ট পাবার জন্য অগাস্টা এবং ড্যামেস্টের মাধ্যমে সোশ্যালিস্ট পার্টিকে লাখ লাখ ডলার ঘুষ প্রদান করেন। কিন্তু উইলি ক্লজ এ কেলেঙ্কারির ব্যাপারে নিজেকে নির্দোষ দাবি করেন। ভবিষ্যতে ন্যাটোর দায়িত্ব যেন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করতে পারে সেজন্য এ অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য বেলজিয়াম পার্লামেন্টে দাবি জানান। ১৯৯৫ সালের ১৯ অক্টোবর বেলজিয়াম পার্লামেন্টে ক্লজের দাবি দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে নাকচ হয়। উইলি ক্লজ ১৯৯৫ সালের ২০ অক্টোবর অগস্টা-ড্যামস্ট কেলেঙ্কারির দায় মাথায় নিয়ে পদত্যাগ করেন।

অচল অবস্থা (Dead lock)

কোনো বিতর্কে বা বাদ প্রতিবাদরত দলসমূহ যখন পরস্পরের সাথে কোনো প্রকার রফা বা আপস করতে অথবা স্বীকৃতি দিতে অস্বীকার করে, তখন যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাকে 'অচল অবস্থা' বলা হয়। এই ধরনের অচল অবস্থা আইন-পরিষদের দুই কক্ষের মধ্যে, আইন-পরিষদ ও প্রশাসনিক শাখার মধ্যে, দুইটি প্রশাসনিক শাখার মধ্যে বা কূটনৈতিক আলোচনারত রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারে।

অছি পরিষদ (Trusteeship Council)

অছি ব্যবস্থা হলো এমন এক আন্দোলনের প্রতীক যা উপনিবেশবাদের অপসারণ, সংশোধন ও রূপান্তরের উদ্দেশে আন্তর্জাতিক সংগঠনকে এ ধরনের কৌশল হিসেবে ব্যবহার করে। অছি পরিষদ জাতিসংঘের ৬টি অঙ্গ-সংগঠনের মধ্যে একটি অন্যতম বিভাগ। স্বাধীনতাকামী ও আত্মনিয়ন্ত্রাধিকার বঞ্চিত যে সকল জাতি বা অঞ্চলের রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব জাতিসংঘের ওপর অর্পিত। যে সকল জাতি বা দেশের রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং যাতে তারা যথাসম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রাধীকার ও স্বাধীনতা অর্জন করতে পারে। সেই সকল রাষ্ট্রকে সহযোগিতা বা কাজ করাই অছি পরিষদের দায়িত্ব।

অতিরাষ্ট্রিকতা (Extra territoriality)

অতিরাষ্ট্রিকতা; অতিরাষ্ট্রিক সুযাগ সুবিধা ভোগ; যে রাষ্ট্রে বাস করে তার আইন ও কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থান। যেকোনো রাষ্ট্রের নিজ রাষ্ট্রের বাইরে কর্তৃত্ব করার অধিকার, যেমন এর সরকারি জাহাজের ওপর বা মহাসমুদ্রে ভাসমান পণ্যবাহী জাহাজের ওপর অথবা বিদেশে নিযুক্ত এটার দূত ও কূটনীতিবিদদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার। বিশেষত দূত ও কূটনীতিবিদগণ যে দেশে বাস্তবিক পক্ষে বাস করেন তারা সেই দেশের কর্তৃত্বের বাইরে অবস্থান করেন। দূতাবাসসমূহকে রাষ্ট্রের মধ্যে 'বিদেশি দ্বীপ' বলা হয়। দূত ও কূটনীতিবিদগণ যে দেশে বাস করেন, তারা সেই দেশের আইন ও কর্তৃত্বের অধীন নয়।

অধস্তন আইন (Delegated Legislation)

সাধারণত আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন করে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে দেখা যায়, আইন বিভাগ বৈধ ক্ষমতা বলেই আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অন্য কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে প্রদান করতে পারে। এ প্রদত্ত বা অর্পিত ক্ষমতা বলে ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষ যে আইন প্রণয়ন করে এটাকেই অধস্তন আইন বা Subordinate Legislation বলে।

অধস্তন আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার উদ্ভব ব্রিটিশ পদ্ধতিতে। বাংলাদেশে অধস্তন আইন প্রণয়নের বিধান রয়েছে এবং এ ধরনের আইন প্রণীত হচ্ছে। সংবিধানের ৬৫ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে :"জাতীয় সংসদ: নামে বাংলাদেশের একটি সংসদ থাকিবে এবং এই সংবিধানের বিধানবলী-সাপেক্ষে প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন-ক্ষমতা সংসদের ওপর ন্যস্ত হইবে : তাবে শর্ত থাকে যে, সংসদের আইন দ্বারা যে কোনো ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষক আদেশ, বিধি, প্রবিধান, উপ-আইন বা আইনগত কার্যকারিতা সম্পন্ন অন্যান্য চুক্তিপত্র প্রণয়নের ক্ষমতার্পণ হইতে এই দফার কোনো কিছুই সংসদকে নিবৃত্ত করিব না।"

সংসদ আইন প্রণয়ন ক্ষমতা অর্পণ করলেও তিনটি অতি প্রয়োজনীয় কাজ সংসদকে করতে হয়। আইনের উদ্দেশ্য, মূল কাঠামো এবং মূল কাঠামো অনুসরণ করা

বাধ্যতামূলক-এ কাজগুলো সংসদকে করতে হয়। এ তিনটি শর্তের কথা স্যার সিসিল কার (Sir Cecil Carr) বলেছেন এভাবে : 'The legislative provides the gun and prescribes the target but leaves to the executive the task of pressint the trigger.' (দ্র. মোঃ আবদুল হালিম, সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ।

অধিকার (Rights)

সাধারণত অধিকার হলো রাষ্ট্রের কাছে নাগরিকের প্রাপ্তি। অবশ্য অনেকক্ষেত্রে ব্যক্তিগত পর্যায়েও অধিকারের বিষয়টি আসতে পারে। এক ব্যক্তির অন্য ব্যক্তির নিকট অধিকারে প্রসঙ্গটিও গুরুত্বপূর্ণ। অধিকার গ্রহণ ও প্রদানের মাধ্যমে মানবকল্যাণ সাধিত হয়। তবে অধিকার মানে নিজের খেয়াল-খুশী মতো কাজ করা নয়। ব্যক্তির স্বীয় ইচ্ছানুসারে চলাফেরাকে কোনো সময়ে অধিকারের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। ব্যক্তিও অপরের ধন-সম্পদ বা জীবনের ওপর হামলা করার বাসনা করতে পারে কিন্তু এই ইচ্ছাশক্তি বা কর্মকে অধিকারের পর্যায়ে আনা যায় না। কারণ অনুরূপ অন্য ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ইচ্ছা প্রদর্শন ও তা বাস্তবায়ন করতে চাইলে মানব সমাজ পরিণত হবে বন্য সমাজে। সেখানে 'জোর যার মুল্লুক তার' অবস্থা বিরাজ করবে। মানুষ সমাজবদ্ধ জীব, সমাজে বসবাস করতে গিয়ে কিছু সুযোগ-সুবিধা প্রয়োজন। সাধারণত এসবকে অধিকার বলা হয়। কেউ সামাজিক জীব হিসেবে অবাধ অধিকারের আশা করতে পারে না। অধিকার মানে স্বেচ্ছাধীন চলাফেরা করা নয় বরং আইনের গণ্ডির মধ্যে অবস্থান করে সুবিধা ভোগ করা। ব্যক্তিমানুষের কল্যাণের অস্তিত্বে প্রমাণিত হয় যে রাষ্ট্রের জন্য ব্যক্তি নয়, ব্যক্তির জন্যই রাষ্ট্রের অস্তিত্ব। সমাজের অঙ্গ রাষ্ট্র আইনের মাধ্যমে অধিকার সৃষ্টি ও রক্ষা করে। অধিকার হলো সমাজজীবনের এমন কিছু শর্ত যেগুলো না থাকলে ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন বিকাশ ব্যাহত হয়। অধিকারসমূহের কার্যকারিতা অনেকাংশে নির্ভর করে আইনের মাধ্যমে স্বীকৃতির ওপর। প্রতিটি অধিকারের একটি সামাজিক মূল্য এবং উদ্দেশ্য থাকে। সামাজিক কল্যাণের কিছু-না-কিছু শর্তপূরণ ও সমাজের অল্পবিস্তর উন্নতি সাধনে কী ভূমিকা পালন করে তার ওপর নির্ভর করে ভিন্ন অধিকারের যথার্থ বৈধতা। সমাজের প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিত্ব বিকাশের পক্ষে অধিকার যেন অনুকূল হয়। অধিকার বিভিন্ন ধরনের হতে পারে। সাধারণত নৈতিক ও আইনানুগ এই দুই ধরনের অধিকার হতে পারে। নৈতিক অধিকারগুলোর মধ্যে পড়ে নীতিবোধ, বিবেক, বিচারশক্তি ইত্যাদি মূলবোধ। এগুলো আইনের দৃষ্টিতে গ্রহণযোগ্য নয়। আদর্শগত তত্ত্বে অবশ্য এগুলো যথেষ্ট গুরুত্ব পায়। আইনানুগ অধিকারগুলো তিন ধরনের: পৌর, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক। পৌরজীবনে লোকের এমন কিছু সুবিধা বা অধিকার থাকা চাই যেগুলো ছাড়া মানুষের বিকাশ ও ব্যক্তিত্বের স্ফূরণ ঘটে না। যেমন বাক-স্বাধীনতা, লেখার কিংবা সংস্থা গঠনের, জীবন-ধারণ, ঘোরাফেরা, পরিবার-জীবন, ধর্মাচরণ, শিক্ষার্জনের অধিকার ইত্যাদি। রাজনৈতিক অধিকার বলতে রাষ্ট্রীয় কার্যনির্বাহে

অংশগ্রহণ বোঝায়। ভোট দেবার, নির্বাচনে প্রার্থী হবার, দল গঠনের, মতামত প্রকাশ করার, স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ প্রতিরোধের, সরকারি চাকরি পাবার, সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ থাকলে তার সুরাহার জন্য আবেদন করার অধিকার ইত্যাদি রাজনৈতিক গোত্রের। এই সূত্রে কিছু অর্থনৈতিক অধিকারের কথা এসে পড়ে, যেগুলোর আইনানুগ রূপায়ণের নিশ্চয়তা সব সময় থাকে না; যেমন চাকুরি বা জীবিকা নির্বাহের অধিকার। সংসদীয় গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত মালিকানায় ব্যবসা-বাণিজ্যের অধিকার, সম্পত্তি ভোগ করার অধিকার, শ্রমিকদের কাজের সময়, ন্যায়সংগত মজুরি ইত্যাদি বিষয় আর্থনৈতিক অধিকারের আওতায় পড়ে।

অধিকারের আবেদনপত্র (Pettion of Rights)

স্টুয়ার্ট যুগে রাজারা স্বীয় অধিকার ও কর্তৃত্বকে কায়েম করে পার্লামেন্টের ক্ষমতাকে খর্ব করার চেষ্টা করেছেন। রাজা প্রথম চার্লসের সময় তা চরম আকার ধারণ করে। ইতিমধ্যে নতুন নতুন জলপথ ও দেশ আবিষ্কৃত হয়। এতে ব্রিটেনে ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রসার ও নতুন নতুন উপনিবেশ গড়ে ওঠে এবং এক উদীয়মান ধনিক-বনিক শ্রেণির উদ্ভব হয় যারা তাদের অর্থনৈতিক স্বার্থের তাগিদে পার্লামেন্টের বিশেষত কমন্সসভার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও প্রাধান্য প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়। ফলে রাজার সাথে পার্লামেন্টের বিরোধ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। ১৬২৮ সালে প্রথম চার্লস এর রাজত্বকালে লর্ডসভা ও কমন্সসভা পার্লামেন্টের উভয়কক্ষে একযোগে স্টুয়ার্ট রাজাদের স্বৈরাচারী আচরণের নিন্দা করেন এবং কয়েকটি দাবি সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পেশ করেন যা 'অধিকারের আবেদন' (Pettion of Rights) নামে অভিহিত করা হয়। এই আবেদনপত্রে দাবি করা হয় যে, রাজা পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া কোনো কর ধার্য করবে না বা কোনো নজরানা নেবেন না। অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রথম চার্লস এই দাবি মেনে নিতে বাধ্য হয়।

অধিকারের বিল (Bill of Rights)

১৬৮৮ সালে গৌরবময় বিপ্লবের পর স্টুয়ার্ট রাজা দ্বিতীয় জেমস্ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ায় একটি বিশেষ পার্লামেন্ট ১৬৮৯ সালে মেরী (দ্বিতীয় জেমসে্র কন্যা) ও উইলিয়ামকে (জামাতা) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান। এ সময় পার্লামেন্ট তার অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার জন্য বিশেষভাবে উদ্যোগী হয়। এই উদ্দেশে ১৬৮৯ সালেই পার্লামেন্ট ঐতিহাসিক "অধিকারের বিল" (Bill of Rights) প্রণয়ন করে। এই অধিকারের বিল বিধিবদ্ধ হওয়ার ফলে ইংল্যান্ডে পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং রাজার একচ্ছত্র ক্ষমতার অবসান ঘটে। এই আইনের দ্বারা পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত রাজা কোনো কর ধার্য, রাজস্ব সংগ্রহ এবং নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তাছাড়া সেনাবাহিনী সংক্রান্ত বিষয়ে রাজার ক্ষমতাকে সীমাবদ্ধ করা হয়।

অধিবৃত্তি (Bonus)

অধিবৃত্তি হলো অতিরিক্ত লভ্যাংশ। অর্থাৎ কোনো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মধ্যে তাদের বেতন বাদেও লাভের যে অংশ বণ্টন করে দেওয়া হয়, নিয়মিত বেতন ছাড়া যে অতিরিক্ত অর্থ প্রদান করা হয় তাকে বোনাস বা অধিবৃত্তি বলা হয়। তাছাড়া যুদ্ধে প্রবীণ ব্যক্তিদেরকে তাদের কার্যকালে যে বেতন দেওয়া হয় তা ছাড়াও যে অতিরিক্ত অর্থ দেওয়া হয় তাকে অধিবৃত্তি বলে।

অধিবেশন (Session)

অধিবেশন বলতে পার্লমেন্টের অধিবেশনকে বুঝায়। পার্লামেন্ট বসার প্রথম বৈঠক থেকে শুরু করে স্থগিত হওয়া বা পার্লামেন্ট ভেঙে না দেয়া পর্যন্ত সময়কে অধিবেশন বোঝায়। বিভিন্ন দেশে পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান ও স্থগিত করার বিধান বিভিন্ন রকম হতে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের অধিবেশন আহ্বান করেন রাষ্ট্রপতি। বছরে কমপক্ষে দুটি অধিবেশন সংসদকে করতে হয়। ব্রিটিশ কমন্সসভার বাৎসরিক প্রথম অধিবেশন বসে অক্টোবরে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতি বছর কংগ্রেসের অধিবেশন শুরু হয় ৩ জানুয়ারি।

অধ্যাদেশ (Ordinance)

অধ্যাদেশ শব্দটির ইংরেজি Ordinance যার উৎপত্তি Anglo-French & Medieval Latin থেকে। Anglo-French এ Ordenance এবং Medieval Latin এ Ordinantia শব্দটি Order, Dispositon অর্থে ব্যবহৃত হতো। তবে চর্তুদশ শতাব্দীতে Ordinance বা অধ্যাদেশ শব্দটির ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অধ্যাদেশ হলো এমন কতগুলো নির্দেশ, আদেশ বা ডিক্রি যা যেকোনো দেশের রাষ্ট্রপ্রধান বা নির্বাহী প্রধান বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষ সংবিধান প্রদত্ত বিশেষ ক্ষমতাবলে তৈরি ও প্রণয়ন করে এবং যা আইনের মত কার্যকর। সাধারণত আইন প্রণয়নের ক্ষমতা আইনসভার হাতে ন্যস্ত। কিন্তু কতিপয় রাষ্ট্রের লিখিত সংবিধানে বিশেষ ক্ষেত্রে কিংবা জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য রাষ্ট্রপতিকে আইন প্রণয়নের ক্ষমতা প্রদান করে। ভারত ও পাকিস্তানের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা লিপিবদ্ধ রয়েছে। ব্রিটিশ রাজা বা রানী কিংবা আমেরিকার রাষ্ট্রপতির এই ধরনের ক্ষমতা নেই। আইন পরিষদ বা সংসদ যখন অধিবেশনে থাকে না অথবা পার্লামেন্ট যখন পার্লামেন্ট বিলুপ্ত হয় তখন জরুরি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য (Urgent situation or extreme necessity) রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক যে আইন প্রণয়ন করা হয় তাই অধ্যাদেশ। অধ্যাদেশ হলো: ১.রাষ্ট্রপ্রধান বা একটি কর্তৃপক্ষ জারিকৃত নিয়ম অথবা আইন, ডিক্রি বা নির্দেশ; ২.একটি সরকারি নিষেধাজ্ঞা বা বিধান; ৩.অধ্যাদেশ আইনের মত শক্তিশালী; ৪.আইন সভার অনুমোদনের পূর্বে তা কার্যকর হয়; ৫.আইনসভায় বিল আকারে উত্থাপনের পূর্বে গেজেটে প্রকাশিত হয়; ৬.অধ্যাদেশ হলো একটি প্রাথমিক বা সাধারণ আইন।

অধ্যাদেশ অননুমোদন (Disapporoval of Ordinance)

কোনো অধ্যাদেশ জারি হওয়ার পর অনুষ্ঠিত প্রথম বৈঠকে ওই অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপন করতে হয় এবং উপস্থাপনের ৩০দিন পর্যন্ত অধ্যাদেশটির কার্যকারিতা থাকে। এ মেয়াদের মধ্যে অধ্যাদেশটি রহিত বা বাতিল করা যেতে পারে কিংবা সংসদে গৃহীত প্রস্তাবক্রমে অধ্যাদেশটি অননুমোদন করা যেতে পারে। অধ্যাদেশের বিধানগুলোকে অব্যাহত রাখার লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে সংসদে প্রতিস্থাপনমূলক একটি বিল উত্থাপন করতে হয় এবং তিনি বিলটি যাতে সংসদে বিবেচিত হতে পারে সেরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকেন। তাঁর উদ্দেশ্য থাকে যে বিলটি সংসদে এমন সময়ের মধ্যে পাস করা যাতে অধিবেশনের প্রথম বৈঠক থেকে শুরু করে ৩০ দিনের মধ্যে বিলটিতে রাষ্ট্রপতির সম্মতি লাভ করা যায়। আবার কোনো অধ্যাদেশ উপস্থাপনের পর যে কোনো সদস্য তিন দিনের নোটিশ দিয়ে অধ্যাদেশটির অননুমোদনকল্পে সংসদে সিদ্ধান্ত প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। একই অধ্যাদেশ অননুমোদনকল্পে সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের নোটিশ পাওয়া গেলে নোটিশ প্রাপ্তির ক্রমানুসারে প্রস্তাবগুলো একই দিনের কর্মসূচিতে অর্ন্তভুক্ত করা হয়। সংসদ নেতার পরামর্শক্রমে স্পিকার ওই দিন ধার্য করেন। তবে অধ্যাদেশটি সংসদে উপস্থাপনের ৩০ দিনের মধ্যে হতে হয়, অন্যথায় অধ্যাদেশটি বাতিল বলে গণ্য হয়। সংশ্লিষ্ট বিলটি সংসদে উত্থাপনের আগেই অধ্যাদেশ অননুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব নিষ্পত্তির দৃষ্টান্ত খুবই সীমিত। অধ্যাদেশ অননুমোদনের জন্য আনীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব এবং জন গুরুত্বসম্পন্ন বিষয়ে আনীত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব একই আকারে প্রণীত হবার রীতি চালু রয়েছে। অধ্যাদেশ অননুমোদন সম্পর্কিত সিদ্ধান্ত প্রস্তাব যে আকারে হোক দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তার নমুনা হিসেবে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো: ১.সংসদের অভিমত এই যে, ইন্সটিটিউট অব পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিজ ইন এগ্রিকালচার (ইপসা) অধ্যাদেশ, ১৯৯৬ (অধ্যাদেশ নং ৩, ১৯৯৬) অননুমোদন করা হউক। ২.সংসদের অভিমত এই যে, বন্যা-উত্তর পুনর্বাসন (অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণ) অধ্যাদেশ, ১৯৯৮ (অধ্যাদেশ নং-১) অননুমোদন করা।

অধ্যাদেশ জারি (Promulgation of Ordinance)

বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের আইন প্রণয়ন ক্ষমতা জাতীয় সংসদের ওপর ন্যস্ত এবং সাধারণভাবে সংসদ তা পালন করে। এটা কোনো শর্তাধীনে আবদ্ধ নয় বা কোনোভাবে সীমিত নয়। তথাপি প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি মোকাবিলার জন্য সংবিধানে রাষ্ট্রপ্রধানের ওপর অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারির ক্ষমতা (Ordinance Making Power) ন্যস্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ সংবিধানের ৯৩(১) উপ-অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাষ্ট্রপতি ২টি ক্ষেত্রে অধ্যাদেশ প্রণয়ন করতে পারেন, যথা: ১.যখন সংসদ বিলুপ্ত বা ভেঙ্গে যাওয়া অবস্থায় থাকে; এবং ২.যখন সংসদ কার্যকর আছে কিন্তু অধিবেশনে নেই। এই দু'টি পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে, আশুব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রয়েছে বলে সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হয় তিনি যেরূপ

প্রয়োজন মনে করবেন সেরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করতে পারেন এবং জারি হওয়ার সময় থেকে অনুরূপভাবে প্রণীত অধ্যাদেশ সংসদেও আইনের ন্যায় ক্ষমতাসম্পন্ন হবে। অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পর্কিত বিধানগুলো মূলত: দু'ভাগে বিভক্ত- ১. সাধারণ অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পর্কিত বিধান এবং ২. সংযুক্ত তহবিল থেকে অর্থ প্রত্যাহারের জন্য অধ্যাদেশ প্রণয়ন সম্পর্কিত বিধান।

অধ্যাদেশের মর্যাদা (Legal Status of an Ordinance)

বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানানুযায়ী জাতীয় সংসদ যে সকল আইন প্রণয়ন করে তা সবই সাধারণ আইনের মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রপতি যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন সেই সময় হতে তা সংসদের আইনের ন্যায় সমক্ষমতাসম্পন্ন হবে। কারণ অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি তথা নির্বাহী বিভাগের একটি আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা। সংবিধান কর্তৃক সরাসরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ যে আইন প্রণয়ন করে তা সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত। সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ পরিস্থিতিতে সরাসরি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। সুতরাং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন (Acts of Parliament or Statute) ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ (Ordinance) সাধারণ আইনের আওতায় পড়ে।

অধ্যাদেশ প্রণয়নের শর্ত (Provisions of Ordinance)

বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারি ও প্রণয়ন করার এখতিয়ার আছে। সংসদের আইন প্রণয়ন করার ক্ষেত্রে যেসব সাংবিধানিক সীমাবদ্ধতা আছে তেমনি রাষ্ট্রপতির অধ্যাদেশ জারির ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ সংবিধানে তিনটা শর্ত রয়েছে, যথা- ১.জাতীয় সংসদ আইন দ্বারা যা করতে পারে না রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশের মাধ্যমে তা করতে পারেন না। সংসদ আইন প্রণয়ন করতে পারে কিন্তু সংবিধানের তৃতীয়ভাগে বর্ণিত মৌলিক অধিকারের অধ্যায় যে সমস্ত বিধানসমূহ বর্ণিত, তা ভঙ্গ করে বা তাদের ব্যত্যয়ে সংসদ কোনো প্রণয়ন আইন করতে পারে না। মৌলিক অধিকারের সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ সকল প্রচলিত আইন যতখানি অসমাঞ্জস্যপূর্ণ ততখানি বাতিল বলে গণ্য হবে। আবার আইন প্রণয়নের সময় সংবিধানের দ্বিতীয় ভাগে বর্ণিত রাষ্ট্রপরিচালনার সূত্রগুলো প্রযুক্ত হবে। আইন প্রণয়নকালে এই সংবিধান বাংলাদেশের অন্যান্য আইনের ব্যাখ্যা দানের ক্ষেত্রে নির্দেশক হবে এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের কার্যের ভিত্তি হিসেবে এই সকল নীতি আদালতে বলবৎযোগ্য হবে না। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে অধীন প্রণীত সংশোধনের ক্ষেত্রে এই অনুচ্ছেদের কোনো কিছুই প্রযোজ্য হবে না; ২.অধ্যাদেশ দ্বারা রাষ্ট্রপতি সংবিধানের কোনো বিধান পরিবর্তন বা রহিত করতে পারবে না। প্রজাতন্ত্রের সকল ক্ষমতার মালিক জনগণ; এবং জনগণের পক্ষে, সেই ক্ষমতার প্রয়োগ কেবল এই সংবিধানের অধীন ও কর্তৃত্বে কার্যকর হবে। সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে যা থাকুক না কেন, সংবিধানের প্রস্তাবনা, প্রথম, দ্বিতীয় ও

তৃতীয় ভাগের সকল অনুচ্ছেদ, নবম- ক ভাগে বর্ণিত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী সাপেক্ষ তৃতীয়ভাগের সকল অনুচ্ছেদ এবং একাদশ ভাগের ১৫০ অনুচ্ছেদসহ সংবিধানের অন্যান্য মৌলিক কাঠামো সংক্রান্ত অনুচ্ছেদগুলোর বিধানাবলী সংযোজন, পরিবর্তন, প্রতিস্থাপন, রহিতকরণ কিংবা অন্য কোনো পন্থায় সংশোধনের অযোগ্য হবে। সংবিধান হচ্ছে আইনের শাসন, আইন দ্বারা আইনের শাসনকে রদ বা রহিত করা যায় না। ৩.পূর্বে জারিকৃত কোন অধ্যাদেশকে পরবর্তী অধ্যাদেশের মাধ্যমে বলবৎ করা যায় না; শুধুমাত্র সংসদ যদি কোনো আইন প্রণয়ন করে সেই আইনের দ্বারা বলবৎ করা যাবে। রাষ্ট্রপতি সংধিানের ৫৬ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুযায়ী কেবল প্রধানমন্ত্রী ও ৯৫ অনুচ্ছেদের (৩) দফা অনুসাওে প্রধান বিচারপতি নিয়োগের ক্ষেত্র ব্যতীত অন্য সকল দায়িত্ব পালনে প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী কার্য করবেন। সুতরাং এই অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শ অনুযায়ী অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন।

অধ্যাদেশের মর্যাদা (Legal Status of an Ordinance)

বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানানুযায়ী জাতীয় সংসদ যে সকল আইন প্রণয়ন করে তা সবই সাধারণ আইনের মর্যাদা লাভ করে। রাষ্ট্রপতি যে অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারি করেন সেই সময় হতে তা সংসদের আইনের ন্যায় সমক্ষমতাসম্পন্ন হবে। কারণ অধ্যাদেশ প্রণয়নের ক্ষমতা রাষ্ট্রপতি তথা নির্বাহী বিভাগের একটি আইন প্রণয়নগত ক্ষমতা। সংবিধান কর্তৃক সরাসরি ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে কোনো কর্তৃপক্ষ যে আইন প্রণয়ন করে তা সাধারণ আইনের আওতাভুক্ত। সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদ রাষ্ট্রপতিকে বিশেষ পরিস্থিতিতে সরাসরি আইন প্রণয়নের ক্ষমতা দিয়েছে। সুতরাং সংসদ কর্তৃক প্রণীত আইন (Acts of Parliament or Statute) ও রাষ্ট্রপতি কর্তৃক প্রণীত অধ্যাদেশ (Ordinance) সাধারণ আইনের আওতায় পড়ে।

অনাক্রমণ চুক্তি (Non-aggression Pact)

এক বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো আগ্রাসন বা আক্রমণ না করার জন্য পরস্পরিক যে বোঝাপড়া বা চুক্তি তাই অনাক্রমণ চুক্তি। প্রতিবেশি রাষ্ট্র বা অন্যকোনো রাষ্ট্র যখন পরস্পর পরস্পরের মধ্যে বলপ্রয়োগ বা অস্ত্রধারণ করবেনা এবং আপোষ-মীমাংসার মাধ্যমে যাবতীয় বিরোধের নিষ্পত্তি করবে এই মর্মে যে চুক্তি সম্পাদন করে তাকে অনাক্রমণ চুক্তি বলে।

অনাস্থা প্রস্তাব (Vote of No-confidence)

সাধারনত যে কোনো সংসদ সদস্য আইন পরিষদের সদস্যদের বা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশে সংসদে প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন। কিংবা সংসদে সরকারি সদস্য কর্তৃক আনীত কোনো বিলের বিরুদ্ধে অনাস্থা জানিয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপন করে, তাকেই অনাস্থা প্রস্তাব বলা হয়। যদি এই প্রস্তাবের পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠ বা

দুই-তৃতীয়াংশ ভোট (সংবিধান অনুযায়ী) পড়ে তাহলে সরকারের পতন ঘটে। কোনো কোনো দেশে রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব পাশ করতে হলে সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট নয়, দুই তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রয়োজন হয়। বিভিন্ন দেশে বিশেষ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপনের ব্যবস্থা লক্ষ্য করা যায়। মন্ত্রিসভার দায়িত্ব বলবৎ করার চরম ও প্রত্যক্ষ পন্থা হলো সংসদ কর্তৃক মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব গ্রহণ। অনাস্থা প্রস্তাব কথাটি পার্লামেন্ট বা আইন সভার কার্যক্রমের সাথে সম্পর্কিত। বাংলাদেশ সংবিধানের ৫৭ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন হারালে প্রধানমন্ত্রী তথা মন্ত্রিসভা পদত্যাগ করবেন।

অনুগত বিরোধী দল (Loyal Opposition)

কোনো বিরোধী দল যখন জাতীয় স্বার্থে ক্ষমতার বাইরে থেকেও সরকারি দলের সঙ্গে সহযোগিতামূলক আচরণ করে তখন তাকে অনুগত বিরোধী দল বলা হয়। এ ধরনের বিরোধী দলের কাছে জাতীয় স্বার্থ এবং জাতীয় ঐকমত্য প্রতিষ্ঠা প্রধান বিবেচ্য বিষয় হয়। আবার কোনো বিরোধী দল যখন সরকারি দলকে তোষামোদ করে এবং ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখার লক্ষ্যে পরিকল্পিতভাবে সরকারের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে তখন তাকেও অনুগত বিরোধী দল বলে। সামরিক শাসকদের দ্বারা সৃষ্ট আইনসভায় বা 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া' শুরুর প্রথম পর্যায়ে এরকম অনুগত বিরোধী দলের অস্তিত্ব দেখা দেয়। এ ধরনের বিরোধী দল জনসমর্থনহীন ও গণবিচ্ছিন্ন চরিত্রের হয়। ক্ষমতা লাভের পর সামরিক শাসকেরা রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতা প্রতিষ্ঠার জন্য পরিকল্পিতভাবে আইনসভা গঠন করেন। এরকম আইনসভা নির্বাচিত হতে পারে আবার শাসক-সৃষ্টও হতে পারে। গণসমর্থিত বিরোধী দলগুলো সামরিক শাসকদের 'গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া'য় সম্পৃক্ত না হলে সামরিক জান্তা বিরোধী দলের সৃষ্টি করে। এসব দল আইনসভায় সরকারের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হয়। এদের বিরোধিতা স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট এবং শাসকগোষ্ঠীর পরিকল্পনার অধীনেই হয়।

অনুন্নত বিশ্ব (Under Developed Countries)

সাধারণত যে সকল দেশের উৎপাদন উপকরণ ও প্রক্রিয়া উন্নত দেশগুলোর তুলনায় পশ্চাৎপদ সেই সকল দেশগুলোকে সমন্বিতভাবে অনুন্নত বিশ্ব বলে অভিহিত করা হয়। নিম্ন মাথাপিছু আয়, মুদ্রাস্ফীতি, শোষণ দারিদ্র্য, পরনির্ভরশীলতা, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, বেকারত্ব, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত দিক থেকে অনগ্রসরতা এ সকল দেশের সাধারণ বৈশিষ্ট্য। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার দেশ যারা কলাকৌশল ও প্রযুক্তির দিক থেকে উন্নত বা অগ্রসর দেশগুলোর তুলনায় পিছিয়ে আছে সে সকল দেশ অনুন্নত দেশের অন্তর্ভুক্ত। এই সকল দেশগুলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কোনো না কোনো বিদেশি শক্তির উপনিবেশ ছিল। তাছাড়া পৃথিবীর উন্নত দেশগুলো তাদের

শিল্প প্রতিষ্ঠানের কাঁচামাল সংগ্রহ এবং শিল্পোৎপাদিত পণ্য বিক্রয়ের বাজার হিসেবে ব্যবহার করার জন্য এসব দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক অনিশ্চয়তা, প্রযুক্তিগত পশ্চাৎপদতা, শোষণ, দারিদ্র্যতা ও পরনির্ভরশীল বিভিন্ন কৌশলে কাজে লাগায়। এগুলো স্বল্পোন্নত দেশ (Less Developed Countries বা LDC, কেউবা উন্নয়নশীল দেশ (Developing Countries) নামেও বিশ্বে পরিচিত। এই অনুন্নত দেশগুলোর উন্নয়নের ধাপ একই রকম নয়; তৃতীয় বিশ্বের অন্তর্গত বটে। সুতরাং অনুন্নত বিশ্ব বলতে সেই সমস্ত দেশগুলোর সমষ্টিকে বোঝায় যেখানে জনসংখ্যার তুলনায় মূলধন সৃষ্টি ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের হার উন্নত দেশগুলোর তুলনায় কম।

অনুপ্রবেশ (Infiltration)

কোনো দেশ বা সংগঠনের অভ্যন্তরে শত্রুপক্ষ অথবা ভিন্ন দেশ বা সংগঠনের ব্যক্তি বা চরদের গোপনভাবে ঢুকে পড়াকে অনুপ্রবেশ বলে।

অন্ধকার যুগ (Dark Age)

অতীত ও বর্তমান যুগের মধ্যবর্তী যুগকে মধ্যযুগ বলা হয়। এটাকে অন্ধকার যুগও বলে। ইউরোপের ৫০০ খ্রিস্টাব্দ হতে ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এক সহস্র বৎসর কাল। এই সহস্র বৎসর কাল ইউরোপ অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার তিমিরে আচ্ছন্ন ছিল বলে এই সময়কে 'অন্ধকার যুগ' বলা হয়। এই যুগের অবসানের পর ইউরোপে নবযুগের বা নব-জাগরণের সূচনা হয়।

অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম (Operation Desert Storm)

১৯৯১ সালে ইরাক আকস্মিকভাবে কুয়েত দখল করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে করলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কুয়েত থেকে ইরাকি বাহিনীকে হটানোর জন্য যে সমারিক অভিযান শুরু করে তার সাংকেতিক নাম 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম বা অপারেশন মরু ঝড়'। এই অপারেশনের নামে সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে মার্কিন কর্তৃত্বাধীন বহুজাতিক বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ইরাক-কুয়েত যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরও তা বহাল রাখা হয়।

অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম (Operation Iraki Freedom)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে ইরাকের প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাতের লক্ষ্যে পরিচালিত সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন ইরাকি ফ্রিডম'। ইরাক তথা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের বিরুদ্ধে দীর্ঘদিনের রণ প্রস্তুতি শেষে ২০০৩ সালের ২০ মার্চ বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টায় যৌথবাহিনী ইরাকে তাদের আক্রমণের সূচনা করে। শুরু হয় বাগদাদসহ ইরাকের প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ। ইরাকের কুয়েত সীমান্ত দিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা ইরাক ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। তারা

প্রথম দিকে প্রচণ্ড প্রতিরোধের সম্মুখীন হলেও পরে একের পর এক যৌথ বাহিনী নাজাফ, কারবালা, বসরা এবং অবশেষে রাজধানী বাগদাদও দখল করে নেয়। প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেন এবং তার রিপাবলিকান গার্ড বাহিনী রণভঙ্গ দেন। ফলে বিচ্ছিন্ন কিছু এলাকার প্রতিরোধ যুদ্ধ অব্যাহত থাকলেও ইরাকে ওপর ইঙ্গ-মার্কিনীদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন অভিযানের বিরোধিতা করে জাতিসংঘসহ বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা। তাছাড়া রাশিয়া, ফ্রান্স, জার্মানি, চীন ও মুসলিম বিশ্বের অধিকাংশ দেশ এর বিরোধিতা করে। অন্যদিকে এ অভিযানকে অন্ধভাবে সমর্থন করে অস্ট্রেলিয়া, স্পেন, ইতালি, জাপান, নেদারল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও ডেনমার্ক। আর্থিক সুবিধা পাওয়ার আশায় সমর্থনকারী দেশ আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া, ফিলিপাইন, আজারবাইজান, উজবেকিস্তান, জর্জিয়া, লিথুনিয়া, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, চেক রিপাবলিক স্লোভাকিয়া, কলাম্বিয়া, এল সালভাদর, নিকারাগুয়া, ইরিত্রিয়া, ইথিওপিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, মেসিডোনিয়া। তাছাড়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাথে থাকতে হয়েছে তুরস্ককে। অন্যদিকে কুয়েত, সৌদি আরব, কাতার, জর্ডান, বাহরাইন, ওমান, আরব আমিরাত মুখে বিরোধিতা করলেও থেকেছে যুক্তরাষ্ট্রের নীরব সঙ্গী হিসেবে।

অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম (Operation Enduring Freedom)

যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে আফগানিস্তানের তালেবান সরকার ও তালেবান মিত্র ওসামা বিন লাদেনের বিরুদ্ধে পরিচালিত অভিযান 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম' নামে পরিচিত। ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ার ট্র্যাজেডির ২৭ দিন পর ৭ অক্টোবর মার্কিন ও ব্রিটিশ বিমান এবং যুদ্ধজাহাজ থেকে আফগানিস্তনে প্রচণ্ড হামলা শুরু হয়। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ বেতার-টিভিতে দেয়া ভাষণে এ সামরিক অভিযান শুরুর ঘোষণা দেন। উপর্যুপুরি বিমান হামলার ফলে ২০০১ সালের ১২ নভেম্বর তালেবান বাহিনী রাজধানী কাবুল ছাড়তে বাধ্য হয় এবং সেই সাথে 'অপারেশন এনডিউরিং ফ্রিডম'-এর প্রথম পর্যায়ের কাজ সমাপ্ত হয়।

অপারেশন ক্লিন হার্ট (Operation Clean Heart)

বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান সন্ত্রাস ও নাশকতা বৃদ্ধির প্রেক্ষিতে সন্ত্রাসের মূলোৎপাটন করে দেশে শান্তি ও শান্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যৌথবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত বিশেষ অভিযানের নাম 'অপারেশন ক্লিন হার্ট'। ২০০২ সালের ১৬ অক্টোবর থেকে এ অপারেশন শুরু হয়। প্রথম দিনে প্রায় ১১ হাজার সেনা সদস্য এ অভিযানে অংশ নেয়। পরে সেনা সংখ্যা বৃদ্ধি এবং এ কার্যক্রম শহর থেকে প্রত্যন্ত গ্রামাঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত করা হয়। অপারেশন ক্লিন হার্টের সুবাদে সন্ত্রাস হ্রাস পায় এবং সন্ত্রাসীরা গা ঢাকা দেয়। ফলে দেশে আপাতত শান্তি ও স্বস্তি ফিরে আসায় ৯ জানুয়ারি ২০০৩ সরকার যৌথ অভিযান 'অপারেশন ক্লিন হার্ট' কার্যক্রম সমাপ্তি ঘোষণা করে। অপারেশন ক্লিন হার্টের ব্যাপ্তিকাল ছিল মোট ৫৭ দিন।

অপারেশন ডেজার্ট ফক্স (Operation Desert Fox)

১৯৯৮ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে পরিচালিত ইঙ্গ-মার্কিন আক্রমণের সাংকেতিক নাম 'অপারেশন ডেজার্ট ফক্স' (Operation Desert Fox)। ১৬ থেকে ১৯ ডিসেম্বর মাত্র চারদিনের অভিযানে আক্রমণকারী ইঙ্গ-মার্কিন পক্ষ ইরাকের ওপর ভয়াবহ বিমান হামলা পরিচালনা করে ব্যাপক ধ্বংস সাধন করে। তারা ইরাকের লক্ষ্যবস্তুর ওপর নিক্ষেপ করে ৪২৫টি ক্রুজ ক্ষেপনাস্ত্র। রাশিয়া ও চীন এই অভিযানের প্রতিবাদ জানায়। বিশ্ববাসী ইঙ্গ-মার্কিন এই হামলাকে নিছক শক্তির দাম্ভিকতা এবং মানবতার বিরুদ্ধে প্রহসন বলে আখ্যায়িত করে।

অপারেশন পুশ ব্যাক (Operation Pushback)

'অপারেশন পুশ ব্যাক' হলো ভারত সরকার কর্তৃক জবরদস্তিমূলকত একতরফাভাবে বাংলা ভাষাভাষীদের বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর একটি অপচেষ্টা। ১৯৯২-এর আগস্ট মাসের শেষের দিকে হঠাৎ করেই বিভিন্ন বস্তি থেকে বাংলা ভাষাভাষীদের ধরে ট্রাকে তুলে নিয়ে আসা হয় বাংলাদেশর সীমান্তে। ভারতীয়দের মতে যাদের 'পুশ ব্যাক' করার চেষ্টা করা হয় তারা বাংলাদেশী। কিন্তু ভারতের হাতে কোনো প্রমাণ ছিল না যে এরা বাংলাদেশী। বরং তাদের দিল্লির রেশন কার্ড ছিল, ভোটার তালিকায় নাম ছিল, সর্বোপরি এই সব বস্তিবাসী নিজেদের ভারতীয় বলে দাবি করে। এছাড়া বাংলাদেশে ঠেলে পাঠানোর ব্যাপারে ভারত সরকারের তরফ থেকে বাংলাদেশ এবং যাদের পুশ ইন করার চেষ্টা করা হয় তাদের কাউকে আগাম কোনো নোটিস দেয়া হয়নি। এটা ছিল নাগরিক, মানবিক এবং রাজনৈতিক অধিকার লঙ্ঘন। বাংলাদেশ সরকার এই অপচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করে। ভারতীয় রাজনৈতিক নেতারাও ব্যাপারটির প্রতিবাদ করে। বাংলাদেশ সরকার সীমান্তে বিডিআর পাহারা জোরদার, কার্ফু জারি, দেখামাত্র গুলির নির্দেশ ছাড়াও অপারেশন পুশ ব্যাক প্রতিহত করার দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণ করে।

অপারেশন বারবারোস (Operation Barbarossa)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার ওপর আগ্রাসী জার্মানির সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন বারবারোস'। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানি হঠাৎ করে রাশিয়া আক্রমণ করে। ২৯ লাখ জার্মান সৈন্য এই অভিযানে অংশ নেয়। বিশাল এ বাহিনী ঝড়ের বেগে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতিরোধ ভেঙে এগুতে থাকে। প্রায় দু হাজার মাইল ফ্রন্ট লাইনে এই আক্রমণ চালানো হয়। প্রথম দিকে এই অভিযানে জার্মান বাহিনী সাফল্য পায় এবং রাশিয়ার বহু অঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু পরে শীতকাল আসায় জার্মানদের বিজয় পরাজয়ের গ্লানিতে পরিণত হয়। প্রচণ্ড শীতে এবং খাদ্যের অভাবে জার্মান বাহিনী মারাত্মক সংকটে পড়ে। এই অভিযানে শুধু ক্ষুধার কারণে মারা যায় প্রায় ১০ লাখ জার্মান সৈন্য। অবশেষে প্রচণ্ড শীতে ও পর্যাপ্ত খাদ্যের অভাবে জার্মান বাহিনী পরাজয় বরণ করে।

অপারেশন ব্লু স্টার (Operation Blue Star)

ভারতের পাঞ্জাব প্রদেশের শিখরা ১৯৪৭ সাল থেকেই স্বায়ত্তশাসনের দাবি করে আসছে। এই উদ্দেশে শিখদের চরমপন্থি নেতা জর্নাল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালের নেতৃত্বে শিখরা ১৯৭৩ সালের পর 'স্বাধীন খালিস্তান'-এর জন্যে আন্দোলন শুরু করে। ১৯৮২ সালে ভিন্দ্রেনওয়ালে তাঁর সমর্থকদের নিয়ে শিখদের প্রধান ধর্মপীঠ অমৃতসরস্থ স্বর্ণমন্দিরে আশ্রয় নিয়ে স্বাধীন শিখ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। ভারতের সরকার ১৯৮৪ সালের ৫-৭ জুন ভারতীয় সেনাবাহিনী দ্বারা স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালায় এবং প্রচণ্ড নৃশংসতার সাথে বিদ্রোহীদের দমন করে। শিখদের পবিত্র 'আকাল তখ্‌ত্‌' রক্ষা করতে গিয়ে অসংখ্য শিখ প্রাণ হারায়। স্বয়ং জর্নেল সিং ভিন্দ্রেনওয়ালেকে হত্যা করা হয়। ভারতীয় সেনাবাহিনীর এই অভিযানেরই কোড নাম ছিল অপারেশন ব্লু স্টার। ভিন্দ্রেনওয়ালের মৃত্যুর প্রতিশোধ নিতে গিয়ে শিখরা ১৯৮৪ সালের ৩১ অক্টোবর প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকেই গুলি করে হত্যা করে। ১৯৮৫ সালের ২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে মধ্যপন্থী শিখ নেতা সন্ত হরচাঁদ সিং লাঙ্গোয়ালের এক চুক্তি হয়। চুক্তির ২৭ দিন পর (২০.৮.৮৫) লাঙ্গোয়াল আঁততায়ীর গুলিতে নিহত হন। ফলে অবস্থার অবনতি ঘটতে থাকে এবং স্বর্ণমন্দিরে চরমপন্থিরা পুনরায় ঘাঁটি স্থাপন করে। এমতাবস্থায় ৯-১৮ মে, ১৯৮৮ ভারতীয় আধা সামরিক বাহিনী পুনরায় স্বর্ণমন্দিরে অভিযান চালিয়ে স্বর্ণমন্দিরকে মুক্ত করে।

অপারেশন মান্না (Operation Manna)

বাংলাদেশের উপকূলীয় জেলাগুলোর বিভিন্ন দ্বীপাঞ্চল ও এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চল যেমন— কক্সবাজার, মহেশখালী, কুতুবদিয়া প্রভৃতি জায়গাতে ১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল যে প্রলয়ঙ্করী ঘূর্ণিঝড় বয়ে গিয়েছিল তাতে প্রায় ৩ লাখ লোক প্রাণ হারিয়েছিল। প্রায় ৩৯০ কিমি বেগে প্রবল হারিকেন ঘূর্ণিঝড় ও প্রায় ৬ মিটার উঁচু জলোচ্ছ্বাসের তাণ্ডবে বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সাধনের পর ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনীর ব্যাপক ত্রাণ তৎপরতা পরিচালিত হয় বন্যাদুর্গত এলাকায়। এই ত্রাণ তৎপরতাই অপারেশন মান্না নামে পরিচিত। ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী ২০ মে দু সপ্তাহব্যাপী তাদের ত্রাণকার্য পরিচালনা করে। হযরত মুসা (আ)-এর কওমদের কাছে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে বিশেষ এক ধরনের সুস্বাদু বেহেশতী খাদ্য আসত, যা পবিত্র কুরআন ও বাইবেলে মান্না ও সালওয়া নামে পরিচিত (সূরা বাকারাহ)। এ ঘটনাকে স্মরণ করেই ব্রিটিশ রাজকীয় নৌবাহিনী তাদের এ ত্রাণ কার্যক্রমের নাম দেয় 'অপারেশন মান্না'।

অপারেশন লিপ ফরওয়ার্ড (Operation Leap Forward)

শ্রীলংকার ক্ষমতাসীন সরকার কর্তৃক স্বাধীনতাকামী তামিলদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সামরিক অভিযানের নাম 'অপারেশন লিপ ফরওয়ার্ড'। চন্দ্রিকা কুমারাতুঙ্গা ক্ষমতায় এসে দীর্ঘকালের গৃহযুদ্ধ মিটিয়ে ফেলার উদ্যোগ নেন। তিনি তামিলদের স্বায়ত্তশাসন

দেয়ার অঙ্গীকার করেন। তার আহ্বানে তামিরা সাড়া দিলে ৮ জানুয়ারি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ায় বিশ্ববাসী এটা তামিল সমস্যার শান্তিপূর্ণ সমাধান হিসেবে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু উক্ত শান্তিচুক্তির সুযোগে এটা ছিল প্রভাকরণের প্রতারণা এবং শক্তি সঞ্চয়ের কৌশল। এর প্রমাণ ১৯ এপ্রিল তামিল যুদ্ধবিরতি লঙ্ঘন করে। তারপরও চন্দ্রিকা তার শান্তি প্রয়াস অব্যাহত রাখেন। কিন্তু শান্তি প্রতিষ্ঠার সকল চেষ্টা ব্যর্থ হওয়ার পর এপিলের শেষের দিকে সরকার 'Operation Leap Forward' নামক সামরিক অভিযান চালায়। এই অভিযানে সরকারি বাহিনী উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করে। সরকারি বাহিনী তামিলদের কেন্দ্র জাফনার উপকণ্ঠে পৌঁছে যায়।

অপারেশন সানসাইন (Operation Sunshine)

শ্রীলংকার সরকার কর্তৃক তামিল গেরিলাদের ওপর পরিচালিত অভিযানের নাম 'অপারেশন সান সাইন' (Operation Sunshine)। ইতিপূর্বে পরিচালিত অপারেশন লিপ ফরওয়ার্ডে সরকারি বাহিনী কিছু সাফল্য লাভ করায় লংকা সরকার ১৯৯৫ সালের ১৭ অক্টোবর অপারেশন সানসাইন (সূর্যরশ্মি) শুরু করে। অপারেশন লিপ ফরওয়ার্ডের পর আরো শক্তি বৃদ্ধি করে ২৫ হাজার সৈন্য নিয়ে এবং চীন, রাশিয়া ও ইসরাইল থেকে আরো যুদ্ধাস্ত্র সংগ্রহ করে এই অভিযান চালায়। দীর্ঘ ৪৭ দিন তুমুল যুদ্ধের পর সরকারি বাহিনী ২ ডিসেম্বর তামিল অধ্যুষিত জাফনার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ লাভ করে। এটি এলটিটিইর বিরুদ্ধে শ্রীলংকা সরকারের এ যাবৎকালের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

অপারেশন সার্চলাইট (Operation Searchlight)

২৫ মার্চ '৭১ বাঙালি জাতির জীবনের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন দিন। বাংলাদেশে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসন কায়েম রাখার জন্য ২৫ মার্চ রাতে যে ঘৃণ্য, বর্বর গণহত্যা ও ধ্বংসযজ্ঞ চালানো হয় সেই ঘটনাকেই বলা হয় অপারেশন সার্চলাইট। ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে ২৫ মার্চ '৭১ গণপরিষদের অধিবেশন আহ্বান করা হয়। এর পূর্বে পাকিস্তানি শাসক ইয়াহিয়া খান এ শাসনতান্ত্রিক আলোচনার জন্য ৫ মার্চ ঢাকায় আসেন এবং ১৫ মার্চ থেকে ২৫ মার্চ আলোচনা চলে। শেষ পর্যন্ত আলোচনা ব্যর্থ হলে ইয়াহিয়া খান ওই দিন ঢাকা ত্যাগ করেন কিন্তু সামরিক বাহিনীকে গোপনের নির্দেশ দিয়ে যান সামরিক অভিযান চালাতে। ফলে ২৫ মার্চ রাত সাড়ে ১০ টায় শুরু হয় ইতিহাসের ঘৃণ্যতম হত্যাকাণ্ড সাংবাদিক অ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস এই ঘটনাকে 'বিশ শতকের জঘন্যতম প্রবঞ্চনা বলে আখ্যায়িত করেছেন। ওইদিন পাক সেনাবাহিনী ঢাকা শহরের নিরস্ত্র জনগণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং অসংখ্য নর-নারী ও শিশু হত্যা করে। উদ্দেশ্য ছিল দেশের নেতৃবৃন্দ, বুদ্ধিজীবী, ছাত্র-যুবক নির্মূল করা আর বাঙালি জাতিকে ক্রীতদাসে পরিণত করা। শুধু ঢাকাতেই সে রাতে প্রায় ৫০ জাহার নর-নারী নিহত হয়। ওই রাতেই বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে পাকিস্তানের করাগারে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দি হবার পূর্বে শেখ মুজিব সশস্ত্র প্রতিরোধের নির্দেশ জারি করে

বাংলাদেশকে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দেন। '৭১ সালের সেই ২৫ মার্চ কাল রাতে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী কর্তৃক পরিচালিত এই অভিযানকেই বলা হয় 'অপারেশন সার্চলাইট'।

অপারেশন সি এঞ্জেল (Operation Sea Angel)

১৯৯১ সালের ২৯ এপ্রিল কক্সবাজারসহ বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে প্রায় তিন লাখ মানুষ মারা যায়। এবং কোটি কোটি টাকার সম্পদ ধ্বংস ও বিনষ্ট হয়। দেশের উপদ্রুত এলাকায় ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যে সহযোগিতার লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এগিয়ে আসে। মার্কিন টাস্কফোর্স পরিচালিত সেই ত্রাণ ও পুনর্বাসন কার্যক্রমের নাম দেয়া 'অপারেশন সি এঞ্জেল' (Operation Sea Angel)। উপদ্রুত এলাকায় মার্কিন টাস্কফোর্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এই অভিযানের প্রধান ছিলেন হেনরি সি স্ট্রাকপোল।

অপারেশন সি লায়ন (Operation Sea Lion)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটেনের ওপর আগ্রাসী জার্মানির সামরিক অভিযানের নাম অপারেশন সি লায়ন। যুদ্ধে জার্মানি একের পর এক প্রতিবেশী বৈরি দেশ দখল করে তৎকালের সবচেয়ে শক্তিধর দেশ ব্রিটেনের দিকে অগ্রসর হয়। ১৯৪০ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানি ব্রিটেন আক্রমণ করে। ইতিমধ্যে ফ্রান্সও জার্মানির দখলে এসে যায়। এরপর জার্মানি প্রচণ্ড বিমান হামলা চালায় ব্রিটেনের ওপর। কিন্তু ব্রিটেন তার শক্তিশালী রাডার ব্যবস্থার সহযোগিতায় জার্মান আক্রমণ প্রতিহত করে। যে উদ্দেশ্য 'অপারেশন সি লায়ন' পরিচালিত হয়েছিল তা ব্যর্থ হয়।

অপারেশন হাস্কি (Operation Husky)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইতালির বিরুদ্ধে পরিচালিত যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের যৌথ অভিযানের নাম 'অপারেশন হাস্কি'। ১৯৪৩ সালের জুলাই মাসে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আর ব্রিটিশ বাহিনী ইতালির সিসিলি এবং সর্দিনিয়া দ্বীপের ওপর হামলা শুরু করে। ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর প্রচণ্ড আক্রমণের ফলে ৩৯ দিনের মধ্যে পতন ঘটে সিসিলির। অক্ষশক্তির ১ লাখ ৬৭ হাজার এবং মিত্রশক্তির প্রায় ৩২ হাজার সৈন্য নিহত হয় ওই যুদ্ধে। সিসিলি থেকে পালিয়ে বাঁচে লক্ষাধিক জার্মান সেনা।

অপূর্ণ অলিগোপলি (Imperfect Oligopoly)

যখন কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে অল্পসংখ্যক প্রতিষ্ঠান সমজাতীয় কিন্তু বিভিন্ন প্রকার পণ্য উৎপাদন ও বিক্রয় করে এইরূপ পৃথকীকৃত পণ্যের বাজারকে অপূর্ণ অলিগোপলি বলে। প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের পণ্য এইরূপ স্বতন্ত্র যে, কেউ তার পণ্যের মূল্য কমালে অন্যান্য

প্রতিষ্ঠানের অধিকাংশ বিক্রেতা তার পণ্য ক্রয় করবে না। সুতরাং প্রত্যেক প্রতিষ্ঠান তার পণ্যের মূল ধার্য করার সময় ধরে নেয় যে, অন্যান্য প্রতিষ্ঠান অতি সত্বর তাদের পণ্যের মূল্য পরিবর্তন করবে না।

অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার (Imperfect Market)

যখন ক্রেতা এবং বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতা অপূর্ণ থাকে তখন তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। যে বাজারে ক্রেতা অথবা বিক্রেতার আচরণের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব থাকে এবং দ্রব্যটি যদি একই গুণসম্পন্ন না হয় তাহলে তাকে অপূর্ণ প্রতিযোগিতামূলক বাজার বলা হয়। এমতাবস্থায় বিক্রেতাগণ বিভিন্ন লোকের নিকট বিভিন্ন মূল্যে দ্রব্য বিক্রয় করে অতিরিক্ত মুনাফা অর্জনের চেষ্টা করে।

অবরোধ (BLockade)

যেকোনো দেশে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিঘ্ন সৃষ্টির প্রক্রিয়া হলো অবরোধ। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি এক ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যম। অন্যভাবে বলা যায়, গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি একটি অধিকারও বটে। এ ব্যবস্থা বিভিন্ন দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের হাতিয়ার হিসেবে সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত আছে। তবে দেশে সরবরাহ ও অর্থনৈতিক বিঘ্ন সৃষ্টি করাই অবরোধের মূল উদ্দেশ্য। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এটি একটি স্বীকৃত আন্দোলন এবং শান্তিপূর্ণভাবে পালিত হলে এ ব্যবস্থাকে সংবিধানসম্মত কিংবা সরকারকে মেনে নেয়ার মানসিকতা পোষণ করতে দেখা যায়। তবে অনেক ক্ষেত্রে গণতান্ত্রিক সরকারও অবরোধ পালনের ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে থাকে। আন্তর্জাতিক আইনে নিরপেক্ষ কোনো দেশের বাণিজ্য-জাহাজ সে অবরোধ অমান্য করলে জাহাজ বাজেয়াপ্ত করার অধিকার থাকে। উক্ত আইন অনুযায়ী নিরপেক্ষ সমস্ত দেশসহ যাবতীয় ক্ষেত্রেই ওই অধিকার প্রযুক্ত হতে হবে। লন্ডনে ১৯০৮ সালে একটি ঘোষণায় অবরোধের অধিকার নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হয়েছিল, কিন্তু সেটা ফলপ্রসূ হয়নি। ইতিহাসে নানা দেশের অনেক অবরোধের নজির আছে। অনেক সময়ে শান্তিরক্ষার্থে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো অবরোধের পদ্ধতি প্রয়োগ করে। আবার অনেকক্ষেত্রে রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে এ ধরনের কর্মসূচি সহিংস অবস্থায় পালিত হয়। তবে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি হিসেবে অবরোধ বহুল পরিচিত। বাংলাদেশে অবরোধ পালনের নজির অনেক। মুক্তিযুদ্ধের সময় থেকে অবরোধ পালনের ঘটনা হয়ে আসছে। সাম্প্রতিককালেও সরকার পতন আন্দোলনগুলোতে অবরোধ কর্মসূচি দেওয়া হয়।

অবস্থান ধর্মঘট (Hunger Strike)

সাধারণত কোনো দল বা সংগঠন বা প্রতষ্ঠানের কর্মচারী বা শ্রমিক তাদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ে দাবি-দাওয়া আদায়ের জন্য নিজ কর্মস্থলে অবস্থান করে অথবা নির্দিষ্ট কোনো স্থানে অবস্থান করাকেই অবস্থান ধর্মঘট বলে। বিশেষ করে শ্রমিকরা মালিকদের

বিরুদ্ধে এই কর্মসূচি পালন করতে দেখা যায়। কারণ কর্মস্থল ত্যাগ করলে মালিক বা কর্তৃপক্ষ নতুন শ্রমিক নিয়োগ করে কারখানা চালাতে পারে। এই আশঙ্কাতেই শ্রমিকরা কর্মস্থলে অবস্থান ধর্মঘটের কৌশল অবলম্বন করে। ১৯৩৪ সালে পোল্যান্ডের কয়লাখনির শ্রমিকরা দাবিপূরণের উদ্দেশে ধর্মঘট করে এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত খনির মধ্যে অবস্থান করে। এটাই ছিল বিশ্বের ইতিহাসে প্রথম অবস্থান ধর্মঘট। পরবর্তীতে অবস্থান ধর্মঘটের কৌশল বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে।

অবাধ অর্থনীতি (Free Economy)

অবাধ বা মুক্ত অর্থনীতি বলতে রাষ্ট্রের এমন এক অর্থনীতিকে বোঝায় যেখানে উৎপাদন ও বিপণনের ওপর মূলত রাষ্ট্রের কোনো নিয়ন্ত্রণ থাকে না; ক্রেতা সাধারণের গড় চাহিদাই উৎপাদনের ধরণ ও পরিমাণ নির্ধারণ করে। সমাজতান্ত্রিক বা রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির বিপরীতে পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে বোঝানোর জন্যে অবাধ অর্থনীতি কথাটি ব্যবহার করা হয়। তবে, বাস্তবে বিশ্বের সকল রাষ্ট্রেরই উৎপাদন ও বিপণনের ওপর কিছু না কিছু নিয়ন্ত্রণ থাকেই এবং বিভিন্ন দেশে, এমনকি উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোর ক্ষেত্রেও এখন রাষ্ট্র ক্রমশ অধিকতর হারে নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করছে। জার্মানির সিলভিও গোসেলসহ (১৮৬২-১৯৩০) অবাধ অর্থনীতির প্রবক্তারা মনে করেন যে, অর্থনৈতিক বৈকল্যের চিকিৎসার প্রধান উপায় হল নিয়মিত একটি নির্দিষ্ট হারে মুদ্রামান হ্রাস করা এবং এর ফলে সৃষ্ট ফাঁক পুরণের জন্য নয়া মুদ্রা বাজারে ছাড়া। এই ব্যবস্থায় মুদ্রার সার্কুলেশন বেড়ে যাবে। কারণ জনসাধারণ মুদ্রামান কমার আগেই তা দিয়ে কোনো না কোনো দ্রব্য কিনে রাখতে আগ্রহী প্রকাশ করে। মুদ্রার এই গতিশীলতা কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গতি সৃষ্টি করবে এবং ফলে কোনো অর্থনৈতিক সঙ্কট দেখা দেবে না।

অবাধ প্রতিযোগিতা (Free Competition)

অবাধ প্রতিযোগিতা তত্ত্বগতভাবে এমন একটা পরিস্থিতি, যে পরিস্থিতিতে উৎপাদন ও বন্টনের ওপর সরকারের কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ থাকে না। সরবরাহ ও চাহিদার শক্তিসমূহ এবং মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণভাবে স্বাধীন গতিতে চলতে পারে এবং পারস্পরিক প্রতিযোগিতার ভিত্তিতে গুণগত ও পরিমাণগত বিকাশলাভ করে। এটাকে অবাধ প্রতিযোগিতা বলা হয়।

অবাধ বাণিজ্য (Laissez-faire)

অবাধ বণিজ্য অর্থনৈতিক বাজার ব্যবস্থার সাথে সম্পর্কিত বিষয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ওপর কোনোরূপ সরকারি নিয়ন্ত্রণ বা বিধি-নিষেধ আরোপ না করা হলে তাকে অবাধ বাণিজ্য বলা হয়। সাধারণত বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিনা বাধায় ও বিনা শুল্কে বাণিজ্য। এক দেশের সাথে অপর দেশের বাণিজ্যে যখন আমদানি ও রপ্তানির ওপর কোনো শুল্ক ধার্য ও নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয় না, সেরূপ বাণিজ্যকে অবাধ

বাণিজ্য বলা হয়। অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় অর্থাৎ উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময়ের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত মালিকানা বনাম সরকারি হস্তক্ষেপ সম্পর্ক দীর্ঘকালের। অষ্টাদশ শতকের ফ্রান্সে চতুর্দশ লুইয়ের অর্থমন্ত্রীর উদ্দেশে ধ্বনিত অবাধ বাণিজ্য নীতির আদর্শ ফিজিওক্র্যাট নামে পরিচিত অর্থনীতিবিদরা গ্রহণ করেন। তাঁরা সমকালীন মার্কেন্টাইলিস্ট অর্থাৎ বাণিজ্যমন্ত্রী অর্থনীতিবিদদের রাষ্ট্রনির্ভর অর্থনীতি তথা সরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যের নীতি মানতেন না। ফিজিওক্র্যাটরা মনে করতেন যে রাষ্ট্রের কাজ হলো স্বাভাবিক ধারানুসারী ব্যক্তিগত সম্পত্তির নিরাপত্তা বিধান। অ্যাডাম স্মিথ প্রমুখ ধ্রুপদী অর্থনীতিবিদরা সরকারি হস্তক্ষেপ প্রবণতাবিরোধীদের শিবিরকে সংখ্যায় পুষ্ট করেন এবং অদ্যাবধি সমাজতন্ত্রের বিপক্ষ মতাবলম্বীরা অবাধ বাণিজ্য নীতিতে দৃঢ়তার সঙ্গে আস্থাশীল। যেসব দেশে পণ্য উৎপাদন ব্যবস্থা বিশেষ বিকাশ লাভ করে, সেসব দেশের উদ্যোগেই অবাধ বাণিজ্যের নীতি উৎসাহিত হয়, কারণ ওইসব দেশে উৎপন্ন বিপুল পরিমান পণ্য তখন অন্য দেশের বাজারে বিক্রি করার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এই প্রয়োজন থেকেই অবাধ বাণিজ্যনীতির উদ্ভব ঘটে এবং ইংল্যান্ড এর নেতৃত্ব গ্রহণ করে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইউরোপে এই অবাধ বাণিজ্যের উদ্ভব ঘটে। অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশক পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী অবাধ বাণিজ্য বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। এ সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জার্মানিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিপুল শিল্পোন্নয়ন-প্রয়াস লক্ষ করা যায়। কিন্তু ইংল্যান্ডের উন্নততর কল-কারখানায় উৎপাদিত পণ্যের সঙ্গে অসমান প্রতিযোগিতায় কুলিয়ে উঠতে না পারায় দুর্বলতর দেশগুলোর শিল্পোন্নয়নের প্রয়াস প্রায়শই বাধাপ্রাপ্ত হতে থাকে। সুতরাং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি প্রভৃতি রাষ্ট্র বিদেশি পণ্যের ওপর উচ্চহারে আমদানি শুল্ক ধার্য করে স্ব-স্ব দেশের শিল্পোৎপাদন অব্যাহত হয়। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকে বহু দেশই উচ্চহারে শুল্ক আরোপ অসমান প্রতিযোগিতার কবল থেকে স্ব-স্ব দেশের শিল্পকে রক্ষা করার প্রচেষ্টা চালানো হয়। অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল প্রমূখ অর্থশাস্ত্রবিদগণ অবাধ বাণিজ্যের সমর্থক ছিলেন।

অভাব (Wants)

বস্তুগত ও অবস্তুগত কোনো দ্রব্য পাওয়ার আকাঙ্ক্ষাকে অভাব বলে। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ অসংখ্য অভাবের সম্মুখীন হয়। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানসহ প্রতিনিয়ত নানা অভাব রয়েছে। মানুষকে এই অভাব পূরণের জন্য কাজ করতে হয়। বস্তুত সকল প্রকার অর্থনৈতিক কার্যাবলীর মূলে রয়েছে অভাব।

অভিজাততন্ত্র (Aristocracy)

প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ কর্তৃক শাসনব্যবস্থা পরিচালনাকে অভিজাততন্ত্র বলা হয়। মূলত যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অভিজাতশ্রেণিরই কর্তৃত্ব বহাল থাকে। শব্দগতভাবে অভিজাততন্ত্র অর্থ উৎকৃষ্ট শাসনব্যবস্থা। মনীষীগণ এ শাসনকে ভালো বলে আখ্যা দিয়েছেন। শাসন

ক্ষমতা জ্ঞানী-গুণীদের দ্বারা পরিচালিত হওয়া ভালো। প্রাচীন গ্রীসে দাস-মালিকেরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫ ভাগ মাত্র হওয়া সত্ত্বেও, শুধুমাত্র তারাই ছিল ভোটের অধিকারী, প্রতিনিধিত্ব ও রাষ্ট্রপরিচালনার কর্তা। শতকরা ৯৫ ভাগ নাগরিকের ভোটাধিকার তো দূরে থাক, তাদেরকে কোনোরকম নাগরিক মনে করা হতো না। বিপুল সংখ্যক বৈশ্য ও শূদ্রদের রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে কোনো এখতিয়ার ছিল না। বর্তমানকালে অভিজাততন্ত্র বলতে বোঝায় কিছু ব্যক্তির শাসন যারা সাধারণত ধনিক সম্প্রদায়ভুক্ত। অ্যারিস্টটলের মতে, অভিজাততন্ত্র সরকারের স্বাভাবিক রূপ,এর বিকৃত রূপ হচ্ছে ধনিকতন্ত্র। দার্শনিক রুশো অভিজাততন্ত্রকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন- প্রাকৃতিক, নির্বাচিত এবং উত্তরাধিকার ভিত্তিক। রুশো সম্পদশালী দেশের জন্য রাজতন্ত্র এবং কম সম্পদশালী ও আয়তনে ছোট দেশের জন্য অভিজাত শাসনের কথা বলেছেন। অনেক সময় গণতান্ত্রিক শাসন অভিজাত গণতন্ত্র (Aristo-Democracy) নামে খ্যাত হয়।

শাসনকার্যে কতিপয় ব্যক্তি আসীন থেকে ক্ষমতা ব্যবহার করবে- এটিই অভিজাততন্ত্রের মূল কথা। এ ব্যবস্থায় সর্বোৎকৃষ্ট গুণাবলীর সমন্বয়ে গঠিত সমশ্রেণির কিছু ব্যক্তি ক্ষমতা ব্যবহার করে। অনেকের মতে, "সরকারের একটিই ভাগ তা হলো কতিপয়ের শাসন"। কারণ যে শ্রেণির শাসনই বলি না কেন, সেখানে বাস্তবে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা ব্যবহারের অধিকারী। একনায়কতন্ত্রেও একনায়ক বা রাজা একক শাসন করতে পারেন না, তারা কিছু ব্যক্তির সহযোগিতা লাভ করেন। গণতান্ত্রিক শাসন বহুজনের হলেও প্রকৃতপক্ষে কতিপয় ব্যক্তিই তা ব্যবহার করেন।

অভিজ্ঞতাবাদ (Empiricism)

সমস্ত জ্ঞানের উৎসই হলো অভিজ্ঞতা। যুক্তিবাদ-বিরোধী এই মতবাদে সহজাত জ্ঞান ও পূর্বকল্পিত বা অবরোহী পদ্ধতিতে নির্ণীত সত্যকে স্বীকার করা হয় না। পর্যবেক্ষণ (অভিজ্ঞতা) ব্যতীত কোনো কিছুর সামান্যীকরণ এই মতবাদের পরিপন্থী। যৌক্তিক অভিজ্ঞতাবাদ এবং যৌক্তিক প্রত্যক্ষবাদ বিংশ শতাব্দীতে সবিশেষ প্রাধান্য পায়। উভয় মতবাদেই অভিজ্ঞতার সাথে সঙ্গতিপূর্ণ প্রস্তাবনাই একমাত্র বিবেচ্য। তাই কোনো বিষয় অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষিত না হলে অর্থহীন। সমাজতত্ত্ব ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানে যেসব অভিজ্ঞতাবাদী লেখক ও তাত্ত্বিক আছেন তাঁদের এই রীতি মেনে চলতে হয়। গবেষণার কাজে লিপিবদ্ধ নথি অপেক্ষা সংশ্লিষ্ট স্থানে গিয়ে তথ্য সংগ্রহ অধিক মূল্যবান। বলা হয়ে থাকে যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির ভিত্তিতে বিশ্বাসী এই মতবাদ ফ্রান্সিস বেকন থেকে জন স্টুয়ার্ট মিল্ পর্যন্ত যুক্তরাজ্যের দর্শনচিন্তায় আধিপত্য করে।

অভিবাসন (Immigration)

স্থায়িভাবে বসবাস করা বা চাকুরি পাবার উদ্দেশে কোনো দেশে প্রবেশ করাকে 'অভিবাসন' বলে। বিভিন্ন দেশে এই সম্পর্কে বিভিন্ন আইন রয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে

কেন্দ্রীয় সরকার 'অভিবাসন' সমস্যা নিয়ন্ত্রণ করে। ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত অভিবাসন সীমাবদ্ধ করার জন্য কোনো প্রকার আইন প্রণয়ন করা হয় নি। তখন হতে দরিদ্র, পাগল, মূকবধির ও চীনের কুলিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করা হয়। বর্তমানে প্রতি বছর ১,৫৪,০০০ লোককে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়।

অভিযান (Campaign)

অভিযান বা সামরিক অভিযান সাধারণত কোনো উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে যে প্রচেষ্টা চালান হয় ; প্রণালীবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলন। রাজনৈতিক অর্থে কোনো শাসননীতির স্বপক্ষে বা বিপক্ষে কিছুকাল ধরে প্রণালীবদ্ধভাবে জনমত উদ্দীপিত করার চেষ্টা। বিশেষ কোনো রাষ্ট্রীয় পদ লাভের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মনোনীত প্রার্থীদের মধ্যে এবং নির্বাচনে ভোটদাতাদের সমর্থনলাভের জন্য বিভিন্ন রাজনৈতিক পাটির মধ্যে যে প্রতিযোগিতা হয়, তাকে রাজনৈতিক অভিযান বলে।

অভিশংসন (Impeachment)

পার্লামেন্ট কর্তৃক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের বিচার। পার্লামেন্ট যখন গুরুতর অভিযোগে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী, বিচারপতি বা অন্য কর্মকর্তাদের বিচার করে দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে তখন তাকে অভিশংসন বলে। কী কী অভিযোগ, কোনো কোন কর্মকর্তাকে এবং কীভাবে অভিশংসন করা যাবে তা সংবিধানে উল্লেখ থাকে।
বাংলাদেশের সংবিধানের ৫২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, পার্লামেন্ট অভিশংসন করতে পারবে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট, ভাইস-প্রেসিডেন্ট, ফেডারেল বিচারপতি এবং সিভিল সার্ভিসের সকল কর্মকর্তাকে কংগ্রেস অভিশংসন করতে পারে। রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সংবিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ এবং অন্যান্য গুরুতর অভিযোগে অভিশংসন করা যায়। অভিশংসন পার্লামেন্টের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে প্রথম অভিশংসন করা হয় লর্ড ল্যাটিমারকে (Lord Latimer) ১৩৭৬ সালে (দ্রঃ Chris Cook, *Historical Terms*, Macmillan Reference Books 1990)। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে অভিশংসন করা হয় এমন বিখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক ফ্রান্সিস বেকন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ওয়ারেন হেস্টিংস বেকন, ভারতে ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালনকারী ওয়ারেন হেস্টিংস (Waren Hastings), লর্ড মেলভেলি (Lord Melville) প্রমুখ। বেকন যখন লর্ড চ্যান্সেলর তখন দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে অভিশংসন করা হয়। ১৬২১ সালে তিনি পদচ্যুত হন। ভারতে বিভিন্ন দুর্নীতির অভিযোগ হেস্টিংসকে অভিশংসন করা হয়। ৭ বছর বিচার চলার পর ১৭৯৫ সালে হেস্টিংসের বিরূদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে ২ জন প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে অভিশংসন অভিযোগ উঠে। এঁরা হলেন প্রেসিডেন্ট এনড্রো জনসন (Andrew Johnson) ও প্রেসিডেন্ট রিচার্ড নিকসন (Richard Nixon)। জনসনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং তিনি পদচ্যুত হন (১৮৬৮)। নিকসন আগেই পদত্যাগ করেন (১৯৭৪), ফলে

অভিশংসন প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। অভিশংসন উত্থাপনের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধি সভায় অভিশংসনে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। সভার সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য চাইলে তা উত্থাপন করতে পারেন। অভিশংসনের অভিযোগের বিচার করে সিনেট। সিনেটের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে প্রস্তাব গৃহীত হয়। ব্রিটিশ কমন্সসভায় অভিশংসনে অভিযোগ উত্থাপিত হয়। লর্ডসভা বিচার করে।
বাংলাদেশের সংসদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্য রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে অভিশংসনের প্রস্তাব করতে পারেন। সংবিধান অনুযায়ী তাঁরা স্পিকারের কাছে এ মর্মে নোটিশ দেবেন। স্পিকার নোটিশ পাওয়ার ১৪তম দিন থেকে ৩০তম দিনের মধ্যে সংসদে এ নিয়ে আলোচনা হবে। প্রস্তাব পাস করার জন্য মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সম্মতির দরকার। প্রস্তাব গৃহীত হলে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে এখনও কোনো অভিশংসন প্রস্তাব উত্থাপিত হয় নি। (সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, ঢাকা: পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

অযোগ্যতা (Disqualification)

অযোগ্যতা হলো প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব। গুরুতর অপরাধ, মানসিক বা শারীরিক অসামর্থ্য অথবা বৈধ অবস্থার অভাবে কোনো ব্যক্তির পক্ষে সরকারি কাজে বা পদে যোগ দেওয়ার বা উক্ত পদ বা কাজে বহাল থাকার যোগ্যতা না থাকলে তাকে নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অযোগ্য বলে গণ্য করা হয়।

অরবিস ইন্টারন্যাশনাল (ORBIS International)

'উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল' নামে খ্যাত আন্তর্জাতিক চক্ষুরোগ নিবারণকারী সংস্থা অরবিস ইন্টারন্যাশনাল। উড়োজাহাজের অভ্যন্তরে পূর্ণাঙ্গ হাসপাতাল স্থাপন করে দেশে দেশে চক্ষুরোগীদের চিকিৎসা সুবিধা প্রদানের কারণে বিশ্বব্যাপী 'অরবিস' উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল হিসেবেই পরিচিত। ১৯৮১ সালে অরবিস ইন্টারন্যাশনাল প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর এ পর্যন্ত ১২৭টি দেশে তার কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। ১৯৮৫ সালে ঢাকায় উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতালের আগমনের মধ্য দিয়ে এ দেশে অরবিসের কার্যক্রম শুরু হয়। এর পর ১৯৯২, ১৯৯৬, ১৯৯৮ ও ১৯৯৯ সালে অরবিসের উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল এ দেশে অবতরণ করে বেশ কিছু চক্ষুরোগীকে চিকিৎসা সুবিধা দেয়। বাংলাদেশে সংস্থার কার্যক্রম জোরদার এবং অর্থবহ করার লক্ষ্য ১৯৯৯ সালে ঢাকায় খোলা হয় অরবিসের 'কান্ট্রি অফিস'। ২০০২ সালে চার সপ্তাহের জন্য অরবিসের উড়ন্ত চক্ষু হাসপাতাল বাংলাদেশের চট্টগ্রামে অবতরণ করে।

অরাজকতা (Anarchy)

সাধারণত সুপরিচালিত সরকার, শাসনব্যবস্থা, সুনিয়ন্ত্রিত উৎপাদন ও বন্টনব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক স্থিতিশীলতা ইত্যাদির অনুপস্থিতিজনিত পরিস্থিতিকেই বলে

অরাজকতা। অনেক সময় কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব বা দল রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে দ্বিধাবেধ করেন না। যাঁরা এরূপ পরিস্থিতি সৃষ্টির মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল বা অপর কোনো গোষ্ঠীগত স্বার্থসিদ্ধির প্রয়াস পান তাদেরকে বলা হয় অরাজকতাবাদী বা Anarchist. অরাজক অবস্থায় অবশ্যম্ভাবীরূপেই আপামর জনগণ ভোগান্তির শিকার হয়।

অরাজকতাবাদ (Anarcism)

অরাজকতাবাদ বা নৈরাষ্ট্রবাদ (Anarcism) গ্রিক শব্দটি'এনার্কিয়া' (Anarcho) শব্দ থেকে উদ্ভব। 'এনাকিয়া' শব্দের অর্থ **'শাসকহীনতা'** (Rulerness) বা 'শাসনের অভাব'। আভিধানিক অর্থে অরাজকতাবাদ হল সরকার বা শাসনের অনুপস্থিতি, যেখানে আইন ছাড়া নিয়ন্ত্রনবিহীন অবস্থা বিরাজমান থাকে। এই মতবাদীদের উদ্দেশ্য হচ্ছে সকল প্রকার কর্তৃত্ব বা সংগঠিত নেতৃত্ব ও রাষ্ট্রযন্ত্রের অবসান ঘটানো ও তৎপরিবর্তে রাষ্ট্রহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা। এই মতবাদীদের মতে, রাজতন্ত্র, সাধারণতন্ত্র, এমনকি সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রসহ সকল শাসনব্যবস্থাই খারাপ ও উৎপীড়নমূলক। তাঁদের মতে সমাজে বল প্রয়োগকারী কোনো সংগঠন সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, কারাগার, আইন-কানুন ইত্যাদির মোটেই প্রয়োজন নেই। জবরদস্তিমূলক নিয়ন্ত্রণের অবসান ঘটিয়ে, রাষ্ট্ররূপী কারাগারকে ধ্বংস করে মানুষের জন্য সার্বিক স্বাধীনতা, মুখ ও শান্তির এক পরিবেশ রচনা করতে চান নৈরাজ্যবাদীরা। মানুষ এই পরিবেশ নিজের উদ্যোগ, উদ্যম ও সাহচার্যেই গড়ে তুলবে। মিখাইল আলেক্সান্দ্রভিচ, বাকুনিন এই মতবাদের মূলপ্রবক্তা হলেও প্রিন্স ক্রপটকিনের ভাবনায় এই তত্ত্বের বিশাম ঘটে। উইলিয়াম গডউইন, টমাস হডস্কিন, ম্যাক্স স্টির্ণার, পিয়েরে জোসেফ প্রূঁধো, হেনরী ডেভিড থরো প্রমূখ এই মতবাদের প্রবক্তা।

অরোরার বিদ্রোহ (Insurgency of Arora)

১৯১৭ সালের ২৪ অক্টোবর বিপ্লবের সময় রুশ নৌ-বাহিনীর ক্রুজার 'অরোরা' বলশেভিক আদর্শে অনুপ্রাণিত নৌ-সেনারা জাহাজটিকে পেট্রোগ্রাডস্থ শীতপ্রাসাদ-এর ঠিক সামনাসামনি অর্থাৎ বাল্টিক সাগরে এনে নোঙর ফেলে। ক্রেনস্কি সরকার জাহাজটিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেও তারা সে আদেশ মানতে অস্বীকার করে এক বিদ্রোহের পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। বস্তুত অরোরার নৌ সেনাদের বিদ্রোহই ছিল রাশিয়ার সফল কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রথম অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। ২৫ অক্টোবর ক্রেনস্কি পলায়ন করেন এবং ২৬ অক্টোবর লালফৌজ শীতপ্রাসাদ ঘেরাও করে ভেতরে বৈঠকরত মন্ত্রিসভার সদস্যদের আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেয়। এ সময় অরোরা থেকে শীতপ্রাসাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা হতে থাকলে ভীতসন্ত্রস্ত মন্ত্রীরা পালাতে গিয়ে ধরা পড়েন এবং পরিণামে শীতপ্রাসাদের পতন ঘটে।

অর্জিত আয় (Earned Income)

উপার্জিত বা অর্জিত আয় ; আয়াসলব্ধ আয়। পারিশ্রমিক, বেতন, লাভ, ফি বা দর্শনী হতে যে আয় হয় তাহাকে উপার্জিত আয় বলে। এই আয় খাজনা, কারবারের লভ্যাংশ, সুদ, দান, বা যৌথব্যবসায়ে নিয়োজিত মূলধন হতে যে আয় হয়, তা হতে পৃথক। মোটামুটিভাবে কায়িক পরিশ্রম বা ব্যবসায়ের ঝুঁকি নেওয়ার ও দক্ষ পরিচালনা হতে যে আয় হয়, তাই অর্জিত আয়। আবার কোনো ভূসম্পত্তির মালিক বা উত্তরাধিকার তার সম্পত্তি হতে বিনা খরচে ও বিনা পরিশ্রমে যা লাভ করে এবং কুসীদজীবীদের বিনা আয়াসে যে লাভ বা আয় হয় তাকে অনুপার্জিত বা অনায়াসলাভ আয় বলে।

অর্ডার অব প্রিসেডেন্স (Order of Precedence)

অর্ডার অব প্রিসেডেন্স অর্থ হল পূর্ববর্তিতার ক্রম বা মর্যাদাগত অগ্রাধিকারের তালিকা। একটা দেশের রাষ্ট্রপ্রধান (রাষ্ট্রপতি), সরকারপ্রধান (প্রধানমন্ত্রী), মন্ত্রিমণ্ডলী, স্পিকার, পার্লামেন্ট সদস্যগণ, সচিববৃন্দ, প্রধান বিচারপতি, অন্যান্য বিচারপতি, সামরিক কর্মকর্তাগণসহ রাষ্ট্রের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের মধ্যে পদমর্যাদার দিক থেকে কার পরে কে তার যে ক্রমিক তালিকা প্রণয়ন করা হয় সেটাকেই বলে অর্ডার অব প্রিসেডেন্স। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে দাওয়াত, আসনগ্রহণ ও অন্যান্য আচারের ক্ষেত্রে এই অর্ডার অব প্রিসেডেন্স অনুসরণ করা হয়।

অর্থ (Money)

যে বস্তু বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক, স্থগিত পাওনার মান এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে তাকে অর্থ বলা হয়। সুতরাং যে বস্তু বিনিময় কার্য অথবা দেনা-পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বজনগ্রাহ্য এবং যা মূল্যের পরিমাপ এবং সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে তাকেই অর্থ বলা হয়।

অর্থনীতি, জাতীয়ভিত্তিক (National Economy)

সাধারণত যে অর্থনীতি জাতীয় উৎপাদন, সরবরাহ ও চাহিদার ভিত্তিতে পরিচালিত হয়, তাকে জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতি বলে। এরূপ অর্থনীতির ক্ষেত্রে পণ্যের বাজারদর স্থানীয় উৎপাদন বা চাহিদার ভিত্তিতে নির্ণীত হয় না, বরং জাতীয়, এমনকি আন্তর্জাতিক উৎপাদন, চাহিদা ও সরবরাহের ভিত্তিতেও নির্ধারিত হয়। জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতি সামন্তবাদ-এর পরিপন্থী। এরূপ অর্থনীতির বিকাশ স্থানীয় বা সামন্তবাদী অর্থনীতির গণ্ডিকে অবলুপ্তির দিকে ঠেলে দেয়। পুঁজির বিকাশ, উন্নততর বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রয়োগ, জীবনধারণের উপকরণাদির পরিমাণ বৃদ্ধি, যাতায়াত ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় অর্থনীতি লোপ পেতে থাকে এবং জাতীয়ভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে।

অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ (Econocim Penetration)

অর্থনৈতিক অনুপ্রবেশ; রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন। অদূর ভবিষ্যতে অর্থনেতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক অপর একটি রাষ্ট্রের মধ্যে (সাধারণত অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে) অর্থনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করা অর্থাৎ রাজনৈতিক উদ্দেশে অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব কায়েম করা। এই অর্থনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপনের উদ্দেশে শক্তিশালী রাষ্ট্র কর্তৃক দুর্বল রাষ্ট্রের মধ্যে নিম্নোক্ত পন্থাগুলো গ্রহণ করা হয়। বিপুল পরিমাণ মূলধন নিয়োগ, কলকারখানা প্রতিষ্ঠা, রাস্তাঘাট ও রেলপথ নির্মাণ, শক্তিশালী রাষ্ট্রটির ব্যবসায়ীদের ঘাঁটি স্থাপন ও বিভিন্ন ব্যাংকের শাখা প্রতিষ্ঠা এবং উক্ত রাষ্ট্রদ্বারা দুর্বল দেশটির বহির্বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

অর্থনৈতিক কাঠামো (Economic Structure)

অর্থনৈতিক কাঠামো বা অর্থনৈতিক গঠন কোনো সামাজিক উৎপাদন-প্রণালী ও বণ্টন-পদ্ধতির ভিত্তিতে গড়ে উঠা বিভিন্ন মানুষ ও শ্রেণির পরস্পরের অর্থনৈতিক সম্বন্ধ। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক, শিল্পপতি, ব্যাংক মালিক প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার মূলধনী ও এই সকল মূলধনীর সাথে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়ীর দল এবং এদের পরস্পরের আরও জটিল অর্থনৈতিক সম্বন্ধসমূহ নিয়ে সমাজের 'অর্থনৈতিক কাঠামো'র সৃষ্টি হয়ে থাকে।

অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ (Economic Nationalism)

বিদেশি শিল্প-প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয়করণ ও আমদানির ওপর শুল্ক ধার্য করে দেশি শিল্প সংরক্ষণের মাধ্যমে আর্থিক ক্ষেত্রে স্বদেশকে স্বয়ংসম্পূর্ণ করার নীতি। অর্থনৈতিক স্বয়ংসম্পূর্ণতা আনয়ন এবং অন্য রাষ্ট্র হতে নিজেকে রক্ষা করার জন্য যেকোনো রাষ্ট্র কর্তৃক আরোপিত রক্ষা-শুল্কের তফসিল, ব্যবসায়সংক্রান্ত অন্যান্য বাধানিষেধ আরোপ, বিদেশি মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ, বাণিজ্য বন্ধ, কাঁচামালের ওপর একচেটিয়া অধিকার স্থাপন, বৈদেশিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রণ, প্রস্তুতকারকদের সংস্থাগঠন, উপনিবেশ স্থাপন ও বিশেষ সুবিধাজনক শর্তে কাঁচামাল সংগ্রহকরণকে 'অর্থনৈতিক জাতীয়তাবাদ' বলা হয়।

অর্ধঘণ্টা আলোচনা (Half-an Hour Discussion)

সংসদে উত্থাপিত কোনো জনগুরুত্বসম্পন্ন বিষয় সম্পর্কে অর্ধঘণ্টা আলোচনা। স্পিকার কর্তৃক অর্ধঘণ্টা আলোচনার সময় নির্ধারিত হয়। সুনির্দিষ্ট নিয়মের ভিত্তিতে এরকম আলোচনার সুযোগের দাবি করা হয়। সংসদে উত্থাপিত তারকাচিহ্নিত বা তারকাচিহ্নবিহীন প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে যদি ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ দেয়া প্রযোজনীয় হয় তখন স্পিকার এ সম্পর্কে অর্ধঘণ্টা সময় আলোচনার জন্য নির্ধারণ করে দিতে পারেন। তবে এ ধরনের আলোচনা চেয়ে আকাঙ্ক্ষী সদস্যকে পুরো তিনদিনের নোটিশ সংসদ সচিবের কাছে দিতে হয়। নোটিশে সংশ্লিষ্ট সদস্যকে আলোচনা

উত্থাপনের কারণও ব্যাখ্যা করতে হয়। উত্থাপিত বিষয়টি আলোচনার জন্য যথেষ্ট জনগুরুত্বসম্পন্ন কিনা তা বিচার করেন স্পিকার। অর্ধঘণ্টা আলোচনা চলাকালে সংসদে আনুষ্ঠানিকভাবে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করা যায় না এবং ভোট গ্রহণেরও বিধান নেই। নোটিশ যে সদস্য দেন তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী সংক্ষেপে এর উত্তর প্রদান করেন। তবে যদি সময় থাকে তাহলে স্পিকার আগে লিখিতভাবে জানিয়েছিলেন এমন অনধিক দুজন সদস্যকে বাস্তব ঘটনা সম্পর্কে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দানের জন্য একটি করে প্রশ্ন করার অনুমতি দিতে পারেন।

অলিগোপলি (Oligopoly)

যখন কোনো দ্রব্যের যোগান মাত্র 'কয়েকজন বিক্রেতা' দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয় তখন তাদেরদের 'অলিগোপলি' বা 'কতিপয় প্রতিষ্ঠানবিশিষ্ট কারবার' বলা হয়। এরূপ কারবার প্রত্যেক শিল্প প্রতিষ্ঠানের উৎপাদন ও মূলনীতি অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নীতি দ্বারা প্রভাবিত হয়।

অসহযোগ আন্দোলন (Non-Co-operation Movement)

অসহযোগ আন্দোলন মহাত্মা গান্ধী ও ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস পরিচালিত ভারতব্যাপী অহিংস গণ-আইন অমান্য আন্দোলনগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম। ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত চলা এই আন্দোলন ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসে "গান্ধী যুগ"-এর সূত্রপাত ঘটায়।

ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রাওলাট আইন পাস হলে, ভারতের ভাইসরয় ও ইম্পিরিয়াল লেজিসলেটিভ কাউন্সিল ১৯১৯ সালের ৬ এপ্রিল সেই আইন বলবৎ করে। এই আইনবলে ভারতবাসীর ওপর দমনমূলক নানা বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। সাধারণ মানুষের ন্যায়বিচার লঙ্ঘিত হয়, ন্যূনতম প্রমাণ দাখিল ব্যতিরেকেই সেনা ও পুলিশকে সাধারণ ভারতীয়দের গ্রেফতার, কয়েদ ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার অনুমতি দেয়া হয়।

অধিকন্তু, ভারতীয় জনসাধারণের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের একতরফা ভারতীয় সেনা পাঠানোর সিদ্ধান্ত অনেক ভারতবাসীকেই ক্ষুব্ধ করেছিল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অ্যানি বেসান্ত, গোপালকৃষ্ণ গোখেল ও বাল গঙ্গাধর তিলকের মতো উদার মধ্যপন্থী নেতাদের আহ্বানে হোমরুল আন্দোলন শুধুমাত্র আবেদন-নিবেদন ও রাজনৈতিক সভা-সমিতির মাধ্যমে চলছিল; তার এমন কোনো বিধ্বংসী চরিত্র ছিল না যা সরকারি কাজে বিপুল বাধার সৃষ্টি করতে পারে। ১৯১৮ সালে দক্ষিণ আফ্রিকায় এবং বিহারের চম্পারণ ও গুজরাটের খেদায় মহাত্মা গান্ধী দেখিয়ে দিয়েছিলেন কীভাবে গণ-আইন অমান্য করে সরকারি কাজে বাধা দিয়ে ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের সম্ভ্রম ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায়।

১৯১৮ সালে চম্পারণ ও খেদা সত্যাগ্রহের সময় অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, গার্হস্থ্য হিংসা, কুসংস্কার, নারীনির্যাতন ও অস্পৃশ্যতার অন্ধকারে নিমজ্জিত গরিব কৃষকদের নেতৃত্ব

দেন তিনি। এই সব দুর্দশার মধ্যেও তাদের বাধ্য করা হচ্ছিল খাদ্যশস্যের বদলে নীল, তামাক ও তুলা উৎপাদনে। বদলে দেয়া হচ্ছিল অতি নগণ্য মজুরি। তার ওপর, দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও তাদের করদানে বাধ্য করা হচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সরকার এই মর্মে চুক্তিসাক্ষরে বাধ্য হন যে, দুর্ভিক্ষপীড়ীত অঞ্চলে কর মওকুফ করা হবে, কৃষকদের নিজ ইচ্ছামতো ফসল চাষ করতে দেয়া হবে, রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দেয়া হবে ও সমস্ত জমি ও সম্পত্তি যা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল, তাও ফেরত দেয়া হবে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এটিই ছিল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বৃহত্তম বিজয়।

মহাত্মা গান্ধীকে সাহায্য করেন রাজেন্দ্র প্রসাদ ও জওহরলাল নেহেরুর মতো একদল তরুণ ভারতীয় বিপ্লবী। খেদা আন্দোলনটি সামগ্রিক পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল। তিনিও গান্ধীজির অন্যতম সহসৈনিকে পরিণত হন।

তুরস্কের মুস্তাফা কামাল ইসলামের খলিফা বলে পরিচিত তুরস্কের সুলতানকে সিংহাসনচ্যুত করলে ব্রিটিশ সরকার কামালকে সমর্থন করেন। তখন লক্ষ লক্ষ ভারতীয় মুসলমান সরকারের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সরব হন। প্রতিবাদের উদ্দেশে মুসলমান নেতারা খিলাফত কমিটি গঠন করে তাঁদের প্রতি ব্রিটিশ সরকারের ঔদাসিন্যের অবসান ঘটাতে সচেষ্ট হন।

পাঞ্জাবের জালিয়ানওয়ালাবাগে একটি নিরস্ত্র জমায়াতে রেজিন্যাল্ড ডায়ারের নির্দেশে নির্বিচারে গুলো চালানো হলে শতাধিক মানুষ নিহত ও সহস্রাধিক আহত হন। মহিলা, শিশু ও বৃদ্ধদেরও ছেড়ে দেয়া হয় না। এই ঘটনার প্রেক্ষিতে বিক্ষোভ শুরু হলে ব্যাপক ধরপাকড়, লাঠিচার্জ ও হত্যালীলা চালায় পুলিশ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড ভারতের ব্রিটিশ শাসনের সর্বাপেক্ষা কুখ্যাত ঘটনা বলে বিবেচিত হয়। গান্ধীজি ও তাঁর সহযোগীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে যায় যে ব্রিটিশ শক্তির সঙ্গে এবার সংঘাত অনিবার্য।

গান্ধীজি রাওলাট আইনের বিরুদ্ধে একটি জাতীয় প্রতিবাদ আন্দোলনের সূচনা করেন। সকল অফিস ও কলকারখানা বন্ধ হয়ে যায়। ভারতীয়দের সরকারি স্কুল, পুলিশ বিভাগ, সেনাবাহিনী ও সরকারি চাকুরি ত্যাগে উৎসাহিত করা হতে থাকে। আইনজ্ঞরা সরকারি আদালত বর্জন করেন। গণ-পরিবহণ, ব্রিটিশ দ্রব্যসামগ্রী বিশেষত কাপড় বর্জিত হয়।

বাল গঙ্গাধর তিলক, বিপিনচন্দ্র পাল, মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, অ্যানি বেসান্ত প্রমুখ বলিষ্ঠ নেতা এই আন্দোলনের বিরোধিতা করেন। সারা ভারত মুসলিম লীগ এর সমালোচনাও করেন। কিন্তু দেশের তরুণ জাতীয়তাবাদীগণ এই আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ হয়ে গান্ধীজিকে সমর্থন করেন। তাঁর পরিকল্পনা গ্রহণ করে কংগ্রেস এবং মওলানা আজাদ, মুখতার আহমেদ আনসারি, হাকিম আজমল খান, আব্বাস তয়েবজি, মওলানা মহম্মদ আলি ও মওলানা শওকত আলি প্রমুখ মুসলিম নেতা তাঁকে সমর্থন করেন। ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে গান্ধীজি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। এমনকি সারা ভারত হোমরুল লিগ যেখানে একদা জিন্নাহ্, তিলক ও বেসান্তের মতো নেতানেত্রীর কর্তৃত্ব বজায় ছিল, সেখানেও তিনি সভাপতি নির্বাচিত হন।

অসহযোগ আন্দোলনের সাফল্য ও লক্ষ লক্ষ ভারতীয়দের এই আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্ত যোগদান ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষকে সন্ত্রস্ত করে তোলে। কিন্তু ৪ ফেব্রুয়রি, ১৯২২ তারিখে চৌরি চৌরায় প্রতিবাদী জনতা ও স্থানীয় পুলিশের হিংসাত্মক সংঘর্ষে পুলিশের গুলিতে তিনজন আন্দোলনকারী নিহত হন। গান্ধীজি অনুভব করেন আন্দোলন বিপথে চালিত হচ্ছে। তিনি চাইতেন না আন্দোলনে জনতা ও পুলিশ মারমুখী হয়ে পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করুক ও সাধারণ নাগরিকগণ তাতে নিহত হন।

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ গান্ধীজির অবস্থানকে সমর্থন করলেও অনেকেই তাঁর সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ হন। আলি ভ্রাতৃদ্বয় তাঁর তীব্র সমালোচনা করেন। মোতিলাল নেহেরু ও চিত্তরঞ্জন দাশ স্বরাজ্য পার্টি গঠন করে গান্ধীজির নেতৃত্ব অস্বীকার করেন। অনেক জাতীয়তাবাদী নেতা মনে করেন, একটি বিচ্ছিন্ন হিংসার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিয়ে গান্ধীজি সঠিক কাজ করলেন না। তাঁরা গান্ধীজির নেতৃত্বের ওপর হতাশা ব্যক্ত করেন।

সমসাময়িক ঐতিহাসিক ও সমালোচকদের কথা থেকে জানা যায়, এই আন্দোলন এতটাই তীব্র আকার ধারণ করেছিল যে, ১৯৪৭ সালের বহু আগেই তা ব্রিটিশ শাসনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিয়ে ভারতে স্বাধীনতা এনে দিতে পারত। আবার অনেক ঐতিহাসিক ও নেতা গান্ধীজির অবস্থানকে সমর্থন করতেও দ্বিধা করেননি। তাঁদের মতে, তিনি যদি আন্দোলন প্রত্যাহার করে না নিতেন, তবে এই আন্দোলন অরাজক অভ্যুত্থানে পর্যবসিত হত এবং সাধারণ মানুষের সমর্থন বিচ্যুত হয়ে সশস্ত্র বিপ্লবীদেরই উৎসাহদান করে যেত।

১৯৩০ থেকে ১৯৩৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে ভারতে পুনরায় অহিংস গণ আন্দোলন শুরু করেন গান্ধীজি। লক্ষ লক্ষ দেশবাসী লবণ সত্যাগ্রহের মাধ্যমে বিশ্বের সামনে ভারতের অহিংস আন্দোলনের উজ্জ্বল ভাবমূর্তিটি তুলে ধরেন। সত্যাগ্রহ শেষ হয় গৌরবময় সাফল্যমণ্ডিত হয়ে। ভারতীয়দের দাবি মেনে নেয়া হয় এবং কংগ্রেস ভারতীয় জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধির মর্যাদা লাভ করে।

অস্কার পুরস্কার (Oscar Prize)

বিশ্বের চলচ্চিত্র জগতের সর্বাধিক মর্যাদাপূর্ণ পুরস্কার ‘অস্কার‘। একে চলচ্চিত্র জগতের; নোবেল পুরস্কার; বলা হয়। এটি ‘অ্যাকাডেমি অ্যাওয়ার্ড’ নামে পরিচিত। চলচ্চিত্রে বিশেষশ অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ প্রতি বছর এ পুরস্কার দেয়া হয়।

অস্কার পুরস্কার প্রকবর্তন করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হলিউডের ‘অ্যাকাডেমি অব মোশন পিকচার্স আর্টস অ্যানড সায়েন্স’। ১৯২৭ সালে প্রতিষ্ঠিত এ প্রতিষ্ঠিত ১৯২৮ সাল থেকে অস্কার পুরস্কার প্রদান শুরু করে। ‘মেট্রো- গোল্ডউইন-মায়ার’ (এমজিএম)- এর প্রধান শিল্প নির্দেশক সেডরিক গিবনস অ্যাকাডেমি পুরস্কারের ডিজাইনটি উদ্ভাদবন করেন। তার ডিজাইনের ওপর ভিত্তি করে মার্কিন ভাস্কর জর্জ স্ট্যানলি মুর্তিটি নার্মাণ করেন। ট্রফির মুর্তিটি হচ্ছে একটি ফিল্মের রিলের ওপর ক্রুসেডারের তলোয়ার হাতে দণ্ডায়মান একজন নাইটের। উচ্চতা ৩৪.৩ সেন্টিমিটার, ওজন ৩.৯ কেজি। খাদমিশ্রিত

ব্রিটানিয়াম ধাতুতে তৈরি মুর্তিটি তামা, রূপা, নিকেল ও ২৪ ক্যারেট সোনার পাতে মোড়ানো। ট্রফির ডিজাইন তৈরি হবার পর একাডেমির তৎকালনি নির্বাহী পরিচালক মার্গারেট হেরিক এই মূর্তির সঙ্গে তার চাচা অস্কারের চেহারার সাদৃশ্য খুঁজে পেয়েছিলেন। তিনি এই মন্তব্যটি করার পর থেকে একাডেমির কর্মীরা ট্রফিটিকে 'অস্কার' বলে উল্লেখ করতে শুরু করেন। এভাবেই একাডেমি পুরস্কারের সঙ্গে 'অস্কার' নামটি যুক্ত হয়ে যায়।

চলচ্চিত্রের নির্বাক যুগে একাডেমি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৯২৭-২৮ সালের জন্য একাডেমির প্রথম পুরস্কার ঘোষিত হয়। ক্লারা বাউ ও গ্যারি কুপার অভিনীত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিতে নির্মিত 'উইংগস' ছবিটি শ্রেষ্ঠ ছবির অস্কার লাভ করে। শ্রেষ্ঠ ছবি হিসেবে অস্কারপ্রাপ্ত নির্বাক যুগের এটাই একমাত্র ছবি। চলচ্চিত্রের সবাক যুগ শুরু হবার পর ১৯২৯ সালের ১৬ মে পরবর্তী অস্কার পুরস্কার ঘোষণা করা হয়।

অস্থায়ী কমিটি (Ad hoc Committee)

ল্যাটিন শব্দগুচ্ছ Ad hoc এর অর্থ 'অস্থায়ীভাবে: একবারের জন্যে।' বিকল্প অন্য কোনো পদ্ধতি অবলম্বন করা হলে তার নিন্দা ও সমালোচনা অর্থে অ্যাডহক শব্দটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম হিসেবে ব্যবহৃত হয়। অস্থায়ীভাবে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্যে প্রণীত কমিটিকে অ্যাডহক কমিটি বুঝায়। কোনো সমস্যার গভীরতা ও অন্তর্নিহিত অবস্থা পর্যবেক্ষণে অ্যাডহক কমিটি কাজ করতে পারে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সভার স্পিকার সুনির্দিষ্ট কাজ সম্পাদন ও নির্দিষ্ট উদ্দেশে অ্যাডহক কমিটি গঠন করেন। প্রতিনিধি সভার সদস্যরা এর সদস্য হন। যে উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা সম্পাদিত হলে কমিটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। স্পিকার প্রতিনিধি পরিষদের বিভিন্ন কমিটি থেকে অ্যাডহক কমিটির সদস্যদের নিয়োগ করেন। সাধারণত যাদের সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা আছে তাদেরই অ্যাডহক কমিটির সদস্য করা হয়।

অহংবাদ (Egoism)

সাধারণত নিজের সত্তা বা অস্তিত্ব ব্যতীত অন্য কিছুকে স্বীকার না করাকে অহংবাদ বলা হয়। ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লবের ক্ষেত্রে যেসব মতবাদ প্রেরণা যুগিয়েছিল, অহংবাদ তার মধ্যে অন্যতম। কেননা, সামন্ততান্ত্রিক শোষণ, নিপীড়ন ও যথেচ্ছাচারের তীব্র বিরোধিতা বা প্রতিবাদস্বরুপ এই মতবাদ সৃষ্টি হয়। অহংবাদের অনুসারীদের বলা হয় অহংবাদী (Egoism বা Egocentric)। রাজনীতি ছাড়াও সমাজের অন্যান্য ক্ষেত্রেও অহংবাদীদের অস্তিত্ব থাকতে পারে।

অহিংসা (Non-violence)

গৌতম বুদ্ধই খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম অহিংস নীতি বা অহিংসাবাদ প্রচার করেন। পরবর্তীতে মহাত্মা গান্ধী এই নীতিকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে রাজনৈতিক

অস্ত্র হিসেবে প্রয়োগ করেন। অহিংসাবাদ সন্ত্রাসবাদের বিপরীত। গান্ধীজি মনে করতেন যে, যা হিংসার দ্বারা অর্জিত হয় তা হিংসার মাধ্যমেই ধ্বংস হতে বাধ্য। আর যা অহিংসার মাধ্যমে লব্ধ, তা স্থায়ী হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর মতে গণতন্ত্র হল 'অবিকৃত অহিংসার শাসন'। তিনি আরও বলতেন যে, যতদিন পর্যন্ত অহিংসাকে একটি জীবন্ত শক্তি হিসেবে স্বীকার করা না যাবে, ততদিন গণতন্ত্র বহুদূরের স্বপ্ন হয়েই থাকবে। তাঁর মতে, কোনো সরকারের পক্ষেই সম্পূর্ণ অহিংস হওয়া সম্ভবপর না হলেও, 'সেই সরকারই সর্বশ্রেষ্ঠ, যে-সরকার সর্বাপেক্ষা কম শাসনক্ষমতা প্রয়োগ করে'।

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগ (Anglo-Saxon Age)

অ্যাংলো-স্যাকসন একটি উপজাতির নাম। অ্যাংলো-স্যাক্সন উপজাতীয় লোকেরা মূল ইউরোপীয় ভূ-খণ্ড থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে আসে। তারা সেল্টিক (celtic) উপজাতীয়দের বিতাড়িত করে সেখানে বসতি স্থাপন করে। অ্যাংলো-স্যাক্সন উপজাতিরা ছিল অত্যন্ত যুদ্ধবাজ। প্রথমে তারা নিজেদের একজন প্রধান (chieftain) এর নেতৃত্বে সাসেক্স, অ্যাসেক্স, ওয়েসেক্স, পূর্ব অ্যাঙ্গোলিয়া, মর্মিয়া, নর্দাম্বিয়া, কেন্ট নামক সাতটি রাজ্য স্থাপন করে। এদের মধ্যে দীর্ঘদিন সশস্ত্র সংঘর্ষ ও বিরোধ চলতে থাকে। যুদ্ধে বিজয়ী উপজাতীয় নেতা বা প্রধান রাজকীয় মর্যাদা দাবি করতে শুরু করেন। তবে এই সাতটি রাজ্যের মধ্যে ওয়েসেক্স নবম শতাব্দীতে অন্য ছয়টি রাজ্যের ওপর প্রভূত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হয় এবং সমগ্র অধিকৃত অঞ্চলের ওপর সার্বভৌম কর্তৃত্বসম্পন্ন একজন প্রধানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে এইভাবে ব্রিটেনের শাসনতান্ত্রিক ইতিহাসে রাজতন্ত্রের সূত্রপাত হয়।

অ্যাডলফ হিটলার (Adolf Hitler)

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের শেষদিক থেকে অদ্যাবধি যে-ব্যক্তিটি ইতিহাসকে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত করে এসেছেন এবং সর্বাধিক আলোচিত চরিত্ররূপে চিহ্নিত হয়ে আছেন, তিনি হলেন জার্মান একনায়ক হের অ্যাড্লফ হিটলার। ইতিহাসের সব পরাজিত নায়কের ভাগ্যে যা জোটে হিটলারের ভাগ্যেও তাই হয়েছে। তিনি আজ ইতিহাসের নিন্দিত এক ব্যক্তিত্ব। তাঁর কোনো গুণ ছিল কি না তা কেউ জানে না, কিন্তু তাঁর দোষগুলো ইতিহাসের পাতায় পড়তে পড়তে আমরা মুখস্থ করে ফেলেছি। কিন্তু এর উল্টোটাও তো হতে পারত। দ্বিতীয় মহাসমরে হিটলারের শোচনীয় পরাজয় না ঘটলে তিনিই হয়তো হতেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ নন্দিত ব্যক্তি। প্রশংসা-নিন্দা যাই-ই হোক তার পরিমাণও এত বেশি যে, তাঁকে আজও কেউ অতিক্রম করতে পারেননি। ইতিহাসে এমন আলোচিত ব্যক্তিত্ব আর আসেনি। ইতিহাসের এই বিতর্কিত মহানায়ক অ্যাডল্ফ হিটলারের জন্ম হয়েছিল অস্ট্রিয়ার ব্রাউনাউতে (Braunau) ১৮৮৯ সালের ২০ এপ্রিল। তাঁর পিতা ছিলেন রাজ্য সরকারের এক ছোট অফিসার। প্রবাদ আছে—তিনি সামাজিক ভাবে স্বীকৃত কোনো দম্পতির সন্তান ছিলেন না। তাঁর বাবা-মা বিবাহিত ছিলেন না।

হিটলার ছোটবেলা থেকেই ছিলেন একেবারে একরোখা এবং বদমেজাজি। যা করতে মন চাইত তা না করতে পারলেই ভয়ানক রেগে যেতেন। ছোটবেলায় হিটলারের শখ হয়েছিল, তিনি শিল্পী হবেন। কিন্তু বাবা শিল্পী হওয়া পছন্দ করতেন না। তবু জোর করেই তিনি এক আর্ট স্কুলে ভর্তি পরীক্ষা দিলেন, কিন্তু টিকতে পারলেন না। শেষে এই শিল্পী হওয়া নিয়েই বাবার সঙ্গে ভয়ানক রাগারাগি করে তিনি বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। চলে এলেন ভিয়েনা শহরে। ১৯১৩ সালে ভিয়েনা ছেড়ে চলে গেলেন মিউনিখে (Munich)। সেখানে অবশ্য পোসটার আঁকার কাজটাজ কিছু পেতে লাগলেন, অন্তত ভিয়েনার চেয়ে ওখানকার অবস্থা কিছুটা ভালো। সেখানে অবস্থানকালে হিটলার ১৯১৪ সালের আগস্ট মাসে একজন অস্ট্রিয়ান নাগরিক হিসেবে জার্মান সেনাবহিনীতে ভর্তি হওয়ার জন্য আবেদন করলেন। তাঁর আবদেন মঞ্জুর হয়ে গেল। শুরু হলো তাঁর সৈনিক জীবন। সেখান থেকেই অর্থ ও ক্ষমতার লিপ্সা তাঁকে পেয়ে বসেছিল। তিনি অপরকে হিংসা ও ঘৃণা করতে শেখেন। যাকে তাঁর পছন্দ হত না তিনি অনায়াসে তার প্রতি ঘৃণাসূচক বাক্য ব্যবহার করতেন। বিশেষ করে ইহুদিদের সম্পর্কে তাঁর ছিল ভয়ানক খারাপ ধারণা। ইহুদিদেরকে তিনি বলতেন 'ছোট জাতের মানুষ' (Lower Races)। হিটলারের ভাষায় জার্মানরা ছিল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মানবগোষ্ঠী। তারাই পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই জার্মানরাই পৃথিবী শাসন করবে।

সেনাবাহিনীতে তিনি প্রথমদিকে কিছুটা ভালো করেন। ১৯১৮ সালে একটি লৌহপদক (Iron cross) লাভ করেন। তবে তিনি যে সত্যি সত্যি এমন পদক পেয়েছিলেন ঐতিহাসিকগণ জার্মান সেনাবাহিনীর অতীত রেকর্ড তল্লাশি করেও তার কোনো প্রমাণ খুঁজে পাননি। তবে। তিনি সেনাবাহিনীতে পদোন্নতি পেয়ে পেয়ে করপোরাল (Corporal) পর্যন্ত উঠেছিলেন এটা সত্য। এটাই তাঁর প্রমোশনের শেষ ধাপ। এর উপরে আর যেতে পারেননি।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর মিউনিখের জার্মান সেনাবাহিনীর রাজনৈতিক বিভাগে তিনি চাকরি নেন নতুন করে। এখানেই অবসরপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর সদস্য এবং বাইরের লোকজন নিয়ে ন্যাশনাল স্যোস্যালিস্ট পার্টি (National Socialist Party) নামে রাজনৈতিক দল গঠন করেন। প্রথমে দলের নেতা ছিলেন জুলিয়াস স্ট্রেইচার (Julius Streicher) নামে এক লোক। ১৯২৩ সালে ফ্রান্স জার্মানির রাহর উপত্যকা (Rahr) দখল করলে জার্মানির জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই বিদেশি দখলদারের বিরুদ্ধে হিটলার তাঁর দল নিয়ে তীব্র আন্দোলন গড়ে তোলেন। এই সময় তাঁর জনপ্রিয়তাও বেড়ে যায়। তাঁর দলের সদস্য সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় প্রায় ৫৬,০০০। তিনি তখন জার্মানির রাজনৈতিক অঙ্গনে একটি বড় ধরনের ব্যক্তিত্ব ও শক্তি। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় জার্মানির মধ্যবিত্তশ্রেণি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সবচেয়ে বেশি। হিটলার তাদের অবস্থার উন্নতি করার আশা দিয়ে দলে ভর্তি করে লোকসমাগম ঘটাতে লাগলেন। দল গঠনের মাত্র দশবছরের মধ্যে তাদের সদস্যসংখ্যা বেড়ে গিয়ে দাঁড়াল ১,৮০,০০০ জনে। হিটলারের ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টির প্রতিজ্ঞা ছিল তিনটি- ১.

ভার্সাই চুক্তি বাতিল করা; ২. ইহুদিদের দেশ থেকে বিতাড়িত করা; ৩. উপনিবেশসমূহ ফিরিয়ে আনা। মূলত হিটলারের ন্যাশনাল সোস্যালিস্ট পার্টি বা নাৎসিদলের মতো সুগঠিত দল পৃথিবীতে খুব কমই সৃষ্টি হয়েছে।

তৎকালীন রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গের (১৮৪৭-১৯৩৪) দ্বিতীয় নির্বাচনের সময় নাৎসিদলের পক্ষ থেকে হিটলারও তাঁর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন, কিন্তু হিটলার নির্বাচনে হেরে যান। এরপর থেকে চ্যান্সেলর (প্রধানমন্ত্রী) হবার জন্য চেষ্টা করতে লাগলেন হিটলার। অবশেষে ১৯৩৩ সালের ৩১ জানুয়ারি তাঁর মনোবাসনা পূর্ণ হয়। হিডেন্ড বুর্গ অনিচ্ছাসত্ত্বেও হের হিটলারকে জার্মানির চ্যান্সেলার নিযুক্ত করেন। চ্যান্সেলর হবার পরই হিটলার তাঁর দলের মেনিফেস্টোর প্রধান প্রধান দফাগুলো কার্যকর করার উদ্যোগ নেন। তিনি জার্মানি থেকে প্রথমেই ইহুদি বিতাড়নের কাজ শুরু করেন। তারপর একটি একটি করে ভার্সাই চুক্তির শর্তগুলো অমান্য করতে লাগলেন। ভার্সাই চুক্তি অনুসারে জর্মানির এক লাখের বেশি সৈন্য রাখার উপায় ছিল না। হিটলার এই এক লাখ সৈন্যকে এমনভাবে সুশিক্ষিত এবং আধুনিক মারণাস্ত্রে সজ্জিত করলেন যে, এদের মধ্যে যে-কোনো ৫০০ জন সৈন্য একটা যুদ্ধ জয় করে আসতে সক্ষম ছিল। এ ছাড়াও তিনি দেশে বাধ্যতামূলকভাবে সামরিক শিক্ষার প্রচলন করলেন। দেশের প্রত্যেক যুবককে যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা দিলেন। হিটলারের সুশৃঙ্খল ব্যবস্থায় জার্মানির অর্থনৈতিক ব্যবস্থা এমন হয়েছিল যে, দেশে একজন লোকও বেকার ছিল না। প্রত্যেকে কাজ করার এবং টাকা রোজগারের সুযোগ পেত। হিটলার দেশে যুদ্ধবিমান, মোটরগাড়ি, যুদ্ধাজাহাজ তৈরি করার কারখানা গড়ে তুললেন। জার্মানিতে লক্ষ লক্ষ কিলোমিটার পাকা রাস্তা তৈরি হতে লাগল। এতে দেশের যাতায়াত ব্যবস্থার খুব উন্নতি হলে। এ ছাড়া জার্মানিতে রাসায়নিক দ্রব্য, ওষুধ, কাগজ, খেলনা প্রভৃতি নানারকম নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের বড় বড় কারখানা তৈরি হলো। এখানেও বহু বেকার লোকের কর্মসংস্থান হলো। কেউ কেউ নিজের চেষ্টায় কারখানা খুলতে চাইলে তারও সুযোগ দেয়া হলো। জার্মান ব্যাংকগুলো তাঁদের টাকা দিয়ে সাহায্য ক্ষমতা। এই রকম ব্যবস্থা নেয়ার ফলে জার্মানির মধ্যবিত্তশ্রেণীর দুঃখ দূর হয়ে গেল। হিটলার নানাভাবে চেষ্টা করে দেশ থেকে বেকার সমস্যা দূর করে ফেললেন। হিটলারের নতুন নিয়মে দেশে খুব ধনী কেউ ছিল না, কিন্তু গরিবেরও কিছু না করে থাকবার উপায় ছিল না। সকলেই সচ্ছলভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করার সুযোগ পেয়েছিল। এইসব উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের পাশাপাশি হিটলার আরেকটি কাজ করে যাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর কার্যক্রম ও নিজের ভাবমূর্তি তুলে ধরার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে লাগলেন। তিনি জার্মানদের ফুয়েরার (Fuhrer) হয়ে গেলেন। ঘাটে মাঠে স্কুলে কলেজে অফিসে আর সেনাছাউনিতে সর্বত্র বয়ে যেতে লাগল হিটলারের প্রশংসার বন্যা। রাষ্ট্রপতি হিন্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পরের দিনই ১৯৩৪ সালের ৩ আগস্ট হিটলার নিজেকে রাষ্ট্রপতি ঘোষণা করলেন এবং আনুষ্ঠানিকভাবে ফুয়েরার উপাধি গ্রহণ করলেন। একই সঙ্গে তিনি সেনাবাহিনীরও কর্তৃত্ব নিজের হাতে রাখলেন। দেশকে সংঘবদ্ধ করে হিটলার এবার ধুয়া তুললেন যে, জার্মানির বাইরে যত জার্মান

আছে তাদের প্রত্যেককে দেশে ফিরিয়ে আনতে হবে। এর জন্য দেশের পরিধি আরও বাড়াতে হবে, আরও জায়গার দরকার হবে। তাই ইউরোপের জার্মানপ্রধান অঞ্চলগুলোকো জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। ১৯৩৮ সালের তিনি আকস্মিক আক্রমণ চালিয়ে অস্ট্রিয়াকে জার্মানির অন্তর্ভুক্ত করে নিলেন। তারপর মিউনিখ চুক্তির (১৯৩৮ সাল) বলে চেকোস্লোভাকিয়ার (Czecholsovakia) সুদেতেনল্যান্ডকেও (Sudetenland) দখল করলেন।

তারপর ঝগড়া বাধল পোলিশা করিডোর নিয়ে। ভার্সাই চুক্তির আগে জায়গাটি ছিল জার্মানির পোল্যান্ডকে বালটিক সাগরে যাবার সুযোগ দেয়ার জন্য ভার্সাই চুক্তিতে এটা পোল্যান্ডকে দিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু হিটলার দাবি করলেন, পোলিশ করিডোর ফিরিয়ে দিতে হবে। পোল্যান্ড রাজি হলো না। ফলে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর জার্মানবাহিনী পোলিশ করিডোরের ব্যাপার নিয়ে পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসে। শুরু হলো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। এদিকে করিডোরে বসবাসরত অধিকাংশ লোক ছিল জার্মান বংশোদ্ভূত। তারাও এই আক্রমণকে সমর্থন করল। তাদের মনে আশা জাগল আবার হয়তো তারা জার্মানির সঙ্গে একত্রিত হতে যাচ্ছে। করিডোরের প্রধান শহর ডানজিগের নাৎসি নেতা আলবার্ট ফোরাস্টার ঘোষণা করলেন যে তাদের বিশ বছরের আশা আজ সফল হয়েছে।

ডানজিগ আবার মহান জার্মান রাষ্ট্রের সঙ্গে মিলিত হলো। জার্মান সেনা করিডোরে প্রবশে করা মাত্র সেখানকার জার্মানরা তাদের সাদর অভ্যর্থনা জানাল। ২ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশর ওপর জার্মানবাহিনী বিমান থেকে বোমাবর্ষণ করতে লাগল। ব্রিটেন আগে থেকেই বলে আসছিল যে, পোল্যান্ড কোনো বহিঃশক্রর দ্বারা আক্রান্ত হলে তারা পোল্যান্ডের পাশে থাকবে। এই যুদ্ধে ব্রিটেন পোল্যান্ডের পক্ষে যোগ দিল। কারণ তার ভয় ছিল জার্মানি বেশি শক্তিশালী হলে ফ্রান্সের জন্য সেটা হুমকির কারণ হবে। এরপর ব্রিটিশ কমনওয়েলথভুক্ত অস্ট্রেলিয়া এবং নিউজিল্যান্ডও যোগদান করল জার্মানিবিরোধী মৈত্রীজোটে। জার্মানবাহিনী পোল্যান্ডের বন্দরনগরী জিউনিয়া দখল করে ওয়ারশের দিকে ধাবিত হলো। এমনি সময় রুশবাহিনী রুখে দাঁড়াল পোল্যান্ডের অপরপ্রান্তে। ১৯৩৯ সালে অবশ্য হিটলার রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তি করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও রাশিয়া জার্মানির পক্ষ অবলম্বন করল না, বরং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে পোল্যান্ডের কোন্ কোন্ অংশ রাশিয়ার ছিল তা পুনরুদ্ধার করতেই ছিল তাদের এই সমরোদ্যম। ২৭ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডের ওয়ারশ নগরীর পতন ঘটল জার্মানির হাতে। তখন জার্মানি আর রাশিয়া দুই বিজয়ী দেশ পরাজিত পোলান্ডকে ভাগাভাগি করে নিল দু'জনের মধ্যে শিকারের মাংস ভাগাভাগির মতো।

পোল্যান্ড অধিকৃত হবার পর হিটলার এবার পশ্চিম সীমান্তের দিকে নজর দিলেন। জার্মান বিমামবাহিনী এবার ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড এবং ফ্রান্সের ওপর বোমাবর্ষণ করতে লাগল। আগে ব্রিটেন নৌশক্তিতে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ছিল। কিন্তু এবার হিটলারের উন্নত প্রযুক্তিতে সজ্জিত ইউ-বোট (U-Boat) অর্থাৎ জার্মান ডুবোজাহাজের আক্রমণে ব্রিটিশ

নৌবাহিনীও ক্ষতবিক্ষত হতে লাগল। কিন্তু ব্রিটিশ বিজ্ঞানীরা জার্মান ইউ-বোটের মোকাবিলা করার জন্য এক ধরনের জলবোমা বা ডেপথ-চার্জ আবিষ্কার করে ফেললেন। এবার ব্রিটিশ নৌবাহিনী হিটলারের নৌশক্তিতে বিশ্বজয়ের অভিযানকে তছনছ করে দিতে লাগল। ব্রিটেন তার শক্তিশালী নৌবহর দিয়ে জার্মানির চারদিক ঘেরাও করে ফেলল। জার্মানির সকল রকম সমুদ্রপথের আমদানি-রফতানি বন্ধ হয়ে গেল। খাদ্যবস্ত্র, অস্ত্র ও রাসায়নিক উপকরণ আমদানি বন্ধ হয়ে গেল। জার্মানি তার নতুন বিজিত দেশ চেকোস্লোভাকিয়া এবং পোল্যান্ড থেকে কোনো সাহায্যই পেল না।

এই সময় পর্তুগালের সীমান্তে আবার সক্রিয় হয়ে উঠল জার্মানবাহিনী। বেলজিয়াম ও ইংল্যান্ড পর্তুগালের পক্ষে দাঁড়াল। এদিকে হিটলার হল্যান্ড (বর্তমান নেদারল্যান্ড) আক্রমণের পরিকল্পনা করতে লাগলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল হল্যান্ডের মধ্য দিয়ে ফ্রান্সের অভ্যন্তরে প্রবেশ করা। এছাড়া হল্যোন্ড অধিকার করতে পারলে তার পশ্চিম-উপকূল থেকে ইংল্যান্ড আক্রমণ করা সহজে হবে। ৯ এপ্রিল (১৯৪০) নরওয়ে এবং ডেনমার্ক আক্রমণ করল জার্মান। ডেনমার্ক সহজেই বশ্যতা স্বীকার করল। কিন্তু নরওয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যেতে লাগল। ব্রিটেন নরওয়েকে সকল প্রকারের সহযোগিতা দিতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মিত্রশক্তি নরওয়েতে হেরে গেল। নরওয়েতে মিত্রশক্তির পরাজয়ে ব্রিটেনে দারুণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হলো। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী নোভল চেম্বারলেন পদত্যাগ করলেন। তাঁর স্থলে নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন উইনস্টন চার্চিল (১০ জুন ১৯৪০ সাল থেকে)।

ওদিকে পর্তুগালেরও পরাজয় হলো। পর্তুগিজ রাজপরিবার লন্ডনে গিয়ে আশ্রয় নিলেন। ১০ জুন (১৯৪০) হিটলারবাহিনী ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে প্রবেশ করল। ফ্রান্সে গঠিত হলো মার্শাল পেতঁ্যার অধীনে একটি পুতুল-সরকার। ফ্রান্সের পরাজয়ের পর সমগ্র ইউরোপে তখন হিটলার এক অপরাজেয় ব্যক্তিত্ব। জার্মানিতে হিটলারের প্রশংসায় সারাদেশ মুখরিত।

এবার হিটলার তাঁর চূড়ান্ত বিজয়ের জন্য ব্রিটেন-আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। ঝাঁকে ঝাঁকে জার্মান যুদ্ধবিমান বোমা ফেলতে লাগল ইংল্যান্ডের বিভিন্ন স্থানে। টেমস নদীর মোহনায় এবং ডোভার প্রণালীতে চলল প্রচণ্ড বিমানযুদ্ধ। ২৭ সেপ্টেম্বর মিত্রবাহিনীর মতো ইতালি এবং জাপানের সঙ্গে দশবছর মেয়াদি সন্ধি করলেন হিটলার। হিটলারের পক্ষে ইতালি গ্রিস আক্রমণ করতে গিয়ে বেকায়দায় পড়ে গেল। অপরদিকে যুগোস্লাভিয়া উভয় শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৪১ যুগোস্লোভিয়া আত্মসমর্পণ উভয় শক্তির বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালেন। ১৭ এপ্রিল ১৯৪১ যুগোস্লাভিয়া আত্মসমর্পণ করল এবং ২২ এপ্রিল (১৯৪১) থেকে ইংরেজ সৈন্য গ্রিস ত্যাগ করতে শুরু করল। হিটলারের সবচেয়ে বড় ধরনের অভিযান ছিল রাশিয়া-আক্রমণ। জার্মানি ২২ জুন (১৯৪১) রাশিয়ার বিরুদ্ধে সৈন্য চালনা করে। পূর্ব প্রুশিয়া, পোলানা করছিলেন, তবু মধ্য দিয়ে জার্মানবাহিনী রাশিয়া অভিমুখে যাত্রা করে।

ক্রমে জার্মানরা লেনিনগ্রাদের দিকে অগ্রসর হয়। জার্মানরা মস্কো বোমাবর্ষণ করে। ১ সেপ্টেম্বর থেকে রুশবাহিনী পাল্টা আক্রমণ চালায়। লেনিন উভয়পক্ষে প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। ১৯ সেপ্টেম্বর জার্মানবাহিনী কিভ নগরীতে প্রবেশ করে। কিন্তু রুশবাহিনী চারদিক থেকে কিভ নগরী ঘিরে ফেলে। এর পরও জার্মানিরা খার্কভ অধিকার করল এবং ক্রিমিয়া ও ইউক্রেনেও তাদের আক্রমণ অব্যাহত থাকল। এদিকে উত্তরআফ্রিকায়ও জার্মানবাহিনীর সঙ্গে ইংরেজদের যুদ্ধ চলছে। ৯ ডিসেম্বর চীন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১১ ডিসেম্বর জার্মানি এবং ইতালি যৌথভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ৩১ জানুয়ারি (১৯৪৩) জার্মানবাহিনীর নিকট লেনিনগ্রাদের পতন ঘটে। এর এক বছর পরে ২৬ জানুয়ারি (১৯৪৪) রুশবাহিনী কর্তৃক লেনিনগ্রাদ পুনঃর্দখল হয়। ২ মে (১৯৪৫) রাশিয়া বার্লিন দখল করে। ১৩ ফেব্রুয়ারি রাশিয়া হাঙ্গেরি পুনর্দখল করে নেয়। ৪৫,০০০ জার্মানসৈন্য রুশসৈন্য দ্বারা ঘেরাও হয়ে পড়ে। শুরু হয় জার্মানবাহিনীর পরাজয়ের পালা। একটার-পর-একটা পরাজয়।

ক্রমে জার্মানরা হিটলারের বিরুদ্ধেই অসন্তুষ্ট হয়ে উঠে। ২০ জুলাই হিটলারকে হত্যা করারও চেষ্টা করা হয়। কিন্তু হিটলার প্রাণে বেঁচে যান। তখন থেকেই তিনি ভূগর্ভস্থ সুরক্ষিত দুর্গে আশ্রয় নেন এবং সেখান থেকেই যুদ্ধ পরিচালত হতে থাকে। মিত্রশক্তি ফ্রান্সের দিক থেকে দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসতে লাগল। নগরের পর নগর জার্মানদের হাতছাড়া হয়। অবশেষে প্যারিস থেকেও সরে আসতে হলো জার্মানবাহিনীকে। এদিকে ইংরেজ, মার্কিন, ফরাসিবাহিনী বিভিন্ন পথে জার্মানিকে আক্রমণ করতে লাগ। ওদিকে জার্মানির পূর্বসীমান্ত থেকে অগ্রসর হতে লাগল রুশবাহিনী। আর বাধা দেয়ার কোনো ক্ষমতা রইল না হিটলারের। ওড্যব নদীর তীরে রুশবাহিনীকে বাধা দেয়ার শেষ চেষ্টা করলেন হিটলার। কিন্তু তাতেও অক্ষম হয়ে একেবারে ভগ্নোদ্যম হয়ে পড়লেন তিনি। এবার নিশ্চিত বুঝতে পারছিলেন যে, জার্মানদের পরাজয় অবধারিত। ২৯ এপ্রিল (১৯৪৫) দুর্ভাবনা আর হতাশায় অসুস্থ হয়ে পড়লেন তিনি। পরে সম্ভাব্য লজ্জাজনক শাস্তির হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য তিনি আত্মহত্যা করলেন। তাঁর মৃতদেহ চ্যান্সেরারি ভবনের ভেতরেই সমাহিত করা হয়। হিটলারের পরাজয়ের মধ্যদিয়ে শেষ হয় দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের। তবে তিনি জার্মানবাহিনীর শেষ আত্মসমর্পণ দেখে যাননি। তার আগেই আত্মহত্যা করে সম্মান বাঁচিয়েছিলেন। (সূত্রঃ অস্ট্রিক আর্য্য, বিশ্বশ্রেষ্ঠ আলোকিত মানুষ, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১১)।

অ্যান্টি থিসিস (Anti-thesis)

বিশ্ব জগতের প্রতিটা বস্তু বা সমাজের একটি ক্রিয়া থাকে, যা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আর এই প্রতিক্রিয়া হলো অ্যান্টি থিসিস। অর্থাৎ সাধারণভাবে কোনো বস্তু বা সমাজের কোনো অবস্থা বা ব্যবস্থার মধ্যে সমগ্র বাস্তব জগতে আবির্ভূত প্রতিপাদ্যের বিপরীত যুক্তিরূপে উপস্থাপিত বিষয় হল অ্যান্টি থিসিস। কোনো রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সংস্কৃতিক পরিস্থিতি, তার গতিধারা, সংগঠন ও জনগণের করণীয়

সম্পর্কে কোনো উপস্থাপিত বিষয় তার বিপরীত বিষয় থাকে যা রাজনীতির ক্ষেত্রে অ্যান্টি থিসিস। থিসিস ও অ্যান্টি থিসিসের দ্বন্দ্ব সমন্বয়ের ফলেই সিন্থেসিস (Synthesis) বা সংশ্লেষণ ঘটে। রাজনীতির ক্ষেত্রেও থিসিস, অ্যান্টি থিসিস ও সিন্থেসিস এর সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।

অ্যামনেস্টি (Amnesty)

অ্যামনেস্টি (Amnesty) শব্দটি গ্রিক ভাষা থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হল ভুলে যাওয়া, বা বিস্মৃত হওয়া। ইংরেজিতে Amnesty শব্দটির অর্থ হলো মুক্তিদান, অপরাধ বা ক্ষমা করা, যার প্রচলিত রাজনৈতিক অর্থ রাজা বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক শাস্তিপ্রাপ্ত অপরাধীদের বা রাষ্ট্রদ্রোহী অপরাধীদের অপরাধ মার্জনা যার মাধ্যমে রাষ্ট্র রাজনৈতিক বা অন্যান্য অপরাধীদের ক্ষমা করে দিতে পারে যাতে তারা কারাগারে থাকলে কারামুক্ত হয়, দণ্ডপ্রাপ্ত বা শাস্তিপ্রাপ্ত হলে শাস্তি মওকুফ হয় কিংবা তাদের বিরুদ্ধে মামলা চালু থাকলে মামলা খারিজ হয়। সাধারণত রাজনৈতিক সমঝোতার প্রেক্ষিতে একটা সরকারের সরকারের আমলে রাজবন্দীদের মার্জনা করে থাকে। আবার অনেক সময় অবস্থিত সরকার অবস্থানগত চাপের কারণে ক্ষমা ঘোষণা করতে পারে। তবে এই ক্ষমা রাষ্ট্রপ্রধানের হাত দিয়ে হয়ে থাকে। তাছাড়া বর্তমানে অর্থনৈতিক অ্যামনেস্টি বা ট্যাক্স অ্যামনেস্টির ব্যাপারও প্রচলিত হয়েছে। এরূপ অ্যামনেস্টির মাধ্যমে কালো টাকার মালিককে এরূপ শর্ত দেওয়া হয় যে, টাকা উৎপাদনমূলক খাতে বা সরকার নির্ধারিত অন্য কোনো খাতে বিনিয়োগ করা হবে। কিংবা ট্যাক্স ফাঁকিদানকারীকে (একই শর্তে) ক্ষমা প্রার্থনা করা যেতে পারে।

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল (Amnesty International)

অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিচালিত রাজনৈতিক নির্যাতন, কারারুদ্ধকরণ, মানবাধিকার লঙ্ঘন ইত্যাদির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করা এবং এরূপ অপরাধ যথাসম্ভব প্রতিরোধ করাই এই প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য। ১৯৬১ সালে যুক্তরাজ্যে এ প্রতিষ্ঠানের সদর দপ্তর স্থাপিত হয়। বর্তমানে ১৫০টি দেশে এর শাখা রয়েছে এবং এর সদস্যসংখ্যা হচ্ছে প্রায় ৫,০০০। উল্লেখ্য যে, মানবতা ও শক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখার জন্য ১৯৭৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

অ্যারিস্টটল (Aristotle)

প্রাচীন বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শিনিক ও বিজ্ঞানী হিসেবে অ্যারিস্টটল পরিচিত। আনুষ্ঠানিক যুক্তিবিদ্যার সূচনা, দর্শনের প্রায় প্রতিটি শাখাকে সমৃদ্ধকরণসহ রাজনীতির নানা দিক নিয়ে তাঁর অবদান অপরিসীম। ম্যাসেডোনিয়ার স্ট্যাগিরা শহরে খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৪ সালে অ্যারিস্টটলের জন্ম। সতেরো বছর বয়সে প্লেটোর অ্যাকাডেমিতে পড়ার জন্য

অ্যারিস্টটল এথেন্সে নগরীতে আসেন। প্রায় বিশ বছর তিনি সেখানে অবস্থান করেন। অ্যারিস্টটলকে প্রাচীনকালের সর্বশ্রেষ্ঠ দার্শনিক ও বিজ্ঞানী হিসেবে অভিহিত করা হয়। খিস্টপূর্ব ৩৪২ সালে অ্যারিস্টটল তেরো বছর বয়স্ক যুবরাজের গৃহশিক্ষক নিযুক্ত হয়ে ম্যাসেডোনিয়ায় ফিরে আসেন। এই যুবরাজই পরবর্তীতে মহামতি আলেকজান্ডার হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। অ্যারিস্টটলের কাছে আলেকজান্ডার কয়েক বছর শিক্ষা লাভ করেন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৩৫ সালে আলেকজান্ডারের সিংহাসন আরোহণের পর অ্যারিস্টটল এথন্সে ফিরে যান এবং তাঁর নিজস্ব বিদ্যালয় লাইসিয়াম প্রতিষ্ঠা করেন। জ্যোতির্বিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, ভ্রূণবিদ্যা, ভূগোল, ভূতত্ত্ব, পদার্থবিদ্যা, শরীরবিদ্যা, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা এবং প্রাচীন গ্রিকদের পরিচিতি জ্ঞানের সকল বিষয়ে অ্যারিস্টটলের বিশেষ অবদান রয়েছে। তাঁর বৈজ্ঞানিক রচনাগুলো অংশত সেই সময় পর্যন্ত অন্যদের আহরিত জ্ঞানের সংকলন। তাঁর গবেণা প্রকল্পের একটি ছিল বহু দেশের সংবিধানের তুলনামূলক পর্যালোচনামূলক বিশ্লেষণ। পরবর্তী পাশ্চাত্য চিন্তার জগতেও অ্যারিস্টলের প্রভাব ছিল অনেক। প্রাচীন ও মধ্যযুগে তাঁর গ্রন্থাবলি ল্যাটিন, সিরিয়াক, আরবি, ইটালিয়ান, ফরাসি, হিব্রু, জার্মান ও ইংরেজিসহ বহু ভাষায় অনূদিত হয়। পরবর্তী গ্রিক ও বাইজান্টাইন লেখকগণ তাঁর লেখার পাঠক ও ভক্ত ছিলেন। ইসলামি দর্শনের ওপর তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব পরে এবং বহু শতাব্দী ধরে তাঁর লেখা ইউরোপীয় চিন্তাকে নিয়ন্ত্রণ করে। সবচেয়ে প্রসিদ্ধ আরবি দার্শনিক আবু রুশদ ইসলামিক ধর্মতত্ত্ব এবং অ্যারিস্টটলের যুক্তিবাদের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা করেন। তিনি ৩২২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে গ্রিসে মৃত্যুবরণ করেন।

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (Albert Einstein)

অ্যালবার্ট আইনস্টাইন (১৮৭৯-১৯৫৫) জার্মান পদার্থবিদ এবং আপেক্ষিকতার তত্ত্বসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব আবিষ্কারক। তাঁর তত্ত্বের ফলশ্রুতিতে মহাশূন্য, সময়, গতি, বস্তু, আলো, মাধ্যাকর্ষণ ইত্যাদি সম্পর্কে নতুন ধারণার সৃষ্টি হয়। ফ্যাসিবাদী সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে তিনি জার্মানি ত্যাগ করেন বেং যুক্তরাষ্ট্রের প্রিন্সটনে বসবাস শুরু করেন। তাঁর দার্শনিক চিন্তাধারা স্পিনোজার চিন্তাধারার কাছাকাছি ছিল। সামাজিক-রাজনৈতিক চিন্তার দিক থেকে তিনি সামাজিক নিপীড়ন, সমরবাদ ও প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরোধী ছিলেন। যুদ্ধের জন্যে আণবিক শক্তি ব্যবহারেরও তিনি ঘোরতর বিরোধিতা করেন।

অ্যাসেরীয় সভ্যতা (*Asyrian* Civilization)

মোসেপটেমিয়া উত্তরাংশে অ্যাসেরীয়রা প্রাধান্য বিস্তার করে। ক্যাসাইটদের আক্রমণের প্রাচীন ব্যাবলিন সম্রাজ্যের পতন ঘটলে তারা এই সভ্যতার উত্তরাধিকার লাভ করে। খ্রিস্টপূর্ব ১৩০০ অব্দের মধ্যেই অ্যাসেরীয়রা সমগ্র উত্তর মেসোপটেমিয়া দখল করে নেয়। আসেরীয় সম্রাটদের মধ্য সর্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন আশুরবানিপাল (খ্রিস্টপূর্ব ৬৬৮-৬২৬)। অ্যাসিরয়িরা মুলত ব্যবলিনীয় সভ্যতার দ্বারা প্রভাবিত হলেও সভ্যতার

ইতিহাসে তাদের নিজস্ব অবদানও কম নয়। স্থাপত্য, ভাস্কর্য, চিত্রকলা, কারুশিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মৌলিক উদ্ভাবন ক্ষমতার ছাপ সুস্পষ্ট। সম্রাট আশুরবানিপাল রাজধানী নিনেভাহকে এমন সব জমকালো প্রাসাদ ও রাজপথ দ্বারা সুশোভিত করেন যে তাকে 'সৌরকল্লোজ্জ্বল নগরী নামে অভিহিত করা হতো। তিনি নিজে ছিলেন সুপণ্ডিত। রাজধানী নিভোহেকে তিনি শুধু সামরিক কেন্দ্রই নয়, শিক্ষা ও সংস্কৃতির এক বৃহৎ কেন্দ্রে পরিণত করেন। তিনি প্রতিষ্ঠা করেন এমন এক বিশাল পাঠাগার, সেমিটিক জগতে যা ছিল সর্ববৃহৎ ও সমৃদ্ধতম।

আংশিক ভারসাম্য (Partial Equilibrium)

যখন কোনো একজন ভোগকারী, কোনো একটি উৎপাদক প্রতিষ্ঠান বা কোনো একটি শিল্প বিশেষের ভারসাম্য আলোচনা করা হয় তখন তাকে 'আংশিক ভারসাম্য' (Partial Equilibrium) বলা হয়। এটা হলো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অংশবিশেষের ভারসাম্যের আলোচনা। "অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তীত রয়েছে" ধরে নিয়ে আংশিক ভারসাম্যের বিশ্লেষণে কেবল প্রাথমিক ও প্রত্যক্ষ প্রতিক্রিয়াগুলো আলোচনা। অর্থনীতির ব্যষ্টিগত বিশ্লেষণ (Micro-economic Analysis) মূলত আংশিক ভারসাম্যেরই আলোচনা।

আই.এম.এফ (International Monetary Fund-IMF)

আই. এম. এফ. বা আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund IMF) জাতিসংঘের একটি এজেন্সি হলেও কার্যত এটি একটি স্বাধীন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান। এর উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণের মাধ্যমে উৎপাদন, প্রকৃত আয় ও কর্মসংস্থানকে গতিময় করে তোলা এবং বিনিময় হারকে স্থিতিশীল রাখা এবং এর নিজস্ব তহবিল থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলোকে সাহায্য প্রদান করা। ১৯৪৪ সালের ব্রেটন্ উডস্ চুক্তি অনুযায়ী স্থাপিত হয় আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (International Monetary Fund-IMF)। এই সংস্থার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল বহুমুখী বাণিজ্যের সম্প্রসারণ। স্বর্ণমানের ভিত্তিতে সদস্য দেশসমূহের মুদ্রামানের সমতা রক্ষা এবং পারস্পরিক বিনিময়হারের স্থিতিশীলতা রক্ষা মর্মেও এই সংস্থা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই তহবিল গঠনের উদ্দেশে সদস্য দেশসমূহের চাঁদা ধার্য করা, যার ৭৫% স্ব-স্ব মুদ্রায় এবং ২৫% স্বর্ণে, মার্কিন ডলারে বা উভয়টি মিলিয়ে প্রদেয়। এই তহবিলের অপর উদ্দেশ্য হল কোনো সদস্যদেশের লেনদেনের ক্ষেত্রে ঘাটতি দেখা দিলে, সংশ্লিষ্ট দেশকে বৈদেশিক মুদ্রা সাহায্য প্রদান করা, যা সাধারণত তার কোটার ওপর ২৫% এর অধিক হয় না। কোনো সদস্য রাষ্ট্রই আই.এম.এফ. এর পূর্বানুমতি ব্যতিরেকে এই হারের শতকরা ১০ ভাগের বেশি পরিবর্তন করতে পারে না। আই.এম.এফ. এর সদস্যদেরকে এই ফান্ডে কোটা অনুযায়ী চাঁদা প্রদান করতে হয়। অবশ্য ১৯৬৮ সালে এই তহবিল বিশেষ উত্তোলন অধিকার (Special Drawing Rights - SDR)-এর প্রবর্তন করে, যাতে সদস্যরা প্রয়োজনমত তাদের ঘাটতি পূরণ করতে পারে।

আইএসআই (ISI)

পাকিস্তানি গোয়েন্দা সংস্থা আইএসআইয়ের পুরো নাম 'ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান স্বাধীন হওয়ার পর ব্রিটিশ আইবির (Inteligence Bureu) কর্মচ্যুত পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নিয়ে আইবি পুনর্গঠিত হয়। জানা যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব বাড়ানোর উদ্দেশে আইএসআই বা ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি (Inter Services Agency) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভুট্টোর সে আশা পূরণ হয়নি।

পরে ক্রমান্বয়ে আইএসবি আন্তর্জাতিক মানের গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। এ সংস্থার প্রধান কার্য এলাকা ভারত, পাকিস্তান, যুক্তরাষ্ট্র। বাংলাদেশে এ সংস্থার তৎপরতা আছে বলে জানা যায়। আসামের বিদ্রোহী গ্রুপ 'উলফা'র সঙ্গে আইএসআইর যোগসাজশ আছে বলে অনেক পর্যবেক্ষক মনে করেন। পাকিস্তানি গুপ্তচর সংস্থার সঙ্গে আফগান, তালেবান এবং বাংলাদেশের মৌলবাদী বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে সম্পর্ক রয়েছে বলে ধারণা করা হয়।

আইন (Law)

আইন শব্দটির ইংরেজী প্রতিশব্দ 'Law'। এই 'Law' শব্দটি টিউনিক মূল 'Lay' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ To place or to set. এর আভিধানিক অর্থ হলো স্থির, অপরিবর্তনীয় এবং যা সর্বত্র সমান আরোপিত। অন্যান্য ইউরোপীয় জাতি- 'Droit', 'Recht', Diritto' 'Derecho' প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগে সামগ্রিকভাবে আইনের সঠিক প্রকাশ করেছে এবং রোমানরা Ius শব্দটির মাধ্যমে তার ব্যাখ্যা দিয়েছে। তবে আইন শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়, যথা-নৈতিক আইন, ধর্মীয় আইন, প্রাকৃতিক আইন, সামাজিক, আইন, এবং রাষ্ট্রীয় আইন। সাধারণত আইন বলতে বোঝায় নিয়ম-কানুন, যা কোনো না কোনো কারণে মান্য। এগুলোর কোনোটির উৎস মানুষের নীতিবোধ, কোনোটির ধর্মশাস্ত্রের বিধান, সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, জনমত ন্যায়-নীতি সামাজিক মূল্যবোধ প্রভৃতি। সমাজবদ্ধ মানুষের আচার ব্যবহার নিয়ন্ত্রণকারী সামাজিক প্রথা, রীতিনীতি, ঐতিহ্য প্রভৃতি সামাজিক আইনের আওতাভুক্ত। সমাজবাসীর ঔচিত্য, অনৌচিত্য, ন্যায়-অন্যায়, সৎ-অসৎ, ভল-মন্দ প্রভৃতি বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত নিয়মনীতিকে নৈতিক বিধান বলা হয়। আবার প্রাকৃতিক নিয়মনীতিকে নৈতিক বিধানও বলা হয়। প্রাকৃতিক জগতের ঘটনাবলীর কার্য কারণ সম্পর্ক বোঝানোর জন্য প্রাকৃতিক আইন কথাটি বলা হয়। কিন্তু রাষ্ট্রবিজ্ঞান এগুলোর কোনোটিই আইন পদবাচ্য হিসেবে স্বীকৃত নয়। ব্যপক অর্থে আইন বলতে সমাজ জীবনের অসংখ্য নিয়ম-নীতি ও বিধিকে বোঝালেও সংকীর্ণ ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানের পরিভাষায় আইন বলতে এমন এক ধরনের নিয়ম-কানুন ও বিধি বিধানকে বোঝায় যা রাষ্ট্র কর্তৃক তৈরি, সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত এবং যা অবশ্য মান্য, ভঙ্গ করলে শাস্তি পেতে হয় এবং মানবিক কারণে অবমাননা করলেও সে শাস্তি থেকে অব্যহতি পাওয়া যায় না। রাষ্ট্রীয় আইনের সাথে অন্যান্য

ধরনের আইনের পার্থক্য এই যে, রাষ্ট্রীয় আইন মান্য না করলে কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষ বা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তা বলবৎ করতে পারে। অন্যান্য আইনের ক্ষেত্রে তদ্রুপ বলপ্রয়োগের বিধান নেই। সুতরাং আইন হলো রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত, স্বীকৃত ও গৃহীত জনসাধারণের কল্যাণের জন্য অত্যাবশ্যক কতগুলো লিখিত বিধি-বিধান ও নিয়ম-নীতির সমষ্টি যা দ্বারা মানুষ ও প্রতিষ্ঠানের আচরণ নিয়ন্ত্রণ করা হয়। আইনের উক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে এর কতগুলো বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা যেতে পারে। যথা-১. আইন হলো কতগুলো বিধিবদ্ধ আচার ব্যবহার; ২. আইন মানুষের কেবল বহির্জগতের আচার আচারণকে নিয়ন্ত্রণ করে; ৩. আইন সুস্পষ্ট, সুনির্দিষ্ট এবং সার্বজনীন; ৪. রাষ্ট্রের সার্বভৌম কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত এবং বাধ্যতামূলকভাবে বলবৎ হয়; ৫. আইনের স্থান সবকিছুর উর্ধ্বে; ৬. আইন বিধিসম্মত, যুক্তিসঙ্গত এবং দ্বিধাদ্বন্দ্ব বিবর্জিত; ৭. আইন গতিশীল এবং দেশ কালভেদে পরিবর্তনশীল; ৮. আইন বৃহত্তর সমাজ জীবনে আপেক্ষিক; ৯. আইনের চোখে সবাই সমান; এবং ১০. আইন অমান্য করলে শাস্তি অনিবার্য।

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া (Process of Law)

আধুনিক গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার মূল চালিকাশক্তি হিসেবে কাজ করে আইনসভা। আইনসভা বা জাতীয় সংসদ আইনের কাঠামো নির্মাণ, আদালতে বিচার সম্পাদন, অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও সরকারের স্থিতিশীলতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তবে আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগের সম্পর্কের ভিত্তিতে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে আইন পাশের পদ্ধতি ভিন্ন ধরনের। আবার বিলের প্রকারভেদ অনুযায়ী (সংবিধান সংশোধন, বাজেট ইত্যাদি) আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। সংসদীয় শাসন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রসমূহ পদ্ধতিগত বিচারে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকভুক্ত দেশসমূহে একই পদ্ধতি অর্থাৎ ওয়েস্টমিনিস্টার পদ্ধতি বা ব্রিটিশ হাউস অব কমন্সের রীতিনীতি অনুসরণ করে। রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় আইনসভা নির্বাহী বিভাগ হতে পৃথক থাকার কারণে আইন প্রণয়নে আইনসভা স্বাধীন। সংসদীয় কিংবা রাষ্ট্রপতি শাসিত যেকোনো ব্যবস্থায় আইন প্রণয়নের পদ্ধতিগত দিক নির্দেশনা সেই দেশের সংবিধানে উল্লেখ পাওয়া যায়। সংবিধান নির্দেশিত ওই পদ্ধতিটি যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চর্চা করা হয় তা সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সংস্কৃতির মান, সংসদীয় গণতান্ত্রিকচর্চা ও ঐতিহ্য, দলব্যবস্থা ইত্যাদি উপাদান দ্বারা প্রভাবিত। হাউস অব কমন্স 'Standing Order of the House' বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ, জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধি, ভারতের আইনসভার Rules of procedure, এ রকম স্বীয় বিধি দ্বারা আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়াটি পরিচালিত হয়। জাতীয় সংসদ কর্তৃক বিল উপস্থাপন ও অনুমোদনের প্রক্রিয়াগত কলা-কৌশলকে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়া বলা হয়। অর্থাৎ একটি বিল যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করে আইনে পরিণত হয় তাকে আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার বলে।

আইনগত কাঠামো আদেশ (Legal Framework Order)

পাকিস্তানের সংবিধান, আইনসভা, নির্বাচন, নির্বাচকমণ্ডলী ইত্যাদি বিষয়ে জারিকৃত আইনগত আদেশ। জেনারেল ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালের ৩০ মার্চ এ আইনগত কাঠামো আদেশ জারি করেন। গণঅভ্যুত্থানের মুখে ১৯৬৯ সালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান পাকিস্তানের ক্ষমতা থেকে অপসারিত হন। তারপর ক্ষমতায় আসেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। ক্ষমতায় আসার ঠিক এক বছর পর তিনি পাকিস্তানের পরবর্তী নির্বাচন কীভাবে অনুষ্ঠিত হবে, সংবিধানের মৌলভিত্তি কী হবে, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক পরিষদগুলোর সম্পর্ক কী রকম হবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের চরিত্র কেমন হবে, প্রেসিডেন্ট কীভাবে আইনসভা ডাকবেন বা বাতিল করবেন ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে রূপরেখা তুলে ধরেন। এ রূপরেখা সম্বলিত আদেশই আইনগত কাঠামো আদেশ বা Legal Framework Order (LFO, এলএফও)।

আদেশে বলা হয় পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদে ৩১৩ জন সদস্য থাকবেন। এঁদের মধ্যে ১৬৯ জন পূর্ব পাকিস্তান থেকে এবং ১৪৪ জন পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে। প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর সদস্য সংখ্যা বিভিন্ন রকম হবে। 'এক ব্যক্তি এক ভোট' এ নীতিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। প্রেসিডেন্ট তার পছন্দ মতো জাতীয় পরিষদের অধিবেশন আহ্বান করবেন। অধিবেশন শুরুর ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে। সংবিধান প্রণয়ন করতে ব্যর্থ হলে প্রেসিডেন্ট জাতীয় পরিষদ ভেঙে দিতে বা পুনরায় নির্বাচন দিতে পারবেন। সংবিধান রচনার পর তা যদি প্রেসিডেন্ট কর্তৃক প্রমাণিকৃত (Validated) না হয় তাহলে জাতীয় পরিষদ ভেঙে যাবে। জাতীয় পরিষদ যে সংবিধান প্রণয়ন করবে তা হতে হবে ইসলামি আদর্শ সংরক্ষণের সহায়ক। আদেশে বলা হয় পাকিস্তান হবে একটি যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকার। প্রদেশগুলো স্বায়ত্তশাসন পাবে, তবে তাতে যুক্তরাষ্ট্রীয় ঐক্য ক্ষুণ্ন হতে পারবে না।

ইয়াহিয়ার ঘোষিত এ আদেশের বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় পূর্ব পাকিস্তানে। আদেশ অনুযায়ী প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার হাতেই সকল ক্ষমতা সমর্পিত বলে এর সমালোচনা করা হয়। রাজনৈতিক দলগুলো এ আদেশের বিরোধিতা করে। তারপরও শেষ পর্যন্ত এ আদেশের বিধান অনুযায়ীই ১৯৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলগুলো নির্বাচনে অংশ নেয়।

আইনশাস্ত্র (Jurisprudence)

আইনশাস্ত্র হলো আইনের উৎপত্তি, প্রকৃতি ও বিকাশ সংক্রান্ত তত্ত্বগত বিদ্যা। এই শাস্ত্রে আইনের উৎপত্তি, বিকাশ ও প্রয়োগ থেকে শুরু করে যাবতীয় বিষয়ে অনুপুঙ্খ ধারণা থাকে। ত্রয়োদশ থেকে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রত্যয়টিকে প্রাকৃত আইন হিসেবে দেখা হত এবং মনে করা হত যে, প্রাকৃত আইনের পেছনে থাকে দিব্য নির্দেশ। ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই নানারকম তত্ত্ব গড়ে ওঠে যে আইনের ভিত্তি সার্বভৌম কর্তৃত্বের বিধিবিধান। আবার অন্য মতে, আইন হলো সংস্কৃতি ও প্রথাগত বিধান যার

পেছনে ধর্ম বা নৈতিকতার কোনো ভূমিকা থাকে না। আইন সম্পর্কে অন্যান্য তাত্ত্বিকেরা কেউ কেউ মনে করেন যে, আইনের পেছনে থাকে ঐতিহাসিক কার্যকারণ, অর্থাৎ বিবর্তনের ধারায় আইন রচিত হয়। কারও দৃষ্টিতে সমাজতান্ত্রিক কার্যকারণ, অর্থাৎ জাতি ও সমাজের আধিপত্যশীল ধারায় আইন গড়ে ওঠে। আইনশাস্ত্রের কাজ আইন নিয়ে নয়, আইনের দার্শনিক ভিত্তিভূমির বর্ণনা ও বিশ্লেষণ, অর্থাৎ আইনের অন্তর্নিহিত অধিকার, বাধ্যবাধকতা, দায়দায়িত্ব, ন্যায়বিচার ইত্যাদি প্রত্যয়ের অর্থ ও সঙ্গতি প্রদর্শন করা। আইনের সার্বিক তত্ত্বগত দিকসহ এর প্রয়োগ ও বাস্তবতা নিয়ে ব্যাখ্যা বিশ্লেষনের যথেষ্ট সুযোগ থাকে আইনশাস্ত্রে। এর মাধ্যমে যেকোনো নাগরিক আইন সম্পর্কে সচেতন হতে পারে।

আইনসভা (Legislature)

সরকার কয়েকটি অঙ্গের মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এগুলোর মধ্যে আইনসভা অন্যতম। অন্য দুটি হলো শাসন ও বিচার সংক্রান্ত। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইনের ভিত্তিতে সরকারের অন্য দুটি বিভাগ অর্থাৎ শাসনবিভাগ ও বিচারবিভাগ তাদের নিজ নিজ ক্ষেত্রে কার্যনির্বাহ করে। তিনটি বিভাগের মধ্যে আইনসভার গুরুত্বই অধিক। আইনসভার প্রধান কাজ আইন প্রণয়ন, সংশোধন ও পরিবর্তন করা। রাষ্ট্রভেদে আইনসভার কার্যপদ্ধতি ভিন্ন। আইনসভা অনেক রাষ্ট্রে গণপরিষদের কাজ হিসেবে সংবিধান প্রণয়ন, সংশোধন প্রভৃতি কাজ করে। আইনসভায় জনমতের যেমন প্রতিফলন হয়, অন্য ক্ষেত্রে তা হয় না। সেজন্যই একে জনপ্রিয় প্রতিষ্ঠান বলা যায়। জনগণের প্রতিনিধি নয়-সেটা কোনো দিন প্রকৃত আইনসভার মর্যাদা পাবে না। শাসন বিভাগের কর্মকর্তাগণ জনসাধারণের নির্বাচিত প্রতিনিধি নাও হতে পারেন। নির্বাহী প্রধানগণ বিভিন্ন পথে ক্ষমতায় অসীন হতে পারেন কিন্তু আইনসভার সভ্য হতে গেলে জনসমর্থন একান্ত আবশ্যক। বিচার বিভাগের সাথে জনসাধারণের কোনো প্রত্যক্ষ সম্পর্ক স্থাপিত হয় না। তাই এদিক থেকে এটি একটি জনপ্রিয় বিভাগ এবং শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার। অনেক সময় আইনসভা নির্বাচনবর্গে (electoral college) পরিণত হয়ে রাষ্ট্রপতি নির্বাচন করে। সরকারের আয়ব্যয় সম্পর্কিত যাবতীয় সিদ্ধান্ত, বাজেট অনুমোদন ও আর্থিক ক্রিয়াকর্মের সমালোচনা আইনসভার অন্যতম প্রধান কাজ। আইনসভা সরকারের অন্যান্য যাবতীয় ক্রিয়াকর্মের পর্যালোচনা করে। মন্ত্রিচালিত সরকারের মন্ত্রিগণকে আইনসভার সদস্য হতে হয় এবং নিজেদের কাজের জন্যে আইনসভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। সংসদীয় গঠনতন্ত্রের রীতি অনুযায়ী সাধারণ নির্বাচনে আইনসভায় নির্বাচিত দলভিত্তিক প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করে।

আইনসভা : এক-কক্ষ ও দ্বি-কক্ষ (Legislature : unicameral & bicameral)

এক-কক্ষবিশিষ্ট (unicameral) আইনসভা বেশি জনপ্রিয় ছিল আঠারো শতকের শেষে এবং উনিশ শতকের গোড়ায়। এককক্ষের ব্যবস্থাকে সমর্থন করতেন বেঞ্জামিন

ফ্র্যাঙ্কলিন ও জেরেমি বেনথাম। পরবর্তীতে হ্যারল্ড লাস্কিও অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন। দুজনের অভিমত ছিল যে, আইনসভায় প্রতিনিধিত্বমূলক একটি কক্ষ থাকাই সংগত। বাংলাদেশ, পাকিস্তান, তুরস্ক, বুলগেরিয়া প্রভৃতি দেশে এককবিশিষ্ট আইনসভা। ১৭৮৭ সালে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলনে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান প্রণয়নকালে তিনি এককক্ষের জন্য জোর যুক্তি প্রদর্শন করেন। জেরেমী বেন্থাম প্রায় সে সময়েই ব্রিটেনে এক কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের জন্য মতামত প্রদান করেন। রুশোও এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভাকে সমর্থন করেন। এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা গঠনের বিপক্ষেও বহু রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও রাজনীতিবিদ মন্তব্য রেখেছেন। তা সত্ত্বেও পৃথিবীর অনেক দেশেই এক-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা আছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা রয়েছে। ব্রিটেন, আমেরিকা, ফ্রান্স, ভারতসহ প্রভৃতি বড় বড় রাষ্ট্রে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায়। দ্বি-কক্ষের পেছনে বহু যুক্তি আছে সত্যি কিন্তু অনেক দেশে এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা দেখা যায়। ভারতের বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার রীতি রদ করা হয়েছে। কারণ একটি কক্ষ থাকলে আইন প্রণয়নের কাজ অনেক সরল ও দ্রুত হতে পারে, নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিত্ব সরাসরি ও চূড়ান্ত হয়। দায়িত্ব ও কর্তব্যে বিভাজন ঘটে না। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভায় সিদ্ধান্ত গ্রহণে অনেকক্ষেত্রে জটিলতা সৃষ্টি হয়। তবুও কালক্রমে দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভা জনপ্রিয় হয়ে ওঠেছে। এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্রীয় উভয় ধরনের রাষ্ট্রেই দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা প্রবর্তিত হতে পারে। যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার প্রকৃষ্ট নির্দশন। অনেক দেশই ওই দুটি ব্যবস্থাকে মডেল হিসেবে অনুসরণ করা হয়। আইন প্রণয়নের কাজে যথোচিত সতর্কতার সুযোগ, জনমত নির্ণয়ের সুবিধা ও এককক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার অসতর্কতা ও স্বেচ্ছাচারিতা এড়ানো দ্বি-কক্ষের অনুকূলে প্রধান যুক্তি।

আইনের উৎস (Source of Law)

বর্তমানে আইনের একমাত্র উৎসই রাষ্ট্র তথা আইনসভা বা জাতীয় সংসদ। কেননা, রাষ্ট্রই সব নিয়মকানুনকে বিধিবদ্ধ করে ও বৈধতা দান করে। আইনের বৈশিষ্ট্য ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, আইন কেবলমাত্র রাষ্ট্র কর্তৃক সৃষ্টি হয় না, মানব সভ্যতার আদিম যুগ থেকে আজ পর্যন্ত নানা সূত্র ও উৎস থেকে আইন সৃষ্টি হয়েছে, আইন গড়ে উঠেছে এবং তৈরি হয়েছে। সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনের বিবর্তন ধারায় আইনের বিবর্তন ঘটেছে। আইনের উৎস নির্দেশের ক্ষেত্রে করতে অধ্যাপক হল্যান্ডকে অনুসরণ করা যায়। তিনি আইনের ৬টি উৎসের কথা বলেছেন-যথা: ১. প্রথা (Customs) ২. ধর্ম (Religion) ৩. বিচারালয়ের সিদ্ধান্ত (Adjudication) ৪. বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Scientific Discussion) ৫. ন্যায়বোধ (Equity) ৬. আইন পরিষদ (Legislature) উক্ত উৎসের সাথে ওপেনহেইম জনমতকেও আইনের অন্যতম

উৎস বলে উল্লেখ করেছেন। এ ছাড়া নির্বাহী ঘোষণা, ডিক্রি বা প্রশাসনিক আইন, বৈদেশিক চুক্তি সংহিতাবদ্ধকরণ, সংবিধান এবং অধ্যাদেশকে আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে বিবেচনা করা যেতে পারে।

আইনের উৎস ও ধর্ম (Source of Law & Region)

আদিম যুগে মানব্য সমাজের মধ্যে যখন সভ্যতার আলো পৌঁছায়নি, তখন অসভ্য মানুষের উদ্ধত আচরণের ওপর ধর্মীয় অনুশাসনগুলো ছিল একমাত্র নিয়ন্ত্রণ। মধ্যযুগে ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসেবে রাজার নির্দেশ মান্য করার শিক্ষা দিয়ে ধর্ম প্রত্যক্ষভাবে আইনের জন্ম দেয়। ধর্মের নির্দেশ মেনে চলা মানুষের স্বভাবিক প্রকৃতি। ম্যাকাইভার উদাহরণ দিয়ে দেখিয়েলেন গ্রীসের প্রাচীন আইন সবই দেবী টেনিস এবং ডিইকের নির্দেশ বলে পরিচিত ছিল। হিন্দু ও মুসলমানদের বিবাহ সামাজিক সম্পর্ক উত্তরাধিকার প্রভৃতি বিষয়ে আইন হিন্দু ও মুসলমানদের ধর্মশাস্ত্র থেকে নেওয়া হয়েছে। হিন্দু আইনের ওপর মনুসংহিতার (Manu) এবং মুসলিম আইনের (Muhammudan Law) ওপর কোরআন শরীফ ও শরীয়তের প্রভাব সর্বজনবিদিত।বাংলাদেশে জামায়াত-ই-ইসলাম ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর ভিত্তি করে দেশ শাসনের আদর্শ প্রচার করছে। ইরান, সৌদি আরব, ফিলিস্তিনসহ বেশ কিছু মুসলিম রাষ্ট্র আইনের অন্যতম উৎস হিসেবে ধর্মের ভূমিকা কে প্রাধান্য দেয়।

আইনের উৎস ও ন্যায়বোধ (Source of Law & Equity)

ন্যায়বিচার বলতে সাম্য, সমতা ও বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করাকে বোঝায়। বিচারপতিগণ কার্য সম্পাদনে আইনের ব্যাখ্যা করার সময় শুধুমাত্র লিখিত আইনের অর্থের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেন না, ন্যায়নীতি বোধকেও কাজে লাগান। কোনো বিশেষ ধরনের মামলা সম্পর্কে আইনের কোনো সুস্পষ্ট নির্দেশ নেই কিংবা কোনো প্রচলিত আইন সমাজে ন্যায়নীতি বোধের সাথে সামঞ্জস্যবিহীন হয়ে পড়েছে। এরূপ ক্ষেত্রে বিচারপতিগণ নিজেদের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে মামলার রায় প্রদান করেন। ফলে নতুন আইন রচনার সম্ভাবনা দেখা দেয়। গীলক্রাইস্টের ভাষ্য হলো, ন্যায়নীতির অর্থ হচ্ছে সাম্য ও ন্যায়বিচার অথবা যেখানে আইনের বিধান ঠিকমত প্রযোজ্য হয় না সেখানে সাধারণ বুদ্ধি বা ন্যায়বোধের ওপর ভিত্তি করে বিচার করা (Equity is simply equality of justice or in case where the existing law does not properly apply judgment according to common sense and fairness). আবার পরিবর্তিত সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে বিচারপতিরা ন্যায়বিচারের মাধ্যমে নতুন আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগ করেন। সুতরাং প্রয়োজনের তাগিদে আইনের রূপ বদলায়, আবার নতুন আইনেরও সৃষ্টি হয়। প্রাচীন কালের রোমের প্রেটরগণ (Praetors) প্রায়ই দায়িত্ব নেওয়ার পর ন্যায় বিচারের মাধ্যমে নতুন আইন প্রবর্তন করতেন। আর ইংল্যান্ডের চ্যান্সেলর অতীতকাল থেকে ন্যায় বিচারের ভিত্তিতে আইন কার্যকর হয়ে আসছে।

আইনের উৎস ও প্রথা (Source of Law & Custom)

বহুদিন ধরে প্রচলিত আচার-আচরণ, রীতিনীতি এবং লোকাচারকেই প্রথা বলা হয়। অর্থাৎ প্রথা হচ্ছে সমাজ জীবন থেকে উদ্ভূত নিয়মকানুন, যা ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করে। সম্ভবত প্রথা পরিবার, সম্প্রদায় ও উপজাতির জীবন, শান্তি ও সম্পত্তি রক্ষার তাগিদেই সাধারণ রীতি নীতির ভিত্তিতে গড়ে ওঠে এবং তা মানুষ অভ্যাসের ন্যায় অনুসরণ করে। এই রীতিনীতি দ্বারা সকল প্রকার বিবাদ ও সমস্যার সমাধান করা হতো। একটি তৃণক্ষেত্রের ওপর দিয়ে যেমন করে একটি পায়ে চলা পথ তৈরী হয় তেমনি করে প্রথার উৎপত্তি হয়। রাষ্ট্র প্রণীত কোনো আইন প্রথাকে অস্বীকার করলে বা তার বিরুদ্ধাচরণ করলে সেই আইন বলবৎ করা যায় না। ব্রিটেনের অলিখিত সংবিধানের অধিকাংশ বিধান ও ভারতে হিন্দু ও মুসলমান আইন প্রধানত প্রথাভিত্তিক।

আইনের উৎস ও বিচারকের রায় (Source of Law & Adjudication)

প্রাচীনকালে দলপতি, গোষ্ঠীপতি, রাজা বা সমাজের জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিরা প্রথা ও ধর্মীয় অনুশাসন প্রয়োগ করে বিরোধ নিষ্পত্তির কাজে এগিয়ে আসেন এবং উদ্ভব হয় বিচার ব্যবস্থার। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতি, নতুন জীবন প্রণালী উদ্ভব ও আরো জটিল পরিস্থিতির কারণে প্রথা ও ধর্মের অনুশাসন দ্বারা দ্বন্দ্বের মীমাংসা করা সম্ভব হত না বলে বিচারকরা স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে বিরোধ মীমাংসা করতেন। বিচারকগণের ওই ব্যাখ্যা অনুরূপ মোকদ্দমা মীমাংসার ক্ষেত্রে নজির হিসেবে গণ্য হয়। এটা করতে গিয়ে বিচারকরা সচেতন বা অচেতনভাবে বহু নতুন আইনের জন্ম দেয় বিভিন্নভাবে, যেমন- ক. আইনের নতুন ব্যাখ্যা দিয়ে; খ. আইনের ত্রুটি-বিচ্যুতি তুলে ধরে; গ. নতুন আইনের প্রয়োজনীয়তা দেখিয়ে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিরা আইনসভা প্রণীত যেকোনো আইনকে সংবিধানের নির্দেশ কিংবা নীতির সাথে সঙ্গতিহীন হলে স্ববিবেচনা প্রসূত ক্ষমতা বলে (Due Process Law) বাতিল করে দিতে পারে। এরূপ ক্ষেত্রে অবশ্য প্রচলিত আইনের সাথে সঙ্গতি রাখতে হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিচার বিভাগের 'মারবারী বনাম মেডিসন', মামলার রায় উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করছে। এসকল নজিরকে বিচারক সৃষ্ট আইন (Judge Made Law) বলে। ভারতবর্ষের সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতিরা আইন সংবিধানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণভাবে রচিত কি না তা বিচার করে দেখতে পারে।

আইনের উৎস ও বিজ্ঞানসম্মত আলোচনা (Source of Law & Scientific Discussion)

আইনশাস্ত্রের ওপর অনেক পণ্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন পুস্তক বা লিখনীতে বিভিন্ন যুক্তিতর্ক, টীকা, ভাষ্য, প্রভৃতি মাধ্যমে তাঁরা আইনের প্রকৃত উদ্দেশের কথা প্রচার করেন।আইনবিদ ও সাধারণ মানুষের এই বিশেষজ্ঞ ও ভাষ্যকারদের বিচক্ষণতা ও পাণ্ডিত্যের প্রতি প্রভূত শ্রদ্ধা থাকে। এক্ষেত্রে উদহারণ হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

স্টোরি (Story), ও কেন্ট (Kent), ইংল্যান্ডের ব্লাকস্টোন (Blackstone), কোক্ (Coke), হল (Hale), প্রমুখ আইনবিদদের অভিমতকে আইনের উৎস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করা হয়। ভারতের রাসবিহারী ঘোষের 'বন্ধকী সম্পত্তি' বিষয়ক পুস্তক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্তমূলক প্রভাব বিস্তার করে। বাংলাদেশে গাজী শামসুর রহমানের আইন সংক্রান্ত রচনা অত্যন্ত মূল্যবান।

আইনের শাসন (Rule of Law)

আইনের শাসনের অর্থ হলো সংবিধান ও আইনের ধারায় যা বলা আছে সে অনুসারে শাসনব্যবস্থা পরিচালিত হবে। অবশ্য সব নিয়ম আইন নয় কিন্তু সব নিয়ম মেনে না চললে আইনের শাসন কার্যকর হবে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সামরিক শাসনামলে যেসব বিধান দ্বারা রাষ্ট্র পরিচালিত হয় সে সব হলো সামারিক আইন এবং এর আওতায় আইনের শাসন কার্যকর হতে পারে না। আইন হবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত সংসদ কর্তৃক পাসকৃত অনুমোদনযোগ্য নিয়ম-কানুন এবং এর দ্বারা সাধারণের কল্যাণ সাধিত হবে। এ ধরনের আইন অনুসারে যখন সঠিকপথে রাষ্ট্র পরিচালিত হবে, তখন তাকে আমরা আইনের শাসন বলব। আইনহীন সমাজে মানুষ বসবাস করতে পারে না। তবে আইনের শাসন না থাকলে সে আইন না থাকার মতো। ধরে নিলাম শাসনতন্ত্রে সকলের মতো প্রকাশের স্বাধীনতা আছে। কিন্তু সরকার সমর্থিত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি এ অধিকার হরণ করে এবং আইনের ধারায় কোনো বিচার পাওয়া না যায়, তবে আইনের শাসন নেই বলে পরিগণিত হবে। আর যদি এ অধিকার সঠিক অর্থে বাস্তবায়িত হয়,তাহলে আইনের শাসন আছে বলে গণ্য হবে। আইনের শাসনের অর্থ হলো আইন অনুসারেই পরিচালিত হওয়া।

আইন সবার উপরে একথা যেকোনো সংবিধানই ঘোষণা করে থাকুক, তার সার্থক রূপায়ণ নির্ভর করে সর্বস্তরের নাগরিকের ওপর। সেজন্যে প্রয়োজন বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, বিশেষ করে যদি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোনো আইন প্রয়োগের প্রয়োজন ঘটে। অবশ্য ক্ষমতার পৃথকীকরণের ওপর সেটা নির্ভর করে। সব কিছু সত্ত্বেও শেষাবধি সেই রাষ্ট্রই বিচারপতি নিয়োগ ও ছাঁটাই এর কাজ নিয়ন্ত্রণ করে। আর রাষ্ট্রই আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করে। দেশের স্থিতাবস্থা নষ্ট হয়ে গেলে, আইন ও শৃঙ্খলা ভেঙে পড়লে, সন্ত্রাসবাদীদের দাপট দেখা দিলে আইনের শাসন আর থাকে না। সেজন্যে প্রতিরোধক কিছু আইন বিধিবদ্ধ হয়। তাতে স্বভাবতই সন্ত্রাসবাদী ও অনুরূপ আসামিদের দমনের সময়ে মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হয়। সজন্যে কী ব্যক্তিমানুষ, কী সরকার সকলকেই আইনের প্রক্রিয়ার ওপর আনুগত্য রক্ষা করতে হবে। একই আইনের প্রয়োগ-পরিধির মধ্যে সকলের থাকা চাই। আইনের শাসনের মূল কথা হলো: ১. কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের ইচ্ছা অনিচ্ছার দ্বারা নয় বরং সুনির্দিষ্ট ও ধারাবাহিক আইনের দ্বারাই রাষ্ট্র ও নাগরিকদের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হবে; ২. আইনের চোখে অবস্থান-নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সমান হবে; ৩. বিচার বিভাগে সম্পূর্ণরূপে

প্রশাসন ও সরকারে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিদের প্রভাবমুক্ত হবে এবং রাষ্ট্রের সকরল কর্মকর্তা ও নাগরিক অবস্থান নির্বিশেষে আদালতের কাছে দায়ী থাকবেন এবং ৪. সংবিধানই জনগণের মৌলিক ও নাগরিক অধিকার সুনিশ্চিত করবে এবং কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীবিশেষের ইচ্ছামাফিক সংবিধান বাতিল, স্থগিত বা পরিবর্তন করা যাবে না।

আকস্মিক বিদ্রোহ (Coup d' Etat)

আকস্মিক বিদ্রোহ শব্দটির অর্থ হলো হিংসা, সংঘর্ষ ও যুদ্ধ। ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা দেশকে প্রত্যক্ষ আচরণে, কথায় অথবা মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতিতে আঘাত, উৎখাত কিংবা অবমাননার উদ্দেশে কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, অথবা দেশের আক্রমণসূচক ব্যবহার। বিষয়টি মনস্তাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের অনুশীলন ও গবেষণার ক্ষেত্র। আগ্রাসন প্রবৃত্তিকে স্বভাবগত হতাশাব্যঞ্জক বলে মনে করেন ফ্রয়েড ও অন্যান্য মনস্তাত্ত্বিকেরা। সচরাচর আগ্রাসী অভিসন্ধির কথা স্বীকার করে না আগ্রাসনকারীরা; তারা প্রকৃত অথবা সম্ভাব্য আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সাফাই গায়। অধিকাংশ সময় আইন-শৃঙ্খলা ও সভ্যতা বজায় রাখার দোহাই দিয়ে থাকে। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার প্রতিবেশী কয়েকটি দেশের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তিতে (৩ জুলাই, ১৯৩৩) আগ্রাসনের সংজ্ঞা নিরূপিত হয়: যে কোনো ঘটনায় যেখানে ১. কোনো রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা; ২. অন্য রাষ্ট্রের এলাকায় যুদ্ধ ঘোষণা না করে হানা দেওয়া; ৩. যুদ্ধ ঘোষণা না করে কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ড কিংবা নৌ, বিমান অথবা স্থলবাহিনীর ওপর আক্রমণ ; ৪. অপর কোনো রাষ্ট্রের বন্দর অথবা উপকূল অবরোধ; ৫. অন্য এক রাষ্ট্রের ভূখণ্ড থেকে অপর কোনো রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে সশস্ত্র জঙ্গি গোষ্ঠীকে মদদ দেওয়া অথবা অনুপ্রবেশ করা এবং ওই ধরনের গোষ্ঠীকে সাহায্য অথবা আশ্রয়দান থেকে বিরত থাকার দাবি প্রত্যাখ্যান করা। অনুরূপ সংজ্ঞা ১৯৩৩ খ্রি অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে গৃহীত হয়। রাষ্ট্রসংঘের সনদে আগ্রাসন সম্পর্কে কিছু বলা হয়নি। প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এবং সামরক অবরোধ, শাস্তি (sanction) প্রভৃতির মাধ্যমে আগ্রাসন ঘটে। সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্র অনুযায়ী রাষ্ট্রসংঘ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সামরিক বাহিনীর অভিযান ছাড়াও গেরিলা যুদ্ধের মধ্য দিয়েও আগ্রাসী আচরণ ফুটে ওঠে। আগ্রাসনকে প্রমাণ করা, বিশেষ করে পরোক্ষ আগ্রাসন চিহ্নিত করা একটি জটিল ব্যাপার।

আকাশবাণী (Akash Bani)

ভারতের সবচেয়ে শক্তিশালী রেডিও সার্ভিসের নাম 'আকাশবানী'। রবীন্দ্রনাথের 'আকাশবাণী' শিরোনামের একটি কবিতা থেকে এই নামটি গ্রহণ করা হয়েছে। কবিতার একটি পঙক্তি ছিল 'ধরার আঙিনা হতে উঠিল আকশাবাণী'। 'আকাশবাণী' কবিতাটি প্রথম 'অল ইন্ডিয়া রেডিও' নামের পরিবর্তে 'আকাশবাণী' নামকরণের সিদ্ধান্ত নেন। এর আগে আরো বেশ কয়েক বার এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তনা করা হয়েছিল।

সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উদ্যোগে ১৯২৭ সালের ২৩ জুলাই বোম্বাইয়ে (মুম্বাই) ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানির নামে ভারতবর্ষে প্রথম বেতার অনুষ্ঠান প্রচারকেন্দ্র স্থাপিত হয়। এটি ছিল সম্পূর্ণ ব্যবসায়িক উদ্যোগে বোম্বাইয়ের এফএম চিনয় নামে একটি পারসি প্রতিষ্ঠানের আরেকটি সহযোগী সংগঠন ছিল ইন্ডিয়ান ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। এর মাসখানেক পরে অর্থাৎ ১৯২৭ সালের ২৬ আগস্ট কলকাতায় ১ নং গার্স্টিন প্লেসে এর অন্য একটি স্টেশন খোলা হয়। কিন্তু কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হতে হতে ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে দেউলিয়া হয়ে যায়। তখন বড়লাটের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য স্যার ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের প্রচেষ্টায় সরকার এক বছরের জন্য পরীক্ষামূলকভাবে বেতার প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনার দায়িত্বভার গ্রহণ করে। সেই সঙ্গে প্রতিষ্ঠানটির পূর্বনামও পরিবর্তন করা হয়। নাম রাখা হয় 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস'। এক বছর পর আর্থিক অবস্থার আরো অবনতি ঘটলে ১৯৩১ সালে সরকার 'ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিস' বন্ধ করে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু জনসাধারণের আন্দোলনের মুখে সরকার এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে।

এর কিছুদিন পর ১৯৩৪ সালে লায়নেল ফিল্ডেন নামে ব্রিটিশ বেতারের এক দায়িত্বশীল কর্মীকে এনে ভারতীয় বেতারব্যবস্থার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৯৩৫ সালের ৮ জুন ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং সার্ভিসের নাম বদল করে 'আল ইন্ডিয়া রেডিও' রাখা হয়।

১৯৬৩ সাল পর্যন্ত দিল্লি, বোম্বাই, মাদ্রাজ ও কলকাতা ছাড়াও প্রায় প্রতিটি রাজ্যে মাঝারি ও ছোটখাটো বহু স্টেশন স্থাপিত হয়। বর্তমানে আকাশবানীর ১৮৫টি প্রচার সম্প্রসারণ কেন্দ্র, ২৯৩টি ট্রান্সমিটার এবং ৩০টি বিবিধ ভারতী কেন্দ্র আছে। ট্রান্সমিটারের সংখ্যা এই রকম ১৪১টি এমডব্লিউ, ৪৩টি শর্ট ওয়েব ও ৭৩টি এফএম ট্রান্সমিটার। আকাশবাণী ২৪টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। এর মধ্যে ৮টি ভারতীয় ভাষা, ইংরেজি ও ১৫টি বিদেশি ভাষা আছে।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা (Agartala Conspiracy Case)

১৯৬৬ সালের ৬ দফা আন্দোরকে দমননীতির মাধ্যমে নস্যাৎ করতে না পেরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী এক ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। সরকার ১৯৬৮ সালের জানুয়ারি মাসে শেখ মুজিবকে প্রধান আসামি করে ৩৫ জন সামরিক ও বেসামরিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে রাষ্ট্রদোহিতার মামলা দায়ের করে। তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয় যে, তারা ভারতের সহায়তায় সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যম পাকিস্তান রাষ্ট্র থেকে পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য ভারতের আগরতলায় ষড়যন্ত্র করেছিল। এ মামলার বিচারকার্যের জন্য একটি স্পেশাল ট্রাইব্যুনাল গঠন করা হয়। আসামিরা নিজেদের নির্দোষ দাবি করলে স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য তাদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার প্রতিবাদের সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানের

আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলনের পরিণত হয়। এ মামলার অন্যতম আসমি সার্জেন্ট জহুরুল হক ঢাকা সেনানিবাসে পুলিশের গুলিতে শহীদ হলে আন্দোলন আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। এ আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন এগার দফার ভিত্তিতে গঠিত সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ। অবশেষে ছাত্র আন্দোলন ও গণআন্দোনের মুখে সরকার মামলটি প্রত্যাহার করে।

আগ্রার তাজমহল (Tazmohol of Agra)

পৃথিবীর অন্যতম আশ্চর্য স্মৃতিসৌধ হলো আগ্রার তাজমহল। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মোঘল সম্রাট শাহজাহান ভারতবর্ষের শাসনকর্তা ছিলেন। ১৬১২ সালো তিনি আরজুমান্দ বানু বেগম নামে এক সুন্দরী ও বুদ্ধিমতী তরুণীকে বিয়ে করেন। স্রমাট পত্নীর নতুন নাম দেন মমতাজ মহলে। শোনা যায়, একদা সম্রাজ্ঞী তাজমহলের অনুরূপ একটি ভবন স্বপ্নে দেখেন। স্বপ্নের কথা তিনি সম্রাটকে খুলে বলেন। তিনি সম্রাটকে অনুরোধ করেন, তাঁর মৃত্যুর পর যেন স্বপ্নে দেখা ওই সৌধের অনুরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মান করা হয়।

১৬৩১ সালে বারহানপুর শহরে সন্তান হওয়ার সময় মমতাজ মহল মৃত্যুবরণ করেন। পত্নীর মৃত্যুতে সম্রাট এতই ভেঙে পড়েন যে, তিনি সিংহাসন ছেড়ে দিতে পর্যন্ত উদ্যত হন। শেষ পর্যন্ত পত্নীর স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য এমন একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেন যা কখনো কোথাও নির্মিত হয়নি। ভারতের শ্রেষ্ঠ শিল্পী ও স্থপতিদের ডেকে আনা হয় সম্রাটের দরবারে। আরব, পারস্য, তুরস্ক এবং মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশ থেকেও আসেন সেরা শিল্পী ও স্থপতিরা। ১৬৩২ সালে নির্বাচিত নকশা অনুযায়ী তাজমহলের নির্মাণকাজ শুরু হয়। এটি নির্মাণে নিযুক্ত করা হয় বিশ হাজারেরও বেশি শ্রমিক। অর এর নির্মাণ কাজ শেষ হতে সময় লাগে বিশ বছর। এতে ব্যয় হয় ৪ কোটি টাকা।

তাজমহলের চত্বরটি আয়তাকার। এর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ যথাক্রমে ৬৩৪ ও ৩৩৪ গজ। বাইশ ফুট উঁচু মার্বেলের পীঠিকার ওপর স্মৃতিসৌধের অবস্থান। তাজমহলের চার কোনে চারটি মিনার। সৌধের উচ্চতা ২০০ ফুট। পুরোটাই শ্বেত পাথরের তৈরি। মেঝে তৈরিতে ব্যবহৃত হয়েছে শ্বেত পাথর ছাড়াও ১২ রকম মূল্যবান পাথর ও মণি-মাণিক্য। সৌধের দেওয়ালে উৎকীর্ণ আছে পবিত্র কুরআনের বাণী। তাজমহল নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী আনা হয়েছিল ভারত ছাড়াও আরব, মিশর, তিব্বতসহ আরো বহু দেশ থেকে। তাজমহলের নিচের অংশে রয়েছে বেগম মমতাজ মহল ও সম্রাট শাহজাহানের কবর। বহুমূল্য রত্নরাজিতে সে সমাধি অলকৃত। সম্রাট শাহাজাহান নিজের জন্য যমুনার অপর তীরে কালো মার্বেল পাথরে তাজমহলের অনুরূপ একটি স্মৃতিসৌধ নির্মাণ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু তার আগেই তিনি নিজের পুত্র আওরঙ্গজেবের হাতে বন্দী হন।

তাজমহল পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দর্শনীয় স্থানের অন্যতম। বিভিন্ন দেশের হাজার হাজার পর্যটক এই অপরূপ সৌন্দর্যমণ্ডিত স্মৃতিসৌধ দেখতে যান। চাঁদের আলোর তাজের সৌন্দর্য উপভোগ যে কোনো ভ্রমণকারীর কাছেই এক অবিস্মরণীয় অভিজ্ঞতা।

আগ্রাসন (Aggression)

সাধারণত আগ্রাসন বলতে এক রাষ্ট্র কর্তৃক অপর কোনো রাষ্ট্রকে আক্রমণ বোঝায়। এই আক্রমণ সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামরিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশে হয়ে থাকে। তবে, আগ্রাসনকারী রাষ্ট্র দাবি করে যে তারা আগ্রাসনকারী নয়, বরং আত্মরক্ষার্থে কিংবা গণতান্ত্রিক বা সমাজতান্ত্রিক বা অপর কোনো আদর্শরক্ষার স্বার্থে অথবা সভ্যতা ও স্বকীয়তা রক্ষার স্বার্থেই আক্রমণ করতে বাধ্য হয়। ১৯৩৩ সালের ৩ জুলাই সোভিয়েত ইউনিয়ন, তুরস্ক, রুমানিয়া, পোল্যান্ড, ইরান, লাটভিয়া, এস্টোনিয়া ও আফগানিস্তান এক কনভেনশনে মিলিত হয়ে আগ্রাসনের সংজ্ঞা নির্ণয় করার চেষ্টা করেন। আগ্রাসন হবে তখনই: ১. এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-ঘোষণা; ২. যুদ্ধ-ঘোষণা ছাড়া রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক অপর রাষ্ট্রে আক্রমণ; ৩. যুদ্ধ-ঘোষণা ব্যতিরেকে এক রাষ্ট্রের সশস্ত্রবাহিনী কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের সেনাবাহিনী, বিমানবাহিনী বা নৌবাহিনীর ওপর আক্রমণ; ৪. অন্য রাষ্ট্রের সমুদ্রগামী বন্দরে অবরোধ (Blockade) সৃষ্টি এবং ৫. অপর রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে গঠিত বেসরকারি বাহিনীকে সহায়তা বা আশ্রয়দান করে। ১৯৩৩ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে নিরাপত্তার প্রশ্নে গঠিত কমিটিও আগ্রাসনের প্রায় একই প্রকার সংজ্ঞা প্রদান করে। এই সংজ্ঞা মোটামুটি সর্বজনগৃহীত। আগ্রাসনের সর্বশেষ পরিণতি হলো যুদ্ধ।

আচরণবাদ (Behavioralism)

আধুনিককালে রাজনীতি বিজ্ঞানের ছাত্রগণ রাজনীতি অধ্যয়নে কতগুলো নতুন তত্ত্ব ও পদ্ধতি উদ্ভাবন করেন। এতে এই শাস্ত্র অধ্যায়নের এক নব দিগন্তের সূচনা হয়। এই আধুনিক তত্ত্বগুলো যথা কার্যভিত্তিক পদ্ধতি, ব্যবস্থা বিশ্লেষণতত্ত্ব, যোগাযোগ তত্ত্ব, সিদ্ধান্তগ্রহণ তত্ত্ব ইত্যাদি। কোনো রাজনীতিক কাঠামোর গঠনগত নিয়মিত দিকের সাথে এটার পরিবর্তন আনয়নকারী বিভিন্নদিক ও কার্যাবলী আলোচনা করে এর প্রকৃত পরিচয় উন্মুক্ত করে। বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যবস্থার সরকার ও রাজনীতি অধ্যয়নে এই সকল মতবাদ আচরণবাদ নামে অভিহিত। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আচরণবাদের ব্যাপক প্রসারতা লাভ করলেও এর পূর্বে তা উদ্ভব হয়েছিল। প্রথমে জে.বি ওয়াটসন মনোবিজ্ঞানে এ পদ্ধতি ব্যবহার করেন। রাজনীতি বিশ্লেষণে এ তত্ত্বটির প্রথম প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায় ১৯২০ ও ১৯৩০ জনকে চার্লস মেরিয়াম (Charles Merriam) এবং হ্যারল্ড ল্যাসওয়েল (Harold Lasswell) এর লেখনীতে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে আচরণবাদ অতি গুরুত্বপূর্ণ ও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একই সাথে এটা একটা বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত আন্দোলনে রূপ নেয়। এই কারণে বুদ্ধিবৃত্তি সংক্রান্ত

আন্দোলন ও রাজনীতি অধ্যয়নের আধুনিক তত্ত্ব ও পদ্ধতিকে সমষ্টিগতভাবে আচরণবাদ বলে। আচরণবাদের জন্মভূমি হিসেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কথা বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চার্লস মেরিয়ামের নেতৃত্বে একটি পাঠচক্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং এই পাঠচক্র আচরণবাদী আন্দোলনের পীঠস্থান। তবে আচরণবাদে বিকাশের ক্ষেত্রে The Social Science Research Council এর Committee on Comparative Politics গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। G. A. Almond, David Eaton, David E. Apter, Sidney Verva, Robert Dahi প্রমূখ এর অবদান বেশি। বস্তুত রাজনৈতিক সমাজের সভ্যগণের আচরণের ওপর ভিত্তি করে যখন কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা বা এর কোনো প্রতিষ্ঠান, এর সরকারের প্রকৃতি ও স্থিতিশীলতা, পরিবর্তন বা উন্নয়ন প্রভৃতি বিশ্লেষণ ও অনুধাবণ করা হয়, তখন তাকে আচরণবাদ বলা হয়। আচরণবাদে ব্যক্তির আচরণই মূখ্য বিষয়। ব্যক্তির কার্যকলাপ, অনুভূতি, আশা অকাঙ্খা, ইচ্ছা, পছন্দ প্রভৃতি তার আচরণের অর্ন্তভূক্ত। বস্তুত কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় তার সরকারের প্রকৃত পরিচয় লাভ তখনই সম্ভব হয়, যখন আমরা সরকারের অর্ন্তভূক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের আচরণের পরিচয় লাভ করতে পারি।

আচেহ (Acheo)

আচেহ হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার একটি প্রদেশ যা উত্তর সুমাত্রার একটি দ্বীপ। এর রাজধানীর নাম বান্দা আচেহ। তেল, গ্যাস, তামা ও রাবারসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে পরিপূর্ণ এ প্রদেশ। ইন্দোনেশিয়ার মোট জাতীয় উৎপাদনের শতকরা ৩০ ভাগ আসে আচেহ প্রদেশের তরল গ্যাস থেকে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ প্রদেশটির জনগণ দরিদ্র। এখানকার জনগোষ্ঠী অনেকটা কট্টোরপন্থী মুসলমান। প্রদেশটি প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট সূকর্ণোর শাসনামল থেকে "বিশেষ অঞ্চল (ঝঢ়বপরধষ তড়হব)"-এর মর্যাদা ভোগ করে আসছে। এ সংগ্রাম পরিচালনা করছে 'ফ্রি আচেহ মুভমেন্ট' নামক সংগঠন। সূহার্তোর পদত্যাগের পর আচেহ প্রদেশের জনগণ আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের জন্য বিদ্রোহী হয়ে ওঠে এবং এ বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের জন্য ১৯৯৯ সালের ৪ ডিসেম্বর স্বাধীনতা ঘোষণার হুমকি দেয়। ইন্দেনেশিয়ার সরকার স্বাধীনতার দাবি প্রত্যাখান করে। তবে সেখানে স্বায়ত্বশাসন প্রদানের বিষয়ে গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারে নমনীয় মনোভাব পোষণ করে।

আজটেক সভ্যতা (*Aztec* Civilization)

মেক্সিকো (Mexico) উপত্যকার উত্তর দিকে অবস্থিত 'আজতলন' নামক স্থান থেকে আজটেকরা খ্রিস্ট্রীয় বারো শতকের দিকে বর্তমান মেক্সিকো অঞ্চলে এসে বসতি গড়ে তোলে। আজতলন থেকে এদের নাম হয়েছে অজটেক (Aztec) বা আজতেক। প্রথম দিকে তারা স্থানীয় অধিবাসীদের অধীন ছিল, পরে তোরা শতকের দিকে তারা সুবিখ্যাত 'তেনোচালিন' নগরী প্রতিষ্ঠা করে। মধ্য পনেরো শতকের দিকে আজটেকরা

বিশাল সম্রাজ্যের অধিকারী হয়। ১৫১৯ সালে স্পেনদেশিয় হেরানান্দো কোর্তেজ এটি আক্রমণ করলে করভারে জর্জরিত প্রজারা তাদের সহায়তা করে। ১৫২০ সালে আজটে করা বিদ্রোহ করে, কিন্তু কোর্তেজ তা কঠোর হস্তে দমন করে। স্পেনীয়রা তদের মন্দির ও ভবনাদিসহ তেনোচতিৎলন শহর ধ্বংস করে এ কাজেই তৈরি করে আধুনিক মেক্সিকো নগর। নহুতঅতল নামক ভাষায় আজকেটরা কথা বলতো। এদের লিখন পদ্ধতি ছিল চিত্রলিপি। অর্থনীতি ছিল কৃষিভিত্তিক, তবে ব্যবসা-বাণিজ্যেও এরা পারঙ্গম ছিল। এরা ছিল যুদ্ধপ্রিয় জাতি।

আজ্ঞা (Mandate)

সাধারণত আজ্ঞা হলো কোনো কিছু করা বা না করা সম্পর্কে আদেশ বা অনুমতি। এটি একটি রাজনৈতিক শব্দ। রাজনৈতিক নানা ধরনের ক্রিয়াকর্মে শব্দটি ব্যবহৃত হতে পারে। মূলত নির্বাচনের সাথে শব্দটি সম্পর্কিত। নির্বাচনে অবতীর্ণ হয়ে কোনো দল যখন কিছু প্রতিশ্রুতি দেয় এবং সে ভিত্তিতে জনগণ যখন তাদের নির্বাচিত করে, ওই সংশ্লিষ্ট কাজ করার পেছনে ভোটদাতাদের সঙ্গে চুক্তি পূরণ তথা আদেশ পালনের দায়িত্ব সংক্রান্ত অঙ্গীকারই ম্যান্ডেট। অর্থাৎ ক্ষমতাসীন দলের জনগণের আজ্ঞাধীনে থাকতে হয়। জনসাধারণের আজ্ঞা পালনের ওপর দল ও সরকারের বৈধতা নির্ভর করে। এমনকি পরবর্তীতে ক্ষমতায় আসার বিষয়টিও আজ্ঞার সাথে সম্পর্কিত। গণতন্ত্রে বৈধতার উৎস হলো জনগণের সম্মতি। আজ্ঞা অমান্যকারীদের জনগণ বিশ্বাস করতে চায় না।

আজ্ঞা সূত্রে নানা প্রশ্ন ওঠে। নির্বাচনে বহুরকমের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। তাই ক্ষমতাসীন দলের কাছে বিভিন্ন ভোটদাতার বিভিন্ন প্রত্যাশা থাকে। বহু ভোটদাতা প্রতিশ্রুতি ব্যতিরেকেই স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ক্ষমতাসীন দলকে ভোট দেয়, সেক্ষেত্রে তাদের কাছে সেই দলের আজ্ঞা পালনের প্রকৃতি ও পরিমাণ কী হবে? নির্বাচনের পর সমাজিক ও রাজনৈতিক কর্মসূচির প্রয়োজন দেখা দিতে পারে। তখন নতুন প্রেক্ষাপেট আজ্ঞা নেবার প্রয়োজন সম্পর্কে প্রশ্ন দেখা দেয়। আবার অন্যদিকে আজ্ঞা প্রত্যয়টির অপর একটি প্রয়োগ ইতিহাস-বিখ্যাত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি ও তুরস্কের কয়েকটি ভূখণ্ড ও উপনিবেশের প্রশাসন সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের একটি বিভাগ কর্তৃক অধিগৃহীত হয়। দ্বিতীয় বিশযুদ্ধের পরও ইতালি ও জাপানের কয়েকটি ভূখণ্ডের প্রশাসন অনুরূপভাবে জাতিসংঘের অছিপরিষদের ওপর ন্যস্ত হয়। কাজেই বলা যায় আজ্ঞা শব্দটি বিভন্ন অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে।

আঞ্চলিক উত্তেজনা (Regional Tension)

পৃথিবীর কোনো একটি অঞ্চলের দুই বা ততোধিক দেশের মধ্যে সৃষ্ট তীব্র বিরোধ বা উত্তেজনাকেই বলে আঞ্চলিক উত্তেজনা (Regional Tension)। অভিযোগ করা হয় যে, বৃহৎ শক্তিগুলো তাদের প্রভাব বলয় বজায় রক্ষার্থে, প্রতিপক্ষকে হীনবল করার স্বার্থে, বাজার সংরক্ষণের স্বার্থে, অস্ত্রবিক্রয়ের স্বার্থে কিংবা অনুরূপ অপর কোনো স্বার্থে

পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে উসকানি প্রদান, দালাল সৃষ্টি বা কূটনৈতিক চালের মাধ্যমে এরূপ উত্তেজনা সৃষ্টি করে থাকে। কিংবা সৃষ্ট উত্তেজনার ইন্ধন যোগায়। অবশ্য, পরাশক্তির উসকানি বা ভূমিকা ব্যতীতও আঞ্চলিক উত্তেজনা সৃষ্টি হতে পারে।

আঞ্চলিক সহযোগিতা (Regional Co-operation)

বিশ্বের কোনো একটা অঞ্চলের সাধারণ স্বার্থের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা দুই বা ততোধিক দেশসমূহের মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রতিরক্ষামূলক বা সার্বিক পারস্পরিক সহযোগিতাকে আঞ্চলিক সহযোগিতা বলা হয়। আঞ্চলিক সহযোগিতার ধারণা তেমন কোনো নতুন ধারণা নয়। কারণ আঞ্চলিক সহযোগিতা কোনো না কোনো সাংগঠনিক কাঠামোর মাধ্যমে বাস্তবরূপ লাভ করে। ইউরোপীয় দেশগুলোর সমন্বয়ে EEC দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার 'আসিয়ান', দক্ষিণ এশিয়ার 'সার্ক' ইত্যাদি আঞ্চলিক সহযোগিতার উদাহরণ।

আটত্রিশতম অক্ষরেখা (38^{th} Parallel)

৩৮তম অক্ষরেখা উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়ার মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত কোরিয়া একক রাষ্ট্র হিসেবে জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন ছিলো। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপান মিত্রশক্তির নিকট পরাজিত হলে সোভিয়েত ও মার্কিন বাহিনী কোরিয়া দখল করে। উত্তর কোরিয়ার বিশাল অংশ দখল করে সোভিয়েত রেড আর্মি এবং দক্ষিণ কোরিয়ার অংশ দখল করে মার্কিন সেনাবাহিনী। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে কোরিয়ার ভবিষ্যত নির্ধারণে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। দুই পরাশক্তি তাদের নিয়ন্ত্রণাধীন অংশে সরকার গঠন করতে উদ্যোগ নেয়। এ অবস্থায় কোরিয়ার নিয়ন্ত্রণ নিয়ে দুই দুই পরাশক্তির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলে কোরিয়াকে ৩৮ অক্ষরেখা বরাবর সমান্তরাল করে বিভক্ত করা হয়। ১৯৫০ সালে এই বিভক্তি রেখা অতিক্রম করাকে কেন্দ্র করে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। বর্তমানে এই অক্ষরেখার মাধ্যমে বিভক্ত উত্তর ও দক্ষিণ কোরিয়া দু'টি স্বাধীন রাষ্ট্র।

আটলান্টিক চার্টার (Atlantic Charter)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নিউ ফাউন্ডল্যান্ডের আর্জেন্টিয়া উপসাগরের মার্কিন ক্রুজার 'অগস্টা' এবং ব্রিটিশ যুদ্ধজাহাজ 'প্রিন্স অব ওয়েলস'-এ ১৯৪১ সালের ৯-১২ আগস্ট অনুষ্ঠিত বৈঠকে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল কতিপয় মৌলনীতি সম্পর্কে মতৈক্যে পৌঁছে যে বিবৃতি প্রদান করেন, সেটাই আটলান্টিক সনদ নামে খ্যাত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্তরাজ্যের মধ্যে সম্পাদিত একটি চুক্তি বা সনদ। মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট এবং ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিল

এতে স্বাক্ষর করেন। ১৯৪১ সালের ৯ আগস্ট এ সনদ স্বাক্ষরিত হয়। আটলান্টিক চার্টারে যুদ্ধের পর উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে মোকাবিলা করা হবে সে সম্পর্কে মৌলিক নীতিমালা নির্দিষ্ট হয়। মিত্র শক্তির হাতে পরাজিত হবার পর আগ্রাসী শক্তির প্রতি কী রকম আচরণ করা হবে, বিভিন্ন রাজ্যের ওপর অধিকার, সমুদ্রে চলাচল, বিশ্ববাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক, অধিকৃত অঞ্চলগুলোতে সরকার ব্যবস্থা কীভাবে পরিচালিত হবে ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

আটলান্টিক চার্টারে বলা হয়ঃ ক. এককভাবে কোনো শক্তিই কোনো রাজ্যে বা রাজ্যাংশ দখল করতে পারবে না, খ. সংশ্লিষ্ট জনগণের সম্মতি ছাড়া কোনো রাষ্ট্রের সীমানা পরিবর্তন, পরিবর্ধন করা যাবে না, গ. প্রত্যেক জনগোষ্ঠীকে তাদের সরকার পদ্ধতি পছন্দ করার এবং স্বশাসনের অধিকার দেয়া হবে, ঘ. বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ শিথিল হবে এবং সকল জাতি সমভাবে কাঁচামাল পাওয়ার ধিকার পাবেক, ঙ. যুদ্ধের পর জাতিগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে পূর্ণ সহযোগিতা গড়ে তুলতে হবে এবং শ্রমিকদের মান উন্নয়ন ও সামাজিক নিরাপত্তা দেয়া হবে, চ. ভবিষ্যতের শান্তি-অবস্থা অবশ্যই মানুষকে অভাব ও ভীতি থেকে মুক্তি দেবে, ছ. সকলের সমুদ্রে চলাচলের অধিকার থাকবে এবং জ. আগ্রাসী জাতিগুলোকে নিরস্ত্র করা হবে ও সামগ্রিক একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা হবে। ১৯৪১ সালের ১৫ আগস্ট তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নসহ মিত্র শক্তিভুক্ত সকল দেশ এতে সই করে।

আটলান্টিক চার্টার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মিত্রশক্তির পক্ষে ইতিবাচক প্রভাব ফেলে। যুদ্ধের পর আটলান্টিক চার্টার অনুযায়ী মিত্রশক্তির মধ্যে বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর সুসম্পর্ক গড়ে উঠে। অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্তরাজ্যসহ পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। এদিক থেকে আটলান্টিক চার্টারের প্রভাব গভীর ও ব্যাপক।

আটলান্টিক মহাসাগর (*Atlantic* Ocean)

পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম মহাসগার এবং এই মহাসগারের দখলে আছে। পৃথিবীর ২০ শতাংশ জায়গা। এর আয়তন ৮,১৬,৬২,৭০০ বর্গকিলোমিটার বা ৩,১৫, ২৯, ৯৬৮ বর্গমাইল এবং গড় গভীরতা ১,৮৩০ মিটারেরও বেশি। পুয়ের্তো রিকোর অদূরে ন্যারয়ার্স (Nares) রে ৮,৬৪৮ মিটার ২৮,৩৭৩ ফুট গভীরতাই আটিলান্টিকের সর্বাধিক গভীরতা। আটলান্টিক মহাসাগরের পূর্বদিকে ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা মহাদেশ এবং পশ্চিম দিকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশে। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে আমেরিকা মহাদেশ। এর উত্তর ও দক্ষিণ দিকে রয়েছে আর্কটিক ও আন্টার্কটিক সাগর। আটলান্টিক মহাসাগর ধেকে ইংরেজি S এর মতো মধ্যে আমেরিকার পানামা খার একে প্রশান্ত মহাসাগরের সঙ্গে এবং ভূম্যসাগর দিকে দিয়ে সুয়েজ খাল, লোহিত সাগর ও আরব সাগর একে ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করছে। উত্তর-দক্ষিণে

ভারত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত করেছে। উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত এই বিশাল মহাসাগরটি বিষুবরেখার উত্তরে বিস্তৃত এই বিশাল মহাসাগরটি বিষুরেখার উত্তর অংশ উত্তর আটলান্টিক মাহাসগার এবং দক্ষিণের অংশ দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগর নামে পরিচিত। এই দুই আটলান্টিকরে বৈশিষ্ট্য আলাদা।

উত্তর আটলান্টিকের দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি এবং এর উপকূলে প্রচুর খাড়ি রয়েছে। এখানকার দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জগুলো হলো আইসল্যান্ডের ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ বাহামা, কিউবা, হাইতি, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ বার্বাডোস, টোবাগো, মার্গারিটা। দক্ষিণ আটলান্টিকের উপকূল তুলানমূলকভাবে মসৃণ। এখানে সেন্ট হেলেনা, ত্রিস্তান দা কুনহা, দক্ষিণ জর্জিয়া, ফকল্যান্ড, দক্ষিণ স্যান্ডউইচ, ইত্যাদি দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। আটলান্টিক মহাসাগরের বিভিন্ন অংশে উষ্ণ এবং শীতল স্রোতের প্রভাব লক্ষণীয়। উত্তর আটলান্টিকের গ্রিনল্যান্ড শীতল স্রোত ও লাব্রাডার শীতল স্রোতের সঙ্গে মেক্সিকো (Maxico) উপসাগর থেকে আগত উষ্ণ সমুদ্রস্রোতের মিলনের ফলে নরওয়ে ও নিউজিল্যান্ড উপকূলে প্রচুর মাছ পওয়া যায়। পৃথিবীর বৃহৎ মৎস্যশিকার ক্ষেত্র ডগার ব্যাংক (Dogger Bank) এখানেই অবস্থিতি। বিভিন্ন মাছের মধ্যে হেরিং, কড, ম্যাকারেল, ট্রাউট, স্যামন, চিংড়ি হ্যাভক হ্যালিবাট প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রাচীনকালে রোমানরা সম্ভবত আটলাস পর্বতের নামানুসারে এই মহাসাগরের নাম দেন আটলান্টিক। আবার অনেকেই মনে করেন রূপকথার হারানো রাজ্য আটলান্টিস দ্বীপপুঞ্জ থেকে আটলান্টিক মহাসাগর নামকরণ হয়েছে।

আত্ম-নিয়ন্ত্রণ (Self-determination)

একটি ভূখণ্ডের অধিবাসীদের একই ভাষা ও ধর্মের ভিত্তিতে স্বাধীন স্বশাসিত ও সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনের জাতীয় আবেগপ্রসূত অভিলাষ হলো আত্ম-নিয়ন্ত্রণ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর যখন পূর্ব-ইউরোপে অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় এবং অটোম্যান সাম্রাজ্য দুটি ভেঙে ছোট ছোট রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা সনদে এই অভিব্যক্তিকে স্বীকৃতি ও উৎসাহ দান করেন। এতে আফ্রিকার বিভিন্ন জনজাতির মধ্যেও অনুরূপ স্বজাত্যবোধের ভিত্তিতে একটি প্রাক-রাজনৈতিক পশ্চাৎপদ এবং রাষ্ট্রীয় আগেব উৎসারিত হয়। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় আবেগের প্রেক্ষাপট থাকা প্রয়োজন। আত্ম-নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের একটা সুস্পষ্ট সম্পর্ক আছে। দ্বিতীয়-বিশ্বযুদ্ধের পর এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশের জাতীয়তাবাদী আবেগের কাছে পশ্চিমের বিভিন্ন সাম্রাজ্যবাদী দেশ নতি স্বীকার করে। রাষ্ট্রসংঘে ১৯৬৪ খ্রি গৃহীত মানবাধিকার সনদের প্রথম অনুচ্ছেদেই আত্মনিয়ন্ত্রণের অগ্রাধিকারকে উল্লেখ করা হয়েছে। লেনিনের চিন্তাতেও জাতীয় আত্ম-নিয়ন্ত্রণের প্রশ্নটি সবিশেষ গুরুত্ব পায়। তাতে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার ক্ষেত্রে সমস্ত জাতির সমতা ও সার্বভৌমত্বের পন্থা স্বীকৃতি পায়। লেনিনবাদী দৃষ্টিতে আত্ম-নিয়ন্ত্রণের অধিকার ছাড়াও প্রতিটি দেশের বিশেষ কোনো যুক্তরাষ্ট্রে অন্যান্য রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদানের অধিকার

অথবা কোনো যুক্তরাষ্ট্র থেকে বেরিয়ে এসে নিজেদের স্বতন্ত্র জাতীয় রাষ্ট্র গঠনের অধিকার আছে।

জাতীয়তাবাদ হলো জাতির আত্মসচেতনতা। যখন কোনো আত্মসচেতন জাতীয় জনসমাজ পৃথক সত্ত্বায় স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষা করার মানসে নিজস্ব রাষ্ট্রীয় কাঠামোর আওতায় নিজেদের রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার বিকাশ সাধন করতে চায় বা দাবী জানায়, তখন তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার বলা হয়। এ আদর্শে জাগ্রত জনসাধারণের প্রধান অধিকার হলো এর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার। এ অধিকার প্রতিষ্ঠায় নিজস্ব শাসন স্থায়ী করতে পারলে জাতীয় রাষ্ট্রে পরিণত হয়। জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠা লাভ করে জাতীয় রাষ্ট্র (National State)।

কোনো রাষ্ট্রীয় সীমানার মধ্যে একটি জাতি বাস করলে নিজস্ব সরকার গঠনের সুবিধা হয়। নিজস্ব সরকার গঠন করা প্রত্যেকটি জাতির রাজনৈতিক অধিকার। প্রত্যেক জাতির নিজস্ব ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, সত্ত্বা প্রভৃতি বর্তমান থাকে। জাতীয় সত্ত্বার পরিপূর্ণতা জাতীয় সরকারের মাধ্যমে সম্ভব। স্বাধীন নিজস্ব ভাগ্য নির্ধারণ করার অধিকার প্রত্যেকের থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে দুর্বলের ওপর থেকে সবলের অত্যাচার রক্ষা করা সম্ভব হয়। নিজস্ব রাজস্ব ও সরকার থাকলে পরিচালনার সুবিধা হয়। বিশ্বসভ্যতার উন্নয়ন ও বিকাশে এটা কোনো বাধার কারণ হয় না। এতে সভ্যতা ও সংস্কৃতির সুস্থ প্রতিযোগিতা গড়ে উঠে। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকলে গণসমর্থন লাভ করা সম্ভব হয়। যখন সরকার একটি মাত্র জাতির দ্বারা নির্বাচিত হয়, তখন বিপুল গণসমর্থন লাভ করে এবং জনগণ সকল ক্ষেত্রে আনুগত্যতা দেখায়। তারা সব সময়ে ভাবে যে, সরকারের আইন স্বাধীনতা রক্ষায় সহায়ক, সুতরাং সেটা স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রতিপালিত হয়। অতএব বলা যায়, প্রতিটি জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকা উচিত।

আদমশুমারী (Census)

আদমশুমারী বা দেশের লোকসংখ্যা গণনা। সরকার কর্তৃক দেশের লোকসংখ্যা গণনার কাজকে আদমশুমারী বলা হয়। ওপর ভিত্তি করে আইন-পরিষদের সভ্যদের সংখ্যানির্ণয় ও প্রত্যক্ষ কর-বণ্টন করা হয়। প্রতি দশ বৎসর অন্তর আদমশুমারীর কাজ করা হয়। বর্তমানে আদমশুমারীর মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক ও অর্থনৈতিক তথ্য সংগ্রহ করা হয়।

আদর্শ পার্লামেন্ট (Model Parliament)

রাজা তৃতীয় হেনরীর পুত্র প্রথম এডওয়ার্ড (Edward) যুদ্ধে লিপ্ত হয়ে পড়েন। তখন রাজা জরুরি অর্থের প্রয়োজনের পরিপ্রেক্ষিতে ১২৯৫ সালে বৃহত্তম ও প্রতিনিধিত্বমূলক পরিষদের একটি অধিবেশন আহ্বান করেন। এই অধিবেশনই ইংল্যান্ডের ইতিহাসে 'আদর্শ পার্লামেন্ট' (Model Parliament) বলে পরিচিত। এই অধিবেশনে ২ জন আর্চ বিশপ, ১৮ বিশপ, কেন্দ্রীয় ধর্মীয় ব্যবস্থায় ৩ জন প্রধান, ৬৬ জন এ্যাবট, ৯ জন আর্ল,

৪১ জন ব্যারন, ৬১ জন নাইট এবং শহরাঞ্চলের ১৭২ জন প্রতিনিধিসহ সমাজের সকল শ্রেণির প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

আদালত (Court)

আদালত দেশের একমাত্র ন্যায়াধিকরণ, যেখানে আইন কানুনের মাধ্যমে সুষ্ঠু, বিচারকার্য সুসম্পন্ন হয়। অন্যায় অত্যাচার, চুরি ডাকাতি, রাহাজানি, নরহত্যা ইত্যাদি অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের আদালতে আইন কানুনের সাহায্যে বিচার করা হয়। আদালতে বিচারপতিই সর্বোচ্চ আসনে অধিষ্ঠিত থাকেন।

আধিপত্য (Hegemony)

আধিপত্য প্রত্যয়টির অর্থ জটিল। সাধারণত কোনো শ্রেণির দ্বারা অন্যান্য শ্রেণি বা রাষ্ট্র দ্বারা রাষ্ট্রের ওপর প্রভুত্ব বা আধিপত্য করা। এক রাষ্ট্র যখন অন্য বা অন্যান্য রাষ্ট্রের ওপর নিজের আধিপত্য চাপিয়ে দিতে চায়, অর্থাৎ অন্যান্য রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ বা খর্বিত করে সেসব রাষ্ট্রের সরকার, প্রশাসন, অর্থনীতি, সমাজ ইত্যাদির ওপর নিজের প্রাধান্য বা প্রাধান্য চাপিয়ে দিতে চায়, তখন প্রথম রাষ্ট্রের এরূপ প্রবণতাকে বলা আধিপত্যবাদ। উনিশ শতকে ইউরোপে এক রাষ্ট্রের ওপর অপর রাষ্ট্রের প্রভাব অর্থে আধিপত্যবাদ কিংবা প্রভুত্ববাদ প্রত্যয়ের প্রচলন ঘটে। এক রাষ্ট্র কীভাবে তার ওপর নির্ভরশীল অথবা প্রতিবেশী অন্য দুর্বল রাষ্ট্রকে প্রভুত্বে দাবিয়ে রাখে তারই কৌশলগত ও পেশীশক্তির রাজনীতি।

মার্কসীয় ধারায় একটি রাষ্ট্র আর একটি রাষ্ট্রের ওপর যে আধিপত্য চালায় সেটা প্রকৃত অর্থে সাম্রাজ্যবাদী নয়। নেতৃত্বের অর্থে প্রত্যয়টির ব্যবহার মার্কসীয় রাজনীতিতে দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে। লেনিন ও বলশেভিকরা এই প্রত্যয়টির মাধ্যমে কীভাবে গণতান্ত্রিক বিপ্লবে কৃষকদের সঙ্গে মতালি ও শ্রমিকদের নেতৃত্বের প্রভাবাধীনে কৃষকদের নিয়ে আসা হবে তা বুঝতে সাহায্য ক্ষমতা। সাধারণত কোনো রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামরিক বা অন্য কোনো দুর্বলতার সুযোগ নিয়েই অপর রাষ্ট্র ওই রাষ্ট্রের ওপর আধিপত্য চাপিয়ে দেয়ার প্রয়াস পায়।

আধুনিক যুগ (Modern Age)

মধ্যযুগে ব্যক্তিকে গির্জা, সামন্ত ও রাজার পীড়ন সহ্য করতে হয়েছিল। তিন প্রভূকে এক সঙ্গে সন্তুষ্ট করা সম্ভব হত না। অথচ প্রত্যেক ব্যক্তিকে শোষণের উদ্দেশে তারা ব্যবহার করত। কিন্তু আধুনিক যুগের (১৪০০ থেকে বর্তমান) সূচনালগ্নে অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দিকে ইউরোপের রাজতন্ত্রের প্রবল প্রতাপ শুরু হয়। তখন থেকে মধ্যযুগের ধর্মীয় গোড়ামী, কুসংস্কার, গীর্জার প্রভাব, গীর্জা ও সম্রাটের ক্ষমতার দ্বন্দ্বের অবসান ঘটে। নবজাগরণ বা রেনেসাঁর প্রভাবে ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে

(Renaissance and Reformation)। এই সময় থেকে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। ফলে চিন্তার জগতে সূচীত হয় এক ব্যাপক পরিবর্তন। ম্যাকিয়াভেলী, হবস্, লক, রুশো, বার্কলে, হিউম, জন স্টুয়ার্ট মিল হেগেল, কান্ট, ফিকটে প্রমূখ এ যুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। যে যুগে মধ্যযুগের ধর্মীয় গোড়ামীর পরিবর্তে জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের ক্ষেত্রে যে চিন্তা চেতনার বিকাশ ঘটে সে যুগকে আধুনিক যুগ বলে অভিহিত করা হয়।

আধুনিকীকরণের চার নীতি (Principles of Modernization)

চীনের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী জো. এন. লাই (চৌ এন লাই) জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে (১৯৭৫ সালের জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত) আধুনিকীকরণের চার নীতি উপস্থাপন করেন। এই চার নীতি হলঃ ১. শিল্প; ২. কৃষি; ৩. সশস্ত্রবাহিনী এবং ৪. বিজ্ঞান-প্রযুক্তির ক্ষেত্রে দ্রুত বিকাশের নীতি। চীনে মাও পরবর্তী নেতৃবৃন্দ মনে করেন যে, এই চার নীতি শ্রমজীবী জনগণের কল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রগতির স্মারক ছিল। তাই তাঁরা এই চার নীতি এবং তা চিং তৈলখনি ও তা চাই স্বনির্ভর গ্রামের আদর্শ অনুসরণ করেন। তবে 'চার কুচক্রী' এই চার নীতি মেনে নেয়নি এবং জো এন লাই ছিলেন বস্তুত 'চার কুচক্রী'র ঘোর বিরোধী ছিলেন।

আধ্যাত্মিকতা (Spiritualism)

আধ্যাত্মিকতা হলো এমন এক ধরনের বিশ্বাস যা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ধারণা থেকেই উদ্ভূত। আধ্যাত্মিকতাবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, বস্তুজগৎ হল সর্বশক্তিমান সত্তা কর্তৃক সৃষ্ট এবং বস্তুজগতের মাধ্যমেই সৃষ্টিকর্তা ও তাঁর অসীম ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তাঁরা আরও মনে করেন যে, আত্মা অবিনশ্বর এবং দেহাতীতভাবে আত্মা অবস্থান করতে পারে। তাঁদের মতে, বস্তুগত জীবনের পরই রয়েছে বস্তুহীন অনন্ত জীবন। তাই আধ্যাত্মিকতাবাদীদের সাধনা হল আত্মার শক্তি যা সুখময় অনন্ত জীবনের সাধনা। অবশ্য কোনো কোনো ধর্মাবলম্বীরা মনে করেন যে, এক জন্মের পাপ-পুণ্য অনুযায়ী আত্মা উন্নততর বা হীনতর দেহ ধারণ করে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে। এটাকে তাঁরা বলেন জন্মান্তরবাদ। অনেকের মতে (যেমনঃ বৌদ্ধদের) জন্মান্তরের একপর্যায়ে আত্মা চিরশান্তি বা নির্বাণ লাভ করে। আধ্যাত্মিকতাবাদীরা সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার কৃপালাভের জন্যে এবং তাঁর সঙ্গে একাত্ম হওয়ার জন্যে সাধনা করেন। তাঁদের মতে, সঠিক পথে সাধনার মাধ্যমে সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে একাত্মতায় উপনীত হওয়ার পর্যায়ে অতিপ্রাকৃত বা আধ্যাত্মিক ক্ষমতা অর্জনও সম্ভবপর। বস্তুবাদীরা অবশ্য, আধ্যাত্মিকতাকে নিছক ভাববাদী ও অবান্তর ব্যাপার বলে উড়িয়ে দিতে চান।

আনুগত্য (Loyalty)

এটি একটি ইতিবাচক মানসিক প্রবণতা। কারও কোনো কিছুর প্রতি বিশ্বস্ততা, অনুরাগ ও সমর্থন ফুটে ওঠার মর্মার্থ হলো আনুগত্য। ব্যক্তিজীবনের প্রতিটি ধাপে এ বিষয়টি

সম্পর্কিত। এটি এমন এক মানসিকতা যার মধ্য দিয়ে পরিবার, চাকুরি, ব্যবসা-বাণিজ্য, ধর্মীয় অথবা বহুত্ববাদী সমাজে যেকোনো প্রতিষ্ঠানের প্রতি প্রদর্শিত হতে পারে। আনুগত্য স্বভাবতই আত্মস্বার্থ বহির্ভূত একটি চেতনা। রাজনীতিতে আনুগত্য হলো দেশভক্তি ও রাষ্ট্রের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বিষয়। নিজ দল বা গোষ্ঠীর অন্ধ প্রশংসা এবং অন্যদের সমালোচনা আনুগত্যের অঙ্গ। আনুগত্যের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলে দেশ, দল বা গোষ্ঠীর সঙ্গে একাত্মতা। ব্যক্তিগত ও সামাজিক পর্যায়েও আনুগত্যের গুরুত্ব অনেক বেশি।

প্রাচীন গ্রীসে রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্যপালন ছিল শ্রেষ্ঠ পূণ্যের কাজ। প্লেটো, অ্যারিস্টটলসহ অনেক মনীষী আনুগত্যের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেছেন। মধ্যযুগে ইউরোপে জাতিরাষ্ট্র গড়ে ওঠার সময়ে একমাত্র সামন্ত প্রভুদের কাছেই সাধারণ লোকের আনুগত্যের প্রশ্ন দেখা দিত। ম্যাকিয়াভেলি রাজনৈতিক আনুগত্যকে প্রাথমিক কর্তব্য হিসেবে দেখেন; সমসাময়িক যুগে আনুগত্যের মনোভাব হয়ে পড়েছিল স্তিমিত। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে আনুগত্যের বিষটি বড় আকারে দেখা দেয়। এটি আবেগের সাথেও সম্পর্কিত। রুশো আনুগত্যকে আবেগমণ্ডিত করে তোলেন। উনিশ শতকের গোড়া থেকে আনুগত্যের বিষয়টি জটিল ও স্ববিরোধী হয়ে পড়ে, বিশেষ করে আন্তর্জাতিকতার আদর্শ প্রসারিত হবার ফলে বিশ শতকে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবের সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক দল, নেতা ও আদর্শের প্রতি লোকের অবিচল আনুগত্য দাবি করা হয়। আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে সোভিয়েত দেশ কিংবা চীনের পতি আনুগত্য ছিল স্বাভাবিক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে প্রথমাবধি আনুগত্যের প্রশ্নটি গুরুত্ব পায়। আদিপূর্বে সেখানকার অধিবাসীদের ছিল ইংরেজ রাজশক্তির প্রতি আনুগত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর কমিউনিস্ট অন্তর্ঘাতের আশঙ্কায় যুক্তরাষ্ট্র সরকার দেশের প্রতি আনুগত্যের নিদর্শন স্বরূপ নানা বিধিনিষেধ আরোপ করে। আনুগত্য শব্দটি বর্তমানে দলীয় কর্মীবাহিনীর উর্ধ্বতন নেতৃবৃন্দের ওপর শ্রদ্ধাভক্তির সাথে বিশেষ সম্পর্কিত।

আন্তর্জাতিক আইন (International Law)

যখন একাধিক দেশ একই আইন মানতে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়, তখন ওই আইনকে আন্তর্জাতিক আইন বলা যেতে পারে। বিভিন্ন রাষ্ট্র পারস্পরিক সম্প্রীতি এবং মৈত্রীর সম্পর্ক বজায় রাখার তাগিদে এবং একে অপরের সঙ্গে সম্পর্কসূত্রে নিজেদের শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে যে আচরণবিধি প্রণয়ন করে তাকেই আন্তর্জাতিক আইন বলা হয়। জাতিসংঘ এবং বিভিন্ন দ্বিজাতিক ও বহুজাতিক জোট সংস্থাসমূহের সনদ কিংবা চার্টারই আন্তর্জাতিক আইনের দলিল। যেমন: সমুদ্রসীমা, জাহাজ চলাচল, শুল্ক, সার্বভৌমত্বের নিরাপত্তা, গণনির্যাতন রোধ, আগ্রাসনরোধ ইত্যাদি বিষয়ে আন্তর্জাতিক আইন রয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের অন্যতম প্রণেতা জাতিসংঘ। জাতিসংঘ আন্তর্জাতিক আদালতও গঠন করেছে। আন্তর্জাতিক আইন দু'ধরনের হয়ে থাকে, যথা পাবলিক (অর্থাৎ বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে)

এবং প্রাইভেট (অর্থাৎ ব্যক্তিগত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)। তত্ত্বগতভাবে প্রথম ধরণাটি হলো একত্র সুগ্রথিত আইন যার প্রয়োগ সর্বদেশীয়। দ্বিতীয়টির প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হলো আইনের অধিক্ষেত্র (jurisdiction) নির্ধারণ এবং দ্বিতীয়ত দেশভেদে আইনের তারতম্য। কার্যত যে দেশে মামলা দায়ের করা হয় সেই দেশেরই আইন প্রযুক্ত হয়।

১৭৮০ সালে আন্তর্জাতিক আইন প্রত্যয়টি দার্শনিক বেন্থাম উদ্ভাবন করেন। আধুনিককালে অনেক দার্শনিক ও রাষ্ট্রবিজ্ঞানী এ বিষয়ে বক্তব্য প্রদান করেন। তাঁরা সবাই আন্তর্জাতিক অধিক্ষেত্রের তত্ত্বগত ভিত্তি স্থাপনের প্রয়াসী হন। আইনের নিরিখে দুটি বা তদধিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে প্রথা ও চুক্তি হলো আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গত উৎস। স্বাভাবিক নিয়ম অনুসরণের প্রবক্তারা মানবপ্রকৃতির মধ্যে আন্তর্জাতিক আইনের উৎস সন্ধানের সুপারিশ করেন।

মূলত আন্তর্জাতিক আইনের উৎস ছ'টিঃ যথা— ১. রোমান আইন, ২. বিজ্ঞানসম্মত প্রামাণ্য বইপত্র, ৩. সন্ধি এবং বিভিন্ন দেশের মধ্যে সম্পাদিত চুক্তি, ৪. আন্তর্জাতিক আলোচনা সভা এবং বিচার বিভাগের সালিশির রায়, ৫. বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রীয় আইন ও ৬. কূটনৈতিক মতামত বিনিময়। লাস্কি বলেছেন, কোনো একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক আইন যতক্ষণ মান্য ও পালন করে ততক্ষণ পর্যন্ত তা আইনসিদ্ধ। কিন্তু আজকের দিনে নিজস্ব নিরাপত্তার তাগিদে কোনো রাষ্ট্রই সহসা আন্তর্জাতিক আইন অমান্য করে না। কারণ নিজ নিজ স্বার্থে সব রাষ্ট্রই চায় নিজের নিরাপত্তা ও বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে।

আন্তর্জাতিক বাণিজ্য (International Trade)

যখন একই দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ব্যক্তি বা অঞ্চলের মধ্যে বাণিজ্য সংঘটিত হয় তখন তাকে আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য বলা হয়। পক্ষান্তরে, যখন দুইটি ভিন্ন দেশের অধিবাসীদের মধ্যে যে বাণিজ্য হয় তখন তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের মূল ভিত্তি হল আঞ্চলিক শ্রমবিভাগ ও বিশেষীকরণ। কোনো ব্যক্তি যেমন নিজে তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করতে পারে না তেমনি কোনো দেশের পক্ষেও তার প্রয়োজনীয় সকল দ্রব্য উৎপাদন করা সম্ভবপর নয়। প্রত্যেক দেশের সম্পদ ও উৎপাদন ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। এমতাবস্থায় কোনো দেশ যে সকল দ্রব্য উৎপাদনে বিশেষ সুবিধার অধিকারী সে সেই সকল দ্রব্য বেশি পরিমাণে উৎপাদন করবে এবং এর বিনিময়ে বিদেশ থেকে অন্যান্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য আমদানি করবে। এইভাবে বিভিন্ন দেশের মধ্যে যে বাণিজ্য গড়ে উঠে তাকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্য বলা হয়।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক (International Relation)

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ককে বোঝায়। বিশ্ব সমাজের সকল মানুষ ও সকল গোষ্ঠীর বিভিন্নমূখী কর্মকাণ্ড, চিন্তাধারা ও প্রক্রিয়া এই সম্পর্কের অর্ন্তভূক্ত। তবে

আন্তর্জাতিক রাজনীতি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অংশ বিশেষ। জাতিসংঘের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যকার যে সম্পর্ক বিদ্যমান তাকে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বলা হয়।

আপীল (Appeal)

আপীল পুনর্বিচারের জন্য আবেদন বা পুনর্বিচার প্রার্থনা করা। আদালত কর্তৃক কোনো বিচারের রায় ঘোষণা করার পর দণ্ডপ্রাপ্ত বা সাজাপ্রাপ্ত ব্যক্তি রায় পুনর্বিবেচনার জন্য উচ্চ আদালতে যে আবেদন করে তাকে আপীল বলে। অর্থাৎ নিম্ন-আদালত হতে কারণ দর্শায়ের জন্য উচ্চ-আদালতের নিকট পুনর্বিচার প্রার্থনা করাই হলো আপীল।

আফিম যুদ্ধ (Opium War)

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিক থেকে দশকের পর দশক ধরে ব্রিটেন চীনে ক্রমবর্ধমান হারে বিপুল পরিমাণে আফিম রপ্তানি করার মাধ্যমে একদিকে বহু চীনা জনগণকে আফিমখোরে পরিণত করে এবং বিনিময়ে বিশাল পরিমাণ রৌপ্য নিজেদের দেশে পাচার করে আনে। ফলে এ বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হয়। ১৮৪০ সালে বাণিজ্যিক স্বার্থরক্ষার অজুহাতে ব্রিটেন চীনে সামরিক হামলা শুরু করে। লিন সে সুর নেতৃত্বে চীনের সিপাহীরা এ হামলার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলে এবং ক্যান্টনম বর্তমান গোয়াংজৌ-এর জনগণের উদ্যোগে স্বতঃস্ফূর্তভাবে 'ব্রিটিশদের ধ্বংস করো বাহিনী' গড়ে ওঠে। এর ফলে ব্রিটিশরা ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু ১৮৪২ সালে দুর্নীতিবাজ চীন সরকার ব্রিটেনের সঙ্গে 'নানকিনের চুক্তি' স্বাক্ষর করলে আফিমের যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটে।

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা (Origanization of African Unity OAU)

আফ্রিকান ঐক্য সংস্থা ১৯৬৩ সালের ২৫ মে আদ্দিস আবাবায় প্রতিষ্ঠিত হয়। আলজিরিয়া, অ্যাঙ্গোলা, বেনিন, বাতসোয়ানা, বুরুন্ডি, ক্যামেরুন, কেপ ভার্ডে, মধ্য আফ্রিকান প্রজাতন্ত্র, শাদ, কমোরোস, কঙ্গো, জিবুতি, মিশর, ইকোয়েটো, রিয়াদ, গিনি, ইথিওপিয়া, গ্যাবন, গাম্বিয়া, ঘানা, গিনিবিসাউ, আইভরি কোস্ট, কেনিয়া, লেসোথো, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, মালউয়ি, মাদাগাস্কার, মালি, মৌরিতানিয়া, মরিশাস, মরক্কো, মোজাম্বিক, নাইজার, নাইজেরিয়া, রুয়ান্ডা, সাওটোমে ও প্রিন্সিপ, সেনেগাল, সিসিলিজ, সিয়েরা লিওন, সোমালিয়া, সুদান, সোয়াজিল্যান্ড, তাঞ্জানিয়া, টোগো, তিউনিসিয়া, উগান্ডা, আপার ভোল্টা, জায়ারে, জাম্বিয়া ও জিম্বাবুয়ে– এই ৫০টি রাষ্ট্র এই সংস্থার বর্তমান সদস্য। আদ্দিস আবাবায় এই সংস্থার সদর দফতর অবস্থিত। এর সদস্য রাষ্ট্রগুলোর প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত একটি অ্যাসেম্বলি, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কাউন্সিল এবং একটি সেক্রেটারিয়েট রয়েছে। এই সংস্থার মৌল উদ্দেশ্যসমূহ হলঃ ১. আফ্রিকার রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি জোরদার করা; ২. অর্থনৈতিক সহযোগিতা জোরদার করা; ৩. পারস্পরিক

স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা; ৪. আফ্রিকার বুক থেকে বর্ণবাদ, সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদের উচ্ছেদ সাধন করা এবং ৫. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (African National Congress)

প্রধান শ্বেতাঙ্গ সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের অধিকার সুরক্ষিত করার উদ্দেশে দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়নের সৃষ্টি হয়। ১৯১২ সালের ৮ জানুয়ারি দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের প্রথম জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সংগঠন আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলত প্রথম মুক্তি আন্দোলনের নাম আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেস (এ.এন.সি)। আফ্রিকানদের সংহতি, যাবতীয় ধরনের বর্ণবৈষম্যবাদের বিরোধিতা করে এবং "বর্ণবৈষম্যমুক্ত, একীভূত ও গণতান্ত্রিক দক্ষিণ আফ্রিকা" প্রতিষ্ঠার পক্ষে ঘোষণা দেয় এই সংগঠনটি। ১৯২৯ সালে এই সংগঠন আফ্রিকান ট্রেড ইউনিয়ন এবং দক্ষিণ আফ্রিকার কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মিলে "আফ্রিকান জনগণের অধিকার" নামে একটি সংগঠন গঠিত হয় এবং "পাসপত্র আইন "আর "পার্মিশন" ব্যবস্থা বাতিল করার দাবি জানায়। ১৯৫২ সালে এই সংগঠন দক্ষিণ আফ্রিকার ভারতীয় কংগ্রেসের সংগে যৌথভাবে "অন্যায্য আইন উপেক্ষা করার আন্দোলন" চালাতে শুরু করে। ১৯৫৫ সালের জুন মাসে এই সংগঠন "স্বাধীন সনদ প্রণয়নে অংশগ্রহণ করে এবং সকল আফ্রিকান জনগণের সমান নাগরিক অধিকার দেয়ার দাবি জানায়।

১৯৬০ সালে এই সংগঠন "পাসপত্র সংক্রান্ত আইন-বিরোধী আন্দোলন" শুরু করে। পরে সংগঠনটিকে অবৈধ সংগঠন বলে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬১ সালে এই সংগঠন " জাতীয় বল্লম" নামক সশস্ত্র সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং এর সঙ্গে সঙ্গে বিপুল প্রয়াসে রাজনৈতিক ও পররাষ্ট্র বিষয়ক নানা রকম সংগ্রাম পরিচালনা করে। দেশের ভেতরে নিজের তার প্রভাব ক্রমেই সম্প্রসারিত হতে থাকে। সংগঠনটি আফ্রিকান ঐক্য সংস্থার স্বীকৃতি ও সমর্থন অর্জন করে।

আফ্রিকান ন্যাশনাল কংগ্রেসের অন্যতম নেতা নেলসন ম্যান্ডেলা বর্ণবাদ বিরোধী আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন। ১৯৬২ সালে তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণবাদী সরকার গ্রেপ্তার করে ও অন্তর্ঘাতসহ নানা অপরাধের দায়ে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেয়। ১৯৮৪-৮৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকাতে এক সংবিধান প্রণীত হয়, যাতে কৃষ্ণাঙ্গ সংখ্যাধিক্যের প্রতিনিধিত্বের কোনো ব্যবস্থা রাখা হয় না। চতুর্দিকে অসন্তোষ ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। ফলে এএনসির যথেষ্ট প্রভাব বাড়ে। ১৯৮৯ সালে আফ্রিকান সরকারের নেতৃত্বে পরিবর্তন হয়। এফডিব্লিউডি ক্লার্ক নেলসন ম্যান্ডেলাকে মুক্ত করেন। পরের বছর সমস্ত রাজনৈতিক আন্দোলন আইনসম্মত বলে গ্রহণ করা হয়। একটি নতুন রাজনৈতিক ব্যবস্থায় সব আফ্রিকাবাসীর ভোটের অধিকার নিয়ে আলোচনাকে শুরু হয়। এএনসির মধ্যে চুক্তি সম্পন্ন হয়। ১৯৯৪-তে এ.এন.সি. নির্বাচনে জয়ী হয় এবং নেলসন ম্যান্ডেলা দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি হন।

আফ্রো-এশীয় সম্মেলন (Afro-Asian Summit)

আফ্রো-এশীয় সম্মেলন ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং শহরে অনুষ্ঠিত হয়। এটি একটি আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোর আন্তঃমহাদেশীয় সম্মেলন। যে সকল দেশ এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেছিল। সেগুলো হল: আফগানিস্তান, কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, চীন, মিশর, ইথিওপিয়া, গোল্ড কোস্ট, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ইরাক, জাপান, জর্ডান, লাওস, লেবানন, লাইবেরিয়া, লিবিয়া, নেপাল, পাকিস্তান, ইরান, ফিলিপিন্স, সৌদি আরব, সুদান, সিরিয়া, থাইল্যান্ড, তুরস্ক, উত্তর ভিয়েতনাম, দক্ষিণ ভিয়েতনাম ও ইয়েমেন। সাইপ্রাস, যুক্তরাষ্ট্র ও আফ্রিকা জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা দর্শক হিসেবে এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এই সম্মেলনে কিছু মতভেদ দেখা গেলেও সম্মিলিত সদস্যেরা অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা; আত্ম নিয়ন্ত্রণাধিকার এর ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করেন। কম্বোডিয়া, শ্রীলংকা, জাপান, জর্ডান, লাওস, লিবিয়া, নেপাল ও সংযুক্ত ভিয়েতনামকে জাতিসংঘের সদস্যপদ প্রদান; মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় ফরাসি উপনিবেশবাদ এবং নেদারল্যান্ডস ও নিউগিনিতে ওলন্দাজ উপনিবেশবাদসহ সকল উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধাচরণ, মানবাধিকার সংক্রান্ত জাতিসংঘ ঘোষণার প্রতি সমর্থন ইত্যাদির সপক্ষে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

আবু মুসা (Abu Musa)

আবু মুসা হচ্ছে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপটি হরমুজ প্রণালীর সন্নিকটে অবস্থিত। এই দ্বীপটির কৌশলগত গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। কারণ এই দ্বীপটি পারস্য উপসাগরের প্রবেশদ্বারে অবস্থিত। দ্বীপটির মালিকানা নিয়ে ইরান ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের মধ্যে মতবিরোধ রয়েছে। ১৯৭১ সাল হতে দ্বীপটির অধিকাংশ অঞ্চল সারজাহ চুক্তির মাধ্যমে ইরানের দখলে থাকে। সাম্প্রতিককালে ইরান এই দ্বীপটির ওপর পূর্ণ দখল স্থাপনে সচেষ্ট হয়। এখানে ইরানের সামরিক ঘাঁটি রয়েছে। ইরান-ইরাক যুদ্ধের সময় এই আবু মুসা দ্বীপটি দখল ইরাকের গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য ছিল।

আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln)

আমেরিকার ইতিহাসের এক কলঙ্কময় অধ্যায় ছিল দাসপ্রথা। এই দাসপ্রথা দিয়েই উত্তর ও দক্ষিণের রাজ্যগুলোর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে চলছিল মন কষাকষি, মতবিরোধ ক্রমেই তীব্রতর হয়ে উঠে। অবশেষে দক্ষিণ দিকের লোকেরা জানাল যে, তারা উত্তরদিকের অধিবাসীদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে একটি নতুন স্বাধীন রাষ্ট্র গড়ে তুলবে। এই সময় আমেরিকার রাষ্ট্রপতি ছিলেন মহাপ্রাণ মনীষী আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln)। তিনি নিজেও ওই কুখ্যাত দাসপ্রথাকে অন্তর দিয়ে ঘৃণা করতেন। তিনি দক্ষিণ দিকের লোকদের বলে দিলেন—আমেরিকান সরকারের বাইরে গিয়ে পৃথক রাষ্ট্রগঠন করা যাবে না। দরকার হলে সরকার বিচ্ছিন্নতাবাদীদের জোর করে যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে ধরে রাখতেও কুণ্ঠিত হবে না।

আব্রাহাম লিংকন ছিলেন সত্যি এক দৃঢ় চরিত্রের লোক। জন্ম তাঁর কেন্টাকি (Kentucky) প্রদেশের হজেনভিল (Hodgenville) শহরে এক গরিবের ঘরে। ১৮০৯ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি আমেরিকার এক অখ্যাত লিংকন-পরিবারে তাঁর জন্ম। পিতা ছিরেন টমাস লিংকন (Thomas Lincoln)। মায়ের নাম হ্যান্সি হ্যাংকাস লিংকন। আব্রাহাম লিংকন পরবর্তী সময়ে তাঁর পিতা সম্পর্কে বলেছেন : আমার পিতা ছিলেন একজন শ্রমিক। লেখা বা বই পড়া সম্পর্কে তাঁর কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না। তিনি ছিলেন একজন ভালো শিকারি, উত্তম মিস্ত্রি, কঠোর পরিশ্রমী, কিন্তু ব্যর্থ কৃষক। যদিও ছোটবেলায় আব্রাহাম লিংকনের দুষ্টু বলে অখ্যাতি ছিল, কিন্তু পড়াশোনার দিকে ছিল খুব মনোযোগ। আব্রাহাম যে স্কুলে পড়তেন সেটি ছিল একটি কাঠের স্কুল। মজার ব্যাপার হলো, স্কুলের সব ছাত্র-ছাত্রীকে চেঁচিয়ে পড়তে হত। এই স্কুলের প্রভাব থেকেই আব্রাহাম লিংকন পরিণত বয়সেও চেঁচিয়ে পত্রিকা পড়তেন, বই পড়তেন। ১৮১৬ সালে লিংকন-পরিবারকে তাঁদের পুরনো বসত ছেড়ে উঠে আসতে হলো লুইসভিল (Louisville) থেকে ৬৪ কিলোমিটার উত্তরে নব ক্রিক (Knob Creek) নামে অন্য জায়গায়। এখানে এসে তাঁরা জঙ্গল কেটে গড়ে তুললেন নতুন বসত। ১৮১৯ সালে এই নতুন জায়গায় দেখা দিল মহামারী। এই মহামারীতেই আব্রাহামের মা ন্যান্সি (Nancy) মারা গেলেন। এর কিছুদিন পরে পিতা টমাস তিন সন্তানের জননী সারাহ জনস্টন (Sarah Johnston) নামে বিধবা মহিলাকে আবার বিয়ে করলেন। অবশ্য সৎমা হলেও মহিলা খুব ভালো ছিলেন। আব্রাহামকে খুব আদর করতেন। বড় হয়ে লিংকন গাঁয়ের এক বন্ধুর সঙ্গে ব্যবসা করতে নামলেন। কিন্তু ব্যবসা বেশিদিন চলল না। পাওনাদারেরা তাঁকেই বিব্রত করে তুলতে লাগল। তিনি এত সৎ প্রকৃতির ছিলেন যে, কাউকেই ফাঁকি দিতে পারলেন না। দীর্ঘ পনেরো বছর ধরে নিজে কষ্ট করে তিনি এই দেনা পরিশোধ করে দিলেন। এর মধ্যেই আইন পাস করে শহরে আইনব্যবসা করতে শুরু করলেন। ১৮৩৭ সালে এপ্রিল মাস। আটাশ বছরে যুবক আব্রাহাম লিংকন আইনজীবী হওয়ার জন্য চলে এলেন স্প্রিংফিল্ড (Springfield) শহরে। সুবিখ্যাত আইনজীবী জন টি স্টুয়ার্টের সহকারীরূপে কাজ শুরু করলেন। শুধু তা-ই নয়, রাজ্য আইন পরিষদে দলের নেতারূপে জনসমাজে সমাদার ও প্রতিপত্তি লাভ করলেন। ১৮৪২ সালের ৪ নভেম্বর তিনি মেরি টড (Marry Todd) নামে এক মহিলার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। আব্রাহাম লিংকন আইন ব্যবসা দ্বারা জীবিকার্জন করতেন বটে, কিন্তু রাজনীতিতেই তাঁর উৎসাহ ছিল বেশি। তিনি ১৮৪৭ সালের নভেম্বর মাসে হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ-এর আসন লাভ করেন। কংগ্রেসের সদস্যরূপে লিংকন দুটো গুরুত্বপূর্ণ কমিটির সদস্যপদ লাভ করেছিলেন। যুক্তরাষ্ট্রের সিনেটের নির্বাচনেও লিংকন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। ১৮৫৫ সালের ৫ জানুয়ারি আইন পরিষদের সদস্যদের ভোটে তিনি পরাজিত হন। পরের বছর তিনি বুঝতে পারেন রিপাবলিকান দলে যোগদান করা তাঁর কর্তব্য।

১৮৫৬ সালের ২৯ মে ইল্লিনয়েস (Illionis) রিপাবলিকান দলের প্রতিষ্ঠা দিবসে তিনি দেশের প্রচলিত ঘৃণ্য দাসব্যবসা সম্পর্কে এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দান করেন। তাঁর

বক্তৃতা শুনে শ্রোতারা একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েছিল। ১৮৫৮ সালের নির্বাচনে তিনি বেশি ভোট পেলেও রাজ্য আইন পরিষদের অধিবেশনে সিনেটর নির্বাচনের ভোট সংখ্যায় দেখা গেল কম ভোট পেয়েছেন। কিন্তু আব্রাহাম পরিজিত হলেও সারাদেশে তাঁর মর্যাদা ও জননেতা হিসেবে স্বীকৃতি অক্ষুণ্ন রয়ে গেল। আব্রাহাম লিংকন তাঁর কর্মতৎপরতার দরুন ১৮৬০ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দলীয় মনোনয়ন লাভ করলেন এবং প্রতিদ্বন্দ্বী ক্ষমতাবান ধনী স্টিফেন ডগলাসকে পরাস্ত করে মার্কিন প্রেসিডেন্ট পদে জয়ী হলেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়ে যেদিন তিনি হোয়াইট হাউসে এলেন সেদিনের স্মৃতিটি ছিল খুবই চমৎকার। আব্রাহাম নিজেই সমস্ত বাক্সপেঁটরা গুছিয়ে নিলেন। স্প্রিংফিল্ডের বাড়িটা বিক্রি করে দিলেন। দুটো গরু এবং একটি ঘোড়া ছিল, তাও বিক্রি করে দিলেন। কুকুরটা দিয়ে দিলেন এক বন্ধুকে। তার পরই তিনি স্ত্রী-পুত্রকে নিয়ে উঠে এলেন হোয়াইট হাউসে। তাঁর মনে হয়তো এই বিশ্বাস ছিল যে, হোয়াইট হাউসের সরকারি বাসভবনই হবে তাঁর স্থায়ী বাসস্থান। এক অর্থে তা-ই হয়েছিল। কারণ মৃত্যুর পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত তিনি হোয়াইট হাউসের বাসিন্দাই ছিলেন। ক্ষমতা হারিয়ে তাঁকে এখান থেকে বিদায় নিতে হয়নি। আব্রাহাম লিংকন ছিলেন যুদ্ধ ও নিষ্ঠুরতার বিরোধী। দাসপ্রথাকে কেন্দ্র করে উত্তর আর দক্ষিণাঞ্চলের মানুষদের মধ্যে বেধে গেল গৃহযুদ্ধ। যুদ্ধের গতি ১৮৬৩ সালের দিকে দক্ষিণাঞ্চলে যেতে শুরু করল। প্রেসিডেন্ট লিংকন ঘোষণা করলেন : যে এলাকা আমাদের দখলে এসেছে সেই স্থানের ক্রীতদাসেরা আজ থেকে মুক্ত। ১৮৬৪ সালের দিকে যুদ্ধ-নিয়ন্ত্রণের জন্য ইউলিসিস এস গ্রান্ট (Ulysses S. Grant) নামক এক দুর্ধর্ষ সেনাপতিকে নিয়োগ করলেন প্রেসিডেন্ট লিংকন। ১৮৬৫ সালে ৯ এপ্রিল অ্যাপোমালটক্স (Appomaltox) কোর্ট হাউসে শত্রুপক্ষ আত্মসমর্পণ করল। প্রেসিডেন্ট লিংকনের অমরবাণী শোনা গেল- "ক্রীতদাসদের মুক্তি দিয়ে আমরা স্বাধীনতা রক্ষা সম্পর্কে নিশ্চিত ভরসা দান করে, কারও প্রতি ঈর্ষা না রেখে, সকলের প্রতি প্রীতি নিয়ে, সত্যকে আশ্রয় করে, সত্যকে গ্রহণ করার ক্ষমতা, যা ঈশ্বর আমাদেরকে দান করেছেন, তাকেই পাথেয় করে আসুন, মিলেমিশে আমাদের করণীয় কাজগুলো সমাধান করি।" এমনি লিংকন ছিলেন মানবতা ও গণতন্ত্রের মানসপুত্র। গণতন্ত্র সম্পর্কে তাঁর সেই অমর বাণী—Government of the people, by the people and for the people আজও শতাব্দীকাল ধরে প্রবাদবাক্যের মতো প্রচলিত আছে। গণতন্ত্র এবং আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার এমন নিখুঁত সংজ্ঞা অদ্যাবধি কেউ দিতে পারেননি। কিন্তু এর কিছুদিন পরই এল সেই মর্মান্তিক ক্ষণটি। প্রেসিডেন্ট লিংকন স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে ওয়াশিংটনের ফোর্ট থিয়েটারে 'আমাদের আমেরিকান প্রতবেশী' নাটকটি দেখছিলেন। ঠিক তখন জন উইলকিস বুথ নামে এক উন্মাদ অভিনেতা প্রেসিডেন্টের বক্ষ লক্ষ্য করে পিস্তলের গুলো ছুড়ল। লিংকনের রক্তাপ্লুত দেহ গড়িয়ে পড়ল। এমনি করে বিশ্বের সবচেয়ে মহান দয়ালু হৃদয়বান ব্যক্তিটির জীবনাবসান ঘটল সহসা। এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটে ১৮৬৫ সালে। আজও তিনি বিশ্বের স্মরণীয় ও বরেণ্য ব্যক্তিদের একজন।

আমলাতন্ত্র (Bureaucracy)

ফরাসি শব্দ ব্যুরো (Bureau) বা সংস্থা এবং গ্রিক ক্রাটিন (Kratin) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে Bureaucracy কথাটির উদ্ভব। প্রথমদিকে এই শব্দটি সরকারি কর্মচারীদের সম্পর্কে ব্যাঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহার করা হলেও পরবর্তীকালে শব্দটি সরকারি কর্মচারী শ্রেণি, বিশেষত উচ্চপদস্থ সরকারি কর্মচারী শ্রেণির সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। আমলাতন্ত্র বলতে এমন এক ধরনের প্রশাসন ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে একদল দক্ষ, পেশাজীবি সরকারি কর্মচারী পদসোপন নীতির ভিত্তিতে ও নিরপেক্ষভাবে রাষ্ট্রের কার্যাবলী সম্পন্ন করে সর্বাধিক জনকল্যাণ অর্জন করতে সচেষ্ট হন। অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলের শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক কাঠামো অনুপস্থিত বা দুর্বল বিধায়, এসব দেশে বেসামরিক ও সামরিক আমলাতন্ত্রই সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে আবির্ভূত হয়। কার্যত সকল কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ প্রধান নিয়ন্ত্রক হয়ে দাঁড়ায়। এঁদেরকে সিভিল সার্ভেন্ট বা জনগণের কর্মচারী হিসেবে অভিহিত করা হলেও অনুন্নত বা স্বল্পোন্নত দেশে তাঁরাই হয়ে দাঁড়ায় জনগণের প্রকৃত মালিক মোক্তার এবং দেশি বিদেশি শোষণের প্রতিভূ। সাবেক উপনিবেশ বা কলোনীসমূহে তাঁরাই সাবেক উপনিবেশবাদীদের সঙ্গে সম্পর্ক ও স্বার্থের যোগসূত্র। উন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলোতে শক্তিশালী আর্থ-সামাজিক কাঠামোর অবস্থানের দরুন আমলাতন্ত্র তেমন প্রবল নয়। সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ সম্পর্কেও অনেকে অভিযোগ করেন যে, সেসব দেশেও বনেদি আমলাতন্ত্রের স্থলে পার্টি আমলাতন্ত্র গড়ে উঠেছে এবং এই পার্টি আমলাতন্ত্রই সেসব দেশের কায়েমি স্বার্থবাদ গোষ্ঠী (Vested Interest Group)-এ পরিণত হয়েছে। অবশ্য যে সকল সাবেক কমিউনিস্ট দেশ বর্তমানে গণতন্ত্র ও পুঁজিবাদে ফিরে এসেছে, সে সকল দেশ থেকে পার্টি আমলাতন্ত্রেরও অবসান ঘটছে। উদাহরণ, পূর্ব ইউরোপীয় সাবেক কমিউনিস্ট দেশসমূহ।

আমেরিকার গৃহযুদ্ধ (American Civil War)

আমেরিকার ১১টি সাউদার্ন স্টেটস এবং নর্দান ফেডারেল স্টেটসের মধ্যে ১৮৬০ থেকে ১৮৬৫ সাল পর্যন্ত যুদ্ধই আমেরিকার গৃহযুদ্ধ নামে খ্যাত। সাউদার্ন স্টেটগুলো ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিল। আর নর্দার্ন স্টেটগুলো ইউনিয়ন রক্ষা করতে চেয়েছিল। আর নর্দান স্টেটগুলো ইউনিয়ন রক্ষা করতে বদ্ধপরিকর ছিল। নর্দার্ন ফেডারেল স্টেটগুলো যুদ্ধে জয়ী হয়। আব্রাহাম লিঙ্কন আমেরিকার দাসপ্রথা রহিত এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করেন।

আমেরিকার বিপ্লব/স্বাধীনতা যুদ্ধ (American Revolutionary War)

গ্রেট ব্রিটেনের কাছ থেকে আটলান্টিক উপকূলের ১৩টি উপনিবেশ বা কলোনির স্বাধিকার আদায়ের জন্য সংঘটিত যুদ্ধই আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ১৭৭৫

থেকে ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত চলে। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কারের পর স্পেনে এই নতুন মাহদেশের দক্ষিণ ও মাধ্যাঞ্চল দখল করে নেয়। কিন্তু মহাদেশের উত্তর ভাগে অর্থাৎ আটলান্টিক উপকূলবর্তী এলাকায় ইংরেজদের ১৩টি উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭৬৫ সালে ইংরেজ সরকারের আয় বৃদ্ধির উদ্দেশে উপনিবেশগুলোর সকল দলিলপত্রে সরকারি নতুন ষ্ট্যাম্প লাগানোর স্বার্থের সংঘাত বাধে। জনসাধারণের প্রবল আপত্তির মুখেও ইংরেজ সরকার বাণিজ্য ও বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের ওপর নতুন নতুন শুল্ক আরোপ করতে থাকে। এর প্রতিবাদে ১৭৭৩ সালে একদল লোক বোস্টন বন্দরে জাহাজ থেকে চায়ের বাক্স সমুদ্রে ফেলে দেয়। এই অবাধ্যতা দমনের জন্য সরকার বোস্টন বন্দর বন্ধ করে দিয়ে সেখানে ইংরেজ সৈন্যের সমাবেশ ঘটায়। এভাবে ১৭৭৫ সালে 'লেক্সিংটন কংকর্ড'- এ সংঘর্ষ শুরু হয়।

১৭৭৬ সালের ৪ জুলাই উপনিবেশগুলোর মিলিত প্রতিনিধিসভায় স্বাধীনতার ঘোষণা-পত্রে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে ভিত্তি রচিত হয়। জর্জ ওয়াশিংটন সৈন্যদল গঠন করেন এবং স্বাধীনতাযুদ্ধের আহ্বান জানান। অবশেষে ১৭৮৩ সালে প্যারিস সন্ধির মধ্যে দিয়ে গ্রেট ব্রিটেন উপনিবেশগুলোর স্বাধীনতা মেনে নেয়। ফলে আটলান্টিক থেকে মিসিসিপি নদী পর্যন্ত বিশাল ভূখণ্ডটি আমেরিকার স্বাধীন যুক্তরাষ্ট্ররূপে প্রতিষ্ঠিত হয়।

আম্র কূটনীতি (Mango Diplomacy)

তৎকালীন পাকিস্তান প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ শরিফ (১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে) ভারতের পঞ্চাশতম স্বাধীনতা বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের রাষ্ট্রপতি কে. আর. নারায়ণ ও উপরাষ্ট্রপতি কৃষাণ কান্ত এবং প্রধানমন্ত্রী ইন্দরকুমার গুজরালসহ বিভিন্ন ভারতীয় নেতার কাছে পাকিস্তানি আমের উপহার পাঠান। এটাকেই কূটনৈতিক মহল ম্যাঙ্গো ডিপ্লোম্যাসি বলে অভিহিত করেন। নওয়াজ শরিফের এসব উদ্যোগের পরে পাক-ভারত সম্পর্কের অনেকটা উন্নতি ঘটলেও, ১৯৯৮ সালের মাঝামাঝি সময়ে উভয় দেশই পারমাণবিক বিস্ফোরণ ঘটানোর ফলে সম্পর্কের পুনরায় অবনতি ঘটে।

আয় (Income)

মানুষ তার অসীম অভাব পুরণের জন্য প্রত্যহ বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে। এই সকল কাজের বিনিময়ে যে অর্থ উপার্জিত করে তাকে আয় বলা হয়। অনেকে 'আয়' ও 'সম্পদ' শব্দ দুটিকে একই অর্থে ব্যবহার করেন। কিন্তু এইভাবে দুইটি শব্দকে একই অর্থে ব্যবহার করা ঠিক নয়। সম্পদ বলতে এরূপ দ্রব্যকে বোঝায় যাহার অর্থমূল্য আছে। অপরপক্ষে আয় হল সম্পদ-উৎপাদিত সেবা প্রবাহ। সেলিগম্যানের ভাষায়, "আয় হল অর্থনৈতিক পণ্য হতে তৃপ্তিপ্রবাহ।" (Inflow of satisfaction from economic goods)। সুতরাং আয় সম্পদেরই সৃষ্ট ফল। অবশ্য কেবল অর্থনৈতিক দ্রব্য হতেই আয় হয় না; সেবামূলক কার্যও মানুষের অভাব মোচন করতে পারে। সুতরাং এই প্রকার কার্য হতে যে তৃপ্তি মানুষ ভোগ করে তার মূল্যকেও আয়ের অন্তর্ভুক্ত করা।

আয়-কর (Income Tax)

বিভিন্ন প্রকারের আয়ের ওপর যে কর ধার্য করা হয়, তাকে 'আয় কর' বলা হয়, যেমন বেতন, মজুরি, খাজনা সুদ, দালালি, গ্রন্থকারের গ্রন্থস্বত্ব ব্যবহারের জন্য শতকরা যে মূল্য দেওয়া হয়, ব্যবসায়ের লাভ, কারবারের লভ্যাংশ-এই সব সম্পদের ওপর আরোপিত কর।

আরব লিগ (Arab League)

১৯৪৫ সালের ১০ মে গঠিত বিভিন্ন আরব দেশকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রসমবায়। আরব জাতীয়তাবাদী চেতনাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরা, আরব অঞ্চলের পারস্পরিক স্বার্থের ক্ষেত্রে সহযোগিতা, আরব এলাকায় উপনিবেশবাদের বিরোধিতা, ইসরায়েল রাষ্ট্র গঠনের বিরুদ্ধে ভূমিকা গ্রহণ ইত্যাদিই ছিল এই সংস্থা গঠনের মূল উদ্দেশ্য। প্রতিষ্ঠাতা সদস্যদের মধ্যে ছিল মিশর, ইরাক, লেবানন, সৌদি আরব, সিরিয়া, জর্ডান এবং ইয়েমেন। পরে একের পর এক লিবিয়া, সুদান, তিউনিসিয়া, মরক্কো, কুয়েত, আলজেরিয়া, দক্ষিণ ইয়েমেন, বাহরাইন, কাতার, ওমান এবং পারস্য উপসাগরের উপকূলবর্তী আমিরশাহি রাজ্যগুলো তাতে যোগ দেয়। ১৯৭৮ সালে মিশর ও ইসরায়েলের মধ্যে প্যালেস্টাইনের স্বার্থবিরোধী 'ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি' স্বাক্ষরিত হলে, আরববিশ্বে এর বিরুদ্ধে তীব্র ঝড় ওঠে এবং এই পরিপ্রেক্ষিতে মিশর আরব লিগ ত্যাগ করে। এই সংগঠনটি আরব দেশগুলোর জাতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক। প্রতিষ্ঠার পর থেকে আরব দেশগুলোর যেসব রাজনৈতিক বিষয়ে লিগের ভূমিকা বিভিন্ন সময়ে প্রবল হয়ে ওঠে সেগুলো হলো ১. ফ্রান্সের দখল থেকে সিরিয়া ও লেবাননের স্বাধীনতা সংগ্রামের প্রতি সমর্থন; ২. ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ও অস্তিত্বের বিরুদ্ধে সংগ্রাম; ৩. আলজেরিয়াকে স্বাধীনতা প্রদানে ফ্রান্সের অহেতুক বিলম্বের বিরোধিতা এবং ৪. আরব দেশগুলোর অর্থনৈতিক উন্নয়নে ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস। আরব দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক ও কারিগরি বিষয়ে সহযোগিতা, আরব সংস্কৃতির উন্নয়ন এবং আরব দেশগুলোর মধ্যে বিবাদ-বিসংবাদের নিষ্পত্তি লিগের কর্মসূচির অন্তর্গত। তবে আরব ভূখণ্ড থেকে ঔপনিবেশিক শক্তির উচ্ছেদ এবং ইজরায়েলের বিরুদ্ধে সমন্বিত সংগ্রামই এখন লিগের প্রধান কাজ হলেও সদস্য দেশগুলোর মধ্যে ঐক্যবদ্ধ উন্নয়ন প্রয়াস অব্যাহত আছে।

নব্বইয়ের দশকের প্রথমার্ধে মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের সঙ্গে প্রতিবেশী দেশগুলোর সম্পর্কে শান্তির পরিবেশ গড়ে উঠতে থাকায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন আরব লিগকে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ তুলে নেবার আবেদন জানান। আরব লিগ সেই আবেদন প্রত্যাখ্যান করে এই বলে যে অধিকৃত আরব ভূখণ্ড সমূহ থেকে ইজরায়েল সরে না গেলে ওই প্রশ্ন বিবেচিত হবে না।

আরব সভ্যতা (*Arab* Civilization)

সেমিটিক জাতির বিভিন্ন অংশ দজলা-ফুরাত উপত্যকা, মেসোপটেমিয়া, সিরিয়া, প্যালেস্টাইন ও সিনাই উপত্যকা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে বিভিন্ন সভ্যতা গড়ে তোলে

আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০-৫০০ অব্দের মধ্যে। এই সভ্যতা আরব সভ্যতা নামে পরিচিত ছিল। খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীর অ্যাসেরীয় উৎকীর্ণ-লিপি থেকে জানা যায়, আরব বলতে আরব উপদ্বীপের সুদূর উত্তরাঞ্চলের যাযাবরদেরকেই বোঝানো হতো। এরপর সমগ্র আরব উপদ্বীপ এবং মধ্যপ্রাচ্যের মরু এলাকার অধিবাসীদের আরব বলে অভিহিত করা হতে থাকে। মধ্যযুগে তারা অভিহিত হত 'স্যারাসেন' নামে। এরা ছিল মূর্তি ও পকৃতিপূজক। আরব সভ্যতা প্রাথমিকভাবে মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতা দ্বারা গভীরভাবে প্রভবিত হয়। পরবর্তীকালে যে আরব সভ্যতা গড়ে ওটে তার অবস্থান ছিল মূলত দক্ষিণ অঞ্চলে। প্রাচীনকালে আরব অঞ্চরে দুটি রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। একটির নাম মিনায়েরম (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক ৭০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক)। অন্যদির নাম সাবাইন (খ্রিস্টপূর্ব আনুমানিক৭০০ অব্দ থেকে খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক)। অন্যটির নাম সাবাইন (খ্রিস্টপূর্ব আনুমনিকি ৭৫০ অব্দদ থে খ্রিস্টপূর্ব ১১৫ অব্দ সময়সীমার মধ্যে)।

খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দে দক্ষিণাঞ্চলীয় এ দুটি আরব রাজতন্ত্রের আমলে বিভিন্ন দেশের সঙ্গে সমুদ্রপথে বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এই সময় আরবদের প্রধান রপ্তানিপণ্য ছিল নানান ধরনের সুগন্ধীদ্রব্য, পাথর ও মসলা। 'জাহেলিয়া' বা তমসাচ্ছন্ন নামে কথিত যুগে মক্কা ছিল ব্যবসাকেন্দ্র হিসেবে পশ্চিম এশিয়ার সমৃদ্ধতম নগরী। স্থল-বাণিজ্যপথে আরব বণিকদের ছিল নিরঙ্কুশ আধিপত্য। এই সময় মক্কায় ব্যাংক স্থাপিত হয়। মহাজনী ব্যবসা প্রসার লাভ করে। অন্তর্জাতিক বাণ্যিজ্যের সহায়ক হিসেবে 'ক্লিয়ারিং হাউস' বা নিকাশঘর স্থাপন করা হয়। প্রাক ইসলামী যুগের কবি ও পণ্ডিতদের মধ্যে ইমরুল কায়েস, তারাকা আমর, উম্মে কুলসুম, লোবিদ, যুহায়ের হারিসও আনতারার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আরবের সাংস্কৃতিক জীবনে উকাজ নামে একটি মেলায় বিশেষ গুরুত্ব ছিল। প্রতি বছর এখানে সাহিত্য প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হতো। পুরস্কারপ্রাপ্ত কবিতা কাবার দেয়ারে ঝুলিয়ে রাখা হত। সমগ্র আরবি সাহিত্যের এই সব কবিতা অসাধারণ সৃষ্টি বলে অভিহিত। ৬১০ থেকে ৬৫১ খ্রিস্টাব্দ সময়সীমার মধ্যে কুরআন শরীফ সংকলন ও লিপিবদ্ধকরণের কাজ সমাপ্ত হয়। হয়রত মুহাম্মদের (সা.) ব্যক্তিগত জীবচনাচরের দৃষ্টান্ত ও কুরআনে মানুষের মানুষে সমতা ও ভ্রাতৃত্বের উদার বাণী আরব ভুখণ্ড ছাড়িয়ে বিস্তৃত হলে এক নতুন সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। ৭৫০ সালে থেকে শুরু হয় ইসলাম ধর্মাবলম্বী আব্বাসীয় খলিফাদের শাসনকাল। ৭৮৬ থেকে ৮০৯ সালের মধ্যবর্তী কালকে বলা হয় আরব সভ্যতার স্বর্ণযুগ। বাগদাদ ছিল এই সাম্রাজ্যের মূলকেন্দ্র। ফলে এখানে গড়ে ওঠে বিশাল বিশাল সুম্য অট্টালিকা, উদ্যান, বিপনীকেন্দ্র, রাস্তাঘাট, বিনোদনকেন্দ্র ইত্যাদি। বাণ্যিজ্যেরও গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রে পরিণত হয় বাগদাদ। এ সময় আরবী ভাষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। আরবদের বলা হয় আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। চিকিৎসাবিজ্ঞান, গণিত ও রসায়নশাস্ত্রে তাদের রয়েছে মৌলিক অবদান। দুরবীন, দিগদর্শন ও বকযন্ত্র (Distillation) আবিস্কারে কৃতিত্ব তাদেরই। ভেষজবিদ্যার ক্ষেত্রেও তাদের রয়েছে প্রভূত অবদান। শিল্প-সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই

সভ্যতার অবদান অসামান্য। 'আরব্য রচনী' বিশ্বসাহিত্রের অমূল্য সম্পদ। নবম সালে অরবীয় সঙ্গীতকলার প্রভুত বিকাশ ঘটে তাদের কাছ থেকেই ভারতীয়রা তবলা এবং ইউরেপীয়রা 'লিউট' নামের বাদ্যযন্ত্র গ্রহণ করে।

আর্থিক ব্যয় (Money cost)

উৎপাদন ব্যয়কে যখন অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন সেই ব্যয়কে আর্থিক ব্যয় বলা হয়। কোন দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য উৎপাদনকারীর বিভিন্ন উপাদানের প্রয়োজন হয়। যে সমস্ত উপাদান ক্রয় করতে উৎপাদনকারীর যে মোট অর্থ ব্যয় করে তাই উৎপাদনের আর্থিক ব্যয়। কাঁচামালের দাম শ্রমিকগণের মজুরি, জমির খাজনা, বাড়ী ভাড়া, মূলধনের জন্য সুদ, মালিকের সাধারণ মুনাফা প্রভৃতি সমষ্টিই হল কোন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানের মোট আর্থিক ব্যয়।

আর্ন্তজাতিক আদালত (International Court of Justice)

১৯৪৬ সালের ১৮ এপ্রিল তারিখে নেদারল্যান্ডের দি হেগ শহরে জাতিসংঘ সনদ মোতাবেক আর্ন্তজাতিক আদালত (International Court of Justice)-এর প্রথম বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এটি লীগ অব নেশন্‌স-এর আর্ন্তজাতিক স্থায়ী আদালত (Permanent Court of International Justice)-এরই উত্তরসূরি। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যেকার বিবাদের নিস্পত্তি করা এর প্রধান কাজ। ১৫ জন বিচারপতি নিয়ে এই সংস্থা গঠিত হয়। তারা সাধারণ ও নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক যৌথভাবে (পরোক্ষভাবে) নির্বাচিত হন। প্রতি তিন বছরে এর এক-তৃতীয়াংশ পদ খালি হয়। এই আদালতের সনদে বলা আছে যে, জাতীয়তা নির্বিশেষে এর বিচারকমণ্ডলী নির্বাচিত হবেন। বৃহৎ শক্তিসমূহের বিশেষ প্রভাব থেকে আদালতকে মুক্ত রাখাই ছিল এর উদ্দেশ্য। কিন্তু, কার্যত নিরাপত্তা পরিষদের পাঁচটি স্থায়ী সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধি সর্বদাই এই আদালতে বহাল থাকেন এবং এঁদের কেউ মারা গেলে বা কারও মেয়াদ সমাপ্ত হলে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র থেকেই শূন্য পদ পূরণ করা হয়। বিবাদমান কোনো রাষ্ট্রের প্রতিনিধি বা বিচারক না থাকলে, মামলা চলাকালীন উক্ত রাষ্ট্রের তরফ থেকে একজন অস্থায়ী বিচারক নিয়োগের বিধান রয়েছে। জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ অন্তত বাহ্যত স্বীকার করে নিয়েছে যে, কতিপয় বিষয়ের ক্ষেত্রে আর্ন্তজাতিক আদালতের এখতিয়ার একচ্ছত্র, যেমন : ১. কোনো চুক্তিবিশেষের ব্যাখ্যা; ২. আন্তর্জাতিক আইন সংক্রান্ত যেকোনো প্রশ্ন; ৩. এমন কোনো বিষয়, যার অবস্থিতি আর্ন্তজাতিক দায়িত্বভঙ্গের শামিল এবং ৪. আর্ন্তজাতিক দায়িত্বভঙ্গের ক্ষেত্রে গৃহীতব্য ব্যবস্থার প্রকৃতি ও আওতা। অবশ্য, যুক্তরাজ্য তার সঙ্গে কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের বিবাদের ক্ষেত্রে এই আদালতের এখতিয়ার স্বীকার করতে চায় না। আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও 'যেসব বিবাদ আবশ্যিকভাবেই যুক্তরাষ্ট্রের এখতিয়ারভুক্ত'–সেসব বিবাদের ক্ষেত্রে এই আদালতের এখতিয়ার নেই বললে চলে।

আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা (International Labour Organisation ILO)

আর্ন্তজাতিক শ্রম সংস্থা বা আই. এল. ও. ১৯১৯ সালে ভার্সাই-সন্ধির ৩৮৭ থেকে ৪২৭ ধারা ও লীগ অব নেশনস্ গঠনতন্ত্র অনুসারে জেনেভা নগরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের চারটি বিভাগ রয়েছে, যথা; ১. সাধারণ সম্মেলন, ২. পরিচালক কমিটি, ৩. বিভিন্ন সহকারি সংগঠন, ও ৪. আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন। আন্তর্জাতিক কর্মপদ্ধতির মাধ্যমে শ্রমিক সমাজকে সংগঠিত করা ও শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ, জীবনমান ও আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নসাধনই এর উদ্দেশ্য। জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর ১৯৪৬ সালে এই শ্রম সংস্থার সঙ্গে জাতিসংঘের এক চুক্তি সম্পাদিত হয় এবং সদস্যদেশগুলোর সরকার, শ্রমিক ও মালিকদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই শ্রম সংস্থার কাঠামো গঠিত। শ্রমিক স্বার্থসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়, ভিন্ন দেশে কর্মরত শ্রমিকদের নিরাপত্তা ও স্বার্থসংক্রান্ত বিষয়, বিশ্বব্যাপী শ্রমিক সংগঠন ও শ্রমিক আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখা ও শক্তিশালী করা এবং উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের উদ্দেশে আর্ন্তজাতিক বা আঞ্চলিক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, প্রশিক্ষণ, কনভেনশন ইত্যাদির আয়োজন করা এই সংস্থার কর্মপরিধির অন্তর্গত। প্রতিবছর আহূত আর্ন্তজাতিক শ্রম সম্মেলনের মাধ্যমে সংস্থার নীতি ও কর্মসূচি নির্ধারিত হয়। এই সম্মেলনে প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্র দু'জন সরকারি, একজন মালিকপক্ষীয় ও একজন শ্রমিকপক্ষীয় প্রতিনিধি প্রেরণ করে। ২০ জন সরকারি প্রতিনিধি এবং মালিক ও শ্রমিকদের পক্ষ থেকে ১০ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে এর গভর্নিং বডি গঠিত হয়। এই সংস্থার একজন মহাপরিচালক নিযুক্ত করেন, যিনি সংস্থার প্রধান কার্যালয়ে অবস্থান করে গৃহীত কর্মসূচিসমূহ বাস্তবায়িত করেন এবং সংস্থার কার্যাবলী তদারক করেন। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় জেনেভায় অবস্থিত। পুঁজিবাদী দেশসমূহের মালিক-প্রতিনিধিরা একসময় দাবি উত্থাপন করেন যে, কমিউনিস্ট দেশসমূহ থেকে এই সংস্থায় মালিক প্রতিনিধি নেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই, কেননা তাঁরা প্রকৃতপক্ষে মালিক নন, তাঁরা বরং তাঁদের স্ব-স্ব সরকার কর্তৃক নিযুক্ত ও সরকারেরই আজ্ঞাবহ। অবশ্য, এ প্রচেষ্টা সফল হয় না। সংস্থার গভর্নিং বডির ১০টি আসন কানাডা, চীন ফ্রান্স, জাপান, পশ্চিম জার্মানি, ভারত, ইতালি, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জন্যে বরাদ্দ। এই সুবাদে যে, এই ১০টি দেশে শিল্প ও শ্রকিদের গুরুত্ব সর্বাধিক। বাকি ৩০টি আসন পূর্ণ করা হয় নির্বাচনের মাধ্যমে। বর্তমানে জাতিসংঘের একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা।

আর্ন্তজাতিকতাবাদ (Internationalism)

জাতীয়তাবাদের বিপরীত শক্তি হলো অর্ন্তজাতিকতাবাদ। আন্তর্জাতিকতাবাদীরা মানুষের ঐক্যে বিশ্বাস করে ও জাতিতে ভেদ দূর করতে চায়। জাতীয় সমস্যা মূলত আর্ন্তজাতিক সমস্যারই ফলশ্রুতি বিশেষ। তারা ঘৃণা, বিরোধ, গর্ব ও কুসংস্কারের বিরোধিতা করে এবং মানুষের মধ্যে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সৃষ্টি করতে আগ্রহী হয়। সমাজতন্ত্রীরা প্রধানত এই মতবাদের অনুসারী। তাঁরা মনে করেন যে,

শ্রমিক শ্রেণি বা সর্বহারা শ্রেণির সমস্যা দেশ-নির্বিশেষে একই চরিত্র সম্পন্ন। সুতরাং বিশ্বব্যাপী শ্রমিক শ্রেণির আন্দোলন গড়ে তোলা ও বিজয় অর্জনের মধ্যেই জাতীয় পর্যায়ে সর্বহারাদের চূড়ান্ত ও স্থায়ী মুক্তি সম্ভবপর। আজকাল অবশ্য অনেকে মনে করেন যে, জাতীয়তাবাদ ও আন্তর্জাতিকতাবাদের মধ্যে মূলত কোনো বিরোধ নেই এবং ফলে জাতীয় সমস্যার পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয় আন্দোলন পরিচালনার পাশাপাশি, বিশ্বের যেকোনো দেশের জনগণের, বিশেষত সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে বা সহযোগিতা প্রদান করতে কোনো বাধা নেই।

আল আক্সা মসজিদ (Al Aksa Mosque)

ডফলিস্তিনের প্রাণকেন্দ্র জেরুালেম নগরীতে অবস্থিত আল আক্সা মসজিদ মুসলমানদের নিকট পৃথিবীর দ্বিতীয় পবিত্রতম মসজিদ। এই মসজিদটি বিশ্ব মুসলিমের প্রথম কিবলাহ্ হিসেবে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। আল আক্সা মসজিদের মধ্যে হযরত সুলায়মান (আঃ) এর আসন ও হযরত দাউদ (আঃ) এর মেহরাব রয়েছে। এই মসজিদের পবিত্রতার কারণেই মূলত জেরুজালেম নগরীর গুরুত্ব মুসলমানদের নিকট অত্যন্ত বেশি। মক্কা শরীফের পরেই মুসলমানদের নিকট এই মসজিদের গুরুত্ব। আক্সা শব্দের অর্থ দূরবর্তী। সম্ভবত মক্কা নগরী থেকে জেরুজালেম এর দূরত্বের কারণে এই নামকরণ করা হয়েছে। জেরুজালেম নগরীটি ইহুদীদের নিকটও পবিত্রতম স্থান। তাই জেরুজালেম নিয়ে মুসলমানদের সাথে ইহুদীদের ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব রয়েছে। আল আক্সা মসজিদের আদি নাম ছিলো বাইতুল মাকাদস। তবে মহানবী (সা:)-এর ইসলামী যুগ হতে এর নাম হয় আল আক্সা মসজিদ। মসজিদে আকসা মুসলমানদের কাছে গত সাড়ে ১৪শ বছর যাবত দুই কেবলার প্রথম কিবলাহ্ ও তিন হারাম শরীফের তৃতীয় হারাম শরীফ হিসেবে বিবেচিত।

আল কায়েদা (Al-Qaeda)

বহুল আলোচিত, নন্দিত-নিন্দিত ওসামা বিন লাদেনের সংগঠনের নাম আল কায়েদা। বিশ্বের প্রায় অনেক দেশেই আল কায়েদার সদস্যদ আছে বলে ধারণা করা হয়। বসনিয়া, চেচনিয়া, তাজিকিস্তান, সোমালিয়া, ইয়েমেন ও কসোভোতে মুসলিম যোদ্ধাদের সমর্থন, সাহায্য ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আল কায়েদার সদস্যরা। আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার সমর্থন, সাহায্য ও প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে আল কায়েদার সদস্যরা। আফগানিস্তানের সাথে রাশিয়ার যুদ্ধ সংগঠনটির জন্মের পটভূমি। ১৯৮৮ সালের দিকে আল কায়েদা আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করে। এর প্রাথমিক লক্ষ্য ইসলামের শত্রুদের ধ্বংস করা এবং ইসলামী দেশসমূহ থেকে দুর্নীতিগ্রস্ত মুসলিম নামধারী শাসকদের ক্ষমতা থেকে সরিয়ে ইসলামী সরকার প্রতিষ্ঠা করা, যে সরকার শরীয়াহ অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করবে। সৌদি ধনীকুবের লাদেন তাঁর সম্পত্তির একটা বিরাট অংশ ব্যয় করে আল কায়েদার সদস্যদের ভরণ-পোষণ ও প্রশিক্ষণের

জন্য। তাছাড়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মুসলমানরা আল কায়েদার জন্য সাহায্য পাঠিয়ে থাকে। এ সকল সহায্য সবই আসে ব্যক্তি পর্যায়ে থেকে। ইসলামের বাস্তবপন্থী মুসলিমরা আল কায়েদার জন্য আর্থিক ও নৈতিক সাহায্য যুগিয়ে থাকে।

আল জাজিরা (Al *Jazeera*)

কাতারভিত্তিক আরবি ভাষার স্যাটেলাইট টিভি চ্যানেল। বিশ্বব্যাপী জনপ্রিয় এ চ্যানেলটির জন্ম ১৯৯৬ সালের ১ নভেম্বর। আল জাজিরা ২০০১-২০০২ সালে আফগানিস্তানে মার্কিন নেতৃত্বাধীন হামলার ছবি সরাসরি সম্প্রচার করতে পারা একমাত্র টিভি চ্যানল। 'আল জাজরিা' শব্দটির বাংলা অর্থ উপদ্বীপ। আফগানিস্তানের তালেবানের সঙ্গে আমেরিকা ও তার মিত্র দেশগলোর যে দ্বন্দ্ব, সে সম্পর্কে সবচেয়ে আকর্ষণীয় রিপোর্ট প্রচার করে এই চ্যানেলটি। এই টিভি চ্যানেলটি একমাত্র বিদেশি সম্প্রচার মাধ্যম, যেটিকে আফগানিস্তানে তালেবান শাসনামলে স্বীকৃতি দেয়া হয়। ৮ অক্টোবর ২০০১ আফগানিস্তানে বিমান হামলা শুরু হলে একমাত্র এই টিভি চ্যানলেটি ওসামা বিন লাদেনের একটি সাক্ষাৎকার সম্প্রচার করতে সক্ষম হয়। আফগানিস্তানে যে হামলা হয় তার প্রত্যক্ষ ছবি পরিবেশনের জন্য সিএনএন ও বিবিসির মতো চ্যানলকে আর জাজিরার ওপর নির্ভর করতে হয়। এর ধারণ করা দৃশ্য সারা দুনিয়ায় পরিবেশন করে এপি,এএফপি, রয়টার্স প্রভৃতি বার্তা সংস্থা। আল জাজিরা অসংখ্য এক্সক্লুসিভ রিপোর্ট প্রচার করতে সক্ষম হয়। ২০০৩ সালের ইরাকে ইঙ্গ-মার্কিন অন্যায় আগ্রাসনের সমং। এ চ্যানেল বিবিসি, এবিসি, সিএনএন-এর মতো মিথ্যা ও একপেশে খবর প্রচার না করে- নিজেদের নিরপেক্ষতা ও বস্তুনিষ্ঠতা বজায় রাখে ইঙ্গ-মার্কিন জোটের প্রচণ্ড চাপ সত্ত্বেও। কাতারের অমির পরিবারের অর্থসাহায্য ছাড়াও বিজ্ঞাপন এবং দর্শকদের ট্যাক্সের টাকায় চ্যানেলটির সব ব্যয় নির্বাহ হয়। চ্যানেলটির যুক্তরাজ্য ও ইউরোপে তাদের অনুষ্ঠান সম্প্রচারের জন্য স্কাই টিভি সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এর জনপ্রিয়তা প্রথমত সংবাদের কারণে, দ্বিতীয়ত রাজনৈতিক, সামাজিক এমনকি যৌন বিষয়ে টক শো প্রচারের জন্য। সব মিলিয়ে পেশাদার সাংবাদিকতার আচরণের কারণেই আল জাজিরা টিভি চ্যানেলটি আলোচনায় আসে।

আলজিরিয়া সংকট (Algeria Crisis)

বিংশ শতাব্দীর পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি সময়ে বেনবেল্টাসহ তরুণরা আলজিরিয়াকে ফরাসি সাম্রাজ্যবাদের কবলমুক্ত করার জন্যে গঠন করেন জাতীয় মুক্তি ফ্রন্ট (Front de Liberation Nationale-FLN)। প্রায় ৩,৫০,০০০ প্রাণের বিনিময়ে ১৯৬২ সালের জুলাই মাসে আলজিরিয়া স্বাধীনতা অর্জন করে। কিন্তু ১৯৬৫ সালের জুন মাসে এক সামরিক ক্যু এর মাধ্যমে কর্নেল হুয়ারি বুমেদিন বেনবেল্লা সরকারকে উৎখাত করেন। ১৯৮৮ সালের অক্টোবরে ব্যাপক গণবিক্ষোভ দেখা দিলে সরকার তা কঠোর

হস্তে দমন করে। ১৯৯১ সালের ডিসেম্বরে সরকার নির্বাচন অনুষ্ঠানে বাধ্য হলে এই নির্বাচনে ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট প্রায় ৮০% ভোট পেয়ে বিজয়ী হয়। এমতাবস্থায়, সামরিক বাহিনী অপর এক ক্যু-এর মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট শাদলি বেনাজাদিদ সরকারকে উৎখাত করে এবং বিজয়ী ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতেও অস্বীকার করে। ফলে, এক গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই গৃহযুদ্ধে ১৯৯৭ সাল নাগাদ ১,১০,০০০ মানুষ নিহত হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

আসিয়ান (ASEAN)

১৯৬৭ সালের ৮ আগস্ট থাইল্যান্ডের রাজধানী ব্যাংককে আসিয়ানের সদস্য রাষ্ট্রের পররাষ্ট্র মন্ত্রীদের ব্যাংকক ঘোষণার মাধ্যমে আসিয়ান গঠিত হয়। 'আসিয়ান' দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার একটি আঞ্চলিক সংগঠন। এর সম্প্রসারিত রূপ হল Association of South East Asian Nations. অর্থাৎ দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় জাতিসমূহের সংঘ। ইন্দোনেশিয়া ও মালয়েশিয়ার সংঘর্ষের পর ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাসে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও ফিলিপিন্স– এই পাঁচটি উদ্যোক্তা সদস্যের উদ্যোগে আসিয়ান গঠিত হয়। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার আর্থিক প্রবৃদ্ধি, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অগ্রগতি এবং আঞ্চলিক শান্তি ও স্থিতিশীলতা সুনিশ্চিত করার জন্য যৌথ প্রচেষ্টা চালানো। এই প্রচেষ্টা সমতা ও অংশীদারের ভিত্তিতে হবে। আসিয়ানভূক্ত প্রায় সব দেশেই অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহগত সমস্যা রয়েছে। যেমন-ফিলিপাইনে মরো মুসলিম সমস্যা এবং কমিউনিস্ট বিদ্রোহগত সমস্যা। এ সকল সমস্যা সমাধান এককভাবে সম্ভব নয় বলে তারা কমিউনিস্ট বিদ্রোহ বিরোধী পরিকল্পনাপ্রণয়নের জন্য আসিয়ান গঠন করে। সত্তরের দশকে ভিয়েতনাম, কম্বোডিয়া ও লাওসে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে, শঙ্কিত আসিয়ান সদস্যরা ১৯৭৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে ইন্দোনেশিয়ার বালিতে এক শীর্ষ সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনে গৃহীত 'আসিয়ান ঐকমত্য ঘোষণা' শীর্ষক ঘোষণায় বলা হয়, তার তাৎপর্য হল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া থেকে সমাজতন্ত্রের মূলোৎপাটন। ভিয়েতনাম, লাওস ও কম্বোডিয়া এই ঘোষণার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। ১৯৭৮ সালে জাকার্তায় স্থাপিত হয় আসিয়ানের স্থায়ী সেক্রেটারিয়েট। এর প্রথম সেক্রেটারি জেনারেল ইন্দোনেশিয়ার জেনারেল রেক্সো দার্শনো ইন্দোনেশীয় সরকারের বৈষম্যমূলক অর্থনৈতিক ও সামাজিক নীতির সমালোচনা করায় ১৯৭৮ সালের ফেব্রুয়ারিতে পদচ্যুত হন। আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে হ্রাসকৃত শুল্কে বাণিজ্য ও শিল্প বিনিয়োগ নীতি চালু করার কথা থাকলেও, স্বার্থের স্ববিরোধিতা একে আশানুরূপ গতিশীল করে তুলতে পারেনি। আসিয়ানের পৃষ্ঠপোষকতা প্রধানত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান ও অস্ট্রেলিয়া করছে। এসব দেশ এবং ইইসিভুক্ত দেশসমূহের সঙ্গে আসিয়ানের অর্থনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। চীনেও আসিয়ানকে সমর্থন দিয়েছে, প্রধানত এই ভরসায় যে, এর আওতাভূক্ত দেশসমূহ

তৎকালীন সোভিয়েত বলয়কে প্রতিহত করবে। কিন্তু তা সত্ত্বেও আসিয়ানভুক্ত দেশসমূহ কখনোই চীনকে তেমন একটা সুদৃষ্টিতে দেখেনি।

ইউটোপিয়া (Utopia)

ইউটোপিয়া গ্রিক Utopia শব্দটির শাব্দিক অর্থ 'কোথাও না' (Nowhere) অর্থাৎ যা কোথাও নেই; একমাত্র কল্পনার রাজ্যে অবস্থান। টমাস মুর (Thomas Moor) Utopia নামক গ্রন্থে এমন একটা দ্বীপের কল্পনা করেছিলেন যেখানে সম্পদের ওপর সমগ্র জনগণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত এবং সেখানে অনাবিল সুখ-শান্তি বিরাজমান। তিনি এই গ্রন্থে শোষিত কৃষকদের ক্ষোভ ও প্রতিবাদ তুলে ধরেন এবং তাদের ইউটোপীয় বা কাল্পনিক স্বর্গের বা সুখের স্বপ্ন দেখান। আধুনিক যুগেও সমৃদ্ধশালী সমাজব্যবস্থাকে ইউটোপিয়া বলা হয়। তাছাড়া বর্তমানে যে সকল রাজনীতিবিদ ও সমাজবিদ জনগণের সামনে এমন ভবিষ্যৎ সমাজচিত্র তুলে ধরেন যা কল্পনায় চমৎকার কিন্তু বাস্তবে সম্ভব নয়, তাদেরকে ইউটোপীয় বলে অভিহিত করা হয়। ইউটোপীয় শব্দ থেকে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র কথাটির উদ্ভব।

ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism)

সামন্ত সমাজের ধ্বংসাবশেষ থেকে আধুনিক যে বুর্জোয়া সমাজের উৎপত্তি হয়েছে তার সন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছে ইউরোপীয় সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism) বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্র। সাধারণত সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়টি ইউটোপীয় সমাজতন্ত্র নামে পরিচিত। এই কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের মূল প্রবক্তা হলেন ফ্রান্সের সাঁ সিঁমো ও শার্ল ফুরিয়ে এবং ইংল্যান্ডের ররাট আওয়েন। তাঁরা এমন একটি সমাজের কল্পনা করেছেন, যেখানে সম্পদ হবে জনগণের, প্রত্যেক মানুষের শ্রমদান হবে স্বেচ্ছামূলক এবং সমানভাবে বন্টন হবে। কিন্তু ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীরা সম্পদ ও শ্রেণির ভূমিকা এবং ইতিহাসের প্রগতিশীল বিকাশধারা উপলব্ধি করতে সমর্থ হননি। তারা মনে করেন যে, বিপ্লবের তত্ত্ব পরিহার করেন। সমাজে অবস্থিত সামাজিক সম্পর্কের যে পরিবর্তন হয় সে সম্পর্কে ধারণা দিতে ব্যর্থ হয়, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান, নৈতিক মান ও ধর্মই হল সমাজ বিকাশের চালিকাশক্তি এবং সমাজতান্ত্রিক ধ্যানধারণা প্রচার ও বিস্তারের মাধ্যমে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় ক্রমপরিবর্তন সম্ভব হয়। পরবর্তীতে ইউটোপীয় সমাজতন্ত্রীদের অবৈজ্ঞানিক চিন্তাধারাকে প্রতিহত করার উদ্দেশে ফ্রেডারিক এঙ্গেলস তাঁর বিখ্যাত ইউটোপীয় ও বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র গ্রন্থটি রচনা করেন। বাস্তব যে সকল চিন্তাবিদ বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ না করে, কল্পনা বা পূর্ব নির্ধারিত ধারণা দিয়ে বাস্তবকে বিশ্লেষণ বা ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পান এবং যারা সমাজতন্ত্র উত্তরণের কাল্পনিক ও অবস্তুবাদী পথনির্দেশ করেন, তাদেরকেই ইউরোপীয় বা কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী বলা হয়।

ইউনিসেফ (UNICEF)

জাতিসংঘের **আন্তর্জাতিক শিশু জরুরি তহবিল** বা United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF), ১৯৪৬ সালের ১১ ডিসেম্বর গঠিত হয়। এর মূল উদ্দেশ্য হলো অনুন্নত দেশসমূহে স্থায়ীভাবে শিশু স্বাস্থ্য রক্ষা করা এবং জনকল্যাণ কাজে সহযোগিতা করা। মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্থ দেশসমূহের শিশুদের স্বাস্থ্য ও কল্যাণার্থে এই তহবিল গঠন করা হলেও, ১৯৫০ সাল থেকে এই তহবিল সমগ্র অনুন্নত বিশ্বের শিশুকল্যাণ অংশগ্রহণ করে আসছে। জাতিসংঘের এই অঙ্গ সংগঠনটির সদর দফতর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরে অবস্থিত। ইউনিসেফের সাংগঠনিক কাঠামে হলো; কার্যনির্বাহী পরিষদ, কর্মসূচি বিষয়ক কমিটি, জাতীয় কমিটি ও সচিবালয়। এই সংগঠন পরামর্শগত সহায়তা ছাড়াও তহবিল সম্ভাব্য ক্ষেত্রে বস্তুগত সহায়তাদিও প্রদান করে থাকে।

ইউনেস্কো (UNESCO)

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতি সংগঠন বা United Nations Education, Science and Cultural Organization (UNESCO), ১৯৪৬ সালের ৪ নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়। এর উদ্দেশ্য হল শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে ন্যায়বিচার, আইনের শাসন, মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি শ্রদ্ধা সৃষ্টি এবং শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ। একটি সাধারণ সম্মেলন (প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের এক-একজন প্রতিনিধির সমন্বয়ে), একটি কার্য নির্বাহী পরিষদ এবং একজন মহাসচিবসহ একটি সচিবালয় এর রয়েছে। এই সংস্থার প্রধান কার্যালয় প্যারিসে অবস্থিত। জাতিসংঘের যারা সদস্য রাষ্ট্র তারা সবাই পদাধিকার বলে ইউনেস্কোর সদস্য। এই সংস্থার কার্যক্রম প্রধান নিম্নরূপঃ ১. শিক্ষামূলকঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, মৌলিক শিক্ষা, উন্নততর শিক্ষা-পদ্ধতির ওপর গবেষণা ও তথ্য সরবরাহ ইত্যাদি; ২. প্রকৃতিবিজ্ঞানমূলকঃ বিজ্ঞানীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা সৃষ্টি ও বিজ্ঞানকে জনপ্রিয়করণ; ৩. সমাজবিজ্ঞানঃ বর্ণবৈষম্য, ধর্মীয় দ্বন্দ্ব ইত্যাদি নিরসনকল্পে সংশ্লিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক সমস্যাসমূহের ওপর গবেষণাকে উৎসাহ দান; ৪. সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডঃ সদস্যরাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সাংস্কৃতিক বিনিময় এবং শিল্প, সাহিত্য ও দর্শনকে গণমুখীকরণ; ৫. ব্যক্তি-বিনিময়ঃ বিদেশে চাকরি ও অধ্যয়নের ব্যাপারে তথ্য সরবরাহ, ফেলোশিপ প্রদান ইত্যাদি; ৬. জনসংযোগঃ ইউনেস্কোর কর্মকাণ্ড এবং শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক সম্পর্কে জনগণকে অবহিতকরণ; ৭. পুনর্বাসনঃ অনুন্নত বিশ্বের এবং যুদ্ধ বা প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকার শিক্ষায়তন, লাইব্রেরি, বিজ্ঞান সনদ ইত্যাদির প্রয়োজন নির্ধারণ ও সে প্রয়োজন মেটানোর ব্যাপারে পরামর্শ ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতা প্রদান এবং ৮. কারিগরি সহায়তাঃ সাধারণ ও কারিগরি শিক্ষা, মৌলিক শিক্ষা, শিক্ষক-প্রশিক্ষণ, বৈজ্ঞানিক গবেষণা ইত্যাদির ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

প্রদান করে থাকে। সদস্য রাষ্ট্রগুলো প্রতি দুই বছরে একবার সাধারণ সম্মেলনে মিলিত হয়ে এই সংস্থার নীতি নির্ধারণ, কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাজেট অনুমোদন করে থাকে।

ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার (UNESCO Peace Prize)

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক সংস্থা (UNESCO) কর্তৃক প্রবর্তিত পুরস্কার। ইউনেস্কো প্রদত্ত এ শান্তি পুরস্কারের অফিসিয়াল নাম কেলিক্স হোফেট বয়গ্নি পুরস্কার। আইভিরি কোস্টের পরলোকগত প্রেসিডেন্ট কেলিক্স হোফেট বয়গ্নি'র নামানুসারে এ নামকরণ করা হয়েছে। ১৯৮৯ সাল থেকে ইউনেস্কো শান্তি পুরস্কার প্রবতর্ন করা হয়। শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের জন্য এ পুরস্কার দেয়া হয়।

ইউপিআই (UPI)

ইউনাইটেড প্রেস (১৯০৭) এবং ইন্টারন্যাশনাল নিউজ সার্ভিস (১৯০৯) বিলুপ্ত করে ১৯৫৮ সালে ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল নামে এই সংবাদসংস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। প্রায় ১০০টি দেশে ইউপিআই অর্থাৎ 'ইউনাইটেড প্রেস ইন্টারন্যাশনাল' সংবাদ প্রেরণ করে থাকে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১,১৫০টি সংবাদপত্র এবং প্রায় ৩,৮৫০টি বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্রসহ বিশ্বের ৫৮৮০টি সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র এর সরবরাহ করা সংবাদের গ্রাহক। ইউপিআই-এর ১৬৪টি ব্যুরোতে কর্মরত আছে ১,৭২৫ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী। এটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বেসরকারি ব্যক্তিমালিকানাধীন সংস্থা।

ইউরো (Euro)

ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যরাষ্ট্রসমূহ তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতাকে সংহত করার উদ্দেশে ১৯৬০ সাল থেকেই একটি সাধারণ বা কমন মুদ্রার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করে আসছিল। ১৯৮৯ সালে মাদ্রিদে অনুষ্ঠিত ইউরোপীয় কাউন্সিলের সভায় সংশ্লিষ্ট দেশসমূহের রাষ্ট্রনায়করা অর্থনৈতিক ও মুদ্রাসংক্রান্ত ঐক্যের সিদ্ধান্ত নেয়। অতঃপর, ১৯৯৯ সালে মাসত্রিশটে স্বাক্ষরিত চুক্তি মোতাবেক স্থির হয় যে ঐকমত্যসম্পন্ন রাষ্ট্রসমূহের জন্যে একটি সাধারণ মুদ্রা প্রচলন করা হবে, যে মুদ্রা ইউরো মানি বা ইউরো নামে পরিচিত হবে। মাসত্রিশটে এ ব্যাপারে কয়েকটি মূল শর্ত আরোপ করা হয়। যেমন: ১. দ্রব্যমূল্যের ওপরের স্তরে স্থিতিশীলতা অর্জন করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দেশকে প্রমাণ করতে হবে যে, সে দেশ মুদ্রাস্ফীতির মোকাবিলা করতে সক্ষম; ২. অর্থনীতির স্বচ্ছতা ও ধারাবাহিকতা থাকতে হবে এবং জিডিপ র ৩%-এর বেশি ঘাটতি রাখা যাবে না; ৩. সংশ্লিষ্ট দেশকে অন্তত দু'বছর ইউরোপীয় মুদ্রাব্যবস্থা (EMS)-এর সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকতে হবে এবং ৪. সংশ্লিষ্ট দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের স্বাধীনতা থাকতে হবে আর এটা সুনিশ্চিত করতে হবে যে, জাতীয় বাজেটের ঘাটতি মেটাতে সংশ্লিষ্ট কেন্দ্রীয় ব্যাংক কোনো ঋণ দেবে না। ইউরোপের যেসব রাষ্ট্র উপরোক্ত শর্তসমূহ পূরণ

করবে, তারাই এই একক মুদ্রাব্যবস্থার আওতায় আসতে পারবে। ১৯৯৯ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ১১টি দেশে ইউরো চালু হয়েছে।

ইউরোপীয় পার্লামেন্ট (European Parliament)

এটি একটি বিশেষ ধরনের পার্লামেন্ট। বিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে পশ্চিম ইউরোপে আন্তঃদেশীয় সংসদীয় ধরনের কিছু প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপীয় দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক সহযোগিতার জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। যেমন 'ইউরোপীয়ান কয়েল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি' (European Coal and Steel Community-ECSC) 'ইউরোপীয়ান এটমিক এনার্জি কমিউনিটি (European Atomc Energy Community), 'ইউরোপীয়ান ইকনোমিক কমিউনিটি' (European Economic Community) ইত্যাদি। এসব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এমন কিছু বিষয় জড়িয়ে পড়ে যেগুলো সম্পর্কে শুধু দেশীয় আইনসভাগুলোর সিদ্ধান্ত যথেষ্ট নয় বলে প্রতীয়মান হয়। এসব বিষয় সম্পর্কে আন্তঃদেশীয় পার্লামেন্টারি সমালোচনা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন অনুভূত হয়। এজন্যই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয় 'কনসালটেটিভ এসেম্বেলি অব দি কাউন্সিল অব ইউরোপ' (১৯৪৯), এরপর গঠিত হয়, 'নরডিক কাউন্সিল' (১৯৫৩), তারপর 'এসেম্বলি অব ওয়েস্টার্ন ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন' (১৯৫৪), 'বেনেলাক্স কনসালটেটিভ ইন্টারপার্মামেন্টারি কাউন্সিল' (১৯৫৭)। ১৯৫৮ সালে 'ইউরোপীয়ান কয়েল অ্যান্ড স্টিল কমিউনিটি'র 'কমন এসেম্বলি' থেকে গঠিত 'ইউরোপীয়ান পার্লামেন্টারি এসেম্বলি' (European Parliamentary Assembly)। এখন এ প্রতিষ্ঠানটির জনপ্রিয় ও পরিবর্তিত নাম European Parliament (দ্র. Encyclopedia Britannica, Vol.17.1969)।

প্রথমদিকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য ছিল মাত্র ৬টি দেশ-ফ্রান্স, ফেডারেল রিপাবলিক অব জার্মানি, ইটালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস ও লুক্সেমবার্গ। পরবর্তীকালে এর সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বর্তমানে ১২টি দেশ এর সদস্য। প্রথমদিকে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা প্রত্যেকটি দেশের পার্লামেন্ট কর্তৃক মনোনীত হতেন। ১৯৭৬ সালে সিদ্ধান্ত হয় যে, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্যরা সরাসরি নির্বাচিত হবেন। তাঁদের মেয়াদকাল হবে ৫ বছর। সে সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ১৯৭৯ সালে প্রথম নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৭৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপীয় পার্লামেন্টের সদস্য সংখ্যা ছিল ১৯৮। এখন এ সংখ্যা ৬২৬। সদস্যদের বলা হয় 'Member of European Parliament' (MEPs).

ইউরোপীয় কমিশনের কাজের ওপর পার্লামেন্টের নিয়ন্ত্রণ ও কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষমতা রয়েছে। কমিশন প্রণীত বাজেট পার্লামেন্ট প্রত্যাখ্যান করতে পারে। কমিশনের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্বাত এনে কমিশনকে পদত্যাগে বাধ্য করতে পারে। তবু ইউরোপীয় পার্লামেন্টের বাস্তব ক্ষমতা নিয়ে মতোভেদ আছে। অনেকে বলেছেন, 'In practice it is powerless...' কার্যত এটি একটি 'talking shop' ছাড়া কিছু নয়-এমন কথাও কেউ কেউ বলছেন।

১৯৯১ সালের ম্যাসট্রিস্ট যুক্তির ফলে ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। যদিও একেবারে গোড়ার দিকে ECSC-এ পরাপর্শক কমিটি হিসেবেই ইউরোপীয় পার্লামেন্ট কাজ ক্ষমতা তবু আস্তে আস্তে এর আইন প্রণয়ন ক্ষমতা বেড়েছে। এক্ষেত্রে প্রথম বড় ধরনের অগ্রগতি সাধিত হয় ১৯৮৭ সালে, Single European Act (SEA) পাস করার মাধ্যমে। এ আইন অনুযায়ী ইউরোপীয় পার্লামেন্টের প্রস্তাবিত আইন বা সিদ্ধান্ত ইউরোপীয় কমিশনের 'কাউন্সিল অব মিনিস্টার্স' কেবল সর্বসম্মত ভোটের মাধ্যমে বাতিল করতে পারে।

পার্লামেন্ট প্রতি মাসে একবার এক সপ্তাহের জন্য বৈঠকে বসে। সাধারণত ফ্রান্সের স্ট্রসবার্গে (Strasbourg) এর অধিবেশন হয়। তবে বছরে একবার ব্রাসেলস-এ বৈঠক হয়। একজন প্রেসিডেন্ট এর প্রধান কাজ করেন। তাঁর যথেষ্ট প্রভাব ও আনুষ্ঠানিক কাজ রয়েছে (দ্র. NIcholas Comfort, *Brewer's Polities*, Revised Edition, Cassell, London, 1995)। (সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, ঢাকাঃ পার্লামন্টোরি শব্দকোষ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা (European Political Thought)

ইউরোপীয় চিন্তাধারার চারণক্ষেত্র পাশ্চাত্যের ইউরোপীয় দেশসমূহ এবং প্রাচীন গ্রীস হচ্ছে প্রধানতম লালন ক্ষেত্র। গ্রীসবাসীদের যুক্তিবাদী চিন্তাধারা, ব্যক্তিস্বাধীনতা, নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী ও নগর রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের কারণে প্রাচীন গ্রীস সভ্যতা অন্যান্য সভ্যতা থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর ছিল। সুদূর অতীতে ভূ-মধ্যসাগরের বেলাভূমিতে অবস্থিত পর্বতসংস্কুল এই ক্ষুদ্র দেশের রাষ্ট্রচিন্তা সে অপূর্ব উৎকর্ষ সাধিত হয় বর্তমানের ইউরোপীয় চিন্তাধারাকে পুষ্পে পুষ্পে শোভিত করেছে। তাই প্রাচীন গ্রীস ও এথেন্সের রাষ্ট্রচিন্তাকে ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা বলা হয়।

ইখওয়ানুল মুসলিমিন (*Ikhwanul* Muslimin)

মিশরে প্রতিষ্ঠিত ইসলামভিত্তিক রাজনৈতিক দল। প্রতিষ্ঠাতা শায়েখ হাসানুল বান্না। দেশের মানুষকে ইসলামের বিপ্লবী চেতনার দিকে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্য ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি 'ইখওয়ানুল মুসলিমিন' নামক একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন। সময়ের ব্যবধানে এ সংগঠনের জনপ্রিয়তা ব্যাপকতা লাভ করে। মিশরের জালেম শাসকদের সাথে পাল্লা দিয়ে শায়খ বান্না তাঁর দলকে মজবুত করতে লাগলেন। এটাই শাসকদের সহ্য হলো না। ১৯৪৮ সালের ৮ ডিসেম্বর ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে নিষিদ্ধ করার ঘোষণা এবং ইখওয়ানের কেন্দ্রীয় কার্যালয় থেকে শেখ বান্না ছাড়া উপস্থিত সকল নেতৃবৃন্দকে গ্রেপ্তার করা হয়। ইখওয়ানের সব তহবিল ও সম্পদ বাজেয়াপ্ত, হাসপাতাল, স্কুল, ক্লাব, শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করে দেয়া হলো। সারা দেশের হাজার হাজার ইখওয়ান কর্মীদেরকে গ্রেপ্তার করা হলো। জেলখানায় তাঁদের ওপর

চালানো হলো নির্যাতন। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ থেকে শুরু করে গ্রামাঞ্চলের সদস্যদেরকে পর্যন্ত বন্দি করা হলো। কিন্তু বন্দি করা হলো না শুধু শেখ হাসানুল বান্নাকে উদ্দেশ্য গুপ্তঘাতক দিয়ে হত্যা করা। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি শেখ বান্না কায়রোস্থিত ইয়ং মেনস মুসলিম অ্যাসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে ভাষণ শেষে ট্যাক্সিতে আরোহণ করাকালে শাসক গোষ্ঠীর এজেন্ট এক আততায়ীর গুলিতে শাহাদাতবরণ করেন। পরে ইখওয়ানের নেতা কর্মীদের ওপর নেমে আসে নির্মম নির্যাতন ইখওয়ানের বহু নেতা কর্মীকের ফাঁসি দেয়া হয়। দীর্ঘ প্রায় দু-দশক এ দলটি নিষিদ্ধ ছিল। বর্তমানে এটি মিশরের দ্বিতীয় বৃহত্তম দল। এটি একটি আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক দল। কেননা মিশর, সুদান, জর্ডান, লিবিয়া, সিরিয়াসহ আরব বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশে এটি স্বনামে কিংবা ভিন্ন নামে প্রতিষ্ঠিত দল। বর্তমানে সুদানে ক্ষমতাসীন সরকার ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রভাবিত।

ইজতিহাদ (Istihad)

ইজতিহাদ একটি আরবি শব্দ যার অর্থ হচ্ছে স্বীয় শক্তি বা বুদ্ধিমত্তার প্রয়োগ।। হযরত মুহাম্মদ (সা:) এর মৃত্যু পরবর্তী সময়ে ইসলামি রাষ্ট্রের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় অর্থনৈতিক, সামাজিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও চিন্তা চেতনার ক্ষেত্রে এমন এক নতুন ও জটিল সমস্যা সৃষ্টি হতে থাকে যার সমাধান কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা সরাসরি দেওয়া সম্ভব নয়। এমতবস্থায়, ইসলামি আইন ও শাস্ত্রবিদরা কুরআন ও সুন্নাহ শাশ্বত বাণীর ভিত্তিতে স্বীয় বিচার বুদ্ধি প্রয়োগ করে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে সচেষ্ট হন। নতুন পরিস্থিতিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এই প্রক্রিয়ার নামই ইজতিহাদ। তবে ইসলামের মৌল নীতির ক্ষেত্রে ইজতিহাদের প্রয়োগ নিষিদ্ধ। যাঁরা ইজতিহাদ করেন তাদেরকে বলা হয় মুজতাহিদ। উল্লেখ্য যে, শিয়া ও সুন্নি উভয় সম্প্রদায় পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে কুরআন সুন্নাহর মর্মবাণী মৌলনীতির প্রায়োগিক রূপ নির্ধারণের নির্ভরশীল উপায় হিসেবে গ্রহণ করে।

ইজিয়ানা সভ্যতা (Aegean Civilizations)

বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার মধ্যে ইজিয়ানা সভ্যতা অন্যতম। ৩০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ইউরোপের মাটিতে ইজয়িানা সমদ্রের নিকটবর্তী ক্রিট দ্বীপকে কেন্দ্র করে এ সভ্যতা গড়ে ওঠেছিল। এ সভ্যতা সিন্ধু, মিশরীয় ও সুমেরীয় সভ্যতার সমসাময়িক। ইজিয়ানা সভ্যতার অপর নাম Minoan। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১০০০ অব্দে এর বিকাশ ঘটে। গ্রিককেন্দ্রিক ও সভ্যতার বিস্তৃতি ঘটে ইজায়ান সমুদ্রের ক্রিট দ্বীপ, গ্রিস ও সিক্লাডিম দ্বীপে। এ সভ্যতার লোকেরা আর্থিকভাবে সচ্ছল ছিল। নাসোন, মালিয়া, জাকরস প্রভৃতি অঞ্চলে এরা অটাটপালিক নির্মাণ করে বসবাস করতো ইজিয়ানদের ধর্ম বিশ্বাসের ক্ষেত্রে ছিল দেবদেবীর পূঁজা। সাপ ও ষাঁড় ছিল তাদের প্রদান আরাধ্য।

ইতিহাস (History)

অতীতের ইতিবৃত্তকে ইতিহাস বলা হয়। ইতিহাসকে প্রধানত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা- ১.প্রাচীন ইতিহাস (মানব-সভ্যতার প্রথম থেকে ৪৭৬ সালে রোম নগরীর পতনের সময় পর্যন্ত), ২.মধ্যযুগের ইতিহাস (রোম নগরীর পতন থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত) এবং ৩. আধুনিক ইতিহাস (ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম থেকে বর্তমান সময় পর্যন্ত)। গ্রিক ঐতিহাসিক হিরোডোটাস (খ্রিস্টপূর্ব ৪৮৪-৪২৪) কে ইতিহাসের জনক বলা হয়। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত ইতিহাস বলতে রাজা রাজসভাদের কাহিনীকেই বোঝাত। তাছাড়াও প্রধানত যুদ্ধের জয় পরাজয়ের কাহিনীকেও ইতিহাস বলা হত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রিটেনের এডওয়ার্ড গিবন (১৭৩৭-১৭৯৪) এবং উনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কে (১৭৯৫-১৮৮৬) রাজা ও রাজ দরবারের কাহিনীর পাশাপাশি সমকালীন রাজনীতি, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, সাংস্কৃতি ইত্যাদিকেও ইতিহাসের বিষয়ভুক্ত বলে মত প্রকাশ করেন। তাঁরা এটা দেখানোর প্রয়াস পান যে, সংশ্লিষ্ট সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন কোনো ঘটনা আদৌ ঘটতে পারে না। এজন্য তাঁদেরকে বলা হয় আধুনিক ইতিহাসের জনক। কার্ল মার্কসের মতে, মানুষের সমগ্র ইতিহাসই হল মূলত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস; শোষক এবং শোষিতের দ্বন্দ্বের ইতিহাস।

ইনকা সভ্যতা (*Inca* Civilization)

ইনকারা আদিতে গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজজীবনে বসবাস ক্ষমতা। এদের মূল বাসভূমি ছিল পেরু অঞ্চলের দক্ষিণাংশে কুস্কো (Cuzco) নামক স্থানে। খ্রিস্টীয় বারো শতকের দিকে এরা আশপাশে বিস্তৃত হতে থাকে। ১৪৩৮ সালে ইনকাদের নবম শাসক পাচাকুতি পাশের চাঙা সংযুক্ত রাষ্ট্রে আক্রমণ প্রতিহত করেন। অতঃপর তিনি আশপাশের বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেন এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক সংস্কার সাধন করেন। তাঁর পুত্র তোপা ইনকা ইয়াপানকুই উত্তর ও দক্ষিণ সাম্রাজ্যে আরো বৃদ্ধি করেন। পশ্চিমে বলিভিয়া, উত্তর-পশ্চিমে আর্জেন্টিনা, উত্তরে চিলি ও ইকুয়েডর পর্যন্ত তিনি রাজ্য বিস্তৃত করেন। তার পুত্র ওয়াইনা কাপেক ইকুয়েডর এবং কলম্বিয়ার আরো অঞ্চল দখল কনে। ১৯২৭ সালে ওয়াইনার মৃত্যু হলে তাঁর দুই পুত্রের মধ্যে রাজ্য নিয়ে বিরোধ ঘটে। ১৯৩২ সালের আতাহুয়াল্লা সিংহাসনের উত্তরাধিকারী তাঁর ভই ওয়াস্কারকে পরাজিত করেন। স্পেনীয় ফ্রান্সিসকো পিজারো ওই বছরই আতাহুয়াল্লাকে পরাজিত ও বন্দি করে মুক্তিপণ দাবি করেন। এক ঘর ভর্তি সোনা এবং দুই ঘর ভর্তি রূপা মুক্তিপণ পেয়েও স্পেনীয়রা আতাহুয়াল্লাকে হত্যা করেন ওয়াস্কার ইতিপূর্বেই বন্দি ও নিহত হয়েছিলেন। উত্তরাধিকারবিহীন বিশাল সাম্রাজ্যটি স্পেনীয়রা সহজেই দখল করে নেয়। ইনকা সভ্যতার অধিবাসীরা ছিল উন্নত চিন্তাধারার অধিকারী। ছবি আঁকা ও মাটি দিয়ে বিভিন্ন জিনিস তৈরি করার কৌশল তারা জানতো। জ্যোতির্বিদ্যায়ও তাদের অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। পাথরের চাই দিয়ে সুন্দর সুন্দর বাড়ি তৈরি করার পদ্ধতি

তারা আয়ত্ত করেছিল। ইনকবারা জলসেচেরে অতি উন্নত পদ্ধতিও আবিস্কার করেছিল। ব্যাপক ও উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা উদ্দেশে অনেক রাস্তা তৈরি করেছিল। ইনকাদের সাম্রাজ্যের সরকরি ভাষার নাম ছিল 'ক্যুয়েচুয়া'। এ ভাষাই গোটা সাম্রাজ্যের সরকারি ভাষায় পরিণত হয়। ইনকা সভ্যতায় লিখন পদ্ধতির প্রচলন না থাকলেও সংখ্যা গণনা এবং নথিভূক্ত করার জন্য ক্যুপি নামে এক বিশেষ ধরনের দড়ি পাকানো পদ্ধতি ব্যবহৃত হতো। স্পেনীয়রা ইনকা সভ্যতার অনেক কিছু ধ্বংস করে ফেলে। তবে অতীত সৃমতি হিসেবে এদরদ কেউ কেউ রোগী অসুখের সময় ঐতিহ্যবাহী অনুষ্ঠান উদযাপন করে। রাস্তা, সেতু, জলাধার, নর্দমা ইত্যাদি নির্মাণে ইনকা সভ্যতার দক্ষতার পরিচয় মেলে। মাচুপিচুতে আজও ইনকা সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

ইনতিফাদা (Intifada)

ইনতিফাদা আরবি শব্দ যার চলতি অর্থ গণ-অভ্যুত্থান। ইসরায়েল কর্তৃক ফিলিস্তিনি ভূ-খণ্ড দখলের বিরুদ্ধে ১৯৮৭-৯৩ সালে ফিলিস্তিনি জনগণের যে ব্যাপক অভ্যুত্থান ঘটে, সেটাই ইনতিফাদা নামে খ্যাত। বস্তুত, এই ইনতিফাদার পরিপ্রেক্ষিতেই ইহুদিরা অনন্যোপায় হয়ে একটি ফিলিস্তিন রাষ্ট্র গঠন করতে দিতে রাজি হয়। এই রাষ্ট্রেরই প্রেসিডেন্ট ইয়াসির আরাফাত ছিলেন। ইয়াসির আরাফাতের আপোসমুখিতার ব্যাপারে সংখ্যাগরিষ্ঠ ফিলিস্তিনি জনগণই অসন্তুষ্ট এবং তারা ইসরায়েলি কর্তৃপক্ষ ও আপোসকামী ইয়াসির আরাফাত সরকারের বিরুদ্ধে ইনতিফাদা জারি করার পক্ষপাতী ছিল।

ইন্টারপোল (Interpole)

১৯২৩ সালে Interpole বা International Criminal Police Commission আন্তর্জাতিক পুলিশ দফতর প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সদর দফতর প্যারিসে অবস্থিত। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হচ্ছে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে অপরাধ অনুসন্ধানের ব্যাপারে পারস্পরিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। বিশ্বের ৫০টি দেশ এই সংগঠনের সদস্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এর কার্যক্রম বন্ধ থাকলেও ১৯৪৬ সালে পুনরায় চালু হয়। ইন্টারপোলের একটা সাধারণ পরিষদ রয়েছে যার অধিবেশন এক এক সময় এক একটা সদস্য রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হয়। সদস্য দেশগুলোর পুলিশ বাহিনীর সাথে যোগাযোগ স্থাপন, অপরাধীদের সন্ধান, গতিরোধ, গ্রেফতার ইত্যাদির জন্য কমিশনের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সহ বিভিন্ন ব্যবস্থা রয়েছে।

ইন্টারপ্যালেশন (Interpellation)

ইন্টারপ্যালেশন হলো সুইজারল্যান্ড, ইতালি, বেলজিয়াম, নেদারল্যান্ডস প্রভৃতি দেশে প্রচলিত একটি পদ্ধতি, যার মাধ্যমে কোনো দফতরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে সংশ্লিষ্ট দফতর সম্পর্কে পার্লামেন্টে জবাবদিহি করতে বাধ্য করা যায়। তাঁর জবাবের ভিত্তিতে ভোট

গ্রহণ করা যায় এবং ভোটে তাঁর পক্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ না হলে তাঁকে দফতরচ্যুত করা যায়।

ইবনে খালদুন (Ibn Khaldune)

ইবনে খালদুন (১৩৩২-১৪০৬), তিউনিসে জন্মগ্রহণকারী দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদ ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্ব রাষ্ট্রের উত্থান-পতনের নিয়ম ব্যাখ্যা করেন। তিনি যাযাবর ও নগরজীবনের তুলনামূলক বৈশিষ্ট্য নির্ণয় করেন এবং রাষ্ট্রের উদ্ভব ও বিকাশের কারণ হিসাবে জনগোষ্ঠী বিশেষের মৌলিক চাহিদাসমূহের নিরাপত্তার আর্তিকে চিহ্নিত করেন। তাঁর ঐতিহাসিক গ্রন্থমালা 'কিতাবুল ইবার' এর প্রথম খণ্ড 'আল-মুকাদ্দামা' ১৩৮০ সালে রচনা করেন। এটা তাঁর মৌলিক চিন্তার জন্য কালজয়ী। মানুষের কর্মকাণ্ড ও ভাগ্যনিয়ন্ত্রণে আল্লাহ বা দৈবের ভূমিকার ব্যাপারে তিনি নিশ্চুপ থাকেন। তিনি বিশ্বাস করতেন যে, রাষ্ট্রের জন্ম, বৃদ্ধি, বিকাশ এবং মৃত্যু বা ধ্বংস আছে। তাঁর মতে একটি জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক সংহতির প্রকৃতির ওপর নির্ভর করে রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব ও পতন। কোনো ইচ্ছার বাস্তবায়নে সকল জনসমষ্টির প্রচ্ছন্ন সমর্থন একান্তভাবে কাম্য। আর এই প্রচ্ছন্ন সংহতি বা সমর্থনই আসাবিয়া। এই সংহতি পারিবারিক বন্ধন ও রক্তের সম্পর্কের দ্বারা সৃষ্টি হয় যা রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনার ক্ষেত্রে মূল চালিকা শক্তি হিসেবে কাজ করে।

ইবনে তাইমিয়া (Ibn Taymiyyah)

ইবনে তাইমিয়া (১২৬৩-১৩২৮) দামেস্কের নিকটবর্তী হাররান নাম স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি তৎকালীন বিভিন্ন জ্ঞানী ব্যক্তির কুরআন, ফিকহ ও তর্ক বিদ্যায় বুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি পীর দরবেশের প্রতি অন্ধভক্তি, কবর পূজা, মাযার জিয়ারত ইত্যাদির বিরুদ্ধে ছিলেন। তিনি আল্লাহ সম্পর্কে কুরআন ও হাদিসকে শাব্দিক অর্থে গ্রহণ করতেন। হজরত উমর (রা.), হজরত আলি (রা.) প্রমুখ ব্যক্তিত্বকেও তিনি ভুল ভ্রান্তির উর্ধ্বে বলে মনে করতেন না। বহুক্ষেত্রে তিনি তৎকালীন ফকিহদের সঙ্গেও দ্বিমত পোষণ করতেন এবং ইজমার বিপরীত মত পোষণকেও কুফর বা পাপ বলে মনে করতেন না। তিনি ইমাম গাজ্জালি (র.) এর সমালোচনা করতেন। ইবনে তাইমিয়ার ইসলাম সম্পর্কে নিষ্ঠার প্রশ্নে মুসলিম পণ্ডিতেরা ভিন্ন ভিন্ন মত পোষণ করেন। তবে অনেকের মতেই তিনি ইসলামের সত্যিকার অনুরাগী ছিলেন। স্বাধীন ও আপোসহীন মতামতের জন্য তাঁর অনেক শত্রু সৃষ্টি হয়। আল্লাহর প্রতি মানবীয় গুণ আরোপ করার অপরাধে ১৩০৬ সালে অভিযুক্ত হয়ে তিনি এক ভূগর্ভস্থ দুর্গে কারারুদ্ধ হন। ১৩০৮ সালে মুক্তিপ্রাপ্তির অল্পকাল পরেই রাজনৈতিক কারণে আরও দেড় বছর কারাগারে কাটান। মাত্র কয়েকদিন মুক্ত জীবনযাপন করার পর তিনি পুনরায় আলেকজান্দ্রিয়ার কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সুলতানের নিষেধাজ্ঞা পালনে অস্বীকার করায় ১৩২০ সালে তিনি আবার দামেস্কে কারারুদ্ধ হন। পীর ও নবীদের মাযার জিয়ারত সংক্রান্ত

ফতোয়ার পরিপ্রেক্ষিতে ১৩২৬ সালে তাঁর পুনরায় শাস্তি হয়। কারাগারে বসে তিনি পুস্তক রচনা করছেন। একথা জানতে পেরে সরকার তাঁকে লেখনীর উপাদান থেকে বঞ্চিত করেন। এই আঘাত সইতে না পেরে ২০ দিন পর কারাগারেই ইমাম ইবনে তাইমিয়া ইন্তেকাল করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৫০০। (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ২০১৩.)

ইবনে রুশদ্ (Ibn Russhd)

দ্বাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত মুসলিম চিন্তাবিদ আবুল ওয়ালিদ মুহাম্মদ ইবনে রুশদ্ (১১২৬-১১৯৮) স্পেনের কর্ডোভায় জন্ম গ্রহণ করেন। ইবনে রুশদ্ গ্রিক দার্শনিক অ্যারিস্টটলের দ্বারা প্রভাবান্বিত হন। অ্যারিস্টটল ও প্লেটোর ওপর তাঁর লিখিত ভাষ্য আজও সুপ্রসিদ্ধ। বিশ্বের চিরন্তরতা ও আল্লাহর জ্ঞানের স্বরূপ, তাঁর গায়েবের জ্ঞান, জীবাত্মা ও জ্ঞানের সম্পূর্ণতা, পরকাল ইত্যাদি বিষয়ে তাঁর দার্শনিক মতামতের জন্য কেউ কেউ তাঁকে নাস্তিক বলে মনে করত। তাঁর মতে কোনো বস্তুই অনস্তিত্ব থেকে একবার মাত্র সৃষ্টি হয়েই চিরস্থায়ী হয় না, বরং প্রতি মুহূর্তেই তা নবতর রূপ পরিগ্রহ করে। এজন্যই পৃথিবী স্থায়ী হওয়া সত্ত্বেও পরিবর্তনশীল। প্রকারান্তরে বলা যেতে পারে যে, একটি সৃজনশীল শক্তি দুনিয়ার সঙ্গে থেকে একে স্থায়ী ও গতিশীল রাখছে। মহাশূন্যে তারকাদের আকৃতি ও অবস্থান তাদের গতির ফলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই গতির উৎস হল সেই শক্তি, যা আদিকাল থেকে এদের ওপর ক্রিয়াশীল রয়েছে। আল্লাহ সম্পর্কে ইবনে রুশদের মত হল, 'আদি কারণ কেবল নিজ অস্তিত্ব সম্পর্কেই সচেতন'। তিনি স্বীকার করেন যে, আল্লাহ স্বয়ং স্বীয় সত্তায় বিশ্বের যাবতীয় বস্তুর জ্ঞান রক্ষা করছেন। কিন্তু তাঁর জ্ঞান সামগ্রিক বা আংশিক কোনোটিই নয়, কেননা তাঁর জ্ঞান মানুষের জ্ঞানের চাইতে উচ্চতর পর্যায়ের জ্ঞান। মানবাত্মা সম্পর্কে তাঁর মত হল এই যে, প্রত্যেক আত্মার মৃত্যুর পর বিশ্ব বা পরম আত্মায় মিশে যায়। পরকালে তিনি বিশ্বাস করতেন। কিন্তু এ সম্পর্কে বহুল প্রচারিত কাহিনী ও বর্ণনাসমূহকে তিনি অশুদ্ধ বলে মনে করতেন। তাঁর মতে 'ওহি' বা প্রত্যাদেশ দুই প্রকার, যথাঃ ক. দার্শনিক সত্যমূলক ও খ. ধর্মীয় সত্যমূলক। ফলে কুরআনের কোনো বক্তব্য যদি সাধারণ অর্থে অগ্রহণীয় হয়, তা হলে বুঝতে হবে যে, তার কোনো নিগূঢ় অর্থ আছে এবং সেটাকে খুঁজে পাওয়াই হবে দার্শনিকের কাজ। পাশ্চাত্য দুনিয়ায় আবু রুশদ Averroes নামে পরিচিত।

ইবনে সউদ (Ibn Soudh)

ইবনে সউদ (১৮৮০-১৯৫৩) আরবের বেদুইন উপজাতীয়দের ঐক্যবদ্ধ করে একটি একক জাতি হিসাবে গড়ে তোলেন। তাই, তাঁরই নামানুসারে আধুনিক আরবকে বলা হয় সৌদি আরব। এই ঐক্যের প্রয়োজনেই তিনি বিভিন্ন উপজাতীয়দের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। ১৯০১-১৬ সালে তিনি তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। কিন্তু প্রথম

মহাযুদ্ধের সময় কর্নেল টি.ই. লরেন্স তুরস্কের বিরুদ্ধে আরব বিদ্রোহ গড়ে তোলার উদ্যোগ নিলে ইবনে সউদ তাঁর সঙ্গে যোগ দিতে অস্বীকার করেন। এই কারণে যে, মিত্রপক্ষ হেজাজের হোসেনকে আরবের বাদশাহরূপে স্বীকৃতি দিয়েছিল। ইবনে সউদ হোসেনসহ অন্যান্য প্রতিদ্বন্দ্বীকে পরাজিত করে ১৯২৪-২৫ সালের মধ্যেই মক্কা, মদিনা ও জেদ্দার ওপর নিজের পূর্ণ কর্তৃত্ব কায়েম করেন। ১৯২৬ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি নিজেকে হেজাজ ও নেজদের বাদশাহরূপে ঘোষণা করেন। ১৯৩২ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর সাম্রাজ্য (যা আয়তনে ফ্রান্সের প্রায় চারগুণ) এর নামকরণ করা হয় সৌদি আরব। ১৯২৭-৩৬ সময়ে তাঁর পররাষ্ট্রনীতি সাফল্য অর্জন করে এবং বিভিন্ন চুক্তির মাধ্যমে তিনি সকল বৃহৎ শক্তির স্বীকৃতি আদায় করে নেন। তিনিই সর্বপ্রথম মার্কিন তৈল ধনকুবেরদের তৈল উত্তোলনের ব্যাপারে চুক্তিবদ্ধ করেন। (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকা : মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩.)

ইবনে সিনা (Ibn Sina)

ইবনে সিনা, আবু আলি (৯৮০-১০৩৭) মধ্য এশিয়ার একজন মুসলিম দার্শনিক ছিলেন। যিনি একাধারে দার্শনিক, প্রকৃতি বিজ্ঞানী ও চিকিৎসাবিদ ছিলেন। অ্যারিস্টটলের দর্শনে বিশ্বাসী ইবনে সিনা একান্তভাবে ইসলাম ধর্মের অনুগত ছিলেন। তবে তিনি সকল প্রকার কুসংস্কারের বিরোধিতা করতেন। তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থের নাম আকসাম-উল-উমুল। আরবী ভাষায় লিখিত এই গ্রন্থে আমরা তাঁর ধর্মীয় চিন্তা চেতনা, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা ও অর্থনৈতিক অবকাঠামো সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করতে পারি।

ইয়ালটা সম্মেলন (Yalta Conference)

১৯৪৫ সালের ৪-১১ ফেব্রুয়ারি ক্রিমিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্র ইয়ালটায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট, ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এবং রাশিয়ার স্ট্যালিনের মধ্যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে জার্মানিকে পরাজিত ও দখল করার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। এই তিন শক্তিই জার্মানির এক একটা অংশ দখল করবে। ফ্রান্সকে একটা অংশ দখলের জন্য আহ্বান জানানো হবে এবং সমন্বয়ের জন্য বার্লিনে চার বাহিনীর অধিনায়কদের নিয়ে একটি কমিশন গঠন করা হবে। এতে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, জার্মানবাহিনী সম্পূর্ণ ভেঙে দেয়া হবে, সমস্ত জার্মান অস্ত্র হয় দখল করা হবে অথবা ধ্বংস করে দেয়া হবে, যুদ্ধাপরাধীদের দ্রুত বিচার ও শাস্তি দেয়া হবে, জার্মান সামরিক কারখানাসমূহ হয় ভেঙে দেয়া হবে নতুবা সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে নিয়ে আসা হবে জার্মানবাসীর জীবন থেকে সকল নাৎসি প্রভাব নির্মূল করা হবে। তদুপরি, ডাম্বার্টন ওক্স্ সম্মেলনের সূত্র ধরে এই সম্মেলনে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে, আসন্ন এপ্রিলে অনুষ্ঠিতব্য সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনে প্রস্তাবিত জাতিসংঘ সনদ প্রস্তুত করা হবে। এই সম্মেলনে প্রস্তাবিত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদসংক্রান্ত রুজভেল্টের তিনটি প্রস্তাবও

গৃহীত হয় এবং স্থায়ী সদস্যদের ভেটো ক্ষমতার ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ইতোপূর্বে দাবি করেছিল যে, তার ১৬টি প্রজাতন্ত্রের জন্য জাতিসংঘে ১৬টি আসন চাই। কিন্তু এই বৈঠকে সোভিয়েত ইউনিয়ন একমত হয় যে, রুশ ফেডারেল প্রজাতন্ত্র ছাড়া, ইউক্রেন প্রজাতন্ত্র ও রাশিয়া প্রজাতন্ত্রেরই শুধু জাতিসংঘে আসন থাকবে। তিন নেতা আরও একমত হন যে, নাৎসি কবলমুক্ত ইউরোপীয় যেকোনো দেশে তাঁরা সম্মিলিতভাবে গণতন্ত্রমনা ব্যক্তিদের নিয়ে সরকার গঠন করে দিতে বা নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে পারবেন। এতদিন যাবৎ লন্ডনস্থ প্রবাসী পোল্যান্ড সরকারকে যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্য সমর্থন দিয়ে আসছিল। এই সম্মেলনে তাঁরা তা প্রত্যাহার করেন। কিন্তু তাঁরা জোর দিয়ে বলেন যে, পোল্যান্ডে নির্বাচন অনুষ্ঠান করতে হবে এবং এর পূর্ব সীমান্তে কার্জন লাইন মেনে চলতে হবে।

ইরাক যুদ্ধ (Irak War)

ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ব্রিটেনের নেতৃত্বে পরিচালিত যুদ্ধই ইরাক-মার্কিন যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৯১ সালের উপসাগরীয় যুদ্ধে ইরাক পরজিত হলেও মার্কিনীরা ইরাকে ওপর নতুন করে যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়ার সুযোগ খুজতে থাকে। আফগানিস্তানে তালেবান-আলকায়েদার পতনের পর একটা মোক্ষম সুযোগ এসে যায়। ওয়াশিংটন আল-কায়েদার সাথে বাগদাদের নিবিড় যোগসূত্র রয়েছে বলে দাবি করে। কিন্তু এসব দাবির সপক্ষে ওয়াশিংটন তেমন কোনো তথ্য প্রমাণ উপস্থাপন করতে পারেনি। এবার ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও মিসাইল ভাণ্ডার রয়েছে বলে ওয়াশিংটন ও লন্ডন দাবি করে। যদিও জাতিসংঘের অস্ত্র পরিদর্শকরা ইরাকে কোনো প্রকার পারমাণবিক, রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র খুঁজে পাননি। এমনকি এসব অস্ত্র বহন করার মতো মাঝারি ও দূরপাল্লার মিসাইলও ইরাকে হাতে নেই। এতে প্রমাণ হয়ে যায় ইরাকের গণবিধ্বংসী অস্ত্র ও মিসাইল ভাণ্ডার ধ্বংস করা যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য নয়। যুক্তরাষ্ট্রের মূল লক্ষ্য হলো মধ্যপ্রাচ্যের তেল।

সৌদি আরবের পরেই বিশ্বের দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ তেল ভাণ্ডার রয়েছে ইরাকের ভূমিতলে। কমপক্ষে ১১২.৫ ব্যারেলের অস্তিত্ব প্রমাণিত যা গোটা বিশ্বের মোট তেল-গ্যাসের ১১%। যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম দিকে জাতিসংঘ অস্ত্র পরিদর্শক দলের মাধ্যমে ইরাকে যে গণবিধ্বংসী অস্ত্র আছে তা প্রমাণ করতে চেয়েছিল। কিন্তু তাতে ব্যর্থ হওয়ায় একতরফাভাবে যুদ্ধ শুরু করে। বিশ্ব জনমত জাতিসংঘ এবং ন্যায়নীতির তোয়াক্কা না করে মানবতা বিরোধী এ যুদ্ধের প্রেক্ষিতে রচিত হয় ২০০১ সালে। ১১ সেপ্টেম্বরের সন্ত্রাসী হামলার পরদিন ১২ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ইরাক, ইরান ও উত্তর কোরিয়াকে শয়তানের অক্ষচক্র এবং শয়তানের আবাসস্থল হিসেবে ঘোষণা দেন। তখন থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এ নিয়ে দীর্ঘ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক প্রচার-প্রচারণা শুরু করেন। বুশ জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের সাধারণ অধিবেশনে ইরাককে একটি ভয়াবহ হুমকি হিসেবে চিহ্নিত করে একে আর সহ্য করা হবে না বলে ঘোষণা দেন।

তবে এরকম ব্যবস্থা জাতিসংঘের অনুমোদন ছাড়া নেওয়া হবেনা বললেও বুশ শর্ত দেন, ইরাক জাতিসংঘ প্রস্তাবনা মানতে ব্যর্থ হলে সামরিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে।
১৭ অক্টোবর কংগ্রেস গণবিধ্বংসী অস্ত্র থাকার দায়ে ইরাকেরা প্রেসিডেন্ট সাদ্দাম হোসেনের ওপর বুশকে সামরিক শক্তি ব্যবহারের ক্ষমতা দেয়। ৮ নভেম্বর কয়েক সপ্তার বাদানুবাদের পর জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ ১৪৪১ প্রস্তাবনা পাস করে। এই প্রস্তবানায় ইরাক গণবিধ্বংসী অস্ত্র পরিহার না করলে এবং প্রস্তাবনা মানতে ব্যর্থ হলে মারাত্মক পরিণতি ভোগ করবে বলা হয়। ৭ ডিসেম্বর প্রস্তাবনা অনুযায়ী বাগদাদ তার রাসায়নিক, জীবানু, পারমানবিক ও ক্ষেপনাস্ত্র কর্মসূচির পূর্ণ বিবরণ দিয়ে ১২০০ পাতার দলিল জাতিসংঘে জমা দেয় এবং কোনোরকম পারমানবিক, রাসায়নিক ও জীবানু অস্ত্র তাদের হাতে নেই বলে ঘোষণা দেয়।
২০ জানুয়ারি ২০০৩ ব্রিটিশ প্রতিরক্ষামন্ত্রী জেয়ফ হুন উপসাগরীয় অঞ্চলে ২৬ হাজার সৈন্য মোতায়েনের ঘোষণা দেন। ২৮ জানুয়ারি স্টেট অব দ্যা ইউনিয়ন ভাষণে বুশ ইরাক নিরস্ত্র না হলে সামরিক হামলা চালানোর অঙ্গীকার করেন। ৬ ফেব্রুয়ারি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী কলিন পাওয়েল ইরাক জাতিসংঘ প্রস্তাবনা মেনে চলছে না এবং আল-কায়দার সঙ্গে দেশটির সংযোগ রয়েছে বলে ঘোষণা দেন এবং এ প্রেক্ষিতে ১৫ ফেব্রুয়ারি পেন্টাগণ ইরাকে সম্ভাব্য হামলার প্রস্তুতি পর্বে ১৫০,০০০ সৈন্য উপসাগরে পাঠিয়ে দেয়। ২৪ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র এবং স্পেন ইরাক ইস্যুতে নতুন খসড়া প্রস্তাব জমা দেয়। এই প্রস্তাবে ইরাকের বিরুদ্ধে জাতিসংঘ প্রস্তাব মানতে ব্যর্থতা, মিথ্যা বিবৃতি দেওয়া এবং তথ্য গোপন করার জন্য অভিযোগ আনা হয়। ১ মার্চ জাতিসংঘের নির্দেশে ইরাক আল-সামুদ মাঝারি পাল্লার ক্ষেপনাস্ত্র ধ্বংস করতে শুরু করে।

১৭ মার্চ যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও স্পেন নতুন প্রস্তাবনা পাসের পরিকল্পনা বাতিল করে যুদ্ধ শুরু করার ব্যাপারে জাতিসংঘের অনুমোদন লাভের চেষ্টা ছেড়ে দেয়। এতে জাতিসংঘের উদ্যেগ ব্যর্থ হয় এবং দীর্ঘদিনের রণপ্রস্তুতি বাকবিতণ্ডা আর কূটনৈতিক তৎপরতা শেষে ২০ মার্চ বাংলাদেশ সময় সকাল নয়টায় যৌথ বাহিনী ইরাকে তাদের আক্রমণের সূচনা করে। শুরু হয় বাগদাদসহ ইরাকে প্রধান প্রধান শহরগুলোতে ব্যাপক বোমাবর্ষণ। এদিকে ইরাকের কুয়েত সীমান্ত দিয়ে মার্কিন ও ব্রিটিশ সৈন্যরা প্রায় বিনা বাধাতেই ইরাক-ভূখণ্ডে ঢুকে পড়ে। তারা প্রথম প্রতিরোধের মুখে পড়ে ইরাকের দক্ষিণাঞ্চলীয় বন্দর নগরী ইম্ম কসরের কাছে। তাছাড়া কুয়েত সীমান্ত থেকে দীর্ঘ মরুপথে বিভিন্ন স্থানে চোরাগুপ্তা হামলার শিকার হয় যৌথ বাহিনী। যৌথ বাহিনীর অভিযানে প্রথম পতন হয় উম্ম কসরের। এখানে ইরাকিরা প্রথমে বেশ প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। তারপর একের পর এক ইরাকিদের হাতছাড়া হতে থাকে নাজাফ, কারবালা ও বসরা। অবশেষে রাজধানী বাগদাদসহ প্রায় সমগ্র ইরাকের ওপর ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর দখলদায়িত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। ২৪ এপ্রিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ ইরাক যুদ্ধ অবসানের ঘোষণা দেন। এ যুদ্ধে হাজার হাজার ইরাকি নারী, শিশুসহ

বেসামরিক লোক নিহত এবং বহুলোক আহত হয়। বিশেষত প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্রভূমি ইঙ্গ-মার্কিন বোমা হামলায় ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে।

ইরাক-ইরান যুদ্ধ (Iran-Irak War)

১৮৮০ সালের ২২ সেপ্টেম্বর ইরাক-ইরান উপসাগরীয় যুদ্ধ শুরু হয়। শাতিল-আরব জলপথের অধিকার নিয়ে এই দুটি উপসাগরীয় দেশের মধ্যে যুদ্ধের সূত্রপাত। তৃতীয় বিশ্বের দুটি দেশের দীর্ঘস্থায়ী যুদ্ধ কেবল এই অঞ্চলের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি হুমকিই নয়, আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও এই যুদ্ধের প্রতিফলন ঘটে। শুরুতে এই যুদ্ধ কেবলমাত্র ইরান-ইরাকের মধ্যে সীমত থাকলেও পরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে বহিরাগত শক্তি—বিশেষত আরব দেশ এবং বৃহৎ শক্তিসমূহ। জর্ডান ও মিশর– এই দুটি আরব দেশ শুরু থেকেই ইরাককে এবং সিরিয়া ও লিবিয়া ইরানকে যুদ্ধে মদদ জুগিয়েছে। বৃহৎ শক্তিসমূহের মধ্যে ফ্রান্স ইরাকের প্রধান অস্ত্র সরবরাহকারী হয়ে ওঠে। মস্কোও দীর্ঘ সময় চুপ করে থাকার পর এই যুদ্ধে বাগদাদকেই সমর্থন জানায়। ১৯৮০-৮৮ পর্যন্ত যুদ্ধে দু পক্ষের অসংখ্য সৈন্য প্রাণ হারায়। মার্কিন হিসাব অনুসারে, ইরানের কমপক্ষে এক লক্ষ সৈন্য হতাহত হয়। ব্রিটিশ যুদ্ধবিশারদরা অবশ্য এ সংখ্যা আরো বেশি বলে দাবি করেন। অন্যদিকে ইরাকের ক্ষয়ক্ষতিও বিশাল। আন্তর্জাতিকভাবে এ যুদ্ধ বন্ধের উদ্যেগ নেয়া হলেও কোনোটাই সফল হয়নি। ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন শান্তি ও যুদ্ধবিরতির কথা বার বার বললেও ইরান তাতে কর্ণপাত করেনি। এই যুদ্ধ টিকিয়ে রাখা ইরানি শাসকদের পক্ষে অত্যাবশ্যকীয় ছিল। যুদ্ধের নামে দেশের অগণিত সমস্যা ধামাচাপা দিতে শাসকরা সচেষ্ট ছিলেন। জাতিসংঘের আহ্বানে ২৯ আগস্ট, ১৯৮৮ ইরাক-ইরান যুদ্ধবিরতি মেনে নেয়।

ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি (Iran-Contra Scandal)

নিকারাগুয়ার বিদ্রোহী কন্ট্রা গ্রুপ দীর্ঘদিন ধরে সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ পরিচালনা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইরানের নিকট প্রচুর অস্ত্র বিক্রয় করে১৯৮৫ সালের আগস্ট মাসে। এ অস্ত্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ দ্বারা মার্কিন সরকার তৎকালীন নিকারাগুয়ার সরকারের বিরুদ্ধে কন্ট্রা বিদ্রোহীদের সাহায্য প্রদান করে। এটি যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন পররাষ্ট্রনীতির পরিপন্থী। এ ঘটনা মার্কিন ইতিহাসে ইরান-কন্ট্রা কেলেঙ্কারি নামে পরিচিত। ১৯৮৭ সালে এ কেলেঙ্কারির তথ্য ফাঁস হয়ে যাওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট রোনাল্ড রিগ্যানসহ সিআইএ প্রধান, জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা, প্রেসিডেন্টের মুখপাত্র প্রমুখ ক্ষমতাসীন ব্যক্তিত্ব অভিযুক্ত হয় এবং বিশ্বব্যাপী ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে। কেলেঙ্কারির বিষয়টি তদন্তের জন্য সিনেটর জন্য টাওয়ারের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করা হয়। ঘটনার সত্যতা এবং প্রেসিডেন্টের সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয় কমিশনের রিপোর্টে। এতে জানা যায়, পদচ্যুত জাতীয় নিরাপত্তা সহকারী অলিবার নর্থ কেলেঙ্কারির নায়ক। অবশেষে প্রেসিডেন্ট রিগ্যান কংগ্রেসের সিনেটে ক্ষমা প্রার্থনা করলে এর পরিসমাপ্তি ঘটে।

ইরানের ইসলামী বিপ্লব (Islamic Revolution of Iran)

১৯৭৯ সালে আয়তুল্লাহ রুহুল্লা খোমেনির নেতৃত্বে ইরানে ইসলামী বিপ্লব সংঘটিত হয়। পতন অনিবার্য হয়ে ওঠায় ইরানের শাহ আগেই দেশ ছেড়ে বাহামায় পালিয়ে যান। ১৯৫২ সালে রেজা শাহ্ পাহলোভী সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি ছিলেন পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে বিশ্বস্ত মার্কিন মিত্র। যুক্তরাষ্ট্র তাকে টিকিয়ে রাখার সর্বাত্মক চেষ্টা করে। কিন্তু ইসলামী বিপ্লবের তোড়ে সকল মার্কিন প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। ইসলামী বিপ্লক সম্পন্ন হওয়ার পরই মাকিন দূতাবাস অবরোধ করে। প্রায় এক বছর এই অবরোধ স্থায়ী হয়। জিম্মিদের উদ্ধারে যুক্তরাষ্ট্র একটি ব্যর্থ সামরিক অভিযান চালায়। ইরানে ইসলামী বিপ্লব সামসাময়িক পৃথিবীতে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। অনেকেই ভাবতেন যে, ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দিন শেষ হয়ে গেছে। কিন্তু ইরানের ইসলামী বিপ্লব এ ধারণাকে মিথ্যা প্রমাণ করে। ইসলাম যে এখনো বিপ্লব সাধনে সক্ষম, ইরানের ইসলামী বিপ্লবই এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইসলামিক সালভেশন আর্মি (ISA)

আলজেরিয়ার সামরিক জান্তা ১৯৯১ সালের সাধারণ নির্বাচনে বিজয়ী ইসলামিক সালভেশন ফ্রন্টের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে অস্বীকার করলে তারা ১৯৯২ সাল থেকে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে। বস্তুত ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্টের সশস্ত্র গ্রুপের নামই ইসলামিক সালভেশন আর্মি। দেশব্যাপী এরা গেরিলা অভিযান চালিয়ে সামরিক সরকারকে হটিয়ে আলজেরিয়ার ক্ষমতায় আরোহণ করতে চায়। এরা কট্টর ইসলামপন্থী।

ইস্তাম্বুল (Istanbul)

ইস্তাম্বুল তুরস্কের সাবেক রাজধানী। অবস্থানের দিক দিয়ে বলতে গেলে এটা বসফরাস প্রণালীর উভয় তীরে অর্থাৎ ইউরোপের পশ্চিমাংশ ও এশীয়ার পূর্বাংশে অবস্থিত। এটার সাবেক নাম কনস্ট্যান্টিনোপাল।

উইটান বা উইটেনাগেমট (Witan or Witenagemot)

অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগে রাজারা উত্তরাধিকার সূত্রেই রাজপদ লাভের নিয়ম চালু হয়। তাঁরা উইটান বা উইটেনাগেমট (witan or witanagemot) নামক একটি পরিষদের মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। উইটানকে 'বিজ্ঞজন সভা' (Council of Wisemen) হিসেবেও অভিহিত করা হয়। কারণ রাজপরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ, বিশপ, শায়ার (Shire)-এর অল্ডারম্যানগণ এবং প্রধান ভূ-স্বামীগণ এই সভায় স্থান পেতেন যাদের তারা রাজা মনোনীত করতেন। উইটানদের তেমন কোন নির্দিষ্ট কাজ

ছিল না। সাধারণত রাষ্ট্র ও চার্চ সম্পর্কিত যাবতীয় কার্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে রাজা এই পরিষদের সঙ্গে পরামর্শ করতেন। তবে উইটানদের পরামর্শ গ্রহণ করা বা না করা রাজার ইচ্ছার ওপর নির্ভর করত। এক্ষেত্রে রাজার পক্ষে কোনো বাধ্যবাধকতা ছিল না।

উচ্চ পরিষদ (Upper House)

কোনো কোনো রাষ্ট্রে আইন পরিষদে উচ্চ পরিষদ ও নিম্ন পরিষদ নামে দুইটি পরিষদ থাকে। নিম্ন পরিষদ হতে যেসব আইনের খসড়া বা রাষ্ট্র সম্বন্ধনীয় বিধানাদি অনুমোদিত হয়ে উচ্চ পরিষদে প্রেরিত হয়, তা উচ্চ পরিষদে চূড়ান্তভাবে বিবেচিত হয়ে থাকে। উচ্চ পরিষদ রাষ্ট্র সম্বন্ধনীয় ব্যাপারাদিতে সাধারণত নিম্ন পরিষদ হতে ক্ষমতাশীল।

উৎপাদন (Production)

শ্রমের দ্বারা বিভিন্ন প্রাকৃতিক বস্তুকে মানুষের ব্যবহারযোগ্য বস্তুতে পরিণত করাই হলো উৎপাদন। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, গাছের বীজ বপন করে যে মানুষ গাছের সৃষ্টি করে তা বীজ হতে অধিকতর উপযোগী। এই উপযোগ সৃষ্টিই হচ্ছে উৎপাদন। একইভাবে বলা যায় যে গাছ থেকে তৈরি আসবাবপত্র আরো উপযোগী। তাই গাছকে আসবাবপত্রে পরিণত করার উপযোগ সৃষ্টি করাই হলো উৎপাদন। আধুনিক ধনবিজ্ঞানীদের মতে, কোনো দ্রব্যে উপযোগ সৃষ্টি করাকেই উৎপাদন বলা হয়। প্রচলিত অর্থনীতি অনুসারে জমি, শ্রম, পুঁজি ও সংগঠন এই চারটির সমন্বয়ের মধ্য দিয়েই উৎপাদনকাজ সম্পন্ন হয়। মার্কসীয় মতে উৎপাদনের অর্থ ও তাৎপর্য অনেক ব্যাপক ও গভীর, কারণ, উৎপাদনের প্রক্রিয়ায় মানুষ কেবল প্রকৃতির ওপরই কাজ করে না, পরস্পরের ওপরও কাজ করে এবং পরস্পরের সঙ্গে কতগুলো নির্দিষ্ট যোগাযোগ ও সম্পর্কও স্থাপন করে। অবশ্য যন্ত্রায়ণ, ও স্বয়ংক্রিয়তা বা অটোমেশন, কম্পিউটার প্রযুক্তি ইত্যাদির ফলে উৎপাদনে মানবশ্রমের ভূমিকা ক্রমশ তুলনামূলকভাবে গৌণ হয়ে পড়ছে।

উৎপাদন প্রক্রিয়া (Mode of Production)

সাধারণত সংশ্লিষ্ট দেশের সমাজব্যবস্থার স্বরূপ উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপরই নির্ভর করে। খাদ্য, বস্ত্র, গৃহস্থালির সরঞ্জামাদিসহ জীবনধারণের ও উপভোগের যাবতীয় উপকরণ উৎপাদনের ইতিহাস দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি। সমাজ, সমাজের প্রধান প্রধান ধ্যানধারণা, রাজনৈতিক মতবাদ ও প্রতিষ্ঠানের রূপ ইত্যাদি উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপরই নির্ভরশীল। উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিবর্তন ঘটলে গোটা সমাজব্যবস্থারই পরিবর্তন ঘটে। মানবসমাজের ঊষাকাল থেকে উৎপাদন প্রক্রিয়ার যে কয়েকটি প্রধান রূপ রেখা গেছে তা হলো, আদি সাম্যবাদী ব্যবস্থা, দাসব্যবস্থা, সামন্তবাদী ব্যবস্থা, পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। বর্তমান যুগটিকে সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদের অবক্ষয় ও

সমাজতন্ত্রের যুগ বলে অভিহিত করলেও বাস্তবে ঘটেছে বিপরীত ঘটনা। বিংশ শতাব্দীর আশির দশক থেকে বিশ্বব্যাপী মার্কসীয়, লেনিনীয় ও মাও ধারার সমাজতন্ত্রের কার্যত পতন ঘটে; অথচ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা বহাল তবিয়তে বলবৎ থাকে। উৎপাদন প্রক্রিয়ার রয়েছে দুটি অবিচ্ছেদ্য দিক, যেমন- উৎপাদিকাশক্তি ও উৎপাদন-সম্পর্ক। উৎপাদিকা শক্তিই হল উৎপাদন প্রক্রিয়ার নির্ধারক ও বিপ্লবী দিক। কেননা, উৎপাদিকা শক্তির পরিবর্তনের ফলেই উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটে। আবার, উৎপাদন সম্পর্কও উৎপাদিকা শক্তিকে প্রভাবিত করে। উৎপাদন সম্পর্ক যদি অনুকূল হয়, তা হলে তা উৎপাদিকা শক্তির বিকাশের মাত্রা বাড়িয়ে দেয়; আর প্রতিকূল হলে বিকাশের ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করে। বৈরী সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় নবতর উৎপাদিকা শক্তির সঙ্গে পুরানো উৎপাদন সম্পর্কের তীব্র দ্বন্দ্ব বেধে যায় এবং এই দ্বন্দ্বের ফলশ্রুতিতে সমাজ পরিবর্তন অনিবার্য হয়ে ওঠে। বর্তমান বিশ্বে সমাজতন্ত্রের পতন, অটোমেশন, কম্পিউটার প্রযুক্তি ইত্যাদির বিস্ময়কর অগ্রগতি এবং অর্থনীতির বিশ্বায়নের ফলে উৎপাদন প্রক্রিয়া ও উৎপাদন সম্পর্কের ক্ষেত্রে এমন সব ফিচার দেখা দিচ্ছে যা দু'তিন দশক পূর্বেও কল্পনা করা যায়নি।

উৎপাদন ব্যয় (Cost of Production)

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করার জন্য উৎপাদনকারীকে যে ব্যয় করতে হয় তাকে উৎপাদন ব্যয় বলা হয়। কিন্তু এই ব্যায়ের প্রকৃতি সম্বন্ধে অর্থনীতিবিদগণের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। ক্লাসিক্যাল ও নিও-ক্লাসিক্যাল ধণবিজ্ঞানিগণ ব্যয়কে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন যথা– আর্থিক ব্যয় (Money cost) এবং প্রকৃত ব্যয় (Real cost)। কিন্তু অস্ট্রীয় ধনবিজ্ঞানিগণ প্রকৃত ব্যয়ের পরিবর্তে 'সুযোগ ব্যয়' (Opportunity cost) তত্ত্ব প্রচার করেছেন।

উৎপাদন যন্ত্র (Production Machine)

প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর শ্রমিক তার শ্রম প্রদান করার জন্য যে সকল উপকরণের সাহায্য নেয়, সে সকল উপকরণকে বলে উৎপাদন যন্ত্র। যেমন, হাতুড়ি, কাস্তে, লাঙল, শাবল, স্ক্রু ড্রাইভার ইত্যাদি থেকে শুরু করে মোটর, ডায়নামো, পাম্প, লেদ, লুম, মেশিন, কম্পিউটার ইত্যাদি যাবতীয় হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতিই হল উৎপাদন যন্ত্র।

উৎপাদন সম্পর্ক (Production Relationship)

উৎপাদন সম্পর্ক বলতে উৎপাদনের প্রক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত উৎপাদন শক্তি ও উৎপাদন উপকরণসমূহের বিদ্যমান সম্পর্ককে বোঝায়। মানুষের সঙ্গে মানুষের, বিশেষত, শ্রমিকের সাথে মালিকের, শ্রেণির সঙ্গে শ্রেণির যে সম্পর্ক গড়ে ওঠে, তাকে উৎপাদন সর্ম্পক বলে। মার্কসীয় মতে, সম্পত্তির সম্পর্কের মধ্য দিয়ে এই সম্পর্ক প্রকাশিত হয়। শোষণমুক্ত সমাজে এই সম্পর্ক হয় পারস্পরিক সাহায্য, সহযোগিতা ও

সমতাভিত্তিক। কিন্তু শোষণমূলক সমাজে এ সম্পর্ক হয় এক শ্রেণির ওপর অন্য শ্রেণির প্রভুত্বেও ও শোষণের। ইতিহাসে পাঁচ রকম উৎপাদন সম্পর্কের নিদর্শন পাওয়া যায়, যথা- আদি সাম্যবাদী সমাজ, দাসসমাজ, সামন্তবাদী সমাজ, পুঁজিবাদী সমাজ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ। কিন্তু বিজ্ঞান প্রযুক্তির অভাবনীয় বিকাশ, এবং অর্থনীতি ও উৎপাদিকা শক্তির দ্রুত বিশ্বায়ন (globalization) ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে এতদ্বসম্পর্কিত সাবেকি ধারণার ব্যাপক পরিবর্তন ঘটছে।

•

উৎপাদন, মোট অভ্যন্তরীণ (Gross Domestic Product (GDP)

সাধারণত কোনো দেশের এক বছরের উৎপাদিত দ্রব্য এবং সেবা বা সার্ভিসেস (যেমন ব্যাংক, বীমা, পরিবহণ, বিদ্যুৎ সরবরাহ, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, পয়ঃপ্রণালী ইত্যাদিজনিত সেবা) এর মোট পরিমাণের আর্থিক মূল্যকে মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বলা হয়। এর সঙ্গে বিদেশ থেকে অর্জিত আয় যোগ করা হলে, তাকে বলে মোট জাতীয় উৎপাদন (GNP)।

উৎপাদন, মোট জাতীয় (Gross National Product (GNP)

মোট জাতীয় উৎপাদন বলতে কোনো দেশের উৎপাদিত পণ্য ও সার্ভিসের মোট বার্ষিক পরিমাণের আর্থিক মূল্যকে বোঝায়। দেশের কতিপয় সূত্র থেকে লব্ধ আয়ের সমষ্টিই হল মোট জাতীয় উৎপাদন যেমন- কৃষি, বন, মৎস্য শিল্প, খনি, ইমারত, জনকল্যাণ, পরিবহন বণ্টন (Distribution), ইনস্যুরেন্স, ব্যাংক ও অন্যান্য মুদ্রাসংক্রান্ত খাত, বসতবাড়ি, স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত সার্ভিস, পরিবারের প্রতি প্রদত্ত সার্ভিস, বিদেশ থেকে অর্জিত নিট আয়, অন্যান্য সার্ভিস বা সেবা ও মওজুতের প্রবৃদ্ধি (Stock Appreciation)। মোট জাতীয় উৎপাদন থেকে মূলধন বাবদ ব্যয়িত সম্পদ (আর্থিক মূল্যে) বাদ দিলে যা থাকে তাই হল জাতীয় আয় (National Income)।

উৎপাদিকা শক্তি (Forces of Production)

উৎপাদনযন্ত্র এবং সেই যন্ত্র ব্যবহারকারী মানুষ, অর্থাৎ শ্রমিক, এই দুয়ের সম্মিলিত রূপই হলো উৎপাদিকা শক্তি। তবে, শ্রমিককেই মৌল উৎপাদিকাশক্তি বলে বিবেচনা করা হয়।

উৎপ্রেষণ রিট (Writ of Certiorari)

উৎপ্রেষণ রিট একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ হলো "To be certified" অর্থাৎ "বিশেষভাবে জ্ঞাত হওয়া" কোনো আদালত বা ট্রাইব্যুনাল যদি ক্ষমতা বহির্ভূত বিচারকার্য পরিচালনা করত তাহলে কমন ল' কোর্টে আবেদন করা হতো যে "King should be certified of the proceeding to be investigated"। এভাবে certiorari রিট চালু হয়। কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোনো ব্যক্তি বা কোনো সংস্থা যদি তার

আইনগত ক্ষমতাকে লংঘন করে কিংবা principle of natural justice যদি ভঙ্গ করে তবে উচ্চতর আদালত যে আদেশের মাধ্যমে উক্ত কাজকে নাকচ করে দেয় তাকে উৎপ্রেষণ রিট বলে।

উত্তম সরকার (Good Government)

B.C. Rout-এর কথায়, সরকারকে রাষ্ট্রের মগজ বলা যায় (The government said to be the brain of the state)। মগজ ভালো হলে যেমন একজনকে সুস্থ মানুষ বলা যায়, তেমনি সরকার ভাল হলেও রাষ্ট্রকে উত্তম বলা যায়। কিন্তু ভাল বা উত্তম সরকার কি তা বলা কঠিন। আদিকাল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত সরকারের নানা রকম বিভাগ পরিলক্ষিত হয় কিন্তু সঠিক অর্থে বলা কঠিন কোনোটি উত্তম সরকার বা শাসন। এজন্যই হয়ত ১৭৫৫ সালে Alexander Pope বলেছিলেন, সরকারের প্রকারভেদ নিয়ে বোকাদের তর্ক করা সাজে, কেননা কোনোটি ভাল সরকার তা বুঝা যায় শাসন প্রক্রিয়া বিচারে। তার কথায়, "For forms of government let fools contest, what ever is best that administration is best"। বিষয়টির ওপর সামান্য আলোকপাত করলেই এর সহজ অর্থ বুঝতে পারা যাবে। আমরা জানি একনায়কতান্ত্রিক বা স্বৈরশাসন খারাপ এবং গণতন্ত্র উত্তম সরকার। কিন্তু গণতন্ত্রের এমন সব সমালোচনা আছে তা বলার মতো নয়। অনেক রাষ্ট্রে গণতন্ত্রের নামাবলি গায়ে জড়িয়ে সরকার এমন শাসন অব্যাহত রাখে যা একনায়কতান্ত্রিক শাসনের চেয়েও খারাপ। সেজন্যই হয়ত অ্যারিস্টটল বলেছেন যে, লুটপাট করে খাওয়া গণতন্ত্র কোনো সময়ে চুরি করা অভিজাততন্ত্রের চেয়ে উত্তম নয় (Plundering democracy is no more better than the exploiting aristocracy.)। কথাটি অতীব সত্য, কারণ গণতন্ত্রের নামে যদি ব্যাপক জনগণের ভয়াবহ লুট-পাট চলে, তাহলে তা কোনো সময়ে অভিজাত বা স্বৈরশাসনের চেয়ে উত্তম হতেই পারে না। আবার রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞানুসারে স্বৈরশাসন মনে হলেও তা যদি জনকল্যাণকর কাজে নিজেকে নিয়োজিত রাখে, তবে তা খারাপ নয়। ব্যাপক শোষণের কারণে যেমন গণতান্ত্রিক সরকার ঘৃণার পাত্রে পরিণত হতে পারে, তেমনি কল্যাণকর কাজের দ্বারা একনায়কও শ্রদ্ধার আসন পেতে পারে। অনেক রাজা-বাদশার শাসন আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করা হয় এবং তারা কিংবদন্তী হয়ে আছেন। সামরিক শাসন সবচেয়ে খারাপ কিন্তু পৃথিবীতে বহু ফৌজী শাসক এত প্রকার উন্নয়ন সাধন করেছেন যে, জনগণ পরবর্তীকালেও তাদের ক্ষমতার মসনদে বসিয়েছে।

গণতান্ত্রিক শাসনেরও বহু প্রভারভেদ আছে-যেমন এককেন্দ্রিক ও যুক্তরাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপতি শাসিত ও মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার। পৃথিবীর সব দেশেই কিন্তু এক রকম শাসন নেই। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে সম্রাট-বাদশা-আমীরদের শাসন অব্যাহত আছে। সে কারণে Joseph De Maistre বলেছেন, "প্রত্যেক জাতিরই সরকার আছে-যা তারা পছন্দ করে (Every nation has government that it deserves)। কিন্তু আমরা Alexander pope-এর বক্তব্যের সূত্র ধরে যে আলোচনা করলাম তা সর্বত সত্য নয়।

সরকার ভাল শাসন করলেই তাকে উত্তম বলতে পারি না। উত্তম হতে গেলে তাকে প্রথমেই গণতান্ত্রিক হতে হবে। পোপের কথার পরিপ্রেক্ষিতে H. Finer বলেছেন যে, উত্তম সরকার কোনোটি মুক্ত মানুষই তা নির্ধারণ করতে পারে (But what is best must freemen still decide)। পোপও নাকি এরকম কথা বলেছেন ব্যক্তিস্বার্থের কারণে। তিনি সে সময়ে ব্রিটেনের রাজাদের একান্ত কাছে থাকা ও নানাবিধ সুবিধা প্রাপ্তির জন্য এরকম বক্তব্য দিয়ে তোয়াজ করেছেন। প্রত্যেক সরকারেরই ক্রটি আছে এবং ক্রটিমুক্ত সরকার পাওয়া দুষ্কর। Friedrich বলেছেন, সম্পূর্ণ ভাল সরকার মানুষের পক্ষে কার্যকর করা সম্ভব নয়-এটা কেবল দেবতাদের রাজ্যেই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বুন্টসলি বলেন যে, "রাষ্ট্রের মূখ্য তিনটি উদ্দেশ্য আছে-সে সব হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করা, জাতীয় জীবনের উন্নয়ন এবং মানবতার উৎকর্ষতা সাধন"(The establihsment of good governnance the developmnt of national life and the perfection of humanity-these are the triple ends of the state)। প্রকৃত কথা হলো সুশাসন প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে কোনোক্রমেই অন্যগুলো বাস্তবায়ন সম্ভব নয়। কীভাবে সুশাসন আসবে তা এক কথায় বলা কঠিন, তবে এর জন্য বেশ কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। সে সম্পর্কে আমরা পর পৃষ্ঠায় আলোচনা করব। (সূত্রঃ ড. মো. মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

উত্তর আমেরিকা অবাধ বাণিজ্য চুক্তি (নাফটা)
(North American Free Trade Agreement)

এটি একটি আঞ্চলিক জোট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ও মেক্সিকো নিয়ে এই জোট গঠিত। ১৯৯৩ সালের ১৭ নভেম্বর যুক্তরাষ্ট্র এই চুক্ত অনুমেদান করে। ১৯৯৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে চুক্তিটি কার্যকর হয়। চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ দিকসমূহ নিম্নরূপ:

১. এই চুক্তি স্বাক্ষরেরর ফলে উত্তর আমেরিকায় বিশ্বের সর্ববৃহৎ অবধা বাণিজ্য এলাকা গঠিত হয়।
২. এইচ চুক্তির ফলে সদস্যভূক্ত দেশসমূহের অনেক পণ্যের ওপর থেকে অবিলম্বে কর ওঠে যাবে।
৩. চুক্তি স্বাক্ষরের ১৫ বছরের মধ্যে সদস্যভূক্ত দেশগুলোর মধ্যকার সকল বাণিজ্য বাধা ও শুল্ক তুলে দেয়া হবে।
৪. কিছু গুরুত্বপূর্ণ কৃষি পণ্যের ওপর থেকে শুল্ক প্রত্যাহার করা হবে ১৫ বছর পরে। এই সংরক্ষণ ব্যবস্থার অন্তর্ভূক্ত মার্কিন কৃষি পণ্যের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে চিনি ও কমলার রস।
৫. অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে মেক্সিকো ছয় বছর পর তার বাজার যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডার বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান ও ব্যাংকগুলোর জন্য খুলে দেবে।

নাফটা চুক্তি যুক্তরাষ্ট্রের জন্য রাজনৈতিক অ অর্থনৈতিক দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সাথে যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক উন্নয়নের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপস্বরূপ।

মেক্সিকোতে অল্প মজুরিতে শ্রমিক পাওয়া যায় বলে মার্কিন কোম্পানিগুলো এ সুবিধা কাজে লাগাতে সক্ষম হবে। এই চুক্তির ফলে বাংলাদেশ তথা তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশ ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কারণ যুক্তরাষ্ট্র অল্প খরচে মেক্সিকোতে বস্ত্রশিল্প প্রতিষ্ঠা করার ফলে এ দেশগুলোর তৈরি পোশাক শিল্পের বাজার হ্রাস পাবে।

উদারনীতি (Liberalism)

ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান এবং অবাধ ব্যবসা-বাণিজ্যের স্বাধীনতা সমন্বিত মতাদশর্কে উদারনীতি হিসেবে অভিহিত করা যায়। সাধারণত রক্ষণশীলদের বিরুদ্ধে এই নীতি ব্যবহৃত হয়। এটি যেমন রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে, তেমনি বিপ্লবেরও বিরুদ্ধে। অনেকটা প্রগতিশীলতার সাথে এর সম্পর্ক রয়েছে। উদারনৈতিক মতবাদ ইতিহাসের বিশেষ কোনো সময়ে অথবা একক কোনো চিন্তাশীল ব্যক্তি দ্বারা উদ্ভাবিত হয়নি। দীর্ঘদিন ধরে বিকাশ লাভ করে এই উদারনৈতিক ভাবধারার সৃষ্টি হয়েছে। কারও কারও মতে প্রাচীন গ্রিসেই উদারনীতির প্রধান দুটি অঙ্গ, অর্থাৎ চিন্তার স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতা বিরাজ ক্ষমতা। অবশ্য গ্রিসে মুষ্টিমেয় অভিজাত ব্যক্তিই ওইসব সুযোগ সুবিধার অধিকারী ছিল। খ্রিস্টান ধর্ম প্রবর্তনের গোড়ার দিকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে উদারনীতিকে সমর্থন করা হত। এর সুদূরপ্রসারী সুফল দেখা দেয় ক্রীতদাস প্রথা উচ্ছেদের আন্দোলনে এবং রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় স্বাধীনতার সমর্থনে। ক্রমে রাষ্ট্র দার্শনিকদের চিন্তায় উদারনীতির প্রত্যয়গুলো স্পষ্ট হতে শুরু করে। জার্মানি, ফ্রান্স, ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে রোমান ক্যাথলিক নিয়ন্ত্রণ থেকে প্রাটেস্ট্যান্টদের মুক্তির আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে হবস, লক ও ফ্রান্সে রুশো, গিজো প্রমুখ রাষ্ট্র দার্শনিকদের মধ্যে উদারনৈতিক ভাবধারা বিকশিত হতে শুরু করে। ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উদারনৈতিক চিন্তায় প্রকারভেদ ফুঠে ওঠে।

ইতিহাসের ধারায় উদারনীতির উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রী ভূস্বামীদের দাপট, অভিজাত শ্রেণির কুক্ষিগত রাষ্ট্র এবং খ্রিস্টান যাজকদের আধিপত্যের বিরুদ্ধে লোকের একটি স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া হিসাবে। লোকে চেয়েছিল ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসন মনে করতেন যে মানুষের অধিকার হস্তান্তর করা যায় না এবং তা রক্ষা করাই হলো সরকারের বড় কাজ। জন লক তাঁর সমকালীন বৈপ্লবিক যুগের মুক্তির আকুতিকে সর্বপ্রথম সুস্পষ্টভাবে লিপিবদ্ধ করেন। আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামে ও ফরাসি বিপ্লবে মানবাধিকারের সনদ রচিত হয়।

কার্যত উদারনীতি ছিল জীবনযাত্রার একটি মনোভঙ্গী, শুধুই এক মতাদর্শ মাত্র নয়, তাতে মানুষের শুভসত্তা ও যুক্তিবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপিত হয়। এতে সংস্কারের মাধ্যমে সামাজিক উন্নয়নের নীতি অনুসরণ করা হয়। ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল ও সুখবহ করার জন্য জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে বাঞ্ছিত সংস্কার সাধনের মাধ্যমে যেসব রীতিনীতি ও মূল্যবোধ প্রধান্য পায় তা কার্যক্রমে গণতন্ত্রের সারবস্তু হয়ে দাঁড়ায়। মনোভঙ্গী হিসেবে যুক্তিবোধ ও বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

উনিশ শতক থেকে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদার্শনিকেরা এই উদারনৈতিক ভাবধারাকে তাত্ত্বিক সূত্রে বিবৃত করেন, সমন্বিতরূপে তত্ত্বগুলো ক্রমে একটি আন্দোলনের পথে বিকশিত হয়। উনিশ শতকের সবচেয়ে শিল্পোন্নত দেশ ইংল্যান্ডে উদারনীতি জাতীয় দর্শন ও রাষ্ট্রীয় কর্মপন্থার মাননির্ধারক হিসেবে প্রথম মর্যাদা লাভ করে, ইংল্যান্ডে হুইগ দল পরবর্তী কালে লিবার‍্যাল অর্থাৎ উদারনৈতিক দল নামে অভিহিত হয়।

উদারনীতির অর্থনৈতিক ভাবনা অ্যাডাম স্মিথ-এর 'ওয়েলথ অফ নেশনস' থেকে উৎপত্তি। অবাধ ব্যবসাবাণিজ্য ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক বিধিব্যবস্থাকে সমর্থন করা হয় এতে। উদারনীতির রাষ্ট্রদর্শনও ছিল বেনথামের হিতবাদী দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেই নিরিখে বেনথাম নানা রকম সংস্কারের সুপারিশ করেন, তার অন্যতম ছিল পার্লামেন্টের বার্ষিক অধিবেশন, সর্বজনীন ভোটাধিকার, আমলাতন্ত্র তথা সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে আইনসভার অধীনস্থ করা। ব্যক্তিস্বাধীনতার ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল ও আন্দোলন গড়ে ওঠে উদারনীতির ভিত্তিতে; তাতে সংবিধানসম্মত রাষ্ট্রব্যবস্থায় সর্বসাধারণের জীবন ও ধনসম্পত্তির নিরাপত্তা আইনের দ্বারা সুরক্ষিত। আদালতে আইনের আশ্রয় গ্রহণের সুযোগ এবং মতামত প্রকাশ, সংঘবদ্ধ হওয়া এবং মুদ্রণের নিরঙ্কুশ স্বাধীনতাও উদারনীতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ।

বিশ শতকে দুটি চিন্তাধারা মিশে গিয়ে উদারনীতির একটি আধুনিক রূপ পরগ্রহ করে। তার একটি হলো রাজনৈতিক গণতন্ত্র আর অপরটি হলো শ্রমিক আন্দোলনে সংস্কারবাদী সমাজতন্ত্র। এটি কেবল আর মধ্যবিত্তের মতাদর্শ হয়ে রইল না, সর্বসাধারণের মতাদর্শে পরিণত হলো।

উদারনৈতিক গণতন্ত্র (Liberal Democracy)

স্বাভাবিকভাবেই গণতন্ত্র শব্দটি উদারতার সাথে সম্পর্কিত। যেখানে উদারনীতি নেই সেখানে গণতন্ত্র কার্যকর হতে পারে না। গণতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থারই একটি বিশেষ রূপ- উদারনৈতিক গণতন্ত্র। ১৭৭৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের 'স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে' বিবৃত হয়েছিল যে, মানুষ স্বাধীনভাবে জন্মায়, সেই স্বাধীন ভূমিতে মানুষ সামাজিক, রাজনৈতিক ও আর্থনৈতিক জীবনের সর্বস্তরে সমতার অধিকারী। জীবনের নিরাপত্তা, স্বাধীনতা ও সুখের সন্ধানে মানুষ আজন্মকাল নানাবিধ অধিকার ভোগ করে এসেছে। এই ঘোষণাপত্র ছাড়াও ১৬৮৮ সালের ব্রিটেনের গৌরবময় বিপ্লব এবং ১৭৮৯ সালের ফরাসি বিপ্লব উদারনৈতিক গণতন্ত্রী ভাবধারার সূচনা করেছিল।

উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অন্তঃসার হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা, নানাবিধ অধিকার এবং শাসিতের সম্মতি-সাপেক্ষ বৈধতা-সম্পন্ন সরকার। যা প্রকৃতপক্ষে গণতন্ত্রেরই নামান্তর। এই প্রত্যয়ের মূলকথা নাগরিকের যাবতীয় অধিকারের স্বীকৃতি, আইনের শাসন এবং রাষ্ট্রের প্রশাসনের গণতান্ত্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে উদারনীতির সুসংবদ্ধ সম্পর্ক। গণতন্ত্র ক্রমপ্রসারমান। কালক্রমে গণতন্ত্রেরও বিবর্তন হয়েছে। কখনো গণতন্ত্র ভঙ্গুর আবার কখনো গণতন্ত্র এর নিজ স্বকীয়তায় উদিত হয়। আর্থনৈতিক

ক্ষেত্রে মিশ্র অর্থনীতি ও গণতান্ত্রিক পরিকল্পনা অবাধ বাণিজ্যের স্থান অধিকার করেছে। আর্থনৈতিক সমতার নীতি প্রাধান্য পাওয়ায় উদারনৈতিক গণতন্ত্রের অবাধ গতি অনেকাংশে রুদ্ধ হয়েছে। গণতন্ত্রের সকল বাধ রোধ করে সকলের জন্য অবাধ গণতন্ত্র চর্চার নীতি উদার গণতন্ত্রের আওতাভূক্ত।

উদ্দেশ্যমূলক ভোট (Deliberative Vote)

সংসদে কিংবা আইন পরিষদে স্পিকারের প্রদত্ত বিশেষ ভোট। সাধারণত 'হ্যা' ও 'না' পক্ষের ভোট সমান হয়ে গেলে স্পিকার কাস্টিং ভোট প্রদান করেন। কিন্তু পার্লামেন্টে স্পিকার অন্যতম ভোটও প্রদান করেন। যেমন দক্ষিণ আফ্রিকার সংবিধানের কিছু নির্দিষ্ট অংশ সংশোধন করার জন্য উভয় পক্ষের যৌথ অধিবেশনের দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতির দরকার হয়। এ ধরনের অধিবেশনে যখন চূড়ান্ত ভোট অনুষ্ঠিত হয় তখন স্পিকার ভোট প্রদান করতে পারেন। এটাই deliberative বা উদ্দেশ্যমূলক ভোট।

উদ্বাস্তু (Displaced Persons)

উদ্বাস্তু বা বাস্তুহারা ব্যক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে হাজার হাজার মানুষ নিজেদের আবাসস্থল ও বাসভূমি হতে উৎখাত হয়েছে ও রাষ্ট্রহারা হয়েছে তাদেরকে উদ্বাস্তু বলা হয়। জার্মানিতে অবস্থানরত মিত্রশক্তিবর্গ কর্তৃক তাদেরকে জার্মানি ও অন্যান্য দেশে বিশেষ শিবিরে রাখা হয়। পরে আন্তর্জাতিক উদ্বাস্তু সংস্থা (International Refugee Organisation) তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করে।

উদ্বৃত্ত মূল্য (Surplus Value)

প্রত্যয়টি মার্কসের শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্বের (labour theory of value) প্রধান অঙ্গ। মার্কস মনে করতেন, উৎপাদনের মাত্র একটি উপাদান আছে। আর সেটি হলো শ্রম। শ্রমিককে তার শ্রম বা শ্রমশক্তির বিনিময়ে যে পুঁজিপতিরা যে মূল্য প্রদান করে, সেটা তার শ্রমশক্তির সমান বলে ধরে নেওয়া হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা শ্রমিকের কাজের মোট সময়ের মূল্য অপেক্ষা কম। শ্রমিক যে বস্তু উৎপাদন করে সেটা অতিরিক্ত দামে পুঁজিপতি বিক্রয় করে। আর সেই অনুপাতে শ্রমিক মজুরি পায় কম, অর্থাৎ অতিরিক্ত যে সময়ের কাজের মূল্য শ্রমিক কম পায় সেটা তার উদ্বৃত্ত মূল্য হিসেবে প্রাপ্য। যতটা থেকে তাকে বঞ্চিত করা হয় সেটা তার অতিরিক্ত শ্রম সময়ের মূল্য। ধরা যাক, একজন শ্রমিক ৮ ঘণ্টা পরিশ্রম করে ৫০ টাকার পরিমান মুনাফার সৃষ্টি করে। কিন্তু তাকে বেতন দেয়া হয় ২৫ টাকা, যা তার চার ঘণ্টার শ্রমের মূল্যমাত্র। বাকি যে চার ঘণ্টা শ্রমের মূল্য থেকে সে বঞ্চিত হয়, সেটাই হলো উদ্বৃত্ত মূল্য। এই উদ্বৃত্ত মূল্য মালিকের ঘরে জমা হয়। তত্ত্বে উদ্বৃত্ত মূল্যের দৃষ্টিতে মুনাফাকে বিচার করা হয়েছে। শ্রমভিত্তিক মূল্যতত্ত্বে বলা হয় যে কোনো জিনিস উৎপাদন করতে হবে যে সামাজিক

সময় লাগে সেটাই হলো তার মূল্য। মুনাফা ও দাম হলো বাহ্যিক আকার, যার পেছনে অতিরিক্ত শ্রমের মূল্য থাকে অন্তর্নিহিত। আর সেটিই উদ্বৃত্ত মূল্যের ক্ষেত্র।

উন্নয়ন (Development)

উন্নয়ন একটি গতিশীল প্রক্রিয়া এবং একটি সার্বিক ধারণা। সাধারণত যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনো বস্তু বা সমাজ এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় ধাবিত বা রূপান্তরিত হয়ে উন্নততর পর্যায়ে উপনীত হয়, তখন তাকে উন্নয়ন বলে। একটি রাষ্ট্র বা সমাজের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও সাংস্কৃতিক দিকসহ সকল দিকের সমন্বিত উন্নয়নকে বলে সার্বিক উন্নয়ন (Total Development)। এ সার্বিক উন্নয়নের প্রবক্তারা মনে করেন যে, একটা সমাজের বিভিন্ন দিকসমূহ পরস্পর এমনই ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত যে, আলাদা আলাদাভাবে কোনো একটি দিকের উন্নয়ন চূড়ান্ত বিচারে সম্ভবপর নয়। তাই প্রকৃত উন্নয়নের জন্য সার্বিক উন্নয়ন প্রক্রিয়াই যথার্থ।

উন্নয়নশীল দেশ (Developing Countries)

সাধারণত যে সকল দেশ উন্নত নয়, কিন্তু উন্নয়নের ধারা অব্যাহত রেখেছে সে সকল দেশগুলোকে উন্নয়নশীল দেশ বলা হয়। এশিয়া, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকার যে সমস্ত দেশ একসময় কোনো না কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশ ছিল এবং এখনও পর্যন্ত প্রযুক্তি, শিল্পায়ন ও মাথাপিছু আয়ের দিক থেকে অনুন্নত, সে সমস্ত দেশকেই উন্নত বিশ্বের রাজনীতিবিদ ও অর্থনীতিবিদরা উন্নয়নশীল দেশ বলে অভিহিত করেন। এই দেশসমূহকেই কেউ কেউ বলেন স্বল্পোন্নত দেশ বা Less Developed Countries (LDC), আবার কেউবা অনুন্নত দেশ (Undeveloped Countries) বলে অভিহিত করেন।

উপদল (Faction)

সাধারণত উপদল অর্থ হলো ক্ষুদ্রগোষ্ঠী। দলের অভ্যন্তরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল গড়ে ওঠাই উপদলের শামিল। একই দলের মধ্যে এক গোষ্ঠী বিশেষ রাজনৈতিক মনোভঙ্গীর ভিত্তিতে দানা বাঁধে এবং সেইসব গোষ্ঠী অপরাপর গোষ্ঠীর সঙ্গে অল্পবিস্তর বিষয়ে এক অপরের প্রতিপক্ষ মনোভাব গড়ে তোলে। রাজনৈতিক দল ছাড়াও সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কিংবা সংগঠনের মধ্যেও সমমনোভাবাপন্ন সদস্যদের গোষ্ঠীগতভাবে উপদল গড়ে তুলতে দেখা যায়। কোনো উপদল যখন ক্ষমতার শীর্ষে উঠতে চায় এবং নিজেদের আদর্শ ও উদ্দেশের প্রেক্ষাপটে সদস্য বৃদ্ধি করে চলে তখন সেটা একটি পুরোপুরি দলেই পরিণত হয়। যেসব দলে উপদল গড়ার প্রবণতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হয় না, সে সব দলেও ব্যক্তিকেন্দ্রিক সংযত করা হয়ে থাকে। তবে অনেক সময় বিচ্ছিন্ন উপদল বিরোধী পক্ষ হিসেবে রাজনৈতিক ভারসাম্য রক্ষা করে।

উপনিবেশ (Colony)

উপনিবেশ বলতে এমন এক ভূ-খণ্ডগত অধিকারকে নির্দেশ করে, যেখানে তার জনগণ অন্য একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের শাসনাধীন এবং শোষণাধীনও বটে, অথচ সেই রাষ্ট্রের কোনো অবিচ্ছেদ্য অংশ নয়। উপনিবেশে অনেক সময় স্বায়ত্তশাসন বা গণপ্রতিনিধিত্বশীল পার্লামেন্ট মন্ত্রিসভা ইত্যাদিও থাকতে পারে। কিন্তু, উপনিবেশবাদী শক্তি উপনিবেশের পার্লামেন্ট বা সরকারের যে কোনো সিদ্ধান্তকে বাতিল করে দিয়ে স্বীয় সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দিতে পারে। অর্থাৎ, উপনিবেশের প্রকৃত অর্থে, স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব থাকে না। উপনিবেশেবের উৎপত্তির দিকে তাকালে দেখা যায় যে, আন্তর্জাতিক জলপথসমূহ আবিষ্কারের পর তৎকালীন উন্নত দেশসমূহের ব্যবসায়ীরাই স্ব-স্ব রাষ্ট্রের পৃষ্ঠপোষকতায় উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। বস্তুত ষোড়শ শতাব্দীর পর থেকেই উপনিবেশসমূহের উদ্ভব। পরবর্তীকালে, ব্যবসায়ীদের হাত থেকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট উপনিবেশের শাসনভার গ্রহণ করে। ইউরোপের ব্রিটেন, ফ্রান্স, পর্তুগাল, স্পেন, হল্যান্ড প্রমুখ রাষ্ট্র এবং এশিয়ার জাপান, আফ্রিকা ও ল্যাটিন আমেরিকায় স্ব-স্ব উপনিবেশ স্থাপন করেছিল। উপনিবেশ স্থাপনের মৌল উদ্দেশ্য হলো উপনিবেশ থেকে কাঁচামাল ও অন্যান্য বহনযোগ্য সম্পদাদি লুণ্ঠন করে নেওয়া এবং উপনিবেশের পুঁজির বিকাশ ও শিল্পায়নের সম্ভাবনাকে দাবিয়ে রেখে ঐ সমস্ত দেশকে নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের একচেটিয়া বাজার হিসাবে ব্যবহার করা। কিন্তু, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী বিশ্বপরিস্থিতিতে উপনিবেশসমূহে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তীব্রতর হয়ে ওঠে এবং একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। এমতাবস্থায়, শিল্পোন্নত দেশসমূহ (যাদের অধিকাংশই সাবেক উপনিবেশবাদী শক্তি), সাবেক উপনিবেশসমূহকে অর্থনৈতিকভাবে পদানত ও মুখাপেক্ষী করে রাখার নতুন কৌশল অবলম্বন করে। এই নতুন কায়দাকে বলে নয়া উপনিবেশবাদ। বর্তমানে উপনিবেশবাদীরা তাদের সমর্থিত পুতুল সরকার দিয়ে পরোক্ষভাবে শাসন কার্যে হস্তক্ষেপ করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, উপনিবেশবাদী শক্তিসমূহ, তাদের স্বদেশ থেকে বহু দূরবর্তী বিপুল এলাকা ও জনগণকে পদানত করতে পেরেছিল। প্রধানত তাদের উন্নততর অস্ত্রশস্ত্র, বিশেষত কামান, আগ্নেয়াস্ত্র, গোলা বারুদ (Gun-powder) ইত্যাদির জোরে উপনিবেশ স্থাপন করে।

উপনিবেশবাদ, নয়া (Neo-colony)

নয়া-উপনিবেশবাদকে সাম্রাজ্যবাদী কৌশলের সমষ্টিগতরূপ বলা হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে উপনিবেশবাদ এক নতুন অঙ্গিকে প্রবাহিত হতে শুরু করে। অর্থাৎ নতুন আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে উপনিবেশিক শাসকরা নিজেদের শোষণ ও প্রাধান্য বজায় রাখার লক্ষ্যে নতুন কৌশল অবলম্বন করে। বিশেষত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর সাবেক উপনিবেশগুলোতে প্রবল জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং একের পর এক উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যেতে থাকে। এমতাবস্থায়, সাম্রাজ্যবাদীরা, সাবেকি কায়দায়

উপনিবেশসমূহ দখলে রাখা সম্ভবপর নয় বুঝতে পেরে, তাদের বাজার ও প্রভাব বলয় বজায় রাখার স্বার্থে সাবেক উপনিবেশগুলোতে অর্থনৈতিকভাবে পদানত রাখার নয়া কৌশল অবলম্বন করে এবং বহুলাংশে সাফল্যও অর্জন করে। সাম্রাজ্যবাদীদের (বা নয়া-সাম্রাজ্যবাদী) নিকট অর্থনৈতিকভাবে মুখাপেক্ষী অনুন্নত অঞ্চল বা দেশসমূহকে বলে নয়া উপনিবেশ। আর এই প্রক্রিয়াকে বলে নয়া উপনিবেশবাদ।

উপ-নির্বাচন (By-election)

কোনো পার্লামেন্ট বা সংস্থার মেয়াদকালে নির্বাচিত সদস্যের মৃত্যু, পদত্যাগ বা অপর কোনো কারণে তাঁর পদ শূন্য হলে, সেই পদপূরণের জন্য যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়, তাকেই উপনির্বাচন (By-election) বলে। উপনির্বাচনে নির্বাচিত সদস্য সংশ্লিষ্ট পার্লামেন্ট বা সংস্থার অবশিষ্ট মেয়াদ কালের জন্যই নির্বাচিত হন। অন্যান্য স্থানীয় সরকারের ক্ষেত্রেও উপনির্বাচন প্রযোজ্য হতে পারে। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কোনো সদস্য একাধিক আসন থেকে নির্বাচিত হলে নিয়মানুযায়ী তিনি একটি আসনের প্রতিনিধিত্ব রাখতে পারেন। বাকি আসন ছেড়ে দেন। পরবর্তীতে এসব ছেড়ে দেয়া আসনেও উপনির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়।

উপনিষদ (Assembly)

উপনিষদের অপর নাম বেদান্ত বা বেদের অন্ত। মহর্ষি বাদরায়ন বেদান্ত দর্শনের রচয়িতা। শংকরাচার্য (৩য়-৪র্থ শতাব্দী) ও রামানুজ (একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দী) এর প্রধান ভাষ্যকার। উপনিষদে ব্রহ্ম থেকে জগতের উৎপত্তি কীভাবে ঘটেছে তা বিভিন্ন উপনিষদে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। শংকরাচার্য্যের মতে ব্রহ্মেরই একমাত্র সত্তা আছে। এ ছাড়া জগতের কোনো যথার্থ সত্তা নেই; আত্মা ও ব্রহ্ম অভিন্ন এবং জগৎ মায়ার সৃষ্টি। আত্মজ্ঞনের দ্বারা অজ্ঞানতা কেটে গেলে উপলব্ধি করা যায় যে, জগতের কোনোই সত্তা নেই; (মায়ার কি কোনো সত্তা থাকে?)। কিন্তু রামানুজের মতে, আত্মা দেহ ও মন থেকে স্বতন্ত্র, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপ। আত্ম নিত্য, নির্বিশেষ, নিষ্ক্রিয়, অর্খ ও অনাদি। আত্মার স্বরূপ সম্পর্কে অজ্ঞতাবশতই জীব নিজেকে কর্তা, ভোক্তা বা জ্ঞাতা বলে মনে করে এবং জাগতিক সুখ দুঃখকে নিজের সুখ দুঃখ বলে বিবেচনা করে। বস্তুত, অহং (Ego) এবং আত্মা এক নয়। অহংকে জয় করার মধ্য দিয়েই ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর। অহংকে সম্পূর্ণরূপে জয় করার সঙ্গে সঙ্গেই সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি সত্যকে উপলব্দি করে এবং অনুভব করে, "আমিই ব্রহ্ম"। এভাবেই ব্রহ্ম এবং নিজের মধ্যেকার মায়াবৃত পার্থক্য ঘুচে যায় (ইসলামি 'আনাল হক' সম্পর্কিত ব্যাখ্যার সঙ্গে সাযুজ্য লক্ষণীয়)। রামানুজের মতে ব্রহ্মের দুই রূপ, 'চিৎ' ও 'অচিৎ'। 'চিৎ' অংশ থেকে জড়জগতের এবং 'অচিৎ' অংশ থেকে জীবজগতের উৎপত্তি। সুতরাং জড়দেহ ও ব্রহ্মের অংশ, তবে তা শাশ্বত নয়। আত্মা শাশ্বত এবং সূক্ষ্ম। চেতনা আত্মার অবিচ্ছেদ্য গুণ। রামানুজের মতে আত্ম ও অহং অভিন্ন। (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

উপযোগ (Utility)

সাধারণত উপযোগ বলতে উপকারিতা বোঝায়। অর্থনীতিতে উপযোগ হল মানুষের অভাব মিটানোর জন্য কোন দ্রব্যের ক্ষমতা। মানুষ যখন কোনো অভাব বোধ করে তখন সে তার অভাব পূরণের জন্য কোন দ্রব্য ভোগ করে। এই ভোগের দ্বারা দ্রব্যের উপযোগ নষ্ট হয় এবং মানুষের অভাব পূরণ হয়। অবশ্য উপযোগের সাথে ভাল মন্দের সম্পর্ক নাই। যে-কোন দ্রব্য তা ভাল হোক মন্দ হোক মানুষের অভাব মিটাতে পারলে বুঝতে হবে এর উপযোগ আছে। অতএব, উপযোগ হলো কোনো বস্তুর সামাজিক প্রয়োজন মেটানোর ক্ষমতা।

উপযোগ, সামগ্রিক (Total Utility)

সাধারণত কোনো দ্রব্যের সমস্ত এককের উপযোগ একত্র যোগ করলে সামগ্রিক বা মোট উপযোগ পাওয়া যায়। অর্থাৎ কোনো দ্রব্যের সামগ্রিক উপযোগ বলতে সে দ্রব্য যত ইউনিট ভোক্তা কর্তৃক ব্যবহার করা হয়, তত ইউনিটের যোগফলকে বোঝায়। যেমন, কোনো এক ব্যক্তি তার প্রয়োজন মেটানোর জন্য কোনো একটি দ্রব্য তিনবার ক্রয় করল। তা হলে ওই ব্যক্তির কাছে ওই দ্রব্যের সামগ্রিক উপযোগ (Total Utility) হন তিন।

উপযোগবাদ (Utilitarianism)

উপযোগবাদ হলো এমন এক মতবাদ, যেখানে অন্য সবদিক উপেক্ষা করে, কেবল উপযোগিতার মানদন্ডে কার্যাদির মূল্যায়ন করে। এটি একটি বুর্জোয়া ন্যায়তত্ত্ব। বেন্থাম এই তত্ত্বের উদ্ভাবক। তাঁর মতে নীতি হওয়া উচিত, প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণের মাধ্যমে "সর্বাধিক লোকের সর্বাধিক উপকার"। তিনি আরও মনে করেন যে, কোনো কাজ নৈতিক না অনৈতিক, তা ওই কাজের দ্বারা কতজন লোকের ভালো ও কতজন লোকের মন্দ হয়েছে, সেই হিসাব থেকে গাণিতিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। জন স্টুয়ার্ট মিল উপকার এবং আনন্দের গুণগত মূল্যায়নের তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে, দৈহিক আনন্দ বা পরিতৃপ্তির তুলনায় অন্তরের আনন্দ বা পরিতৃপ্তিই হল অধিকতর খাঁটি। উপযোগিতার নীতি হল সুখ ও দুঃখের আপেক্ষিক হিসাব। দুঃখ হলো যন্ত্রণা, কষ্ট অথবা তার কারণ। সুখ হল তৃপ্তি বা তৃপ্তির কারণ। এটা এক ধরনের অনুভূতি। মানুষের সুখ বা দুঃখ, কোথায় মানুষের তৃপ্তি বা যন্ত্রণা এটা বোঝাতে অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট কোনো তথ্য-প্রমাণ বা সাক্ষের দরকার নেই। সুখ দুঃখের মূল্যবিচার সম্ভব বিশেষ ব্যক্তির উপলব্ধি থেকে। ব্যক্তির এই উপলব্ধির পরিমাপক হলঃ সুখ বা দুঃখের তীব্রতা (Intensity), স্থায়িত্ব (Duration), নিশ্চয়তা (certainty) সান্নিধ্য বা দুরত্ব (proximity), উর্বরতা (Fecundity) পবিত্রতা (purity) এবং ব্যাপ্তি (Extent)। তবে দুঃখ কিংবা সুখ ব্যক্তির একার ব্যাপার বা বিচ্ছিন্ন ব্যাপার নয়। একের সুখ বা দুঃখের প্রভাব অন্যের উপরেও পড়ে। অর্থাৎ ব্যক্তির নীতিবোধ; মূল্যবোধ ও যুক্তিবোধকে সকল ক্ষেত্রে

প্রাধান্য দেওয়ার উদারতাবাদের উদ্দেশ্য। রাষ্ট্রের ক্ষেত্রে বলা যায় যে বস্তু বা আচরণ বা নীতি বা সরকারের কোন সিদ্ধান্ত তাকে বেদনা বা যন্ত্রণা দেয় বা দিতে পারে বলে মনে করে বলে তাকে সে এড়িয়ে যায় এবং যা তাকে আনন্দ দেয় বা দিতে পারে তাকে সে গ্রহণ করে। সুতরাং সুখ প্রদানকারী কাজ বা সিদ্ধান্তগুলোকে সে ভাল এবং বিপরীত কাজকে সে খারাপ নামে অভিহিত করে। উপযোগবাদের জন্ম গ্রিক দেশে। এপিকিউরাস এর সুখভোগবাদ (Hedonism) থেকে এর জন্ম। এই তত্ত্ব থেকেই প্রয়োগবাদের উদ্ভব।

উপরিকাঠামো (Super-Structure)

উপরিকাঠামো হল সে সকল বিষয় বা কাঠামো যা একটি মূল বিষয় বা কাঠামোর ওপর নির্ভরশীল। আর মূল কাঠামোকে বলা হয় ভিত্তি (Basis)। সমাজের ক্ষেত্রে, সাধারণত অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে (সমাজতন্ত্রীদের বিবেচনায় উৎপাদন সম্পর্ককে) ধরা হয় ভিত্তি এবং রাজনীতি, শিল্প সাহিত্য, আইনব্যবস্থা, প্রশাসনব্যবস্থা, নীতি ও মূল্যবোধ, ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তাধারা ইত্যাদিকে উপরি কাঠামো বলা হয়। কেননা, একটা দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটা কী, প্রধানত তার ওপরই নির্ভর করে সে দেশের রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, সাংস্কৃতিক, নৈতিক কাঠামো ও মানের স্বরূপ। সুতরাং, ভিত্তি বা মূল কাঠামোর পরিবর্তন না করে, উপরিকাঠামো নিয়ে যত টানা হ্যাঁচড়াই করা যাক না কেন তাতে কোনো মৌলিক পরিবর্তন সাধন কোনোক্রমেই সম্ভবপর নয়। অন্যদিকে, মূল কাঠামো পরিবর্তন হলে উপরিকাঠামোগুলোর কমবেশি পরিবর্তন হতে বাধ্য। অবশ্য একথাও সত্য যে, কাঠামো পরিবর্তনের জন্য উপরিকাঠামোগুলোকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা যায়। যেমন, ধরা যাক, একটা দেশে পুঁজিবাদী অর্থনীতি বিদ্যমান আছে। এখন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটাকে পুঁজিবাদী রেখে, উপরিকাঠামোগুলোর চরিত্র সমাজতন্ত্রী করা সম্ভবপর নয়। এরই পাশাপাশি একথাও সত্য যে উপরিকাঠামোগুলো, যেমন রাজনৈতিক দল, ট্রেড ইউনিয়ন, সশস্ত্রবাহিনী, প্রশাসন ইত্যাদির মধ্যে সমাজতান্ত্রিক শক্তি সৃষ্টি করা গেলে, তা দিয়েই বিপ্লব ঘটিয়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেও পরিবর্তন করে সমাজতান্ত্রিক করা যেতে পারে। এদিক থেকে বিবেচনা করলে কাঠামো ও উপরিকাঠামোর সম্পর্ক দ্বান্দ্বিক ও পরস্পর সম্পর্কযুক্ত।

উপশালা (Lobby)

সাধারণত পার্লামেন্টের সদস্যদের চাপসৃষ্টি সংক্রান্ত একটি বিষয়। ইংরেজি লবি শব্দের শাব্দিক অর্থ উপশালা। কোনো রাজনৈতিক বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারী এবং বিশেষ করে আইনসভার সদস্যদের ওপর কোনো কাজের অনুকূলে প্রভাব বিস্তার কিংবা চাপ সৃষ্টির পদ্ধতিকে ইংরেজিতে 'লবি' করা বলা হয়। এই পদ্ধতিতে আইনসভা কিংবা সচিবালয়ের সংলগ্ন উপশালায় প্রভাববিস্তারকারী বা চাপসৃষ্টিকারী বিশেষ গোষ্ঠীর পক্ষে এক বা একাধিক ব্যক্তি কোনো সাংসদ বা মন্ত্রী কিংবা উচ্চপদস্থ সরকারি

আধিকারিককে সেই গোষ্ঠীর স্বার্থানুকূলে কোনো সিদ্ধান্ত বা ব্যবস্থা গ্রহণে প্রবৃত্ত করেন। প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টি প্রত্যক্ষভাবে হয়ে থাকে। আইনসভার সদস্যরা ভিন্ন দলের সদস্যদের সমর্থন লাভের জন্যও উপশালায় এই পদ্ধতি অবলম্বন করেন।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট স্বয়ং তাঁর কার্যনির্বাহি সহকারীদের বিবেচ্য কোনো বিষয়ে কংগ্রেসের সদস্যদের ভোট সংগ্রহের জন্য নিয়োগ করেন। সেখানকার উপশালায় প্রভাব বিস্তার বা চাপ সৃষ্টির জন্য তালিকুভুক্তি কিছু পেশাদার লোক থাকেন, যাঁরা তাঁদের মক্কেলদের স্বার্থে সমর্থন অর্জনের চেষ্টা করেন। ব্রিটেনে সংবাদ সংস্থাগুলো উপশালার কাজ করে। তাদের মাধ্যমে সুকৌশলে গোপনীয় খবর বেরিয়ে যায় জনমত যাচাই অথবা লোকের সেইসব সংবাদে প্রতিক্রিয়া জানার উদ্দেশে।

লবি বলতে কখনো কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বুঝায়। যেমন 'সংসদ লবি', 'ভোটিং লবি'। বাংলাদেশ জাতীয় সংসদের কার্যপ্রণালী বিধিতে বলা হয়েছে 'লবি অর্থ সংসদ কক্ষ সংলগ্ন অলিন্দ এবং একই প্রান্ত বিশিষ্ট এলাকা'। ব্রিটিশ কমন্সসভার চেম্বারের পাশের দুটি রুমের একটিকে 'ভোটিং লবি' বলে। এখানে এসে এমপিরা ভোট প্রদান করেন। আবার 'লবি করা' বলতে কোনো আইন পাস বা নীতি নির্ধারণের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বোঝানো, প্রভাবিত করা বা চাপ প্রয়োগ করা বুঝায়। লবি বলতে কোনো নির্দিষ্ট গ্রুপ বা সংগঠিত ব্যক্তিদেরও বুঝায়। যেমন পরিবেশবাদী লবি, নারীবাদী লবি ইত্যাদি।

উপসাগরীয় যুদ্ধ (War of Subsea)

কুয়েতকে ইরাকের দখলমুক্ত করতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ৩২টি দেশের ইরাকের বিরুদ্ধে সামরিক অভিযান উপসাগরীয় যুদ্ধ নামে পরিচিত। ১৯৯০ সালের ২ আগস্ট ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেনের নির্দেশে ইরাকি বাহিনী কুয়েত দখল করে এবং কুয়েতকে ইরাকের ১৯ তম প্রদেশ বলে ঘোষণা করে। ৭ আগস্ট সৌদি আরবের তেলখনিগুলো রক্ষা করার উদ্দেশে আমেরিকা, ব্রিটেন, মিশর প্রভৃতি দেশের যৌথ সেনাবাহিনী মোতায়েন করা হয় উপসাগরে। এর নাম দেয়া হয় 'অপারেশন ডেজার্ট শিল্ড'। ইরাকের ওপর অর্থনৈতিক অবরোধ শুরু হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ কুয়েত থেকে ইরাকি সৈন্য প্রত্যাহারের শেষ দিন ১৯৯১ সালের ১৫ জানুয়ারি বলে ঘোষণা করে। ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হোসেন এই ডাকে সাড়া না দিলে জেলারেল নরম্যান সোয়াজকদ-এর নেতৃত্বে বহুজাতিক বাহিনী 'অপারেশন ডেজার্ট স্টর্ম' শুরু করে।

১৯৯১ সালের ১৭ জানুয়ারি বহুজাতিক বাহিনী ইরাকে বিমান হামলা শুরু করে। আক্রমণের লক্ষ্য থেকে বেসামরিক স্থানও বাদ যায়নি। ইরাক অন্যান্য আরব দেশগুলোর সমর্থন পাওয়ার লক্ষ্যে ইসরাইল ও সৌদি আরবে স্কাড মিসাইল হামলা চালায়। ২৪ ফেব্রুয়ারি বহুজাতিক বাহিনী ইরাকের বিরুদ্ধে স্থলযুদ্ধ শুরু করে। দীর্ঘ ৪৩ দিন বিমান ও স্থল আক্রমণের পর ২৬ ফেব্রুয়ারি ইরাক কুয়েত থেকে সেনা প্রত্যাহারের কথ ঘোষণা করে এবং ২৮ ফেব্রুয়ারি যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয়। উপসাগরে

স্থায়ী যুদ্ধবিরতির লক্ষ্যে নিরাপত্তা পরিষদ ঘোষিত শর্তগুলো ইরাক মেনে নেয়। শর্তগুলো হলো: ইরাকের সব ক্ষেপণাস্ত্র, রাসায়নিক, জীবানু ও পারমাণবিক অস্ত্র ধ্বংস করতে হবে। ইরাক যাতে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক অস্ত্র নির্মাণ করতে না পারে সেজন্য ইরাকের ভবিষ্যৎ কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করা হবে। কুয়েতের স্বাধীনতার পর ১৯৬৩ সালে ইরাকের সঙ্গে বিতর্কিত সীমান্ত ইরাককে মেনে নিতে হবে। যুদ্ধের ক্ষতিপূরণের জন্য ইরাককে তার তেল বিক্রয়লব্ধ অর্থের একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ বিশেষ তহবিলে জমা রাখতে হবে।

উপসাগরীয় যুদ্ধে বহুজাতিক বাহিনীর ২৩৪ জন, ৮৫,০০০ থেকে ১,৫০০,০০০ ইরাকি সৈন্য এবং প্রায় ৩৩,০০০ কুয়েতি জনগণ প্রাণ হারায়।

উহুদের যুদ্ধ (Battle of Uhud)

তৃতীয় হিজরীর সাওয়াল মাসে (৩২৫ সালে) মদিনার উহুদের প্রান্তরে মক্কার পৌত্তলিক বাহিনী ও মুসলিম বাহিনীর মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে তিন হাজার সুসজ্জিত সুদক্ষ সৈন্যের বিরুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা) মাত্র এক হাজার সৈন্য নিয়ে শত্রুর মোকাবিলা করেন। উহুদ প্রান্তরের কাছাকাছি এসে মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ তার দলের ৩০০ লোক নিয়ে মুসলিম বাহিনী ছেড়ে চলে যায়। হযরত মুহাম্মদ (সা) মাত্র ৭০০ সাহাবি নিয়ে তিন হাজার সৈন্যের মোকাবিলা করেন। এ যুদ্ধে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর চাচা বীরশ্রেষ্ঠ (রা)-সহ মুসলিম বাহিনীর ৭০ জন সাহাবী শহীদ হন। হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর দুটো দাঁতও শহীদ হয়। বিপুল ক্ষয়ক্ষতির পরও মুসলিম বাহিনী বিজয়ী হয়।

এএফপি (AFP)

বিশ্বের অন্যতম পুরনো সংবাদ সংস্থা এটি। ১৮৩৫ সালে প্যারিসে 'অজঁস আভা' (Agence Avas) নামে প্রথম বড় ধরনের যে সংবাদসংস্থার জন্ম, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর তারই পরিবতর্তিত রূপ অজঁস ফ্রাঁস-প্রেস (Agence France-Presse) অর্থাৎ এএফপি। প্রথমে এটি সরকারের মালিকানাধীন ছিল। ১৯৫৭ সাল থেকে এটি সংবাদপত্রের সেবায় নিয়োজিত। এএফপি বার্তাসংস্থা বর্তমানে ১৬৪টি দেশে সংবাদ সরবরাহ করে থাকে। এর প্রধান কার্যালয় প্যারিসে অবস্থিত।

এএসাইও (ASIO)

অস্ট্রেলিয়ার গোয়েন্দা সংস্থার নাম এএসআইও বা The Australian Security and Intelligence Organisation. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জেনারেল ডগলাস ম্যাক আর্থার জাপানিদের বিরুদ্ধে মিত্ররাষ্ট্রে সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন তখন থেকেই অস্ট্রেলিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের ইতিহাস শুরু হয়।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা (Single Majority)

পার্লামেন্টের মোট আসনের মধ্যে কোনো একটি দল কর্তৃক অর্ধেকের বেশি আসন পাওয়াকে সংখ্যাগরিষ্ঠতা বলে। সংসদীয় গণতন্ত্রে যে দল পার্লামেন্টের অধিকসংখ্যক সদস্যের সমর্থন পায় সে দল সরকারি গঠন করে। কোনো একটি দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে বিভিন্ন দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার (দেখুন, কোয়ালিশন সরকার) হতে পারে। একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে গঠিত সরকার অধিকতর স্থিতিশীল হয়।

এককেন্দ্রিক শাসনব্যবস্থা (Unitary Government)

কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকারের মধ্যে সম্পর্কের ভিত্তিতে সরকারকে এককেন্দ্রিক এবং যুক্তরাষ্ট্রীয়-এ দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এককেন্দ্রিক সরকারে যাবতীয় ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে অর্পিত থাকে। কেন্দ্রীয় সরকার প্রাদেশিক বা আঞ্চলিক সরকারসমূহকে ক্ষমতা অর্পণ করে। প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় সরকার আঞ্চলিক সরকারের ক্ষমতা হ্রাস বা বৃদ্ধি করতে পারে। এটি একটি একক অখণ্ড সংঘবদ্ধ সরকার ব্যবস্থা, যে সকল ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী। সকল ক্ষমতা কেন্দ্রের হাতে থাকে এবং কেন্দ্রীয় সরকার স্বয়ং এসব ব্যবহার অথবা অন্য বিভাগ সৃষ্টি করে সুবিধামত সেগুলোর ওপর কিছু ভার অর্পণ করতে পারে। কেন্দ্রীয় সরকার সাধারণ আইনের দ্বারা আঞ্চলিক সরকারসমূহের সীমানা,পরিধি এবং কর্তৃত্বের পরিবর্তন করতে পারে। প্রশাসনিক ও অন্যবিধ সুবিধার কারণে দেশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক খণ্ডে বিভাগ করা হয়। কিন্তু সকল ক্ষমতা আসে কেন্দ্র থেকে। আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের এজেন্ট মাত্র। আঞ্চলিক সরকারের কোনো স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নেই। সকল সময় কেন্দ্রমুখীন ভাব লক্ষ্য করা যায়। অর্থাৎ সকল ক্ষমতাই যেন আসে কেন্দ্র থেকে। ফ্রান্সে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রভূত ক্ষমতা আছে। বলা হয় "সকল বৈদ্যুতিক তারের সংযোগস্থল প্যারিসে।" অর্থাৎ সেখান থেকে সকল নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়। এ ধরনের ব্যবস্থায় একটি সরকার ও একটি আইনসভা থাকে। সংবিধান লিখিত অথবা অলিখিত হতে পারে। এই ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় আইনসভারই প্রাধান্য বজায় থাকে। স্থানীয় বা আঞ্চলিক সরকার কেন্দ্রীয় সরকারের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করে। এই শাসনব্যবস্থায় সারা দেশে একই ধরনের আইন ও একই শাসননীতি অনুসরণ করা হয়। ফলে শাসনতন্ত্র কখন জটিল ও বিপুল হয়ে পড়ে না। ছোট ছোট যেসব দেশে ভৌগোলিক সংবদ্ধতা থাকে না, সেখানে এ ধরনের শাসনব্যবস্থা কার্যকর হয়ে থাকে। যেসব দেশে লোকের রাষ্ট্রচেতনা অনুন্নত এবং স্বায়ত্তশাসনের পরিবেশ অনুকূল নয় সেখানেও এককেন্দ্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা উপযোগী। যুক্তরাজ্যে এই ব্যবস্থা সাফল্যের সঙ্গে চলে আসছে। গ্রেট ব্রিটেন, ইতালী, ফ্রান্স, জাপান, আফগানিস্তান এবং আরও অনেক দেশে এককেন্দ্রিক শাসন প্রবর্তিত আছে। পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা, কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় সরকারের মধ্যে সামঞ্জস্য, শাসনব্যবস্থার প্রয়োজনে দ্রুত পরিবর্তন, জরুরি বিষয়ে অবিলম্বে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ইত্যাদি

দিক থেকে এককেন্দ্রিক ব্যবস্থা সুবিধাজনক। তবে অসুবিধাও আছে। গণতন্ত্রের যুগে যথার্থ স্বায়ত্তশাসনের অভাব, বিভিন্ন অঞ্চলে স্থানীয় প্রয়োজন অনুযায়ী আইন না থাকা, আমলাতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা, ভৌগোলিক সংযোগ না থাকলে প্রশাসনে বিলম্ব ও সংযোগের অসুবিধা দেখা দেয়। (বিস্তারিত দেখুনঃ ড. মো. মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, ঢাকাঃ আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

একচেটিয়া কারবার (Monopoly)

যখন কোনো দ্রব্যের যোগান মাত্র একজন ব্যক্তি বা একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকে তখন এইরূপ বাজারকে একচেটিয়া কারবার বলা হয়। একচেটিয়া কারবারী দ্রব্যটির সমগ্র যোগান নিয়ন্ত্রণ করে এবং তার দ্রব্যের কোনো ঘনিষ্ঠ পরিবর্তন দ্রব্য (Close substitutes) পাওয়া যায় না। সুতরাং একচেটিয়া কারবারকে পূর্ণ প্রতিযোগিতার সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থা বলা যায়। যখন কোনো বিশেষ পণ্য বা কতিপয় পণ্যের উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর একচ্ছত্র প্রভুত্বকারী পুঁজিবাদীদের সংঘ। এই সংঘবদ্ধ পুঁজিবাদীরা কোনো ক্ষেত্রে পণ্যবিশেষের সমগ্র উৎপাদনের ওপর, কোনো ক্ষেত্রে তার সিংহভাগের ওপর প্রভুত্ব স্থাপন করে। ১৮৬০ থেকে ১৮৭০ সালের মধ্যে পণ্যের প্রতিযোগিতা তীব্র আকার ধারণ করলে, সর্বপ্রথম এরূপ সংঘের সূচনা ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৮)-এর প্রাক্কালে একচেটিয়াসমূহ পুঁজিবাদী অর্থনীতির মৌল নিয়ামক হয়ে দাঁড়ায়। লেনিনের মতে, অবাধ প্রতিযোগিতার স্থলে একচেটিয়াসমূহের প্রতিষ্ঠাই (নয়া) সাম্রাজ্যবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ও বিষয়বস্তু।

একচেটিয়া ক্ষমতা (Exclusive Power)

একচেটিয়া ক্ষমতা বা সংরক্ষিত ক্ষমতা বা একক ক্ষমতা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারি ব্যবস্থায় যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা আইন পরিষদের জন্য সরক্ষিত করা হয়, তাহাকে 'একচেটিয়া ক্ষমতা' বলে। কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ যে সকল বিষয়ে আইন প্রণয়ন করিতে পারে প্রাদেশিক আইন-পরিষদ সেই সকল আইন প্রণয়ন করিতে পারে না এবং অনুরূপ ভাবে প্রাদেশিক আইন পরিষদের জন্য রক্ষিত বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ আইন প্রণয়ন করিতে পারে না।

একনায়কতন্ত্র (Dictatorship)

একনায়কতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত। রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ভিউম্যানের মতে, "একজন বা কতিপয় ব্যক্তি যখন দেশের সকল প্রকার শাসন ক্ষমতা অধিকার এবং তা প্রতিরোধহীন ব্যবহার করে তখন তাকে একনায়কতন্ত্র বলে অভিহিত করা যায়।" কোনো বিশেষ ক্ষমতাধর ব্যক্তি বা সমর নায়ক জোরপূর্বক ক্ষমতা দখল ও তা অপ্রতিরোধ্যভাবে পরিচালনা করলে তখন তাকে একনায়কতান্ত্রিক শাসন বলা হয়। এই শাসনে জনসাধারণের অধিকার রক্ষিত হয় না। যে শ্রেণি থেকে একনায়কের উদ্ভব হয় সাধারণত সেই শ্রেণির

স্বার্থ রক্ষিত হয় অধিকতর। এটা শ্রেণি স্বার্থে (Class interest) পরিচালিত হয়। একনায়কতান্ত্রিক শাসনে সর্বময় ক্ষমতা এক ব্যক্তির হাতে অর্পিত থাকে এবং তার ইচ্ছাই সমগ্র স্তরে প্রতিফলিত হয়। এটি শুধু ব্যক্তির শাসন নয়-দলেরও শাসন, তাই বিশেষ কোনো দলের একনায়কতান্ত্রিক শাসনও প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। এ সরকার স্বেচ্ছাচারী এবং জনমতের কোনো গুরুত্ব প্রদান করা হয় না। একনায়কের ইচ্ছাই চূড়ান্ত, অন্য কোনো ইচ্ছা তার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারে না। বাছাইকৃত কিছু ব্যক্তির পরামর্শ অনুসারে শাসন পরিচালিত হয়। প্রয়োজন অনুসারে পরামর্শ গ্রহণ এবং তা বর্জন করতে পারে। ফোর্ডের বক্তব্য অনুসারে একনায়কতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অবৈধ ক্ষমতার প্রধান হিসেবে ধরা যায়। ক্ষমতার উৎস বৈধ নয়। শক্তি প্রয়োগে ক্ষমতায় আসায় নির্বাচন বা উত্তরাধিকারের বিধান মোতাবেক ক্ষমতায় আরোহন করে না। তার হাতে থাকে চরম সার্বভৌম ক্ষমতা। এতে দলের অস্তিত্ব বলবৎ থাকে, তবে সেখানে মাত্র একটি দলই বর্তমান, অন্য দলের অবস্থান স্বীকার করা হয় না। একনায়ক নিজের দলের প্রধান। একদেশ, একনেতা এবং এক দলে (On state, one leader and one party) বিশ্বাসী। বিরোধী দলের কার্য-প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কোনো সময়ে বিরোধী বা প্রতিবাদী দলের উদ্ভব হলে অংকুরেই তা বিনষ্টের ব্যবস্থা করা হয়। একটি মাত্র দল থাকবে এবং দলীয় কর্মীদের প্রধান দায়িত্ব একনায়কের ইচ্ছা ও আদর্শ প্রচার করা। শাসনকার্যে ব্যক্তি স্বাধীনতা থাকে না। ব্যক্তির প্রধান দায়িত্ব রাষ্ট্রের সেবা করা এবং একনায়কের আদেশ বিনা দ্বিধায় মাথা পেতে নেয়া। রাষ্ট্রকে প্রধান অবলম্বন হিসেবে মনে করা হয়। রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য রাষ্ট্র নিজেই,ব্যক্তি উদ্দেশ্য সাধনের মাধ্যম মাত্র। ব্যক্তি কোনোদিন রাষ্ট্রীয় স্বার্থের প্রতিকূলে কাজ করতে পারে না। মুসোলিনী বলতেন, "সবই রাষ্ট্রের মধ্যে,কোনো কিছুই রাষ্ট্রের বাহিরে নয় এবং বিরুদ্ধেও নয়" (Everything within the state, nothing outside the state and nothing against the state)। রাষ্ট্র হলো সর্বেসর্বা প্রতিষ্ঠান। মুসোলিনীর মতে, এর বাহিরে কোনো মানবিক বা আধ্যাত্মিক মূল্যবোধের উপস্থিতি সম্ভব নয় (The state is all embracing, out side of it no human and spiritual values is possible.)।

ফরাসি বিপ্লবের পর গণতন্ত্রের প্রবর্তন হবার ফলে একচ্ছত্রাধিপতিদের কাল শেষ হলেও নতুন আকারে একনায়কতন্ত্র বা ডিক্টেটরশিপ দেখা দিয়েছে। ব্যক্তি, গোষ্ঠী, পার্টি, শ্রেণি ইত্যাদি ধরনের একনায়কতন্ত্রের উদ্ভব হয়েছে। (সূত্র: ড. মো. মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

.একুশ দফা (21 Point)

তৎকালীন পূর্ববাংলায় ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর মুসলিম লীগ শাসনের অবসানের লক্ষ্যে আওয়ামী লীগ সভাপতি মওলানা ভাসানী, কৃষক-শ্রমিক পার্টির সভাপতি শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী মিলে ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের অংশগ্রহণের জন্য যুক্তফ্রন্ট নামে একটি নির্বাচনী মোর্চা গঠন করেন। হক-

ভাসানি-সোহরাওয়ার্দী নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচিই 'একুশ দফা' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য, এ নির্বাচনের মুসলিম লীগের ভরাডুবি হয় এবং যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠন করে। একুশ দফার কর্মসূচি হচ্ছে:

১. বাংলাকে পাস্তিারে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ২. বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারীর ও সমস্ত খাজনা আদায়কারী স্বত্ব উচ্ছেদ ও রহিত করে উদ্বৃত্ত জমি ভূমিহীন কৃষকদের মধ্যে বিতরণ এবং খাজনা হ্রাস ও সার্টিফিকেট মারফত খাজনা আদায় রহিত করা হবে। ৩. পাট ব্যবসা জাতীয়করণ ও তা পূর্ববঙ্গ সরকারে প্রত্যক্ষ পরিচালনায় আনা এবং মুসলিম লীগ শাসনামলের পার্ট-কেলেঙ্কারি তদন্ত ও অপরাধীর শাস্তির ব্যবস্থা। ৪. কৃষিতে সমবায় প্রথা প্রবর্তন এবং সরকারি সাহায্যে কুটির শিল্পের উন্নয়ন। ৫. পূর্ববঙ্গকে লবণশিল্পে স্বয়ংসম্পূর্ণ করা এবং লবণ কেলেঙ্কারির তদন্ত ও শাস্তির ব্যবস্থা। ৬. কারিগর শ্রেণির গরিব মোহাজেরদেব কর্মসংস্থানের আশু ব্যবস্থা। ৭. খাল খনন ও সেচ ব্যবস্থার মাধ্যমে দেশে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ রোধ। ৮. পূর্ববঙ্গে কৃষি ও শিল্পখাতের আধুনিকায়নের মাধ্য দেশেকে স্বাবলম্বী করা এবং আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থার মূলনীতি মাফিক শ্রমিক অধিকার প্রতিষ্ঠা। ৯. দেশের সর্বত্র অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা প্রবর্তন এবং শিক্ষকদের ন্যায্য বেতন ও ভাতার ব্যবস্থা। ১০. শিক্ষা ব্যবস্থার আমূল সংস্কার মাতৃভাষার শিক্ষাদান, সরকারি ও বেসরকারি বিদ্যালয়ের ভেদাভেদ বিলোপ করে সকল বিদ্যালয়কে সরকারি সাহায্যপুষ্ট প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা। ১১. ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় আইন প্রভৃতির সকল প্রতিক্রিয়াশীল আইন বাতিল এবং উচ্চ শিক্ষা সহজলভ্য করা। ১২. শাসনব্যয় হ্রাস, যুক্তফ্রন্টের কোনো মন্ত্রী এক হাজার টাকার বেশি বেতন গ্রহণ না করা। ১৩. দুর্নীত, স্বজনপ্রীতি ও ঘুষ বন্ধের কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ। ১৪. জননিরাপত্তা আইন, অর্ডিন্যান্স ও অনুরূপ কালাকানুন বাতিল, বিনা বিচারে আটক বন্দির মুক্তি, রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযুক্তদের প্রকাশ্য আদালতে বিচার এবং সংবাদপত্র ও সভাসমিতি শাসনবিভাগ থেকে পৃথক করা। ১৬. বর্ধমান হাউসের পরিবর্তে কম বিলাসের বাড়িতে যুক্তফ্রন্টের প্রধানমন্ত্রীর অবস্থান করা এবং বর্ধমান হাউসকে প্রথমে ছাত্রাবাস ও পরে বাংলা ভাষার গবেষণাগারে পরিণত করা। ১৭. রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে শহীদদের স্মৃতি চিহ্নিতস্বরূপ ঘটনাস্থলে শহীদ মিনার নির্মাণ করা এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত মিনার নির্মাণ করা এবং শহীদদের পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়া। ১৮.একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস এবং সরকারি ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করা। ১৯. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে পূর্ববঙ্গে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন এবং দেশরক্ষা, পররাষ্ট্র ও মুদ্রা ব্যতীত সকল বিষয় পূর্ববঙ্গ সরকারের অধীনে আনয়ন, দেশরক্ষা ক্ষেত্রে স্থল বাহিনীর হেডকোয়ার্টারে পশ্চিম পাকিস্তানে স্থাপন এবং পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র নির্মাণ কারখানা স্থাপন ও আনসার বাহিনীকে সশস্ত্র বাহিনীতে পরিণত করা। ২০. কোনো অজুহাতে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা কর্তৃক আইন পরিষদের আয়ু না বাড়ানো এবং আয়ু শেষ হওয়ার ছয় মাস পূর্বে মন্ত্রীর পদত্যাগপূর্বক নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা। ২১. যুক্তফ্রন্টের আমলে

সৃষ্ট শূন্য আসনের তিন মাসের মধ্যে উপনির্বাচনের ব্যবস্থা করা এবং পর পর তিনটি উপনির্বাচনের যুক্তফ্রন্ট প্রার্থী পরাজিত হলে মন্ত্রিসভার পদত্যাগ করা।

এক্লেশিয়া বা নগরসভা (Ecclesia)

প্রাচীনকালে এথেন্সের সকল সুস্থ সবল নাগরিকদের সাধারণ সমাবেশের নাম এক্লেশিয়া বা নগরসভা। এর ইংরেজি প্রতিশব্দ Assembly যা বর্তমানে আইনসভা হিসেবে পরিচিত। আইনগতভাবে নগররাষ্ট্রের ২০ বছর বয়স্ক প্রত্যেক পুরুষ সদস্যরাই নগরসভার সদস্য হতে পারত। নগরসভার নিয়মিত অধিবেশন বছরে দশবার বসত এবং পাঁচ শতক পরিষদের আহ্বানে জরুরি অধিবেশন বসত। রাজা ছিলেন এই নগরসভার সভাপতি। নীতি ও আইনগতভাবে ছিল এটি নগররাষ্ট্রের সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান, অনেকটা আমাদের সংসদের কাছাকাছি। কিন্তু বাস্তবতার দিক থেকে সমস্ত নাগরিক সমন্বয়ে এর কার্যকারিতা অলীক রাজনৈতিক কল্পনা বৈ আর কিছু নয়। আধুনিককালে যেমন রাষ্ট্রপ্রধানের নামে আদেশ নির্দেশ জারি করা ও কার্যকর করা হয় তেমনি এক্লেশিয়ার নামেই আদেশ নির্দেশ জারি ও কার্যকর করা হত। প্রকৃত ক্ষমতা ছিল রাজার হাতে ন্যস্ত।

অ্যাটর্নি জেনারেল (Attorney General)

সরকারের প্রধান আইন উপদেষ্টাকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলা হয়। এটি একটি সাংবিধানিক পদ। অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারকে সংবিধান, সাধারণ আইন, আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইনগত পরামর্শ দেন। সরকারের পক্ষে আদালতে উপস্থিত হন। যুক্তরাজ্যে অ্যাটর্নি জেনারেল 'ল অফিসার'দের একজন। যুক্তরাষ্ট্রে অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারের 'ডিপার্টমেন্ট অব জাস্টিজ'-এর প্রধান, প্রেসিডেন্টের কেবিনেট সদস্য। তিনি ফেডারেল পাবলিক অ্যাটর্নিদের কাজ এবং ফেডারেল প্রিজন ব্যবস্থা তদারক করেন। বাংলাদেশ সংবিধানের ৬৪ অনুচ্ছেদে অ্যাটর্নি জেনারেলের নিয়োগ, দায়িত্ব, ক্ষমতা, পারিশ্রমিক কি হবে তা বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেলকে নিয়োগ করেন। সুপ্রিম কোর্টের বিচারক হবার যোগ্যতা রাখেন এমন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রপতি অ্যাটর্নি জেনারেল নিয়োগ করতে পারেন। রাষ্ট্রপতি যে দায়িত্ব প্রদান করেন অ্যাটর্নি জেনারেল তা পালন করবেন। অ্যাটর্নি জেনারেল সরকারকে সকল আইনগত বিষয়ে পরামর্শ দেন। সরকার জড়িত এমন মামলায় সরকারকে সাহায্য ও পরামর্শ দেন। তাঁর অধিকার আছে বাংলাদেশের সকল আদালতে বক্তব্য পেশ করবার। অন্তর্বর্তী আদেশ (interim order) দেবার প্রয়োজন দেখা দিলে হাইকোর্ট (সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী) অ্যাটর্নি জেনারেলকে নোটিশ দেবেন এবং অ্যাটর্নি জেনারেল বা তাঁর কোনো প্রতিনিধির বক্তব্য না শুনে কোনো আদেশ দেবেন না। অ্যাটর্নি জেনারেল রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত সম্মানী পান। রাষ্ট্রপতির সন্তুষ্টি অনুযায়ী তাঁর দায়িত্ব পালনের কার্যকাল নির্ধারিত হয়।

এপি (AP)

'নিউইয়র্ক অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস' থেকেই এপি অর্থাৎ 'অ্যাসোসিয়েট প্রেস'-এর জন্ম ১৮৪৮ সালে। ১৯০০ সালে এর প্রশাসনিক কাঠামোকে ঢেলে নতুন করে সাজানো হয়। বর্তমানে আন্তর্জাতিক সংবাদসংস্থাগুলোর মধ্যে এটিই বৃহত্তম ১০০-রও বেশি দেশ থেকে এপি সংবাদ সংগ্রহ এবং বিশ্বের ৬,৫০০-রও বেশি সংবাদপত্র, বেতার ও টেলিভিশন কেন্দ্র এর সংগৃহীত খবরাদি প্রেরণ করে। এপির ১৮৩টি ব্যুরোতে ২,৫৫৪ জন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিযুক্ত। এর প্রধান দপ্তর অবস্থিত নিউইয়র্কে।

এপিকিউরিয়ানবাদ (Epicurianism)

এপিকিউরিয়াস (Epicurus) খ্রিঃ পূর্বঃ (৩৪১ অব্দে-২৭০ অব্দে) গ্রীসে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি যে দর্শনের প্রবর্তন করেন তা এপিকিউরিয়বাদ বা ভোগবাদ নামে খ্যাত। তিনি খ্রিস্টপূর্ব ৩০৬ অব্দে এথেন্সে এপিকিউরিয়ান স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন (Epicurean School) প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি সক্রেটিসের শিষ্য, সাইরিনের এরিস্টিপাসের (Aristippus of Cyrene) এর কাছ থেকে এই মতবাদের প্রেরণা লাভ করেন। এই কারণে এ মতবাদকে 'সাইরিনাইকবাদের' (Cyrenaicism) উত্তরসূরী বলেও অভিহিত করা হয়। এপিকিউরিয়াস এবং তাঁর অনুগামীরা মনে করতেন, সর্বাধিক সুখ ও আনন্দ সাধন হচ্ছে দর্শনের উদ্দেশ্য; পরম আরাম আয়েশে জীবন-যাপন করাই মানুষের চরম লক্ষ্য; সুখভোগের যা সহায়, কেবল তাই বাঞ্ছনীয় ও কল্যাণকর। সুখ হলো দেহ ও মনকে কষ্ট ও যন্ত্রণা থেকে রেহাই দেওয়া। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা সবকিছু বিচার বিবেচনা করা এবং যন্ত্রণাদায়ক পথ এড়িয়ে চলা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে সাধারণ বোধশক্তি আছে এবং তাকে যথাযথভাবে প্রয়োগ করতে পারলে যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্কৃতি পাওয়া যায়। এই উদ্দেশে ব্যক্তি রাষ্ট্রীক ও ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করে। মৃত্যুর পরে কোনো প্রকার জীবনের অস্তিত্ব আছে বলে তারা মনে করতেন না। বস্তুত মানুষের মধ্যে তিন ধরনের মানসিক গতি লক্ষ্য করা যায়- যথা (১) মৃদু ও কোমল গতি থেকে সুখবোধ, (২) উত্তাল ও প্রচণ্ড গতি থেকে দুঃখবোধ, (৩) মাঝামাঝি বা দুর্বল অবস্থা থেকে দুঃখ ও সুখ কোনটিই হয় না। এই তিন অবস্থা থেকে মানুষ একমাত্র সুখভোগের প্রত্যাশী। সকল মানুষ আনন্দের জন্য লালায়িত। এপিকিউরিয়ানদের মতে মদ্যপানে, যৌন সম্ভোগে ও তৃপ্তিকর খাদ্যগ্রহণে আনন্দ পাওয়া যাবে না, প্রকৃত আনন্দ তাতে নেই তা আত্মসংযম, কঠোরতা অবলম্বনের মধ্যে নিহিত। মানুষ যখন ভীতি ও অভিপ্রায় থেকে মুক্ত হতে পারে তখনই সে প্রকৃত আনন্দ লাভ করতে পারে। তাছাড়া আকাঙ্খা হচ্ছে যত অনিষ্টের মূল। আকাঙ্খা থেকে ঘৃণা-বিদ্বেষ, যুদ্ধ-বিগ্রহ, বিদ্রোহ ও অনৈক্যের সৃষ্টি হয়ে থাকে তাই আকাঙ্খাকে দমিয়ে রাখার পক্ষে সুখ অর্জনের কথা বলেছেন। সুখ হচ্ছে আপেক্ষিক, যেমন— একজন ধনী ব্যক্তির কাছে ব্যয়বহুল খাবার সামগ্রী তেমন তৃপ্তিকর তেমননি একজন ক্ষুদার্ত ও দরিদ্র ব্যক্তির কাছে রুটি ও পানি সমান তৃপ্তিকর। তারা রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রে বলেছেন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে ব্যক্তির নিজস্ব স্বার্থের ভিত্তি করে। কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্র হয়ে আইন রচনা করে

এবং এই আইনের মূখ্য উদ্দেশ্য হিংসা ও অভিচারের হাত থেকে ব্যক্তিকে রক্ষা করা। রাষ্ট্রের আইন এই উদ্দেশ্য সাধন করতে পারলে আনুগত্য দেখানো যাবে; অন্যথায় নয়, এই থেকে স্পষ্টত হয়ে ওঠে যে, তারা সামাজিক চুক্তি মতবাদের প্রতিষ্ঠা করে গেছেন।

এফবিআই (FBI)

পূর্ণ নাম Federal Bureau of Investigation. ১৯০৮ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট পশ্চিম আমেরিকার দস্যু ও পূর্ব আমেরিকার অপরাধীদের দমনের উদ্দেশে এফবিআই প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯২৪ সালে এডলার হুভার মাত্র ২৯ বছর বয়সে এই গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান হন এবং সুদীর্ঘ ৫০ বছর যাবৎ এ দায়িত্ব পালন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান কর্তৃক পার্ল হারবারের ওপর আক্রমণের গোপন সংবাদ পেয়েও তা কাজে লাগাতে না পারায় মার্কিন সরকার মনে করে যে, আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির জন্য এফবিআই তেমন উপযুক্ত নয়। ফলে Central Intelligence Agency (CIA)-এর সৃষ্টি হয় এবং এফবিআই কার্যত অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা সংস্থায় পরিণত হয়। কঠোর শৃঙ্খলাসম্পন্ন এই সংস্থার প্রত্যেক এজেন্টই সুশিক্ষিত এবং যুদ্ধ, অস্ত্রের ব্যবহার, অপরাধের কলাকৌশল পরীক্ষা, আইন, প্রশাসন ইত্যাদি বিষয়ে কঠের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় আমেরিকায় অনুপ্রবেশকারী নাৎসি গোয়েন্দাদের রহস্য উদঘাটন ও পরবর্তীকালে কেজিবি এজেন্টদের নির্মূল করার কৃতিত্ব FBI-এর। এর আর একটি অন্যতম কৃতিত্ব হলো নাৎসিদের খবর পাঠানোর গুপ্ত ব্যবস্থা মাইক্রোডটের রহস্য বের করা। এটি পৃথিবীর এমন একটি গুপ্তচর বিভাগ যারা অপরাধী আর বিদেশি গুপ্তচরদের সঙ্গে একই সঙ্গে মোকাবিলা করে।

এল.টি.টি.ই (Liberation Tigers of Tamil Elam-LTTE)

বিশ্বের যেসব দুর্ধর্ষ গেরিলা সংগঠন বর্তমানে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র তথা স্বাধীনতা দাবি করে ব্যাপক ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ চালিয়ে যাচ্ছে এলটিটিই তাদের অন্যতম। এল.টি.টি.ই হল শ্রীলংকার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী জঙ্গি সংগঠন। ১৯৪৮ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা অর্জন করার পর থেকে তামিলদের সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ শুরু করে। সেই প্রেক্ষাপটে তৈরি হয় তামিল বিদ্রোহ। প্রথমে ১৯৪৮ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাদেরকে ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়। সরকার তামিলদের প্রতি দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিকের মত ব্যবহার করে। ১৯৭২ সালে শ্রীলংকাকে বৌদ্ধ রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় এবং ১৯৭৪ সালে ইংরেজির পরিবর্তে সিংহলি ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করা হলে, শ্রীলংকার সংখ্যালঘু তামিলরা তামিল ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে আন্দোলন শুরু করে। ক্রমশ এই আন্দোলনে স্বাধিকার আন্দোলনে পরিণত হয় এবং তামিলরা ভারতের সাহায্য সহযোগিতা পেতে থাকে। ১৯৮৩ সাল থেকে তারা তামিল এলাম বা পৃথক তামিল রাষ্ট্রের দাবিতে গৃহযুদ্ধ শুরু করে। এক পর্যায়ে শ্রীলংকা সরকার তামিলদের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে রাজি হয় এবং ফলে তাদের

স্বাধীনতার দাবির প্রতি আন্তর্জাতিক সমর্থন অনেকটা হ্রাস পায়। ১৯৮৭ সালের জুন মাসে তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদের অবসানকল্পে ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী ভারত এলটিটিই বাহিনীকে নিরস্ত্রীকরণের উদ্দেশে শ্রীলংকার উত্তর ও পূর্বাঞ্চলে ভারতীয় সৈন্য মোতায়েন করে। বিদ্রোহীদের হাতে প্রায় ১২০০ ভারতীয় সৈন্য হতাহত হওয়ার পর ১৯৯০ সালে ভারত সৈন্য প্রত্যাহার করে। এলটিটিই এর সবচেয়ে ভয়ংকর হলো সুইসাইড স্কোয়াড। শ্রীলংকার ক্ষিপ্ত তামিলরা প্রেমাদাসাকে ও ১৯৯১ সালে ধানু নামে এক আত্মঘাতী মহিলার মাধ্যমে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে ভারতের সাবেক প্রধানমন্ত্রী রাজিব গান্ধীকে হত্যা করে। ১৯৯৫ সালে সরকারি বাহিনীর হাতে তামিলদের ডি-ফ্যাক্টো রাজধানী জাফনার পতন ঘটে। কিন্তু তার পরও এলটিটিই তার একচ্ছত্র নেতা ভিলুপিল্লাই প্রভাকরণের নেতৃত্বে তাদের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন অব্যাহত রাখে।

এলিট (Elite)

সকল সমাজে মানুষের শ্রেণিবিন্যাস লক্ষ্য করা যায়। যেকোনো সমাজের মানুষ এলিট বা প্রভাবশালী গোষ্ঠী এবং তারা সমাজে সংখ্যায় কম। অন্যদিকে জনসাধারণ যাদের সংখ্যা সমাজে অনেক বেশী বা তারা সমাজের সংখ্যাগুরু গোষ্ঠী। এলিট বলতে সমাজের সেই সংখ্যালঘু জনসমষ্টিকে বোঝায় যারা সমাজের উচ্চস্তরের বা তারাই সমাজের বৃহত্তর অথবা সমগ্র অংশকে নিয়ন্ত্রণ বা প্রভাবিত করেন। সমাজে আভিজাত্য, ক্ষমতা, চাকুরিগত অবস্থান, আর্থিক প্রাচুর্য, রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ইত্যাদির কারণে একটা দেশ বা সমাজের যে অংশটি 'উৎকৃষ্ট', ক্ষমতাধর ও যাবতীয় সিদ্ধান্তের ধারক বলে বিবেচিত, সেই অংশটিকেই এলিট বলা হয়। সাধারণত প্রতিপত্তিশালী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, পার্লামেন্টের বিশিষ্ট সদস্যবৃন্দ, সামরিক ও বেসামরিক আমলাতন্ত্রের উচ্চতম পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ, উচ্চতম পর্যায়ের শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, ব্যাংকার ও টেকনোক্র্যাট-বৃন্দ, বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ, সমাজবিদ ও বিজ্ঞানী প্রমুখ, নেতৃস্থানীয় বুদ্ধিজীব ও সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠসমূহের বিশিষ্ট শিক্ষাবিদবৃন্দ, সর্বোচ্চ আদালতের বিচারক ও শ্রেষ্ঠতম পর্যায়ের কৌসুলিবৃন্দ, বাছাই করা বেসরকারি প্রতিষ্ঠান (NGO)-র সর্বোচ্চ কর্মকর্তাবৃন্দ প্রমুখকেই সমাজের এলিট বলে বিবেচনা করা হয়। প্রায়শই দেখা যায় যে, সমাজের এলিটরা যেদিকে ঝোঁকেন, সাধারণ জনমতও সেদিকেই প্রভাবিত হয়। বস্তুত এলিটরাই একটি সমাজের যাবতীয় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং জনমতকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সামাজিক বিপ্লব ব্যতীত একটি অবস্থিত এলিট শ্রেণি বা তাদের কায়েমি স্বার্থকে অপসারণ করা সম্ভবপর নয় বলেই অনেকে মনে করেন।

এলিট তত্ত্ব (Elite Theory)

যেকোনো সমাজের সংখ্যালঘু শ্রেণি ঐতিহ্য-সম্পদ, পদমর্যাদা, শিক্ষা ইত্যাদির ক্ষেত্রে সুবিধাজনক অবস্থানের দরুণ দল-মত-নির্বিশেষে সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রাধান্য

ভোগ করে, সেই শ্রেণিকেই বলা হয় এলিটশ্রেণি। এলিটতত্ত্বের প্রবক্তাদের মতে, একটা দেশে যে তন্ত্রই চালু থাকুক না কেন, যেকোনো দলের সরকারই ক্ষমতাসীন থাকুক না কেন, কার্যত সর্বদাই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এই এলিটশ্রেণি। পুঁজিবাদী রাষ্ট্রে ওই সমাজের পুঁজিপতি, আমলা, রাজনীতিবিদ প্রমুখের ইচ্ছাতেই পরিচালিত হয় এবং তাদের স্বার্থেই জনগণের ভোটাধিকারকে ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে কমিউনিস্ট রাষ্ট্রেও প্রকৃত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে পার্টি ও রাষ্ট্রের এলিটরা। এলিট মতবাদীদের মতে, পৃথিবীতে চিরকাল প্রকৃত প্রস্তাবে এলিটদের শাসন ও প্রাধান্যই চলে এসেছে, এখনও তাই চলছে, ভবিষ্যতেও তাই চলবে। অর্থাৎ রূপ ও কাঠামো যাই হোক না কেন, সংশ্লিষ্ট সমাজ বা রাষ্ট্রের এলিটদের ইচ্ছা ও স্বার্থ অনুসারেই সেই সমাজ বা রাষ্ট্র পরিচালিত হবে। প্যারেটো, মস্‌কা, মিচেল্‌স প্রমূখ রাজনীতিতে এলিট তত্ত্বেও প্রয়োগ দেখান।

এলিট, প্রশাসনিক (Administrative Elite)

যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে শাসন প্রণালীতে প্রভাব বিস্তার করে তাদেরকে প্রশাসনিক এলিট বলা হয়। প্রশাসনিক এলিট বিভিন্ন পার্লামেন্টারি ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত কার্যকর করার জন্য কর্মকর্তাদের যে স্তর থাকে সেটাকেই বলে প্রশাসনিক এলিট। এটা আমলাতন্ত্র বা সিভিল সার্ভিসের প্রায় সমার্থক। তবে প্রশাসনিক এলিট এর পরিধি দেশভেদে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। যেমনঃ ফ্রান্স ও জার্মানিতে পুলিশ ও স্কুল-শিক্ষকদেরও প্রশাসনিক এলিট বলে গণ্য করা হয়, অথচ ব্রিটেনে তা হয় না। অনেক দেশে আমলাতন্ত্র ক্ষমতাবান বিধায় দেশের মেধাবী মানুষরা আমলাতন্ত্রে যোগ দেয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো যেসব দেশে প্রশাসনের গুরুত্বপূর্ণ পদসমূহে রাজনৈতিকভাবে নিয়োগ প্রদান করা হয়, সে সকল দেশে সাধারণত মাঝারি মেধা ও বিদ্যার লোকেরাই আমলা হতে আগ্রহী হয়। ফলে দেশভেদে প্রশাসনিক এলিটদের গুণগত মান ও ক্ষমতার তারতম্য আছে।

এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (Asian Development Bank (ADB)

জাতিসংঘের অর্থনৈতিক কমিশনের সুপারিশক্রমে এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের উন্নয়কল্পে ১৯৬৬ সালে এশিয়া উন্নয়ন ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এশিয়া ও প্রশানন্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য এবং সুইজারল্যান্ডসহ ৩৬টি দেশ এবং ইউরোপ ও উত্তর আফ্রিকা থেকে ১৬টি রাষ্ট্রসহ মোট ৫২টি রাষ্ট্র নিয়ে এ ব্যাংক কার্যক্রম শুরু করে। এই ব্যাংকের উদ্দেশ্য হচ্ছে এশিয়া, দূরপ্রাচ্য এবং প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উন্নয়নশীল দেশসমূহকে ঋণদান, বিনিয়োগে অনুপ্রেরণা এবং কারিগরি সাহায্য প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে এগিয়ে নেয়ার উদ্দেশে এ.ডি.বি প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এর সদর দপ্তর ম্যানিলায় অবস্থিত। বোর্ড অব গভর্ণরস, বোর্ড অব ডিরেক্টরর্স, ১জন প্রেসিডেন্ট, ৩জন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ে এডিবির প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গঠিত হয়।

এশীয় যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনা (Asian Collective Security Plan)

১৯৬৯ সালের ৭ জুন মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্ব কমিউনিস্ট পার্টির এক সম্মেলনে সোভিয়েত নেতা ব্রেজভেন এক পরিকল্পনা পেশ করেন। ব্রেজনেভের এই পরিকল্পনা এশীয় যৌথ নিরাপত্তা পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার মূল কথা হল: ১.এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্বের প্রতি পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ; ২.আক্রমণ, বলপ্রয়োগ ও অপরের সীমান্ত লংঘন সম্পূর্ণরূপে পরিহার করা; ৩.কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ না করা, ৪.সাম্য ও সার্বভৌমত্বের ভিত্তিতে পারস্পরিক সহযোগিতা সম্প্রসারিত করা; ৫.নিতান্তই কোনো বিরোধ দেখা দিলে শান্তিপূর্ণ উপায়ে তার মীমাংসা করা; সর্বোপরি, ৬.সকল সামরিক জোটের বিলোপ সাধন করে সমগ্র এশিয়াভিত্তিক সহযোগিতা ও যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গড়ে তোলা।

এসকাপ (Economic and Social Commission for Asia and Far East (ESCAP)

এসকাপ জাতিসংঘের একটি সংস্থা। অর্থাৎ এশিয়া ও দুরপ্রাচ্যের জন্য অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন। এশিয়া ও দূরপ্রাচ্যের দেশসমূহের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদানই এসকাপের কাজ।

ঐকমত্য (Consensus)

যেকোনো সিদ্ধান্তে একই প্লাটফর্মে দাঁড়ানোর প্রবণতা। একই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। রাজনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক এবং ব্যক্তিগত যেকোনো পর্যায়েই এটি হতে পারে। কোনো সংস্থা অথবা ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোনো সিদ্ধান্তে সকলের মতের মিল বা অভিন্নতা। মতোভেদ থাকলেও অনেক সময় পরস্পরবিরোধী স্বার্থ সমন্বিত হয় যখন সকলের কল্যাণে কিংবা জাতীয় স্বার্থে কোনো প্রশ্ন ওঠে, বিশেষ করে যুদ্ধবিগ্রহ দেখা দিলে। যেকোনো দেশের ঐতিহ্যের মধ্যেই বিভেদের ও সংঘাতের পরিবর্তে সমন্বয় ও ঐকমত্যের ধারা প্রাধান্য পায়। স্বভাবতই বিভেদের বিরুদ্ধে মানুষের ঐকমত্যে গড়ে ওঠে। এই ধরনের ঐকমত্যে জনস্বার্থমুখী মনোভাব প্রতিফলিত হয় যেটাকে কল্যাণকর রাষ্ট্রের অন্যতম গুণ মনে করা হয়। জনহিতাকাঙ্ক্ষী মনোভাবের কাছেই ঐকমত্যের আবেদন বেশি। এই ধরনের রাষ্ট্রনীতির লক্ষ্য হলো সর্বাধিক-সংখ্যক মানুষের সন্তোষবিধান এবং সম্ভাব্য ন্যূনতম-সংখ্যক মানুষের কাছে বিরাগ-ভাজন হওয়া। তাতে এমন এক রাজনৈতিক কর্মসূচি অনুসরণ করা হয় যেটা যে কোনো মতাদর্শেই চলুক না কেন সেটা সদাই সুপরীক্ষিত ও সর্বজন অনুমোদিত পথে পারস্পরিক সম্পর্ক বজায় রেখে অগ্রসর হয়। সর্বোপরি বলা যায় ঐকমত্যে একটি ইতিবাচক চেতনা যার মাধ্যমে যেকোনো কল্যাণমূখী কর্মকাণ্ড বাস্তবায়ন করা সম্ভব।

ঐক্য (Alliance)

সাধারণত একাধিক দল বা গোষ্ঠী পারস্পরিক বোঝাপাড়ার মাধ্যমে কোনো উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে একতাবদ্ধ হওয়াকে ঐক্য বা জোট বলা হয়। প্রয়োজনবোধে কোনো

রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তি অন্য কোন রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তির সাথে বিশেষ উদ্দেশে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে সাময়িকভাবে ঐক্যবদ্ধ হলে তাকে বলা হয় চুক্তি বা মৈত্রী। এই ধরনের সাময়িক চুক্তি বা মৈত্রী ব্যতীত কোনো রাষ্ট্র, পার্টি, দল বা ব্যক্তি টিকে থাকতে পারেনা। কিন্তু এই মৈত্রী বা চুক্তি কখনও শর্তহীন নয়। শর্তহীন চুক্তি বা মৈত্রী আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। এই ধরনের মৈত্রী বা চুক্তিতে সাধারণত যে সকল শর্ত রাখা হয় তাদের মধ্যে একটি হল চুক্তিবদ্ধ পক্ষগুলোর পরস্পরের কার্যের প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার থাকে।

ঐতিহাসিক এগার দফা (Historical 11 Point Movement)

পাকিস্তান কাঠামোর অধীনে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকবৃন্দের শোষণ-বঞ্চনা-নিপীড়ন ও অগণতান্ত্রিক কার্যকলাপের প্রতিবাদস্বরূপ পূর্ব-বাংলায় স্বায়ত্বশাসন দাবি আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। পাকিস্তানের কেন্দ্রিয় শাসকবর্গের দীর্ঘ দিনের অনুসৃত স্বৈরাচারী নীতির কারণে এই দাবি ধীরে ধীরে জোরালো আকার ধারণ করে এবং তা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। এই আন্দোলন ঘটনার এক চরম পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনের পক্ষে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার ফলে পূর্ব-বাংলার জনগণ যখন তীব্র আইয়ুব-বিরোধী ঘৃণা ও ক্ষোভে চরম বিক্ষুব্ধ ঠিক সে সময়ে পশ্চিম-পাকিস্তানেও আইয়ুব-বিরোধী বিক্ষোভ তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে ওঠে। ১৯৬৬ সালে মন্ত্রিসভা হতে পদত্যাগ করে জুলফিকার আলী ভুট্টো আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে সমালোচনায় মুখর হয়ে ওঠেন।

ষাট দশকের পূর্বে শুধু পূর্ব-পাকিস্তানেই নয় এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানেও কোনো মধ্যবিত্ত শ্রেণি ছিল না বললেই চলে। কিন্তু স্বৈরশাসক জেনারেল আইয়ুব খানের আমলে পশ্চিম পাকিস্তানে ভূমি সংস্কার ও দ্রুত শিল্পায়নের ফলে কৃষি, বাণিজ্য ও অন্যান্য অর্থনৈতিক কার্যকলাপের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষা ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি পায়। ফলে পশ্চিম পাকিস্তানে একটা মধ্যবিত্ত শ্রেণি গড়ে ওঠে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য যে রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রয়োজন ছিল আইয়ুবের মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় তা পূরণ করা সম্ভব ছিল না। বিধায় সেখানেও একটি শ্রেণির মধ্যে আইয়ুবী একনায়কতন্ত্রের বিরুদ্ধে চরম অসন্তোষ দেখা দেয়।

পশ্চিম পাকিস্তানেও আইয়ুবী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে জোরালো গণআন্দোলন শুরু হয়। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের জনগণ পাঞ্জাবী আধিপত্য হতে মুক্তি লাভের জন্য এক ইউনিট বাতিলের জন্য জোর দাবি জানায়। তারা আঞ্চলিক স্বায়ত্বশাসন লাভ করতে চায়। উচ্চাভিলাষী ভুট্টো এই পরিস্থিতিকে চতুরতার সাথে কাজে লাগিয়ে জনগণকে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে সচেষ্ট হন। আইয়ুব সরকারও তখন কঠোর দমননীতি অনুসরণ করতে থাকে।

১৯৬৮ সালের শেষের দিকে পশ্চিম-পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ গণতন্ত্র পুণরুদ্ধারের লক্ষ্যে আইয়ুবী একনায়কত্বের বিরুদ্ধে দুর্বার আন্দোলন শুরু করলে বিক্ষোভরত ছাত্রদের ওপর পুলিশের গুলো বর্ষণের ফলে কতিপয় ছাত্র নিহত হওয়ায় ছাত্রসমাজের এ আন্দোলন আরো ব্যাপক ও তীব্রতর আকার ধারণ করে। পূর্ব-পাকিস্তানের ছাত্র সমাজ পশ্চিম-পাকিস্তানে আইয়ুব বিরোধী ছাত্র আন্দোলনকে স্বাগত জানায় এবং ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে ও দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবিতে ধর্মঘট পালন করে। আইয়ুব বিরোধী ছাত্রসমাজের এ আন্দোলন অতি দ্রুত গতিতে সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে। ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন মূখ্যত এই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দান করে। আন্দোলন পরিচালনার জন্য ১৯৬৮-এর শেষের দিকে পূর্ব-পাকিস্তান ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়ন সম্মিলিতভাবে ছাত্রলীগ নেতা ও তৎকালীন ডাকসুর (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ) সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদকে সভাপতি করে সর্বদলীয় 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' গঠন ক্ষমতাঃ তার নেতৃত্বে সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ আইয়ুব প্রশাসনের বিরুদ্ধে ৫ জানুয়ারি ১৯৬৯ তাদের এগার দফা দাবি সংবলিত একটি কর্মসূচি ঘোষণ করে। এই ১১-দফা কর্মসূচি ৬ জানুয়ারি ১৯৬৯ সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই ১১-দফা কর্মসূচি ছিল নিম্নরূপ :

১। (ক) স্বচ্ছল কলেজসমূহকে প্রাদেশিকীকরণের নীতি পরিত্যাগ করতে হবে এবং জগন্নাথ কলেজসহ প্রাদেশিকীকরণকৃত কলেজসমূহকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দিতে হবে।

(খ) শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের জন্য প্রদেশের সর্বত্র বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলে স্কুল-কলেজ স্থাপন করতে হবে এবং বেসরকারি উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত স্কুল-কলেজসমূহকে সত্বর অনুমোদন দিতে হবে। কারিগরী শিক্ষা প্রসারের জন্য পর্যাপ্তসংখ্যক ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পলিটেকনিক, টেকনিক্যাল ও কমার্সিয়াল ইনস্টিটিউট স্থাপন করতে হবে।

(গ) প্রদেশের কলেজসমূহে দ্বিতীয় শিফটে নৈশ আইএ; আইএসসি; আইকম ও বিএ; বিএসসি; বিকম এবং প্রতিষ্ঠিত কলেজসমূহে নৈশ এমএ ও এমকম ক্লাস চালু করতে হবে।

(ঘ) ছাত্র বেতন শতকরা ৫০ ভাগ হ্রাস করতে হবে। স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ডের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে। এবং ছাত্র আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কলারশীপ ও ষ্টাইপেন্ড কেড়ে নেয়া চলবে না।

(ঙ) হলো, হোষ্টেলের ডাইনিং হলো ও কেন্টিন খরচার শতকরা ৫০ ভাগ সরকার কর্তৃক 'সাবসিডি' হিসাবে প্রদান করতে হবে।

(চ) হলো ও হোষ্টেল সমস্যার সমাধান করতে হবে।

(ছ) মাতৃভাষার মাধ্যমে সর্বস্তরে শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। অফিস আদালতে বাংলা ভাষা চালু করতে হবে। সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পর্যাপ্ত সংখ্যক অভিজ্ঞ শিক্ষকের ব্যবস্থা করতে হবে। শিক্ষকের বেতন বৃদ্ধি করতে হবে এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের অধিকার দিতে হবে।

(জ) অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক করতে হবে। নারী শিক্ষার ব্যাপক প্রসার করতে হবে।

(ঝ) মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে এবং অটোমেশন প্রথা বিলোপ, নমিনেশনে ভর্তি প্রথা বন্ধ, মেডিকেল কাউন্সিল অর্ডিনেন্স বাতিল, ডেন্টাল কলেজকে পূর্ণাঙ্গ কলেজে পরিণত করা প্রভৃতি মেডিকেল ছাত্রদের দাবি মেনে নিতে হবে। নার্স ছাত্রীদের সকল দাবি মেনে নিতে হবে।

(ঞ) প্রকৌশল শিক্ষার অটোমেশন প্রথা বিলোপ, ১০% ও ৭৫% রুল বাতিল, সেন্ট্রাল লাইব্রেরির সুব্যবস্থা, প্রকৌশল ছাত্রদের শেষবর্ষেও ক্লাস দেয়ার ব্যবস্থাসহ সকল দাবি মেনে নিতে হবে।

(ট) পলিটেকনিক ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' সুযোগ দিতে হবে এবং বোর্ড ফাইন্যালে পরীক্ষা বাতিল করে একমাত্র সেমিষ্টার পরীক্ষার ভিত্তিতেই ডিপ্লোমা দিতে হবে।

(ঠ) টেক্সটাইল, সিরামিক, লেদার টেকনোলজি এবং আর্ট কলেজ ছাত্রদের সকল দাবি অবিলম্বে মেনে নিতে হবে। আই, ই, আর, ছাত্রদের দশ দফা; সমাজকল্যাণ কলেজ ছাত্রদের, এম, বি, এ, ছাত্রদের ও আইনের ছাত্রদের সমস্ত দাবি মেনে নিতে হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে বাণিজ্য বিভাগকে আলাদা 'ফ্যাকাল্টি' করতে হবে।

(ড) কৃষি বিদ্যালয় ও কলেজ ছাত্রদের ন্যায্য দাবি মেনে নিতে হবে। কৃষি ডিপ্লোমা ছাত্রদের 'কনডেন্স কোর্সের' দাবিসহ কৃষি ছাত্রদের সকল দাবি মেনে নিতে হবে।

(ঢ) ট্রেনে, ষ্টিমারে ও লঞ্চে ছাত্রদের 'আইডেন্টিটি কার্ড' দেখিয়ে শতকরা পঞ্চাশ ভাগ 'কন্সেসনে' টিকেট দেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। মাসিক টিকিটেও এই 'কন্সেসনে' দিতে হবে। পশ্চিম পাকিস্তানের মতো বাসে ১০ পয়সা ভাড়ায় শহরের যে কোনো স্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা করতে হবে। দূরবর্তী অঞ্চলে বাস যাতায়াতেও শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হবে। ছাত্রীদের স্কুল-কলেজে যাতায়াতের জন্য পর্যাপ্ত বাসের ব্যবস্থা করতে হবে। সরকারি ও আধা-সরকারি উদ্যোগে আয়োজিত খেলাধুলা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে ছাত্রদের শতকরা ৫০ ভাগ 'কন্সেসন' দিতে হবে।

(ণ) চাকরির নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

(ত) কুখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয় অর্ডিন্যান্স সম্পূর্ণ বাতিল করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে।

(থ) শাসকগোষ্ঠীর শিক্ষা সংকোচন নীতির প্রমাণ্য দলিল জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ও হামুদুর রহমান কমিশন রিপোর্ট সম্পূর্ণ বাতিল করতে এবং ছাত্রসমাজ ও দেশবাসির স্বার্থে গণমুখী ও বৈজ্ঞানিক শিক্ষা ব্যবস্থা কায়েম করতে হবে।

২। প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটে প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে পার্লামেন্টারি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। বাক-স্বাধীনতা, ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতা দিতে হবে। দৈনিক ইত্তেফাক পত্রিকার ওপর হতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

৩। নিম্নলিখিত দাবিসমূহ মেনে নেয়ার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে:

(ক) দেশের শাসনতান্ত্রিক কাঠামো হবে ফেডারেশন শাসনতান্ত্রিক রাষ্ট্রসংঘ এবং আইন পরিষদের ক্ষমতা হবে সার্বভৌম।

(খ) ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা দেশরক্ষা, বৈদেশিক নীতি ও মুদ্রা এই কয়টি বিষয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে। অপরাপর সকল বিষয়ে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর ক্ষমতা হবে নিরঙ্কুশ।

(গ) দুই অঞ্চলের জন্য একই মুদ্রা থাকবে। এই ব্যবস্থায় মুদ্রা কেন্দ্রের হাতে থাকবে। কিন্তু এই অবস্থায় শাসনতন্ত্রে এমন সুনির্দিষ্ট বিধান থাকতে হবে যে, যাতে পূর্ব পাকিস্তানের মুদ্রা পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে। এই বিধানে পাকিস্তানে একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে। দুই অঞ্চলে দুটি পৃথক রিজার্ভ ব্যাঙ্ক থাকবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের জন্য পৃথক অর্থনীতি প্রবর্তন করতে হবে।

(ঘ) সকল প্রকার ট্যাক্স, খাজনা, কর ধার্য ও আদায়ের সকল ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। ফেডারেল সরকারের কোনো কর ধার্য করার ক্ষমতা থাকবে না। আঞ্চলিক সরকারের আদায়ী রেভিনিউর নির্ধারিত অংশ আদায়ের সঙ্গে সঙ্গে ফেডারেল তহবিলে জমা হবে। এই মর্মে রিজার্ভ ব্যাঙ্কসমূহের ওপর বাধ্যতামূলক বিধান শাসনতন্ত্রে থাকবে।

(ঙ) ফেডারেশনের প্রতিটি রাষ্ট্র বহিঃবাণিজ্যির পৃথক হিসাব রক্ষা করতে এবং বহিঃবাণিজ্যের মাধ্যমে অর্জিত মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর এক্তিয়ারাধীন থাকবে। ফেডারেল সরকারের প্রয়োজনীয় বিদেশি মুদ্রা অঙ্গ রাষ্ট্রগুলো সমানভাবে অথবা শাসনতন্ত্রের নির্ধারিত ধারা অনুযায়ী প্রদান করবে। দেশজাত দ্রব্যাদি বিনা শুল্কে অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে আমদানী-রপ্তানী চলবে এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর সাথে চুক্তি সম্পাদনের, বিদেশে ট্রেড মিশন স্থাপনের এবং আমদানী-রপ্তানী করার অধিকার অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর হাতে ন্যস্ত করে শাসনতন্ত্রে বিধান করতে হবে।

চ) পূর্ব-পাকিস্তানকে মিলিশিয়া বা প্যারা মিলিটারী রক্ষী বাহিনী গঠনের ক্ষমতা দিতে হবে। পূর্ব-পাকিস্তানের অস্ত্র কারখানা নির্মাণ ও নৌবাহিনীর সদর দফতর স্থাপন করতে হবে।

৪। পশ্চিম পাকিস্তানের বেলুচিস্তান, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধুসহ সকল প্রদেশের স্বায়ত্তশাসন প্রদান ক্ষমতাঃ সাব-ফেডারেশন গঠন করতে হবে।

৫। ব্যাঙ্ক-বীমা, পাট ব্যবসা ও বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণ করতে হবে।

৬। কৃষকের ওপর হতে খাজনা ও ট্যাক্সের হার হ্রাস করতে হবে এবং বকেয়া খাজনা ও ঋণ মওকুফ করতে হবে। সার্টিফিকেট প্রথা বাতিল ও তহশিলদারদের অত্যাচার বন্ধ করতে হবে। পাটের সর্বনিম্ন মূল্য মণ প্রতি ৪০ টাকা নির্ধারণ এবং আখের ন্যায্য মূল্য দিতে হবে।

৭। শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি বোনাস দিতে হবে এবং শিক্ষা, বাসস্থান, চিকিৎসা ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে। শ্রমিক স্বার্থ বিরোধী কালাকানুন প্রত্যাহার করতে হবে এবং ধর্মঘটের অধিকার ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান করতে হবে।

৮। পূর্ব-পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও জল সম্পদের সার্বিক ব্যবহারের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯। জরুরি আইন প্রত্যাহার, নিরাপত্তা ও অন্যান্য নিবর্তনমূলক আইন প্রত্যাহার করতে হবে।

১০। সিয়াটো, সেন্টো, পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি বাতিল করে জোট বহির্ভূত স্বাধীন ও নিরপেক্ষ পররাষ্ট্রনীতি কায়েম করতে হবে।

১১। দেশের বিভিন্ন কারাগারে আটক সকল ছাত্র, শ্রমিক, কৃষক, রাজনৈতিক কর্মী ও নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি, গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ও হুলিয়া প্রত্যাহার এবং আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলাসহ সকল রাজনৈতিক কারণে জারিকৃত মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। সূত্রঃ দেখুন—*বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ দলিলপত্রঃ* দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ৪০৯-৪১২।

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ (Historical Materialism)

মানব সমাজ এক জটিল সত্তাকে প্রকাশ করে, মানুষের সঙ্গে মানুষের, মানুষের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক দিয়ে যার প্রকাশ। মানুষের কাজ ও মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কটাই হচ্ছে সামাজিকভাবে বাস্তব দিক এবং এর পেছনে সামাজিক জ্ঞানের প্রভাব রয়েছে। সামাজিক জ্ঞান হল জ্ঞানের সেই এলাকা যা সাহায্য করে মানুষের সমাজ ও ইতিহাসকে জানতে ও বুঝতে। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ সমাজ সম্পর্কে, ইতিহাস সম্পর্কে জ্ঞান ও বিবেচনার ক্ষেত্রে নিয়ে এল এক বিপ্লব। বিপ্লবকেই ইতিহাসের চালিকা শক্তি হিসেবে বর্ণনা করা হয়। সাধারণত সমাজ বিকাশের বস্তুবাদী নিয়মই হল ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী, প্রাকৃতিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রে যেমন, সামাজিক ঘটনাবলীর ক্ষেত্রেও তেমনি বস্তুগত কার্যকারণ ও দ্বন্দ্বতত্ত্ব সমভাবে প্রযোজ্য। ঐতিহাসিক বস্তুবাদ দাবি করে যে, ১. সামাজিক পরিবর্তন কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়, এর পেছনে রয়েছে সুস্পষ্ট ধারাবাহিকতা এবং ২. সামাজিক পরিবর্তনের কারণও সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, যা সম্পূর্ণ বস্তুগত। এই তত্ত্ব বলে যে, উৎপাদিকাশক্তির সঙ্গে উৎপাদন সম্পর্কের দ্বন্দ্বই সমাজ পরিবর্তনের মৌলসূত্র। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে উৎপাদিকাশক্তিরও বিকাশ ঘটে। তখন পিছিয়ে পড়া উৎপাদন সম্পর্কের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব বেধে যায় এবং এরই ফলশ্রুতিতে সমাজ পরিবর্তন ঘটে। এই নিয়মেই আদিম সাম্যবাদ থেকে দাস সমাজ, দাস সমাজ থেকে সামন্ত সমাজ, সামন্ত সমাজ থেকে শিল্প

তথা বুর্জোয়া সমাজের বিকাশের প্রতিটি পর্যায়ে আগের যুগের চেয়ে পরবর্তী যুগ উৎপাদন শক্তিতে উন্নত। প্রকৃতপক্ষে উৎপাদনের পদ্ধতি দিয়ে চিহ্নিত হল এই যুগগুলো। ইতিহাসের বস্তুবাদী ব্যাখ্যা 'উৎপাদনের উপায়গুলোর মালিক কে' সে প্রশ্নেরও জবাব দিল। দেখালো যে, দাস ব্যবস্থায় দাস মালিক, সামন্ত ব্যবস্থায় জমিদার, ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় পুঁজিপতিই উৎপাদনের উপকরণের মালিক। প্রতিটি ব্যবস্থায় পর্যায়ক্রমে এল ক্রীতদাস, ভূমিদাস ও শ্রমিক-নতুন উৎপাদিকা শক্তির পক্ষে প্রয়োজনীয় নতুন শ্রেণি। প্রতিটি যুগেই শ্রেণিরূপ বদলেছে, শোষণের নতুন রূপ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, কিন্তু শোষণ বন্ধ হয়নি। ফলে, শোষণমুক্ত সমাজে দ্বন্দ্বের মীমাংসার জন্য কোনো বলপ্রয়োগের প্রয়োজন নেই। মার্কস-এঙ্গেলসই ঐতিহাসিক বস্তুবাদের উদ্যোক্তা। লেনিন, স্ট্যালিন ও মাও ঝে ডং এর যুগোপযোগী বিকাশ সাধনের প্রয়াস পান। তবে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদীদের তত্ত্বানুযায়ী সমাজতান্ত্রিক সমাজ সাম্যবাদী সমাজে রূপ পরিগ্রহ করার কথা থাকলেও, বর্তমান বিশ্বে তার উল্টোটিই ঘটছে এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজই পুনরায় মুক্তবাজার অর্থনীতি, তথা পুঁজিবাদে ফিরে যাচ্ছে। বস্তুত ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সমাজবিজ্ঞানের এক বিপ্লব বলা হয়।

ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র (Historical Charters and Documents)

ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের ঐতিহাসিক সনদ ও চুক্তিপত্র এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। ব্রিটেনে বিভিন্ন সময়ে রাজনৈতিক সংকট-নিরসনের জন্য রাজা ও পার্লামেন্ট বা জনগণের অধিকার সংক্রান্ত যে সকল সনদ চুক্তিপত্র গৃহীত হয়েছে সেগুলোকে ঐতিহাসিক সনদ বা চুক্তিপত্র (Historical Charters and Documents) বলা হয়। রাজা জন এর রাজত্বকালে সামন্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে বিরোধ বাধে। সে সময় রাজার কাছে থেকে কতগুলো অধিকার আদায় করে, সেই সকল অধিকারগুলো ১২১৫ সালে 'Magna Carta বা মহাসনদ বলা হয়। ১৬২৮ সালে 'অধিকারের আবেদনপত্র' (The Petition of Rights), ১৬৮৯ সালের অধিকারের বিল (The Bill of Rights), ১৭০১ সালের মীমাংসা আইন (The Act of Settlement), ১৭০৭ সালে স্কটল্যান্ডের সঙ্গে এবং ১৮০০ সালে আয়ারল্যান্ডের সাথে সংযুক্তি করণের চুক্তিপত্র প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

ঐশ্বরিক অধিকার (Divine Right)

রাজারা বংশানুক্রমে রাজ্যশাসনের জন্য ঈশ্বরের পক্ষ থেকে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অধিকারকে ঐশ্বরিক অধিকার বলা হয়। বডিন (১৫৩০-৯৬), হুকার (১৫৫৪-১৬০০) প্রমুখ ছিলেন এই মতবাদরে অন্যতম প্রবক্তা। বস্তুত, গণতন্ত্রের উদ্ভবের সূচনায় চার্চ ও রাজতন্ত্র উভয়েই অনুভব করে যে, তাদের স্ব স্ব অস্তিত্ব রক্ষার জন্যই উভয়ের মধ্যে আঁতাত অতীব জরুরি। এমতাবস্থায়, রাজারা চার্চকে, বিশেষত ক্যাথলিক চার্চকে ব্যাপকভাবে সুরক্ষা (Protection) প্রদান করেন এবং প্রতিদানে চার্চও প্রচার করে যে রাজারা বংশ-

বংশানুক্রমে দেশশাসন করবে– এটাই ঈশ্বরের বিধান। অন্যান্য যে সকল দেশে শক্তিশালী রাজতন্ত্র ছিল, সে সকল দেশের রাজারাও পুরোহিতদের মাধ্যমে এ জাতীয় তত্ত্ব প্রচার করাতেন। জাপানে তো এটা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করা হত যে জাপানের রাজবংশ সরাসরি ঈশ্বর থেকেই উদ্ভূত। ইউরোপে অবশ্য সংস্কার আন্দোলন (Reformation) শুরু হলে এই মতবাদ দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে। সেন্ট অগাস্টাইন তাঁর ঈশ্বরের শহর (St. Augustine's 'City of God') গ্রন্থে রাজার ঐশ্বরিক অধিকারতত্ত্ব মূর্তরূপ দান করেন।

ঐশ্বরিক আইন (Devine Law)

ঐশ্বরিক আইন হলো সাধারণত মানবিক বিচার বিবেচনার উর্ধ্বে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশ। পরলৌকিক লক্ষ্য অর্জনের জন্য বা পরলোকে মানবের ঈপ্সিত জীবনের কাম্য পরিবেশের জন্যে স্বেচ্ছা প্রাণোদিত হয়ে মানুষের যা করা কর্তব্য সে সম্পর্কে মানবিক বিচার বিবেচনার উর্ধ্বে ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ নির্দেশ হলো ঐশ্বরিক আইন। এর উৎস শুধু স্বতন্ত্র কোনো আইন নয়, এদের পরিণতি, লক্ষ্য ও এবং আইন ভঙ্গের শাস্তির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ আলাদা। এটা প্রত্যক্ষভাবে ঈশ্বরের কাছ থেকে এক্ষেত্রে এবং এগুলোর লক্ষ্য হলো পারলৌকিক জীবনের মঙ্গল বিধান। ঈশ্বর মৃত্যুর পরপারে যে পুরস্কার দেবেন বা দণ্ডবিধান করবেন— এই বিধান আইনকে সচল রেখেছে। এই আইন ভঙ্গ করলে ভঙ্গকারীর জন্য কোনো পার্থিব শাস্তির বিধান নেই বা থাকা উচিত নয়। এতে যে শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে তা শুধুমাত্র মৃত্যুর পর। তবে ঐশ্বরিক আইন অন্যান্য প্রচলিত আইন থেকে স্বতন্ত্র্য। সকল আইনের উৎস হিসেবে ঐশ্বরিক আইনকে প্রাধান্য দেওয়া হয়। এই আইন প্রয়োগে কোন বলপ্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষের প্রয়োজন না হলেও মানুষের নৈতিক গুণাবলী বিকাশে সহায়ক হিসেবে ভূমিকা পালন করে।

ঐশ্বরিক মতবাদ (Devine Theory)

ঐশ্বরিক মতবাদ অনুযায়ী রাষ্ট্রের জন্ম, বৃদ্ধি বিকাশ, এবং ধ্বংস ঈশ্বরের ইচ্ছার ওপর নির্ভর করে। পাপে লিপ্ত হবার জন্য অপরাধীরা অন্যের শাসনে বা নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাষ্ট্রই সেই ধরনের প্রতিষ্ঠান যা অন্যকে সংযত করে শৃঙ্খলার মধ্যে রাখে। রাষ্ট্রের উৎপত্তির ক্ষেত্রে এটা একটি প্রাচীন মতবাদ।

ওকাস (Orginzation of Centreal American States (OCAS)

ওকাস ODECA নামেও পরিচিত। কোস্টারিকা, এল সালভাডর, গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস ও নিকারাগুয়া মধ্য আমেরিকার এই পাঁচটি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ওকাস গঠিত। এই সংস্থা ১৯৫১ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি এবং ১৯৫২ সালে জারিকৃত চার্টার এর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ ও ১৯৬৬ সালে এই চার্টারের কিছুটা সংশোধন করা হয়। এই সংস্থার উদ্দেশ্য হচ্ছে, ১.পারস্পরিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতা

বৃদ্ধি করা এবং ২. কোনো বিরোধ দেখা দিলে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তা মীমাংসার ব্যবস্থা করা। এর সদর দফতর সান সালভাডরে অবস্থিত।

ওডের-নিস-লাইন (Oder-Neisse Line)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর জার্মানি ও পোলান্ডের মধ্যে নিরূপিত সীমারেখা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়েই ইয়াল্টা এবং পোটসডাম সম্মেলনে ব্রিটেন যুক্তরাষ্ট্র এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন এই তিন মিত্র শক্তি পোল্যান্ডের সীমারেখা চিহ্নিত করে। অবশ্য ইয়াল্টা সম্মেলনে এ ব্যাপারে মতানৈক্য ঘটেছিল। পরবর্তী পোটসডান সম্মেলনের চূড়ান্ত রিপোর্টে তিন সরকার প্রধান একমত হন যে, ওডার নদী রেখা বরাবর থেকে আরম্ভ করে পশ্চিম নীস নদীর সংঙ্গম স্থল এবং পশ্চিম নীল নদীর বরাবর থেকে চেকোস্লোভাকিয়ার সীমানার পূর্ব দিকে অবস্থিত প্রাক্তন জার্মান ভূমি পোল্যান্ডের শাসনাধীন আসবে। কিন্তু পরবর্তীতে এই সীমারেখার স্বীকৃতি নিয়ে জার্মানি ও পোল্যান্ডের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দেয়।

ওমবুডসম্যান (Ombudsman)

ন্যায়পাল বা ওমবুডসম্যান শব্দটি অর্থ করা হয়েছে নাগরিক অধিকার রক্ষক। ওমবুডসম্যান হলো অতি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন মন্ত্রী বা তদুর্ধ্ব পর্যায়ের একজন সরকারি কর্মকর্তা, যিনি সরকার, বিশেষত প্রশাসনের যে কোনো দফতর, বিভাগ বা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগের সরাসরি তদন্ত করতে পারেন। ওমবুডসম্যান সরকারি, আধা-সরকারি যে কোনো দফতরে যে কোনো সময় উপস্থিত হতে পারেন, যে কোনো ফাইল বা কাগজপত্র তলব করতে ও দেখতে পারেন এবং যে-কোনো কর্মকর্তাকে জেরা করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট অন্যায়, অবিচার বা দুর্নীতিরোধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে বা ব্যবস্থার সুপারিশ করতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধানসহ সকলেই তাঁকে সহযোগিতা প্রদানে বাধ্য থাকেন। ওমবুডসম্যানের বাংলা প্রতিশব্দ হতে পারে ন্যায়পাল। বাংলাদেশ সংবিধানের ৭৭ অনুচ্ছেদে ন্যায়পাল নিয়োগের বিধান রয়েছে।

ওয়াকআউট (Walk-Out)

কোনো সিদ্ধান্ত বা প্রস্তাবের প্রতিবাদে পার্লামেন্টের বা অপর কোনো সংস্থার অধিবেশন বা বৈঠক থেকে চলে যাওয়াকেই বলে ওয়াক আউট। সাধারণত পার্লামেন্ট বা আইন পরিষদে বিরোধীদলীয় সদস্যেরা সরকারি দলের কোনো প্রস্তাব বা সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ওয়াক আউট করে থাকেন। জাতিসংঘ বা অনুরূপ কোনো রাষ্ট্রসংঘের অধিবেশন থেকেও ওয়াক আউট (Walk-Out) হতে পারে। আবার কোনো রাজনৈতিক দল বা সংগঠনের বৈঠক থেকেও সংখ্যালঘিষ্ঠ ভিন্ন মতাবলম্বীরা ওয়াকআউট করতে পারে। বস্তুত ওয়াকআউট সংখ্যাগরিষ্ঠের বিরুদ্ধে সংখ্যালঘিষ্ঠের আপত্তি বা প্রতিবাদেরই একটি রূপ। ওয়াকআউট স্থায়ী বা সাময়িক হতে পারে। তবে সাধারণত সংসদ থেকে

সদস্যদের সাময়িক বের হয়ে আসা। সাধারণ বিরোধী দলের সমস্যরা সরকারি কোনো সিদ্ধান্ত, স্পিকারের কোনো রুলিং-এর প্রতিবাদ বা অন্য কোনো কারণে সংসদ থেকে বের হয়ে আসেন। সরকারি দলের সদস্যরাও ওয়াকআউট করেন। ওয়াকআউট কাঙ্ক্ষিত নয়, তবু তা সদস্যদের অধিকার বলেই স্বীকৃত। ওয়াকআউটের ফলে সংসদের স্বাভাবিক কার্যক্রম বাধাগ্রস্ত হয়। সাধারণভাবে কোনো বিষয়ের প্রতি সর্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণের লক্ষ্যে ওয়াকআউট করা হয়। অতিরিক্ত ওয়াকআউট রাজনৈতিক মত-পার্থক্য বেশি হলে ওয়াকআউট বেড়ে যায়। অতিরিক্ত ওয়াকআউট সরকারি ও বিরোধী দলের মধ্যে সমঝোতার পরিবেশ অনুপস্থিত-এটাই প্রমাণ করে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে ওয়াকআউটের ঘটনা অহরহ।

ওয়াটার লু যুদ্ধ (Battle of Waterloo)

১৮১৫ সালে সংঘটিত হয় ওয়াটার লু যুদ্ধ। বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলসের দশ মাইল দক্ষিণে ওয়াটার লু নামক স্থানে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। প্রথম নেপোলিয়ন বোনাপার্টের শেষ যুদ্ধ। নেপোলিয়ন যখন ইউরোপের সকল দেশ জয় করে ফরাসি সাম্রাজ্য বিস্তারের স্বপ্নে বিভোর তখন ইউরোপের দেশগুলো ফ্রান্সের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়। ব্রিটেন, প্রুশিয়া, রাশিয়া, স্পেন ও পর্তুগালসহ প্রায় সকল ইউরোপীয় দেশ একজোট হয়ে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। এই যুদ্ধে ফ্রান্সের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন নেপোলিয়ন এবং জেনারেল মিশেল নে। অপরদিকে মিত্রশক্তিবর্গের সৈন্যবাহিনীর নেতৃত্ব দেন 'ডিউক অব ওয়েলিংটন' আর্থার ওয়েলসরি এবং প্রুশীয় সেনাপতি গেবহার্ড লেবেরেস্ট ফন ব্লুকার। এতে ফ্রান্সের সৈন্যসংখ্যা ছিল ৭২,০০০ এবং মিত্রশক্তির সৈন্যসংখ্যা ছিল ৬৭,০০০। পরে মিত্রশক্তির সৈন্যবল আরো বাড়ানো হয়। ১৫ থেকে ১৮ জুন এখানে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ চলে। যুদ্ধে নেপোলিয়নের বাহিনী শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। এরপর সম্রাট নেপোলিয়নকে সেন্ট হেলেনা দ্বীপে নির্বাসনে পাঠানো হয়। পরে সুকৌশল খাবারে আর্সেনিক বিষ মিশিয়ে তাকে ধীরে ধীরে হত্যা করা হয়। ওয়াটার লু যুদ্ধে ফ্রান্সের প্রায় ৩২,০০০ এবং মিত্রশক্তির প্রায় ২৩,০০০ সৈন্য প্রাণ হারায়।

ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারি (Watergate Scandal)

ওয়াশিংটনের পোটোম্যাক নদীর তীরবর্তী ওয়াটারগেট নামক ভবনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডেমোক্রেটিক পার্টির সদর দফতর অবস্থিত। ১৯৭২ সালের ১৭ জুন প্রকাশ হয়ে যে, ডেমোক্রেটিক দলের গোপন আলোচনা ও নির্বাচনী কৌশল জানার জন্য রিপাবলিকান দল ডেমোক্রেটিক দলের উক্ত সদর দফতরে বিভিন্ন ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি স্থাপন করে। এ ব্যাপারে ৫ জন হাতে নাতে ধরা পড়ে। এর সঙ্গে উচ্চ পর্যায়ের কেউ জড়িত নেই, জনগণকে আপাতত একথা বুঝিয়ে ১৯৭২ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে অনুষ্ঠিত

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান দল জয় লাভ করে। কিন্তু মার্কিন পত্রপত্রিকা এর পেছনে লেগেই থাকে। এর মধ্যে প্রকাশ হয়ে যে, তৎকালীন অ্যাটর্নি জেনারেল ও হোয়াইট হাউস স্টাফ চীফসহ সরকারের উচ্চতম পর্যায়ের ব্যক্তিরাই এই কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত ছিলেন। এঁদের মধ্য থেকে হোয়াইট হাউসের আইন বিষয়ক উপদেষ্টা জন ডিন এবং প্রেসিডেন্ট নিক্সনের ঘনিষ্ঠ সহকর্মী ম্যাকগ্রোভার সমস্ত তথ্য ফাঁস করে দেন। ১৯৭৩ সালের ৯ নভেম্বর আদালত অভিযুক্ত সাত জনের ছয় জনকে কারাদণ্ড দেয়। ১৯৭৪ সালের ২৪ জুলাই সুপ্রিম কোর্ট ৬৪টি টেপ তলব করে। ১৯৭৪ সালের ২৭-২৯ তারিখে অনুষ্ঠিত জুডিসিয়ারি কমিটির সভায় প্রেসিডেন্ট নিক্সনকে ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির দায়ে ইম্পিচ করার জন্য সুপারিশ করা হয়। এমতাবস্থায়, ৫ আগস্ট নিক্সন ওয়াটারগেট কেলেঙ্কারির সকল দায়দায়িত্ব স্বীকার করে নেন এবং ৯ আগস্ট পতদ্যাগ করেন।

ওয়ারস চুক্তি (Warsaw Pact)

১৯৫৫ সালের ১৪ মে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারস মহানগরীতে পূর্ব ইউরোপের সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও সাহায্যের ভিত্তিতে ২০ বছরের জন্য সম্পাদিত চুক্তি। তাতে আলবানিয়া (১৯৬৮ সালে নাম প্রত্যাহার করে), বুলগেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ডা, রুমানিয়া এবং সোভিয়াতে ইউনিয়ন যুক্ত হয়েছিল। দেশগুলোর একটি যৌথ সশস্ত্র বাহিনী গঠিত হয়। চুক্তি অনুযায়ী শীর্ষে একটি রাজনৈতিক পরামর্শ সমিতি ছিল। এই চুক্তির অপর নাম পূর্ব ইউরোপীয় পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি। এই চুক্তি অনুযায়ী সদস্যভুক্ত দেশসমূহেরর একটি ঐক্যবদ্ধ সামরিক কমান্ড গঠন করা হয় এবং সাব্যস্ত হয় যে, সদস্যভুক্ত কোনো দেশ আক্রান্ত হলে অন্য সকলে মিলে তার সর্বাত্মক সহযোগিতায় এগিয়ে আসবে।

১৯৫৪ সালের অক্টোবরে পশ্চিম জার্মানি ন্যাটো রাষ্ট্রজোটে যোগ দেওয়ার ফলে সমাজতন্ত্রী দেশগুলোর নিরাপত্তার তাগিদে ওয়ারস চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির অন্তর্গত কোনো দেশ আক্রান্ত হরে জোটের অন্যান্য দেশগুলো তার সাহায্যে এগিয়ে আসবে বলে চুক্তি হয়েছিল। জোটবদ্ধ দেশগুলো বছরে একবার যৌথ মহড়ায় অংশ নিত। ১৯৬৮ খ্রি চেকোস্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে একবার সামরিক অভিযান করা হয়েছিল। স্বাক্ষরকারীরা অস্ত্র প্রতিযোগিতার অবসান চায়, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা হ্রাস ও বিনষ্টকরণ, রাসায়নিক অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং যাবতীয় চায়, পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা হ্রাস ও বিনষ্টকরণ, রাসায়নিক অস্ত্রের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি এবং যাবতীয় নতুন মারণাস্ত্র উৎপাদন রদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তবে নাটো সংগঠন যদি ভেঙে দেওয়া হয় তা হরে ওয়ার্‌স জোটও ভেঙে দেওয়া হবে বলে অঙ্গীকার করা হয়। ১৯৯১ খ্রি সংযুক্ত জার্মানির নাটো থেকে বেরিয়ে আসার পর ওয়ার্‌স চুক্তির জোট ভেঙে দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই চুক্তির কোনো কার্যকারিতা নেই।

ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে (Westminister Abe)

ব্রিটেনের একটি ঐতিহাসিক ও দর্শনীয় স্থান হচ্ছে 'ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে'। এটি ব্রিটেনের রাজধানী লন্ডন শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত। ব্রিটেনের অনেক ঐতিহাসিক ও বেদনাদায়ক ঘটনার স্বাক্ষী এই স্থানটি। এটি মূলত একটি সমাধি ক্ষেত্র। ব্রিটেনের বহু খ্যাতিমান রাজনৈতিক ও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অসংখ্য অজ্ঞাতনামা যোদ্ধাদের সমাধি রয়েছে এই 'ওয়েস্ট মিনিস্টার অ্যাবে'তে। ইংরেজি সাহিত্যের অনেক লেখক ও ঔপন্যাসিকের সমাধিও এখানে অবস্থিত।

ওহাবি আন্দোলন (Wahabi Movement)

ইসলামি চিন্তা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে আরবের আবদুল ওহাব যে সংস্কারমূলক আন্দোলন শুরু করেন, তা-ই ওহাবি আন্দোলন নামে খ্যাত। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে এই আন্দোলন তীব্র আকার ধারণ করে। রায় বেরোলির সৈয়দ আহমদ হজ্ব উপলক্ষে মক্কায় গিয়ে ওহাবি আদর্শে দীক্ষা নেন। মক্কাতেই তাঁর পরিচয় ঘটে বারাসতের মীর নিসার আলি (তিতুমীর) ও ফরিদপুরের পীর দুদু মিয়ার সঙ্গে। ১৮২০-২২ সালে ভারতবর্ষব্যাপী এই আন্দোলনের ব্যাপক প্রচার কাজ চলে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এই আন্দোলনে শামিল হয়। ওহাবিরা ভারতবর্ষকে 'দারুল হরব্' বা 'শত্রুর দেশ' বলে ঘোষণা করেন এবং একে 'দারুল ইসলাম' বা 'ইসলামের দেশ'-এ পরিণত করার শপথ নেন। শোষক উৎপীড়ক ইংরেজ ও তাদের পদলেহী জমিদার জায়গিরদার মহানদের বিরুদ্ধে ছিল ওহাবিদের বিদ্রোহ। প্রথম পর্যায়ে শিখ জমিদারদের বিরুদ্ধে মুসলমান চাষীদের বিদ্রোহ চরম আকার ধারণ করে এবং ১৮৩১ সালে এক প্রচণ্ড যুদ্ধে স্বয়ং সৈয়দ আহমদ বেরেলভি নিহত হন। অতঃপর, এই বিদ্রোহ উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ থেকে বাংলা বিহার পর্যন্ত বিস্তার লাভ করে। মূলত ওহাবি আন্দোলন অসাম্প্রদায়িক হলেও, বাংলাদেশে যেহেতু জমিদারেরা ছিল প্রধানত হিন্দু এবং প্রজাদের বেশির ভাগ মুসলমান, সেহেতু প্রজাদের এই বিদ্রোহকে অনেকে সাম্প্রদায়িক রূপ দেওয়ার প্রয়াস পায়। বাংলায় এই আন্দোলনের প্রধান নায়ক ছিলেন তিতুমীর ও পীর দুদু মিয়া। ১৭৭২ সালে চব্বিশ পরগনায় তিতুর জন্ম। ওহাবি আন্দোলন শুরু হলে এতদঞ্চলের জমিদার কৃষ্ণদেব রায় ওহাবি মতাবলম্বীদের দাড়ি রাখার ওপর মাথাপিছু আড়াই টাকা হারে খাজনা ধার্য করেন। অন্যান্য জমিদাররাও গ্রহণ করেন বিভিন্ন নিবর্তনমূলক ব্যবস্থা। জমিদারদের অত্যাচারের বিররুদ্ধে আদালতের মাধ্যমে প্রতিকার পেতে ব্যর্থ হয়ে তিতুমীর ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর প্রধান সহকারী হন মিসকিন শাহ। ১৮৩০ সালের ৬ই নভেম্বর তিতুমীর কৃষ্ণদেব রায়ের প্রাসাদ আক্রমণ করেন এবং কয়েকদিন পর ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বিরুদ্ধেও যুদ্ধ ঘোষণা করেন। জমিদারদের খাজনা প্রদানও বন্ধ করে দেওয়া হয়। স্বাভাবতই, জমিদার নীলকর, কোম্পানি সবাই মিলে তিতুমীরকে ধ্বংস করার প্রস্তুতি নেয়। তিতুমীর নারকেলবেড়িয়ায় বাঁশের কেল্লা তৈরি করে এই হামলা প্রতিহত করার প্রয়াস

পান। কিন্তু সম্মিলিত বাহিনীর কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের বাঁশের কেল্লা ছিন্ন বিছিন্ন হয়ে যায়। ১৮৩৯ সালের ১৫ নভেম্বর কেল্লার পতন ঘটে, তিতুমীর নিহত হন এবং ৮০০ বিদ্রোহী বন্দি হয় এবং ওহাবি আন্দোলনের জঙ্গি অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে। বলাবাহুল্য, ওহাবি আন্দোলন মূলত ছিল উপনিবেশবাদ ও সামন্তবাদ বিরোধী কৃষক-প্রজাদের আন্দোলন।

ঔপনিবেশিকতাবাদ (Colonialism)

সব অর্থনেতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক কর্মপন্থার সাহায্যে একটি সাম্রাজ্যশক্তি অন্যান্য দেশ কিংবা অধিবাসীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ অথবা সম্প্রসারণ বজায় রাখার প্রক্রিয়াই ঔপনিবেশিকতাবাদ। শব্দটির অর্থ সাম্রাজ্যবাদের সমতুল্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে ঔপনিবেশিকতাবাদ শব্দটি বিশেষ করে বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সাম্রাজ্যবাদ শব্দটির সমার্থেবহুল ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে শব্দটির দ্বারা সাম্রাজ্য বিস্তার ও শিল্পোন্নয়নের জন্য আইনকানুন বিধিবদ্ধকরণে যে ঔপনিবেশিক রীতিনীতি বা কর্মপন্থাকে বোঝানো হতো।

এক স্থানের কিছু অধিবাসী যখন নিজ দেশ ছেড়ে অন্য কোনো দেশে গিয়ে যে বসতি বা উপনিবেশ স্থাপন ক্ষমতা। ইউরোপের অধিবাসীরা দলে দলে আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দেশে এবং তারও আগে গ্রিসের অধিবাসীরা সিসিলি, দক্ষিণ ইতালি প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশ স্থাপন করে বসবাস ক্ষমতা।

ইদানীং সাম্রাজ্যবাদবিরোধী আন্দোলনসূত্রে ঔপনিবেশিকতাবাদ বিস্তার লাভ করেছে। সপ্তদশ শতক থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্ব পর্যন্ত ব্রিটেন, ফ্রান্স, স্পেন, পর্তুগাল, হল্যোন্ড, ইতালি, জাপান প্রভৃতি ধনতন্ত্রী দেশ বিশ্বের বিভিন্ন অনুন্নত দেশ জবরদস্ত দখল করে ঔপনিবেশিক শাসন কায়েম করে। উদ্দেশ্য ছিল নিজ দেশের উদ্বৃত্ত মূলধন উপনিবেশে লগ্নি করা, উপনিবেশে শ্রমিকের শস্তা জমজুরি এবং সেখানকার কাঁচামাল সস্তায় শিল্প বাণিজ্যে নিয়োগ করা। উপনিবেশগুলোতে আর্থনৈতিক শোষণের দ্বারা স্বদেশের প্রভূত উন্নতিবিধান করা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে কিছুটা এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে বহুলাংশে ব্যবসাবাণিজ্যের ক্ষয়-ক্ষতি এবং দায়দেনার ফলে ঔপনিবেশিক শক্তিসমূহ আর্থিক দিয়ে সবিশেষ পর্যদস্ত হয়। সেকারণে উপনিবেগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলে রাখা নিরর্থক হয়ে দাঁড়ানোয় সেগুলো সাম্রাজ্যবাদীরা ছেড়ে চলে যায়।

কংগ্রেস (Congress)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল আইন পরিষদ দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। কক্ষ দুটি হল, সিনেট এবং প্রতিনিধিসভা বা হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভ্স্। মার্কিন সংবিধানের এক নম্বর ধারায় বলা আছে যে, এই সংবিধানে প্রদত্ত সকল ক্ষমতার এখতিয়ার হচ্ছে উক্ত দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট কংগ্রেসের। প্রত্যেক জোড় বৎসরের প্রথম মঙ্গলবারে সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে কংগ্রেসের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় (শুধু মেইন রাজ্যে নির্বাচন সদস্যরা কংগ্রেসম্যান নামে পরিচিত হন)।

কংগ্রেস সদস্য (Congressman)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আইন পরিষদ কংগ্রেসের সদস্যদের কংগ্রেসম্যান বলে। কংগ্রেসের দুটি কক্ষ-প্রতিনিধি সভা এবং সিনেট। প্রতিনিধি সভার সদস্যদেরই কংগ্রেসম্যান বলা হয়। সিনেটের সদস্যদের সিনেটর বলা হয়।

কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি (Congress Socialist Party)

ত্রিশের দশকের প্রথমার্ধে আইন অমান্য আন্দোলন স্তিমত হয়ে পড়ায় কংগ্রেসের যুব কর্মীদের মধ্যে তীব্র অসন্তোষ ও হাতাশা দেখা দেয়; তাঁরা সংগ্রামী পথে অগ্রসর হবার সংকল্প গ্রহণ করেন। দেশের বিভিন্ন স্থানে সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গড়ে উঠতে শুরু করে। পুনাতে অনুষ্ঠিত এক সম্মেলনে (১৯৩৩) একটি সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি গৃহীত হয়। পাটনাতেও ইতিপূর্বে অনুরূপ এক সম্মেলন (১৯৩১) অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ওই সময়ে নাসিক জেলে আইন অমান্য আন্দোলনে ধৃত কিছু যুবকর্মী একটি সমাজতন্ত্রসূচী দল গঠনের এক খসড়া কর্মসূচি প্রস্তুত করেন (১৯৩৩)। তাঁদের মধ্যে ছিলেন জয়প্রকাশ, নারায়ণ, অশোক মেহতা, অচ্যুৎ পট্টবর্ধন, ইউসুফ মেহেরালি, এম. আর. মাসানি এন. জি. গোরে, এস. এম. যোশী, এম. এল. দাঁনতওয়ালা প্রমুখ ব্যক্তি। ১৯৩৪ সালের এপ্রিল মাসে জব্বলপুরে মানবেন্দ্রনাথ রায়ের ও আর. এস. রুইকবের কিছু সংখ্যক অনুগামীও একটি সমাজতন্ত্রী দল গঠনের সিদ্ধান্ত নেন। মানবেন্দ্রনাথ তখন কারাগারে। ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির এক অধিবেশনে আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করে সংসদীয় কর্মসূচি গ্রহণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। ইতিপূর্বে ভগ্নপ্রায় স্বরাজ পার্টিকে পুনর্গঠিত করার প্রয়াস চলেছিল। সংগ্রাম বিমুখ এই প্রবণতাকে প্রতিরোধ করার জন্য উল্লিখিত অধিবেশনের পূর্বে পাটনায় সমাজতন্ত্রীরা আচার্য নরেন্দ্র দেবের সভাপতিত্বে এক সম্মেলনে মিলিত হন। সেখানে একটি নিখিল ভারত সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী গঠিত হয়। বিভিন্ন সমজতন্ত্রী গোষ্ঠীর সঙ্গে সংযোগ ও সমন্বয়ের জন্য একটি প্রস্তুতি সমিতি গঠিত হয়; তার সাধারণ সচিব হন জয়প্রকাশ। ওই বছরের অক্টোবর মাসের শেষদিকে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত প্রথম সম্মেলনে নিখিল ভারত কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির আনুষ্ঠানিক প্রতিষ্ঠা হয়।

বোম্বাই সম্মেলনেই পার্টির উদ্দেশ্য সংবলিত গঠনতন্ত্র এবং কর্মসূচি গৃহীত হয়। কংগ্রেসের ভেতরে থেকেই কার্যনির্বাহ ছিল পার্টির বৈশিষ্ট্য। প্রথম সম্মেলনে গৃহীত মূল দুটি উদ্দেশ্য ছিল: ১. ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বাইরে অবস্থিত থেকে দেশের পূর্ণ স্বাধীনতা এবং ২. দেশে একটি সমাজতন্ত্রী সমাজের প্রতিষ্ঠা। ইংরেজ সরকারের সঙ্গে সাংবিধানিক বিষয়ে আলোচনা যথার্থ স্বাধীনতা অর্জনের পরিপন্থী বলে এই দল মনে করে। উল্লিখিত দ্বিতীয় লক্ষ্যের সমর্থনে ১৫ দফার এক কর্মসূচি গৃহীত হয়, যার মূলকথা ছিল উৎপাদনকারী জনগণের কাছে যাবতীয় ক্ষমতার হস্তান্তর, ভারী শিল্প-বাণিজ্যের রাষ্ট্রীয়করণ, যৌথ কৃষিব্যবস্থা ও সমবায়ের মাধ্যমে উৎপাদন ও বণ্টন,

দেশীয় রাজ্য ও জমিদারি ব্যবস্থার অবসান, কাজের অধিকারকে রাষ্ট্রের স্বীকৃতি দান, সর্বজনীন ভোটাধীকার, রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ ইত্যাদি।

কংগ্রেসের ভেতরে থেকে তার আদর্শ ও কর্মসূচির রূপায়ণ ছাড়াও কংগ্রেসের বাইরে শ্রমিক ও কৃষক সগঠনসমূহে যোগ দিয়ে সেগুলোকে শ্রেণিসংগ্রামের অনুকূলে শক্তিশালী করে তোলা ছিল দলের দ্বিমুখী কর্মধারা। দ্বিতীয় ধারার কর্মসূচির অন্যতম অঙ্গ ছিল যুব, নারী ও স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গড়ে তোলা।

পার্টি গঠনের গোড়ার দিকে মানবেন্দ্রনাথের অনুগামীদের অনেকেই সেটির সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩৬ সালের নভেম্বরে মানবেন্দ্রনাথ জেল থেকে মুক্তি পাবার পর তাঁরা দলত্যাগ করেন। অন্যদিকে ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল তার পূর্ব অনুসৃত উগ্র কর্মপন্থা বাতিল করে পপুলার ফ্রন্ট নীতি গ্রহণ করে। এ যাবৎকাল ভারতীয় কমিউনিস্টরা সি এস পি দলের তীব্র সমালোচনা করতেন। অতঃপর ওই দলে প্রকাশ্যে যোগদানের মাধ্যমে নিষিদ্ধ ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সদস্যরা কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত হন। দ্বিতীয় বিশ্ব-মহযুদ্ধের প্রাক্কালে সি এস পি থেকে কমিউনিস্টরা বহিষ্কৃত হন। অন্যান্য বাম নেতাদের মধ্যে জওহরলাল ও সুভাষচন্দ্র এই দলের সঙ্গে কোনোভাবে যুক্ত হননি। ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইনের বিরুদ্ধে নির্বাচনে অংশগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে বিরোধিতাসূত্রে বামপন্থী জোটে বিভন্ন দল ও নেতা সাময়িকভাবে যুক্ত হন।

সি এস পি দলের আদর্শ ও কর্মসূচি যাই থেকে থাকুক না কেন, প্রতিষ্ঠাকাল থেকেই তার নেতৃবৃন্দের মধ্যে বিচিত্র ও বহুমুখী মতাদর্শ দেখা যেত। কেউ ছিলেন ফোবিয়ান সমাজতন্ত্রী, কেউ বা কট্টর মার্কসবাদী, কেউ আবার নিখাদ গান্ধীবাদী কিংবা বৈদান্তিক মতাদর্শে বিশ্বাসী। পার্টির মুখপত্র 'কংগ্রেস সোসালিস্ট' প্রথমেকলকাতা ও পরে বোম্বাই থেকে প্রকাশিত হত।

ত্রিপুরী কংগ্রেসের (১৯৩৯) প্রাক্কালে সি এস পি সুভাষচন্দ্রকে সমর্থন করে, কিন্তু অধিবেশনে গোবিন্দ বল্লভ পন্থের প্রস্তাব উত্থাপনের সময়ে নিরপেক্ষ থাকে; এবং পরোক্ষে দক্ষিণপন্থীদের পক্ষ অবলম্বন করে। অনতিকাল পরে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে গঠিত লেফ্‌ট কন্‌সলিডেশন কমিটি যখন কংগ্রেস নেতৃত্বের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ আন্দোলন শুরু করে তখন সি এস পি কমিটি থেকে সরে আসে এবং বাম মোর্চা ছত্রভঙ্গ হয়ে যাওয়ায় রামগড় কংগ্রেসের প্রাক্কালে সভাপতি পদের নির্বাচনে মানবেন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে দক্ষিণপন্থী প্রার্থী মওলানা আজাদকে সমর্থন করে। গান্ধীজির নেতৃত্বে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে সংগ্রাম শুরু করাই ছিল সি এস পি দলের অভীষ্ট বস্তু। ভারত ছাড় আন্দোলনে দলের বিভিন্ননেতা নেতৃত্বদান করেন। আন্দোলন নিষ্ফল হয়ে যাওয়ার পরে জয়প্রকাশ, নরেন্দ্র দেব প্রমুখ নেতৃবৃন্দ পূর্ব পরিকল্পিত সুষ্ঠু কর্মসূচি না থাকাকেই ব্যর্থতার কারণ বলে অভিমতপ্রকাশ করেন। ১৯৪৬ খ্রি জেল থেকে মুক্তির পর দলের কোনো কোনো নেতা নিখিল ভারত কগ্রেস কমিটির অধিবেশনে গণপরিষদে যোগদানের প্রস্তাবের

বিরোধিতা করে নতুন রূপে আবার ভারত ছাড় আন্দোলনের প্রস্তাব করেন। পার্টির কানপুর কনভেনশনে (ফেব্রুয়ারি-মার্চ ১৯৪৭) মাউন্টব্যাটেন প্রস্তাবসহ কংগ্রেসের অনুসৃত নীতিকে নিন্দা করা হয় এবং দরের নাম থেকে কংগ্রেস শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৪৮ খ্রি ফেব্রুয়ারি মাসে এ আই সি সি অধিবেশনে স্থির হয় যে স্বতন্ত্র মতাদর্শ ও গঠনতন্ত্র সংবলিত কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য অতঃপর কংগ্রেসের সদস্য হিসেবে থাকতে পারবেন না। ওই বছরেই নাসিক সম্মেলনে পার্টির সদস্যদের বড় একটি অংশ গণপরিষদ এবং স্বাধীনতার মূলস্রোতে নিজেদের বিচ্ছিন্নতা উপলব্ধি করেন, ফলে সমগ্র দলের কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে আসার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

কনজারভেটিভ পার্টি (Conservative Party)

ব্রিটেনের একটি রাজনৈতিক দল। এটি 'ইউনিয়নিস্ট পার্টি' হিসেবেও পরিচিত। পার্লামেন্ট সবসময় ডানপন্থী এই দলটিকে অষ্টাদশ ও উনিশ শতকের টোরি (Tory) পার্টির উত্তরসূরি মনে করা হয়। কনজারভেটিভ বা 'রক্ষণশীল' শব্দটি ব্রিটেনে ১৮২৪ সালে প্রথম ব্যবহার করে জর্জ ক্যানিং (১৭৭০-১৮২৭)। ১৮৩৪ সালে 'ট্যামওয়ার্থ মেনিফেস্টো' গ্রহণ করার পর থেকেই প্রকৃতপক্ষে এই দলটি তার কাঠামোগত রূপ পরিগ্রহ করে। এর মৌলিক নীতি ও লক্ষ্যাদি সূত্রবদ্ধ করেন বেঞ্জামিন ডিজরেইলি (১৮০৪-১৮৮১)। এসব লক্ষ্যের অন্যতম হচ্ছে বিধিবদ্ধ আইন কঠোরভাবে অনুসরণ, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রক্ষন ও বিস্তার ঘটানো এবং জনগণের অবস্থার উন্নতি সাধন। কনজারভেটিভ পার্টি ১৮৯২ থেকে ১৮৯৫ এবং ১৮৯৫ থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত দুবার ক্ষমতাসীন হয়। তবে শুল্ককরের ক্ষেত্রে সংস্কারের প্রশ্নে নিজেদের মধ্যে মতদ্বৈততা ও সুস্পষ্ট সামাজিক নীতির অভাবে দলটি সংকটের সম্মুখীন হয়। ফলে দীর্ঘকাল ক্ষমতার বাইরে থাকে। অ্যান্ড্রু বোনার ল-এর (১৮৫৮-১৯২৩) নেতৃত্বে ১৯২২ সালে দলটি আবার ক্ষমতায় আসে। ১৯৪৫ সালে কনজারভেটিভ পার্টি নির্বাচিত হওয়ার পর থেকে কিছুটা মধ্যপন্থী প্রগতিশীল ও কল্যাণমূলক রাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করে। বিভিন্ন সময়ে যারা দলটির নেতৃত্ব দিয়েছেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন স্যার অ্যালেক ডগলাস হিউম, স্যার উইনস্টন চার্চিল, কুইন্টিন হগ, এডওয়ার্ড হিথ প্রমুখ।

কনফুসিয়াস (Confucius)

চীনা দার্শনিক কনফুসিয়াসের (খ্রিস্টপূর্ব ৫৫১-৪৭৯) মতে প্রতিটি মানুষের 'ভাগ্য' ও 'চরিত্র' ঈশ্বর কর্তৃক নির্ধারিত, তার পরিবর্তনের কোনো উপায় নেই। কনফুসিয়াসের অন্যতম অনুসারী মেংজু (খ্রিস্টপূর্ব ৩৭২-২৮৯)-এর মতে সামাজিক বৈষম্য ঈশ্বরের ইচ্ছারই ফলশ্রুতি। তাঁর অপর এক অনুসারী স্যুনজু (খ্রিস্টপূর্ব ২৯৮-২৩৮) বলেন যে, ঈশ্বর আসলে প্রকৃতিরই অংশ এবং ঈশ্বর চেতনারহিত। তাঁর অপর এক অনুসারী ছিলেন তুং চুং স্যু (খ্রিস্টপূর্ব ১৭৭-১০৪)। কনফুসিয়াসবাদের মূল শিক্ষাই হল সুবিধাভোগী শ্রেণির আধিপত্য কায়েম করা এবং 'ঈশ্বরের ইচ্ছা'-র জয়গান করা।

কনফুসিয়াস আচরণ ও শিষ্টাচারের নীতিমালাও প্রণয়ন করেন এবং এর প্রধান কথা হল, কনিষ্ঠেরা জ্যেষ্ঠের কাছে এবং অধস্তনরা ওপরস্থদের কাছে বিনীতভাবে আত্মসমর্পণ করবে। একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে চুশি (১১৩০-১২০০) প্রমুখ নয়া কনফুসিয়াসবাদের প্রবর্তন করেন। এই দর্শন অনুযায়ী, সৃষ্টির ক্ষেত্রে দুটি বিষয় আছে, যথা, লি, অর্থাৎ সচেতন সৃষ্টিধর্মী নীতি এবং চি, অর্থাৎ অচেতন বস্তু। লি মানুষের মধ্যে গুণের এবং চি গোষ ও পাপের জন্ম দেয়। ওয়াং ইয়াং মিং (১৪৭২-১৫২৮) এই মতবাদকে আরও বিকশিত করেন। তাও মতবাদ ও বৌদ্ধ ধর্মীয় মতবাদের সঙ্গে কনফুসিয়াসবাদও দীর্ঘদিন যাবৎ সামন্তবাদী চীনের প্রধান আদর্শ হিসাবে বহাল ছিল। চীনে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর কনফুসিয়াসবাদের চর্চা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য বিংশ শতাব্দীর আশির দশকে কনফুসিয়াসের চিন্তাধারা নিয়ে ভাবনা চিন্তার পুনঃসূচনা ঘটে এবং তাঁর সমাধি জনগণের জন্য পুনরায় উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়।

কনভয় (Convoy)

সাধারণত এক বা একাধিক যুদ্ধজাহাজ বা সশস্ত্র জাহাজ যদি অন্য একটি বা কতিপয় যাত্রীবাহী বা বাণিজ্যিক জাহাজকে পাহারা দিয়ে শত্রুর আক্রমণ থেকে রক্ষা করে ও নিরাপদে গন্তব্যে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পালন করে, তা হলে সেই জাহাজ বা জাহাজগুলোর সমষ্টিকে কনভয় বলে। আবার পুরো বহরটিকেও কনভয় বলা যায়।

কনভেনশন পার্লামেন্ট (Convention Parliament)

কনভেনশন পার্লামেন্ট ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সাথে যুক্ত একটি শব্দ। সাধারণত দু'টি ব্রিটিশ পার্লামেন্ট কনভেনশন পার্লামেন্ট নামে খ্যাত হয়। সতের শতকে এ দু'টি পার্লামেন্ট আহূত হয় এবং কিছুদিন অধিবেশন করার পরই বিলুপ্ত হয়। কনভেনশন পার্লামেন্ট দু'টি কোনো রাজা বা সার্বভৌম প্রধান কর্তৃক আহ্বান করা হয় নি। উদ্ভূত রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে পার্লামেন্ট বসে এবং গুরুত্বপূর্ণ অনেক রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে।

প্রথম কনভেনশন পার্লামেন্ট বসে ১৬৬০ স্যালের ১৪ এপ্রিল। রাজা প্রথম চার্লস (১৬০০-৪৯) এর সঙ্গে পার্লামেন্টের সম্পর্ক মোটেই ভালো ছিল না। প্রথম চার্লসের রাজত্বকালে অনেক ঘটনা ঘটে। পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজতন্ত্রের সম্পর্ক চরম অবনতি ঘটে; এ সময় ইতিহাস খ্যাত শর্ট পার্লামেন্ট, লং পার্লামেন্ট বসে। শেষ পর্যন্ত রাজা পরাস্ত হন। প্রথম চার্লসের মৃত্যুর পর শুরু হয় মধ্যবর্তী (interregnum) শাসন। ১৬৪৯ সালের জানুয়ারি থেকে ১৬৬০ সালের এপ্রিল পর্যন্ত মধ্যবর্তী শাসন চলে। মূলত এ 'মধ্যবর্তী' শাসন রাজাহিবীন শাসন। প্রথম কনভেনশন পার্লামেন্ট মধ্যবর্তী শাসনের অবসান ঘটিয়ে রাজা দ্বিতীয় চার্লসকে। (১৬৬০-৮৫) ক্ষমতায় বসায়। দ্বিতীয় চার্লস ছিলের রাজা প্রথম চার্লসের প্রথম ছেলে। 'মধ্যবর্তী শাসনে'র ফলে যেসব সমস্যা দেখা দেয় পার্লামেন্ট সেগুলোর নিষ্পত্তি করে। মধ্যবর্তী শাসনে যারা জড়িত ছিলেন তাদের

সকল কাজকে বৈধ এবং দায়মুক্তি (ইনডেমনিটি) প্রদান করে। ওই সময়ে বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি সম্পর্কিত সকল বির্তকের নিস্পত্তি করে এবং রাজার জন্য একটি বার্ষিক আয় (১২ লাখ পাউন্ড) নির্ধারণ করে।

দ্বিতীয় কনভেনশন পার্লামেন্ট বসে ১৬৮৯ সালের ১ ফেব্রুয়ারি। বিলুপ্ত হয় একই সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি। রাজা দ্বিতীয় জেমস (১৬৩৩-১৭০১, রাজা প্রথম চার্লসের দ্বিতীয় ছেলে)-এর ক্ষমতাচ্যুতির পর এ পার্লামেন্ট বসে। রাজা যত অসাংবিধানিক পদক্ষেপ নেন তা বাতিল করে। রাজার অবৈধ কার্যকলাপের বিবরণ এবং পার্লামেন্টের অধিকার সম্পর্কে 'ডিক্লারেশন অব রাইটস' নামে একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে। এ ঘোষণাপত্র মেনে নেয়ায় উইলিয়াম ও মোরিকে সিংহাসনে বসায়।

কনভেনশন পার্লামেন্ট দু'টি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আহূত হয় নি। তবে পরবর্তী পার্লামেন্টগুলো কনভেনশন পার্লামেন্ট দু'টির সকল কাজের বৈধতা প্রদান করে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ইতিহাসে এবং রাজতন্ত্রের সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দের ক্ষেত্রে কনভেনশন পার্লামেন্ট দু'টির ভূমিকা অনেক গুরুত্বপূর্ণ।

কনসোর্টিয়াম (Consortium)

সাধারণত একাধিক সংঘ বা গোষ্ঠী কোনো কার্য সম্পাদনের জন্য ঐক্যবদ্ধ হয়, এই ঐক্যবদ্ধ সংঘগুলোকে একত্রে কনসোর্টিয়াম বলা হয়। অর্থাৎ কোনো জটিল প্রকল্প বা একটিমাত্র প্রতিষ্ঠানের পক্ষে বাস্তবায়িত করা কঠিন, এমন প্রকল্প বাস্তবায়িত করার উদ্দেশে একাধিক প্রতিষ্ঠান গ্রুপবদ্ধ হয়ে কাজ করলে এরূপ গ্রুপকে বলে কনসোর্টিয়াম। শুধু কতিপয় প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই নয়, কোনো বিশেষ প্রকল্প বা কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করার জন্য কতিপয় রাষ্ট্রকে নিয়েও কনসোর্টিয়াম গঠিত হতে পারে।

কমনওয়েলথ (Commonwealth)

বিশ্বের আধুনিক ইতিহাসে প্রথম একটা সময় ছিল, যখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সূর্য কখনও অস্ত যেত না। সেই দিন গত হয়েছে। তবে এখনও বিশ্বের অনেক দেশ যারা এক সময় ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে ছিল তারা একটি স্বেচ্ছাচারী সংস্থার অধীন যার নাম ব্রিটিশ কমনওয়েলথ। সাধারণত কমনওয়েলথ বলতে বন্ধুত্বের ঐতিহাসিক বন্ধনে আবদ্ধ কতগুলো স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশের সম্মিলিত একটি সংগঠনকে বোঝায়। কমনওয়েলথ ব্রিটিশ কমনওয়েলথ নামে পরিচিত। আর ব্রিটিশ কমনওয়েলথ বলতে ওই রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনকে বোঝায় যা পূর্বে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভূক্ত ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে কমনওয়েলথ একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে এটা কোনো সংস্থা ও নয়, আবার আঞ্চলিক চুক্তিও নয়, আবার কোনো কনফেডারেশনও নয়। প্রকৃতপক্ষে, এটা বন্ধুভাবাপন্ন জাতিসমূহের একটি শিথিল সংগঠন। তবে কমনওয়েলথ একটি শিথিল সংগঠন হলেও সদস্য দেশগুলোর নিজস্ব

সাধারণ সমস্যা নিয়ে আলোচনা করে এবং আপসে সিদ্ধান্তে আসে। এবং নিজেদের কর্ম পরিকল্পনা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে এসে অন্যকে সহযোগিতা করে। সদস্য দেশ গুলোর গণতান্ত্রিক উন্নয়ন ও বিকাশ, নিজেদের মধ্যে অসমতা ও ব্যবধান দূরীকরণ করা, বিশ্বশান্তি ও উন্নয়ন বিদেশি আগ্রাসন থেকে নিজেদের মুক্ত করা সহ বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক জোরদার করার লক্ষ্যেই ১৯৩১ সালে কমনওয়েলথ স্বশাসিত আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। কমনওয়েলথভূক্ত কোনো সদস্য রাষ্ট্র অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রে যে রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করে তাকে বলা হয় হাইকমিশনার (Highcommissoner)। বর্তমান সদস্য সংখ্যা–৫৫।

কনসিলিয়ার আন্দোলন (Conciliar Movement)

মধ্যযুগীয় কনসিলিয়ার আন্দোলন একটি ধর্মীয় আন্দোলন। মধ্যযুগে পোপ (Pope) এর ক্ষমতা (ধর্মীয় ব্যাপারে) মাত্রাতিরিক্ত বেড়ে যাওয়ার ফলে সাধারণ বিশ্বাসীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। দৃঢ়চেতা ধর্মীয় নেতাদের নেতৃত্বে উক্ত অসন্তুষ্ট বিশ্বাসীরা শেষ পর্যন্ত পোপকে তাদের নির্ধারিত পরামর্শ মোতাবেক যাবতীয় ধর্মীয় ব্যাপারাদি নিষ্পন্ন করতে এক প্রকার বাধ্য করে। মধ্যযুগের এই কনসিলিয়ার ধর্ম-আন্দোলনই পরবর্তীকালে ইউরোপীয় রাষ্ট্রীয় জীবনে রাষ্ট্রীয় প্রধানের ক্ষমতা যে পরামর্শকমণ্ডলীর স্বীকৃতির ওপর নির্ভরশীল, তারই প্রথম সূচনা।

কমিউনিজম (Communism)

এ শব্দটি বিভিন্ন অর্থে ব্যবহৃত হয়। যে সমাজ-ব্যবস্থায় সম্পত্তির মালিকানা হয় সর্বসাধরনের; প্রতি ব্যক্তি তার প্রয়োজন অনুযায়ী সব কিছু পায় এবং তার ক্ষমতা অনুযায়ী কাজ করে; এ ব্যবস্থা বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়। সাম্যবাদ বা কমিউনিজম (ইংরেজি: Communism) হলো শ্রেণিহীন, শোষণহীন, ব্যক্তিমুনাফাহীন এমন একটি রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভাবাদর্শ যেখানে ব্যক্তিগত মালিকানার স্থলে উৎপাদনের সকল মাধ্যম এবং প্রাকৃতিক সম্পদ (ভূমি, খনি, কারখানা) রাষ্ট্রের মালিকানাধীন এবং নিয়ন্ত্রণাধীন থাকে। সাম্যবাদ হলো সমাজতন্ত্রের একটি উন্নত এবং অগ্রসর রূপ, তবে এদের মধ্যেকার পার্থক্য নির্ণয়ে বহুকাল ধরে বিতর্ক চলে আসছে। তবে উভয়েরই মূল লক্ষ্য হলো ব্যক্তিমালিকানা এবং শ্রমিক শ্রেণির ওপর শোষণের হাতিয়ার পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থার অবসান ঘটানো। কার্ল মার্ক্স যে মতাদর্শ উপস্থাপন করেছিলেন সেই মতে সাম্যবাদ হলো সমাজের সেই চূড়ান্ত শিখর, যেখানে পৌঁছাতে হলে বিপ্লবের মাধ্যমে সমাজে আর্থনৈতিক সাম্য স্থাপন করতে হবে এবং সেই ক্রান্তিকালে উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলে, সমাজে সামগ্রী ও সেবার অতিপ্রাচুর্য সৃষ্টি হবে। কোনো দেশে সাম্যবাদ থাকলে সেখনে ধনী গরীবের ব্যবধান থাকবে না। নাগরিকদের মৌলিক অধিকারগুলো নিশ্চিত করার দ্বায়িত্ব সরকার নেবে।

১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর ১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক (কমিন্টার্ন) প্রতিষ্ঠান সময়ে অন্যান্য সমাজতন্ত্রী আন্দোলনের সঙ্গে পার্থক্য নিরূপণের উদ্দেশে কমিউনিস্ট শব্দটি অগ্রাধিকার পায়। যেমন উনিশ শতকের মধ্যকালেও শব্দটি অন্যান্য সংস্কারবাদী সাংবিধানিক পরিবর্তনকারী সমাজতন্ত্রীদের থেকে ভিন্ন সশস্ত্র বৈপ্লবিক আন্দোলনের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছিল।

দ্বিতীয় যে অর্থে শব্দটি প্রযুক্ত হয়-অর্থাৎ সমাজব্যবস্থা— সে সম্পর্কে মার্কসের অভিমত ছিল যে ব্যক্তিগত মালিকানা থাকবে না এবং শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। কমিউনিস্ট সমাজকে মার্কস দুটি স্তরে বিন্যস্ত করেন। প্রথম স্তরে যখন সমাজ পুঁজিবাদী ব্যবস্থা থেকে সদ্য বেরিয়ে এসেছে তখন লোকে মুজুরি পাবে ভোগ্য বস্তু কেনার জন্য (বিনিময় ব্যবস্থা অনুসারে) এবং উচ্চতর স্তরে লোকে সমাজকে তাদের সাধ্যানুসারে দেবে এবং সামাজিক সাধারণ ভাণ্ডার থেকে প্রয়োজন অনুযায়ী নেবে। লেনিন তাঁর 'স্টেট অ্যান্ড রেভল্যুশন' গ্রন্থে স্তর দুটির সোসলিজম ও কমিউনিজম নামকরণ করেন। উচ্চতর কমিউস্টি স্তরে শ্রেণিহীন ব্যবস্থায় উৎপাদন ও বণ্টনে সম্পত্তির মালিকানা হবে সর্বসাধারণের এবং সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে যথার্থ সমতা প্রতিষ্ঠিত হবে। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার উন্নয়নের মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তির পরিপুষ্টি তথা মানুষের সর্বাঙ্গীণ উন্নতি ঘটবে।

সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের মাধ্যমে ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ এব কমিউনিস্ট রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা মার্কসীয় মতানুসারে অবশ্যম্ভাবী। ফলে গড়ে ওঠে সর্বহারার একনায়কত্ব। পরিশেষে রাষ্ট্রের অবলুপ্তি (wither away) ঘটবে। সোসালিস্ট বিপ্লবের মধ্যে দিয়ে কমিউনিস্ট শাসনব্যবস্থার প্রবর্তন হলো কমিউনিস্ট পার্টির লক্ষ্য।

কমিউনিস্ট পার্টি (Communist Parties)

উনিশ শতকের ত্রিশের দশকে মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিজম শব্দটি ব্যবহার করেন। একটি আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠন হিসেবে কমিউনিস্ট লিগ গঠনসূত্রে তাঁরা কমিউনিস্ট ইশতেহার (১৮৪৮) গ্রন্থে একটি দল অর্থে কমিউনিস্ট শব্দটির সূত্রপাত করেন। অক্টোবর বিপ্লবের পর কার্যত কমিউনিস্ট শব্দটি ব্যাপকভাবে প্রচলিত হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকে বলশেভিকদের সঙ্গে অন্যান্য সোসাল ডেমোক্র্যোটদের শব্দটি নিয়ে তীব্র মতবিরোধের ফলে ১৯১৭ সালে থেকে রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টর নামের শেষে বলশেভিক কথাটি যুক্ত হয়। ১৯১৮ সালের মার্চ থেকে পার্টির নামকরণ হয় রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। ১৯৫২ সালে যখন পার্টি কমিউনিস্ট পার্টি অব দ্য সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে পরিবর্তিত হয় তখন বলশেভিক শব্দটি বাদ পড়ে।
১৯১৯ সালের মার্চ মাসে তৃতীয় (কমিউনিস্ট) আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। সেই সময় থেকেই পশ্চিম ইউরোপের সোসাল ডেমোক্রেটিক দলগুলো ক্রমে কমিউনিস্ট নাম ধারণ করে। অন্যান্য দেশেও কমিন্টার্নের বিশ্ববিপ্লবের আন্দোলনের কর্মসূচির ভিত্তিতে ক্রমে ক্রমে কমিউনিস্ট পার্টি গড়ে ওঠে।

১৯১৯ সালের অক্টোবরে রাশিয়ার বাইরে প্রথম কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল মেক্সিকোয় মানবেন্দ্রনাথ রায়ের উদ্যোগে। ওই বছর ডিসেম্বরে প্রতিষ্ঠার পক্ষকালের মধ্যে জার্মান কমিউনিস্ট পার্টির দুই প্রধান নেতা রোজা লুক্সেমবুর্গ ও কার্ল লিবনেকট সরকারি বাহিনীর হাতে নিহত হন। হাঙ্গেরিতে বেলা কুন-এর নেতৃত্বে পার্টি গঠিত হয়, একটি গুপ্ত দল হিসেবে। ১৯২০ সালে বুলগেরিয়া, যুগোস্লাভিয়া, ব্রিটেন, স্পেন, ফ্রান্স এবং তাসখন্দে মানবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে প্রবাসী ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতালিতে গ্রামশির উদ্যোগে পার্টি গঠিত হয় (১৯২১)। একই বছরে চীনে পিকিং বিশ্বদ্যািলয়ের দু'জন অধ্যাপক চেন তু-সিউ এবং লি তা-চাও পার্টি-প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী হয়েছিলেন। উল্লেখ্য যে পূর্ব ইউরোপের সব দেশেই প্রতিষ্ঠার অনতিকাল পরে কমিউনিস্ট পার্টিগুলো বেআইন ঘোষিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তির পর সেগুলো আইনগত অধিকার পায়। কমিন্টার্নের ২১ দফা শর্ত পূরণ সাপেক্ষ বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট পার্টি তার সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার লাভ ক্ষমতা। লেনিনের পার্টি-সংক্রান্ত থিসিসের গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার ওপর গুরত্ব আরোপ করা হতো। শর্তপূরণে সমর্থ না হওয়ায় কোনো কোনো দেশের পার্টির সদস্যপদ চলে যায়। কমিন্টার্নের অধিকাংশ দেশর সদস্য-পার্টিই ছিল সেদিন বেআইনী গুপ্তদল।

কমিন্টার্ন প্রতিষ্ঠার পর থেকে বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলন অল্পবিস্তর তাৎপর্যপূর্ণ পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে অগ্রসর হয়। ইতালিতে কমিউনিস্ট নেতৃত্বে ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ফ্রান্সের শ্রমিক আন্দোলনেও কমিউনিস্টদের ছিল প্রবল প্রভাব। কিন্তু ব্রিটেনে কমিউনিস্ট পার্টি একটি নগণ্য দল হিসেবে পরিগণিত হয়। ব্রিটিশ পার্টির নির্দেশে ভারতীয় কমিউনিস্টদের চিরকাল নীতি নির্ধারিত হত। দুটি যুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে চেকোস্লোভাকিয়ায় পার্টি খুবই শক্তিসম্পন্ন হয়ে ওঠে। ওই সময়ে বুলগেরিয়ায় কমিউনিস্টদের এক বিপ্লব-প্রয়াস ব্যর্থ হয়। স্পেনের গৃহযুদ্ধে ফ্যাসিবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সংখ্যালঘু কমিউনিস্টরা সোভিয়েতের সাহায্যে বামপন্থী সরকারের সঙ্গে সবিশেষ সহায়তা করে। হাঙ্গেরিতে কুড়ির দশকে কমিউনিস্টরা কিছুকাল ক্ষমতাসীন হয়েছিল। লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর কমিন্টার্নে স্তালিন ও ট্রটস্কির বিরোধ এবং পরে স্টালিরে একচ্ছত্র ক্ষমতা ও উগ্র কর্মপন্থা বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট আন্দোলনেও সঞ্চারিত হয়। সোসাল ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে বিরোধসূত্রে জার্মান কমিউনিস্টরা কুড়ির দশকে নাৎসিদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল। কমিন্টার্নের যষ্ঠ কংগ্রেসে (১৯২৮) লেনিনের যুক্তফ্রন্ট নীতি পরিত্যক্ত হয়। ভারতে জাতীয় কংগ্রেস সহ নেহরু-বসু-আয়েঙ্গারের নেতৃত্বে উদীয়মান বামপন্থী আন্দোলনকে নিন্দা জানানো এবং ওয়ার্কার্স অ্যান্ড পেজান্টস পার্টি ভেঙে দেবার নির্দেশ দেওয়া হয় ভারতীয় কমিউনিস্টদের। ত্রিশের দশকের গোড়ায় ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তি উত্তরোত্তর প্রবল হওয়ে ওঠে ও কমিউনিস্ট নিধন শুরু করে। সপ্তম কংগ্রেসে (১৯৩৫) সচকিত কমিন্টার্ন তার পরিত্যক্ত যুক্তফ্রন্ট নীতি পুনর্গ্রহণ করে; সোসাল ডেমোক্র্যাট ও অন্যান্য গণতন্ত্রীদের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির তাৎপর্য অনুধাবনে ব্যর্থতার ফলে, জার্মানি কর্তৃক রুশদেশে অভিযানের পূর্বে ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে অগ্রগামী নাৎসিদের সঙ্গে কমিউনিস্টরা সখ্যতা স্থাপন করেছিলেন ; দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অনেক দেশে জাপানি বাহিনীকে স্বাগত জানানো হয়। অচিরেই ইউরোপে কমিউনিস্টদের ওপর খাঁড়া নেমে আসে। যুগোস্লাভিয়া প্রভৃতি দেশে কমিউনিস্টরা তীব্র প্রতিরোধ গড়ে তোলে। যুদ্ধের পর সোভিয়েত সরকারের সহায়তায় পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশে কমিউনিস্টরা ক্রমে ক্ষমতাসীন হয়। চীন, কোরিয়া, ইন্দোচীনও কমউিনিস্ট বিপ্লব সফল হয়।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বিশ্বের প্রায় এক-চতুর্থাংশ ভূখণ্ডে কমিউনিস্ট শাসন কায়েম হয়। ক্রমে মার্কসীয় তত্ত্ব ও কমিউনিস্ট প্রশাসনের নানাবিধ অসঙ্গতি নিয়ে সারা বিশ্বে বিতর্ক ও বিভেদ দেখা দেয়। ইতালি, ফ্রান্স, জার্মানি প্রভৃতি যেসব দেশে পার্টি ছিল প্রবল, সেগুলোতে মতাদর্শের পরিবর্তন ও কমিউনিস্ট শব্দটিরও বর্জন দেখা দেয়। নব্বইয়ের দশকের গোড়ায় পূর্ব ইউরোপ ও সোভিয়েত দেশে কমিউনিস্ট শাসনের অবসান এবং চীনের ব্যক্তিগত মালিকানায় বাজার অর্থনীতির প্রবর্তন বিশ্বের কমিউনিস্ট আন্দোলনে এক মৌলিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। (সূত্রঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *রাজনীতির অভিধান*, কলকাতা: আনন্দ পাবালশার্স প্রাইভেট লি., ২০১১)।

কমিটি (Committee)

কমিটি বা কার্যনির্বাহক সমিতি হলো আইন-পরিষদের কতিপয় সদস্যকে নিয়ে এই সমিতি গঠিত হয় এবং এর প্রধান কাজ আইন-পরিষদের সম্মুখে কোনো প্রস্তাবিত আইনের খসড়াকে অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ করা ও বিচার করা। প্রায় সকল আইন-পরিষদেই কতগুলো স্থায়ী (standing) কমিটি থাকে। বিশেষ ব্যাপারের জন্য বিশেষ ধরনের (special) সমিতি গঠিত হয়। দুই-কক্ষ বিশিষ্ট আইন-পরিষদের কতিপয় সভ্যকে নিয়ে যে সমিতি গঠিত হয়, তাকে যুক্ত সমিতি (Joint Committee) বলে। আইন-পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ দলসমূহ আনুপাতিক হারে সমিতির সদস্যপদ লাভ করে।

কর্তৃত্ববাদ (Authoritarianism)

যে সরকার ব্যবস্থায় জনগণের নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত নয় এবং যে সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনমতের কোনো তোয়াক্কা করে না, সেটি মূলত কর্তৃত্ববাদী সরকার। এ ব্যবস্থাতে জনমতের প্রাধান্য থাকে না, জনগণের স্বাধীনতা সীমিত আকারে থাকে। কাজেই জনগণের সম্মতিকে প্রাধান্য না দিয়ে ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর কর্তৃত্বে সরকার পরিচালিত হওয়াই কর্তৃতবাদ। কর্তৃত্ববাদীরা মনে করেন যে তাঁদের মনোমতো সুশৃঙ্খল পথে সরকার পরিচালিত হওয়া মঙ্গলজনক। দুটি বিশ্বাস থেকে ধারণাটি গড়ে ওঠে : ১. লোকের কর্তৃত্বাধীন থাকাই কল্যাণকর, এবং ২. কর্তৃত্ব

জনগণের সম্মতিসাপেক্ষ নয়, বরং বলা ভাল যে কর্তৃত্ব সম্মতির পূর্বশর্ত। আরও উগ্র কর্তৃত্ববাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রিক বাধ্যতার যুক্তিসিদ্ধ কোনো উৎস নেই। সেজন্য অসন্তোষের প্রতিকার তথা রাষ্ট্রের সুস্থিতির জন্য কর্তৃত্ববাদের প্রয়োজন থাকে ; প্রচলিত অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের প্রতি আনুগত্যের তাগিদেও কর্তৃত্ববাদ অপরিহার্য বলে তাঁদের অভিমত। উল্লিখিত তাত্ত্বিক প্রত্যয় ছাড়াও অনেক সময়ে ক্ষমতাসীন কায়েমি শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা গোষ্ঠীর আচরণেও কর্তৃত্ববাদ ফুটে ওঠে।

কর্তৃত্ববাদী সরকার (Authoritarian Government)

কর্তৃত্ববাদী সরকার হলো এমন এক সরকারি ব্যবস্থা যেখানে জনগণের নাগরিক অধিকার ও ব্যক্তিস্বাধীনতা স্বীকৃত নয় এবং সরকার সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে জনমতের কোনো তোয়াক্কা করে না, জনগণের অংশগ্রহণের হার নেই বললেই চলে।

কর্পোরেশন (Corporation)

কর্পোরেশন হলো ব্যক্তিগত শিল্প ও আনুষঙ্গিক প্রতিষ্ঠানসমূহের এক সম্মিলিত বিরাটকার সংস্থা। এরূপ সংস্থার আওতায় বিভিন্ন ধরনের শিল্প অর্থাৎ পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন শিল্পপ্রতিষ্ঠান (যেমন, কয়লাখনি, তৈলখনি, জাহাজ কারখানা, অন্যান্য যানবাহন কারখানা, কাপড়ের কল, রসায়ন শিল্প, ঔষধ শিল্প, অন্য কোনো শিল্প ,সংবাদপত্র, ব্যাংক, বীমা, ব্যবসা-প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি) একত্রে মিলিত হয়ে কর্পোরেশন গঠন করতে পারে। উৎপাদন ও বাজারজাতকরণের সকল পর্যায়ে একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাই কর্পোরেশন গঠনের উদ্দেশ্য। শেয়ার বাজারের বিকাশ ও প্রায় সকল ক্ষেত্রে ব্যাংকের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার ফলেই বিশাল কর্পোরেশনসমূহ সৃষ্টি হয়েছে। জাপানের মিৎসুবিশি, হিটাচি প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ।

কর্পোরেট রাষ্ট্র (Corporate State)

কর্পোরেট রাষ্ট্র হলো এমন একটি রাষ্ট্র, যে রাষ্ট্রে সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামোর ভিত্তি হলো বিভিন্ন পেশাভিত্তিক প্রতিষ্ঠান বা কর্পোরেশনসমূহ। এরূপ রাষ্ট্রে জাতীয় অর্থনীতির বিভিন্ন দিকের প্রতিনিধিত্ব করে মালিক ও শ্রমিকদের বিভিন্ন কর্পোরেশন। এরূপ রাষ্ট্রে, পার্লামেন্টের সদস্যরাও এলাকায় জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে আসে না, বরং বিভিন্ন সমিতি ও কর্পোরেশনের প্রতিনিধি হয়ে আসেন। এ ধরনের রাষ্ট্রের প্রবক্তারা দাবি করেন যে, এরূপ ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলাদলি থাকে না এবং ফলে জনগণ বাস্তবতার ভিত্তিতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে। এর প্রবক্তারা আরও দাবি করেন যে, এই ব্যবস্থায় মালিক ও শ্রমিকের দ্বন্দ্ব বহুলাংশে প্রশমিত হয় এবং ফলে জাতীয় উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। পর্তুগাল ও ফ্যাসিবাদী ইতালিতে সর্বপ্রথম অনুরূপ রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এই ব্যবস্থার সমলোচকদের মতে কর্পোরেট রাষ্ট্র আসলে এক ধরনের একনায়কত্বেরই নামান্তর।

কর্পোরেশন, বহুজাতিক (Multi-national Corporation)

যে সকল শিল্প ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানসমূহ বা বিভিন্ন কর্পোরেশনের শাখা-প্রশাখা একাধিক দেশে বিস্তৃত, সে সকল কর্পোরেশনকেই বহুজাতিক কর্পোরেশন বলা হয়। এরূপ কর্পোরেশনসমূহ হলো সাম্রাজ্যবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ের একচেটিয়া বা মনোপলি। এসব কর্পোরেশনের মাধ্যমে নয়া সাম্রাজ্যবাদী দেশসমূহ অন্যান্য দেশে তাদের লগ্নি পুঁজির অনুপ্রবেশ ঘটায় এবং বিভিন্ন দেশের বাজারের ওপর, এমনকি বিশ্ববাজারের ওপর একচেটিয়া প্রভাব খাটানোর প্রয়াস পায়। এসব কর্পোরেশনের মাধ্যমেই চলে নয়া সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং এগুলোর মাধ্যমেই প্রতিযোগীদের বাজার থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। শুধু তাই নয়, এরূপ কর্পোরেশনের মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রভাবও বিস্তার করা হয়। বুটস, বায়ার ইত্যাদি ঔষধ প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, ফোর্ড, টয়োটা ফিয়াট ইত্যাদি মোটর প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান; মিৎসুবিশি, ফিলিপস্ ইত্যাদি ইলেক্ট্রনিক্স সামগ্রী প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান, মিৎসুবিশি, মিৎসুই, হিটাচি, ইউপনিগেট, ইউনিলিভার প্রমুখ সামগ্রী তৈরির প্রতিষ্ঠান ইত্যাদিই হল বহুজাতিক কর্পোরেশনের উদাহরণ।

কলব্যাক (Call Back)

কলব্যাক অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া। সাধারণত যদি কোনো নির্বাচিত গণপ্রতিনিধি জনগণের স্বার্থবিরোধী বা দুষ্কৃতিমূলক কোনো কাজে লিপ্ত হন, তা হলে তাঁর বিরুদ্ধে অনাস্থা দিয়ে তাঁর প্রতিনিধিত্ব প্রত্যাহারের অধিকার যদি সংশ্লিষ্ট জনগণের থাকে, তাহলে সেই অধিকারকেই বলে 'কলব্যাক' করার বা ফিরিয়ে আনার অধিকার।

কলম্বো পরিকল্পনা (Colombo Plan)

১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে ব্রিটিশ কমনওয়েলথভূক্ত রাষ্ট্রসমূহের পররাষ্ট্রমন্ত্রীদের নিয়ে শ্রীলংকার রাজধানী কলম্বোতে এক সম্মেলনে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহের সমন্বিত উন্নয়নের যে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়, সেটাই কলম্বো পরিকল্পনা নামে খ্যাত। যে সমস্ত দেশের উন্নয়ন এই পরিকল্পনার আওতাভূক্ত ছিল, সে সকল দেশ হল; ভারত,বার্মা (বর্তমানে মায়ানমার), শ্রীলংকা, নেপাল, থাইল্যান্ড, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া, ফিলিপিনস, মালয়েশিয়া, সিঙ্গাপুর, ইন্দোনেশিয়া ও বোর্নিও (বর্তমানে বোর্নিও ইন্দোনেশিয়ারই অর্ন্তভূক্ত)। বলাবাহুল্য, পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার প্রায় এক-চতুর্থাংশ এ সকল দেশে বসবাস করে। প্রথমে ছয় বছর (১৯৫১-১৯৫৭) মেয়াদি পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও, পরে তা ১৯৬৬ সাল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এ সকল দেশ বিশ্বের প্রায় ১০০% পাট,১০০% প্রাকৃতিক রাবার, ৪০% চা, ও ৬৬% টিন উৎপাদন করে। কতিপয় কমনওয়েলথ দেশ (কানাডা, যুক্তরাজ্য, ভারত, শ্রীলংকা, অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড) এই পরিকল্পনার আওতাভূক্ত দেশসমূহের গণপ্রশাসন, স্বাস্থ্য, বৈজ্ঞানিক গবেষণা, কৃষি ও শিল্পসংক্রান্ত অগ্রগতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ট্রেনিং ও যন্ত্রপাতি সরবরাহসহ বিভিন্ন প্রকার সহযোগিতা প্রদানের উদ্দেশে 'কারিগরি

সহযোগিতা কাউন্সিল' গঠন করে। এই কাউন্সিলের প্রধান কার্যালয় স্থাপিত হয় কলম্বোয়। কমনওয়েলথভূক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাজ্য এবং আন্তর্জাতিক ব্যাংক এই পরিকল্পনায় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করবে বলেও সাব্যস্ত হয়।

কল্যাণরাষ্ট্র (Welfare State)

কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের ধারণাটি অত্যন্ত ইতিবাচক। যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার শুধু প্রতিরক্ষা, প্রশাসন, আইন, বিচার, মুদ্রা ইত্যাদি সম্পর্কিত রুটিন দায়িত্বই পালন করে না, বরং জনগণের সামাজিক নিরাপত্তার জন্যও পর্যাপ্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করে, সেটি মূলত কল্যাণমূলক রাষ্ট্র। প্রত্যয়টির উৎপত্তি ও সময় সম্পর্কে মতদ্বৈততা থাকলেও ১৯৪২ সালে ব্রিটেনের শ্রমমন্ত্রী লর্ড উইলিয়াম হেনরি বিভারিজের সামাজিক নিরাপত্তা ও অন্যান্য পরিসেবা সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে কল্যাণরাষ্ট্রের প্রসঙ্গ প্রথম দেখা যায়। জার্মানিতে উনিশ শতকের আশির দশকে রাষ্ট্রনায়ক বিসমার্ক কিছু সমাজকল্যাণমূলক আইন প্রবর্তন করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ইউরোপে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রী উভয় প্রকার রাষ্ট্রেই জনস্বাস্থ্য, শিক্ষা, বেকারভাতা ও পেনসন বাবদ সরকারের অর্থ বরাদ্দ হতে শুরু করে। ওইসব বিধিব্যবস্থার বিরোধীদের বক্তব্য ছিল যে সরকারের সে সব ব্যয়নির্বাহ অবৈধ এবং তার জন্য অবৈধভাবে কর আরোপ করা হয় তাতে লোকের আত্মনির্ভরতার অভাব ও দারিদ্র্য বেড়েই চলে। সমাজকল্যাণে ব্যয়নির্বাহের বিকল্প হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রে বেসরকারি বীমা ব্যবস্থারও সমালোচনা করা হয়। পক্ষান্তরে সমাজকল্যাণ ব্যবস্থার সমর্থকেরা মনে করেন যে ওই খাতে সরকারি অর্থবরাদ্দ সামাজিক সুবিচার হিসেবে সরকারের একটি কর্তব্য। বর্তমানে নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি দেশকে যথার্থ কল্যাণরাষ্ট্র বলে বিবেচনা করা হয়।

কসোভো (Kosovo)

কসোভো হচ্ছে যুগোশ্লাভিয়া ফেডারেশনের মূল প্রজাতন্ত্র সার্বিয়ার একটি ক্ষুদ্র প্রদেশ। এর আয়তন ৪,২৩০ বর্গমাইল এবং জনসংখ্যা প্রায় ২০ লক্ষ। এই জনসংখ্যার শতকরা ৯০ ভাগ আলবেনীয় বংশোদ্ভূত মুসলমান এবং বাকী ১০% সার্ব। সার্বরা হচ্ছে খ্রিস্টান অর্থোডক্স। কসোভো আলবেনিয়ার সাথে ভৌগোলিকভাবে স্থলসীমান্ত কর্তৃক সংযুক্ত। ১৯২৬ সালে কসোভো মুসলমান অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও সীমান্ত নির্ধারণ সংক্রান্ত একটি আন্তর্জাতিক কমিশনের সুপারিশের প্রেক্ষিতে আলবেনিয়ার পরিবর্তে সার্বিয়া অন্তর্ভূক্ত হয়। তখন থেকেই মূলত কসোভোর জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয় এবং পর্যায়ক্রমে তারা স্বায়ত্ত্বশাসনের জন্য আন্দোলন করতে থাকে। তাদের এ আন্দোলন তেমন বেগবান না হলেও ১৯৯২ সালে যুগোশ্লাভ ফেডারেশন ভেঙে কয়েকটি নতুন রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলে কসোভোর মুসলিম জনগণও স্বাধীনতার দাবি তোলে। এ প্রেক্ষিতে ১৯৯৬ সালে জংগীবাদী আলবেনিয়রা "কসোভো লিবারেশন আর্মি" নামে একটি সশস্ত্র বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন গড়ে তোলে। ফলে শুরু হয় এ সংগঠনের সাথে

সার্বিয় বাহিনীর সশস্ত্র গৃহযুদ্ধ। এ আন্দোলন বন্ধের নামে সার্বিয়রা ব্যাপক গণহত্যা চালায় বা বিশ্বব্যাপী আলোড়ন ও প্রতিবাদ সৃষ্টি করে। কিন্তু যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট হতে কর্ণপাত না করায় যুক্তরাষ্ট্র ন্যাটো জোটের মাধ্যমে ১৯৯৯ সালের ২৫ মার্চ থেকে কসোভোতে সার্ব বাহিনীর ওপর বিমান হামলা শুরু করে। এতে যুগোশ্লাভ প্রেসিডেন্ট কসোভোকে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করতে সম্মত হয়। সার্বিয়া কসোভো থেকে সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং কসোভো থেকে পার্শ্ববর্তী আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো ও মেসিডোনিয়ায় পালিয়ে যাওয়া শরণার্থীদেরকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ২০০৮ সালের ১৬ ফেব্রুয়ারি কসোভো সরকার স্বাধীনতা ঘোষণা করেছে। এক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র তথা পশ্চিমা নীতির পরিবর্তন হলেও কসোভো এখনও জাতিসংঘের স্বীকৃতি পায় নি।

কসোভো শান্তি চুক্তি (Treaties of Kosovo)

কসোভা থেকে যুগোস্লাভ সৈন্য প্রত্যাহার প্রশ্নে আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা বাহনী এবং যুগোস্লাভ ও সার্ব সরকারের মধ্যে ৯ জুন '৯৯ একটি সামরিক শান্তি চুক্তি সম্পাদিত হয়। কসোভো সংলগ্ন মেসিডোনীয় সীমান্তের অভ্যন্তরে পাঁচ দিন একটানা আলোচনার পর এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। স্বাক্ষরের পরপরই ন্যাটো রাষ্ট্রদূতগণ চুক্তিটি অনুমোদন করেন। এ চুক্তির ফলে সার্ব ও আলবেনীয়দের মধ্যে রক্তক্ষয়ী জাতিগত সংঘর্ষ রোধের লক্ষ্যে সার্ববাহিনীর বিরুদ্ধে ন্যাটোর ৭৮ দিনের বোমা হামলা বন্ধের পথ সুগম হয়। সম্পাদিত শান্তি চুক্তির উল্লেখযোগ্য দিক হলো:

১. চুক্তির ফলে আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীদের কসোভোয় মোতায়েন ও বিনা বাধায় কাজ করার পথ সৃষ্টি হবে;
২. সার্ববাহিনী অবিলম্বে অস্ত্র বিরতি পালন শুরু করবে এবং সার্বিয়ার উত্তরাঞ্চল থেকে দফাওয়ারি সৈন্য প্রত্যাহার শুরু করবে;
৩. ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি জোনের একবারে উত্তরাঞ্চল থেকে সৈন্যরা সরে যাবে এবং ১১ দিনের মধ্যে প্রদেশের সব এলাকা থেকে সৈন্য প্রত্যাহার সম্পন্ন করতে হবে;
৪. কসোভো থেকে চলে যাওয়ার পর সার্বসৈন্যরা প্রদেশটির আশপাশের নিরপেক্ষ এলাকার (বাফার জোন) ৪.৮ কি. মি. থেকে ২৪ কি.মি. এলাকার ভেতর আসতে পারবে না;
৫. ২৪ ঘণ্টার মধ্যে যুগোস্লাভিয়াকে কসোভো থেকে তার জঙ্গী বিমান ঘাঁটিতে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা, রাডার ও ভূমি থেকে আকাশে নিক্ষেপণযোগ্য ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবহার বন্ধ করতে হবে;
৬. সার্ব সৈন্য প্রত্যাহারের পরপরই আন্তর্জাতিক শান্তিরক্ষীরা কসোভো আকাশ পথ ও বাফার জোনের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করবে।

কসোভোর যুদ্ধ (Battle of Kosovo)

কসোভো ইউরোপের মুসলিম অধ্যুষিত একটি জনপদ। আয়তন ১০,৯৬৯ বর্গ কিলোমিটার। লোকসংখ্যা ২০ লাখ। এদের ৯০ ভাগ মুসলমান বাকিরা সার্ব-খ্রিস্টান। কসোভোর মুসলমানরা মার্শাল টিটোর আমল থেকেই স্বায়ত্ত শাসন ভোগ করে আসছে। যেখানে যুগোস্লোভিয়ার অন্য প্রদেশগুলো যুগোস্লাভ ফেডারেশন থেকে বেরিয়ে স্বাধীনতা ভোগ করছে যেখানে কসোভোর মুসলমানদের স্বাধীনতা না দিয়ে বরং শেষ অধিকার স্বায়ত্তশাসনটাও মিলোসেভিচ ছিনিয়ে নেয়। কসোভোর বর্তমান সংকটের শুরু হয় ১৯৯৮ সালের গোড়ার দিকে। যুগোস্লাভ প্রেসিডেন্ট মিলোসেভিচ কসোভোর মুসলমানদের স্বয়ত্তশাসন কেড়ে নেয়ার পরই কসোভো যুদ্ধের পটভূমি সৃষ্টি হয়। স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নেয়ার পর এ নিয়ে অনেক আলাপ-আলোচনা হয়েছে কিন্তু মিলোসেভিচ শুধু কসোভোর সরকারি চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও কলকারখানায় সর্বত্র প্রাধান্য বিস্তারের জন্য জঘন্য অপরাধ চালিয়ে যেতে থাকে। এভাবে সংকটের সমাধানের আর কোনো পথ খোলা রাখেনি মিলোসেভিচ। তখন প্রতিবাদের স্থান দখল করে সশস্ত্র তৎপরতা। মিলোসেভিচ স্বায়ত্তশাসন কেড়ে নেয়ার পর মুসলমানদের কসোভো থেকে নিশ্চিহ্ন করার জন্য বিভিন্নভাবে হামলা শুরু করে। তারপর মুসলমানরা বাধ্য হয়ে অস্ত্র হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে। ১৯৯৮ সালের মার্চ মাসে আত্মপ্রকাশ করে কসোভো লিবারেশন আর্মি (কেএলএ)। কেএলএর মূল দাবি হলো 'আর সার্ব শাসন নয়', চাই কসোভোর স্বাধীনতা'। পুরো কসোভোয় স্বাধীনতার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বর্বর মিলোসেভিচ মুসলমানদের দমনে লেলিয়ে দেয় সার্ব সেনাবাহিনী। অত্যাধুনিক অস্ত্রসজ্জিত সার্ব হানাদার বাহিনী কসোভোর জনপদের পর জনপদ জ্বালিয়ে দেয়। হেলিকপ্টার থেকে নিক্ষেপ করে বোমা। নারী ও শিশুসহ হাজার হাজার মুসলমানকে হত্যা করে। সার্ব বাহিনীর বর্বর নির্যাতনে কসোভোর ২০ লক্ষ মানুষের ১৫ লাখ লোক বাস্তুভিটা ও সহায়সম্বল ছেড়ে পার্শ্ববর্তী দেশ আলবেনিয়া, মন্টিনিগ্রো ও মেসিডোনিয়ায় আশ্রয় নেয়। সার্ব হায়েনারা হাজার হাজার মুসলমান মা-বোনের ইজ্জত-সম্ভ্রম লুট করে। পরে বিশ্ব জনমতের প্রবল বিরোধিতা এবং গণবিক্ষোভের মুখে মিলোসেভিচের পতন ঘটে। বর্তমানে জাতিসংঘ যুদ্ধাপরাধ ট্রাইব্যুনালে তার বিচার চলছে। উল্লেখ্য, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পর পৃথিবীর কোথাও এত বড় বিপর্যয় ঘটেনি।

কান্ট, ইমানুয়েল (Emanual Kante)

ইমানুয়েল কান্ট, (১৭২৪-১৮০৪), জার্মান দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক ও জার্মান ধ্রুপদী ভাববাদের প্রবর্তক। তাঁকে জার্মান আদর্শবাদেরও জনক বলা হয়। প্রাশিয়ার কনিসবার্গ অঞ্চলের অধিবাসী পেশায় অধ্যাপক, শান্ত, সংযত এই মানুষটি সারা জীবন নৈতিকতা, স্বাধীনতা ও সমতার পক্ষে লড়াই করে গেছেন। ফরাসী বিপ্লবের আলো জার্মানিতে ছড়িয়ে পড়ুক, রাষ্ট্রীক ও সামাজিক ক্ষেত্রে উদারতা ও শুভবুদ্ধি জাগ্রত হোক, সমাজ ও মানুষের জীবনে চিরস্থায়ী শান্তি আসুক কান্ট মনে প্রাণে এ কথায় ভাবতেন। কান্টের

দর্শন ভাবনার মূলে ছিল তাঁর স্বতঃস্ফুর্ত জ্ঞান বা অনুভূতি। তাঁর মতে, বস্তুর স্বরূপ মানুষের জ্ঞানের অগম্য। মানুষ শুধু ততটুকুই জানতে পারে , বস্তুর যতটুকু ইন্দ্রিয়ের আওতায় ধরা পড়ে। সত্যিকার তাত্ত্বিক জ্ঞান একমাত্র গণিতশাস্ত্র এবং অন্যান্য প্রকৃতি বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই সম্ভবপর। তাঁর মতে, জগৎ একাধারে সসীম ও অসীম, ধ্রুপদী সত্তা একাধারে অস্তিত্বশীল এবং অস্তিত্বহীন ; অনুরূপভাবে বিশ্বের সকল কিছুই দ্বৈত সত্তাসম্পন্ন। সমাজজীবনের ঐতিহাসিক গতিধারায় বিরোধের ভূমিকা এবং শাশ্বত শান্তির গুরুত্বের প্রশ্নে যে মতবাদ তিনি প্রদান করেন, তার চরিত্র ছিল প্রগতিশীল। তিনি আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও চুক্তির ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাষ্ট্রের পারস্পরিক স্বার্থকে এমন ভাবে বিন্যস্ত করার পক্ষপাতী ছিলেন, যাতে তা স্থায়ী শান্তি সুনিশ্চিত করতে পারে। 'আত্মসত্তাহীন বস্তু'র অলীক তত্ত্বই কান্টের দর্শকে স্ববিরোধিতা, ধারাবাহিকতাহীনতা এবং প্রহেলিকার শিকারে পরিণত করেছে বলে, মার্কসবাদীরা সমালোচনা করেন।

কামাল আতাতুর্ক (Kamal Ataturq)

কামাল আতাতুর্ক পুরো নাম মুস্তাফা কামাল পাশা (১৮৮১-১৯৩৮)। ১৯২৩ সালে তিনি তার সহযোগী ইসমত ইনোনু, খালেদা এদিব প্রমুখের সহায়তার তুর্কি খেলাফতের উচেছদ সাধন করেন এবং প্রজাতন্ত্রী তুরস্ক কায়েম তার প্রথম প্রেসিডেন্টের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত দলের নাম পিপলস রিপাবলিকান পার্টি। তিনি কার্যত একনায়কে পরিণত হন এবং তুরস্ককে পাশ্চাত্য ভারধারায় অভিষিক্ত করেন। তিনি ধর্ম থেকে রাষ্ট্রকে পৃথক, বহুবিবাহ নিষিদ্ধ, মহিলাদের বোরকা ও ঘোমটা এবং পুরুষদের ফেজ টুপি ব্যবহার নিষিদ্ধ, তুর্কিদের পাশ্চাত্য পোশাক পরার নির্দেশ দেন, সামন্তবাদী খেতাবাদির বিলোপসাধন, তুর্কি ভাষার জন্য আরবি হরফ উচ্ছেদ করে ল্যাটিন হরফের প্রবর্তন, শিল্পের বিকাশসাধন, কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, দেশে প্রথম আদমশুমারির ব্যবস্থা এবং বামপন্থি আন্দোলনকে কঠোরভাবে অবদমিত করাসহ তিনি তুরস্কে বহু সংস্কারমূলক কার্য সম্পাদন করে ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত অর্থনীতির প্রবক্তা ছিলেন। তুরস্কের চেহারার আমূল পরিবর্তন করেছিলেন বলেই তাঁকে আতার্তুক বলা হত।

কায়রো ঘোষণা (Kairo Dicleration)

১৯৪৩ সালের ১ ডিসেম্বর চীনের চিয়াং কাইশেক, ব্রিটেনের উইনস্টন চার্চিল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট এর মধ্যে কায়রোয় অনুষ্ঠিত বৈঠকে ঘোষণা করা হয় যে, এই ত্রিশক্তির অন্য কারও এলাকা দখলের কোনো দুরভিসন্ধি নেই। ১৯১৪ সালের পর থেকে জাপান প্রশান্ত মহাসাগরের যে সকল দ্বীপ দখল করেছে, সে সকল দ্বীপ থেকে জাপাকে উচ্ছেদ করতে হবে, জাপান চীনের কাছ থেকে মাঞ্চুরিয়া ফরমোজা ও পেস্কাডোরস ছিনিয়ে নিয়েছে বিধায়, সেসব অঞ্চল চীনকে ফিরিয়ে দিতে হবে,

জাপান কর্তৃক অধিকৃত কোরিয়াকে মুক্ত স্বাধীন দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে এবং শত্রুকে (চক্রীপক্ষকে) বিনাশর্তে আত্মসমর্পণ করতে হবে। এই ঘোষণাই কায়রো ঘোষণা নামে খ্যাত।

কারণ দর্শাও রিট (Writ of Quo Warranto)

কারণ দর্শাও রিট কথাটির অর্থ হলো "by what warrant or authority" অর্থাৎ "কোন্ অধিকারে?" কোনো ব্যক্তি যদি এমন কোনো সরকারি পদ (public office) দাবি করে, যে পদের যোগ্যতা তার নেই অথবা অবৈধভাবে যদি কোনো সরকারি পদ দখল করে বসে থাকে, তাহলে উচ্চতর আদালত যে আদেশের মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তিকে তার পদ দখলের বা দাবির কারণ দর্শানোর নির্দেশ দিয়ে থাকে তাকে কারণ দর্শাও রিট বলে। এই রিটের মাধ্যমে উচ্চতর আদালত উক্তরূপ দাবির বৈধতা অনুসন্ধান করে এবং দাবি বা দখল যদি অবৈধ প্রমাণিত হয় তাহলে আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে পদচ্যুত করার নির্দেশ দিতে পারে।

কারবালার যুদ্ধ (Battle of Karbala)

ইরাকের রাজধানী বাগদাদের উপকণ্ঠে ফোরাত নদীর তীরে কারবালা নামক নগর অবস্থিত। এ কারবালা নামক স্থানে ইতিহাসের সবচেয়ে মর্মান্তিক ও ভয়াবহ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উমাইয়া খলিফা ইয়াজিদ এবং মহানবীর (সা) দৌহিত্র ইমাম হুসাইনের মধ্যে এ যুদ্ধ সংঘটিত হয় ৬৮০ সালে। কুফাবাসীদের আমন্ত্রণক্রমে ইয়াজিদের কূটকৌশল যাচাই না করেই ইমাম হুসাইন (রা) মাত্র ১১ জন সঙ্গী ও নিজ পরিজন নিয়ে কুফা অভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু পথিমধ্যে কারবালা নামক স্থানে ইয়াজিদ বাহিনী তাঁর গতিরোধ করে। ফলে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং যুদ্ধে ইমাম হুসাইন সঙ্গী ও পরিজনসহ শত্রুদের হাতে মর্মান্তিকভাবে প্রাণ হারান। ৬৮০ সালের ১০ অক্টোবর এ মর্মান্তিক হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। ইতিহাসে কারবালা যুদ্ধের ফলাফল ছিল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী। এ যুদ্ধের ফলে মুসলমানদের মধ্যে ইয়াজিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা সৃষ্টি হয়। ইমাম হুসাইন (রা) ইসলামী খিলাফত ব্যবস্থা টিকিয়ে রাখার জন্য জিহাদ করে ইতিহাসে খ্যাতি ও অমরত্ব লাভ করেন।

কার্যত ও আইনত (Defacto & Dejure)

কার্যত ও বাস্তবিক পক্ষে অধিকার বলে হউক বা না হউক, প্রকৃত প্রস্তাবে ঘটে। যে অবস্থা বা ঘটনা বাস্তবে বিদ্যমান রয়েছে, আইন বা অধিকারের ওপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তাকে De facto বা 'কার্যতঃ' বলা হয়। De jure Recognition ঃ আইন-অনুযায়ী স্বীকৃতি দান। কোনো রাষ্ট্র বা সরকারকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী স্বীকার করে এর সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা।

কালো পার্লামেন্ট (Black Parliament)

একটি স্কটিশ পার্লামেন্টকে কালো পার্লামেন্ট বলা হয়। ১৩২৩ সালে স্কোন (Scone) শহরে এ পার্লামেন্ট বসে। পার্লামেন্ট স্যার উইলিয়াম ডি সউলিস (Sir Williasm de Soulis) –এর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে যাঁরা জড়িত ছিলেন তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করে। এজন্যে ইতিহাস এ পার্লামেন্ট কালো পার্লামেন্ট বলে পরিচিতি পায়। ১৫২৯ সালে ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরি যে প্রথম রিফরমেশন পার্লামেন্ট (Reformation Parliament) আহ্বান করেন এটাকেও কালো পার্লামেন্ট বলা হয়। এ পার্লামেন্টে প্রথম কমন্স সভার সদস্যরা লর্ডদের ওপর তাঁদের ক্ষমতার বিস্তৃতি ঘটান। কমন্সরা শক্তিশালী হয়ে উঠতে থাকেন। যাঁরা এ পার্লামেন্টের এসব তৎপরতার বিরুদ্ধে ছিলেন তাঁরা একে কালো পার্লামেন্ট বলে চিহ্নিত করেন।

কাশ্মীর সমস্যার ইতিহাস (History of Kasmir Crisis)

পৃথিবীর স্বর্গ হিসেবে খ্যাত কাশ্মীরে আজ বিরাজ করছে দু:সহ এক নরকীয় পরিবেশ। মানবতার আর্তনাদ, লাশ আর বারুদের পোড়া গন্ধে আকাশ-বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। দক্ষিণ এশীয় শান্তি ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রে যে সমস্যাটি সবচেয়ে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছে তা হচ্ছে কাশ্মীর সমস্যা। ভারত ও পাকিস্তানের সম্পর্ক অবনতির পেছনে অন্যতম প্রধান কারণ হিসেবে কাশ্মীর সমস্যাকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যে চারটি যুদ্ধ (১৯৪৭, ৬৫, ৭১ ও ৯৯ সালে) সংঘটিত হয়েছে তার তিনটিই কাশ্মীর নিয়ে। এ সমস্যা উভয় দেশকেই আস্তে আস্তে নিজেদেরকে দূরে সরিয়ে ফেলছে। উভয় দেশই সীমান্তে সৈন্য ও অস্ত্রের মজুদ বৃদ্ধির প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। উভয় দেশের বাজেটের বিরাট একটি অংশ বরাদ্দ করা হয় সামরিক খাতে যা দেশ দু'টির দারিদ্র হ্রাসে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে। পর্যবেক্ষকগণ এ বিষয় নিয়ে আরও একটি যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার আশঙ্কা করছেন, যার ফলাফল অনেক ভয়াবহ হতে পারে। এ সমস্যার প্রকৃতি বুঝতে পেরে ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু এটাকে Pandora's Box এবং জাতিসংঘের প্রাক্তন মহাসচিব উথান্ট Time Bomb হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন। ১৯৯০ সালের জানুয়ারি থেকে শুরু করে এ পর্যন্ত ৪০ হাজারের অধিক নিরীহ মানুষ প্রাণ হারিয়েছে। নির্যাতন ও ধর্ষণের শিকার হয়েছে হাজার হাজার নারী ও কিশোরী। তাই বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতার স্বার্থে এ সমস্যার সমাধান হওয়া একান্ত কাম্য।

পাকিস্তানি কায়েদে আজম (জাতির জনক) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এর বিখ্যাত দ্বি-জাতি তত্ত্বের ওপর ভিত্তি করে ১৯৪৭ সালের ১৪ ও ১৫ আগস্ট পাকিস্তান ও ভারত নামক দুটি রাষ্ট্রের জন্ম হয়। ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকরা ধর্মের ওপর ভিত্তি করে মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে পাকিস্তান এবং হিন্দু অধ্যুষিত এলাকা নিয়ে হিন্দুস্থান বা ভারত গঠন করলেও মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা কাশ্মীরের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত দেয়নি। কাশ্মীরসহ দেশীয় রাজ্যগুলোকে স্বাধীনতা দেওয়ার পরিবর্তে তাদের

ইচ্ছানুয়ায়ী ভারত অথবা পাকিস্তানের সাথে অন্তর্ভূক্ত হওয়ার বিধান রাখা হয়েছিল। এ ব্যবস্থা অনুযায়ী অধিকাংশ রাজ্য ভারতের সাথে এবং কিছু কিছু পাকিস্তানের সাথে অঙ্গীভূত হয়। কিন্তু কাশ্মীরের তৎকালীন হিন্দু রাজা (গলাবসিং এর বংশধর) হরিসিং কাশ্মীরকে একটি নিরপেক্ষ স্বায়ত্বশাসিত রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে চেয়ে নেহেরু ও জিন্নাহ উভয়ের বিরাগভাজন হন। ভারত ও পাকিস্তান উভয় রাষ্ট্রই কাশ্মীরকে তাদের সাথে একীভূত হওয়ার জন্য মনস্তাত্ত্বিক চাপের মধ্যে রাখে।

কাশ্মীরের জনগণের নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য যেমন— খাদ্য সামগ্রী, লবণ, কেরোসিন, পেট্রোল, ভোজ্য তেল ইত্যাদি পূর্ব থেকেই পাকিস্তান থেকে সরবরাহ করা হত। কিন্তু পাকিস্তান হঠাৎ করে এরূপ জরুরি প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি কাশ্মীরে সরবরাহ বন্ধ করে দেয় এবং পাকিস্তানের সাথে একীভূত হওয়ার জন্য চাপ দিতে থাকে। এমতাবস্থায় মহারাজা বিপর্যয়ের মধ্যে পড়তে থাকে। বিপর্যয় কেটে ওঠার জন্য মহারাজা আস্তে আস্তে ভারতের সাথে অন্তর্ভূক্তির দিকে আগাতে থাকে। ১৯৪৭ সালের আগস্ট ও সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীরের ইসলামী জাতীয়বাদী দলগুলো পাকিস্তানের সহায়তায় হিন্দু রাজা হরিসিং এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করলে হিন্দু মহারাজা ভারত বন্ধু নামে কথিত শেখ আব্দুল্লাহর পরামর্শে ভারতের সামরিক সাহায্য কামনা করে। ভারত কাশ্মীরকে ভারতের সাথে একীভূত হওয়ার শর্তে সামরিক সাহায্য প্রদানে রাজী হয়। ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে ২৪-২৭ অক্টোবর ভারত পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়। যুদ্ধে ভারত কাশ্মীরের দুই-তৃতীয়াংশ (জম্মু কাশ্মীর) দখল করে এবং পাকিস্তানের নিয়ন্ত্রণে আসে এক-তৃতীয়াংশ (আজাদ কাশ্মীর বা মুক্ত কাশ্মীর)। ১৯৪৮ সালের ১৭ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ পাক-ভারত বিরোধ নিরসনের প্রচেষ্টাস্বরূপ এক প্রস্তাব পাশ করে। এর তিন দিন পরে জানুয়ারির ২০ তারিখে ভারত ও পাকিস্তানের জন্য জাতিসংঘ কমিশন সৃষ্টি করে এবং যুদ্ধ বিরতির জন্য জাতিসংঘ বাহিনী গঠন করে। কিন্তু জাতিসংঘ বাহিনী গঠনে দীর্ঘ সময় নেয় এবং ১৯৪৯ সালের ১ জানুয়ারি যুদ্ধ বিরতি কার্যকর হয় এবং সেখানে জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী মোতায়েন করা হয়।

১৯৪৮ সালের ১৩ আগস্ট জাতিসংঘ ৪৭ নং প্রস্তাব এবং ১৯৪৯ সালের ৫ জানুয়ারি জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে গঠিত শান্তি কমিশনের প্রস্তাবে ভারত ও পাকিস্তান উভয়ই কাশ্মীরের ভবিষ্যত কাশ্মীরের জনগণের মতামতের ওপর নির্ভর করবে বলে মেনে নিতে সম্মত হয়। কিন্তু ভারত কাশ্মীরী জনগণের মতামতকে উপেক্ষা করে ১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারা মোতাবেক কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং ৩৭০ নং ধারা মোতাবেক এ অঞ্চলকে কেন্দ্র শাসিত প্রদেশে পরিণত করে সেখানে ভারতীয় সেনাবাহিনী মোতায়েন করে। স্বভাবত: কারণেই পাকিস্তান কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতের এ ভূমিকাকে মেনে নিতে পারেনি। ১৯৫৪ সালে পাকিস্তান পাশ্চাত্য সামরিক জোটে যোগ দিলে ইঙ্গ-মার্কিন শক্তির পাকিস্তান প্রীতি বেড়ে যায়।

১৯৫৫ সালে ভারত সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে মৈত্রী চুক্তি পর নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর প্রসঙ্গে ভারত-বিরোধী প্রস্তাব উঠলেই সোভিয়েত ইউনিয়ন তাতে একতরফাভাবে ভেটো দিত। সে কারণে ১৯৫২ ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তান কাশ্মীর বিতর্ক জাতিসংঘে তুললে, সোভিয়েত ইউনিয়ন এর বিরোধিতা করে। ১৯৬৪ সালে পাকিস্তান পুনরায় নিরাপত্তা পরিষদে কাশ্মীর সমস্যা উত্থাপন করলে সোভিয়েত ইউনিয়ন কাশ্মীর প্রশ্নে ভারতকে শুধু সমর্থনই করেনি বরং কাশ্মীরকে ভারতের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ যা কাশ্মীরের জনগণ কর্তৃক নির্ধারিত হয়েছে বলে বর্ণনা করে।

কাশ্মীরকে কেন্দ্র করেই শুরু হয় ১৯৬৫ সালের পাক ভারত ২য় যুদ্ধ। সামরিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এ অঞ্চলটির অধিকার ভোগ করতে দুটি দেশই এক ইঞ্চি পরিমান জমি ছাড়তে নারাজ। তৎকালীন পাক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলফিকার আলী ভুট্টোর পরামর্শে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের নির্দেশে পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশ ও ভারতের গুজরাটের সীমান্তবর্তী "রান অব কচ্ছ" এর জলাভূমিতে পাকিস্তানের একটি ছোট্ট বিতর্কিত এলাকার মালিকানা নিয়ে পাক সেনাবাহিনী শক্তি প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় এবং এলাকাটি অনায়াসে দখল করে নেয়।

ভারত অধিকৃত কাশ্মীরে পাক-হস্তক্ষেপ বন্ধ করার উদ্দেশে ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বর কাশ্মীর ও লাদাখের যোগাযোগ পথের ওপর কারগিল ঘাঁটি থেকে আক্রমণ করে ১৭ দিন ব্যাপী দ্বিতীয় পাক ভারত যুদ্ধের সূত্রপাত ঘটায়। যুদ্ধে ভারত পাকিস্তানের কারগিলের দু'টি ঘাঁটি দখল করে নেয়। এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধানমন্ত্রী আলেক্সো কোসিগানের আমন্ত্রণ ও মধ্যস্থতায় পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর মধ্যে শান্তিপূর্ণভাবে দুদেশের মধ্যকার বিরোধ নিষ্পত্তিকল্পে উজবেকিস্তানের রাজধানী তাসখন্দে এক শীর্ষ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা শেষে ১৯৬৫ সালের ১০ জানুয়ারি উভয় দেশের মধ্যে যুদ্ধ বিরতির একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা "তাসখন্দ চুক্তি" নামে পরিচিত।

এ চুক্তি অনুসারে উভয় রাষ্ট্র ১৯৬৬ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি উভয় পক্ষের সেনাবাহিনী আগের নির্ধারিত সীমানায় ফিরে নিয়ে যায় এবং অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ না করে পারস্পরিক স্বার্থের খাতিরে চুক্তি অনুসারে ভারত তার অধিকৃত কারগিলের দুটি ঘাঁটি পাকিস্তানকে ফেরত দেয়। কাশ্মীর সমস্যা নিয়ে পাক ভারত তৃতীয় যুদ্ধ সংঘটিত হয় ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়। এ যুদ্ধে পাকিস্তানি বাহিনী শুধুমাত্র বাংলাদেশেই পর্যদুস্ত হয়নি। পশ্চিম সীমান্তেও পর্যদুস্ত হয়।

১৯৭১ সালের যুদ্ধে পাকিস্তান হেরে যায় ৬ ডিসেম্বর ভারত স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয় এবং পাকিস্তানের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা অর্জন করে। অপরদিকে ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী স্পষ্ট জানান পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে ভারত কখনও স্বীকার করেনা এবং তিনি পাক অধিকৃত কাশ্মীরকে দখলমুক্ত করার চেষ্টা চালান। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র হুঁশিয়ার করে

দেয় যে, ভারত যদি কাশ্মীরকে মুক্ত করতে চায় তবে মার্কিন নৌবাহিনী ভারতের ওপর পাল্টা আঘাত হানবে। কারণ, ভারত সোভিয়েত ইউনিয়নের দিকে ঝুঁকলে দক্ষিণ এশিয়ার সামরিক ক্ষমতা বজায় রাখতে যুক্তরাষ্ট্র পাকিস্তানের দিকে বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। সাবেক সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী কোসিগানের পরামর্শে ইন্দিরা গান্ধী তার ইচ্ছা পরিত্যাগ করেন। তারপর ১৯৭২ সালে পুরীতে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে যাবতীয় ভুল বুঝাবুঝি, বিবাদ দূর করার জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই ভারত ও পাকিস্তানের পক্ষে আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় যা ঐতিহাসিক "সিমলা চুক্তি" নামে পরিচিত। ভারতের পক্ষে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী ও পাকিস্তানের পক্ষে জুলফিকার আলী ভুট্টো এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। ঐতিহাসিক সিমলা চুক্তিতে বলা হয়েছিল "ভারত ও পাকিস্তান সরকার সংঘর্ষের ঘটনা, যা উভয় দেশের মধ্যে এতকালের সম্পর্কের বৈশিষ্ট্য, তার অবসান করে, সদিচ্ছা, সহযোগিতা, সম্পর্কের উন্নয়ন এবং স্থায়ী শান্তিপূর্ণ দ্বিপাক্ষিক আপোষ আলোচনার পদ্ধতিতে বা উভয়দের ঐক্যমত হলে অন্য কেনো শান্তিপূর্ণ পন্থায় মতোনৈক্যের অবসান করবে। চুক্তি স্বাক্ষরের দু'যুগ অতিবাহিত হলেও দুটি দেশের মধ্যে সম্পর্কের তিক্ততার অবসান আজও ঘটেনি। ১৯৮০ সাল পর্যন্ত কাশ্মীর সমস্যা কিছুটা স্তিমিত থাকলেও ৯০ এর দশকে কাশ্মীর পরিস্থিতি অহিংস রূপ ধারণ করে। ১৯৯২ সালের মার্চ মাসে স্বাধীনতাকামী কাশ্মীরবাসী একটি লং মার্চের আয়োজন করে সীমান্ত অতিক্রম করলে পাকসেনার গুলিতে কয়েকজন কাশ্মীরী মারা যায়। এবং তখন থেকে পাক-ভারত উত্তেজনা দেখা দেয়। ১৯৯৩ সালের ১৪ অক্টোবর শ্রীনগরের বাল মসজিদের জঙ্গী কাশ্মীরীরা আগমন করলে ১৫ অক্টোবর ১০ হাজার ভারতীয় সৈন্য সেটি ঘিরে ফেলে এবং তাদের ভীতি প্রদর্শন করে আত্মসমর্পন করতে বাধ্য করে। জম্মু ও কাশ্মীরের কারগিল ও দ্রাস সেক্টরকে কেন্দ্র করে ভারত পাকিস্তান চতুর্থ যুদ্ধ সংগঠিত হয় ১৯৯৯ সালের ৬ মে থেকে ৫ জুলাই পর্যন্ত যা কারগিল যুদ্ধ নামে পরিচিত। এ যুদ্ধে ভারতের সশস্ত্র বাহিনীর প্রায় ৩০০ জন অফিসার ও জওয়ান প্রাণ হারায় এবং আহত হয় প্রায় ৫০০ জন।

ভারতীয় কর্তৃপক্ষের মতে, পাকিস্তানের পক্ষে হতাহতের সংখ্যা দ্বিগুণের বেশি। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনান ২৫ মে, ১৯৯৯ এ সংঘর্ষ সম্পর্কে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেন। ২৭ মে, ১৯৯৯ কমনওয়েলথ মহাসচিবও একইভাবে উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এবং উভয় পক্ষকে আলোচনার মাধ্যমে কাশ্মীর সমস্যার সমাধান করতে বলেছেন। কাশ্মীরে নিয়ন্ত্রণ রেখার মাধ্যমে প্রথম পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকা খোলাখুলির কারগিল যুদ্ধে ভারতের অবস্থানকে সমর্থন করেছে। গত ৫৩ বছরে ভারত পাকিস্তান সংঘর্ষে ১৯৯৯ সালে বিশ্বের প্রধান দেশগুলো ভারতের অবস্থান সঠিক বলেছে। এবং ৭২ এর সিমলা চুক্তির সময় চূড়ান্তভাবে নির্ধারিত নিয়ন্ত্রণ রেখা মেনে নেওয়ার জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করে। ১৯৯৯ সালের ৫ জুলাই ওয়াশিংটনে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও পাকিস্তানের সাবেক প্রধানমন্ত্রী নওয়াজ

শরীফের সঙ্গে যুদ্ধ নিয়ে তিন ঘণ্টা আলোচনা হয় এবং এক ধরনের চাপের মাধ্যমে পাকিস্তানকে এ যুদ্ধ বন্ধ করতে বাধ্য করানো হয়, যা ভারতের জন্য একটি বড় ধরনের সাফল্য হিসেবে বিবেচিত। এভাবেই কাশ্মীর সংকট শুরু কিন্তু আজও এর ফলপ্রসু কোনো সমাধান হয়নি।

কিচেন কেবিনেট (Kitchen Cabinet)

রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানের অনানুষ্ঠানিক উপদেষ্টমণ্ডলী। মন্ত্রী পরিষদের সদস্য কিংবা সরকারি কোনো আনুষ্ঠানিক পদাধিকারী নন এমন ব্যক্তিরাও কখনো সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধানকে সরকারি ও রাষ্ট্রীয় কাজে পরামর্শ দিনে পারেন। এ ধরনের উপদেশ বা পরামর্শদাতাদের সম্মিলিতভাবে কিনে কেবিনেটের সদস্য বলে। 'কিচেন' শব্দটি তাচ্ছিল্য অর্থে ব্যবহৃত হয়। এরা প্রকাশ্য ও আনুষ্ঠানিকভাবে নন এবং বরং অনানুষ্ঠানিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্কের কারণে নির্বাহী প্রধানের কাছাকাছি আসেন।

যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে 'কিচেন কেবিনেট' কথাটির বহুল পরিচিত। প্রেসিডেন্ট এ্যান্ড্রু জ্যাকসন (১৭৬৭-১৮৪৫)-এর কিছু উপদেষ্টাকে বুঝাতে প্রথম কথাটি ব্যবহৃত হয়। জ্যাকসন ১৮২৯-১৮৩৭ পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। জ্যাকসনের শাসনামলে 'প্রেসিডেন্টের কেবিনেট' কার্যত গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। তিনি কিছু ব্যক্তিগত উপদেষ্টা ও পরামর্শদাতার ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। এঁদের বুঝাতে ব্যাঙ্গার্থে 'কিচেন কেবিনেট' কথাটি ব্যবহার করা হতো। তাঁরা হোয়াইট হাউজে মন্ত্রীদের জন্যে নির্ধারিত কক্ষে বসতেন না। 'কিচেন' বলে তাঁরা যে তত সম্মানিত ছিলেন না বুঝাতে হতো। (সূত্র: জালাল ফিরোজ, ঢাকা: *পার্লামেন্টোরি শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

কুর্দি সমস্যা (Kordy Crisis)

সহস্র বছরের প্রাচীন জাতি কুর্দি ইরানের জাগ্রোস পর্বতমালা থেকে শুরু করে ইরাক এবং সিরিয়া সীমান্ত ধরে তুরস্ক পর্যন্ত পাহাড় পর্বত ও এটার পাদদেশে বর্তমানে প্রায় ২ কোটি কুর্দি বসবাস করে। ঐতিহাসিকদের মতে কুর্দিরা প্রথম ওসমানীয় সাম্রাজ্য হতে স্বায়ত্তশাসন লাভের জন্য আন্দোলন চালিয়ে আসছিল। সেই সূত্র ধরে ১৯২০ সালে ১৯২৫ সালে আন্দোলন করে এবং ১৯৪৬ সালে রাশিয়ার পৃষ্ঠপোষকতায় ইরাকে ১টি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রসত্তা প্রতিষ্ঠা করে। পরে সোভিয়েত রাশিয়া সমর্থন প্রত্যাহার করলে ইরাক সামরিক হস্তক্ষেপের ফলে এর বিলুপ্তি ঘটায়। পরবর্তীতে ১৯৬১ সালে ইরাকের বিরুদ্ধে কুর্দীদের সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু হয়। ১৯৭০ সালে ইরাকের ক্ষমতাসীন পার্টি তাদের স্বায়ত্ত্বশাসন প্রদান করতে চাইলে বিদ্রোহ কিছুটা স্তিমিত হয় কিন্তু সে চুক্তি ভঙ্গ হয়। ১৯৭৪-৭৫ সালে শাহ-এর সমর্থন দিলে তারা ইরাকে আরবিল সুলাইমানিয়া এবং কারফুক শহর দখল করে নেয়। পরবর্তীতে সাদ্দাম হোসেন তার পূর্ণশক্তি নিয়োগ করে তাদের পরাজিত করে। ১৯৯১ সালে কুর্দীদের সাথে সমঝোতার মাধ্যমে তাদেরকে তাদরে নিজ নিজ বাড়িতে আসার আহ্বান জানানো হয় এবং এ প্রেক্ষিতে সেখানে

সহিংসতা হ্রাস পেয়েছে। বর্তমানে কুর্দিরা ইরাকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার।

কূটনীতি (Diplomacy)

বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক স্বার্থে সাহায্য ও সহযোগিতার সম্পর্ক রক্ষা করার প্রক্রিয়াটি মূলত কূটনীতি। কোনো দেশের সরকার নিজেদের দেশের স্বার্থে অন্য দেশের সরকারের সঙ্গে যেসব রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামরিক ও অন্যান্য তৎপরতা চালায়, সেগুলোও কূটনীতি। যেমনঃ ডলার কূটনীতি, পিংপং কূটনীতি ইত্যাদি। জোট গঠন ও জোটের স্বার্থে পরিচালিত তৎপরতাও কূটনীতির আওতায় পড়ে। কূটনীতির সঙ্গে পররাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক নিবিড়। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা, অর্থনৈতিক উন্নতি ও অন্যান্য প্রয়োজনে প্রতিটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে বৈদেশিক নীতি প্রণয়ন করে। কূটনীতির মাধ্যমে সেই নীতি কার্যকর হয়। প্রাচীন গ্রিসের বিভিন্ন নগররাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক বিরাজ ক্ষমতা। প্রয়োজনে সেইসব নগররাষ্ট্রের মধ্যে দূত বিনিময় হত। প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতেও দূত বিনিময়ের রীতিনীতি প্রচলিত ছিল। পঞ্চদশ শতক থেকে বিভিন্ন রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রে দূতাবাস স্থাপন শুরু করে। কংগ্রেস অব ভিয়েনা চুক্তি অনুযায়ী পারস্পরিক আচরণ বিধি ও সুযোগসুবিধা-দানের নিয়মাবলি প্রবর্তিত হয়। কূটনৈতিক ধারায় প্রচলিত সুযোগসুবিধাগুলো হলো দূতাবাসে ধর্মানুষ্ঠান পালনের অধিকার, স্থানীয় পুলিশের এখতিয়ারভুক্ত না হওয়া, স্থানীয় প্রশাসন ও কর ধার্যের আওতায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়া ইত্যাদি সুবিধা দূতাবাসসমূহ ভোগ করে। অবশ্য উক্ত কূটনৈতিক দায়মুক্তি সম্পর্কে বিতর্ক দেখা যায়।

দুটি দেশের মধ্যে শান্তিপূর্ণ উপায়ে এবং আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ ব্যতিরেকে বিবাদ ও বিরোধের মীমাংসাই হলো কূটনীতির প্রধান কাজ। আন্তর্জাতিক সালিশি নিয়ম প্রযুক্ত হলে কূটনীতির দায়দায়িত্ব হ্রাস পায়। অপর রাষ্ট্রকে আন্তর্জাতিক আইন অনুসরণে প্রবৃত্ত করা কূটনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। বর্তমানকালে নানা ধরনের আন্তর্জাতিক সম্মেলনের সাহায্যে এবং রাষ্ট্রনায়কেরা স্বয়ং মিলিত হয়ে আলাপ আলোচনার মধ্যে দিয়ে কূটনীতির কার্যনির্বাহ করেন।

কৃষক-প্রজা পার্টি (Krishak Proja Party)

কৃষক-প্রজা পার্টি ব্রিটিশ আমলের যুক্তবাংলার রাজনীতিতে একটি অন্যতম রাজনৈতিক সংগঠন। দলটি গঠিত হয় ১৯২৮ সালে। অবশ্য ইতিহাসে পাওয়া যায়, ১৯৩৬ সালে কৃষক সমিতির ঢাকা অধিবেশনেই এ সমিতির নতুন নামকরণ করা হয় 'কৃষক-প্রজা পার্টি। বাংলার অন্যতম জনদরদী নেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক ছিলেন দেশের অন্যতম পুরোধা। তখন সারা বাংলার কৃষক-প্রজা পার্টি ছিল একটি অন্যতম জনপ্রিয় রাজনৈতিক দল। ইংরেজ আমলে জমিদারদের স্বার্থ কিংবা প্রজাদের স্বত্ব নিয়ে যে রাজনৈতিক বিরোধ দেখা দেয় তাতে কৃষক-প্রজা পার্টি প্রজাদের স্বার্থ সংরক্ষণের

একটি রাজনৈতিক প্লাটফর্ম হিসেবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৩৭ সালে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার নির্বাচনের কৃষক-প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। এ নির্বাচনের দলটির নির্বাচনী ইশতেহারের মুল বিষয়গুলো ছিল: বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ, মহাজনি সুদের কারবার নিয়ন্ত্রণ, ঋণ সালিশী বোর্ড গঠন করে কৃষকদের ঋণমুক্ত করা, বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষা চালু করা, প্রদেশে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা, মন্ত্রীদের বেতন এক হাজার টাকা নিচে নির্ধারণ।

এ নির্বাচনের কৃষক-প্রজা পার্টি ২১৩ টি আসনের মধ্যে ৩৫ টি আসন পায় এবং এককে ফজলুল হকের নেতৃত্বে প্রাদেশিক মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। তারপর ১৯৪৬ সালের প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচনেও কৃষক-প্রজা পার্টি অংশগ্রহণ করে। তখন এ দলে মাত্র ৫ জন সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৫৪ সালে যুক্তফ্রন্টের একটি শরীক দল হিসেবে নির্বাচন করে কৃষক-প্রজা পার্টি ৩০৯ টি আসনের মধ্যে ৪৮ টি আসন পায় এ কে ফজলুল হক বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হন। তার নেতৃত্বে গঠিত হয় দ্বিতীয় মন্ত্রিসভা। তবে তার এ মন্ত্রিসভা মাত্র ১৫ দিন স্থায়ী হয়। কেন্দ্রীয় সরকার অগণতান্ত্রিকভাবে ফজলুল হকের মন্ত্রিসভা ভেঙে দিলে তখন থেকে পাকিস্তানের ভাঙনের সুর বেজে উঠে, যার পরিসমাপ্তি ঘটে ১৯৭১ সালে। পাকিস্তানের দীর্ঘদিনের সামরিক শাসন ও এককে ফজলুল হকের অন্তর্ধানের সাথে সাথে কৃষক-প্রজা পার্টিও তার অস্তিত্ব হারায়।

কেজিবি (KGB)

সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের আন্তর্জাতিক গোয়েন্দা সংস্থা কেজিবি। পুরো নাম 'কোমিতেত গোসুদরস্তভেন্নোই বেজোপাস্তনোস্তি' অর্থাৎ 'সোভিয়েত কমিটি অব স্টেট সিকিউরিটি' বা 'সোভিয়েত রাজ্য নিরাপত্তা সমিতি'। ষোড়শ শতক থেকে তৎপর 'রাশিয়ান ইনটেলিজেন্স' সংগঠনের ধাঁচে এই গোয়েন্দা সংস্থার জন্ম হয় রাশিয়ার বলশেভিক বিপ্লবের পর ১৯১৭ সালে। তখন এর নাম ছিল 'চেকা' চেকার প্রধান ছিলেন পোল্যান্ডে জন্মগ্রহণকারী রাশিয়ার প্রথম সাম্যবাদী গোয়েন্দা ফেলিক্স জেরঝিনসকি কেজিবি'র গোয়েন্দারা এখনো নিজেদের 'চেকিস্ক' বলে গর্ব করে। ১৯২২ সালে চেকার নাম বদলে জিপিইউ করা হয়। কিছুদিন পর একে ওজিপিইউ বলা হতে থাকে। যার অর্থ দাঁড়ায় 'রাজ্যের রাজনৈতিক প্রশাসন'। ১৯৩৪ সালে একে এনকেবিডি বলা হয়। ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এ গুপ্ত এজেন্সিকে কেজিবি নামে অবহিত করা হয়। এর সদর দপ্তর অবস্থিত মস্কোর জেরঝিনস্কি স্কোয়ারে। বিশ শতকের নব্বই দশকের এক হিসাব অনুসারে কেজিবি'তে কর্মরত লোকের সংখ্যা প্রায় দু'লাখ। শোনা যায়, রাশিয়ার বাইরে অ-রুশ কর্মীর সংখ্যা সাড়ে সাত লাখেরও বেশি। কেজিবি'র মূল দায়িত্ব দেশের অভ্যন্তরে নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং মিলিটারি শাখা জিআরইউ'র সঙ্গে সমন্বিতভাবে গোটা বিশ্বে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করা।

পরবর্তীতে কেজিবি একটি স্পর্শ (Smersh) নামক হত্যাকারীদের সংস্থাও স্থাপন করেছিল। এর অর্থ হলো 'বিশ্বাসঘাতক গোয়েন্দাদের মৃত্যু'। এ সংগঠনের কাজ ছিল,

যে সকল গোয়েন্দাদের ওপর সন্দেহ হত যে তারা শত্রুদের হাতে হাত মিলিয়েছে তাদের হত্যা করে নিশ্চিহ্ন করে দেয়া। ১৯৪৬ সালে স্পর্শ'কে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সেই জায়গায় 'ডিপার্টমেন্ট ফাইভ' নামক এজেন্সি খোলা হয় যা স্পর্শ-এর মতোই হত্যাকাণ্ড ঘটাত। কেজিবি'কে সাহায্য করার জন্য জিআরইউ বা সোভিয়েত ফৌজী সিক্রেট সার্ভিস নামে একটি মিলিটারি গুপ্ত সংগঠনও আছে। যার কার্যালয় ১৯ নামেনসকি স্ট্রিট মস্কোয় অবস্থিত। আমেরিকা থেকে অ্যাটম বোমার রহস্য চুরি করে রাশিয়ায় নিয়ে আসার কাজ জিআরইউ-এরই ছিল। রুডোল্ফ এবেল এ কোনোন মেলোডির মতো বিখ্যাত গোয়েন্দা জিআরইউ-এরই দান। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী ক্লার্ডস ফুশ আর রোসেনবর্গ দম্পতিকে বিশ্বাসঘাতকতা করতে বাধ্য করা আর অ্যাটম বোমের রহস্য জেনে নেয়া জিআরইউ-এরই সাহসিক কার্য ছিল।

কেন্দ্রিকতাবাদ (Centralism)

কেন্দ্রিকতাবাদ একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া বিকেন্দ্রীকরণের বিপরীত। যে প্রক্রিয়ায় সমগ্র দেশ শাসিত হয় একটিমাত্র কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ও ক্ষমতা মোতাবেক। কেননা, বিকেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় দেশের এক একটি অঞ্চল বা প্রদেশের কমবেশি স্বায়ত্তশাসন ক্ষমতা থাকে, যা কেন্দ্রিক প্রক্রিয়ায় থাকে না। রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল, উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রিকতার নীতি অনুসরণের ঝোঁক প্রায়শই লক্ষ্য করা যায়।

কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক (Central Reserve Bank)

যে ব্যাংক সমগ্র দেশের মুদ্রা কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করে (বিশেষত যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায়) সেই ব্যাংককে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলে। কেন্দ্রীয় সরকার এই ব্যাংকের মাধ্যমে দেশের সমগ্র প্রচলিত মুদ্রা কেন্দ্রীভূত করে শিল্প ব্যবসায়ে লগ্নি, ঋণ, কারেন্সি সরবরাহ ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করে। এই রিজার্ভ ব্যাংকের হাতে মুদ্রাসংক্রান্ত প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত থাকে, যাতে এই ব্যাংক দেশের অন্যান্য ব্যাংকের কার্যাদি, লেনদেন, লগ্নি ইত্যাদি তদারক করতে পারে। অন্যান্য ব্যাংক, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংকের নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকে। ১৯১৫ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম এই রিজার্ভ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে অধিকাংশ দেশেই কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক রয়েছে। বস্তুত, কেন্দ্রীয় রিজার্ভ ব্যাংক হচ্ছে ব্যাংকসমূহের ব্যাংক।

কেয়ার (CARE)

CARE-এর পূর্ণরূপ Co-operative American Relief Everywhere. এটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা। এর সদর দপ্তর যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত।

কেয়ার পুরস্কার (CARE Prize)

বিশ্বের সবচেয়ে বড় বেসরকারি ত্রাণ ও উন্নয়ন সংস্থা কেয়ার (CARE- Co-operative American Relief Every Where)। উন্নয়নশীল বিশ্বে জীবনের মান উন্নয়নে যে সকল ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রাখেন তাদের এই পুরস্কার দেয়া হয়। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা বিশিষ্ট অর্থনীতিবদ ড. মুহাম্মদ ইউনূসও এ পুরস্কারে ভূষিত হন।

কোকাকোলা সংস্কৃতি (Cocacola Culture)

কোকাকোলা নামক এই হালকা পানীয়ের আবিষ্কার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হয়। আবিষ্কারের পরপরই এই পানীয় সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে এবং তরুণ সমাজের মধ্যে বিশেষভাবে আকর্ষণ সৃষ্টি করে। অনুরূপভাবে, হালকা মেজাজের পপ জাতীয় সংগীত, চা চা জাতীয় নৃত্য, হিপ্পি জীবনপদ্ধতি, মারিজুয়ানা হাসিস ইত্যাদি মাদক দ্রব্যের আসক্তি বিশ্বের বিভিন্ন দেশের যুব সমাজকে, বিশেষত হতাশাগ্রস্থ যুবসমাজকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করে। বলাবাহুল্য, এসব জিনিস মানুষের চেতনাকে জীবন ও সমাজের গভীরতর দিক থেকে ফিরিয়ে রাখে, জীবন সংগ্রামকে ভোঁতা করে দেয় এবং হালকা মেজাজ ও উদ্দেশ্যহীনতার আবর্তে মানুষকে আচ্ছন্ন করে তোলে। এরূপ আচ্ছন্ন মানুষেরা, বিশেষত তরুণরা অন্যায় বৈষম্য শোষণ ইত্যাদির বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে বিরত থাকে। হালকা ও উদ্দেশ্যহীন এই মানসিকতা, জীবনপদ্ধতি ও মূল্যবোধের সংস্কৃতিকে কোকাকোলা সংস্কৃতি বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

কোয়ালিশন সরকার (Coalition Government)

দুই বা ততোধিক রাজনৈতিক দল মিলিত হয়ে যে সরকার গঠন করা হয়, তাই কোয়ালিশন সরকার। কোয়ালিশন অর্থ অনেক সংস্থা বা অংশের একত্রিতকরণ। কোয়ালিশন বলতে অস্থায়ীভাবে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি বা রাষ্ট্রের মধ্যে ঐক্যকেও বোঝায়। যুদ্ধের সময় একটি রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে অন্য একাধিক রাষ্ট্রের কোয়ালিশন হয়। সাধারণত কোনো জরুরি পরিস্থিতিতে কিংবা পার্লামেন্টে কোনো দলের একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না থাকলে, এরূপ সরকার গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। কোয়ালিশন সরকার হলো বিভিন্ন দলের সমন্বয়ে এবং বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকার। যখন কোনো দল এককভাবে সংখ্যাগষ্ঠিতা অর্জন করতে পারে না তখন দুই বা ততোধিক দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। পার্লামেন্টে কোয়ালিশন করতে আগ্রহী দলের সদস্যরা সরকারের পক্ষে সমর্থন জ্ঞাপন করেন। এ ধরনের সরকার সাধারণ দুর্বল হয়। কোয়ালিশন সরকার গঠিত হবার পর পার্লামেন্ট সদস্যরা সরকার দেখা যায়। কোয়ালিশন সরকার সহজে ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের পর যে দলটি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলটিই সরকার গঠন করে। কিন্তু যখন কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে পারে না তখন একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী দলটি অন্য একটি দলের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে অথবা যেকোনো দুই বা ততোধিক দল একে অন্যকে সমর্থন দিয়ে আইন পরিষদে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সরকার গঠন করে। এটাই কোয়ালিশন সরকার।

কোরাম (Chorum)

কোনো আইনসভা, প্রতিষ্ঠান বা কমিটির সভা আরম্ভ করতে হলে আইনগত বা সংবিধানগতভাবে ন্যূনতম যত জন সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন হয়, তত জন সদস্যের সমষ্টিকে বলে কোরাম (Chorum)। কোনো সংস্থা, সংগঠন বা পার্লামেন্টে কত সদস্য নিয়ে কোরাম হবে, সংশ্লিষ্ট গঠনতন্ত্র বা শাসনতন্ত্রে তা উল্লিখিত থাকে। কোম্পানির ক্ষেত্রে কোরামের উল্লেখ থাকে তার আর্টিকল্‌স্‌ অব অ্যাসোসিয়েশনে।

কোরিয়ার যুদ্ধ (Korian War)

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত কোরিয়া জাপানের উপনিবেশ ছিল। ১৯৪৫ সালে মিত্রশক্তির হাতে জাপানের পরাজয় ঘটে। সোভিয়েত ইউনিয়ন কোরিয়ার উওরাঞ্চল থেকে জাপানিদের উচ্ছেদ করবে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দক্ষিণাঞ্চলে এ দায়িত্ব পালন করবে। আরও স্থির হয় যে, এই দায়িত্ব পালনের পরপরই সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্র উভয়েই কোরিয়ার জনগণের হাতে সর্বময় ক্ষমতা অর্পণ করে ফিরে আসবে। ৩৮ অক্ষরেখার উত্তরাঞ্চলে রাশিয়া তার দায়িত্ব পালন করে ফিরে যায়। কিন্তু, দক্ষিণাঞ্চলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিভিন্ন অজুহাতে জাপানিদের উৎখাতের পরও থেকে যায় এবং তাদের অনুগত ব্যক্তি সিংম্যান রি এর নেতৃত্বে একটি পুতুল সরকার কায়েম করে। স্বভাবতই, কোরীয় জনগণ দাবি করে যে, মার্কিনিদের হটিয়ে উভয় কোরিয়াকে একাত্রিত করা হোক। জনগণের এ দাবিকে নস্যাৎ করার উদ্দেশে পূর্ব রণাঙ্গণে মার্কিন সহায়তাপুষ্ট পুতুল সরকারের সেনারা ৩৮ অক্ষরেখা অতিরিক্ত করে, আর পশ্চিম রণাঙ্গণে খোদ মার্কিন সৈন্যেরাই উক্ত রেখা পার হয়ে উত্তরাঞ্চলে হানা দেয় (৭ অক্টোবর)। উত্তর কোরিয়া এই হামলার বিরুদ্ধে গড়ে তোলে তীব্র প্রতিরোধ। ফলে, শুরু হয় রক্তক্ষয়ী কোরিয়ার যুদ্ধ। এই যুদ্ধে উত্তর কোরিয়ার লক্ষ লক্ষ নরনারী নিহত হয়, ৭৮টি শহর সম্পূর্ণরূপে ধবংসপ্রাপ্ত হয় এবং বিপুল সম্পদের ক্ষতি সাধিত হয়। আর, অন্যপক্ষে, চার লক্ষ মার্কিন সৈন্যসহ প্রায় ১৫ লক্ষ মানুষ নিহত হয়, কয়েক হাজার জঙ্গি বিমান ভূপাতিত হয়, প্রায় চারশো যুদ্ধজাহাজ জলমগ্ন হয় এবং প্রায় তিন হাজার ট্যাংক ধ্বংস হয় (উত্তর কোরিয়ার হিসাব অনুযায়ী)। ১৯৫৩ সালের ২৭জুলাই সীমান্ত ঘাঁটি (৩৮ অক্ষরেখার ওপর অবস্থিত) পানমুনজম নামক স্থানে যুদ্ধবিরতি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি অনুযায়ী দক্ষিণ কোরীয় ও মার্কিন বাহিনী ৩৮ অক্ষরেখার দক্ষিণে সরে যায়।

কোর্ট অব জাস্টিস, ইউরোপীয়ান (European Court of Justice)

কোর্ট অব জাস্টিস হচ্ছে ইউরোপীয় সম্প্রদায় (European Community) এর বিচার বিভাগ। এই আদালত ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সম্প্রদায় (European Coal and Steel Community), এবং ইউরোপীয় আণবিক শক্তি সম্প্রদায় (European Atomic Energy Community)-র সম্মতিক্রমে গঠিত। এই আদালতের ১৯ জন বিচারক রয়েছেন। (প্রত্যেক দেশ থেকে একজন ও বড় দেশ থেকে দুজন করে)। এ ছাড়া ৬ জন অ্যাডভোকেট জেনারেল বিচারক হিসাবে রয়েছেন। এই আদালতের ৬টি চেয়ার রয়েছে। তবে গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে পূর্ণ বেঞ্চ বসেই শুনানী করেন। মূলত ইউরোপীয় সম্প্রদায়ের কোনো সদস্য রাষ্ট্র সম্প্রদায়ের কোনো বিধি ও নিয়মনীতি ভঙ্গ করলে সেই মামলাই এই আদালতে আসে। ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিও এই আদালতে মামলা করতে পারে। আবার কোনো দেশের আদালতও প্রয়োজনে এই আদালতে মামলা পাঠাতে পারে। এই আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে আপিলের কোনো সুযোগ নেই এবং এই আদালতের রায় মেনে চলা প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের আদালতের জন্য বাধ্যতামূলক।

কোর্ট মার্শাল (Court Martial)

কোর্ট মার্শাল বা ফৌজী আদালত সামরিক কর্মচারীদের নিয়ে গঠিত বিচার-সভা। সাধারণত সশস্ত্রবাহিনীর অভ্যন্তরে কোনো অপরাধ সংঘঠিত হলে সামরিক আদালতে, তার বিচার করা হয়। কিন্তু যুদ্ধকালে বা কোনো দেশে সামরিক আইন জারি থাকলে, বেসামরিক অপরাধীদের বিচারও সামরিক আদালতে হতে পারে। সামরিক আদালত প্রধানত সশস্ত্র-বাহিনীর কর্মকর্তাদের নিয়েই গঠিত হয়। তাছাড়া এ আদালতে যুদ্ধকালীন আইন ও বাধানিষেধ উপেক্ষা বা অমর্যাদা করলে সামরিক বেসামরিক উভয়কে দোষী সাব্যস্ত করা হয়ে থাকে।

ক্যাডার (Cadre)

ক্যাডার এর শাব্দিক অর্থ 'কাঠামো' বা মূলকর্মী। কোনো দল বা আর্দশের মূলকর্মীদের বোঝানোর জন্য ক্যাডার কথাটি ব্যবহার করা হয়। যেকোনো রাজনৈতিক দলের কাঠামো এর মূল কর্মীদের নিয়েই গঠিত। রাজনৈতিক দলের আর্দশকে সফল করে তোলার জন্য মূল কর্মীরাই হলো নিয়ামক। ক্যাডারদের বলা হয় আর্দশের সৈনিক। যারা সম্পূর্ণরূপে আদর্শে উদ্বুদ্ধ, আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য অকুতোভয় ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং যাদের চরিত্র ও জীবনপদ্ধতি আদর্শগত দৃষ্টিকোণ থেকে যথার্থ, তারাই ক্যাডার শ্রেণিভূক্ত। ক্যাডার গড়ে তোলা হয় একটি সুনির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। যেকোনো বিপ্লবী সংগঠনের সাফল্য এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য 'ক্যাডার' অপরিহার্য।

ক্যাপিটল (Capital)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কংগ্রেস বা আইনসভার অধিবেশন যে ভবনটিতে বসে, সেই ভবনটিরই নাম ক্যাপিটল (Capital)। অনেক সময় ক্যাপিটল বলতে মার্কিন কংগ্রেসকেও বোঝায়।

ক্যাপিটাল, দাস (Das Kapital)

কার্ল মার্কসের সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'Das Kapital', অর্থাৎ 'The Capital' বাংলায় 'পুঁজি'। এই গ্রন্থ পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার স্বরূপ উদঘাটন করে এবং সমাজতন্ত্রের ভিত্তি রচনা করে। ১৮৪০ সালে এই গ্রন্থের কাজ শুরু হয় এবং তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত এর কাজ চলবে। ১৮৬৭ সালে এর প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয়। অপর দুই খণ্ড এবং ক্যাপিটাল-এর চতুর্থ খণ্ড বলে পরিচিত, 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' (Theory of Surplus Value) প্রকাশিত হয় তাঁর মৃত্যুর পর। এই গ্রন্থের প্রথম খন্ডে রয়েছে পুঁজির উৎপত্তির ব্যাখ্যা ও ইতিবৃত্ত; দ্বিতীয় খণ্ডে পুঁজির পরিক্রমণ পদ্ধতি এবং তৃতীয় খণ্ডে রয়েছে সামগ্রিকভাবে পুঁজিবাদের বিশ্লেষণ। মার্কস দেখিয়েছেন যে, পুঁজিবাদ একটি বিকাশমান ঘটনা, একটি ঐতিহাসিক পর্যায়ের উৎপাদন-প্রক্রিয়া, যার পরিমাণগত পরিবর্তনই তার গুণগত ও বিপ্লবী পরিবর্তনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। এই গুণগত পরিবর্তনের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হচ্ছে সমাজতন্ত্র। মার্কস আরও দেখিয়েছেন কীভাবে পুঁজিবাদের জন্ম থেকে শেষ পর্যন্ত তার মধ্যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব ক্রিয়াশীল থাকে, যার চূড়ান্ত পর্যায়ে" শোষকদেরই শোষণ করা হবে।" উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব হল মার্কসীয় রাজনৈতিক দর্শনের মৌলসূত্র। মার্কস উৎপাদিকাশক্তি এবং উৎপাদন সম্পর্কের ঐক্য ও দ্বন্দ্বের দিক ব্যাখ্যা করে প্রমাণ করেন যে, এর চূড়ান্ত পরিণতিতে বুর্জোয়া সমাজ সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তরিত হতে বাধ্য। পরবর্তীকালে, লেনিন সাম্রাজ্যবাদী স্তরের পুঁজির স্বরূপ ব্যাখ্যা করে মার্কসীয় তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন।

ক্যাবিনেট মিশন পরিকল্পনা (Cabinet Mission Plan)

১৯৪৬ সালের ১৬ মে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার তিনজন সদস্য স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস, লর্ড প্যারিস লরেন্স এবং এ.ভি. আলেকজান্ডার ভারতে এসে ভবিষ্যৎ স্বাধীন ভারতের যে পরিকল্পনা প্রদান করেন, সেটাই ইতিহাসে ক্যাবিনেট পরিকল্পনা নামে খ্যাত। এই পরিকল্পনার মৌল দিকগুলো হলো; ১.ব্রিটিশ শাসিত ভারত ও ভারতের দেশীয় রাজ্যসমূহের সমন্বয়ে ভারতীয় ইউনিয়ন গঠন করা; ২.পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও যোগাযোগ হবে কেন্দ্রীয় বিষয়, অন্যান্য সকল বিষয়ে প্রদেশ ও রাজ্যসমূহই হবে সর্বেসর্বা; ৩. অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ উড়িষ্যা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ, যুক্তপ্রদেশ, মাদ্রাজ ও বোম্বাইকে নিয়ে 'ক' অঞ্চল, মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঞ্জাব, সিন্ধু ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশকে নিয়ে 'খ' অঞ্চল এবং মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলা ও আসামকে নিয়ে 'গ' অঞ্চল গঠিত হবে; ৪. নতুন সংবিধান প্রণীত ও বলবৎ না হওয়া পর্যন্ত সকল প্রধান দলের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে একটি অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠন করা হবে। কিন্তু এই

পরিকল্পনা মুসলিম লীগ গ্রহণ করলেও লিখিত ভারত জাতীয় কংগ্রেস তা প্রত্যাখ্যান করে। অন্তবর্তীকালীন সরকারের ব্যাপারেও কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে তীব্র মতবিরোধ দেখা দেয়। পরিনামে এই পরিকল্পনা বাতিল হয়ে যায়।

ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব (Cabinet Dietatorship)

সাধারণত সাধারণ নির্বাচনে যে দল আইনসভা বা পার্লামেন্টের সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে সেই দলের সদস্যদের নিয়ে প্রধানমন্ত্রী ক্যাবিনেট গঠন করে। তাই পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যদের অকুণ্ঠ সমর্থনের নিশ্চয়তা থাকে। ক্যাবিনেটের ব্যক্তিগত মত পার্থক্যের উর্ধ্বে ওঠে ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারি নীতি নির্ধারণ করেন এবং সকল সিদ্ধান্তকে পার্লামেন্টের সামনে পেশ করেন। তাছাড়া পার্লামেন্টে সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় সাধারণ সদস্যরা ক্যাবিনেটের প্রস্তাবের বিরোধিতা করতে পারেন না। তাই বিরোধী দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও ক্যাবিনেটের প্রস্তাব পার্লামেন্টের অনুমোদন লাভ করে। ক্যাবিনেটের একনায়কত্ব এখন চূড়ান্তভাবে প্রতিষ্ঠিত। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা প্রভৃতি দেশের মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে প্রায়শই এরূপ একনায়কত্বের অভিযোগ উথাপিত হয়।

ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি (Camp David Treaty)

ক্যাম্প ডেভিড হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের বিশ্রাম-নিবাস মেরিল্যান্ডের অন্তর্গত একটি স্থান। ১৯৭৮ সালের অক্টোবর মাসে এখানে মিশরের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সা'দত ও ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী মেহহায়ে বেগিন মিলিত হয়ে দীর্ঘ ১৩ (তের) দিন আলোচনার পর ১৭ অক্টোবর দু'টি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তিই ক্যাম্প ডেভিড চুক্তি নামে পরিচিত। ব্রিটেনে মিশরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদত ১৯৭৭ সালের শেষের দিকে আকস্মিকভাবে ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী মেনাচেম বেগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরই সূত্র ধরে ১৯৭৮ সালের ৫-১৭ সেপ্টেম্বর সময়ে ওয়াশিংটন থেকে ৬৭ মাইল দূরবর্তী ক্যাম্প ডেভিড নামক স্থানে অবস্থিত বার্চ লজ (Birch Lodge) ও ডগউড লজ (Dogwood Lodge) নামক মার্কন প্রেসিডেন্টের অবকাশযাপনের জন্য নির্মিত প্রাসাদদ্বয়ে প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার, প্রেসিডেন্ট সাদত ও প্রধানমন্ত্রী বেগিনের মধ্যে অনুষ্ঠিত হয় এবং এই বৈঠকে তাদের মধ্যে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তিতে বলা হয় যে, ১ সিনাই এলাকা মিশন ফিরে পাবে, ২. গাজা ও জর্ডান নদীর পশ্চিম তীর পাঁচ বছরের জন্য স্বায়ত্তশাসন পাবে এবং ৩.পশ্চিম তীরে ইসরায়েলি সৈন্য বহাল থাকবে। এই চুক্তিতে পি.এল.ও.-র ব্যাপারে কোনো উল্লেখই ছিল না, যদিও পি.এল.ও প্যালেস্টাইনি জনগনের জাতিসংঘ কর্তৃক স্বীকৃত একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান। এই চুক্তিতে গোলাম উপত্যকার ব্যাপারে কোনো উল্লেখ না থাকায় সিরিয়ার সমস্যাও থেকে যায়। সর্বোপরি, বিতাড়িত প্যালেস্টাইনিদের স্বদেশে প্রত্যাবর্তন ও পূর্ণবাসনের প্রশ্ন, প্যালেস্টাইনিদের আন্তঃনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্ন এবং ১৯৬৭ সালে অধিকৃত বায়তুল মুকাদ্দাস ও অন্যান্য এলাকা প্রত্যর্পণের প্রশ্নও সম্পূর্ণ উপেক্ষিত থাকে। এই চুক্তির

ফলে, আরব বিশ্ব বিভক্ত হয়ে পড়ে এবং ইহুদিরা আরও বেপরোয়াভাবে তাদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়। অবশ্য এই চুক্তির দরুণ, মিশর তার হারানো এলাকা ফিরে পায়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে সমস্যা ও উত্তেজনা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই সমস্যা ও উত্তেজনাই ১৯৮২ সালের জুন-জুলাই মাসে প্রচণ্ড রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে রূপ পরিগ্রহ করে। এই চুক্তির ফলে ইসরাইল সিনাই অঞ্চল থেকে ইসরাইলী সৈন্য প্রত্যাহার করে নেয় এবং মিসরের অধিকৃত জায়গা ছেড়ে দেয়। ক্যাম্প ডেভিড চুক্তির বিষয়বস্তুর ওপর চূড়ান্ত চুক্তিটি অবশ্য স্বাক্ষরিত হয় ১৯৭৯ সালের ৬ মার্চ।

ক্যারিজমা (Charisma)

ক্যারিজমা হলো কোনো নেতা বা ব্যক্তির কর্মী ও জনগণকে আকৃষ্ট বা মোহিত করার মত যাদুকরী ভাবমূর্তি। এটা কোনো নেতা বিশেষের সেই অন্তর্নিহিত ক্ষমতা, যার দ্বারা তিনি মানুষের পতঙ্গের মতো আর্কষণ করতে এবং কর্মী ও সমর্থকদের মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখতে সমর্থ হয়। ক্যারিজমা-র ফলে প্রায়শই কর্মী সমর্থকরা সংশ্লিষ্ট নেতার ভুল ত্রুটি, দুর্বলতা স্খলন ইত্যাদিকে আদৌ দেখতেই পান না, দেখলেও ধর্তব্যের মধ্যে আনেন না। আর কেউ ধর্তব্যের মধ্যে আনলেও নেতার বিশাল ভাবমূর্তি ও ব্যক্তিত্বের ভয়ে প্রতিবাদ করার সাহস পান না। নেপোলিয়ন, লেনিন, হিটলার মাও সেতুং, চার্চিল, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ এরূপ ক্যারিজমার অধিকারী ছিলেন বলে মনে করা হয়।

ক্যুদেতা (Coup D' etat)

ক্যুদেতা বা শাসন-ব্যবস্থার প্রচণ্ড পরিবর্তন। বেআইনী বা জবরদস্তিমূলকভাবে শাসনব্যবস্থার পরিবর্তন ; আকস্মিকভাবে বলপূর্বক রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল। ফরাসী ভাষা হতে এই শব্দটি গৃহীত হয়েছে। জনসাধারণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বা তাদের মত গ্রহণ না করে বলপূর্বক কোনো দেশের শাসনব্যবস্থা পরিবর্তনের জন্য আকস্মিকভাবে চূড়ান্ত আঘাত হানার কৌশল। সাধারণত কোনো দেশের সামরিক বাহিনীর নেতৃবৃন্দই এটা করে থাকেন।

ক্রস ভোটিং (Cross Voting)

কোনো আইনসভার সরকারদলীয় সদস্যরা যদি দলীয় নির্দেশ বা শৃঙ্খলা অমান্য করে বিরোধী দলের পক্ষে ভোট দিতে বসে, অথবা অনুরূপভাবে বিরোধীদলীয় সদস্যরাও যদি নিজদলের নির্দেশ অমান্য করে সরকারি দলের পক্ষে ভোটদান করেন, তা হলে এরূপ ভোটকে বলে ক্রস ভোটিং।

ক্রিমিয়ার যুদ্ধ (War of Crimia)

১৮৫৪ সালে 'তুর্কি সাম্রাজ্যে বসবাসরত খ্রিস্টানদের রক্ষা করার দায়িত্ব রাশিয়ার জার কর্তৃক সংরক্ষিত' ঘোষণা করা হলে তুরস্ক ও রাশিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে। এই যুদ্ধে

ব্রিটেন, ফ্রান্স ও সার্ডিনিয়া তুরস্কের পক্ষে যোগ দেয়। মিত্রবাহিনীর ক্রিমিয়ার সেবেস্তাপোলে অবস্থিত রাশিয়ার নৌঘাঁটি আক্রমণ এবং জয়লাভ এই যুদ্ধের প্রধান ঘটনা।

ক্রুসেড (Crusade)

ক্রুসেড এর অর্থ বাংলায় ধর্মযুদ্ধ। মুসলমানদের হাত থেকে প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য খ্রিস্টানরা ১০৯৫ সাল থেকে ১২৭১ সাল পর্যন্ত সময়ে বার বার যে অভিযান চালায়, তা-ই ইতিহাসে ক্রুসেড নামে খ্যাত। এই অভিযান মোট আটবার পরিচালিত হয়। ক্রুসেড অভিযানের প্রথম অভিযান পরিচালনা করেন গডফ্রে। প্রধানত, ইউরোপ থেকেই ক্রুসেড অভিযানসমূহ প্রেরণ করা হয়।

ক্রেমলিন (Kremlin)

রুশ Kremlin শব্দের অর্থ দুর্গ। ক্রেমলিন বলতে বোঝায় মস্কোয় সেই দুর্গ, যেটা এককালে ছিল রাশিয়ার জারদের রাজপ্রসাদ এবং পরে ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রশাসনিক সদর দফতর। বর্তমানে এটি রুশ সরকারের সদর দফতর।

ক্ষমতা (Power)

সাধারণভাবে ক্ষমতা বলতে কোনো নির্দিষ্ট ঘটনা ঘটানোর সামর্থকেই বোঝায় অথবা কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর দ্বারা কোনো যে কোনো মাধ্যমে অভিপ্রেত উপায়ে অন্যের আচরণের ওপর প্রভাব চর্চা করাকেই বোঝায়। ঈপ্সিত যেকোনো কিছু বিনা বাধায় অথবা বাধার মধ্য দিয়ে অর্জনের সামর্থ হলো ক্ষমতা। ক্ষমতার তারতম্য থাকে। খেতাব হিসেবে কিংবা প্রতিনিধিত্ব করার জন্য ক্ষমতা প্রদত্ত হয় ; সীমিতভাবে অথবা ভাগাভাগি করে কিংবা সম্মতিক্রমে অথবা বলপ্রয়োগের মাধ্যমে ক্ষমতা অর্জন সম্ভব। প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে ক্ষমতার প্রয়োগ ঘটে।

কর্তৃত্ব, বৈধতা, অধিকার ইত্যাদি সমার্থক শব্দ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্ষমতা প্রত্যয়টি হলো রাজনীতির যথার্থ সারবস্তু ; এ বিষয়ে অনেক তত্ত্ব আছে, তার মূখ্য উপজীব্য হলো ক্ষমতার রূপান্তর, সীমতকরণ ও লোকের কাছে যুক্তিগ্রাহ্য করে তোলা।

ক্ষমতার প্রকারভেদ আছে। চাকরি, কর্মসংস্থান, জ্ঞান, সামাজিক স্বীকৃতি, মর্যাদা, ব্যক্তিগত ইমেজ প্রভৃতি সামাজিক স্তরের অন্তর্ভূক্ত। সুতরাং ক্ষমতা কার্যকর করতে হলে সামাজিক দিক থেকে মূল্যবান ও স্বীকৃত এই সমস্ত বিষয়গুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ করা আবশ্যক। অর্থনৈতিক ক্ষমতার মাধ্যমে উৎপাদন ব্যবস্থাকে প্রভাবিত ও নিয়ন্ত্রিত করা যায়; ক্ষমতা যদি রাজনৈতিক হয়, তা হলে তার সাহায্যে আইন প্রস্তুতির কাজকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব ; ক্ষমতা ব্যক্তিগত হলে সব কাজেই লোককে লাগানো চলে। কারও কারও বিশেষ করে মার্কসীয় দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ক্ষমতাই হলো প্রধান। অনেকের মতে সব ক্ষমতাই কার্যত একই ক্ষমতার রূপভেদ মাত্র।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে ক্ষমতার সঙ্গে কর্তৃত্বের অধিকার হলো বড় প্রশ্ন। সাধারণত ক্ষমতার সঙ্গে অধিকারের প্রত্যয়কে মিশিয়ে ফেলা হয়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের কাজ হলো জনজীবন থেকে সেইসব ক্ষমতা অপসারণের ইঙ্গিত দেওয়া যার পেছনে জনসমর্থনপুষ্ট অধিকার থাকে না। জনগণ নগ্ন ক্ষমতালিপ্সাকে প্রশ্রয় দেয় না। যদি মনে হয় যে কর্তৃত্বের অধিকার অর্জনই আসলে প্রয়োজন, তা হলে সেটাও ক্ষমতালিপ্সার মতো দেখাবে। ক্ষমতা কখনো সমানভাবে বণ্টিত হয় না, অর্থাৎ Power is never equality distributed. এমন কোনো ক্ষমতা নেই যা সমানভাবে বণ্টন করা হয়েছে।

ক্ষমতা অর্পণ (Delegation of Power)

কোনো ব্যক্তি বা সংস্থার নিকট ক্ষমতা অর্পণ। বিশেষ করে অধীনস্ত ব্যক্তি বা সংস্থার কাছে ন্যস্ত করার প্রক্রিয়া। ক্ষমতা যিনি বা যারা লাভ করেন তাঁরা আদেশক্রমে শুধু প্রয়োগ নয়, উর্ধ্বতনের অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারপ্রাপ্ত প্রতিভূ হিসেবে কার্য পরিচালনা করে এবং তাঁর হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণেরও ক্ষমতা অর্জন করেন। অধিকারপ্রাপ্ত যিনি হন তিনি উর্ধ্বতনের নির্দেশ অথবা মতাদর্শ অনুযায়ী অর্পিত ক্ষমতাবলে কার্যক্রম পরিচালনা করেন। কোনো কাজের প্রতিনিধি এবং অর্পিত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি এক নয়। ক্ষমতা অর্পণের ভাল নিদর্শন হলো সামরিক কিংবা পুলিশের প্রশাসনে উর্ধ্বস্থানীয় আধিকারিদের ক্ষমতা ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত হয়। এছাড়াও সংবিধান ও রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিভাগ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে ব্যক্তি কিংবা কোনো কর্তৃপক্ষ আইন প্রণয়ণে যে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন সেটিও এই প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত বিষয়। সাধারণ আইনে অর্পিত ক্ষমতাবলে অন্য কোনো অধস্তন কর্তৃপক্ষ যে আইন প্রনয়ন করে তা অধস্তন আইনের আওতায় পড়ে।

ক্ষমতার রাজনীতি (Power Politics)

ক্ষমতায় যাওয়া এবং ক্ষমতায় টিকে থাকার রাজনীতি। একটি নেতিবাচক বোধ। সকল রাজনৈতিক দল ও রাজনৈতিক নেতাই ক্ষমতায় যেতে চান। ক্ষমতায় গেলেই কেবল কোনো রাজনৈতিক দলের পক্ষে মতাদর্শ ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সুতরাং এ অর্থে ক্ষমতায় যাওয়ার চেষ্টা করা রাজনৈতিক দল বা রাজনৈতিক নেতার পক্ষে খারাপ কিছু নয়। কিন্তু যখন কোনো দল বা ব্যক্তিগোষ্ঠী আদর্শ বিসর্জন দিয়ে এবং প্রচলিত ও বৈধ পথ ব্যতিরেকে ভিন্ন পদ্ধতিতে ক্ষমতায় যেতে উদগ্রীব হয়ে উঠে তখন এ ধরনের রাজনীতিকে 'ক্ষমতার রাজনীতি' বলে। ক্ষমতার রাজনীতি আদর্শচ্যুতি ঘটায়। ষড়যন্ত্রের সুযোগ প্রশস্ত করে। ক্ষমতার রাজনীতি বিভিন্ন গোষ্ঠী ও ব্যক্তির মধ্যে অশুভ আঁতাত তৈরি করে। ক্ষমতার রাজনীতি রাজনীতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের পথে অন্তরায়ের কারণ হয়।

ক্ষমতার স্বাতন্ত্রীকরণ (Separation of Powr)

রাষ্ট্রের কার্যাবলীকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয় যথা; আইন, শাসন ও বিচার। আইন বিভাগ আইন প্রণয়ন, শাসন বিভাগ শাসন ও বিচার বিভাগ বিচার করে। পূর্বে

এমনিভাবে রাষ্ট্রের কার্যাবলীর কোনো বিভাগ ছিল না। কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ কাজ করতেন। গণতান্ত্রিক শাসনের বিকাশ লাভের পর পরিপূর্ণ ক্ষমতাকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। তিনটি বিভাগ আলাদা আলাদা থাকে এবং কেউ কারও কাজে হস্তক্ষেপ করে না। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতির মূল বক্তব্যই হলো তিনটি বিভাগ আলাদা থেকে স্বীয় কার্যাবলী সম্পাদন করবে এবং কোনো বিভাগ কোনো বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ব্রিটেনের জনগণের স্বাধীনতা রক্ষাকল্পে সেখানে ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের নীতি স্বীকৃতি পেয়েছিল। আজকাল ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। কিন্তু এ নীতি হঠাৎ কোনো সরকারের আমলে প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। বিভিন্ন ঐতিহাসিক বিবর্তনে এর জয়যাত্রা সূচিত হয়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক প্লেটো কালজয়ী গ্রন্থ রিপাবলিকের (Republic) মধ্যে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার যে মতামত দেন তাতে কিছুটা এ নীতির আভাস পাই। ন্যায়বিচার (Justice) প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি রাষ্ট্রের জনগণকে তিনটি ভাগে ভাগ করেন যথা; শাসক, যোদ্ধা এবং সাধারণ শ্রেণি। শাসকের কাজ দেশ শাসন, যোদ্ধা শ্রেণির কাজ দেশের শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষা এবং সাধারণ শ্রেণির কাজ উক্ত দুই শ্রেণির কথামতো অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে সহযোগিতা করা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি কোনো শ্রেণিকেই কোনো শ্রেণির কাজে হস্তক্ষেপ করতে বলেননি। ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণের পরিপূর্ণ কোনো ধারণা পাওয়া যায় না, তবুও একথা বলতে পারি যে, রাষ্ট্র পরিচালনার ক্ষেত্রে কোনো বিভাগ কোনো বিভাগের কাজে হস্তক্ষেপ করবে না। ব্রিটেনে নির্বাহী ক্ষমতা ক্যাবিনেট অর্থাৎ মন্ত্রিসভার ওপর ন্যস্ত থাকে, পার্লামেন্টের সদ্যসের মধ্য হতে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। পার্লামেন্ট মন্ত্রিসভা নিয়ন্ত্রণ করে। ঠিক তেমনি বিচারব্যবস্থায় সর্বোচ্চ প্রতিষ্ঠান হাউস অব লর্ডস সাংবিধানিক সংস্কার অঙ্গ; স্বভাবতই বিচারকেরা বিধানিক কাজে প্রভাব বিস্তার করেন। সেটা যাতে না ঘটে তার জন্য প্রতিষেধক ব্যবস্থা আছে। মন্টেস্কুর আদর্শের সঙ্গে ব্রিটেনের সাংবিধানিক ধারার পুরোপুরি সামঞ্জস্য নেই; স্বাধীনতার প্রশ্নও তাই অংশত সংকুচিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষেত্রেও ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ পূর্ণাঙ্গ নয় ; তাতে অবশ্য সরকারের ত্রিবিধ কর্মক্ষেত্রের মধ্যে একটা ঐক্য আছে। ঐক্য না থাকলে সরকার চালানোও কঠিন হত।

ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন (Small Scale Production)

উৎপাদনের বিভিন্ন উপাদানগুলি অল্প পরিমাণে ব্যবহার করে যদি কোনো পণ্য উৎপাদন করা হয় তা হলে তাকে ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন বলা হয়। প্রাচীনকালে উৎপাদন ক্ষেত্রে প্রধান ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। বর্তমানকালে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, যন্ত্রপাতির আবিষ্কার প্রভৃতি বিভিন্ন কারণে বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার ঘটেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও কতগুলো বিশেষ কারণে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহ এখনও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি টিকে রয়েছে।

খন্দকের যুদ্ধ (আহযাব) (Battle of Khandaq)

উহুদের বিপর্যয়ে মুসলমানগণ সংঘবদ্ধ হয়ে কুরাইশদের শত্রুতার মোকাবিলা করার দৃঢ় পরিকল্পনা করেন। উচ্ছৃঙ্খল বেদুঈনরা ইসলামের বিধি-নিষেধ অমান্য করে অরাজকতা সৃষ্টি করতে থাকে। সলাইম, ঘাতাফান, ফারাফা, আসাদ প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরব বেদুঈন গোত্রগুলো কুরাইশদের সাহায্যে ৬০০০ সৈন্য প্রেরণ করে। বদর ও ওহুদের যুদ্ধে 'বনু কাইনুক' ও 'বনু নজীর' নামক দুটি ইহুদি গোত্র সন্ধীর শর্ত ভঙ্গ করায় তাদেরকে মদিনা থেকে বহিষ্কার করা হয়। তাই তারা কুরাইশদের সাথে হাত মিলিয়ে ইসলামের বিরোধিতা করতে থাকে। ৬২৭ সালের ৩১ মার্চ কুরাইশ, ইহুদি ও বেদুঈনদের একটি সম্মিলিত বাহিনীর নেতৃত্বে দান করে আবু সুফিয়ান মদিনার দিকে অগ্রসর হলে মহানবী (সা) পারস্যবাসী সালমান ফারসির পরামর্শে শহরের চারদিকে একটি পরিখা খনন করেন। পরিখা অথবা খন্দক থেকেই এ যুদ্ধের নামকরণ হয়েছে 'খন্দকের যুদ্ধ'। উদ্ভাবনী শক্তির প্রতীক ও আত্মরক্ষার বলিষ্ঠ উপায় ও পরিখা কুরাইশদের আক্রমণকে প্রতিহত করে। সংখ্যাধিক্য হওয়া সত্ত্বেও তারা উহুদের যুদ্ধের মতো মুসলমানদের পর্যুদস্ত করতে পারেনি। বেদুঈন, কুরাইশ ও ইহুদিদের দ্বারা গঠিত ত্রিশক্তির মধ্যে ঐক্যের অভাব, প্রাকৃতিক বিপর্যয় এবং মুসলমানদের ইস্পাত কঠিন সংকল্পের ফলে কুরাইশগণ পর্যুদস্ত হয়। ২৭ দিন অবরোধ করে রেখে কুরাইশরা মদিনা আক্রমণে ব্যর্থ হয়ে মক্কায় প্রত্যাবর্তন করে। উহুদ প্রান্তরে মুসলমানদের বিপর্যয়ের গ্লানিকে তারা খন্দকের যুদ্ধে মোচন করতে সক্ষম হয়। এর ফলে মুসলিম বিজয়ে কুরাইশ, বেদুঈন ও ইহুদি ত্রিশক্তির ক্ষমতা ধূলিসাৎ হয়ে যায়।

খাতক দেশ (Client-State)

খাতক দেশ বা ঋণীরাষ্ট্র, যে দেশ বা রাষ্ট্র নামে মাত্র স্বাধীন, কিন্তু কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশের মহাজনী মূলধনের (Finance-capital) হস্তক্ষেপের (ঋণদান হিসাবে) ফলে অল্প বিস্তর সাম্রাজ্যবাদের রাজনৈতিক প্রভুত্বের অধীন হয় তাকে 'খাতক দেশ' বা ঋণী রাষ্ট্র বলা হয়। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলো দুর্বল দেশগুলোকে ঋণ দেওয়া। তাদের মধ্যে জেকে বসে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রিত করে। এই সকল খাতক দেশ বা ঋণী রাষ্ট্রও অর্ধ উপনিবেশের অন্তর্ভুক্ত। এমনও দেখা যায়, কোনো কোনো সাম্রাজ্যবাদী দেশও অন্য কোন রাষ্ট্রের ঋণ গ্রহণ করে থাকে এবং উক্ত রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রভূত্ব মানতে বাধ্য হয় ; দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বর্তমান ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালী, পশ্চিম জার্মানি প্রভৃতি দেশগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের খাতক দেশে পরিণত হয়েছে।

খিলাফত আন্দোলন (Khilafat Movement)

উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে তুরস্কের সুলতান 'খলিফা' উপাধি ধারণ করলে মুসলমানেরা এই খিলাফতের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন শুরু করে। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে,

বিভিন্ন কারণে তুরস্ক জার্মানির পক্ষে যোগ দেয়। ফলে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য সৃষ্টি হয় এক বিব্রতকর পরিস্থিতি। তারা একদিকে ভারতের স্বাধীনতার দাবিদার এবং অন্যদিকে খলিফার প্রতি অনুগত্যশীল বিধায় ইংরেজরা মুসলমানদের অবিশ্বাস করতে শুরু করেন। এ সময় মাওলানা মোহাম্মদ আলি, মাওলানা আবুল কালাম আযাদ প্রমুখকে ব্রিটিশ সরকার গ্রেফতার করলে খিলাফত আন্দোলন জোরদার হয়ে ওঠে এবং শুধু ভারতীয় মুসলমানেরা শুধু খলিফার প্রতি সমর্থনই দেয় না, সশরীরে গিয়ে খিলাফত রক্ষার জন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করারও দৃঢ় প্রত্যয় ঘোষণা করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে খিলাফত আন্দোলন সবচেয়ে বড় ধর্মীয় পুনর্জাগরণের জোয়ার সৃষ্টি করে ও ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার ইন্ধন যোগায়। এর পশ্চাৎপদ ছিল তুরস্কের অটোম্যান বংশের সুলতানি যিনি খলিফা হিসেবে ভারতীয় মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগের উৎস ছিলেন, তাঁর ক্রমিক অবমাননা ও অবলুপ্তি।

১৯১১-১২ সালে তুরস্কের সঙ্গে ইতালির যুদ্ধ এবং ১৯১২-১৩ সালে তুরস্কের বিরুদ্ধে দুটি বলকান যুদ্ধের সময় ভারতীয় মুসলিম সমাজে বিরাট চাঞ্চল্য দেখা দেয়। তুরস্ক ও জার্মানির পক্ষকে সমর্থনের জন্য যুদ্ধের সময় সৌকত আলি ও মহম্মদ আলি ভ্রাতৃদ্বয়কে ভারত সরকার অন্তরীন করে। যুদ্ধ পরিসমাপ্তির পর মিত্রপক্ষ যখন অটোম্যান তুরস্কের ক্ষমতা খর্ব করে, তখন ভারতীয় মুসলিম সমাজে প্রবল অসন্তোষ ছড়িয়ে পড়ে। যুদ্ধের সময়ে ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও সেনানীদের সমর্থন অর্জনের জন্যই ইংরেজ সরকার তুরস্ক সাম্রাজ্য সম্পর্কে যেসব প্রতিশ্রুতি দেয় সেগুলো যুদ্ধের পর রক্ষা করা হয়নি বলে মুসলিম নেতৃবৃন্দ অভিযোগ করেন।

১৯১৯ সালের সেপ্টেম্বরে জাতীয় স্তরে একটি খিলাফত কমিটি গঠিত হয়। ২৭ অক্টোবর তারিখটি সারা দেশে খিলাফত দিবস হিসেবে পালিত হয়। আবুল কালাম আজাদ, ফজলুল হক, আক্রাম খাঁ, লক্ষ্ণৌ এর উলেমারা ও দেওবন্দ বিদ্যায়তনের শিক্ষকেরা দিবসের তাৎপর্য প্রচার করেন। ২২ নভেম্বর দিল্লিতে অনুষ্ঠিত খিলাফতিদের প্রথম সম্মেলনে গান্ধী, শ্রদ্ধানন্দ, মালব্য এবং মুসলিম নেতৃবর্গের মধ্যে মওলানা আবদুলবারি, হসরত মোহানি, হাকিম আজমল খাঁ ও আসফ আলি উপস্থিত ছিলেন। এই খিলাফত সম্মেলনেই গান্ধীজির মনে অসহযোগের চিন্তা প্রথম দানা বাঁধে।

আলি ভ্রাতৃদ্বয় অন্তরীন থেকে মুক্তি পান। ৩১ ডিসেম্বর দ্বিতীয় খিলাফত সম্মেলন বসে। পরে জানুয়ারিতে এম এ আনসারি বড়লাটের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। বিষয়টি আন্তর্জাতিক ছিল বলে কোনো ফয়সালা হয়নি। ফেব্রুয়ারিতে সৌকত আলি ঘোষণা করেন যে যুদ্ধের পরে শান্তি চুক্তিতে মুসলিম ধর্মীয় আবেগে আঘাত লাগায় মুসলমানেরা অতঃপর ইংরেজ সরকারের প্রতি অনুরক্ত থাকবে না। গান্ধী বিবৃতি দেন (১০ মার্চ ১৯২০) যে মুসলমানদের খিলাফতি দাবি না মিটলে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হবে। ১৭ মার্চ ভারত থেকে একটি মুসলিম প্রতিনিধি দল লন্ডনে প্রধানমন্ত্রী লয়েড জর্জের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে। তাঁরা নিরাশ হয়ে ফিরে আসেন।

তুরস্কের সঙ্গে মিত্রপক্ষের সম্পাদিত চুক্তিতে তুরস্কের অখণ্ডতা বিনষ্ট হয়। ১৯২০সালের ১৭ এপ্রিল মাদ্রাজে অনুষ্ঠিত খিলাফত সম্মেলনে চতুর্মুখী অসহযোগ আন্দোলনের কর্মসূচি গৃহীত হয়। মে মাসে বেনারসে এ আই সি সি এবং জুন মাসে এলাহাবাদে কেন্দ্রীয় খিলাফত সম্মেলনে গান্ধীজি তাঁর অসহযোগ আন্দোলনে প্রস্তাবে অনড় থাকেন। বিষয়টি মূলত ধর্মীয় এবং দ্বিতীয়ত ইসলামের একজন ধর্মগুরুর পূর্বতন মর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠার দাবিতে ইংরেজ সরকারের উচ্ছেদকল্পে আফগানিস্তানকে ভারত অভিযানে আমন্ত্রণ জানানোর অভিপ্রায় থাকায় অ্যানি বেসান্ত, মোতিলাল নেহেরু, লাজপত রায়, তিলক ও মালব্য অসহযোগ আন্দোলন অবাস্তব বলে মনে করেন। মুসলিম সম্প্রদায়ের আবেগের তাড়নায় বর্হিভারতীয় কোনো রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্যের সঙ্গে ভারতের জাতীয় দাবিকে যুক্ত করার কুফল সম্পর্কে বিপিনচন্দ্র পাল দেশবাসীকে সাবধান করে দেন। অধিকাংশ কংগ্রেস কমিটি গান্ধীজির এই প্রস্তাবে সায় দিতে পারেনি। সেপ্টেম্বরে কলকাতায় এক বিশেষ অধিবেশনে প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ভোটে গান্ধীজির অসহযোগ প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই অধিবেশনে কংগ্রেস ভারতে জাতীয় দাবি সমুহের সঙ্গে খিলাফতকে যুক্ত করে এবং চতুর্মুখী অসহাযোগ আন্দোলনের কর্মসূচিকে সম্প্রসারিত করা হয়।

এরপর ডিসেম্বরে নাগপুরে কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনে মূল প্রস্তাবের সঙ্গে স্বরাজ অর্জনের লক্ষ্যও যুক্ত হয়। নাগপুর অধিবেশনে চিত্তরঞ্জন ও লাজপত রায় বিরোধিতা ছেড়ে গান্ধীজির প্রস্তাব সমর্থন করেন। মালব্য ও জিন্নার বিরোধিতা ছিল নগণ্য।

অসহযোগ আন্দোলনের সঙ্গে যৌথভাবে খিলাফত আন্দোলন বৎসরাধিককাল চলে। নেতৃবৃন্দের অনেকেই কারারুদ্ধ হন। আন্দোলন ক্রমে হিংসাত্মক হয়ে পড়ে, যেটা গান্ধীজির আদর্শের বিরোধী ছিল। ১৯২২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গোরখপুর জেলায় চৌরিচৌরা থানা অঞ্চলে হত্যাকাণ্ডসূত্রে তিনি অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন প্রত্যাহার করেন।

১৯২২ সালের নভেম্বরে মুস্তাফা কামাল পাশা ক্ষমতাসীন হয়ে খিলাফতের বিলোপ সাধন করেন। একই দেশে দুট সমান্তরাল রাষ্ট্রশক্তির অবসান ঘটিয়ে তিনি তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ করায় ১২৯০ বছরের প্রাচীন খিলাফতের পরিসমাপ্তি ঘটে। তুরস্কের শেষ সুলতান ও খলিফা সুইজারল্যান্ডে জীবন অতিবাহিত করেন। ভারতের জাতীয় আন্দোলনে মুসলমানদের সম্পর্ক ও সমর্থন কালক্রমে ক্ষীণ হয়ে আসে। ১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে কামাল আতাতুর্ক তুরস্কের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন এবং খিলাফত বাতিল করে দেন। এমতাবস্থায়, স্বভাবতই, খিলাফত আন্দোলন নিঃশ্বেসিত হয়ে যায়।

খেমারুজ (Khamarus)

খেমারুজ কম্বোডিয়ার উগ্র কমিউনিস্ট গেরিলা সংগঠন। এই গ্রুপটি চীনপন্থী সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে। এই গ্রুপটি একসময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে যুদ্ধ করে কম্বোডিয়াকে

মুক্ত করে। ১৯৭৫ হতে ১৯৭৯ সাল পর্যন্ত এরা কম্বোডিয়ার শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ছিলো। এ সময় দেশে ব্যাপক গণহত্যা সংঘটিত হয়। ভিয়েতনামপন্থী কম্বোডিয়ার বাহিনীর নিকট পরাজিত হয়ে এই গ্রুপটি ক্ষমতা হারায় এবং চীনে আশ্রয় গ্রহণ করে।

গণ-অভীপ্সা/ সাধারণ ইচ্ছা (General Will)

রুশোর রাষ্ট্রদর্শনের অন্যতম প্রধান তিনটি বৈশিষ্ট হলো সামাজিক চুক্তি, সার্বভৌমত্ব এবং সাধারণ ইচ্ছা। সাধারণ ইচ্ছা প্রত্যয় সূত্রে আরও দুটি প্রত্যয় এসে পড়ে: প্রকৃত (actual) ইচ্ছা ও বাস্তব (real) ইচ্ছা। ব্যক্তিমানুষের প্রকৃত ইচ্ছা তার সহজাত প্রকৃতি প্রবৃত্ত এবং অযৌক্তিক। এই অভীপ্সা সংকীর্ণ ও স্ববিরোধী। পক্ষান্তরে ব্যক্তি মানুষের বাস্তব ইচ্ছা তার সমাজকল্যাণ-চিন্তার সঙ্গে জড়িত যুক্তিশীল ইচ্ছা। মানুষের নিজের স্বার্থ অপেক্ষা জনস্বার্থকেই বড় করে দেখে বাস্তব ইচ্ছা। এর মধ্য দিয়েই ব্যক্তি ও সমাজের সমন্বয় ঘটে। এটি স্থায়ী, সাময়িক নয়। স্বার্থবুদ্ধি থেকে মুক্ত থাকার দরুন বাস্তব ইচ্ছা মানুষের যথার্থ মুক্তিস্পৃহাকে প্রতিফলিত করে। বড় আকারে দেখা দেয় সর্বজনীন স্বার্থ ও কল্যাণ। আত্মসমালোচনার মধ্য দিয়ে মানুষ বাস্তব ইচ্ছা উপলব্ধি করে। প্রতিটি মানুষের মধ্যেই উভয় ধরনের ইচ্ছা বিদ্যমান থাকে।

সর্বজনের বাস্তব ইচ্ছার সংযোগ ও সমন্বয় ঘটানো সাধারণ ইচ্ছার কাজ। সাধারণ ইচ্ছা বিভিন্ন লোকের বাস্তব ইচ্ছার একটি সমন্বিত রূপ। তার মধ্যে কারও আত্মত্যাগের প্রশ্ন ওঠে না। সাধারণ ইচ্ছা সমাজের সর্বজনীন উচ্চতর আদর্শকে তুলে ধরে। যথোচিত আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে গণমঙ্গল সম্পর্কে লোকের চেতনা সাধারণ ইচ্ছার মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে। সাধারণ ইচ্ছা সার্বভৌম শক্তি অথবা সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ইচ্ছা নয়। জনস্বার্থে সাধারণ ইচ্ছা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ক্রিয়াশীল হয়। রুশোর এই সাধারণ ইচ্ছা প্রত্যয় কিছুটা অস্বচ্ছ। তিনি নিজেই স্বীকার করেছিলেন যে, প্রত্যয়টি যত না কার্যকর তার চেয়ে বেশি নীতিকথা।

গণঅভ্যুত্থান, ১৯৬৯ (Mass Movement, 1969)

১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থান বাঙালি জাতির ইতিহাসে অন্যতম উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ছাত্রসমাজের ১১ দফা এবং আওয়ামী লীগের ৬ দফার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ-সুবিধা বৃদ্ধি, সংসদীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন, জরুরি আইন প্রত্যাহার প্রভৃতি দাবিতে ছাত্র-সমাজের ১১ দফা দাবিকে রাষ্ট্রবিরোধী দাবি বলে ঘোষণা করে এবং আগরতলা ষড়যন্ত্রমূলক মামলা সাজিয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করে। ফলে সমগ্র বাংলাদেশ ছাত্র-জনতা আন্দোলনের রুদ্ররোষে ফেটে পড়ে এবং ধীরে ধীরে এ আন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। ছাত্র-জনতার ১১ দফা ও ৬ দফ দাবি উপেক্ষিত হলে ১৯৬৯ সালে সমগ্র দেশব্যাপী তীব্র আন্দোলন শুরু হয়। সরকার এ আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য সমগ্র বাংলাদেশে জরুরি অবস্থা ও ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ছাত্র-জনতা

একে অমান্য করে রাস্তায় নেমে পড়লে শুরু হয় প্রচণ্ড আন্দোলন ও বিক্ষোভ মিছিল। এ সময়ে সরকারি নির্দেশে মিছিলের ওপর গুলি চালালে আসাদুজ্জামানসহ নিহত হয় বহু সাধারণ মানুষ। ফলে আন্দোলন আরো তীব্র আকার ধারণ করে এবং অন্যান্য রাজনৈতিক দলও এ মৌলিক অধিকার আদায়ের শপথ নিয়ে ৮ দফা কর্মসূচির ভিত্তিতে 'গণতান্ত্রিক সংগ্রাম পরিষদ গঠন করলে এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেরও আইয়ুববিরোধী আন্দোলন গড়ে উঠে। ফলে দেশের সর্বত্র চলতে থাকে আইয়ুববিরোধী গণআন্দোলন। এভাবে প্রচণ্ড আন্দোলনের ফলে আইয়ুব খান বাধ্য হয়ে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা প্রত্যাহার করে নেয়। পরবর্তীতে রাজনৈতিক সংকট নিরসনের লক্ষ্যে আইয়ুব খান এক গোলটেবিল বৈঠক আহ্বান করেন। শেখ মুজিব বৈঠকে যোগ দেন; কিন্তু পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবি না মানায় তিনি ওই বৈঠক বর্জন করেন। ফলে পুনরায় শুরু হয় তীব্র আন্দোলন ও গণবিক্ষোভ। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান দেশের সার্বিক পরিস্থিতির ক্রমাবনতি রোধ করতে ব্যথ হয়ে ১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ সশস্ত্র ক্ষমতা প্রদান সেনাপতি ইয়াহিয়া খানের হাতে অর্জন করে ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ান। দ্বিতীয়বার দেশে জারি হয় সামরিক আইন। এভাবে '৬৯ সালের গণআন্দোলন গণঅভ্যুত্থানে পরিণত হয়। এবং এই পথ ধরেই '৭১ সালে অর্জিত হয় বাংলার স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব।

গণআন্দোলন, ১৯৯০ (Mass Movement, 1990)

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারের হত্যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে সামরিক শাসনের সূত্রপাত ঘটে। তারই ধারাবাহিকতায় সামরিক শাসন চেপে বসেছিল, তার বিরুদ্ধে চলমান আন্দোলন এবং নানা ঘাত-প্রতিঘাত পেরিয়ে ১৯৯০ সালের শেষদিকে আন্দোলনের চরম আকার ধারণ করে এবং ওই সরকারের পতন ঘটে। জনতার এ আন্দোলনে কাছে শক্তিমান একনায়কের নতি স্বীকারের ঘটনা মহিমান্বিত হয়ে আছে নব্বইয়ের গণআন্দোলনে। এরশাদবিরোধী গণআন্দোলনের ছিল তিনটি মূল ধারা: বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট যার প্রধান ছিলেন শেখ হাসিনা, বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী দলের নেতৃত্বাধীন ৭ দলীয় জোট যার প্রধান ছিলেন বেগম খালেদা জিয়া এবং বামপন্থী রাজনৈতিক দলসমূহের ৫ দলীয় জোট। এছাড়া জোটের বাইরে ছিল জামায়াতে ইসলামীর অবস্থান। ১৯৯০ সালের ১০ অক্টোবর ওই তিন জোট পৃথকভাবে সচিবালয় অবরোধের কর্মসূচি পালনকালে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হলে এক ব্যাপকতা লাভ করে। সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য নামে গঠিত এই ঐক্যের আওতায় সমবেত হয় তিন জোটের অনুসারী বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন। শিল্পী সংস্কৃতিকর্মীরাও ছিলেন রাজপথের আন্দোলনে সক্রিয় ও ঐক্যবদ্ধ। এই পটভূমিকায় ১৯ নভেম্বর ঘোষিত হয় ৭,৮ ও ৫ দলীয় ঐক্যজোটের ঐতিহাসিক যুক্ত ঘোষণা। এই ঘোষণায় অবৈধ সরকারের অধীনে অনুষ্ঠেয় সকল নির্বাচন বয়কটের সিদ্ধান্ত হয় এবং নির্দলীয় নিরপেক্ষ অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন সেই সরকারে অধীনে সার্বভৌম সংসদ নির্বাচন ও

জনপ্রতিনিধিদের সমন্বয়ে সরকার গঠনের রূপরেখা দেয়া হয়। এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক জোট ও দলসমূহের এই ব্যাপকভিত্তিক ও কার্যকর ঐক্য গঠিত হওয়ার ফলে আন্দোলনে নতুন মাত্রা ও গতি সঞ্চারিত হয়। ২০ নভেম্বর দেশব্যাপী সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয় এবং ১২ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিন জোটের আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচি ঘোষিত হয়। আন্দোলন দমনের উদ্দেশে স্বৈরাচারী সরকার নিপীড়নমূলক পন্থা অবলম্বন করে এবং পুলিশ ও বিডিআর বাহিনী (বর্তমানে বিজিবি) ছাড়াও সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দেয়। ২৬ নভেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় এদের সৃষ্ট সংঘর্ষে নিমাই নিহত হন এবং পরদিন প্রকাশ দিবালোকে নির্মমভাবে গুলবিদ্ধ হয়ে মারা যান ডা. শামসুল আলম খান মিলন। ডা. মিলরে মৃত্যু সর্বস্তরের মানুষকে ব্যথিত ও ক্ষুব্ধ করে তোল। সকল মহলের থেকে জোরদার প্রতিবাদ জেগে উঠে। পুলিশের লাঠিচার্জ উপক্ষো করে জমায়েত অনুষ্ঠিত করেন সংস্কৃতিকর্মী ও মহিলারা। পত্রিকার প্রকাশনা বন্ধ করে দেন সাংবাদিকরা। সরকারি কর্মচারীসহ বিভিন্ন স্তরের পেশাজীবীরা স্বৈরাচারের অন্যায় আচরণের প্রতিবাদে নেমে আসেন রাজপথে। অবশেষে ৪ ডিসেম্বর রাতে জেনারেল এরশাদ নাটকীয় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন, রাজপথে নেমে আসে বিজয়োল্লাসে আনন্দমুখর জনতার ঢল।

গণউদ্যোগ (Initiative)

সংক্ষেপে বলা যায় জনগণের উদ্যোগ। কিছু সংখ্যক নাগরিক আইনসভায় কোনো প্রস্তাব উত্থাপনের উদ্দেশে নির্বাচকমণ্ডলীর সমর্থন অর্জনের জন্য সরাসরি গণভোট আহ্বান করতে পারেন। মূলত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রচলিত আছে এই বিধান। তবে প্রস্তাবটি কোনো নতুন আইন প্রবর্তন, পুরানো কোনো আইন বাতিল অথবা সংবিধান সংশোধন সংক্রান্ত হতে পারে। গণউদ্যোগ, গণভোট এবং পুনরায় আহ্বান পদ্ধতি তিনটি কার্যত দলীয় ব্যবস্থা এবং বিশেষ করে যেসব দল আইনসভায় আধিপত্য করে তাদের অতিক্রম করে। এতে প্রগতিশীল অনেক আইনকানুনের সংস্কার সাধিত হয়। অবশ্য পদ্ধতি তিনটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্য স্তরেই বেশি কার্যকর হয়ে থাকে। এ ছাড়া ডাকযোগে জনমত গঠনের প্রয়াস দল ও দলহীন, উভয়ভাবেই চলে। সুইজারল্যান্ডে গণভোট প্রথা যথেষ্ট প্রবল। বিশেষ করে সেখানে নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক আইনসভার কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হয়। জনগণ না চাইলে কোনো আইন ফেডারেল কাউন্সিলে পাশ করে লাভ হয় না। জনগণ ইচ্ছা করলে আইনগত প্রক্রিয়ার মাধ্যমে গণভোটের ভিত্তিতে তা বাতিল করে দিতে পারে।

গণতন্ত্র (Democracy)

ইংরেজি democracy শব্দের বাংলা হলো গণতন্ত্র। গ্রিক শব্দ Demos ও Kratos থেকে গণতন্ত্র শব্দটি এসেছে। Demos শব্দের অর্থ হলো জনগণ। আর Kratos শব্দের অর্থ শাসন। কাজেই শব্দগতভাবে জনগণের মাধ্যমে পরিচালিত শাসনব্যবস্থাই হলো

গণতন্ত্র। গণতন্ত্র অর্থ জনগণের শাসন, তাই বোঝা যায় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনগণের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত থাকে। যে শাসনে সর্বসাধারণের অংশগ্রহণের সুবিধা থাকে তাকে গণতন্ত্র বলে। সাধারণভাবে যে রাষ্ট্রব্যবস্থায় সরকার শ্রেণি, গোষ্ঠী বা ব্যক্তির পরিবর্তে সর্বজনের নিয়ন্ত্রণাধীনে চালিত হয় তাকে গণতন্ত্র বলে। তাতে জনগণের দ্বারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রণীত আইন ও সর্ববিধ নীতি নির্ধারিত হয়; নাগরিক অধিকার সকলের সমান, তাঁরা প্রকাশ্য বিচারবিতর্কের মধ্য দিয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটের মাধ্যমে যাবতীয় সিদ্ধান্তে উপনীত হন। প্রাচীন গ্রিসে সরাসরি অংশ গ্রহণের মধ্য দিয়ে জনগণ প্রশাসনে প্রত্যক্ষ অংশ গ্রহণ ক্ষমতা। পরোক্ষ গণতন্ত্রে জনগণের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিরা আইন সভায় যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোনো ব্যবস্থাতে প্রতিটি মানুষের অংশগ্রহণের সুবিধা নেই। সকল মানুষ বাস্তবে শাসনকার্যে অংশ নিতে পারে না। এজন্য ডাইসী বলেছেন, "গণতন্ত্র এমন এক সরকার যেখানে শাসন পরিচালনাকারীর সংখ্যা তুলনামূলক সমগ্র জাতির বৃহদাংশ।" ব্রাইসীও অনুরূপ মতামত প্রদান করেছেন। গণতন্ত্রে মুখ্যত শাসন ক্ষমতা অর্পিত হয়ে থাকে সকলের ওপর কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা ভোট প্রদানকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সিদ্ধান্ত মাত্র। ক্ষমতা কারা এবং কীভাবে নির্ধারণ করবে সে সম্পর্কে জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতোই গণতন্ত্র।

গণতন্ত্রে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অবাধ নির্বাচন ব্যবস্থা একটি স্বাভাবিক নিয়ম। নির্বাচনে কমপক্ষে দুটি প্রার্থী থাকা চাই। স্বাধীন বিচারবিবেচনা সাপেক্ষ অবাধ প্রার্থী বাছাই গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় প্রতিটি মানুষের পক্ষে একটি মৌলিক অধিকার, সেজন্য মুদ্রণ, মতামত প্রকাশ এবং সংস্থাধীনে মুক্ত হওয়ার স্বাধীনতাও গণতন্ত্রের মৌলিক লক্ষণ। কোনো নাগরিকের ব্যক্তিগত বিষয়ে সরকার হস্তক্ষেপ, খেয়ালখুশি মতো নাগরিকদের ধরপাকড় ও বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করা গণতন্ত্রের পরিপন্থী। গণতন্ত্রে আইনের শাসন বিরাজ করে। গণতন্ত্রে বিরোধী দল থাকাটা স্বতঃসিদ্ধ। গণতন্ত্রী ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের ক্ষমতা তিন ভাগে বিভক্ত থাকে, যথা নির্বাচত আইন সভা, প্রশাসনের দায়িত্বে সরকার এবং বিচারালয়। সরকার যুক্তরাষ্ট্রীয় কিংবা এককেন্দ্রিক হতে পারে। সংসদীয় ব্যবস্থায় সরকার সংসদের কাছে এবং প্রেসিডেন্ট জনগণের কাছে (আমেরিকার প্রেসিডেন্ট প্রথায়) দায়ী থাকেন। উভয় ক্ষেত্রেই সংসদ বা আইনসভা কিংবা জনগণ চাইলে সরকারকে পতন ঘটাতে পারে।

আধুনিক গণতন্ত্র প্রজাতান্ত্রিক অথবা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র হতে পারে। সার্বভৌম ক্ষমতা উভয় ক্ষেত্রেই জনগণের ওপর বর্তায়, সংখ্যাগুরু নাগরিকদের ইচ্ছার প্রকাশে সেটা জানা যায়। নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে, সভা-সমিতি কিংবা সংবাদপত্রে প্রকাশিত অথবা অন্য কোনো গণমাধ্যমে জনগণের ইচ্ছা, অসন্তোষ, দাবি ও অভিমত নির্ণয় হলো প্রচলিত রীতি। জনগণের ইচ্ছা নির্ণয় করা যায় গণভোটের মাধ্যমেও।

গণতন্ত্রের দোষগুণ সম্পর্কে নানারকম সমালোচনাও হয়ে থাকে। মার্ক্সীয় দৃষ্টিতে বুর্জোয়া গণতন্ত্রী রাষ্ট্র শ্রেণিবিভক্ত হয়ে থাকে, ফলে শক্তিশালী শোষক শ্রেণি গণতন্ত্রের

সুফল ভোগ করে। অর্থনৈতিক বৈষম্যের দরুণ সবাই সমান সুযোগ পায় না। অবাধ বাণিজ্যি, ব্যক্তিগত মালিকানা ও একচেটিয়া পুঁজিবাদের ফরে বিত্তবান মানুষ বিত্তহীন মানুষকে শোষণ করে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্রেই যথার্থ গণতন্ত্র নিহিত থাকে। তাতে অর্থনৈতিক উৎপাদন, বন্টন ও বিনিময় রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নির্বাহ হয়। চাকুরি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থান ও অবসরের নিশ্চয়তা থাকে। অবাধ ব্যক্তিস্বাধীনতায় ব্যক্তির সংকীর্ণ স্বার্থ ও জনবিরোধী ক্রিয়াকলাপ প্রকাশ পায়।

তবে সমালোচনা থাকলেও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শাসন ক্ষমতায় যাবার একমাত্র পথ হলো জনগণের রায়। জনগণের রায়ে শাসন ক্ষমতায় গিয়ে শাসক নিজের ইচ্ছানুসারে শাসন করতে পারে না। সব সময়ে জনগণের ইচ্ছানুসারে দেশ শাসন করবে এবং তার দ্বারা যে কল্যাণ হবে তা সব সময়েই জনগণের স্বার্থের অনুকূলে হতে হবে। গণতান্ত্রিক শাসনে মতো প্রকাশের অবাধ অধিকার থাকবে। সকল নাগরিক যেন সমান অধিকার ভোগ করতে পারে সে নিশ্চয়তা অবশ্যই থাকবে। আব্রাহাম লিংকন পুনরায় বলেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র বিখ্যাত রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে এ কারণে যে, এটা সেই সরকার যে সরকার জনগণের মন মতো পরিচালিত হয়। হার্নস বলেন, শুধু রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নয়- অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে সরকার হলো জনগণের সেবক। গেটেল গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেন, "গণতন্ত্র হলো সেই ধরনের সরকার যেখানে জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারী হয় (Democracy is that form of government in which the mass of the population possesses the right to share in the exercise of sovereign power.)। এ প্রসঙ্গে আগারওয়ালের মন্তব্য দিয়ে আমরা সমাপ্তি টানব। তিনি বলেন, "আমরা গণতন্ত্র বলতে সেই প্রকার সরকারকে বুঝি যেখানে রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতা জনগণের ওপর অর্পিত থাকে এবং জনগণ হলো সকল ক্ষমতার উৎস। জনগণ সেখানে প্রত্যক্ষ অথবা তাদের প্রতিনিধির মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অংশগ্রহণ করে।"

গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (Institutionalization of Democracy)

ফ্রিডম হাউজের মতে বিশ্বের ১৯৩টি রাষ্ট্রের মধ্যে ১২২টি রাষ্ট্র বিগত অর্ধশতাব্দীর বেশি সময় ধরে নির্বাচনী গণতন্ত্রের মাধ্যমে সরকার পরিবর্তনে অঙ্গীকারবদ্ধ। দক্ষিণ এশিয়ার বেশিরভাগ রাষ্ট্রই এ পদ্ধতি অনুসরণ করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। গণতন্ত্রের এই প্রসারতার মধ্যদিয়ে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে অনেকেই স্বাগত জানিয়েছেন। বিভিন্ন মনীষী গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিকীকরণে ভিন্ন ভিন্ন মতামত ব্যক্ত করেছেন। Larry Diamond and M.F. Plattner উদারনৈতিক গণতন্ত্রের জন্য ৫টি শর্তের কথা উল্লেখ করেন, যথা: মৌলিক স্বাধীনতা, আইনের শাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের জবাবদিহিতা, এছাড়াও অবাধ গণমাধ্যমের স্বাধীনতা, সিভিল সোসাইটির মতামতসহ সামরিক বাহিনীর ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে গণতন্ত্র প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করতে পারে। Robert Dahl গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য কতিপয় শর্তের কথা উল্লেখ করেছেন। যথা—১) সংগঠন করা এবং

সংগঠনে যোগদানের স্বাধীনতা, ২) ভোটাধিকার, ৩) মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, ৪) রাজনৈতিক নেতাদের সমর্থক ও ভোটারদের জন্য প্রতিযোগিতার অধিকার, ৫) তথ্যের বিকল্প উৎস, ৬) অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন। কাজেই আলোচনার ভিত্তিতে বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের নিম্নলিখিত শর্তসমূহ উল্লেখ করা যেতে পারে। শর্তগুলো হলো- ১) অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচন, ২) আইনের শাসন, ৩) নাগরিক মৌলিক স্বাধীনতা এবং ৪) জবাবদিহিতা। প্রথম নির্দেশকটি গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রথম এবং প্রধান ভিত্তি যেহেতু জনগণ নিজের মতো প্রার্থী পছন্দ করতে পারে যে, কে সরকারি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হবেন। তবে এই শর্তটি অর্থহীন হয়ে যায় যদি গণতন্ত্রের অন্যান্য শর্ত পূরণ না হয়। দ্বিতীয় নির্দেশকটিও গণতন্ত্রের জন্য অন্যতম, কারণ জনগণের স্বাধীনতা রয়েছে কথা বলা, চলাফেরা ও প্রার্থী পছন্দ করা, তা না হলে গণতন্ত্রের মূল চেতনা বাস্তবায়িত হবে না। শেষ শর্তটি ও অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ সরকার জবাবদিহিতার মধ্যে ক্ষমতা ব্যবহার করলে স্বৈরাচারী আচরণ করতে পারবে না।

গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা (Democratic Centralism)

কঠোর এককেন্দ্রিক শৃঙ্খলার আওতায়, সংশ্লিষ্ট জনগণ বা সদস্যের মতামত প্রকাশের স্বাধীনতাকেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা বলা হয়। লেনিনের সুপারিশক্রমে সোভিয়েত ইউনিয়নে সরকারি কাজকর্মে নানা ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকালে এ পদ্ধতি চালু হয়। সোভিয়েত ও অন্যান্য দেশের কমিউনিস্ট পার্টি ওই পদ্ধতি অনুসরণ করে থাকে। তাতে পার্টির মধ্যে সকল বিষয়ে অবাধ আলোচনা এবং পার্টির কর্মকর্তা নির্বাচনে অবাধ সুযোগ, একদলীয় রাষ্ট্র ও সর্বোচ্চ পদবিন্যাসের কঠোর নিয়মশৃঙ্খলা বজায় থাকে। মূলত একই মতবাদ বা আদর্শে বিশ্বাসী সদস্য বা ব্যক্তিবর্গ স্ব স্ব ফোরামে অবাধে নিজ নিজ মতামত প্রদান করতে পারেন বটে, কিন্তু একবার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সকলেই তা মানতে বাধ্য থাকেন। কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব সর্বস্তরের সদস্যদের আস্থাভাজন এবং শক্তি ও কর্তৃত্বসহ অধিক ক্ষমতাশীল হয়। কেন্দ্রিকতার অর্থ হলো পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হতে যাবতীয় ক্ষমতা ন্যস্ত থাকা, যাতে বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানে সুস্থ রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার করা যায়; কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, পরিবার থেকে পুলিশি সংগঠন পর্যন্ত; এই বিধিব্যবস্থায় স্বশাসিত প্রতিষ্ঠান গড়া ও পরিচালনার অবকাশ নিতান্তই সীমিত।

কেন্দ্রিকতার বিধিব্যবস্থা গণতান্ত্রিক, তার আংশিক কারণ হলো যে সেসবের মূলে থাকে জনস্বার্থ, কারণ উৎপাদনে ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা হয়, আংশিক অপর একটি কারণ হলো পার্টির মধ্যে অন্তর্দলীয় গণতন্ত্র, যেখানে তলা থেকে সমস্ত পদ নির্বাচনের মাধ্যমে পূরণ হয়। মাও-জে দং পার্টির অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার সঙ্গে জনগণের একটা সম্পর্ক স্থাপনে বিশ্বাস করতেন। তাঁর দৃষ্টিতে গণতন্ত্র ও কেন্দ্রিকতা পরস্পরবিরোধী নয়। বরং দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের অঙ্গ হিসাবে বিরোধী দুটি সত্তার মধ্যে ঐক্যের এট এক নির্দশন বিশেষ। সাধারণত কোনো সমাজতান্ত্রিক বা বিপ্লবী সংগঠনেই গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতা অনুসরণ করতে দেখা যায়।

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism)

গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র প্রত্যয়টির অর্থ হলো প্রতিনিধিত্বমূলক সংসদীয় রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচকমণ্ডলীকে সমাজতন্ত্রে প্রবৃত্ত করা। এই মতবাদ মার্কসবাদ-লেলিনবাদের পরিপন্থী এবং বনেদী মার্কসবাদীদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আসলে সংস্কারবাদীদেরই আদর্শ। এই মতবাদ শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারাদের একনায়কত্বের অপরিহার্যতা স্বীকার করে না। সাধারণত সাম্যবাদ বা সমাজতন্ত্র বিপ্লব ও আকস্মিক অভ্যুত্থানের পর শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়; সেটা হলো সমাজতন্ত্র অভিমুখে বৈপ্লবিক সমাজতান্ত্রিক পথ। ১৯৫১ সালে ফ্রাঙ্কফুর্টে অনুষ্ঠিত সোসালিস্ট ইন্টারন্যাশনাল-এর কংগ্রেসে 'গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রের লক্ষ্যে ও কাজসমূহ' নির্ধারণ করা হয়। অবশ্য গণতন্ত্র (সোস্যাল ডেমোক্রেসি) স্বতন্ত্র বিষয়। গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রে ব্যক্তিস্বাধীনতা, আইনের শাসন ও বহুত্ববাদী সামাজিক পরিবেশ বিরাজ করে। গণতন্ত্রী সমাজতন্ত্রের পথ ইংল্যান্ডের লেবার পার্টি অনুসরণ করে। এই মতবাদ মার্কসবাদ-লেলিবাদের পরিপন্থী এবং বনেদি মার্কসবাদীদের মতে, গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র আসলে সংস্কারবাদীদেরই আদর্শ। এই মতবাদ শ্রেণিসংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ও সর্বহারাদের একনায়কত্বের অপরিহার্যতা স্বীকার করে না।

গণবিধ্বংসী অস্ত্র (Weapons of Mass Destruction WMD)

ডব্লিউএমডি-এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Weapons of Mass Destruction বা গণবিধ্বংসী অস্ত্র। বিগত দশকগুলোতে এটি তেমনটা শোনা না গেলেও ১১ সেপ্টেম্বর টুইন টাওয়ার সন্ত্রাসী হামলায় ধ্বংস হওয়ার পর বিশ্ববাসী এর সাথে এখন সবচেয়ে বেশি পরিচিত। মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের এমন কোনো ভাষণ পাওয়া যাবে না যাতে WMD'র উল্লেখ নেই। মূলত WMD'র অজুহাত ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ইরাক আক্রমণ করে। সবচেয়ে WMD মারাত্মক হচ্ছে পারমাণবিক ও হাইড্রোজেন বোমাসহ অন্যান্য সম্ভব। তবে WMD'র ব্যাপারটি তুলনামূলকভাবে আপেক্ষিক। কারণ কোনো দেশের অশ্বারোহী সৈন্য দলের ওপর অন্যদেশ ট্যাঙ্ক দিয়ে আক্রমণ চালালে তাই তাদের জন্য গণবিধ্বংসী। অর্থাৎ 'ব্যাপক হতাহত ও প্রচুর সম্পদ বিনষ্টকারী অস্ত্রই হচ্ছে WMD।' তবে গণবিধ্বংসী অস্ত্র শুধু পারমাণবিক, জীবাণু, তেজস্ক্রিয় ও রাসায়নিক উপাদানেই সীমাবদ্ধ নয়, বরং মারাত্মক বিস্ফোরক দ্রব্যও এর অন্তর্ভুক্ত, যা ওকলাহোমার ফেডারেল বিল্ডিং ধ্বংস করতে সক্ষম হয়েছে। ভাগ্যের নির্মম পরিহাস, যে WMD'র অভিযোগে যুক্তরাষ্ট্র ইরাক আক্রমণ করে, সেই WMD দিয়েই সে হত্যা করেছে লক্ষ লক্ষ নিরাপরাধ নারী-পুরুষ ও শিশুকে।

গণভোট (Referendum)

গণভোট কথাটির অর্থ হচ্ছে, রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভোটের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের মতামত গ্রহণের প্রক্রিয়া। জনগণের মতামত প্রদান পদ্ধতি। কোনো বিষয়ে

জনমত নির্ণয়ের জন্য সারা দেশের নির্বাচকমণ্ডলীর প্রত্যক্ষ অভিমতযাচাই প্রক্রিয়া। রাষ্ট্রীয় কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে ভোটের মাধ্যমে সমগ্র জনগণের মতামত গ্রহণের অন্যতম নির্বাচনী প্রক্রিয়া। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির প্রচলন করেন। কোনো কোনো দেশে সংবিধান সংশোধন অথবা যেকোনো বিষয়ে জনমত নির্ণয়ের প্রয়োজনে নির্বাচকমণ্ডলীর গণভোট গ্রহণ করা হয়। বাংলাদেশেও এই বিধান সংবিধানে লিপিবদ্ধ আছে। বাংলাদেশে এ পর্যন্ত বেশ কয়েকটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। মূলত সাংবিধানেক মৌলিক পরিবর্তন কিংবা সরকার ব্যবস্থার পরিবর্তনে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। কমনওয়েলথ অব অস্ট্রেলিয়া অ্যাক্ট ১৯৯০ আইন অনুযায়ী অস্ট্রেলিয়ার সংবিধান সংশোধনের পূর্বশর্ত হলো গণভোট। অবশ্য সব ক্ষেত্রে কেবল যে সংবিধান সংশোধনের জন্যই গণভোট হয় তা নয়। সুইজারল্যান্ডে যেকোনো বিষয়ে অন্যূন ত্রিশ হাজার নাগরিক লিখিত দাবি জানালে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ডে এই পদ্ধতির প্রচলন নেই। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে দেশের বিভিন্ন রাজ্যের একতাবদ্ধ থাকার প্রশ্নে গণভোট গৃহীত হয়।

গণভোটে পুরো জনগোষ্ঠীর সকল ভোটার ভোট প্রদান করেন। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন কারণে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংশ্লিষ্ট দেশের সংবিধান ও আইন অনুযায়ী গণভোট অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় এবং নির্দিষ্ট পদ্ধতি মোতাবেক তা অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালে ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট সরাসরি নির্বাচিত হবেন কিনা এ প্রশ্নে গণভোট হয়।

১৯৭৫ সালে যুক্তরাজ্য ইউরোপিয়ান ইকোনমিক কমিউনিটি (European Economic Community-EEC) থেকে বের হয়ে আসবে কিনা এ প্রশ্নে গণভোট হয়। জাতীয় ও সামাজিক ইস্যুতেও গণভোট হয়। যেমন বিবাহ বিচ্ছেদ বা গর্ভপাত বৈধ করা যাবে কিনা এ প্রশ্নে ইতালিতে গণভোট হয়। সংবিধান সংশোধন করার জন্য কোনো কেনো দেশে গণভোটের দরকার হয়। যেমন অস্ট্রেলিয়া, যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশের সংবিধানে সংশোধনী আনা হলে তা শেষ পর্যন্ত গণভোটের মাধ্যমে সমর্থিত হতে হয়।

বাংলাদেশের সংবিধানের ১৪২ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, সংবিধান সংশোধনী বিল সংসদ কর্তৃক গৃহীত হবার পর (দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে) তা রাষ্ট্রপতির কাছে উপস্থাপিত হলে তিনি তাতে সম্মতি দেবেন কিনা এ প্রশ্নে গণভোটের প্রয়োজন হবে। কোনো কোনো সময় গণভোট অনুষ্ঠানের মাধ্যমে ব্যক্তির ক্ষমতা দখলের বৈধতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। যেমন জার্মানিতে অ্যাডলফ হিটলার কর্তৃক ১৯৩৪ সালের গণভোট। বাংলাদেশের দু'বার সামরিক শাসনের পর 'হ্যাঁ' 'না' নামে পরিচিত দুটি গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। গণভোটের মধ্যদিয়ে 'জনগণ সার্বভৌম' এ ধারণার প্রতিফলন ঘটে।

(সূত্র: জালাল ফিরোজ, *পার্লামেন্টারি শব্দকোষ*, ঢাকা: বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

গাজা (Ghaza)

গাজা জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি পার্বত্য সমভূমি। এটার আয়তন ৩৩৬ বর্গ কিলোমিটার অর্থাৎ ১৩৬ বর্গমাইল। এটা ইসরাইল ও মিশরের সিনাই মরুভূমির

মধ্যবর্তী ভূমধ্যসাগরের উপকূলবর্তী এলাকায় অবস্থিত। এটার জনসংখ্যা ৭ এ (১.২) লক্ষ ফিলিস্তিনী এবং ৮ হাজার ইহুদী। তবে প্রকৃত ফিলিস্তিনীদের সংখ্যা ১০ লক্ষেরও অধিক। এদের মধ্যে অনেকে ১৯৪৮ সালে আরব ইসরাইল যুদ্ধের সময় উদ্বাস্ত হয়েছে। এদের মাথাপিছু আয় ৮০০ ডলার। ১৯৬৭ সালে এই এলাকাটি মিশরের নিকট হতে ইসরাইল ছিনিয়ে নিয়ে যায়। বর্তমানে এটি ফিলিস্তিন এর অন্তর্ভূক্ত।

গিলোটিন (Guillotine)

গিলোটিন বলতে বুঝায়, কোনো বিলের ওপর ভোট নেয়ার জন্য আলোচনা সংক্ষিপ্ত বা শেষ করার নির্দেশ দেয়া। আর আলোচনা নয় ভোট হোক-এ ধরনের নির্দেশ। উত্থাপিত কোনো বিলের বা প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক সংক্ষিপ্ত বা শেষ করা।

গিল্ড সমাজতন্ত্র (Guild Socialism)

১৯০৬ সালে ইংল্যান্ডে এই মতবাদের উদ্ভব। মধ্যযুগীয় গিল্ড ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ও তার ভিত্তিতে সমাজ গঠনই এই মতবাদের মূল কথা। মধ্যযুগীয় গিল্ড ব্যবস্থার পুনঃপ্রবর্তন ও তার ভিত্তিতে সমাজ গঠনই এই মতবাদের মূল কথা। এ মতবাদের পুরোধা ছিলেন এ.জে.পেন্টি নামে জনৈক স্থপতি। এই আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে মূলত মধ্যযুগীয় গিল্ড প্রথার আধুনিক পথে পুনঃপ্রবর্তনের লক্ষ্য নিয়ে। গিল্ড সোসালিস্টরা বিশ্বাস করতেন যে যৌথভাবে সম্পদ সৃষ্টি করে সমাজ, ব্যক্তিগত একক প্রচেষ্টায় সে কাজ সাধিত হয় না। তাঁদের মতে ধনতন্ত্রী অর্থনীতি ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণকে সমর্থন করে, কিন্তু সমাজের প্রতি দায়িত্ব কিংবা উত্তরকালের প্রতি কর্তব্য পালন করে না। তারা চাইতেন যে কলকারখানা জাতীয়করণের পরে সেগুলোর ট্রেড ইউনিয়নসমূহ শ্রমিকদের নিয়ে গঠিত এক-একটি গিল্ডের (সমবায়) মতো স্বায়ত্তশাসিত পরিচালনভার গ্রহণ করুক। এই ব্যবস্থায় রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্কার অপেক্ষা অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। তাঁরা চাইতেন মজুরি প্রথার অবসান, শিল্পে স্বায়ত্তশাসন, সমাজের অন্যান্য গণতন্ত্রী সংগঠনের সহযোগে একটি জাতীয় গিল্ড অবকাঠামো গড়ে তোলা। ১৯১৫ খ্রি ব্রিটেনে এই মতবাদ প্রচারের উদ্দেশে জাতীয় গিল্ড গঠিত হয়। ১৯২৫ সালে ভেঙে যায়। ব্রিটেনে আজও এই মতবাদের অনেক সমর্থক রয়েছে।

গীর্জা ও রাজা (Charch and State)

মধ্যযুগে জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে গীর্জার যাজকের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। তিনি নৈতিকতা বিরোধী কাজের জন্য ধর্মীয় নীতি অনুসারে শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা ন্যস্ত ছিল। এ ক্ষমতা বলে যে কোনো অপরাধের জন্য পোপ সম্রাটকেও শাস্তি দিতে পারত। নবম শতকের প্রথম দিকে পোপ লবেনের রাজা লয়েথারকে ক্ষমতাচ্যুত করেছিল। কিন্তু তাদের এই ক্ষমতা বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। গির্জার পোপেদের জাঁক জমকপূর্ণ জীবনযাপন দেখে

সাধারণ জনগণ তাদের ওপর আস্থা হারিয়ে ফেলে। চতুর্দশ শতকে গির্জার সম্পত্তির কর আরোপ প্রশ্নে যখন পোপ অস্টম বেনিকোসের সাতে ফ্রান্সের রাজ ফিলিপ ডি. ফেরারের সংঘর্ষ বাধে। তখন পোপ রাজার কাছে পরাজিত হয়। তাছাড়া যাজকরা পরকালের ভয় দেখিয়ে বা পাপ পূণ্যের কথা বলে জনসাধারণের নিকট অর্থ ও আনুগত্য আদায় করত। ফলে গির্জার প্রতি জনগণের যে আস্থা বা আনুগত্য ছিল তা লোপ পায় এবং রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

গৃহযুদ্ধ (Civil War)

কোনো রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ পরস্পরবিরোধী রাজনৈতিক বা সামরিক শক্তি কিংবা জাতিসত্ত্বার মধ্যেকার সশস্ত্র যুদ্ধই হলো গৃহযুদ্ধ। গণবিরোধী শাসক শোষক গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে শোষিত নিপীড়িত জনগণের যুদ্ধই হলো গণযুদ্ধ। যেকোনো রাষ্ট্রে অভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা কিংবা সংঘর্ষের একটি রূপ হলো গৃহযুদ্ধ। কোনো দেশের রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের জন্য সে দেশের বিভিন্ন শ্রেণি, ধর্ম, জাতি অথবা রাজনৈতিক দল কিংবা গোষ্ঠীর মধ্যে সশস্ত্র সংঘর্ষ হতে পারে। এটি হতে পারে সরকারের সাথে সরকারবিরোধী রাজনৈতিক, সামরিক বা জাতিসত্তাভিত্তিক শক্তির যুদ্ধ। আবার হতে পারে সামরিক শক্তির সাথে রাজনৈতিক শক্তির যুদ্ধ। এমনকি রাজনৈতিক বা সামরিক কাঠামোর একাংশের সাথে অপরাংশের যুদ্ধ কিংবা জনগণের সঙ্গে কোনো জাতিসত্তাবিশেষের যুদ্ধও হতে পারে। প্রাচীন রোম, ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশের ইতিহাসে গৃহযুদ্ধের অনেক নজির আছে। যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে উত্তর ও দক্ষিণের অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে তীব্র সংঘর্ষ ঘটে (১৮৬১-৬৫); এতে প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিঙ্কন নিহত হন। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মাঝে এবং পরবর্তীকালে স্পেন, যুগোস্লাভিয়া আফগানিস্তান ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে দীর্ঘকাল যাবৎ গৃহযুদ্ধ চলে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণি সংগ্রামের প্রক্রিয়ায় সামাজিক সংকটের ফলে গৃহযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। ক্ষেত্রবিশেষে গৃহযুদ্ধ আন্তর্জাতিক স্তরে এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে বিস্তৃত হতে পারে। ১৯১৭ সালে রাশিয়ায় অক্টোবর বিপ্লবের পর ক্ষমতাচ্যুত প্রতিবিপ্লবী শ্রেণি ও শক্তিগুলোর যোগাসাজসে অন্যান্য রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের ফলে তীব্র গৃহযুদ্ধ দেখা দেয়। ১৯২১ সালে সোভিয়েত শাসন ব্যবস্থার জয় ও প্রতিষ্ঠা হয়। শ্রীলংকা সরকারের সঙ্গে তামিলদের যুদ্ধকে এর উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে।

গেজেট (Gazette)

গেজেট বা ঘোষণাপত্র ; প্রকাশপত্র ; সরকারি সংবাদপত্র বা ইশতেহার ; সরকারি দফতরের সংবাদ, আদেশ, আইনকানুন ইত্যাদি সম্বলিত বিবরণী। সরকারি ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে সরকার জেলা, শহর, নগর প্রভৃতি সম্বন্ধীয় তথ্যাদির সমাবেশ করে ও সেগুলোকে পুস্তকাকারে প্রকাশ করে থাকে। এই ঘোষণাপত্রে শহরের অফিস, আদালত ও অন্যান্য সরকারি কার্যালয় সম্বন্ধীয় তথ্যাদির বিষদ বিবরণ থাকে।

গেরিলা যুদ্ধ (Guerrilla War)

গেরিলা কথাটি এসেছে স্প্যানিশ Guerra শব্দ থেকে এসেছে, যার অর্থ হচ্ছে এক বিশেষ কায়দার যুদ্ধ। গেরিলা শব্দের মূল কথা হচ্ছে, বৃহৎ ও নিয়মত শত্রুবাহিনীর ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনিয়মত বাহিনীর মাধ্যমে আতর্কিত আক্রমণ চালানো। বৃহত্তর বাহিনীকে হয়রানি, নাজেহাল ও সম্ভবস্থলে নির্মূল করে দেওয়ার মাধ্যম হলো গেরিলা। গেরিলাযোদ্ধারা সম্মুখযুদ্ধ যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে। সাধারণত কৌশলে কিংবা গোপনে এ ধরনের যুদ্ধ পরিচালিত হয়ে থাকে। কোনো স্বৈরাচারী সরকারি শক্তির কিংবা কোনো বিদেশি হানাদার বাহিনীর বিরুদ্ধে এবং মুক্তিকামী জনগণের সপক্ষে। মূলত সাধারণ জনগণের মাধ্যমে গেরিলা বাহিনী গঠিত হয়। ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়বাদী ও বৈপ্লবিক, উভয় ধরনের সংগ্রামেই এই যুদ্ধ কৌশল প্রয়োগ করা হয়। কৌশলটি সম্পর্কে মাও জে-দং, আর্জেন্টিনার চে গুয়েভারা, ফরাসি কমিউনিস্ট রেজিস ডেবরে প্রমুখ বিপ্লবী নেতারা নানা ধরনের তত্ত্ব উদ্ভাবন করেছেন। মাও মনে করতেন জনগণের সশস্ত্র সংগ্রাম ও ক্ষমতা দখলের ক্রিয়াকৌশলে গেরিলাযুদ্ধ পদ্ধতি একান্তই আবশ্যক। ডেবরে আরও একটু এগিয়ে গিয়ে বলেন যে বিপ্লবের পরিস্থিতি সৃষ্টির পক্ষে জনগণের সমর্থন অপেক্ষা গেরিলা যুদ্ধের প্রক্রিয়া অনেক বেশি কার্যকর। ওই সমস্ত তত্ত্বেই রাজনৈতিক ও সামরিক, উভয় প্রকার ভূমিকায় দলের কর্মপন্থাকে সঠিকভাবে রূপায়ণ গেরিলা আন্দোলনের পক্ষে সম্ভব। গেরিলাযোদ্ধারা অনেকে এক ঝাঁক ভিমরুলের মতো, যারা একটি বড় জানোয়ারদেরকে নাজেহাল ও সরবরাহ ইত্যাদির জন্য জনগণের ওপরই নির্ভর করে। গেরিলারা সাধারণত এমন এক সময় এমনদিক থেকে হামলা চালায়, যা শত্রুর কাছে নিতান্তই অপ্রত্যাশিত থাকে। বৃহৎ নিয়মিত বাহিনীর বিরুদ্ধে গেরিলাযুদ্ধ বিশেষভাবে ফলপ্রসূ বিবেচনা করা হয়।

গোপন সভা (Caucus)

গোপন সভা মতলব আঁটিবার জন্য কোন রাজনৈতিক দলের ক্ষুদ্র সমিতি। 'ককাস' বলতে আরও বোঝায় নির্বাচন প্রার্থীদের মনোনয়ন ব্যপারে মতৈক্যে পৌছাবার জন্য বা কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার জন্য কোন রাজনৈতিক দরের নেতাদের গোপন সভা। কোন শহর বা অঞ্চলের ভোটদাতাদের প্রাথমিক সম্মেলন। আইনপরিষদের বিভিন্ন পদ ও সমিতির পদের জন্য প্রার্থী মনোয়ন; দলের নেতা নির্বাচন এবং প্রস্তাবিত আইনের খসড়া সম্বন্ধে যুক্ত কর্মপন্থা নির্ধারণ করার আইনপরিষদের এক বা উভয় কক্ষের একই রাজনৈতিক দলভুক্ত সদস্যদের গোপনসভা।

গোলাপের যুদ্ধ (War of Roses)

সামন্ত সম্প্রদায়ের দু'টি উপদলের মধ্যে স্বার্থের সংঘাতই হলো গোলাপের যুদ্ধ নামে খ্যাত। ক্ষমতা লাভের জন্য ভূ-স্বামীদের দু'টি গোষ্ঠীর মধ্যে ক্ষমতার লড়াই শুরু হয় এবং তা ত্রিশবর্ষব্যাপী 'চলে অর্থাৎ যে ঘটনা হেনরী টিউভরের সিংহাসনে আরোহণের

পথ প্রশস্ত করে তা ত্রিশবর্ষব্যাপী গোলাপের যুদ্ধ। এই যুদ্ধ ল্যাংকারস্টার এবং ইয়র্ক বংশের মধ্যে সংঘটিত হয়। এতে ল্যাংকাস্ট্রীয় যুবরাজ আলী অব রিচমন্ড হেনরী টিউডর বিজয়ী হন। এ গোত্রীয় দ্বন্দ্ব সাধারণ জনগণের ওপর বিশেষ কোন প্রভাব ফেলেনি। প্রথম পক্ষ ইয়র্কের সমর্থন করে দক্ষিণের নাইট সম্প্রদায় ও নগরাঞ্চলের অধিবাসীদের এবং দক্ষিণের বৃহৎ সামন্তদের অংশ বিশেষ অর্থনৈতিক দিক থেকে অধিকতর বিকশিত। এই পক্ষের প্রতীকে সাদা গোলাপ আঁকা থাকত। দ্বিতীয় পক্ষ উত্তরের কাউন্টিগুলির সামন্ত অভিজাতগণ ল্যাংকারস্টারদের সমর্থন করে। এই পক্ষের প্রতীকে লাল গোলাপ আঁকা থাকত। তাই এই যুদ্ধ গোলাপের যুদ্ধ নামে পরিচিত।

গোষ্ঠীতন্ত্র (Oligarchy)

গোষ্ঠীতন্ত্র হলো মুষ্টিমেয় ব্যক্তির শাসন। অ্যারিস্টটল অভিজাততন্ত্রের সঙ্গে এই প্রত্যয়টির পার্থক্য নিরূপণ করেছেন। পার্থক্যের মূল কথা হলো, অভিজাততন্ত্র সবার স্বার্থ রক্ষা করে, আর গোষ্ঠীতন্ত্রে মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ রক্ষিত হয়। গোষ্ঠীতন্ত্রে একটি দলের সরকারের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে। এতে কারও স্বার্থ রক্ষিত হয় আবার কারও হয় না। ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে কতিপয় ব্যক্তির হাতে। কতিপয় ব্যক্তির শাসনও বলা যেতে পারে। সাধারণভাবে ক্ষমতা গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন ব্যক্তির হাতে অল্পবিস্তর আবদ্ধ থাকে। রাজতন্ত্র, গণতন্ত্র নির্বিশেষে সব ধরনের সরকারের ওপর গোষ্ঠীতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ একটা স্বাভাবিক ব্যাপার। সেজন্য যাচাই করে দেখা ভাল যে, কী রীতিনীতির ভিত্তিতে গোষ্ঠীতন্ত্রভুক্ত ব্যক্তিরা যুক্ত হয়েছে এবং তাদের ক্ষমতার পরিধি কতটা। নির্বাচনে হটিয়ে দেওয়া ছাড়া গোষ্ঠীতন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করা সাধারণ লোকের পক্ষে কতদূর সম্ভব তা নিয়ে বিতর্ক আছে। সেটা গণতন্ত্রে কষ্টসাধ্য নয়। তবে প্রভাব খাটিয়েও লোকে গোষ্ঠীতন্ত্রের মতিগতি বদলাতে পারে বলে কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী মনে করেন। ইদানীং গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাও গোষ্ঠীতন্ত্রে রূপ নিয়েছে।

গৌরবময় বিপ্লব (Glorious Revolution)

১৬৪৯ সালে রাজা প্রথম চার্লসের মৃত্যুর পর ওলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে সাধারণতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। ইংল্যান্ড, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ড ১৬৫৫ সাল থেকে ১৬৬০ সাল পর্যন্ত একটি লিখিত সাধারণতান্ত্রিক সংবিধানের দ্বারা শাসিত হয়, কিন্তু ক্রমওয়েলও কালক্রমে স্টুয়ার্ট রাজাদের মত পার্লামেন্টের বিরোধিতা করে নিজের ইচ্ছামত শাসনকার্য পরিচালনা করতে শুরু করেন। ১৬৫৮ সালে ক্রমওয়েলের মৃত্যুর দু'বছরের মধ্যে ইংল্যান্ডে সাধারণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার অবলুপ্তি ঘটে এবং পুনরায় রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর স্টুয়ার্ট বংশের দ্বিতীয় চার্লস পার্লামেন্টের প্রাধান্য স্বীকার করে নিয়ে ক্ষমতার অধিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাঁর উত্তরসূরীরা এটা মেনে নিতে প্রস্তুত ছিল না। ফলে পার্লামেন্ট ও রাজার দ্বন্দ্ব আবার আরম্ভ হয়।

এইভাবে পার্লামেন্ট ও রাজার ক্ষমতার দ্বন্দ্বে পার্লামেন্ট জয়ী হয়। স্টুয়ার্ট রাজা দ্বিতীয় জেমস এই সময় দেশ থেকে বিতাড়িত হন। এবং একটি বিশেষ পার্লামেন্ট দ্বিতীয় জেমস্ এর কন্যা মেরীকে সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করান যার ফলশ্রুতিতে স্টুয়ার্ট রাজাদের রাজত্বের অবসান ঘটে। বিনা রক্তপাতে ঐতিহাসিক গৌরবময় বিপ্লবের অবসান ঘটে।

গ্রিক রাষ্ট্রদর্শন (Greek Political Philosophy)

পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের মূল উৎস হিসেবে গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনকে চিহ্নিত করা হয়। রাষ্ট্রচিন্তা বা রাষ্ট্রদর্শনের বিকাশ ও উন্নয়ন পাশ্চাত্যের অনেক দেশে হলেও মৌলিকত্ব, গুরুত্ব এবং নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণে গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনই প্রথম ও প্রধান বিবেচ্য বিষয় হিসেবে গৃহীত। খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম শতক গ্রিক দর্শনের বিকাশ কাল। সুদূর অতীতে ইজিয়ান সাগর বিধৌত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপমালা বেষ্টিত এই উপদ্বীপে রাষ্ট্রদর্শনেও যে চরম উৎকর্ষ সাধিত হয় পাশ্চাত্য তাকে ফুলে ফুলে সুশোভিত করে বর্তমান গৌরবময় রূপদান করে। গ্রিকরা ছিল যুক্তিবাদী, ব্যক্তিস্বাতন্ত্রবাদী এবং বিশ্বসমাজকে শৃঙ্খলিত বলে মনে করত। তাই তাদের দর্শন সমগ্র ইউরোপ এবং আধুনিককালে আমেরিকায় পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শনের যথার্থ পরিচর্যার ফলে তা আজকের উন্নত অবয়ব লাভ করে। তাই ভৌগোলিক তথা দুই বিশ্বের ধারণা মোতাবেক এই দর্শন ঐতিহাসিক আমল থেকে পাশ্চাত্য রাষ্ট্রদর্শন বলে (Western Political Thought) বলে অভিহিত করা হয়। তা প্রাচীন গ্রিসের রাষ্ট্রদর্শনে প্রাথমিক পরিচর্যা ও লালন পরিলক্ষিত হয়।

গ্রিক সভ্যতা (*Greek* Civilization)

গ্রিক সভ্যতা বিশ্বের সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম। শিল্প, বিজ্ঞান, ইতিহাস, দর্শন ও সাহিত্য-প্রতিটি ক্ষেত্রে এর অবদান বিশ্বাসভ্যতার উল্লেখযোগ্য স্থান দখল করে আছে। হোমারের মহাকাব্যে বর্ণিত আকিয়ানেরা যে গ্রিকভাসীয় ছিল তার প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সভ্যতার বিকাশে ও সমৃদ্ধিতে আকিয়ানসহ দোরিয়ান ও আয়োনিয়ানদের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ সাল নাগাদ তারা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে গ্রিসে প্রবেশ করতে শুরু কর। খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ থেকে ১১৩০ অব্দ সময়সীমার মধ্যে মিকোনাই টিরিনস ও পিলস অঞ্চলে বিকশিত হয় এক অগ্রসর ব্রোঞ্জ সভ্যতা। গ্রিক সে সময় কতগুলো ছোট-বড় স্বাধীন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রতিটি রাজ্যের কেন্দ্রস্থলে ছিল দুর্গাপ্রাকারময় প্রাসাদ। আমলাতন্ত্রের একাধিপত্য, ক্রীতদাস প্রথা ও শ্রমবিভাগ প্রচলিত ছিল এই সব ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে। গ্রিক সভ্যতা ও সংস্কৃতি অবিচ্ছেদ্যভাবে নগররাষ্ট্রের সঙ্গে জড়িত। এই সভ্যতা বিকাশ লাভ করে প্রথমে ইজিয়ান দ্বীপপুঞ্জে এমিয়া মাইনরের ইজিয়ান উপকূলবর্তী শহরগুলোতে, এথেন্স, তারপর সিসিলি ও দক্ষিণ ইতালির গ্রিক উপনিবেশগুলোতে। গ্রিকদের ধর্মবিশ্বাস ছিল প্রবল। তাদের দেবদেবির সংক্রান্ত ছিল অনেক তাদের বিশ্বাস ছিলাম এই সব দেবদেবীই তাদের ভাগ্যের নিয়ন্তা।

গ্রেট ব্রিটেন (Great Britain)

ব্রিটেনে হল ৯৪২৮৫ বর্গমাইল বিশিষ্ট একটি স্বল্প আয়তনের রাষ্ট্র। এই ভূ-ভাগটিকে ইংলিশ চ্যানেল ইউরোপীয় উপমহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। সমুদ্রবেষ্টিত এই ক্ষুদ্রাকৃতির দেশটির ভৌগোলিক অবস্থান জাতীয় জীবনের ক্ষেত্রে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডের সাথে ওয়েলস্ সংযুক্ত হয়। ১৭০৭ সালে এদের সঙ্গে স্কটল্যান্ড সংযুক্ত হয়। এই ভূ-ভাগকে সরকারিভাবে 'গ্রেট ব্রিটেন Great Britain বলা হয়। আয়ারল্যান্ডের পার্লামেন্ট ১৯১৮ সালে গ্রেট ব্রিটেনের সঙ্গে আয়ারল্যান্ডকে সংযুক্ত করার প্রস্তাব করে। এইভাবে ইংল্যান্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড ও আয়ারল্যান্ডকে নিয়ে 'গ্রেট ব্রিটেন ও আয়ারল্যান্ড যুক্তরাজ্য' (United Kingdom Great Britain and Ireland) একটি রাষ্ট্র ছিল। কিন্তু দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড ১৯২২ সালে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় এবং স্বতন্ত্র ও স্বাধীন 'আইরিশ সাধারণতন্ত্র' (Irish Republic) গঠন করে। তার ফলে ইংল্যান্ড, ওয়েলস্, স্কটল্যান্ড, উত্তর আয়ারল্যান্ড ও ছোট কয়েকটি দ্বীপ নিয়ে গ্রেট ব্রিটেন গঠিত। উল্লেখ্য যে, ২০১৪ সালে স্কটল্যান্ড আলাদা রাষ্ট্র হওয়ার জন্য গণভোটের আয়োজন করে হেরে যায়।

গ্রোজনী (Grozni)

চেচনিয়া একটি মুসলিম অধ্যুষিত রুশ প্রজাতন্ত্র। এই চেচনিয়া প্রজাতন্ত্রের রাজধানীর নাম গ্রোজনী। এটি একটি বৃহৎ শিল্পকেন্দ্র। ১৯৯১ সালে চেচনিয়া স্বাধীনতা ঘোষণা করলেও চেচনিয়ার স্বাধীনতাকে রাশিয়া স্বীকার করে না। মূলতঃ চেচনিয়া রাশিয়ার একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রজাতন্ত্র।

গ্লাসনস্ত (Glasnost)

গ্লাসনস্ত শব্দের অর্থ হচ্ছে খোলামেলা আলোচনা। সাবেক সোভিয়েত পার্টির নেতা মিখাইল গর্বাচেভ খোলামেলা আলোচনা, স্বাধীনভাবে মত প্রকাশের অধিকার, নির্বাচন পদ্ধতি উন্নত করা এবং মতামতকে উৎসাহিত করার কথা বলেন। গ্লাসনস্ত এর মূল কথা হলো অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে ভবিষ্যতে অগ্রসর হওয়ার জন্য অতীত ইতিহাস আর বর্তমান ও ভবিষ্যতের নীতি ও কাজ সম্পর্কে খোলামেলা আলোচনা করে।

ঘাটতি বাজেট (Deficit financing)

আয়-ব্যয় সম্পর্কিত বিষয়। সাধারণত পরিকল্পিতভাবে আয় অপেক্ষা অতিরিক্ত ব্যয় বরাদ্দ থাকাই ঘাটতি বাজেট। সরকারি ভাষায় অনেক সময়ে এই পদ্ধতিকে ক্ষতিপূরণের অর্থসংস্থান বলা হয়। বাজেটের ঘাটতি পূরণ করা হয় নানা ভাবে ঋণ সংগ্রহ করে। ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করাই হলো প্রকৃত উদ্দেশ্য। সরকারি ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির ঘাটতি আর্থিক নীতি একটি

নীতি হিসেবে অনুসৃত হয়। সরকারের মুদ্রাসংক্রান্ত নীতির অঙ্গ হিসেবে ঘাটতি বাজেট প্রণালী প্রবর্তনের পেছনে জন মেনার্ড কিনসের সুপারিশ প্রভাব বিস্তার করে। ঘাটতি বাজেটের মাধ্যমে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি তথা ক্রয়ক্ষমতা বর্ধিত হয় বলে মূল্যবৃদ্ধি ও মুদ্রাস্ফীতি ঘটে। সরকারি ঋণের চাহিদা মেটাবার জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ককে অতিরিক্ত নোট ছাপতে হয়।

ঘুষ (Bribery)

ঘুষ হলো এক ধরনের উপঢৌকন যা মক্কেল তার কাজ আদায়ের জন্য প্রদান করে থাকে। ঘুষদান বা ঘুষগ্রহণ বেআইনী কার্যে সাহায্য লাভের জন্য গোপনে প্রদত্ত পুরস্কার। কোন সরকারি কর্মচারীর কাজকে প্রভাবিত করার জন্য গোপনে অর্থ বা অন্য কোন প্রকার পুরস্কার প্রদান করাকে ঘুষদান বলা হয়।

চব্বিশতম অক্ষরেখা (24th Parallel)

২৪তম অক্ষরেখা পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যকার কচ্ছ এলাকার সীমান্ত রেখা, ১৯৪৮ সালে এই কচ্ছ এলাকা নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়। কচ্ছের রান এলাকা নিয়ে বর্তমানেও পাক-ভারতের মধ্যে সামরিক উত্তেজনা বিদ্যমান।

চরমপত্র (Ultimatum)

চূড়ান্ত দাবি কিংবা শেষ প্রস্তাবই চরমপত্র। কোনো প্রস্তাব বা দাবি মেনে নেয়ার জন্য শেষ সময় বেঁধে দেয়া। বিরোধী দল বা কোনো বিশেষ স্বার্থগোষ্ঠী সরকারের প্রতি চূড়ান্ত সময় দিয়ে এর মধ্যে দাবি না মানা হলে চরম ব্যবস্থা বা চূড়ান্ত কর্মসূচি নেয়া হবে বলে হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করতে পারে।
আলটিমেটাম বা চরমপত্র সংসদীয় রাজনীতির ক্ষেত্রেও বহুল পরিচিত। পার্লামেন্টে কোনো প্রস্তাব উত্থাপন করে তা মানা বা পাস করার জন্য বিরোধী দল বা বিরোধী দলগুলোর জোট রাজপথে আন্দোলন করর বলে আলটিমেটাম দিতে পারে। বাংলাদেশে নব্বই-পরবর্তী প্রায় প্রতিটি সংসদ নির্বাচনের পূর্বেই রাজনৈতিক দলগুলোর চরমপত্রের ঘোষণার ঘটনা ঘটেছে।

চরমপন্থা (Extremism)

চরমপন্থা বিভিন্ন অর্থে প্রকাশিত হতে পারে। কোনো রাজনৈতিক চিন্তার ফলাফল, হিতাহিত, সম্ভাব্যতা, যৌক্তিকতা, প্রতিক্রিয়া ইত্যাদি নির্বিচারে শেষ সীমায় নিয়ে যাওয়ার প্রবণতা। এছাড়াও মুখোমুখি সংঘর্ষে আসা, বিরোধী পক্ষকে খতম করার প্রত্যয়ও চরমপন্থা প্রত্যয়ভুক্ত হতে পারে। অপরের সব কিছু চিন্তার প্রতি অসহিষ্ণুতা এবং অহিংসায় অনীহা প্রকাশ। রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য যেকোনো মাধ্যম

অবলম্বন, যেটা প্রচলিত আচরণবিধি লঙ্ঘন করে, বিশেষ করে যেগুলো অপরের জীবন, স্বাধীনতা ও মানসিক অধিকারের প্রতি তাচ্ছিল্য কিংবা বিরোধিতা প্রদর্শন করে। বিক্ষোভ, বিদ্রোহ ও বিপ্লবের অস্পষ্ট লক্ষ্য ও আদর্শে বিশ্বাস এবং ক্ষমতা দখল ও সন্ত্রাসবাদী কৌশল প্রয়োগের চেষ্টাও চরমপন্থা হতে পারে।

চাহিদা (Demand)

সাধারণত কোনো কিছু পাওয়ার ইচ্ছা বা আকাঙ্ক্ষাকে চাহিদা বলে। কিন্তু অর্থনীতিতে চাহিদা বলতে কেবল আকাঙ্ক্ষাকেই বোঝায় না, বরং যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করার মতো অর্থ আছে এবং তা খরচ করার ইচ্ছা আছে তাকে চাহিদা বলে। যেমন— একজন ভিক্ষুকের মোটর গাড়ী ক্রয় করার প্রবল আকাঙ্ক্ষা থাকতে পারে, কিন্তু তার তা ক্রয় করার মতো অর্থ নেই। তাই কেবল তার আকাঙ্ক্ষাই চাহিদার সৃষ্টি করতে পারে না। আকাঙ্ক্ষাকে পূরণ করার জন্য তার ক্রয়ক্ষমতা থাকতে হবে। আবার আকাঙ্ক্ষা এবং ক্রয়ক্ষমতা থাকলেই চাহিদার সৃষ্টি হয় না; যেমন, কৃপণের কোনো জিনিস পাবার আকাঙ্ক্ষা আছে এবং প্রয়োজনীয় অর্থও আছে কিন্তু ওই অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা নাই। এক্ষেত্রে চাহিদার সৃষ্টি হয় না। চাহিদার সৃষ্টি হতে হলে আকাঙ্ক্ষা ও ক্রয়ক্ষমতার সাথে সাথে সেই ক্রয়ক্ষমতা ব্যয় করার ইচ্ছা থাকতে হবে। বস্তুত তিনটি উপাদানের সমন্বয়ে চাহিদার সৃষ্টি হয়। যথা– (১) কোনো দ্রব্য পাবার আকাঙ্ক্ষা, (২) তা ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ এবং (৩) ওই অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকতে হবে। অধ্যাপক পেন্‌সন বলেন, "কোনো দ্রব্য পাওয়ার ইচ্ছার পশ্চাতে অর্থ ব্যয় করার সামর্থ্য ও অর্থ ব্যয় করার ইচ্ছা থাকলে তখন তাকে চাহিদা বলা হয়।

চিত্তরঞ্জন দাস (Chittaranjvan Das)

দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস, সবার কাছে যিনি সি. আর. দাস নামে পরিচিত। স্বাধীনতা আন্দোলনের এক জনপ্রিয় নেতা। অপূর্ব ছিল তার দেশপ্রেম। অসামান্য ছিল তার স্বার্থত্যাগ। পরদুঃখকাতর চিত্তরঞ্জন দেশবাসীর কল্যাণে তার ধনদৌলত, আরাম-সুখ, আহার-নিদ্রা সবকিছু ত্যাগ করেন। তার অতুলনীয় দেশপ্রেম ও স্বার্থত্যাগের জন্যই দেশবাসী তাকে দেশবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ১৮৭৯ সালের ৫ নভেম্বর কলকাতার একজন পটলডাঙা স্ট্রিটের এক মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা ভুবনমোহন দাস ছিলেন কলকাতার একজন স্বনামধন্য আইনজীবী।

চিত্তরঞ্জনের শিক্ষাজীবন শুরু হয় ভবানীপুরের লন্ডন মিশনারি স্কুল। এই স্কুল থেকে প্রবেশিকা পাস করে তিনি ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। সেখান থেকে বি.এ. পাস করে আইসিএস পরীক্ষা দেবার জন্য বিলেতে যাত্রা করেন।

১৯১৭ সালে চিত্তরঞ্জন বাংলা কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯১৮ সালের ২৯ মে বোম্বেতে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এই বক্তৃতাতেই তিনি বলে যে, মহাত্মা গান্ধীর নীতিতে স্বরাজ বা স্বাধীনতা লাভ করা সম্ভব নয়। ১৯১৯

সালের মে মাসে ময়মনসিংহে যে প্রাদেশিক কংগ্রেসের অধিবেশন বসে তাতেও তিনি অসহযোগ আন্দোলনের প্রস্তাব দেন। কিন্তু তাঁর সে প্রস্তবের বিরোধিতা করেন মহাত্মা গান। এতদসত্ত্বেও আন্দোলন শুরু হয়। এবং অন্যান্য নেতার সাথে চিত্তরঞ্জনও গ্রেফতার হন। ১৯২২ সালের জানুয়ারিতে তিনি জেলে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ওই সময়ে তাঁর রাজনৈতিক সহযোগী ছিলেন নেতাজি সুভাষ বসু। তিনি ১৯২১ সাল থেকেই দেশবন্ধুর সহকারী হিসেবে ব্যারিস্টারি করেন। সুবাস বুস শুধু চিত্তরঞ্জনের সহকর্মীই ছিলেন না, তাঁর রাজনৈতিক আন্দোলনেরও প্রধান সহকারী ছিলেন। আন্দোলনে যোগদান করে সুভাষ বুসও একই সাথে কারাবরণ করেন। ১৯২২ সালের ৯ আগস্ট চিত্তরঞ্জন জেল থেকে মুক্তি লাভ করেন। এ খবর ছড়িয়ে পড়ার সাথে সাথে সারা কলকাতয়র মানুষ তাঁকে একনজর দেখার জন্য ভেঙে পড়ে। জেল থেকে ফিরে আসার পরই দেশবাসী তাঁকে 'দেশবন্ধু' আখ্যা দান করে। এরপর থেকে তিনি 'দেশবন্ধু' নামেই পরিচিতি ছিলেন।

চিত্তরঞ্জন ছিলেন উদারনীতির মানুষ। তিনি হিন্দু-মুসলমানের মিলন চাইতনে। তিনি বিশ্বাস করতেন হিন্দু-মুসলমানদের সমঝোতা ছাড়া স্বাধীনতা সংগ্রাম জোরদার হবে না। তাই তৎকালীন মুসলিম নেতাদের সাথে তিনি একটি আপোস মীমাংসায় আসেন। এটাই ছিল বেঙ্গল প্যাক্ট। এরপরই চিত্তরঞ্জন দেখলেন, কংগ্রেসের সাথে একত্রে রাজনীতি কথা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। অতঃপর তিনি নিজেই একটি রাজনেতিক দল গঠন করলেন। এর নাম ছিল 'স্বরাজ দল'। তাঁর স্বরাজ দল অল্পদিনেই প্রচণ্ড জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। ১৯২৩ সালে বঙ্গীয় আইনসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। তাতে স্বরাজ পার্টি বিপুল ভোটে জয়লাভ করে। তৎকালীন বাংলার গর্ভনর লর্ড লিটন তাঁকে মন্ত্রিসভা গঠনের আহ্বান জানালেও তিনি গেলেন না। কারণ মন্ত্রিপরিষদের ক্ষমতা ছিল খুবই সীমত। তাছাড়া তিনি তখন ছিলেন অসহযোগ আন্দোলনের পক্ষে। শুধু জনমসমর্থন আদায়ের জন্যই তিনি নির্বাচনের অংশ নেন। ১৯২৪ সালে কলকাতা করপোরেশনের যে নির্বাচন হয় তাতে তাঁর স্বরাজ পার্টি জয়লাভ করলে তিনি করেপারেশনের মেয়র নির্বাচিত হন এবং ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন হোসেন শহীদ সোওরাওয়ার্দী। ১৯২৪ সালের ৪ জুলাই অধিবেশেনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব দেন। অবশেষে দার্জিলিং-এ ১৯২৫ সালের ১৪ জুন পরোলকগমন করেন।

চীনা বিপ্লব (China Revolution)

বিশ শতকের শুরুর দিকে ১৯১২ সালে সান ইয়াৎ সেন-এর নেতৃত্বে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে চীনে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু রাজনৈতিক হানাহানি ও নিজস্ব সেনাবাহিনী বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রধানদের মধ্যে বিরোধ প্রজতন্ত্রের ভাগ্য বিপর্যস্ত করে তোলে। জাতীয় ঐক্য গড়ে এই সঙ্কট মোচনের লক্ষ্যে সান ইয়াৎ সেন-এর কুওমিন্টাং দল উদারবাদী নীতি গ্রহণ করে দেষে অপর প্রধান দল চীন কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে। কিন্তু পরবর্তীতে কুওমিন্টাং নেতা চিয়াং কাই শেক ১৯২৬ সালে

ক্ষমতা হাতে নিয়ে আঞ্চলিক যুদ্ধবাজদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের পরিবর্তে কমিউনিস্টদের দমনে জোর তৎপরতা শুরু করেন। তার নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী সরকার দেশের বেশিরভাগ এলাকা দখল করে নিলেও দূর গ্রামাঞ্চলে কমিউনিস্টদের প্রভাব বজায় থাকে।

এদিকে জাপানা মাঞ্চুরিয়া দখল করে নেয় এবং চীনের উত্তর ভূখণ্ড আক্রমণ করে। চীনের জাতীয়বাদী সরকার বিদেশি আক্রমণ প্রতিহত করার কোনো প্রয়াস না নিয়ে বরং কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে সামরিক বাহিনীকে তারা ঘেরাও করে ফেলে। ১৯৩৪ সালের অক্টোর মাসে এই অবরোধ ভেঙে মাও সে তুং-এর বাহিনী ঐতিহাসিক লং মার্চ বা দীর্ঘ পদযাত্রা শুরু করে। এক বছর পর বিপ্লবী গণবাহিনী ৬০০০ মাইল হেটে উত্তর-পশ্চিম চীনের দূরবর্তী পাহাড়ি শাংক্সি অঞ্চলে পৌঁছে নতুন করে ঘাঁটি গড়ে তোলে। চীনের কমিউনিস্ট পার্টি একই সঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল কুওমিন্টাং সরকার ও জাপানি বৈদেশিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলে। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে মিত্রশক্তির কাছে জাপান আত্মসমর্পণ করলে চীনে ক্ষমতার লাড়াই তীব্র আকার ধারণ করে। কুওমিন্টাং সরকারের অধীনে দেশের তিন-চতুর্থাংশ এলাকা থাকলেও তাদের দুর্নীতি, শোষণ, অকর্মণ্যতা ও অসাধুতার কাণে জনমনে ছিল তীব্র ক্ষোভ। পক্ষান্তরে কমিউনিস্ট আয়ত্তাধীন এলাকায় জমির ওপর কৃষকদের অধিকার প্রতিষ্ঠা ও জনগণের শাসন প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ, শিক্ষা ও সংস্কৃতি বিকাশের তৎপরতা ইত্যাদি কারণে তাদের প্রতি জনসমর্থন বাড়ছিল। মাও সে তুংয়ের নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি শক্তি সংহত করে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে নতুন আক্রমণ অভিযান শুরু করে। কুওমিন্টাং সরকার পিছু শক্তি সংহত করে ১৯৪৭ সালের জানুয়ারি থেকে নতুন আক্রমণ অভিযান শুরু করে। কুওমিন্টাং সরকার পিছু হটতে হটতে রাজধানী নানজিং থেকে ক্যান্টনে ও পরে চোংকিং-এ সরিয়ে নেয় এবং শেষ পর্যন্ত তাইওয়ানে গিয়ে আশ্রয় নেন। গোটা চীনা মূল ভূখণ্ডের ওপর কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বাধীন জনযুদ্ধের বিজয় প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৪৯ সালের ৯ অক্টোবর পিকিংয়ের (বর্তমান বেইজিং) বিশাল সমাবেশে মাও সে তুং বিপ্লবের বিজয় ঘোষণা করেন এবং প্রতিষ্ঠিত হয় গণপ্রজাতন্ত্রী চীন। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে শুরু হয় নয়া চীনের অভিযাত্রা।

চীনের কমিউনিস্ট পার্টি (Communist Party of China)

১৯২১ সালের জুলাই মাসে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রথম চেয়ারম্যান ছিলেন চেন হু মিউ। ১৯২৭ সালে চেনকে অপসারণ করে পার্টির চেয়ারম্যান হয়েছিলেন লি লি সন। তিনি মধ্যচীনের হ্যানিয়াং- এর এক লৌহ কারখানায় একটি কমিউনিস্ট সংঘ গড়ে তোলেন। পরবর্তী কালে মাও সে তুং তার স্থলাভিষিক্ত হন। তবে ১৯২৩ সালের দিকে রুশ কমিউনিস্ট নেতা ও সংগঠক মিখাইল বরোদিন চীনে এলে দেশটিতে বলশেভিক ধরনের কমিউনিস্ট তৎপরতা জোরদার হতে থাকে। কিন্তু মাও সে তুং অন্ধভাবে রুশনীতি অনুসরণের পক্ষপাতী ছিলেন না। তার মতে ছিল: চীন একটি কৃষিপ্রধান

দেশ। তাই শ্রমিক নয়, কৃষকদেরই সংগঠিত করে কমিউনিস্ট বিপ্লব সংগঠিত করতে হবে। তার এই লক্ষ্য ও আদর্শের বাস্তব রূপায়ণে অন্যতম সহায়ক ছিলেন মার্শাল চুতে।

১৯২৫ সালে চীনের জাতীয়বাদী নেতা সান ইয়াৎ সেন মারা গেলে তার স্থলাভিষিক্ত হন কট্টর কমিউনিস্টবিরোধী নেতা চিয়াং কাই শেক। তিনি শুরু থেকেই কমিউনিস্ট নিধনযজ্ঞ শুরু করেন। এই অবস্থায় ১৯৩৪ সালে মাও-এর নেতৃত্বে শুরু হয় লীগ এটাও ঘোষণা করে যে, হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে সামাজিক মিত্রতা সম্ভব, কিন্তু রাজনৈতিক মিত্রতা কখনই নয়। সর্বভারতীয় মুসলিম লীগের প্রথম সভাপতি হন আগা খান। নওয়াব মুহাসিন-উল-মুলক ও ভিখার-উল-মুলক যুগ্ম সম্পাদক নির্বাচিত হন। মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহ, বগুড়ার সৈয়দ নওয়াব আলী, জাফর আলী খান, হাকিম আজমল খান ও মুহাম্মদ আলী প্রমুখ। এভাবে মুসলমানদের নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯০৮ সালের মুসলিম লীগের শাখা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে স্থাপিত হয়। ১৯১৩ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগ দেন।

ক্রমে ক্রমে মুসলিম লীগ পাকিস্তান সৃষ্টির প্রধান নিয়ামক হয়ে ওঠে। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে আনুষ্ঠানিকভাবে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে দুটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব উত্থাপন করেন শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক। এ প্রস্তাব অনুসারে ১৯৪৭ সালে ভারত বিভক্ত হয়ে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়, যদিও তা লাহোর প্রস্তাবের কথিত রাষ্ট্রদ্বয়ের ব্যতিক্রম। ১৯৪৮ সালে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও ১৯৫১ সালে লিয়াকত আলী খান মারা গেলে মুসলিম লীগ দুর্বল হয়ে পড়ে এবং জাতীয় চাহিদা মেটাতে ব্যর্থ হয়ে ক্রমশ বহুধাবিভক্ত ও তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালে স্বাধীন বাংলাদেশের উদ্ভব হলে পাকিস্তান মুসলিম লীগের পুনরুজ্জীবন ঘটানো হয় এবং এ দল সেখানকার রাষ্ট্রক্ষমতায়ও অধিষ্ঠিত হয়।

চীনের মহাপ্রাচীর (Graet Wall of China)

চীনের ইতিহাসের এক অসাধারণ নির্মাণ শিল্প গ্রেটওয়াল বা মহাপ্রাচীর। মহাপ্রাচীর লম্বায় ৫ হাজার কিলোমিটারের বেশি। চীনাদের হিসাবে ১০ হাজার লি লম্বা। এক লি হলো আধা কিলোমিটার। সেজন্যই চীনা ভাষায় এই প্রাচীরের নাম 'ওয়ান লি কোয়াং কো' বেইজিংয়ের উত্তর ও উত্তম-পশ্চিমাঞ্চল নিয়ে চীনের উত্তরাঞ্চলীয় পার্বত্য এলাকাজুড়ে বিস্তৃত। পাথর, ইট ও মাটি দিয়ে নির্মিত এই প্রাচীর ১৫ থেকে ৩০ ফুট চওড়া ও২৫ ফুট পর্যন্ত উঁচু। বিভিন্ন রাবংশের দ্বারা আড়াই হাজারেরও বেশি সময় জুড়ে এই মহাপ্রাচীর নির্মিত হয়েছে। তবে মহাপ্রাচীরের আজকের যে অবস্থা তা মূলত মিং রাজবংশের সময়কার (১৩৬৮-১৬৪৪) নির্মাণের অবশেষ। মহাপ্রাচীন নির্মাণ খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে জউ রাজবংশে শেষ হয়েছিল। এর মধ্যবর্তী সময়ে চিন, হান, সুই, তাং প্রভৃতি রাজবংশের আমলে অসংখ্য পুনর্নিমাণ, সংস্কার, পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজনা ও সম্প্রসারণ ঘটেছে। সত্যিকারের প্রাচীন নির্মাণ শুরু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব

সপ্তম ও অষ্টম শতকের মাঝামাঝি। তখন চীন ছিল অসংখ্য ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত। এসব রাজ্যের মধ্যে কলহ ও যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকতো। এদের কলহের সুযোগ নিয়ে উত্তর দিক থেকে নানা যাযাবর জাতি, বিশেষ করে হুনরা তাদের আক্রমণ করে বসতো। নিজেদের পারস্পরিক আক্রণ এবং সেই সঙ্গে বহিরাক্রমণ ঠেকানোর জন্য এইসব রাজ্যের শাসকরা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা হিসেবে নিজ নিজ দুর্গপ্রাচীর গড়ে তোলে। চিন রাজবংশের (খ্রিস্টপূর্ব ২২১-২০৬) সময়ে চীনের প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াংদিই সত্যিকার অর্থে প্রথম মহাপ্রাচীর নির্মাণ হাত দেন। তিনি ৭টি বিবদমান রাজ্য দখল করে সেগুলো একসঙ্গে যুক্ত করেন। তারপর সেই রাজ্যগুলোর আলাদা আলাদা দুর্গপ্রাচীর যুক্ত করে প্রাচীরকে সম্প্রসারিত করে তোলেন। লাখ লাখ শ্রমিকের দশ বছরের কঠোর পরিশ্রম মহাপ্রাচীর গড়ে ওঠে এবং তা পশ্চিমে লিনটাও থেকে পূর্বে লিয়াওডং পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। হানাদার শিউং নু উপজাতিগুলোর বিরুদ্ধে প্রথম প্রতিরক্ষাব্যূহ হিসেবে প্রাচীনর বরাবর সৈন্য মোতায়েন করা হয়। দূর থেকে হানাদারদের আসতে দেখলে চীনা সৈন্যরা জ্বলন্ত তীর আকাশে ছুড়ে বিপদ সংকেত পৌঁছে দিত। প্রথম সম্রাট কিন শি হুয়াংদির পরবর্তী প্রতিটি রাজবংশই মহাপ্রাচীরের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতাকে ধীরে ধীরে বাড়িয়ে তুলেছে এবং সর্বক্ষেত্রেই এই কাজটা করা হয়েছে বাধ্যতামূলক শ্রম নিয়োগ করে। পঞ্চম থেকে সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরাঞ্চলের ওয়েই, কী ও জউ রাজবংশ আরো দেড় হাজার কিলোমিটার যোগ করে মহাপ্রাচীরের সঙ্গে। দ্বাদশ শতাব্দীতে জিন রাজবংশের সময় মহাপ্রাচীর আজকের দিনের অন্তঃমঙ্গোলিয়া স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলের পূর্বাংশ থেকে জাবাইকায়েল পর্যন্ত প্রসারিত হয়। ১৩৬৮ থেকে ১৬৪৪ সাল পর্যন্ত মিং রাজবংশের সময় প্রাচীরটি লম্বায় ৬৪০০ কিলোমিটার বা ৪ হাজার মাইল পর্যন্ত বর্ধিত হয়ে পড়ে। এই রাজবংশীয় শাসনামলে ২০০ বছর ধরে মহাপ্রাচীরটির সংস্কারপর্ব চলে। এ সময় ইট গ্রানাইটের কাজের প্রসার ঘটে। অথ্যাধুনিক ডিজাইন যোগ করা হয়। বসানো হয় কামান। এভাবেই মিং সম্রাটরা মহাপ্রাচীরকে শক্তিশালী করে তুলে মোঙ্গল ও হুনদের আক্রমণ প্রতিহত করে। মহাপ্রাচীর মজবুত করতে মিং সম্রাটরা ২০০ বছরে যে ১৮ দফা সংস্কার কাজে হাত দিয়েছিল তাতে প্রাচীরের নবরূপায়ণই ঘটেনি, ওটা লম্বায় এক হাজার কিলোমিটার বৃদ্ধি পেয়ে ৬৭০০ কিলোমিটার হয়ে দাঁড়ায়। আমরা আজ প্রাচীরের যে রূপটি দেখতে পাই সেটি মিং আমলেরই। মহাপ্রাচীর পাহাড়ি উপত্যকা, অধিত্যকা দিয়ে উঁচু-নিচু হয়ে পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকে বিস্তৃত। এটি চীনের ইতিহাস, সংস্কৃতি ও উন্নয়নের সাক্ষী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মহাপ্রাচীরের স্থাপত্যশৈলী বিশ্বের নির্মাণ ইতিহাসের এক বিস্ময়।

মহাপ্রাচীরের বিশালত্ব এমন যে তার ধারণা করাও কঠিন। এর গোটা ছবি তোলা অসম্ভব কথিত আছে, মহাপ্রাচীরকে ভেঙে এর এক একটা পাথর যদি পরপর সাজানো যায় তাহলে গোটা পৃথিবী ঘিরে ফেলা যাবে। আর এর মলিকুলগুলো একটার পর একটা সাজালে আমাদের নিকটতম ছায়াপথ অ্যান্ড্রোমিডায় পৌঁছানো যাবে।

চুক্তি (Treaty)

চুক্তি হলো বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্পাদিত বিধিবিধান। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী চুক্তিপত্র রচনার নির্দিষ্ট কোনো বিধান নেই। তবে আন্তর্জাতিক আইনের নানবিধ উৎসের অন্যতম একটি হলো চুক্তি। চুক্তির সাধারণত দুটি পর্যায় থাকে। এক, সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের পূর্ণক্ষমতাপ্রাপ্ত দূতের (plenipotentiary) স্বাক্ষর; এবং দুই, রাষ্ট্রগুলোর অনুমোদন। গণতান্ত্রিক দেশে চুক্তি-সম্পাদনের পূর্বে অনুকূল জনমত নির্ণয় করার চেষ্টা করা হয়। কারণ চুক্তি জনগণের স্বার্থ পরিপন্থী হলের আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে। ক্ষেত্রবিশেষে চুক্তি হয় শর্তসাপেক্ষে। এক্ষেত্রে রূপায়ণেও ব্যত্যয় ঘটে। জাতিসংঘের ১০২ ধারা অনুযায়ী সদস্যদের মধ্যে যাবতীয় আন্তর্জাতিক চুক্তি জাতিসংঘের সচিবালয়ে নিবন্ধনকরণের বিধান রয়েছে। যুদ্ধ বেধে গেলে চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়ে যাওয়া সম্পর্কে দ্বিমতো থাকতে পারে। চুক্তির সমাপ্তি সম্পর্কে নানা মতামত ও জটিলতাও সৃষ্টি হয়। ততে দুটি প্রশ্ন ওঠে : এক, কোনো এক পক্ষ অপর পক্ষের সম্মতি ব্যতিরেকে চুক্তি ভঙ্গ করতে পারে কি না ; দুই, অন্য কোনো আইনের বলে চুক্তি সমাপ্ত করা যায় কি না। বর্তমান সমস্যা ও প্রয়োজনের তাগিদে চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে। সেই চুক্তি পরবর্তীকালের শাসকদের কাছে গ্রহণযোগ্য না হলে অনেক আইনবিদের মতে সেই চুক্তির পরিমার্জনার প্রশ্ন বিবেচিত হতে পারে। চুক্তি সম্পাদনের ক্ষেত্রে বেশিরভাগ রাষ্ট্রেরই পার্লামান্টে অনুমোদন লাগে। অনেকক্ষেত্রে সরকার বা রাষ্ট্রপ্রধান কর্তৃক কোনো সম্পাদিত চুক্তি ওই দেশের পার্লামেন্ট বাতিল করে দিতে পারে।

চুক্তিবাদ (Contract Theory)

চুক্তিবাদের সারকথা এই যে, মানবগোষ্ঠীর পারস্পরিক চুক্তির মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছে। অন্য কথায় রাষ্ট্র পরস্পরের মধ্যে চুক্তিজাত এক মানবীয় প্রতিষ্ঠান। এই মত রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ওপর গভীর রেখাপাত করেছে। চুক্তি কী ধরনের হয়েছিল, এবং কোন কোন পক্ষের মধ্যে হয়েছিল, এসব বিষয়ে অনেক বাগবিতণ্ডা হয়েছে। কিন্তু মোটামুটি বলা যায় যে, চুক্তিবাদী সকল পন্ডিতই স্বীকার করেছেন যে রাষ্ট্র সৃষ্টি হবার পূর্বে সমাজে কোন শাসনপদ্ধতি ছিল না, আইন-শৃঙ্খলা ছিল না, -মানুষ প্রকৃতির আইন মেনেয়া চলত। কিন্তু প্রকৃতির আইন কি তাহা কে বলিবে? পরস্পরের মধ্যে বিবাদ বিসংবাদ বাঁধলে কে তার মীমাংসা করবে? এই সব প্রশ্নের জবাব না থাকায় অনেক অসুবিধা হত। তাই মানুষ নিজেদের মধ্যে বোঝাপড়া করে এক চুক্তির মাধ্যমে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করল।

চে গুয়েভারা (Che Guevara)

কিউবান বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কর্ণধার এবং বিপ্লবোত্তরকালে যিনি ফিডেল ক্যাস্ট্রোর মন্ত্রিসভার সবচেয়ে প্রভাবশালী সদস্য ছিলেন তিনি হলেন বিপ্লবী চে গুয়েভারা। শুধু

কিউবা নয়, সম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সারা বিশ্বের সাম্যবাদ নীতির প্রধান প্রবক্তা বলে তিনি পরিচিতি হয়ে উঠেন। চে গুয়েভারার জন্ম হয়েছিল আর্জেন্টিনার রোসারিও (Rosario) শহরে ১৯২৮ সালের ১৪ জুন। বাবা ছিলেন স্পেনিশ বংশোদ্ভূত এবং মা ছিলেন স্কটল্যান্ডের মেয়ে। চে গুয়েভারা ছিলেন বাবা-মায়ের বড় সন্তান। তাঁর আরো ভাইবোন ছিল। চে গুয়েভারার বাবা-মাও ছিলেন প্রগতিশীল আদর্শে বিশ্বাসী। বলতে গেলে পারিবারিক সূত্রেই চে গুয়েভারা সাম্যবাদী নীতির আদর্শে অনুপ্রাণিত হন।

স্কুল-কলেজের লেখাপড়া শেষ করে ভর্তি হন ডাক্তারিতে। একেবারে রের্কড পরিমাণ মার্ক নিয়ে তিনি কৃতিত্বের সাথে ডাক্তারি পাস করেন ১৯৫৩ সালে। অথচ ডাকাতির করা তাঁর হয়নি। শুধু খেলাধুলা আর পড়াশোনা নয়, তিনি দেশে-বিদেশে ঘুরে বেড়াতেও ভালোবাসতেন। ছুটি পেলেই ঘর থেকে বের হতেন। ঘুরে বেড়াতেন ল্যাটিন আমেরিকায়। কিন্তু তাঁর এই দেশভ্রমণ নিছক মজা করার ব্যাপার ছিল না। তিনি ল্যাটিন আমেরিকার দারিদ্র পীড়িত দেশগুলোতে গিয়ে সে দেশের জনগণের জীবযাপনের মান তাদের দারিদ্রতা, নিপীড়ন, বর্ণ বৈষম্য নীতি এবং পরাধীনতার গল্পানিকে নিজ চোখে দেখে বিচলিত হন। আর এসব দেখতে দেখতেই তাঁর মনে একটা ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে, এদের এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে হলে বিশ্বব্যাপি একটি সশস্ত্র বিপ্লব ঘটাতে হবে। বিপ্লব ছাড়া তাদের মুক্তির কোনো উপায় নেই। চে গুয়েভারা ল্যাটিন আমেরিকার নিপীড়িত জনগণের মুক্তিকে সারাবিশ্বের পীড়িত মানুষেরই মুক্তি বলে মনে করেন। এরা হলো বিশ্বের ভাগ্যবঞ্চিত মানুষেরই প্রতীক। ডাক্তারি পড়া শেষ করে ১৯৫৩ সালে তিনি গুয়াতেমালা চলে আসে। এখানে আসার পেছনেরও একটি কারণ ছিল। তখন গুয়াতেমালার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল একটি বামপন্থী সরকার। জ্যাকোবাবো আরবেঞ্জ (Jsascobo Arbenz) ছিলেন এই বামপন্থী সরকারের প্রধান। তিনি সাম্যবাদ নীতির ভিত্তিতে দেশের অর্থনৈতিক কাঠামো, ভূমিবণ্টন এবং সমাজব্যবস্থাকে পুনর্গঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। চে গুয়েভারা এখানে এসেছিলেন। গুয়াতেমালায় এসে সাম্যবাদ আন্দোলনের শরিক হন গুয়েভারা। এই সময় কাজের সুবিধার জন্য নিজের নাম পাল্টে একটা ছদ্মনাম গ্রহণ করেন। জ্যাকোবারে সাম্যবাদ আন্দোলন সফল হলো না এবং কিছুদিন পরেই পুজিবাদী চক্রান্তে উৎখাত হলেন তিনি। সেখানে বামপন্থী নীতির সরকারের অবসান ঘটে। এ ঘটনায় গুয়েভারাও দারুণভাবে মর্মাহত হন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদী নীতির প্রতি একটি বিরূপ ধারণার জন্ম নেয় তাঁর অন্তরে। তাঁর মনে বদ্ধমূল ধারণা হয় যে, ল্যাটিন আমেরিকা তথা সারাবিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোর উন্নতির সবচেয়ে বড় শুত্র হলো পুঁজিবাদী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। পরে গুয়েভারা বহু ভাষণে এবং লেখায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি তাঁর এই মনোভাবের কথা প্রকাশ্যেই ঘোষণা করেছেন। গুয়াতেমালায় সমাজতান্ত্রিক সরকারে পতনের পর গুয়েভারাও সেদেশ ত্যাগ করে চলে যান মেক্সিকোতে।

তিনি ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সাথে একাত্ম হয়ে বিপ্লব ঘটানোর উদ্দেশে গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দেন। তারপর ১৯৫৬ সালর ২৫ নভেম্বর তারিখে মাত্র ৮১জন গেরিলা নিয়ে নৌকাযোগে এসে নামেন কিউবাতে। তিনি প্রথমে কিউবার ওরিয়েন্ট (Oriente) প্রদেশের অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চরে ঘাঁটি স্থাপন করেন। কিন্তু আত্মগোপন করে বেশিদিন থাকা সম্ভব হলো না। শীঘ্রই তাঁরা ব্যতিস্তার সৈন্যদের নজরে পড়ে গেলেন। এবং সরকারি সৈন্যদের আক্রমণে গুয়েভারার অভিযান সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়ে যায়।

যুদ্ধে হেরে গিয়ে তাঁরা ওরিয়েন্ট প্রদশে থেকে পালিয়ে চলে যান সিরেয়া মায়েন্ট্রার (Sierre Maestra) পর্বত অঞ্চলে। সেখানেই নতুন করে স্থাপিত হয় ঘাঁটি। গেরিলা সৈন্য সংগৃহীত হয় স্থানীয়ভাবে। কিউবার অনেক যুবক গোপনে এসে যোগ দেয় তাঁদের সাথে। আন্দোলনের আকার ধীরে ধীরে দানা বাঁধে। স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে পাওয়া যায় সাড়া। দেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতা এবং বুদ্ধিজীবী সবাই গোপনে সমর্থন দেয় গুয়েভার গেরিলাবাহিনীকে।

গুয়েভারার গেলিরলারা সেনাছাউনিতে ঝটিকা আক্রমণ চালিয়ে ওদের কাবু করতে লাগে এবং সংগ্রহ করতে লাগে অস্ত্রশস্ত্র। ক্রমে গুয়েভারার প্রভাব আরো ছড়িয়ে পড়ে। তিনি হয়ে উঠে ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সবচেয়ে বড় সহযোগী নায়ক। এই সময় কিউবার লোকেরা তাদের প্রিয় নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রোর ছিলেন নির্বাসনে আর গুয়েভারা আছেন তাদেরই মাঝে সংগ্রামের মধ্যে।

ক্যাস্ট্রো তাঁকে গেরিলাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক নিযুক্ত করেন এবং এমনি করে গুয়েভারা কিউবার সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়। ফিডেল ক্যাস্ট্রোর পরেই তাঁর নামোচ্চারিত হত যদিও তিনি কিউবার কেউ ছিলেন না। মাত্র দু'বছর তিনি গেরিলা সংগ্রামের দ্বারাই একনায়ক ব্যাতিস্তা সরকারের পতন ঘটাতে সক্ষম হন এবং দেশকে মুক্ত করেন। গুয়েভারা তাঁর এই দুবছরে গেরিলা অভিযানের রোমঞ্চকর কাহিনী নিয়ে একটি স্মৃতিকথামুলক বই লেখে *Reminiscesces of he Cuban Revolutionarly Wary* হয় ১৯৬৩ সালে।

ব্যতিস্তার পতনের পর ১৯৫৯ সালের ২ জানুয়ারি গুয়েভারার গোরিলারা বিজয়গর্বে রাজধানী হাভানা দখল করে। কিউবায় প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক সরকার। সরকার প্রধান নিযুক্ত হন নির্বাচিত নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো। গুয়েভারাও গ্রহণ করেন কিউবার নাগরিকত্ব। নিযুক্ত হন ক্যাস্ট্রোর সমাজতান্ত্রিক সরকারের মন্ত্রিপরিষদের সদস্য।

গুয়েভারা তখন একান্তভাবেই নিজেকে কিউবার নাগরিক ভাবতে শুরু করেন। কিউবাই তাঁর নিজের দেশ। স্বাধীনতার পর ক্যাস্ট্রোর পক্ষ হয়ে গুয়েভারা পৃথিবীর অনেক সমাজতান্ত্রিক দেশ ভমণ করেন এবং তাঁদের সাথে কিউবার রাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থান করেন। তিনি এই সময় সারা বিশ্বজুড়ে শ্রেষ্ঠ সমাজতান্ত্রিক আদর্শের প্রবক্তা হিসেবে প্রচণ্ড খ্যাতি অর্জন করেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুঁজিবাদ ও উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে সর্বত্র জোরালো বক্তব্য রাখেন। ল্যাটিন আমেরিকায় মার্কিন দমন ও শোষণনীতিরও তিনি তীব্র সমালোচক ছিলেন।

শুধু বিদেশে নয়, দেশেও আর্থসামজিক ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ বিবর্তন ঘটান গুয়েভারা। তিনি ন্যাশনাল ব্যাংক অব কিউবার প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত হন। এবং শিল্পমন্ত্রী হন। তিনি তাঁর চিন্তাধারকে নানা বক্তৃতা ও লেখার মধ্যে ব্যাপকভাবে প্রকাশ করেন। যা পরে পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯৬৫ সালে Man and Socialism নামে। গেরিলাযুদ্ধের কলাকৌশল ও সাফল্যের ওপরেও তিনি একটা চমৎকার বই লিখেছিলেন ১৯৬১ সালে Man and Socialism in Cuba নামে। গেরিলাযুদ্ধে কলাকৌশল ও সাফল্যের ওপরে তিনি একটা চমৎকার বই লিখেছিলেন ১৯৬১ সালে। এর নাম Guerrilla warfare।

কিন্তু ১৯৬৫ সালে চে সহসা রাজনৈতিক দৃশ্যপট থেকে বের হয়ে যান অনেকটা রহস্যময় কারণে। কেউ কেউ বলেন তিনি শিল্পমন্ত্রী থাকালে দেশের ক্যাস্ট্রোর সাথে মতপ্রার্থক্যের সৃষ্টি হয় এবং তিনি মন্ত্রিসভা থেকে বহিস্কৃত হন। আসলে চে গুয়েভারা ছিলেন চনিপন্থী কম্যুনিজিমে বিশ্বাসী আর ফিডেল ক্যাস্ট্রো ছিলেন মস্কোপন্থী। চিন-সোভিয়েট দ্বন্দ্বের কারণেই গুয়েভারা অর ফিডেল ক্যাস্ট্রোর মধ্যে মতো পার্থক্যের সৃষ্টি হয়। ফিডেল ক্যাস্ট্রোর সাথে গুয়েভারার দ্বন্দ্বের আরো একটি কারণ ছিল বলে অনেকে মনে করেন। যুদ্ধের পর গুয়েভারার কর্মতৎপরতা এবং জনপ্রিয়তা এতখানি বেড় গিয়েছিল যে, তাতে স্বয়ং ফিডেল ক্যাস্ট্রো পর্যন্ত ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর ভয় ছিল যদি গুয়েভারার এই জনপ্রিয়তা অব্যাহত থাকে তাহলে হয়তো তিনিই একদিন ক্যাস্ট্রোর স্থান দখল করবেন। কিউবার শাসনক্ষমতা চলে যাবে একদিন বিদেশির হাতে। আগেই বলেছি, গুয়েভারা কোনো দেশে বা আঞ্চলিকতায় বিশ্বাস করতেন না। তাঁর আন্দোলন ছিল বিশ্বের সকল দমননীতির বিরুদ্ধে, তা যেখানেই হোক। তিনি যখন দেখলেন কিউবাতে তাঁর উদ্দেশ্য পুরোপুরিভাবে সফল হলো না, তখন দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল অন্যদিকে। ফিডের ক্যাস্ট্রোর সাথে মত পার্থক্য হওয়ায় পর দু'বছর পর্যন্ত গুয়েভারার গতিবিধি ছিল সম্পূর্ণ অজ্ঞাত। শুধু ১৯৬৭ সালের এপ্রিলে কিউবান কম্যুনিষ্ট পার্টি সম্মেলনে তিনি অজ্ঞাতস্থান থেকে একটি বাণী পাঠান। এটি ছিল একটি ঐতিহাসিক বাণী। ১৯৬৬ সালের অক্টোবর মাসে গুয়েভারা বলিভিয়া গমন করেন। সেখানেও তিনি বলিভিয়ান গেরিলাদের প্রশিক্ষণ দান করেন এবং সাম্রাজ্যবাদী সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম পরিচালায় অংশ নেন এই বলিভিয়ায় গেরিলাযুদ্ধ চালানোর সময়েই তিনি করুণভাবে মৃত্যুবরণ করেন।

চেচনিয়া (Chesnia)

চেচনিয়া হচ্ছে রাশিয়ার অন্তর্গত একটি ককেশীয় মুসলিম প্রজাতন্ত্র। এর রাজধানীর নাম গ্রোজনী। ১৯৯১ সালে চেচনিয়া একতরফাভাবে স্বাধীনতা ঘোষণা করে যা রাশিয়া অবৈধ বলে গণ্য করে। বর্তমান রুশ-চেচনিয়া শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে সেখানে স্বায়ত্বশাসন প্রদান করা হয়েছে।

চেরনোবিল বিস্ফোরণ (Cheronoby Disaster)

১৯৮৬ সালে রাশিয়ার চেরনোবিলের পারমাণবিক চুল্লিতে ভয়াবহ বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে আশেপাশের এলাকাগুলোতে মারাত্মকভাবে তেজস্ক্রিয়তা ছড়িয়ে পড়ে। আক্রান্ত হয় হাজার হাজার মানুষ। ফলে মানুষের স্বাভাবিক প্রজনন প্রক্রিয়া ব্যাহত হয় এবং এখনো অনেক বিকলাঙ্গ শিশুর জন্ম হচ্ছে।

চৈনিক সভ্যতা (*Chinese* Civilization)

চীনা সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও নদীকেন্দ্রিক সমৃদ্ধ সভ্যতা। অনেকের মতে, এর উদ্ভব চীনের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তের তারিম উপত্যাকায়। কুয়েনলুং পবর্ত অতিক্রম করে অধিত্যকা ধরে পীত (হোয়াংহো) নদীর তীর বরাবর গড়ে ওঠেছিল এই সভ্যতা। উত্তর চীনে বর্তমান সে জাতীয় মানুষের বসবাস, প্রস্তর যুগেও তাদের আকার-আকৃতিবিশিষ্ট জনগোষ্ঠীর বসতি ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া গেছে। তারা ব্যবহার ক্ষমতা পাথরের তৈরি ছুরি, তীরের ফলা, কুঠার ও হাড়ের তৈরি নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র। কাপড় বোনা ও মাটির পাত্র নির্মাণ পদ্ধতিও তাদের আয়ত্তে ছিল। অবশ্য চীনা পুরাণে বলা হয়েছে, কুয়াং তির রাজত্বকালে (খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯৭-২৫৯৫) উত্তর-পশ্চিম থেকে যেসব জনগোষ্ঠীর আগমন ঘটে তাদের সঙ্গে স্থায়ী আদিবাসীদর যুদ্ধবিগ্রহ হয়। এই সব আগন্তুকের দল ছিল মূলত তা মঙ্গোলীয় সভ্যতা। চীনা সভ্যতা মূলত কৃষিভিত্তিক। একাকার প্রাচীন জনগোষ্ঠী হোয়াংহো নদীর দু'পাশের উর্বর এলকা জুড়ে চাষ ক্ষমতা জোয়ার, গম, ধান ও নানা ধরনের শাকসব্জি এবং পালন ক্ষমতা বিভিন্ন জাতের পশু। তারা জানাতো রেশমকীটের চাষাবাদ পদ্ধতি। এর সুতো দিয়ে তারা মজবুত ও সুন্দর বস্ত্রাদি বানাতো। খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতক থেকে চীনে এই শিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। রেশম চাষের প্রথ প্রবর্তক ও বিশ্বব্যাপী এর প্রচলনকারী হিসেবে চীনা জগতের অবদান অনস্বীকার্য। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দ পর্যন্ত চীনে বহু খণ্ডবিখণ্ড রাষ্ট্রের অস্তিত্ব বিদ্যমান ছিল। এর ইতিহাস বিভিন্ন রাজবংশ ও তাদের শাসনামল দ্বারা অবিভক্ত। খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক সিন নামের এক রাজা সমগ্র চীন অধিকার করে নেন এবং চীনকে একটি একক রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলেন। এরপর তিনি দেশে মঙ্গেলীয়দের পৌনঃপৌনিক আক্রমণ থেকে রক্ষা করার জন্য গড়ে তোলেন চার হাজার কিলোমিটার দীর্ঘ এক প্রাচীর, যা চীনের মহাপ্রাচীর নামে খ্যাত। এই প্রাচীর বিশ্বের সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম।

চীনারা খ্রিস্টীয় প্রথম শতাব্দীতে আবিস্কার করে কাগজ ও কম্পাস। কাগজ আবিস্কার বিশ্বসভ্যতার বিকাশে এক কালজয়ী প্রভাব রেখেছে। খ্রিস্টজন্মের আগেই চীনের মাটিতে বারুদ ও খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকে মুদ্রণযন্ত্রের আবিস্কার মানব-সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশে প্রভূত অবদান রেখেছে। প্রাচীন অন্যান্য শিল্পদ্রব্যের মধ্যে চীনামাটির কারুকার্যখচিত বাসনপত্র অতুলনীয়।

চীনে বহু বিশ্ববিশখ্যাত মনীষী, ধর্মগুরু ও দার্শনিকের আবির্ভাব ঘটেছে। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কনফুসিয়াস, লাওৎ-তসু ও সিনাৎ সিয়ান। চীনা লোককাহিনী, লোকগীতি ও পুরাণকথার অনেক কিছুই কালজয়ী সাহিত্যকর্মের মর্যাদা অর্জন করেছে। প্রাচীন চীনা চিকিৎসকগণ বিভিন্ন ব্যাধি ও ক্ষত নিরাময়ের ভেষজ ও শল্যচিকিৎসা জানতেন। চীনা আকুপাংচার পদ্ধতি এখানো প্রচলিত। বলবর্ধক ওষুধ হিসেবে তার চায়ের ব্যবহার জানতেন। পানীয় হিসেবে সেই চা আরজ বিশ্বসংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অংশ। চীনের প্রাচীন ঘরবাড়ি, উপাসনালয় ইত্যাদি কাঠের তৈরি ছিল বলে সেসবের কোনোকিছুই বর্তমানকাল পর্যন্ত টিকে থাকতে পারেনি তবে পাথর, ব্রোঞ্জ ও পোড়ামাটির তৈরি বহু পাচীন নির্দশন পাওয়া গেছে, যেগুলো তৎকালীন চীনা জীবনধারা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের অনেক কিছুই তুলে ধরে।

ছয়দফা আন্দোলন (Six Point Movement)

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ছয় দফা আন্দোলন একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর অব্যাহত বৈষম্য ও শোষণনীতির ফলে পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধিকার প্রশ্নে ১৯৬৬ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি লাহোরে বিরোধী দলগুলোর এক মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে দেশবরেণ্য নেতা ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমান পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফাভিত্তিক, অর্থনেতিক ও প্রতিরক্ষার দাবি সম্বলিত ৬ দফাভিত্তিক এক কর্মসূচি ঘোষণা করেন। ইতিহাসে এটিই 'ছয় দফা কর্মসূচি নামে পরিচিত। **দফাসমূহ:** ১. ঐতিহাসিক লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র রচনা করে পাকিস্তানকে একটি সত্যিকারের ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্ররূপে গড়তে হবে। এতে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং আইনগুলো হবে সার্বভৌম। সকল নির্বাচন সার্বজনীন প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে অনুষ্ঠিত হবে; ২. কেন্দ্রীয় বা ফেডারেল সরকারের এখতিয়ারে কেবল দেশরক্ষা ও পররাষ্ট্র এ দুটি বিষয় থাকেব। অবশিষ্ট সকল বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা থাববে প্রাদেশিক সরকারের হাতে; ৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি সম্পূর্ণ পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা থাকবে। এ ব্যবস্তায় মুদ্রা নিয়ন্ত্রণ সঞ্চারিত সরকারে হাতে থাকবে এবং দুই অঞ্চলের জন্য দুটি স্বতন্ত্র ব্যাংক থাকবে। এ ব্যবস্থায় বিকল্প স্বরূপ দুই অঞ্চলের জন্য কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের একই মুদ্রা থাকতে পারে; ৪. সকল প্রকার, খাজনা ধার্য ও আদায়ের ক্ষমতা থাকবে আঞ্চলিক সরকারের হাতে। আঞ্চলিক সরকারের আদায়কৃত রাজস্বের নির্দিষ্ট একটি অংশ কেন্দ্রীয় সরকারের দেয়ার ব্যবস্থা থাকবে, যা দিয়ে ফেডারেল তহবিল গড়ে উঠবে; ৫. বৈদেশিক বাণিজ্য থেকে আয়কৃত বৈদেশিক মুদ্রা আঞ্চলিক ভিত্তিতে হিসাব রাখতে হবে। এক অঞ্চলের আয়কৃত অর্থ সেই অঞ্চলেই ব্যয় হবে। তবে কেন্দ্র এ আয়ের একটি নির্ধারিত অংশ পাবে; ৬. অঙ্গরাজ্যগুলো তাদের অঞ্চলিক প্রতিরক্ষার জন্য মিলিশিয়া বা প্যারামিলিটারি রক্ষীবাহিনী গঠনের অধিকার থাকবে।

ছয়দফা দাবি ছিল পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় 'মুক্তির সনদ'। ছয়দফা কর্মসূচি বাস্তবায়িত হলে দুই অঞ্চলের মধ্যে বিরাজমান অসমতা কমে আসত এবং পাকিস্তান একটি শক্তিশালী ফেডারেল রাষ্ট্ররূপে বিকাশ লাভ করতে পারত। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একগুঁয়েমির ফলে তা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

ছাঁটাই প্রস্তাব (Cut-Motion)

ছাঁটাই প্রস্তাবের মাধ্যমে পার্লামেন্টে সরকারি কোন ব্যয় মঞ্জুরী বা মঞ্জুরী দাবি সংক্রান্ত কোনো প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান বা মঞ্জুরী দাবীর পরিমাণ হ্রাস করতে পারে। এক্ষেত্রে সংসদের সমর্থন না পেলে মন্ত্রিসভাকে হয় পদত্যাগ করতে হবে অন্যথায় রাষ্ট্রপতির মাধ্যমে সংসদ ভেংগে দিয়ে নতুন নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হয়।

ছায়া মন্ত্রিসভা (Shadow Cabinet)

সংসদীয় ঐতিহ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং বহুল পরিচিত ও আলোচিত একটি ধারণা ছায়া মন্ত্রিসভা। বিরোধী দলের নেতৃত্বে অভিজ্ঞ ও বায়োজ্যেষ্ঠদের সমন্বয়ে ছায়া মন্ত্রিসভা গঠিত হতে পারে। সাধারণত দলের সাংগঠনিক কাঠামোতে একজন নেতা যে বিভাগের সম্পাদক নিযুক্ত হন (যেমন—কৃষি, পররাষ্ট্র, অর্থ, পরিকল্পনা, যুব ও ক্রীড়া বা নারী সম্পাদক ইত্যাদি) তিনি ছায়া মন্ত্রিসভায় সংশ্লিষ্ট বিষয়ের দায়িত্ব পালন করেন। কারণ তিনিই সরকারের সংশ্লিষ্ট কর্মকাণ্ডের সঠিক ও যুক্তিসংগত ভুল ধরতে সক্ষম হতে পারেন। ছায়া মন্ত্রিসভার সদস্যরা সরকারকে অব্যাহতভাবে পরামর্শ, সমালোচনা বা নিজস্ব মর্তানুয়ী দিক নির্দেশনা প্রদান করেন। দল ক্ষমতায় গেল তিনি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত হন। ছায়া মন্ত্রিসভা কার্যকর থাকলে সরকারের বিরোধিতা ও সমালোচনা অধিকতর যুক্তিভিত্তিক ও বস্তুনিষ্ঠ হয়। এমনকি ছায় মন্ত্রিসভার মাধ্যমে দেশের আপামর জনসাধারণ ও বিরোধী দলের নেতারা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অবহিত হতে পারেন। ছায়া মন্ত্রিসভা গঠন দক্ষ ও গতিশীল সরকার প্রতিষ্ঠায় সহায়ক। সংসদীয় ব্যবস্থা যথাযথ কার্যকর হওয়ার অন্যতম মাধ্যম।

ছিয়াত্তরের মনন্তর (The hreat Bengal Famine)

দ্বৈত শাসনের কুফল ও কোম্পানির আমলাদের উৎপীড়নের ফলে বাণিজ্য ও কৃষিক্ষেত্রে অবনতি ঘটে এবং দেশের জনগণের অর্থনৈতিক অবস্থা ক্রমশই শোচনীয় হতে থাকে। পলাশী যুদ্ধের পর থেকে দেশের সম্পদ কমতে থাকে অথচ রাজস্বেও হার প্রতি বছর বৃদ্ধি পেতে থাকে। বাংলার এমন ঘোর দুর্দিনে আবার ১১৭৬ বাংলা সনে (১৭৭০ খ্রীঃ) অনাবৃষ্টি এবং খরার দরুণ শস্য নষ্ট হয়ে চরম খাদ্যাভাব দেখা দেয়। জনগণ এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের সম্মূখীন হয়। এ দুর্ভিক্ষ 'ছিয়াত্তরের মন্বন্তর' নামে খ্যাত। এ দুর্ভিক্ষের ফলে বাংলার প্রায় এককোটি অধিবাসী বা এক-তৃতীয়াংশ লোক মারা যায়।

জওহরলাল নেহরু (১৮৮৯-১৯৬৪) Nehru, Jawaharlal

ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রথম সারির নেতা, জাতীয় কংগ্রেসের তিন বারের সভাপতি এবং দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ইংল্যান্ডে ছাত্রজীবন (১৯১০-১২) থেকে তিনি সেখানকার উদারনৈতিক গণতন্ত্রী আদর্শে প্রভাবিত হন। পরবর্তীকালে তাঁর ফেবিয়ান সমাজতন্ত্রী মনোভঙ্গীর সঙ্গে মার্কসীয় মতাদর্শ মিশ্রিত হয়। সক্রিয় রাজনৈতিক জীবনের প্রথমে তিনি টিলক ও অ্যানি বেসান্তের হোম রুল লিগের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন। পরে অসহযোগ আন্দোলনসূত্রে গান্ধীজির ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে আসেন। কুকড়ির দশকের শেষ দিকে কংগ্রেসের মাদ্রাজ (১৯২৭) ও লাহোর (১৯২৯) অধিবেশনে তিনি পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ করানোতে সমর্থ হন। জওহরলালের গ্রন্থাদির মধ্যে 'আত্মজীবনী', 'ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া' ও 'গ্লিম্পসেস অব ওয়ার্লড হিস্ট্রি' তাঁর রাষ্ট্রচিন্তার পরিচয় অনেকাংশে বহন করে।

পিতা মাততিলালের অজ্ঞাবাদী ভাবনাচিন্তা জওহরলালের মনে সঞ্চারিত হয়। তবে তাঁর মননে বাস্তববাদিতা ও যুক্তিবাদিতার পরিমিশ্রণ দেখা যায়। গান্ধী ও রবীন্দ্রনাথের স্নেহভাজন হলেও তাঁর চিন্তায় অতীন্দ্রিয়বাদের কোনো ছাপ পড়েনি। তবে যুদ্ধ ও খ্রিস্টের তিনি ছিলেন বিশেষ অনুরাগী।

জওহরলাল এক দিকে খাদি উন্নয়ন ও গ্রামীণ শিল্পের কর্মসূচিতে বিশ্বাস করতেন, অন্য দিকে দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক পুনর্গঠনের জন্য আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের প্রসার চাইতেন। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধির ওপর তিনি গুরুত্ব আরোপ করেন।

তিনি ছিলেন সমাজতন্ত্রী পশ্চিমা ভাবধারা ও বৈচিত্র্যময় ভারতীয় সনাতন ঐতিহ্যের মধ্যবর্তী পথ অনুসরণের পক্ষপাতী। গান্ধীজির নির্ভীকতা, রাজনৈতিক আন্দোলনে জনগণকে সক্রিয়ভাবে যুক্ত করে তার নেতৃত্বদান এবং রাজনীতিতে অহিংসা, শান্তি ও নৈতিকতা সঞ্চায়ের প্রয়াস জওহরলালকে গান্ধীজির প্রতি আকৃষ্ট করে। আধুনিকতার গুণগ্রাহী জওহরলালের সঙ্গে গান্ধীজির বহু বিষয়েই মতপ্রার্থক্য ছিল। কিন্তু তিনি কখনও গান্ধীজির ক্রিয়াকলাপের বিরোধিতা করেননি।

রাষ্ট্রচিন্তায় জওহরলালের মৌলিক অবদান বিশেষ না থাকলে তাঁর অনুসৃত বহুবিধ কমসূচি ও কর্মপদ্ধতি থেকে তাঁর নিজস্ব ভাবনাচিন্তা ও একটি সুস্পষ্ট মতবাদ ফুটে ওঠে। ব্রিটেনের ফেবিয়ান সোসাইটির গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী আদর্শ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের পরিকল্পিত অর্থনৈতিক পদ্ধতিতে দেশোন্নয়নের প্রয়াস তাঁকে প্রভাবিত করে। তাই দেখা যায়, ভারতীয় সংবিধানে সংসদীয় গণতন্ত্রী প্রথায় নাগরিকদের মৌল অধিকারের সঙ্গে রাষ্ট্রের অনুসরণীয় নির্দেশাত্মক নীতির কথা বলা হয়েছে। আইনের শাসনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া, সরকারি ক্ষমতার পৃথকীকরণ এবং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা ভারতীয় শাসনব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য। বিকেন্দ্রিত পঞ্চায়েতী ব্যবস্থার সমান্তরাল ধারায় মিশ্র অর্থনীতির প্রবক্তা হিসাবে ভারতে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার তিনি

প্রবর্তন করেন। বিজ্ঞান ও কারিগরি বিদ্যার প্রসার, পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা, এবং আধুনিক শিল্প-বাণিজ্যের উন্নয়নে তিনি ছিলেন সবিশেষ উৎসাহী। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নীতি অনুসরণ এবং জোটনিরপেক্ষতার মানসিকতা সৃষ্টির পেছনেও ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ও নেতৃত্ব।

জনমত (Pbulic Opinion)

গণতন্ত্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো জনমত। গণতান্ত্রিক সরকারের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এটা জনগণের শাসন। জনসাধারণের সম্মতির ওপর এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত। এদের মতামত না জেনে শাসন পরিচালিত হতে পারে না। তাই বলা যা যায়, গণতান্ত্রিক শাসনে জনমত হলো প্রাণবায়ু ও মূল চালিকাশক্তি। জনসাধারণের মতামতকে জনমত বলা হয়। 'জনমত' শব্দটি কখন থেকে ব্যবহৃত হচ্ছে তা নিশ্চিত বলা যায় না। রোমান যুগে consensus populi বা 'মতের ঐক্য' শব্দটির প্রয়োগ দেখা যায়। ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালে রুশো সর্বপ্রথম জনমতের ওপর সমধিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

সাধারণত জনগণের মতামতই জনমত হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ লোকের মতামতই জনমত নয়। জনমত বুঝে চলাই হলো গণতান্ত্রিক সরকারের একটি প্রধান কাজ। জনমতের দর্পণে রাজনৈতিক কাজ ও ভাবনার গুণাগুণ বিবেচিত হয়। জাগ্রত জনমতের অভিব্যক্তি হলো গণতন্ত্রের গতিশীলতার লক্ষণ। প্রথম পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় কিছু ব্যক্তি জনমত গঠনের জন্য কোনো চিন্তা ব্যক্ত করেন; তারপর সেটা সর্বজনের মধ্যে প্রচার করা হয়। লোকে যখন সেটা বুঝে গ্রহণ করে তখনই তা জনমতে পরিণত হয়। জনমতের প্রতীক সাধারণত মানুষের স্বার্থ ও চাহিদার ভারসাম্য রক্ষার চিহ্ন বহন করে (ওয়ালটার লিপম্যান)। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিদ্যাবত্তা ও শুভবুদ্ধি অনেকাংশ উন্নত জনমতের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। সরকারের অনুকূলে উপযোগী জনমত বলতে লোকের মধ্যে এমন একটা দৃঢ়মূল মনোভঙ্গী বোঝায় যেটা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তাদের বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় দেয়।

তবে জনবজীবনে লোকের বিশেষ কোনো বিষয়ে সম্ভাব্য আচরণ ও প্রবণতা নির্ণয় সংক্রান্ত নানাবিধ পরিসংখ্যানগত পদ্ধতি, নির্বাচন সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী ইত্যাদির সঙ্গে জনমতের কোনো সঙ্গতির প্রশ্নে মতদ্বৈধ থাকলেও একথা বলা চলে যে বিজ্ঞানসম্মত পরীক্ষা-নিরীক্ষা সাপেক্ষ জনমত বিষয়টি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্তর্গত।

জনমত গঠন ও প্রকাশের প্রধান সহায়ক হলোঃ ১. মুদ্রণযন্ত্র ও সংবাদপত্র, ২. রেডিও, টেলিভিশন ও সিনেমা, ৩. রাজনৈতিক দল, ৪. সভাসমিতি, ৫. শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও সাংস্কৃতিক সংগঠন ৬. ফেসবুক, টুইটার প্রভৃতি। সমাজতন্ত্রী দেশে সরকার এইসব সহায়ক সংস্থাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে। সে কারণে জনমত সরকারি ইচ্ছাক্রমে গঠিত হয়। তাই স্বাধীন জনমত গঠনের প্রথম প্রয়োজন হলো ব্যক্তিস্বাধীনতা ও গণতন্ত্রী সমাজব্যবস্থা। তবে বেশিরভাগ জনসাধারণ যেকোনো মতামত দিলেই তা জনমত হয়

না। এক্ষেত্রে উল্লেখ্য যে, যদি অধিকাংশ ব্যক্তি অন্যায় করতে চায়, তাহলে সে মত জনমত নয়। বলা যায়, যদি কোনো সম্প্রদায়ের অধিকাংশ ব্যক্তি ধূমপানের পক্ষে মতামত প্রদান করে, তাহলে সেটা জনমত হতে পারে না। তাদের মতামতের মধ্যে কোনো যুক্তি নেই এবং এতে জনগণের কল্যাণ সাধিত হবে না। এর প্রতিবাদে একজনও বললে তবে সেটা জনমত বলে বিবেচিত হবে, কারণ তার মতই অধিক গ্রহণীয়। সব সময়ে সংখ্যা পরিমাপও করা যায় না। একজনের মতামতও যদি যুক্তিপূর্ণ হয় ও সমাজের মঙ্গল বয়ে আনে, তাহলে তাকেই জনমত বলা যাবে। একজনের বা কতিপয় ব্যক্তির মতামত জনমতে রূপান্তরিত এবং অধিকাংশের মতামত আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে তার বহু প্রমাণ আছে। আমাদের দেশে ভাষা আন্দোলন, ৬-দফা ইত্যাদি অল্প কয়েকজনের মতামত হলেও তা পরে জনমতে রূপান্তরিত হয়েছে। তাই সংখ্যা পরিমাপ করাই যথেষ্ট নয়-যুক্তিও বিবেচনা করতে হবে। সেজন্য জেফারসন বলেছেন যে, সাহসী একজন ব্যক্তিই সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং একজনের মতামতও জনমতে পরিণত হতে পারে। তদুপরি জনগণের দীর্ঘস্থায়ী কল্যাণ তাতে থাকবে কি না সেদিকেও সমধিক দৃষ্টি প্রদান করা কর্তব্য।

জবাবদিহিতা (Accountability)

গণতান্ত্রিক ও দায়িত্বশীল সরকার ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য উপাদান জবাবদিহিতা। জবাবদিহিতার দুটি দিক রয়েছে। এক. যারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি তারা এবং সকল পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তাবৃন্দ ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগতভাবে তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করছেন কিনা এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট উপরিস্থ কর্তৃপক্ষ এবং জনগণ চাওয়ামাত্রই তাঁরা তাঁদের কাজ ও অবস্থানের ব্যাখ্যা দিতে বাধ্য থাকবেন। দুই. নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও রাষ্ট্রের কর্মচারী-উভয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। জবাবদিহিতা নীতি ও কাঠামোগত এক ধরনের ব্যবস্থাপনা। যা দ্বারা ব্যক্তি যখন কোনো প্রতিষ্ঠানের পক্ষে ক্ষমতা প্রয়োগ করেন তা তিনি ওই প্রতিষ্ঠানের মূল্যবোধ ও নীতির সঙ্গে কত সাদৃশ্য রেখে করেন- সেটা নিরূপণ করে। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার সংসদের হয়ে ক্ষমতা প্রয়োগ করে। সুতরাং সরকারকে সংসদের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। সংসদ সরকারের গৃহীত নীতিমালা সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করে এবং শেষ পর্যন্ত পলিসির ভাগ্য নির্ধারণ করে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান ও সরকারি কর্মকর্তাদের জবাবদিহিতার মুখোমুখি হতে হয়। জবাবদিহিতা না থাকলে প্রতিষ্ঠান পরিচালনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাচারিতা প্রশ্রয় পায়। যেখানেই দায়িত্ব লাভ ও দায়িত্ব অর্পণের ঘটনা ঘটে সেখানেই জবাবদিহিতার প্রশ্ন ওঠে। সরকারি প্রতিষ্ঠানের বড় কর্মকর্তা প্রতিষ্ঠানের হয়ে দায়িত্ব পালন করেন। তিনি প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করেন। তাকে প্রতিষ্ঠানের কাছে জবাবদিহি করতে হয়। ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তার কাছে নিম্নস্তরের কর্মকর্তার জবাব দিতে হয়। কাঠামোতে শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার জন্যে জবাবদিহিতা অত্যাবশ্যকীয়।

গণতন্ত্রে সরকারকে চূড়ান্তভাবে জবাবদিহি করতে হয় জনগণের কাছে। নির্বাচনের সময় সরকার জনগণের কাছে জবাবদিহি করে। গণতন্ত্রে মন্ত্রণালয়ের, সরকারি প্রতিষ্ঠান বা কর্তৃপক্ষের এবং সরকারি কর্মকর্তাদের যেকোনো কাজ তদারক করার বিধান রয়েছে। এজন্যে বিভিন্ন দেশে The Parliamentary Commissioner for Administration বা Ombudsman বা ন্যায়পালের পদ সৃষ্টির ব্যবস্থা রয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধানেও সংসদকে আইন দ্বারা ন্যায়পালের পদ প্রতিষ্ঠার অধিকার দেয়া হয়েছে। ন্যায়পাল সরকারের যেকোনো কাজ বা সরকারের বিরুদ্ধে উত্থাপিত অভিযোগ সম্পর্কে তদন্ত করতে পারেন। ন্যায়পাল জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট (JKLF)

ভারত নিয়ন্ত্রিত একটি অঙ্গরাজ্যের বিপ্লবী সংগঠনের নাম জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট। ভারত সরকাররে অগণতান্ত্রিক আচরণ, শোষণ, নির্যাতন আর মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে বিশ্ব রাজনীতির আসরে নিজস্ব আসন প্রতিষ্ঠিত করেছে এই সংগঠন। ১৯৮৯ সালে এই সংগঠনের আত্মপ্রকাশ ঘটে। **কাশ্মীরে গোড়ার কথা:** মৌর্য সম্রাট অশোকের সময় (খ্রীঃপূর্ব ২৭২-২৩২ অব্দ) কাশ্মীরে বৌদ্ধধর্ম প্রচার লাভ করে এবং খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীতে মধ্য এশিয়া থেকে আগত কুষাণদের শাসনামলে দেশটিতে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক প্রসার লাভ করে। সপ্তম শতাব্দীতে কর্কট বংশের শাসন প্রতিষ্ঠার পর হিন্দু ধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। পরবর্তীতে ১৫৮৬ সালে শামসুদ্দিনের শাসনামলে ইসলাম ধর্ম প্রসার লাভ করে। ১৮১৯ সালে পাঞ্জাবের রাজা রঞ্জিত সিং কাশ্মীর দখল করে শিখ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। পরবর্তীতেহ ১৮৪৬ সালে ব্রিটিশ- ভারত সাম্রাজ্যের প্রদেশে পরিণত করে এবং কাশ্মীরকে ৭৫ লক্ষ টাকার বিনিময়ে জম্মুর গোলাব সিংয়ের নিকট বিক্রি করে দেয়। ১৯৪৭ সালে কাশ্মীরের ইসলামী জাতীয়তাবাদী দলগুলোর চরম বিদ্রোহের এক পর্যায়ে ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ কামনা করে গোলাব সিং-এর বংশধর হরি সিং এবং ভারতের সাথে কাশ্মীর একীভূত হওয়ার স্বার্থে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠায়। ১৯৪৭ সালের ২৪ অক্টোবর ভারত কাশ্মীরে হস্তক্ষেপ করলে ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বিরতি হয়। ১৯৪৯- এর জানুয়ারিতে নিরাপত্তা পরিষদের উদ্যোগে কাশ্মীর কোনো দেশের সঙ্গে থাকবে তার একটা গণভোটের কথা থাকলেও পরবর্তীতে ভারত সে চুক্তি থেকে সরে আসে এবং ১৯৫৭ সালের ২৩ জানুয়ারি ভারতীয় সংবিধানের ১নং ধারা মোতাবেক কাশ্মীরকে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে একীভূত করা হয়। তারপর থেকেই শুরু হয় বিদ্রোহ এবং সর্বশেষ JKLF-এর আবির্ভাব।

যে কারণে জম্মু-কাশ্মীর লিবারেশন ফ্রন্ট ব্যর্থ হচ্ছে

- যে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে লিপ্ত সে রাষ্ট্রের চেয়ে সমারিক দিক থেকে অনেক শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্রের সমর্থন পায়নি।

- JKLF- এর একটি অংশ এবং কাশ্মীরের হিন্দুরা ভারতের সঙ্গেই থাকতে আগ্রহী।
- ইসলাম ধর্মালম্বী কাশ্মীরের একটি অংশ স্বাধীন রাষ্ট্রের চেয়ে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হতে আগ্রহী। অর্থাৎ কাশ্মীরীরা রাজনৈতিকভাবে ত্রিধাবিভক্ত।
- কাশ্মীর সমস্যার প্রতি ক্রমবর্ধমান আন্তর্জাতিক নীরবতা স্বাধীন কাশ্মীর গঠনের প্রধান অন্তরায়।
- ক্ষমতা হারানো বা জনসমর্থন কমে যাওয়ার ভয়ে পাকিস্তান বা ভারত কেউই কাশ্মীরের ব্যাপারে রাজনৈতিক ঝুঁকি নিচ্ছে না।

জয় বাংলা (Joy Bangla)

উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান এবং একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের সময় উচ্চারিত জনপ্রিয় স্লোগান। আন্দোলনের সেই উত্তাল দিনগুলোতে লাখ লাখ মানুষের কণ্ঠে উচ্চারিত 'জয় বাংলা' ধ্বণি আকাশ-বাতাস মুখরিত করতো। মুক্তিযোদ্ধারা 'জয় বাংলা' ধ্বণি দিয়ে শত্রুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তেন। এই ধ্বণি দেশের জন্য আত্মহুতি দিতে মুক্তিযোদ্ধাদের প্রচণ্ড অনুপ্রেরণা জোগাতো। এটি কোনো নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলের স্লোগান ছিল না, বরং মুক্তিকামী বাঙালি জাতির আত্মপ্রতিষ্ঠার মন্ত্ররূপে কাজ করেছিল।

জরুরি ক্ষমতা (Emergency Powers)

একটি বিশেষ ধরনের ক্ষমতা। জরুরি অবস্থা বা সংকটকালে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করা হয়। রাষ্ট্রীয় সংকট, বিপদ ও জরুরি পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য এ ক্ষমতা দেয়া হয়। জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগের সময় নাগরিকদের অনেক মৌলিক ও গুরুত্বপূর্ণ অধিকার হরণ করা হয়। সংবিধান ও আইন অনুযায়ী সরকার বা সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধানের হাতে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার থাকে।

গণতান্ত্রিক ও সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার বিভিন্ন আইন ও শর্ত দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। যে কোনো সময় ইচ্ছা করলেই ক্ষমতা প্রয়োগ করা যায় না। জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকারের সঙ্গে এ ক্ষমতা কি কি শর্তে কার্যকর, কি কি পরিস্থিতিতে অকার্যকর হবে তাও গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উল্লেখ থাকে।

বাংলাদেশের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করার অধিকার দেয়া হয়েছে। যদি রাষ্ট্রপতির কাছে মনে হয় যে, দেশের অভ্যন্তরে জরুরি অবস্থা বিদ্যমান, বহিরাক্রমণ বা অভ্যন্তরীন গোলযোগের কারনে বাংলাদেশের বা এর কোনো অংশের ও অর্থনৈতিক জীবন বিপদগ্রস্ত তখন তিনি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করতে পারেন। তবে জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ও কোনো কোনো ক্ষেত্রে অকার্যকর হয়ে পড়বে তাও সংবিধানে বলা হয়েছে। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে জরুরি ক্ষমতা প্রয়োগ করলে নাগরিকদের মৌলিক অধিকারসমূহ এবং চলাফেরার স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা, সংগঠনের স্বাধীনতা, চিন্তা ও বিবেকের স্বাধীনতা ও বাক স্বাধীনতা, পেশা ও বৃত্তির স্বাধীনতা, সংগঠনের

স্বাধীনতা এবং সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কিত সংবিধানের ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০ ও ৪২ নম্বর ধারা স্থগিত থাকবে বলে সংবিধানে বলা হয়েছে।

জরুরি অবস্থা (Emergency Provisions)

জরুরি অবস্থা বলতে এমন সংকটজনক ও আকস্মিক অবস্থাকে বোঝায় যখন দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সাধারণভাবে বলা যায়, জরুরি অবস্থা বলতে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও জাতীয় স্বার্থে কোনো আকস্মিক সংকটকালীন অবস্থা কাটিয়ে উঠার জন্য কতিপয় মৌলিক অধিকারের ওপর অধিকতর বাধানিষেধ আরোপ করা বোঝায়।

জাতি (Nation)

ঐতিহাসিকভাবে সংগঠিত একটি জনগোষ্ঠী। একই এলাকা, ভাষা, নৃতত্ত্ব, সংস্কৃতি ইতিহাস, ধর্ম ইত্যাদিকেই সাধারণভাবে জাতীয়তার ভিত্তি বলে বিবেচনা করা হয়। নির্দিষ্ট কোনো ভৌগোলিক এলাকার জনগণ যখন একই বংশ, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ এবং সুখ-দুঃখ, ত্যাগ, আবেগ, ঐতিহ্য ও গৌরববোধে অভিন্ন হৃদয় হয়ে একই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে উপণীত হতে চায় এবং অন্যান্য জাতিত্ব থেকে নিজেদের পৃথক মনে করে ও সংগঠিতভাবে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য সচেষ্ট হয় তখন তাদের জাতিসত্তা দানা বাঁধে। কিন্তু কোনো জাতির সার্বভৌমত্ব থাকে না। সার্বভৌম ক্ষমতা আয়ত্ত হলে জাতি একটি রাষ্ট্র হিসেবে পরিগণিত হয়। জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন হলে সেটা একটি রাষ্ট্র গঠন করে। তবে জাতি গড়ে উঠলে যে রাষ্ট্র গড়ে উঠবে তার নিশ্চয়তা নেই। কোনো জাতি সম্পূর্ণ স্বাধীন না হলেও জাতিত্ব থাকে, কিন্তু রাষ্ট্রকে স্বাধীন ও সার্বভৌম হতেই হবে। তবে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলেও স্বতন্ত্র জাতিত্বের ভিত্তিতে জাতি গঠিত নাও হতে পারে। আবার রাষ্ট্রের অবলুপ্তি ঘটলে জাতির অস্তিত্ব চলে যায় না। ইদানীং স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রকে জাতি হিসেবে অভিহিত করা হয় যার ভিত্তিতে গড়ে উঠছে ইউনাইটেড নেশনস্ অর্গানাইজেশন (রাষ্ট্রসংঘ)।

জাতিসংঘ দিবস (UN Day)

২৪ অক্টোবর জাতিসংঘ দিবস। ১৯৪১ সালের ১২ জুন জাতিসংঘ গঠন সংক্রান্ত লন্ডন ঘোষণা স্বাক্ষরিত হয়। তারপর ১৯৪৫ সালের ২৬ জুন জাতিসংঘ সনদ স্বাক্ষরিত হয় এবং ১৯৪৫ সালের ২৪ অক্টোবর তা কার্যকর হয়। জাতিসংঘ সনদ কার্যকর হওয়ার দিনটিই জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালিত হয়।

জাতিসংঘ সমুদ্র চুক্তি (United Nations Convention on the Law of the Sea)

চুক্তিটি 'জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন' হিসেবে পরিচিত। জলসীমা নিয়ে বিভিন্ন দেশের মধ্যে বিরাজমান বিরোধ মীমাংসার দিক-নির্দেশনা দেয়ার জন্য আইনটি প্রণয়ন

করা হয়। ১৯৯৪ সালের নভেম্বরে চুক্তিটি কার্যকরী হয়। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১৬৭টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে।

জাতিসংঘ সমুদ্র আইন কনভেনশন অনুযায়ী দেশগুলো উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল বা ৩৭০ কিমি পানিসীমা নিজের বলে দাবি করতে পাবে। ফলে ওই জলসীমার মধ্যে অবস্থিত তেল ও গ্যাসের মজুদ ছাড়াও মৎস্য শিকারের অধিকার দেশগুলোর থাকবে। কিন্তু কন্টিনেন্টাল সেলফ হলে তার ওপর দেশগুলোর পূর্ণ সার্বভৌমত্ব থাকবে না।

জাতীয় আর্কাইভস (National Arclives)

জাতীয় আর্কাইভস হলো জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দলিল-দস্তাবেজ ও প্রামাণ্য গ্রন্থাদি সংরক্ষণের প্রতিষ্ঠান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা লাভের পর ঢাকায় আর্কাইভস প্রতিষ্ঠার সরকারি প্রচেষ্টা শুরু হয়। অতঃপর ১৯৭৩ সালে ঢাকায় আর্কাইভস ও গ্রন্থাগার অধিদপ্তরের অধীনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'বাংলাদেশ জাতীয় আর্কাইভস' (NAB)। প্রথম দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এলিফ্যান্ট রোডে একটি ভাড়া বাড়িতে এর কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৮৫ সালে (NAB) -এর অফিস ও সংগ্রহশালা ঢাকার শেরে বাংলা নগরের আগারগাঁওয়ে নবনির্মিত জাতীয় গ্রন্থগার ভবনে সাময়িকভাবে স্থানান্তরিত হয়। সরকারের গুরুত্বপূর্ণ ও স্থায়ী দলিল দস্তাবেজ সংগ্রহ, সংরক্ষণ, পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনার জন্য গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৩ সালে জাতীয় আর্কাইভস অধ্যাদেশ জারি করে। এরপর বিভিন্ন মন্ত্রণালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে ১৩ সদস্যের জাতীয় আর্কাইভস উপদেষ্টা পরিষদ গঠিত হয়। জাতীয় আর্কাইভসে একটি বৃহৎ লাইব্রেরি রয়েছে যাতে অর্থনীতি, রাজনীতি, শিল্পকলা, ইতিহাস ও সমাজবিষয়ক প্রচুর গ্রন্থ রয়েছে।

জাতীয় পার্টি (Jatiya Party)

১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ রক্তপাতহীন এক সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে সেনাপ্রধান হুসেইন মোহাম্মদ এরশাদ বি.এন.পি সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। সারা দেশে সামরিক আইন জারি করে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার ওপর বিধি নিষেধ জারি করা হয়। পরে ক্ষমতায় টিকে থাকা এবং বিরোধী দলকে মোকাবিলার জন্য এরশাদ রাজনৈতিক দলগঠনের প্রক্রিয়া শুরু করেন। এর মধ্যে রাজনৈতিক দলগুলোর তৎপরতার ওপর থেকে বিধি নিষেধ তুলে নেয়া হয়। এই প্রক্রিয়ার অংশ হিসেবে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আহসান উদ্দিন চৌধুরীকে চেয়ারম্যান করে ১৯৮৩ সালের ২৭ নভেম্বর 'জনদল' নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করা হয়। জনদলে যোগদানকারী দলগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল আওয়ামী লীগ (মিজান), শামসুল হুদা চৌধুরী ও আব্দুল মতিনের নেতৃত্বে বি.এন.পির একাংশ, জাতীয় লীগ, ডেমোক্রেটিক লীগ (শাহ মোয়াজ্জেম গ্রুপ), ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (নাসের), ইউ.পি.পি (কাজী

জাফর), গণতান্ত্রিক পার্টি (জাহিদ গ্রুপ)। এ দলগুলোর সমন্বয়ে গঠিত 'জনদল' পরবর্তীতে ১৯৮৬ সালের ১ জানুয়ারি 'জাতীয় পার্টি' নামে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর এরশাদ জাতীয় পার্টিতে যোগদান করেন এবং পরের দিন অর্থাৎ ২ সেপ্টেম্বর দলের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ৪২.৩৪% ভোট ও ১৫৩ টি আসন লাভ করে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। প্রচন্ড গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ১৯৯০ সালের ৬ ডিসেম্বর এরশাদ সরকারের পতন ঘটে। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১১.৯২% ভোট ও ৩৫টি আসন লাভ করে সংসদের তৃতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জাতীয় পার্টি ১৬% ভোট ও ৩২টি আসন লাভ করে। এই সংসদে জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগের সাথে ঐক্যমত্যের সরকার গঠন করে। পরবর্তীতে জাতীয় পার্টি ভাঙনের শিকার হয়। ২০০১ সালের ১ অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরশাদের নেতৃত্বাধীন জাতীয় পার্টি ৭.২৫% ভোট ও ১৪টি আসন লাভ করে। ২০০৮ সালের নবম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগের সাথে জোটগত নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে। পরবর্তী ২০১৪ সালের দশম সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে প্রধান বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। অবশ্য জাতীয় পার্টি থেকে কয়েকজন মন্ত্রিসভাতেও নাম লেখান। বাংলাদেশের রাজনীতিতে জাতীয় পার্টি একটি গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক দল।

জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস (National Revolution & Solidarity Day)

১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর বাংলাদেশের ইতিহাসে এক যুগান্তকারী দিন। এ দিনে জাতিগত পরিচয় নির্দিষ্টকরণ, স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সংহতকরণ, গণতন্ত্র পুনরুদ্ধার ও জাতীয় ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই দিনটি জাতীয় বিপ্লব ও সংহতি দিবস হিসেবে পরিচিত। ৭ নভেম্বরের ঐতিহাসিক ঘটনার প্রেক্ষাপটে এবং এর পরবর্তী ঘটনা প্রবাহের সাথে আরো রাজনৈতিক ঘটনাবলী জড়িত। ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীনতা লাভ করে। কিন্তু সদ্য প্রতিষ্ঠিত এ দেশেটির বিরুদ্ধে চক্রান্ত থেমে থাকেনি। দেশে হত্যা, লুণ্ঠন, ব্যভিচার, রাহাজানি, ব্যাংক ডাকাতি, লুটপাট দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পায়। সর্বোপরি একটি অস্থিতিশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। ঠিক এই সময় ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বিপথগামী একদল সেনাবাহিনীর অফিসার কর্তৃক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব সপরিবারে নিহত হন। অভ্যুত্থানকারীরা খন্দকার মোশতাক আহমদকে ক্ষমতায় বসান। কিন্তু একটি বিশেষ রাজনৈতিক দল ও সেনাবাহিনীর একটি অংশ তা ভালো চোখে দেখেনি। এই প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর তৎকালীন ডেপুটি চিফ অব স্টাফ ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ ১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর একটি অতি স্বল্পকালীন অভ্যুত্থান তৎকালীন সেনাপ্রধান মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমানকে ক্যান্টনমেন্টে বন্দি করেন এবং খালেদ মোশারফ নিজেকে সেনাপ্রধান ঘোষণা করেন।

জাতীয় সমাজতন্ত্র (National Socialism)

জাতীয় সমাজতন্ত্র হলো নাৎসিবাদেরই অপর নাম। ১৯১৩ সালে অ্যাডলফ হিটলার জার্মানিতে অভিনব এক রাজনৈতিক আন্দোলন গড়ে তোলেন। এর ভিত্তিতে নাৎসি দলের (ন্যাশনাল সোসালিস্ট জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টি) উদ্ভব ঘটে। ১৯২৯ তত্ত্বগতভাবে প্রত্যয়টিকে আন্তর্জাতক সমাজতন্ত্রের বিপক্ষে একট জাতীয়তাবাদী মতাদর্শ হিসেবে দাঁড় করানো হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাভূত দেশ ও জাতিসমূহের কাছে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে সমাজতন্ত্রের পরিমিশ্রণের যৌক্তিকতা দেখানো হয়। গোড়ার থেকে আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতাদর্শটির অন্তর্নিহিত যে-সুর ফুটে ওঠে সেটি ছিল মূলত জাতীয়তাবাদী দেশাভিমান ও অপর জাতির প্রতি বিদ্বেষ এবং সামরিক উচ্চাভিলাষ। জাতীয় আত্মাভিমান থেকে প্রকাশ পায় বাসভূমির দাবি যেটা ভূরাজনীতির সৃষ্টি করে। যে-জাতি প্রবল তাদের প্রয়োজনীয় বাসভূমির ওপর সম্প্রসারণের অধিকার এবং যাদের দখলে সে-ভূমি থাকে তাদের উৎখাত করার সঙ্গে হীন জাতিসমূহকে তাদের কর্মফল অনুসারে নির্মূল করার অধিকার ও শক্তি প্রয়োগ করা হয়। জাতীয় সমাজতন্ত্রী তত্ত্বে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও মানুষের সামাজিক সম্পর্ককে এক করে দেখা হয়, যাতে সব রকম রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের ফল রাষ্ট্রের ওপর এসে পড়ে। কার্যত তাতে একদলীয় রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। সামাজিক সমন্বয় বিধানের যাবতীয় দায়িত্ব রাষ্ট্রের ওপর অর্পিত। ফলে গড়ে ওঠে এক সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী রাষ্ট্র। প্রত্যয়টির আংশিক সমাজতন্ত্রী বৈশিষ্ট্য হিসেবে কল্যাণরাষ্ট্র ও মিশ্র অর্থনীতির প্রবর্তন এবং শাসকশ্রেণির উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক মহানেতার অধিষ্ঠানের কথা বলা হয়। উৎপাদন ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত মালিকানার আধিপত্য, ইহুদি নিধন, শ্রমিক ও বামপন্থী তথা সমাজবাদী আন্দোলনের কঠোর দমন হিটলারের শাসনক্ষমতায় অবস্থানকালে (১৯৩৩-৪৫) নাৎসি কর্মসূচির প্রধান অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়।

জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল (জাসদ) (Natioanl Socialist Party)

সমাজতান্ত্রিক বিধিবিধান সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী সরকারের সাথে মতদ্বৈততাহেতু ১৯৭২ সালের ৩১ অক্টোবর জাসদের জন্ম হয়। দলের মাধ্যমে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের ভিত্তিতে দেশ গড়ার আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রলীগের দু'দলের অন্তর্দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে জাসদের জন্ম। অবশেষে ছাত্রলীগের তৎকালীন ডাকসাইটে নেতা আ.স.ম আব্দুর রব ও শাজাহান সিরাজ জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল গঠন করেন। মেজর (অব) এম.এ. জলিল দলের যুগ্ম আহ্বায়কের দায়িত্ব পালন করেন। দলের অভিমত অনুসারে গণতান্ত্রিক রীতি-নীতির আওতায় সামজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব। তাদের অভিমত অনুসারে শ্রেণিসংগ্রাম ও সামজিক বিপ্লবের বৈজ্ঞানকি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সম্ভব ১৯৭৩ সালে সংসদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করলেও জাসদ ৩০০ টির মধ্যে মাত্র ২টি আসন লাভ করতে সমর্থ হয়। তারা ১৯৭৪ সালের মধ্যে সরকারকে বিপ্লবের দ্বারা উৎখাতের পরিকল্পনা এবং গণপাবাহিনী নামে সশস্ত্র কর্মীবৃন্দ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করে এবং

দলের লক্ষ্যকে বাস্তবায়িত করার জন্য একটি সৈনিক সংস্থাও গঠন করে। ১৯৭৫ সালের ৭ নভেম্বর সিপাহী অভ্যুত্থানের জাসদ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাদের ইচ্ছা ছিল জেনারেল জিয়াকে রাষ্ট্রক্ষমতায় রেখে সামাজিক বিপ্লব সম্পন্ন করা। পরে মণোমালিন্যহেতু জিয়া দলের প্রধান নেতা ও গণবাহিনীর প্রধান কর্নেল তাহেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন এবং মেজর জালিল ও আব্দুর রবসহ অনেক নেতাকে কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন। ১৯৭৬ সালে জাসদ নিষিদ্ধ ঘোষিত হলেও ১৯৭৮ সালের এপ্রিল মাস থেকে পুনরায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া চালু করার অনুমতি পায়। ১৯৭৯ সালে জাসদ সহিংস প্রতষ্ঠার মানুষে নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণআন্দোলন গড়ে তোলার পরিকল্পনা নেয়। ১৯৮০ সালে জিয়াবিরোধী যে ১০টি দল জোটবদ্ধ হয় জাসদ ছিল তার একটি। জাসদের মূল কৌশল সম্পূর্ণ পরিবর্তনের কারণে ১৯৮১ সালে অপেক্ষাকৃত বিপ্লবীরা দলত্যাগ করে বাংলাদেশ সামজতান্ত্রিক দল (বাসদ) গঠন করে। পরবর্তীতে জাসদ (রব) এরশাদ সরকারকে সকল প্রকার সাহায্য প্রদান করে এবং ১৯৮৬ সালে আওয়ামী লীগের সাথে নির্বাচনে অংশ নিয়ে মাত্র ৪টি আসন লাভে সমর্থ হয়। সে সময়ে জাসদ ছিল একটি আনুগত্যশীল বিরোধী দল। কারণ তারা সকল ক্ষেত্রে সরকারকে সমর্থন করতো। ১৯৮৮ সালে সংসদ নির্বাচনের জাসদ (রব) প্রায় নিক্রিয় হয়ে পড়ে। ১৯৯১ সালের সংসদ নির্বাচনের ১৯৬১ জন প্রার্থী মনোয়ন দান করলেও একটিও আসন লাভে সমর্থন হয়নি। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনের ১টি আসন পায় এবং শেখ হাসিনার জাতীয় সরকারে জাসদের প্রধান আব্দুর রবকে প্রথমে নৌপরিবহন মন্ত্রী এবং পরবর্তীতে মৎস্য ও পশু সম্পদ মন্ত্রী নিয়োগ করা হয়। ২০০১ সালের অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের জাসদ (রব) ৭৬ টি আসনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে একটি আসনেরও বিজনীয় হয়নি। দলীয় মতবিরোধ ও স্বার্থসংশ্লিষ্ট কারণে জাসদ বিভিন্ন সময় ভাঙনের মুখে পড়ে এবং বিভিন্ন উপদল সৃষ্টি হয়। ভিন্ন আদর্শ ও সংগ্রামী ভূমিকার জন্য ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত যে দল আওয়ামী লীগের প্রধান প্রতিপক্ষ ছিল, নানা কারণে ও আদর্শচ্যুতিতে আজ তা লুপ্ত প্রায়।

জাতীয় সরকার (National Government)

অনিয়ন্ত্রণযোগ্য জরুরি অবস্থা, অর্থনৈতিক মন্দা, যুদ্ধ ইত্যাদি পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য অনেক সময় দেশের সকল রাজনৈতিক দলগুলোর মাঝে ঐকমত্য সৃষ্টি হয় এবং উক্ত ঐকমত্যের ভিত্তিতে যে সরকার গঠিত হয় তাকেই জাতীয় সরকার বা জাতীয় ঐকমত্যের সরকার বলে।

জাতীয়তা (Nationality)

জাতীয়তা ধর্মভিত্তিক (যেমন: মুসলমান, হিন্দু, খ্রিস্টান)., ভাষাভিত্তিক (যেমন: বাঙালি, আরবি, ল্যাটিন), নৃতত্ত্বভিত্তিক (যেমন: আর্য, মঙ্গোলীয়, সেমেটিক) বর্ণভিত্তিক (যেমন: শেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ), অঞ্চলভিত্তিক যেমন: স্ক্যান্ডিনেভীয়, মধ্যাশয়ি, ল্যাটিন

আমেরিকান) ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অপরদিকে নাগরিকত্ব হলো একটি রাষ্ট্রের স্থায়ী অধিবাসী হওয়া। কোনো ভূখণ্ডের জনগণ যখন অধিকতর গভীর ঐক্যবোধে অনুপ্রাণিত হয়ে অন্যান্য জনগণ থেকে আত্মস্বাতন্ত্র্য অনুভব করে তখন জাতিত্বের উদ্ভব ঘটে। জাতিত্ব বিকশিত হয় যখন ওই ভূখণ্ডের জনগণের মধ্যে ভাষা, ধর্ম, বংশানুক্রম ও সংস্কৃতিগত ঐক্য বিরাজ করে। জাতিত্বের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো বংশগত ও রাজনৈতিক চেতনা। প্রত্যয়টির অন্যান্য উপাদান হলো ভৌগোলিক, আবেগপ্রবণ, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থের এবং ব্যবহারিক জীবনের ঐক্য। উল্লিখিত উপাদানগুলোর মধ্যে বাহ্যিক উপাদানগুলো গৌণ, সেগুলো ব্যতিরেকেও জাতিত্ব গড়ে উঠতে পারে ; প্রকৃতপক্ষে মূখ্য উপাদান হলো ভাবগত ঐক্য। যদি একই ঐতিহাসিক ঘটনাপ্রবাহে সংশ্লিষ্ট অধিবাসীদের জীবন গড়ে ওঠে এবং তাদের সুখ-দুঃখ, ত্যাগ, আবেগ ও গৌরববোধ একই আকাঙ্ক্ষিত সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক লক্ষ্যে পৌছাতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করে এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য নিজেদের ঐতিহ্যের দৃষ্টান্ত স্থাপন করে, তখন তাদের আবেগ সম্পৃক্ত ভাবগত একতাবোধ জাতিত্ব গঠনের ভাবমূর্তি প্রস্তুত করে ; তারা অন্যান্য জাতিত্ব থেকে নিজেদের সত্তা পৃথক বলে মনে করে। উল্লেখ্য, জাতিত্ব ও জাতি প্রত্যয় দুটির মধ্যে পার্থক্য আছে। জাতিত্ব যখন রাজনৈতিকভাবে সম্পূর্ণ সচেতন এবং সুসংগঠিতভাবে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের মধ্যে দিয়ে নিজেদের জাতীয় বৈশিষ্ট্য পরিপূর্তির প্রয়াসী হয় তখন জাতিত্ব জাতিতে পরিণত হয়। জাতি হলো জাতিত্বের পরবর্তী ধাপ এবং সেটা একটি রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে স্বাধীন হয়েছে কিংবা স্বাধীন হবার জন্য ঐক্যবদ্ধভাবে সচেষ্ট। একটা রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে বিভিন্ন জাতীয়তার মানুষ থাকতে পারে। যেমন ভারতে হিন্দু আছে, মুসলমান আছে, আর্য আছে, দ্রাবিড় আছে, বাঙালি আছে, তামিল আছে। অপরদিকে একই জাতীয়তার মানুষও বিভিন্ন রাষ্ট্রের নাগরিক হতে পারে। যেমনঃ মঙ্গোলীয়রা চীন, জাপান, কোরিয়া, মঙ্গোলীয়াসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিক, মুসলমানদের মধ্যে আছে বিশ্বির প্রায় সকল দেশের নাগরিক কিংবা বাঙালিদের কেউ বাংলাদেশের কেউ ভারতের নাগরিক।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism)

জাতির ইংরেজি প্রতিশব্দের অন্যতম হলো Natinality ও Nation। জাতীয়তাবাদের ইংরেজি হলো Nationalism। দেশের জাতিকুল, সংস্কৃতি, ধর্ম, ভাষা ইত্যাদির ভিত্তিতে দেশবাসীর পারস্পরিক সংযুক্ত থাকার ইচ্ছা ও আবেগ থেকে গড়ে ওঠে ন্যাশনালিটি। নিজেকে কোনো জাতির অন্তর্ভুক্ত জ্ঞান করা, সেই জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য মূল্যবোধ, স্কীয়তার রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে। নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অবস্থান ও জনসংখ্যার ভিত্তিতে দেখা দেয় রাষ্ট্র বা নেশন স্টেট;

ন্যাশনালিজম বা জাতীয়তাবাদ হলো তার ভাবগত পশ্চাৎপট। নিজেকে কোনো জাতির অর্ন্তভূক্ত জ্ঞান করা, সেই জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিকাশ, অগ্রগতি, ভৌগোলিক অবস্থান, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদির সঙ্গে একাত্মবোধ করা এবং সংশ্লিষ্ট জাতির ঐতিহ্য, মূল্যবোধ, স্বকীয়তা রক্ষা ও বিকাশে বিশ্বাসী হওয়ার মধ্য দিয়েই জাতীয়তাবাদের প্রকাশ ঘটে।

জাতি গঠিত হবার ভেতর দিয়ে জন্মলাভ করে জাতীয়তাবোধ এবং এটি মানসিক ব্যাপার ও মনস্তাত্ত্বিক অবস্থা। Toynbee বলেন, ""জাতীয়তাবাদ হলো একটি মনস্তাত্ত্বিক অনুভূতি"(Nationalism is a psychological feeling)। আলফ্রেড ডি গ্রাজিয়ারের কথায়, এটা হলো একটি আবেগপূর্ণ রাজনৈতিক ধারণা (It is a sentimental political concept)। জির্মানের কথায়, জাতীয়তাবোধ হলো আত্মিক উত্তরাধিকার। এটা অনুভূতি, চিন্তা ও জীবনধারার পদ্ধতি। এর দ্বারা নির্দিষ্ট মানব গোষ্ঠীর মধ্যে ঐক্যবোধ জাগ্রত হয়-যার সাহায্যে সেই বিশেষ মানব গোষ্ঠীকে অন্য সব গোষ্ঠী থেকে স্বতন্ত্র বলে ভাবতে শেখায়। একই ইতিহাস, ঐতিহ্য, সাফল্য ও ব্যর্থতা জাতীয়তাবোধকে জাগ্রত ক্ষমতা পরস্পরের মাঝে এমন আত্মীয়তার বন্ধন সৃষ্টি করে যা তাদের একত্রিত করতে ভয়ানক সহায়ক হয়। জাতীয়তাবোধে জাতীয় কৃষ্টির সাথে একাত্ম হয়ে জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। মানুষের মাঝে শত ব্যবধানকে কমিয়ে একটি জনসমাজকে ভয়ানক শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে। সে শক্তি অন্য কোনো শক্তির কাছে মাথা নত করবে না। মানুষের মধ্যে কোনো প্রকার বিভেদের রেখা টানা হয় না। ম্যাকাইভার বলেন, 'জাতীয়তাবাদ হলো সম্প্রদায়ের চরম ও পরম জীবনবোধ-যেটা সে সম্প্রদায় রাজনৈতিক শক্তি বা রাষ্ট্রীয় ঐক্যের মাধ্যমে বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে অধিকার করে বা করতে চায়। বহু কারণের পরিপ্রেক্ষিতে জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয় কিন্তু একবার জাগ্রত হলে তা হয়ে উঠে বেগবান ও দুর্বার। এর প্রেরণায় জনসমাজ আত্মত্যাগ পর্যন্ত করতে প্রস্তুত থাকে।' উক্ত জনসমাজের মধ্যে বিশেষ ঐক্য গড়ে উঠে-যা অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শিখায়। জাতীয়তাবাদের পেছনে ঐক্যের জন্য বিশেষ অনুভূতি প্রবল ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানীগণ একে আধ্যাত্মিক চেতনা বলে অভিহিত করেছেন। এক ভূখণ্ডে বসবাসরত এক ভাষা, সাহিত্য, ধর্ম, ঐতিহ্য, জীবনব্যবস্থা, প্রথা, আচার-ব্যবহার, একই প্রকার আর্থ-সামাজিক এবং রাজনৈতিক অবস্থার মধ্যে অবস্থান করে তখন সে জনসম্প্রদায়কে জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী বলা যায়। এটা মানসিক ব্যাপার এবং মনের গভীরে তার জন্ম ও বিস্তার লাভ ঘটে। লাস্কি বলেছেন, "জাতীয়তাবাদ সাধারণত এক প্রকার মানসিক ঐক্যবোধে জাগ্রত জনসম্প্রদায়, যে ঐক্যবোধ তাদের অন্যদের থেকে পৃথক করে।"

জাতির মধ্যে যখন কিছু বন্ধন মজবুত হয় তখন জন্ম জাতীয়তাবাদ। অনেকে এ প্রসঙ্গে ভাষা ও সংস্কৃতির কথা বলেছেন, কিন্তু তা যথার্থ নয়। বহু ভাষাভাষি, ধর্ম ও বর্ণের লোক একত্রে বসবাস করেও একই জাতীয়তাবাদে উদ্বুদ্ধ হয়। এটা হলো অনুভূতির (Common feeling) ব্যাপার। জাতীয়তাবাদ একটি মানসিক বিষয়। এটা একটা

আনুগত্যও বটে, যে আনুগত্য থাকে বিশেষ কিছুর ভিত্তিতে বিশেষ কোনো রাষ্ট্রের প্রতি-যা অন্যকারও মধ্যে সচরাচর পরিলক্ষিত হয় না। এই ভাবধারা অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শিক্ষা দেয়। জাতীয়তাবাদ হলো একটি বিশ্বাস যা একটি জাতির মধ্যে পরিস্ফূটিত হয়, যে জাতি স্বাধীনভাবে নিজেদের সবকিছুকে গৌরবের সাথে গ্রহণ করে।

আত্মিক ধারণা ও মানসিক অনুভূতি জাতীয়তাবাদের মূল ভিত্তি। এতে কোনো জাতির রাজনৈতিক ইতিহাস, ঐতিহ্য, অতীত স্মৃতি প্রভৃতির আত্মপ্রকাশ ঘটে এবং জনসম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য বিধান হয়ে থাকে। এই আদর্শে অনুপ্রাণিত মানবগোষ্ঠীকে অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র ভাবা হয়। জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক উত্তরাধিকারকে প্রতিষ্ঠার চেষ্টা চালায়। মানবজাতির বিশেষ মানসিকতা ও দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ ও প্রতিফলন ঘটে। নিজের মাতৃভূমির প্রতি গভীর ভালবাসা জাতীয়তাবাদের অন্তর্নিহিত ও মর্মকথা। হেজ বলেন, " জাতীয়তাবাদ হলো জাতীয় জনসমাজ এবং স্বদেশ প্রেম নামক দুটি প্রাচীন উপাদানের আধুনিক আবেগমণ্ডিত সমন্বয় ও অতিরঞ্জন।" এই সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করলে আমরা দুটি জিনিস দেখতে পাই যথা; জাতীয় জনসমাজ ও স্বদেশ বা নিজ দেশের প্রতি ভালবাসা। সুতরাং নির্দিষ্ট জনসমাজ যখন মাতৃভূমিকে গভীর ভালাবাসায় উদ্বুদ্ধ হয় তখন জাতীয়তাবাদ জাগ্রত হয়। অনেকে জাতীয়তাবাদকে স্বদেশপ্রেম বলে উল্লেখ করেছে। বার্নসের মতে, প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কিছু বিশেষ গুণ আছে, যা তাদের স্বার্থ ও কল্যাণের জন্য সংরক্ষণ করা উচিত। এটা করতে গিয়ে যে মনোভাবের জন্মলাভ হয় সেটাই হলো জাতীয়তাবাদ। পরিশেষে বলা যায় যে, জাতীয়তাবাদ এমন মানসিক অনুভূতি-যা কোনো নির্দিষ্ট মানবগোষ্ঠী থেকে নিজেদের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক ঐতিহ্য,ভাষা,সাহিত্য, জীবনযাত্রা,কৃষ্টি প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন এবং অন্যদের থেকে আলাদা ভাবতে শিক্ষাদান করে।

আধুনিককালে জাতি, ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে জাতীয়তাবাদী আবেগ অষ্টাদশ শতকের শেষ দশক অর্থাৎ ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে ঘণীভূত হচ্ছে। বিপ্লব-উত্তর ইউরোপে জাতি রাষ্ট্রের শক্তি ও সত্তা ক্রমে বৃদ্ধি পায়। পাশাপাশি বিকশিত হয় জাতির আবেগে নান্দনিক নতুন মূল্যবোধ। জাতীয়তাবাদের বিবর্তনের ধারায় জাতি রাষ্ট্র ক্রমে সমাজের প্রধান সংগঠনে পরিণত হয়েছে। মূল সমাজের পরিসর হয়েছে সংকুচিত। জাতি রাষ্ট্রের ক্রমবিবর্তনে গণতান্ত্রিক আদর্শের সঙ্গে আর্থ-সামাজিক মাত্রার সমান মিশ্রণ ঘটে। শিল্পবিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের যুক্তধারায় নাতুন পুঁজিবাদী শ্রেণি সামন্ততন্ত্রের অবসান ঘটায় নতুন জীবনযাত্রার প্রবণতা এবং যুক্তিবাদী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারবোধের উন্মেষ ঘটায় জাতীয়তাবাদ। পরাধীন দেশে জাতীয়তাবাদ স্বাধীনতা আন্দোলনের উপাদান জোগায়।

জাতির প্রতি আসক্তি, অনুরাগ ও অতীত গরিমার ভিত্তিতে জাতীয় আবেগ ও দেশহিতৈষা গড়ে ওঠে। সেটাই হলো জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উপাদান। রাষ্ট্রের গঠনে প্রয়োজন হয় জাতির, এবং এক বা অনেক জাতির সমন্বিত জাতীয়তাবাদী আবেগের উপাদানে রাষ্ট্র সুসংবদ্ধতা লাভ করে। জাতীয় পরিচয় রাজনৈতিক

ক্রিয়াকলাপের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। জাতীয় পরিচয় কেবলজাতিসত্তা অর্থাৎ ভৌগোলিক সংযুক্ততা, ভাষা, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির ওপর নির্ভর করে না ; পৃথক অধিকার ও আনুগত্যের চেতনাও পরিচয়কে নিরূপণ করে। সেই চেতনা প্রতিবেশী দেশের সঙ্গে বিশেষ করে নৃকুলগত সম্পর্কে একাত্মতা সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হয়।

জাতীয়তাবাদের আলোর দিকটা পশ্চিমে ক্রমে নিস্প্রভ হয়ে পড়ে এবং তার অন্ধকার দিকটা বড় হয়ে দাঁড়ায়। তার একদা গণতন্ত্রী মানবতাবাদী ভূমিকা সকীর্ণ জাত্যভিমান, অসহিষ্ণু অন্ধ দেশভক্তি,সংখ্যালঘুদের ওপর পীড়ন, অন্য জাতির প্রতি বিদ্বেষ ও পররাজ্য গ্রাসের আচরণে ঢাকা পড়ে যা। ফরাসি ভাবুক আর্নেস্ট রেনা নেশনের উপাদান হিসেবে ভাষা ধর্ম, জাতি ও ভৌগোলিক সংযুক্তিতে বিশ্বাসী ছিরেন না। তাঁর মতে, সবার মনে অতীতের স্মৃতিসম্পদের গরিমাবোধ এবং একসঙ্গে বসবাসের দৃঢ় ইচ্ছাই নেশনের শ্রেষ্ঠ উপাদান। তাঁর সূত্র ধরে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন যে "নেশন একটি সজীব সত্তা, একটি মানস পদার্থ"। দুটি জিনিস এই মানস পদার্থের "অন্তঃপ্রকৃতি গঠন করেছে। একটা হচ্ছে "সর্বসাধারণের প্রাচীন স্মৃতিসম্পদ, আর একটি পরস্পর সম্মতি, একত্রে বাস করিবার ইচ্ছা।" জাতীয়তাবাদের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রত্যক্ষ করেছিলেন যে একদিকে তাতে সমষ্টিগত স্বার্থপরতার তাড়নায় ব্যক্তি মানুষের মনে বিদ্বেষভাব সঞ্চারিত হয়, অন্যদিকে সমষ্টির নামে সেটা রাষ্ট্রের যুককাষ্ঠে ব্যক্তিমানুষকে বরিদান করে। তাঁর দৃষ্টিতে জাতীয়তাবাদ একটি মহামারী বিশেষ, যেটা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে মানুষের নৈতিক প্রাণশক্তিকে গ্রাস করেছে। দেশপ্রেমের নামে যে ভূগোল প্রতিমার পুজো চলেছে তাকে তিনি পরিহার করেন।

বর্তমান বিশ্বে রাজনৈতিক শক্তি হিসেবে জাতীয়তাবাদের সঙ্গে একটি মহান মতাদর্শ হিসেবে তার তত্ত্বগত পারস্পর্যের মধ্যে এক বিরাট অসঙ্গতি দৃশ্যমান। একই জাতির মধ্যে সাংস্কৃতিক বহুত্ব খুবই আদরণীয় ; আবার যে-নিরিখে একটি জাতির অস্তিত্ব বা জীবনযাত্রার মূল্য বেশি গুরুত্ব পায় তার ভিত্তি কাঁচা থাকে। কারণ ওই নিরিখ অনুযায়ী পারমাণবিক অস্ত্রে সজ্জিত বিশ্বের রাষ্ট্রগুলো যেন আজ আত্মবিনাশের দিকে চলেছে। (সূত্রঃ ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকাঃ আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

জাতায়াতে ইসলামী বাংলাদেশ (Jamat Islami Bangladesh)

১৯৪১ সালের আগস্ট মাসে জামায়াতে ইসলামীর আধ্যাত্মিক নেতা মাওলানা সাইয়েদ আবু আলা মওদুদীর নেতৃত্বে 'জামায়াতে ইসলামী হিন্দ' নামে একটি ধর্মভিত্তিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠনটি প্রথম দিকে অখণ্ড ইসলামী জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের বিরোধিতা করে কিন্তু ১৯৪৭ সালের ভারত স্বাধীনতা আইনের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত পাকিস্তানকে মেনে নিয়ে ১৯৪৮ সালে জামায়াত 'কুরআন ও সুন্নাহর ভিত্তিতে শাসনতন্ত্র' প্রণয়নের দাবীকে কেন্দ্র করে পাকিস্তানি রাজনীতিতে অবতীর্ণ হয়।

পাক-ভারত বিভক্তির পর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান ও ভারতে পৃথকভাবে কাজ শুরু করে। মাওলানা আব্দুর রহিমের নেতৃত্বে ১৯৫১ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে জামায়াতের প্রাদেশিক শাখা গঠিত হয়। অধ্যাপক গোলাম আজম ১৯৫৬ সালে জামায়াতের প্রাদেশিক সম্পাদক নিযুক্ত হন।

১৯৬৫ সালে সম্মিলিত বিরোধী দলের অঙ্গ হিসেবে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে আইয়ুবের বিরুদ্ধে ফাতেমা জিন্নাহকে সমর্থন, ১৯৬৮-৬৯ সালের গণ-আন্দোলনে আইয়ুব-বিরোধী ভূমিকা, ১৯৬৯-৭০ সালে বাঙালীর স্বায়ত্তশাসন ও সমাজতন্ত্রের বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ভূমিকা, ১৯৭০ সালে পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার্থে নির্বাচনে অংশগ্রহণ, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ বিরোধী শান্তি কমিটি এবং রাজাকার ও আল বদর বাহিনী গঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন সহ অসংখ্য প্রগতিশীল বাঙালি বুদ্ধিজীবীকে হত্যার সমস্ত নীলনক্সা প্রস্তুত করে।

১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করার জন্য স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দেশে ধর্মভিত্তিক রাজনীতি নিষিদ্ধ করা হয়। এতে জামায়াতের কর্মতৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। পরবর্তীতে ১৯৭৫-এর ১৫ আগস্টের রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতাসীন হলে ধর্ম ভিত্তিক রাজনীতির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়া হয়। এর পর থেকে জামায়াতে ইসলামী বাংলাদেশে প্রকাশ্যে রাজনীতি শুরু করে। স্বৈরাচারী এরশাদ বিরোধী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে ক্যাডারভিত্তিক ধর্মীয় ভাবাদর্শে বিশ্বাসী জামায়াতে ইসলামী অত্যন্ত চতুরতার সঙ্গে তাদের দলীয় শক্তি অর্জনে সক্ষম হয়েছে যার প্রমাণ পাওয়া যায় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে। ১৯৮৬ সালের ৭মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ৪.৬১% ভোট এবং ১০টি আসন লাভ করে। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী ১২.১৩% ভোট ও ১৮টি আসন লাভ করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন অনুষ্ঠিত সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী এককভাবে ৩০০টি আসনে নির্বাচন করে। এই নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী বিপর্যয়ের শিকার হয় এবং ৮.৬১% ভোট ও মাত্র ৩টি আসন লাভ করতে সক্ষম হয়। পরবর্তীতে ২০০১ সালের ১লা অক্টোবর অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জামায়াতে ইসলামী, বি.এন.পি, ইসলামী ঐক্যজোট এবং জাতীয় পার্টির একাংশ (না-ফি) জোট গত ভাবে নির্বাচন করে এবং জামায়াতে ইসলামী মাত্র ৩১টি আসনে প্রার্থী দিয়ে ৪.১৮% ভোট ও ১৭টি আসন লাভ করে জোটগতভাবে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়।

জিব্রাল্টার প্রণালী (Strait of Gibraltar)

জিব্রাল্টার প্রণালী ভূ-মধ্যসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের সংযোগ সাধন করেছে। ভূমধ্যসাগরের পশ্চিম প্রান্তে এবং স্পেনের দক্ষিণ প্রান্তে এর অবস্থান। জিব্রাল্টার প্রণালীকে ভূ-মধ্যসাগরের চাবি বলা হয়ে থাকে। ভূমধ্যসাগরের প্রবেশস্থলে এর অবস্থান। এখানে ব্রিটিশের শক্তিশালী নৌঘাটি রয়েছে। ১৯৪৫ সাল থেকে স্পেন এই

প্রণালীটিকে তার নিকট ফিরিয়ে দেয়ার জন্য ব্রিটেনের নিকট দাবি করে আসছে। কিন্তু ব্রিটেন-এর কর্তৃত্ব স্পেনকে হস্তান্তর করতে চাচ্ছে না। এই প্রণালী না থাকলে উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়ার যেকোনো জাহাজকে উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে চলাচল করতে হতো।

জেনেভা কনভেনশন (Geneva Convention)

জেনেভায় পৃথিবীর ৫৮টি দেশের মধ্যে যুদ্ধবন্দি যুদ্ধাহত ব্যক্তিদের সাতে আচরণবিধির ওপর ৪টি আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৪৯ সালের ১২ আগস্ট। চুক্তি ৪টি 'জেনেভা কনভেনশন' নামে পরিচিত। এতে সাব্যস্ত হয় যে, যুদ্ধবন্দিদের প্রতি মানবিক আচরণ করতে হবে; কোনো তথ্য উদঘাটনের জন্য তাদের ওপর কোনো প্রকার শারীরিক বা মানসিক নির্যাতন চাপিয়ে দেয়া যাবে না; বন্দি হওয়ার পরপর তাদের বিপজ্জনক এলাকা থেকে সরিয়ে নিতে হবে; অসুস্থ এবং যুদ্ধাহত বন্দিদের পক্ষ, জাতীয়তা, ধর্ম, বর্ণ, রাজনৈতিক বিশ্বাস ইত্যাদি নির্বিশেষে খাদ্য, বস্ত্র ও চিকিৎসার সমান সুযোগ দিতে হবে, বন্দিদের প্রতি নিজপক্ষীয় সৈন্যদের অনুরূপ আচরণ করতে হবে; যে সমস্ত যানবাহন বা উড়োজাহাজ চিকিৎসা-সরঞ্জাম বা আহতদের বহন করছে, সেসব যানবাহন, উড়োজাহাজ ইত্যাদি নিরাপত্তা বিধান করতে হবে; বন্দিকারীরা সাধারণ বন্দিদের যুদ্ধ-বহির্ভূত কাজে লাগাতে পারবেন, তবে তা অমানবিক বা মাত্রাতিরিক্ত হতে পারবে না ইত্যাদি। এতে আরো সাব্যস্ত হয় যে, যত দ্রুত সম্ভব যুদ্ধরত উভয় পক্ষ পরস্পরিক যোগাযোগ স্থাপন করবে, যাতে যুদ্ধে নিহত ও আহতদের শণাক্ত করা এবং যুদ্ধক্ষেত্রে পরিত্যক্ত বা নিহত সৈন্যদের সঙ্গে অবস্থিত সরঞ্জামাদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। এতে আরো সাব্যস্ত হয় যে, আলোচনার মাধ্যমে পারস্পরিক বন্দি প্রত্যর্পণ নির্ধারিত হলে কিংবা কোনো নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বন্দিদের আশ্রয় দিতে সম্মত হলে বন্দিদের বন্দিদশা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে। ইতিপূর্বে ১৮৫৮ ও ১৮৬৪ সালেও অনুরূপ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল।

জেনোসাইড কনভেনশন (Genocide Convention)

পোল্যান্ডের অধ্যাপক আর ল্যামকিন কোনো জাতিগত, ধর্মীয় বা ভাষাগত কারণে পরিকল্পিত ব্যাপক নরহত্যাকে বোঝানোর জন্য 'জেনোসাইড' শব্দটি তৈরি করেন। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সদস্য দেশসমূহ এ সম্পর্কিত একটি চুক্তি স্বাক্ষর করে। এ চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়, স্বাক্ষরকারী দেশসমূহ এ ধরনের নরহত্যায় বাধা দেবে এবং হত্যাকারীর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

জেরিকো (Zerrico)

জেরিকো জর্ডান নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত একটি শহর। এটার আয়তন প্রায় ৬০ বর্গ কিলোমিটার। মোট ২৫ হাজার ফিলিস্তিনীর মধ্যে ১৪ হাজার লোক বাস করে এই

শহরে। এদের ভাষা আরবী। এই শহরের মোট লোক সংখ্যার ৯৫% সুন্নী মুসলমান এবং ৫% খ্রিস্টান। এদের প্রধান আয়ের উৎস খাবার দ্রব্যাদি ও পর্যটন কেন্দ্র। ১৯৯৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পি.এল.ও. সায়ত্বশাসন সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে এই জেরিকো শহর ও গাজা অঞ্চল নিয়ে ফিলিস্তিনী সায়ত্বশাসন সংক্রান্ত চুক্তির মাধ্যমে এই জেরিকো শহর ও গাজা অঞ্চল নিয়ে ফিলিস্তিনী স্বায়ত্ত্বশাসিত আবাসভূমি গড়ে উঠে।

জেরুজালেম (Jarujalem)

মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদীদের পবিত্রতম স্থানের নাম জেরুজালেম। ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল সংঘর্ষের পর এ শহরের শাসন ক্ষমতা ইসরাইলের হস্তগত হয়। এ স্থানেই যীশু খ্রিস্টকে ক্রুশ বিদ্ধ করা হয়। ১৯৮০ সালের জুলাই মাসে জেরুজালেমকে বর্তমানে ইসরাইলের স্থায়ী রাজধানী ঘোষণা করায় বিশ্বব্যাপী প্রতিবাদের ঝড় ওঠে। জেরুজালেম বর্তমানে ইসরাইলের অধীনে আছে। ফিলিস্তিনীরা একে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের রাজধানী করতে চায়।

জেলহত্যা (Jail Killing)

১৯৭৫ সালের ৩ নভেম্বর ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে ইতিহাসের নজিরবিহীন বর্বর হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে বাংলাদেশের স্থপতি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। এ সময় বঙ্গবন্ধুর চারজন ঘনিষ্ঠ সহযোগী এবং বেশ কয়েকজন আওয়ামী লীগ নেতা কারাগারে বন্দি হন। চার নেতা হচ্ছেন সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামান। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডের পর খোন্দকার মোশতাক ক্ষমতায় ছিলেন। সেনাবাহিনীর সদস্যদের মধ্যে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ছিল চরম। সেনাবাহিনীর মধ্যে প্রবল অসন্তোষের পটভূমিতে ৩ নভেম্বর সন্ধ্যার পর গোলন্দাজ বাহিনীর কালো পোশাক পরিহিত কতিপয় সৈন্য জেলখানায় ঢুকতে চায়। জেলার প্রথমে অনুমতি না দিলেও মোশতাক আহমদের বরাতে জেলারের কাছে ফোন এলে সৈন্যদের ঢুকতে দেয়া হয়। তারপর সৈন্যরা জেলখানায় ঢুকে সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন আহমদ, মনসুর আলী ও মোহাম্মদ কামারুজ্জামানকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে এবং গুলি করে পাশবিকভাবে হত্যা করে। ৩ নভেম্বর ১৯৭৫ জেলখানায় এই হত্যাকাণ্ডের ফলে এই তারিখ 'জেলহত্যা দিবস' নামে পরিচিত।

জেসিস ইন্টারন্যাশনাল (JCC International)

যুবক-যুবতীদের একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা। বিশ্বব্যাপী নারী দুস্থ আর অসহায় মানুষদের সেবা করাই এ সংস্থার কাজ। পৃথিবীর অনেক দেশেই জেসিস ইন্টারন্যাশনাল-এর শাখা রয়েছে। বর্তমানে ৯৫টি দেশের প্রায় ৮ লাখের মতো যুবশক্তি এ সংস্থার সদস্য।

জোট-নিরপেক্ষ আন্দোলন (Non-Aligned Movement)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর, বিশেষত পঞ্চাশের দশকে বিভিন্ন ব্লক গঠন, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং ঠাণ্ডা লড়াই ব্যাপকতা লাভ করতে শুরু করে। ওই পটভূমিতে ১৯৫৬ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের ও যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট টিটো বেলগ্রেডে মিলিত হন এবং জোট নিরপেক্ষ আন্দোলনের সূচনা করেন। কোনো রাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি অনুযায়ী বিশ্বের বৃহৎ কোনো শক্তিগোষ্ঠীর সঙ্গে সেটির যুক্ত না হওয়া এই আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য। জোট-নিরপেক্ষতা প্রত্যয়টি সবিশেষ দানা বাঁধে যখন পশ্চিমা রাষ্ট্রগোষ্ঠী বনাম পূর্বতণ সোভিয়েত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর মধ্যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বিরোধ প্রকট হয়ে ওঠে। বিশ্বের যেসব রাষ্ট্র জোট-নিরপেক্ষ নীতি অনুসরণ করে সগুলো সাম্রাজ্যবাদ, ঔপনিবেশিকতা, যুদ্ধপ্রস্তুতি এবং যাবতীয় সামরিক জোটে যোগদানের বিরোধী। জোট-নিরপেক্ষতা প্রত্যয়টি নিরপেক্ষতা-নীতির বিচ্ছিন্নতার পরিবর্তে শান্তি ও সহাবস্থানের নীতি স্থাপনকল্পে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় উদ্যম হিসেবে গড়ে উঠেছে। Non-Aligned Movement (NAM) নামক গঠিত সংস্থার বর্তমান সদস্য-সংখ্যা শতাধিক। বিভিন্ন সদস্য-দেশে চার বছর অন্তর অনুষ্ঠিত শীর্ষ-সম্মেলনে পারস্পরিক সহযোগিতা ও বিশ্বপরিস্থিতি সম্পর্কিত বিষয়াদি আলোচিত হয়। বর্তমানে এই আন্দোলন অনুন্নত বিশ্বের জন্য নয়া আর্থ-সামাজিক কাঠামো খুঁজে পেতে ব্যস্ত, ওইসব পরাশক্তিসমূহের কবলমুক্ত হয়ে অনুন্নত বিশ্বের সমৃদ্ধি ও স্বনির্ভরতা অর্জনে।

জ্ঞানই সদগুণ (Knowledge is Virtue)

'জ্ঞানই সদগুণ' বহুল উচ্চারিত এই প্রবাদই সক্রেটিসের দর্শনের মূলমন্ত্র। সকল প্রকার অন্যায় অনাচার ও কুসংস্কারের হাত থেকে অব্যাহতি পাওয়ার একমাত্র উপায় হলো সার্বিক জ্ঞান লাভ। তাঁর মতে জ্ঞান হচ্ছে জিজ্ঞাসা এবং অন্বেষা। তাই তিনি কয়েকটি বিশেষ দৃষ্টান্ত থেকে একটি সাধারণ বচন এবং কতগুলো সাধারণ বচন থেকে ব্যাপকতর সাধারণ বচনে সামান্যীকরণ করতেন যেগুলো কখনো কখনো প্রকট ও সুস্পষ্ট ছিল। এই কথা বলার অর্থ বিচার বুদ্ধিই জ্ঞান লাভের উপায়। সক্রেটিস মনে করতে বুদ্ধি যা সত্য বলে গ্রহণ করবে তাই সত্য। আর সত্যের মানদণ্ডের সাথে ব্যক্তির জ্ঞানের সঙ্গতি থাকলেই জ্ঞান সত্য। আবার জ্ঞান বলতে সক্রেটিস বস্তুর সাধারণ সত্য তা যা ব্যক্তি বিশেষের ইন্দ্রিয় সংবেদনকে ছাড়িয়ে শাশ্বত এক সার্বিক ধারণার সৃষ্টি করে। অর্থাৎ আত্মজ্ঞান অর্জন (Earning Self Knowledge) বা নিজেকে জানাই মানুষের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। জ্ঞানের খাতিরে জ্ঞান অর্জন, বরং ন্যায় ও সুনীতি পরিকল্পিত যথার্থ জীবন যাপনের ব্যবহারিক প্রয়োজনেই 'জ্ঞান' অর্জন প্রয়োজন। জ্ঞানই ভাল মন্দ যাচাইয়ের নিয়ামক। একজন সত্যিকার জ্ঞানী ব্যক্তি ভালকে যথার্থভাবেই অনুধাবন করতে পারে। জ্ঞানই ব্যক্তিকে সদগুণাবলী অর্জন ও বাস্তবায়নে পরিচালিত করে। সুতরাং 'সদগুণই জ্ঞান' কেবলমাত্র জ্ঞানই পূণ্যময় জীবন নিশ্চিত করতে পারে।

ঝুলন্ত পার্লামেন্ট (Hung Parliament)

সাধারণত কোয়ালিশন সরকারের (দেখুন, কোয়ালিশন সরকার/ Coalition Government) ক্ষেত্রে ঝুলন্ত পার্লামেন্টের বিষয়টি জড়িত। পার্লামেন্ট নির্বাচন কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট দেখা দেয়। দুই বা ততোধিক দল নিয়ে কোয়ালিশন সরকার গঠিত হয়। কোনো দল সমর্থন প্রত্যাহার করলে সরকারের পতন ঘটে। সরকারের অস্তিত্ব এক ধরনের অনিশ্চয়তা ও দোদুল্যমানতার মধ্যে থাকে। এজন্য এ ধরনের পার্লামেন্টকে ঝুলন্ত পার্লামেন্ট বলা হয়।

টিউডর যুগ (Tudor Age)

টিউডর বংশের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন ওয়েন টিউডর (Owen Tudor)। তিনি ওয়েলসের একজন নাইট ছিলেন। ওয়েন টিউডর পঞ্চম হেনরীর বিধবা পত্নী ক্যাথারিনকে বিবাহ করেন। তাঁর দু'পুত্র এডমান্ড ও জাসপার কর্তৃক যথাক্রমে আর্ল অব রিচমন্ড (Earl of Richmond) ও আর্লী অব পেমব্রুক (Earl of Pembroke) পদে অধিষ্ঠিত হন। আবার এডমান্ড টিউডর ডিউক অব সমারসেটের কন্যা মার্গারেট বোফোর্ট-কে বিবাহ করেন এবং তাঁদের একমাত্র পুত্র হেনরী টিউডর। এ হেনরী টিউডরই ইংল্যান্ডের টিউডর বংশের প্রথম রাজা ছিলেন [১৪৮৫-১৫০৯]। টিউডর রাজা হেনরী কঠোর হাতে অরাজকতা মোকাবিলা করে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করেন। তখন ইংল্যান্ডের ধনিক-বণিক ও শিল্পপতি শ্রেণি দূর্বল। টিউডর শাসনের পরিমণ্ডলে তারা ক্রমশ অর্থনৈতিক ক্ষমতা অর্জন ও সমৃদ্ধি লাভ করেছে। তাই তারা রাজার অনুগত হয়ে পড়ে।

টোরি (Tory)

আইরিশ toraigbe যার অর্থ (Pursucr) ইংরেজী Whig শব্দের উদ্ভব। পূর্বে টোরি বলতে একজন আইরিশ গেরিলাকে বোঝাত, এবং যিনি আয়ারল্যান্ডে ব্রিটিশ জবরদখলদারীদের বিরুদ্ধে ১৬৪০ এর দশকে এমন একটি গেরিলা আন্দোলন করতো। ১৬৭০ এর দিকে টোরি বলতে ক্যাথলিক রাজা দ্বিতীয় জেমসের সমর্থকদের বোঝাতো এবং তারা ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের বিরোধী ছিলেন। উইলিয়াম পিট দি ইয়ংগারের (William Pitt the Younger) নেতৃত্বে টোরি গ্রুপ শক্তিশালী রাজনৈতিক দলে পরিণত হয়। পরবর্তীতে ব্রিটিশ কনজারভেটিভ পার্টির (১৮৩০ এর দশকে) উদ্ভব ঘটে। স্যার রবার্ট পিল (Sir Robert Peel) টোরি দল থেকে কনজারভেটিভ পার্টি গঠনে নেতৃত্ব দেন। টোরি দল থেকে ব্রিটেনে রাজনৈতিক দল "কনজারভেটিভ পার্টির উৎপত্তি ঘটে টোরি গ্রুপ থেকে। টোরি বলতে রক্ষণশীল বোঝানো হয়। এখন শুধু ব্রিটেন নয় অনেক দেশেই টোরি অর্থ রক্ষণশীল বা কনজারভেটিভ।

ট্রয়ের যুদ্ধ (War of Troy)

গ্রিক কবি হোমারের মহাকাব্য 'ইলিয়াদ'-এ উল্লিখিত গ্রিক ও ট্রয়বাসীদের এই যুদ্ধ নগরে সংঘটিত হয় বলে এটি 'ট্রয়ের যুদ্ধ' নামে পরিচিত। ১৮৭০ সালে জার্মান প্রত্নতত্ত্ববিদ হেনরিক স্লিম্যান প্রথম প্রমাণ করেন যে, ট্রয়ের যুদ্ধ গ্রিক কবি হোমার-এর কল্পনা নয়, বরং এক বাস্তব ঘটনা। তার মতে, প্রায় ৫০০০ বছর আগে ট্রয় নগরীর অস্তিত্ব অবশ্যই ছিল। এখানেই প্রায় ১১৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে ট্রয়ের যুদ্ধ সংঘটিত হয়।
স্পার্টার রাজা মেনেলেয়াসের স্ত্রী হেলেন। ট্রয়ের রাজা প্রিয়ামের পুত্র প্যারিস। একদিন প্যারিস হেলেনকে নিয়ে ট্রয় নগরে পালিয়ে যান। গ্রিকরা এই ঘটনাকে তাদের দেশ ও জাতির প্রতি চরম অবমাননাক মনে করে সংঘবদ্ধভাবে ট্রয় আক্রমণ করে। আগামেমননের নেতৃত্বে দশ বছর তারা ট্রয় নগর ঘিরে রাখে এবং যুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু নগরের রক্ষাব্যবস্থা এতই সুদৃঢ় ছিল যে, তারা ট্রয় নগরের ভেতরে প্রবেশ করার সুযোগ পায় না। শেষে গ্রিক সেনাপতি ওদিসিউস এক অভিনব ফন্দি আঁটেন। তার নির্দেশে বিশাল ঘোড়া তৈরি করে তাতে ১০০ জন সৈন্য ঢুকিয়ে দিয়ে নগরের দ্বারপ্রান্তে রেখে দেয়া হয়। শত্রুদের পরিত্যক্ত জিনিস ভেবে ট্রয়বাসী এই বিশাল আকারের ঘোড়াটিকে টেনে নগরের ভেতরে নিয়ে যায়। ঘোড়ার ভেতরে লুকিয়ে থাকা গ্রিক সৈন্যরা সুযোগ বুঝে রাতের অন্ধকারে বেরিয়ে গ্রিক বাহিনীর জন্য নগরের ফটকগুলো খুলে দেয়। ট্রয়বাহিনী প্রতিরোধ গড়ে তোলার আগেই গ্রিক সৈন্যদের আক্রমণে ট্রয় নগর তছনছ হয়ে যায়। যুদ্ধে গ্রিকবাহিনী জয়লাভ করে।
গ্রিক বীরদের মধ্যে একিলেস, পেট্রোক্লাস, ওদিসিউস ও নেসটনের নাম উল্লেখযোগ্য। হেক্টরের নেতৃত্বাধীন ট্রয়বাহিনীর বীরদের মধ্যে প্যারিস, ইনিয়াস, মেমনন ও পেনথেসিলিয়ার নাম করা যায়। এই যুদ্ধে উভয় পক্ষেরই বহুসংখ্যাক নেতৃস্থানীয় বীরযোদ্ধা নিহত হন।

ট্রেড ইউনিয়ন (Trade Union)

শ্রমিকদের সাধারণ দাবিদাওয়া আদায় ও স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে গঠিত সমিতিকে ট্রেড ইউনিয়ন বলা যায়। এটি মূলত কলকারখানার শ্রমিক সংগঠন। আঠারো শতকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের আগেই এর উদ্ভব হতে শুরু করে। সেখানে তখন অসুখবিসুখে ও বার্ধক্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা বিধান এবং মালিকপক্ষের সঙ্গে মুজুরি ও অন্যান্য শর্তাদি নিয়ে দরাদরি করাই ছিল তাদের কাজ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রাবল্যের দরুণ সেগুলোকে বিরুদ্ধ পরিবেশের সম্মুখীন হতে হত। কারণ বিশেষ করে ফারসি বিপ্লবের পর সেগুলো জনশৃঙ্খলার পক্ষে ক্ষতিকর বৈপ্লবিক সংস্থা হিসেবে প্রতিপন্ন হত। শ্রমিকদের বেআইনি সংস্থা গঠন দমনের উদ্দেশে ইংল্যান্ডে ১৭৯৯ ও ১৮০০ সালে গৃহীত আইনের সাহায্যে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা হয়েছিল। অবশ্য ১৮২৪ সালে ওইসব আইন রদ হয়ে যায়। ১৮৬৯ সালে রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হয় এবং ১৮৭১ সালে ট্রেড ইউনিয়ন আইন প্রবর্তিত হবার পর ট্রেড ইউনিয়নগুলো শিল্পশ্রমিকদের কাছে জনপ্রিয়

হতে শুরু করে। দর কষাকষির মাধ্যম হিসেবে ধর্মঘটের অধিকার আইনসঙ্গত বলে স্বীকৃতি পায় এবং শিল্পশ্রমিকদের আধুনিক আন্দোলন পদ্ধতি শুরু হয়। ট্রেড ইউনিয়ন সাধারণত শ্রমিকদের উচ্চতর বেতন, মুজুরি, ন্যূনতম কাজের সময়, চাকরির স্থায়িত্ব, বোনাস, বিভন্ন ভাতা, ছুটি বৃদ্ধি, চিকিৎসা বাসস্থান, গ্র্যাচুয়িটি পেনশন ইত্যাদি বিভিন্ন সুযোগ সুবিধার দাবিতে মালিক বা কর্তৃপক্ষের নিকট দাবিনামা পেশ করে এবং দাবিনামার ভিত্তিতে আন্দোলন করে। দাবি আদায়ের হাতিয়ার হিসেবে ঘেরাও, অবস্থান ধর্মঘট ইত্যাদির আশ্রয় নেয়া হয়। মালিকপক্ষের সঙ্গে আলোচনা ভেস্তে গেলে ইউনিয়ন ধর্মঘটের ডাক দেয়। প্রথম দিকে সরকার ও মালিকদের দ্বারা স্বীকৃত ছিল না। উনিশ শতকের প্রথমার্ধে ট্রেড ইউনিয়নকে কর্তৃপক্ষ ও সরকার দাবিয়ে রাখত, শতকের শেষ দিকে ক্রমে ইউনিয়ন তার ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি পায়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯৩৫ সালে বিধিবদ্ধ ন্যাশনাল রিলেসান্স অ্যাক্ট শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠনের অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়। ইদানীং পশ্চিমা দেশগুলোর রাজনীতিতে ট্রেড ইউনিয়ন বিভিন্ন ধরনের প্রভাবশালী গোষ্ঠীর অন্যতম হয়ে উঠেছে। সেগুলোর স্বার্থান্বিত ঐক্যসূত্রে একটা সংগ্রামী সত্তা ফুটে ওঠে। বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পবাণিজ্য বৃদ্ধির সঙ্গে অর্থনৈতিক পরিকল্পনা ও জাতীয় বেতন কাঠামো নির্ধারণে ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের যুক্ত করা হয়। যুদ্ধের সময় ছাড়া অন্য সময় ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিনিধিরা শ্রমিকদের স্বার্থই বেশি দেখেন, তার বেশি জাতীয় স্বার্থে নিজেদের জড়াতে চান না। সময় বিশেষে অধস্তন সদস্যরা নেতৃবৃন্দের দ্বারা স্বীকৃত শর্তাদি অমান্য করেন।

কমিউনিস্ট দেশের সমাজে ট্রেড ইউনিয়নের বিশেষ মর্যাদপূর্ণ ভূমিকা থাকে, তাদের রাষ্ট্রের হয়ে অনেকটা এজেন্টের মতো কাজ করতে হয়। কমিউনিস্ট তত্ত্বানুসারে শ্রমিক ও রাষ্ট্রের স্বার্থ অভিন্ন। কমিউনিস্ট দেশে সেজন্য ধর্মঘট অচল; রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের সঙ্গে সহযোগিতা করে চলাই নিয়ম।

উনিশ শতকে ও বিশ শতকের গোড়ায় ট্রেড ইউনিয়নকে এক নতুন সমাজব্যবস্থার পুরোধা হিসেবে দেখা হত। সমাজতন্ত্রই ছিল ট্রেড ইউনিয়নের স্বাভাবিক আদর্শ। ফ্রান্সে সিন্ডিক্যালিজম ও ইংল্যান্ডে গিল্ড সোসলিজম বৈপ্লবিক আদর্শ হিসেবে বিবেচিত হত। ট্রেড ইউনিয়নের ভাবধারা সমাজের অন্যত্রও ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণ ধর্মঘটের মাধ্যমে ধনতন্ত্রকে উচ্ছেদের কথাও বিপ্লবীদের মনে উদয় হয়। রাজনৈতিক কারণে ইউনিয়নসমূহ ধর্মঘট করলেও তাদের মুখ্য লক্ষ্য ছিল নিজেদের সদস্যদের উন্নতি বিধান।

সব দেশেই ট্রেড ইউনিয়নসমূহের কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। ভারতে ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস, হিন্দু মজদুর সভা, সিটু (সেন্টার ফর ইন্ডিয়ান ট্রেড ইউনিয়নস) ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সংস্থা গড়ে উঠেছে। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে জাতীয় সংস্থাগুলোর সমন্বয়ে আন্তর্জাতিক সংগঠন গঠিত হয়েছে। ওয়ার্ল্ড ফেডারেশন অব ট্রেড ইউনিয়ন, ইন্টারন্যাশনাল কনফেডারেশন অব ফ্রি ট্রেড ইউনিয়নস ইত্যাদি।

ঠাণ্ডা লড়াই (Cold War)

দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের মধ্যে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। এক্ষেত্রে শত্রুতাপূর্ণ বিরোধিতাকেও বলা যায়। এতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সম্পর্ক বিঘ্নিত হওয়া ছাড়াও অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ এবং সামরিক প্রস্তুতি ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে। তবে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ হয়নি, হওয়ার সম্ভাবনা থাকে এমন পরিস্থিতি। প্রধানত পশ্চিমা রাষ্ট্রজোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের মিত্র দেশগুলোর সম্পর্কসূত্রে ঠাণ্ডা লড়াই শব্দটি ১৯৪৭ সাল থেকে চলে আসছে। কিন্তু অনুরূপ ঠাণ্ডা লড়াই আরও কোনো কোনো দেশের আন্তর্জাতিক সম্পর্কে দেখা যায়। একদিকে পূর্ব ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকায় সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ সমর্থনে ও কমিউনিস্টদের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল, অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও অন্যান্য পশ্চিমা দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস ঠাণ্ডা লড়াইকে সারা বিশ্বে প্রসারিত করে। বস্তুত ঠাণ্ডা লড়াইয়ের অস্তিত্ব দুটি সমান শক্তিশালী রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর এক পক্ষের ক্ষমতা সম্প্রসারণের বিরুদ্ধে অপর পক্ষের নিরন্তর বিরোধের মধ্যে নিহিত থাকে। এর অন্যান্য লক্ষণের মধ্যে থাকে বিপক্ষ দেশের সংলগ্ন কোনো দেশে সামরিক ঘাঁটি স্থাপন, ভীতি প্রদর্শন, বিধ্বংসী যুদ্ধাস্ত্র নির্মাণ, অর্থনৈতিক অবরোধ সৃষ্টি ইত্যাদি।

ডায়েট (Diet)

জাপানি আইনসভার নাম ডায়েট (Diet)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৭ সালে প্রণীত নতুন সংবিধান অনুযায়ী ডায়েটের ক্ষমতা ও পরিধি অনেক বৃদ্ধি পায়। ডায়েট দু'টি কক্ষ নিয়ে গঠিত। নিম্নকক্ষকে বলা হয় 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্'-এর সদস্য সংখ্যা ২৫০। এ সভা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। অর্ধেক সদস্য প্রতি ৩ বছর পর অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভস্'-এর মোট সদস্য ৪৬৭। ৪৬৭ জন সদস্য মোট ১১৮টি 'নির্বাচনী জেলা' (electoral districts) থেকে নির্বাচিত জন। প্রত্যেক জেলায় ৩ থেকে ৫ জন সদস্য থাকেন। সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন। প্রত্যেক ভোটার একটি করে ভোট দেন। যেসব সদস্য সর্বোচ্চ ভোট পান তাঁরা জেলা থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধি হয়ে 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভিস্'-এ আসেন। 'হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভিস্' চার বছরের জন্য নির্বাচিত হয়। তবে সরকার যেকোনো সময় এ হাউস বিলুপ্ত করতে পারে। বিলুপ্ত হলে ৪০ দিনের মধ্যে নতুন নির্বাচন দিতে হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে জাপানি রাজনীতিতে ডায়েটের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে থাকে। এখন জাপানি রাজনীতির মূলধারা ডায়েটকে কেন্দ্র করেই পরিচালিত হচ্ছে। (সূত্র: জালাল ফিরোজ, ঢাকা: *পার্লামেন্টোরি শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

ডি-৮ (Development-8)

ডি-৮ হলো ৮টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে গঠিত একটি উন্নয়নমূলক জোট। এই জোটের সদস্য হচ্ছে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ইরান, তুরস্কো, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়া, মিশর ও

নাইজেরিয়া। এই জোটটি ১৯৯৭ সালের ১৫ জুন তুরস্কের ইস্তাম্বুলে অনুষ্ঠিত রাষ্ট্র / সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত হয়। জোটটির উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে নিজেদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

ডিজিএসই (DGSI)

ফ্রান্সের গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএসই-এর পুরো নাম Director General Le Securite Exterieur. পূর্ব নাম ছিল এসডিইসিই-এর পুরো নাম The Service de Documentation Experience et Contre Espionage। সংস্থাটির পত্তন হয় ১৯৫৮ সালে। এর সদর দপ্তর অবস্থিত প্যারিসের পূর্বদিকে বুলভার্ড মরটিয়ার (Boulverd Mortier) এলাকায়। ভবনটির কাছে একটি সুইমিংপুল থাকার জন্য গোয়েন্দা সদস্যরা একে 'la piscine' বলে। এর মূল কাজ দেশের বাইরে থেকে গোপন সংবাদ সংগ্রহ করা। ১৯৮১ সালে প্রেসিডেন্ট মিতেরাঁর সমাজতন্ত্রী সরকার গঠনের পর এসডিইসিই পুনর্গঠন করা হয় এবং নাম রাখা হয় ডিজিএসই।

ডি-ডে (D-Day)

ডি-ডে পূর্ণ নাম Dawn Day। ১৯৯৪ সালে ৩ জুন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে রাতের অন্ধকারে নর্মান্ডিতে হাজার হাজার মিত্রবাহিনীর (Allied Power) সৈন্য অবতরণ করে। এটা ছিলো জার্মানির নেতৃত্বে পরিচালিত অক্ষশক্তির (Axis Power) নিকট থেকে ফ্রান্স ও ইউরোপের অন্যান্য দখলকৃত ভূখণ্ড মুক্ত করার এক বিরাট সামরিক অভিযান। ফ্রান্সের নর্মান্ডিতে হাজার হাজার সৈন্য অবতরণের দিনটিকে যুক্তরাষ্ট্রসহ ইউরোপের কতিপয় দেশ ডি-ডে হিসেবে পালন করে থাকে।

ডুরান্ডলাইন (Durandline)

ডুরান্ডলাইন স্যার মোটিমার ডুরান্ড কর্তৃক ১৮৯৬ সালে ভারত ও আফগানিস্তানের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। বর্তমানে আফগানিস্তান ও পাকিস্তানের মধ্যকার চিহ্নিত সীমারেখা। ডুরান্ডলাইনের একটা ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত রয়েছে। ১৮৯৩ সালে ব্রিটিশ সরকার ডুরান্ডের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করেন। যার উদ্দেশ্য ছিল পাক-ভারত সীমানা নিরূপণ করা। ডুরান্ডের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ১৮৯৬ সালেই ব্রিটেন ও আফগানিস্তানের যে সমস্ত অঞ্চল ডুরান্ড লাইন পরিকল্পিত হয়েছিল, আর দুর্বল আফগানিস্তানের ওপর এই চুক্তি চাপিয়ে দেয়া হয়। চুক্তির ফলে ডুরান্ড লাইনের পশতুন উপজাতি অধ্যুষিত এলাকাগুলো তদানিন্তন ব্রিটিশ ভারতের অন্তর্ভূক্ত হয়, কিন্তু আফগান শাসকরা নিজেরাও পশতুভাষী হওয়ায় তারা কখনও এটাকে মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তান রাষ্ট্র গঠনের প্রাক্কালে ব্রিটেনের নিকট তাদের প্রস্তাব ছিল পাক-আফগান উভয়দিকে বসবাসকারী পশতু ভাষা-ভাষী জনসাধারণের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তান ডুরান্ডলাইন বরাবর

সীমান্তের উত্তরাধিকার লাভ করে। কিন্তু ১৯৪৯ সালে আফগান জাতীয় পরিষদ ডুরান্ড লাইনের ন্যায্যতা অস্বীকার করে।

ডেমি (Demi)

প্রাচীন গ্রীসের নগর রাষ্ট্রগুলোর স্থানীয় সরকার ডেমি নামে পরিচিত ছিল। গ্রিক ও এথেন্সের নগর রাষ্ট্রগুলোকে ১০০টা ডেমিতে বিভক্ত করা হয়। এ ডেমিগুলো ছিল স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের প্রাথমিক ইউনিট। এগুলোকে আমাদের পৌরসভা বা ইউনিয়ন ও ওয়ার্ডের সাথে তুলনা করা যায়। তবে ডেমিগুলো বর্তমান স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনে ধারণা হতে একটু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত ছিল। কারণ ডেমির সদস্যপদ বংশানুক্রমিক। এমনকি কোনো সদস্য অন্যত্র চলে গেলেও ওই একই ডেমির সদস্যপদ বজায় থাকত। ডেমির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল এক্লেশিয়া, কাউন্সিল ও গণজুরিসহ রাষ্ট্রীয় অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলোতে নিজ নিজ প্রতিনিধি প্রেরণ। ডেমিগুলো মোটামুটি তাদের জনসংখ্যা অনুপাতে প্রার্থী নির্বাচন করতো এবং পদাধিকারীগণ এইভাবে গঠিত নির্বাচনী প্রতিষ্ঠান হতে লটারীর মাধ্যমে মনোনয়ন লাভ করতেন। গ্রিক সমাজে লটারী ব্যবস্থাকে সব সময়ই গণতান্ত্রিক মনে করা হতো। কারণ প্রত্যেক প্রার্থীরই প্রার্থীত পদ লাভের সম্ভাবনা ছিল।

ডেমোক্রেটিক পার্টি (Democratoc Party)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুই প্রধান রাজনৈতিক দলের একটি। এটি প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮২০-এর দশকে। অবশ্য ডেমোক্রেটিক পার্টির অভ্যুদয় ঘটে ১৭৮৭ সালের দিকে ফেডারেলপন্থীদের বিরোধিতা এবং ফেডারেল সরকারের ক্ষমতা সীমিত করার দাবি তোলার ভেতর দিয়ে। এ সময় এটি পরিচিত ছিল রিপাবলিকান পার্টি নামে। এই দলের মনোনয়ন পেয়েই টমাস জেফারসন ১৮০১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮১৭ থেকে ১৮২৫ সময়সীমার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একমাত্র এই পার্টির একটি গ্রুপ, যারা উচ্চ শুল্ককর ধার্যের পক্ষে ছিল, তারা দল থেকে বেরিয়ে যায় এবং তাদের দল পরিচিত হয় 'রিপাবলিকান পার্টি' নামে। অ্যান্ড্রু জ্যাকসনের নেতৃত্বাধীন গ্রুপটি পরিচিত হয় 'ডেমোক্রেটিক পার্টি' নামে। এরপর থেকে পার্টি দুটি তাদের স্ব স্ব সাংগঠনিক ভিত্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজ্যে জোরদার করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। ডেমোক্রেটিক পার্টির উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন উড্রো উইলসন, ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট, হ্যারি এস. ট্রুম্যান, জন এফ. কেনেডি, বিল ক্লিনটন প্রমুখ রাজনীতিবিদ। ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রতীক 'গাধা'।

তফসিল (Shedule)

তফসিল সংবিধানের হতে পারে, কোনো আইন বা বিধিরও হতে পারে। বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ কার্যপ্রণালী বিধির তফসিল রয়েছে। কার্যপ্রণালী বিধিতে তফসিলের

সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'তফসিল অর্থ এই বিধিসমূহের সাথে সংযোজিত তফসিল'। কার্যপ্রণালী বিধির চারটি তফসিল রয়েছে। প্রথম তফসিলের শিরোনাম 'বেসরকারি সদস্যগণের বিল ও সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের আপেক্ষিক অগ্রগণ্যতা নির্ধারণের জন্য ব্যালট পদ্ধতি', দ্বিতীয় তফসিলের শিরোনাম 'পিটিশনের ফরম', তৃতীয় তফসিল 'কোনো সদস্যের গ্রেপ্তার বা ক্ষেত্রমতো আটক, দণ্ডপ্রাপ্তি বা মুক্তি প্রসঙ্গে প্রেরিতব্য পত্রের ফরম' এবং চতুর্থ তফসিলের শিরোনাম 'সরকারি প্রতিষ্ঠানের তালিকা'। চতুর্থ তফসিলের দু'টি ভাগ রয়েছে।

তাবুকের যুদ্ধ (Battle of Tabouk)

৬৩৭ সালে নবম হিজরির রজব মাসে মুসলিম বাহিনী ও বিশাল রোমান বাহিনীর মধ্যে তাবুকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। মুসলিম বাহিনী হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর নেতৃত্বে তাবুক পৌঁছার খবর পাওয়ার সাথে সাথে রোমান সেনাপতি পশ্চাদপসরণ করে। সামন্তরা অনেক ভয়ে পালিয়ে যায় এবং অনেকে হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর কাছে এসে বশ্যতা স্বীকার করে। তারপর আর কখনো রোমানরা মদিনা আক্রমণের সাহস করেনি।

তালেবান (Taleban)

আফগানিস্তানে তালেবান একটি নতুন শক্তির উত্থান ঘটেছে। সাধারণত মাদ্রাসার ছাত্রদের সমন্বয়ে এ দলটি গঠিত হয়েছে। এরা অত্যন্ত শক্তিশালী গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের বাহিনীকে কাবুলের আশেপাশের এলাকা থেকে বিতাড়িত করে সে এলাকাগুলো নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে দিয়েছে শোনা যায়, এদের গঠনের পেছনে পাকিস্তান গোয়েন্দা সংস্থা ও মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএর হাত রয়েছে। তবে তালেবান বাহিনীর অনেক সদস্য পাকিস্তানে একটি ধর্মীয় রাজনৈতিক সংগঠন কর্তৃক পরিচালিত মাদ্রাসাগুলোতে শিক্ষালাভ করেছে। এসব মাদ্রাসাগুলো পাকিস্তান-আফগানিস্তান সীমান্তে অবস্থিত। তালেবানদের নেতার নাম মোল্লা মোহাম্মদ ওমর। তারেবানরা উগ্র ধর্মীয় আদর্শে বিশ্বাসী। মেয়েদের পর্দা প্রথা, ইসলামী শাসন, কোরআনের আদর্শে রাষ্ট্রব্যবস্থা, ডিশ এন্টেনা নিরুৎসাহিত করা ইত্যাদি তাদের রাজনীতির সাথে সম্পর্কিত।

তাসখন্দ চুক্তি (*Tashkent* Pact)

তাসখন্দ চুক্তি ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যকার সম্পাদিত চুক্তি। এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে। চুক্তিটি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাসখন্দে স্বাক্ষরিত হয় বলে একে তাসখন্দ চুক্তি বলা হয়। ১৯৬৫ সালের পাক-ভারত যুদ্ধের পরে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ হচ্ছে:

১. পাক-ভারত উভয় পক্ষের সীমান্ত এলাকা থেকে সৈন্য অপসারণ;

২. একে অপরের বিরুদ্ধে প্রচারণা বন্ধ করা;

৩. পারস্পারিক শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান;
৪. পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ না করা;
৫. আলোচনার মাধ্যমে শান্তিপূর্ণ উপায়ে যে কোনো বিরোধের মীমাংসা করা।

তিনবিঘা করিডোর

দহগ্রামে যাতায়তের জন্য চুক্তি অনুযায়ী বাংলাদেশকে ভারতীয় ভূ-খণ্ড তিনবিঘায় নির্দিষ্ট পরিমাণ জায়গা ইজারা দেয় ১৯৯২ সালের ২৬ জুন। এ জায়গাটির পরিমাণ হল দৈর্ঘ্য ১৭৮ মিটার এবং প্রস্থ ৮৫ মিটার। এ জায়গাটি করিডোর হিসেবে অভিহিত। দুই দেশের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষর হয় ১৯৭৪ সালের ১৬ মে। নয়াদিল্লীতে সম্পাদিত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন তৎকালীন দু'দেশের সরকার প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ও ইন্দিরা গান্ধী। দু'দেশের ছিটমহল দহগ্রাম ও বেরুবাড়ী সংক্রান্ত দীর্ঘ দিনের সমস্যার সমাধান হয় এই চুক্তিতে। চুক্তি অনুযায়ী ভারত ১২ নম্বর দক্ষিণ বেরুবাড়ী ইউনিয়নের দক্ষিণের অর্ধাংশ এবং সংলগ্ন এলাকার দখল পায় ১৯৭৪ সালে। এর অয়তন ২.৬৪ বর্গমাইল। বিনিময়ে বাংলাদেশ পায় দহগাম ও সংলগ্ন আঙ্গরপোতা ছিটমহল। ১৯৯২ এর ২ শে জুন ভারত বাংলাদেশকে আনুষ্ঠানিকভাবে তিনবিঘা করিডোর হস্তান্তর করে।

তৃতীয় বিশ্ব (Third World)

সাধারণত পৃথিবীর অনগ্রসর ও দরিদ্র দেশগুলোকে পশ্চাৎপদ কিংবা উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে সেগুলোকে তৃতীয় বিশ্ব হিসেবেও চিহ্নিত করা হয়। অবস্থা ও প্রকৃতি অনুসারে মোটামুটি সেগুলো পাঁচ ধরনের: ১. ভৌগোলিক অবস্থান— সঠিক না হলেও আফ্রিকা, এশিয়া ও লাতিন আমেরিকার দেশগুলোকে এই গোত্রে ফেলা হয়। ২. অর্থনৈতিক অবস্থা- সেই একই শিথিল প্রত্যয়ে বিশ্বের দরিদ্র দেশগুলোকে এই অভিধায় বিচার করা হয়। ৩. মতাদর্শগত প্রত্যয়ে- এই পর্যায়ে ওই মহাদেশগুলোতে সদ্য স্বাধীন আত্মসচেতন যেসব ছোট বড় রাষ্ট্র পশ্চিমের প্রধান দুই রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আদর্শ, অর্থাৎ ধণতন্ত্র (ইংল্যান্ড, আমেরিকা ইত্যাদি নিয়ে প্রথম বিশ্ব) অথবা সমাজতন্ত্র (সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপ নিয়ে দ্বিতীয় বিশ্ব) থেকে স্বতন্ত্র পথে চলেছে সেগুলোকে তৃতীয় বিশ্বের শ্রেণিতে ফেলা হয়। ৪. জোটবদ্ধতার মানদণ্ড- উক্ত মহাদেশগুলোতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমন্বয়ে যেসব জোটবদ্ধতার উদ্ভব হয়, সেই নিরিখে। যেমন বান্দুং সম্মেলনে (১৯৫৫) আফ্রিকা ও এশিয়ার কিছু রাষ্ট্র গোষ্ঠীনিরপেক্ষ আন্দোলন গড়ে তোলে। ওই দুটি মহাদেশের কিছু রাষ্ট্রের সঙ্গে লাতিন আমেরিকার কয়েকটি দেশকে নিয়ে প্রথম UNCTAD (United Nations Conference on Trade and Development) সম্মেলন হয় ১৯৬৪ সালে। ৫. রাজনৈতিক বিচারে আন্তর্জাতিক রাষ্ট্রসম্পর্কে ক্ষেত্রে-পূর্ব ও পশ্চিম-তথা সমাজতন্ত্র ও ধনতন্ত্র থেকে পৃথক একটি তৃতীয় শক্তি হিসেবেও কিছু রাষ্ট্রকে দেখা হয়।

সম্প্রতি তৃতীয় বিশ্বের কিছু দেশে দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ঘটায় (যেমন OPEC গোষ্ঠী) তৃতীয় বিশ্বের মধ্যেও ফারাক দেখা দিয়েছে। ফলে পূর্বতন তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোর মধ্যে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মৈত্রীর সূত্র শিথিল হয়ে পড়েছে।

তেভাগা আন্দোলন (Tebhaga Movement)

একটি কৃষক আন্দোলন। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় জীর্ণ যুক্ত বাংলার শেষপর্বে এ আন্দোলন (১৯৪৬-৪৭) ঘটে। সরকার নিয়োজিত ফ্লাউড কমিশনের ভূমিব্যবস্থা সংক্রান্ত সুপারিশ রূপায়ণকল্পে বঙ্গীয় প্রাদেশিক কিসান সভা ১৯৪৬ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এক গণসংগ্রামের ডাক দেয়। সুপারিশে বলা হয়েছিল যে, যারা জোতদারের জমিতে চাষ করে সেইসব বর্গাদার, আধিয়ার প্রভৃতি ভাগচাষীরা ফসলের অর্ধাংশ বা তারও কমের পরিবর্তে অতঃপর দুই-তৃতীয়াংশ পাবে। কিসান সভা তথা কমিউনিস্ট পার্টির কর্মী, যাদের অনেকেই ছিলেন শহুরে বুদ্ধিজীবী ও জঙ্গি মনোভাবাপন্ন ছাত্র, তাঁরা বর্গাদারদের সংগঠিত করার জন্য গ্রামঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েন। ক্রমবর্ধিষ্ণু গ্রামীণ জনসংখ্যা প্রধানাংশে ছিল দরিদ্র কৃষক যারা সাম্প্রতিক দুর্ভিক্ষে ভূমিহীন হয়ে ভাগচাষীতে পরিণত হয়। তেভাগা আন্দোলন অধ্যুষিত এলাকাগুলোতে তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় ষাট শতাংশ। নভেম্বর মাসে ধান কাটার সময়ে 'নিজ খামারে ধান তোলো' ধ্বনিতে আন্দোলন কোনো কোনো অঞ্চলে প্রবল হয়ে ওঠে। তেভাগা নীতির ভিত্তিতে বর্গাদারেরা ফসল আর জোতদারের ঘরে না তুলে নিজেদের খামারে নিয়ে যায়। উত্তরবঙ্গে, বিশেষ করে দিনাজপুর জেলর ঠাকুরগাঁ মহকুমা এবং জলপাইগুড়ি, রংপুর ও মালদহ জেলায় আন্দোলন সবিশেষ শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাছাড় মৈমনসিং (কিশোরগঞ্জ), মেদিনীপুর (মহিষাদল, সুতাহাটা, নন্দীগ্রাম) এবং চব্বিশ পরগণায় (কাক্দ্বীপ) আন্দোলনকারীরা নিজেদের শাসনক্ষমতা কায়েম করে। মৈমনসিং-এর হাজং-রা ফসলের পরিবর্তে টাকায় খাজনা দিতে শুরু করে। উত্তরবঙ্গে রাজবংশী উপজাতির বেশিটা ছিল আধিয়ার ও দরিদ্র কৃষক। কলকাতা ও নোয়াখালির সমসাময়িক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা এই আন্দোলনকে স্পর্শ হয়নি। স্বভাবতই জোতদার ও পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধে। বহু ক্ষেতমজুর ও কৃষক নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতির অবনতি ঘটে। বহু কর্মী গ্রেপ্তার হন, আন্দোলন ফেব্রুয়ারি-মার্চ মাসে ক্রমে স্তিমত হয়ে পড়ে, বিশেষ করে আসন্ন দেশবিভাগের প্রেক্ষাপটে। (সূত্রঃ সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, রাজনীতির অভিধান, কলকাতাঃ আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., ২০১১)।

দক্ষিণ এশীয় অগ্রাধিকার বাণিজ্য চুক্তি (সাপটা)

(SAARC Preferential Trading Arrangement)

সাপটা হচ্ছে দক্ষিণ এশীয় আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থা বা সার্কভূক্ত দেশগুলোর মধ্যকার সম্পাদিত একটি বাণিজ্য চুক্তি। ১৯৯৩ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকায় সার্কের সপ্তম শীর্ষ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনের শেষ দিন ১১ এপ্রিল সার্ক দেশগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। সাপটার (SAPTA) গুরুত্বঃ

১. সাপটা চুক্তি সার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার্কের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে সাপটা চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
২. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সংরক্ষণবাদী নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশে সাপটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।
৩. প্রাথমিকভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে ১০% হারে শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।
৪. সাপটা চুক্তির ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে শিপিং, সার, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।
৫. সাপটা চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ (South Talpotti Island)

সাতক্ষীরা জেলার দক্ষিণে সীমান্ত নদী হাড়িয়াভাঙ্গা ও রায়মঙ্গল নদীর মোহনায় জেগে ওঠা দ্বীপটি দক্ষিণ তালপট্টি দ্বীপ নামে পরিচিত। ভারত এর নাম দিয়েছে পূর্বাশা বা নিউমূর। কারণ দ্বীপটির মালিকানা ভারতও দাবি করেছে এবং তার আধিপত্য বিস্তারে সর্বাত্মক চেষ্টা চালু রাখছে। ১৯৭৮ সালে ভাটার সময় এই দ্বীপের আয়তন ছিল প্রায় ৫ বর্গকিলোমিটার। এ নতুন দ্বীপটি হাড়িয়াভাঙ্গা নদীর মূল খালের পূর্বদিকে জেগে ওঠায় তা স্পষ্টতই বাংলাদেশের মূল ভূখণ্ডের অন্তর্গত। কারণ এই মূল খালের মধ্যপ্রান্ত হচ্ছে উভয় দেশের সীমানা। তা সত্ত্বেও ভারত একতরফাভাবে দ্বীপের মালিকানা দাবি করে। ফলে ১৯৭৯ সালে ভারতে প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে বিষয়টি উল্লিখিত হয় এবং বাংলাদেশের পক্ষ থেকে যৌথ জরিপের প্রস্তাবের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের প্রচেষ্টার কথা বলা হয়। ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রস্তাবে সম্মত হলেও ১৯৮০ সালে ভারতের পক্ষ থেকে উপগ্রহ থেকে তোলা দ্বীপটির কিছু ছবি তুলে তা বাংলাদেশের কাছে হস্তান্তর করে ও দ্বীপটির একতরফা মালিকানা দাবি করে। কিন্তু বাংলাদেশ এ দাবি প্রত্যাখ্যান করে। ১৯৮০ সালের আগস্ট মাসে ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বাংলাদেশ সফরকালে সমস্যাটির শান্তিপূর্ণ সমাধানের আশ্বাস দিলেও ভারত তাদের সম্প্রসারণবাদী নীতি গ্রহণ করে দ্বীপটিকে একতরফাভাবে দখল করে তাতে রণতরী প্রেরণ ও ক্ষেপণাস্ত্র স্থাপন করে।

দক্ষিণপন্থা (Rightism)

বামপন্থা কথাটির বিপরীত একটি শব্দ। তবে এ প্রত্যয়টির কিছু সুস্পষ্ট অর্থ আছে। এ মতবাদের প্রধান উপাদান হলো রক্ষণশীলতা ও কিছুটা কর্তৃত্ববাদ। এতে আনুগত্য,

প্রথা ও প্রচলিত ধারার ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়। এ মতবাদটিতে বশ্যতা, বৈধতা ও কর্তব্যনিষ্ঠার উপাদানে রাষ্ট্রিক বাধ্যতা নিরূপিত হয়। চুক্তি, সম্মতি, সমতা, ন্যায়বিচার প্রভৃতি মূল্যবোধের স্থান হতে সংকীর্ণ। এতে আইন ও সমাজের অসঙ্গতি এবং আইনের উদারনৈতিক সংস্কারসাধন প্রয়াসকে বিশেষ উৎসাহিত করা হয়না। বংশানুক্রমিক ও কালক্রমে যেসব অধিকার বর্তায় সেগুলো অক্ষুণ্ন রাখা এবং ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে বিধিসম্মত বলে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতায় বিশ্বাস এবং অবাধ বাণিজ্য ও পুঁজিবাদী অর্থনীতিকে সমর্থন। দক্ষিণপন্থী মতবাদের উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে যেমন পারস্পর্য আছে তেমনি কিছু স্বরিরোধও দৃশ্যমান।

দপ্তরবিহনী মন্ত্রী (Minister Without Portfolio)

যেসব মন্ত্রীর কোনো দফতর থাকে না। তবে বিশেষ দায়িত্ব থাকতে পারে। সাধারণত কোনো মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব না দিয়েও প্রধানমন্ত্রী (রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি) কোনো কোনো সময় মন্ত্রী নিয়োগ করতে পারেন। এমনকি পূর্বে দফতর দেয়া থাকলেও পরবর্তীতে দায়িত্ব কিংবা দফতর প্রত্যাহার করে দফতরহীন করা যেতে পারে। অনেক সময় এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় যখন কোনো বিশেষ কাজ সম্পাদন করার জন্য প্রধানমন্ত্রী (বা রাষ্ট্রপতি) অন্য কোনো দপ্তরের বা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে ডাকতে পারেন না তখন দপ্তরবিহীন মন্ত্রীকে ওই কাজের দায়িত্ব দেয়া হতে পারে।

দলকর্মী (Cadre)

মূলত রাজনৈতিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মী। অনেকক্ষেত্রে বেতনভূক্ত কর্মীও বলা যেতে পারে। ত্রিশের দশকের গোড়া থেকে সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টি সেইসব কর্মী ও বুদ্ধিজীবী গোষ্ঠীদের ক্ষেত্রে শব্দটির ব্যবহার শুরু করে যারা পার্টির সঙ্গে যুক্ত হয়ে মতাদর্শ প্রচারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সাধারণভাবে বর্তমানে সমস্ত ধরনের সংগঠিত গোষ্ঠীর সক্রিয় কর্মীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যাঁরা সুসমন্বিতভাবে দলের কর্মসূচি রূপায়ণে অংশ নেন। উন্নয়নশীল দেশের স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে থেকে কিছু ব্যক্তিকে বিশেষ প্রশিক্ষণ দিয়ে অর্থনৈতিক, সরকারি ও বেসরকারি প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থায় নিয়োগ করা হয়।

দলত্যাগ (Crossing the Floor/ Defection)

দলত্যাগ বা দল পরিবর্তনের অর্থ একটি দল থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে অন্য একটি দলের সমর্থনে সেই দলের সঙ্গে যুক্ত হওয়া। মূলত দলত্যাগের ইংরেজি প্রতশিব্দ defection. Defection শাব্দিক অর্থ হলো কর্তব্যচ্যুতি। এই শব্দটিকেই রাজনীতির ক্ষেত্রে দলত্যাগ বলা হয়। দলের মনোনয়ন নিয়ে কোনো সংসদ সদস্য নির্বাচিত হওয়ার পর দল ত্যাগ করলে এটাকে দলত্যাগ কিংবা crossing the floor বলা যেতে পারে। পার্লামেন্ট কক্ষে সরকারি ও বিরোধী দলের সদস্যদের বসার স্থান নির্দিষ্ট রয়েছে।

দলত্যাগ করার পর সংশ্লিষ্ট সদস্যতে তাঁর পূর্ববর্তী আসন ত্যাগ (cross) করে উল্টোদিকের নতুন আসনে বসতে হয়। আসন পরিবর্তিত হয় বলে দলত্যাগ বলতে crossing the floor কথাটি ব্যবহৃত হয়।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানে দল ত্যাগ একটি বিশেষ অর্থবহ প্রপঞ্চ। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কোনো সদস্য দলীয় আনুগত্য পরিবর্তন করলে বলা হয় দলত্যাগ করেছেন (crossing the floor)। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ সদস্যরা এখন দলত্যাগ করতে পারেন না। সংবিধানের ৭০ (১) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, 'কোনো নির্বাচনে কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরূপে মনোনীত হইয়া কোনো ব্যক্তি সংসদ-সদস্য নির্বাচিত হইলে তিনি যদি- (ক) উক্ত দল হইতে পদত্যাগ করেন, (খ) সংসদে উক্ত দলের বিপক্ষে ভোটদান করেন, তাহা হইলে সংসদে তাঁর আসন শূন্য হইবে।' পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে দলত্যাগ (crossing the floor) একটি বহুল আলোচিত বিষয়। দলত্যাগের সুযোগ থাকা না-থাকা নিয়ে অনেক বিতর্ক ও মতবিরোধ রয়েছে। সরকারের স্থিতিশীলতা বৃদ্ধি এবং প্রলোভন ও লোভের কারণে সদস্যদের দলীয় আনুগত্য পরিবর্তন করার প্রবণতা রোধ ইত্যাদি দলত্যাগ করার সুযোগ না-থাকা উচিত বলে অনেকে মনে করেন। আবার সদস্যরা দলের বাইরে ভোট দিতে বা দল থেকে পদত্যাগ করতে পারেন না বলে অনেক সময় দলীয় নেতৃত্বের অন্যায় চাপ তাঁদের সহ্য করতে হয়। ফলে সংসদ সদস্যদের স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের অধিকার খর্ব হয়। পার্লামেন্টারি রাজনীতিতে দীর্ঘমেয়াদে এর ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে বলে মনে করা হয়। রাজনৈতিক আনুগত্য পরিবর্তন অর্থাৎ দলীয় নেতৃত্ব, আদর্শ ও কর্মসূচির প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার ব্যক্তি স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। দলত্যাগ, দল পরিবর্তন বা দলবদল নতুন কোনো ঘটনা নয়। বাংলাদেশ , পাকিস্তান, ভারত, আমেরিকা সকল রাষ্ট্রেই তা পরিলক্ষিত হয়।

দলত্যাগী (Renegade)

লাতিন renegare কথাটি থেকে ইংরেজি 'রেনিগেড' শব্দটি উৎপন্ন। বাংলা প্রতিশব্দ দলত্যাগী। অর্থ হলো যে-ব্যক্তি স্বধর্ম, স্বমত বা স্বদল ত্যাগ এবং বিরুদ্ধপক্ষে যোগদান করেছেন। আদিপর্বে রেনিগেড বলতে বোঝাত স্বধর্মত্যাগী বিশেষ করে ক্রিশ্চিয়ান ধর্ম ত্যাগ করে সেইসব লোকেদের মধ্যে যারা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতো। কমিউনিস্ট আন্দোলনে শব্দটি ব্যবহারবহুল। নানা সময়েই কমিউনিস্ট আন্দোলনে যাঁরা ভিন্নমত প্রকাশ করেন এবং ক্রমে বিপক্ষগোষ্ঠী বা দলে যোগ দিয়েছেন তাঁদের প্রতি নিন্দা বা বিশ্বাসঘাতক হিসেবে গালি হিসেবে শব্দটি প্রয়োগ করা হয়। দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের শীর্ষনেতা মার্কসবাদী কার্ল কাউটস্কির সর্বহারার একনায়কত্ব তত্ত্ব পরিহার, সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস ইত্যাদি মৌল বিষয়ে মতপ্রার্থক্য এবং বলশেভিক দল পরিত্যাগ করে সোস্যাল ডেমোক্র্যাটের পক্ষে যোগদানের দরুণ লেনিন তাঁকে 'রেনিগেড' হিসেবে অভিহিত করেন। কমিন্টার্নে বুখারিনের সঙ্গে স্টালিনের ক্ষমতার দ্বন্দ্বে (১৯২৮-২৯) স্টালিনের পক্ষে যোগদানের সম্মত না হওয়ায় মানবেন্দ্রনাথকে কোণঠাসা, বহিষ্কার ও রেনিগেড আখ্যা দেওয়া হয়। অনুরূপ দৃষ্টান্ত আরও আছে।

দলহীন রাজনীতি (Partyless Politics)

দলীয় ব্যবস্থায় গণতন্ত্রী আদর্শ স্ববিরোধী হয়ে পড়ে। কারণ দল বলতে জনসাধারণের একটি অংশকেই মাত্র বোঝায়। যদিও গণতন্ত্র সমগ্র জনসাধারণকে নিয়ে চলে। আংশিক যেমন সমগ্রের সমান হতে পারে না, তেমনি দলীয় শাসনও অসম ও স্ববিরোধী হতে বাধ্য। দলীয় সরকার জনসাধারণের জন্য হতে পারে, জনসাধারণের দ্বারা নয়। প্রতিনিধিত্বমূলক অর্থাৎ জনসাধারণ কর্তৃক নির্বাচিত ও সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের মনোনীত ব্যক্তিরা জনসাধারণের হয়ে সরকর চালায়। ওইসব প্রতিনিধিরা জনগণের প্রতি অনুগত না হয়ে নিজ দলের কাছে অনুগত থাকেন। ফলে জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা কতিপয় রাজনৈতিক ক্ষমতাবান ব্যক্তির কাছে হস্তান্তরিত হয়ে যায়, জনগণের অভিভাবক হিসেবে বৃহত্তর দল সরকারের কাজ চালায়। প্রত্যাহ্বান, গণভোট ইত্যাদি থাকে না; তাই সংসদীয় ব্যবস্থায় দুটি নির্বাচনের মধ্যবর্তী সময়ে জনগণ অসহায় থাকে। দলীয় রাজনীতি ক্ষমতার কাড়াকাড়ি ছাড়া আর কিছু নয়, দলগুলো চায় ক্ষমতা দখল। তাই তারা নির্বাচনদ্বন্দ্বে নামে, যেকোনো দ্বন্দ্বেরই একটা নিজস্ব ধারা থাকে-সেখানে নীতির স্থান গৌণ, সেই দ্বন্দ্বমুখর পথে যেতে গিয়ে দলগুলোকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি, ধাপ্পাবাজি, ঘুষ, জালভোট, জোচ্চুরি, হিংসা ইত্যাদি আশ্রয় নিতে হয়। দল মাত্রই মূলত সমষ্টিবাদী; দলের আদর্শে ও উদ্দেশে শ্রেণি, জাতি, দেশ, ধর্ম ইত্যাদি যূথবাদী আদর্শ প্রাধান্য লাভ করে; সেখানে ব্যক্তির স্থান নগণ্য। দলীয় প্রথায় ওপর থেকে সবকিছু আরোপিত হয়। জনগণ দলের হাতে পুতুল হয়ে থাকে।

দলীয় কর্মিবর্গ (Apparatchiki)

দলীয় নতুন কাঠামোয় দলের ভেতর এবং দলের বাইরে সরকার ও অন্যান্য সংগঠনের মধ্যে বিভিন্ন দায়িত্বে নিযুক্ত থাকেন। স্থানীয়, রাজ্য ও রাষ্ট্রীয় স্তরে ক্রমোচ্চ পর্যায়ে বিভিন্ন পদে বিন্যস্ত হন। এই কর্মীবর্গ নির্বাচিত দলীয় কমিটির অধীন, কিন্তু নিজেরাও নির্বাচিত হয়ে পদাধিকার বলে সবিশেষ ক্ষমতাশালী দলীয় আমলাতন্ত্র হিসেবে। ১৯৮৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির সংশোধিত নিয়মাবলিতে এই কর্মীবর্গকে আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দেওয়া হয়। বেতনভুক্ত বৃত্তিকুশলী এই কর্মীবর্গের দলের প্রতি পূর্ণ আনুগত্য থাকে। দলের নির্দেশ রূপায়ণে সরকারি প্রশাসনে তাদের ভূমিকা অনেক।

দালাইলামা (Dhalilama)

দালাইলামা তিব্বতের ধর্মীয় নেতা। তিব্বতের স্বাধীনতার জন্য তিনি আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ফলে তিব্বত থেকে চীন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বহিষ্কৃত হয়ে ভারতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। দালাইলামা নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

দিয়াগো গার্সিয়া (Thiago Gorshia)

দিয়াগো গর্সিয়া ভারত মহাসাগরের চাগোজ দ্বীপপুঞ্জের একটি অতি ক্ষুদ্র দ্বীপ। এই দ্বীপটি ভারতের কুমারিকা অন্তরীণ হতে ১৪০০ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এর দৈর্ঘ্য ১৩ মাইল এবং প্রস্থ ৪ মাইল। এক সময় এই দ্বীপটি মরিসাসের অন্তর্গত ছিল। ১৯৬৭ সালে মরিসাসের স্বাধীনতার পর ক্ষতিপূরণ দান করে ব্রিটেন এই দ্বীপটি নিজের অধিকারে রেখে দেয়। ১৯৭৪ সালে ব্রিটেন শক্তিশালী নৌঘাঁটি তৈরির লক্ষ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট ছেড়ে দেয়। তবে সে ঘাঁটি ব্রিটেনও ব্যবহার করতে পারবে। মাত্র দুই বছরের মধ্যে এই প্রবাল দ্বীপটিকে পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র সজ্জিত মার্কিন নৌ ও বিমান বহরের একটি বিশাল ঘাঁটিতে পরিণত করা হয়। হত্যাকাণ্ড লড়াইয়ের সময়ে এই ঘাটির গুরুত্ব ছিলো অপরিসীম। কারণ যুক্তরাষ্ট্র এই ঘাঁটি হতে এশিয়া, আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া এই তিনটি মহাদেশে প্রয়োজনমত সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণ করার সুযোগ পেত।

দুই তরবারি তত্ত্ব (Two Sword Theory)

দুই তরবারী তত্ত্ব হলো একটি ঐক্যবদ্ধ, অখণ্ড ব্যবস্থার দুটি দিক মাত্র। যথা: পার্থিব ও আধ্যাত্মিক। মানুষ একই সাথে দুই রাষ্ট্রের নাগরিক। পার্থিব রাষ্ট্র মানুষের পাপজনিত পতনের ফল। মানুষের মধ্যে লোভ-লালসা, হিংসা স্বার্থপরতা প্রবলরূপে বিদ্যমান। এটা এমন কতগুলো বিদমান প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত যা যুদ্ধ-বিগ্রহ বাসনা ও কামনার সংঘাতে অনিবার্যরূপে ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সেন্ট অগাস্টিন পার্থিব রাজ্যকে 'শয়তানের রাজ্য (Civitus Tenena)' বলে অভিহিত করেছেন। যেমন– আসিরীয় ও রোম সাম্রাজ্য। আবার বিধাতার রাজ্য বা আধ্যাত্মিক রাষ্ট্র স্বর্গীয় আনন্দ শান্তি ও আধ্যাত্মিক মুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। সকল পুরাত্মা বিধাতার করুণা লাভ করে। এই রাষ্ট্র চিরস্থায়ী। স্বর্গরাজ্যের প্রতিটা মানুষ মানবপ্রেমে অন্ধ ও নিষ্ঠাবান এবং বিধাতার প্রতি আনুগত্যশীল, পার্থিব রাষ্ট্রের প্রধান হলো সম্রাট বা রাজা। আধ্যাত্মিক দিকের প্রধান হলেন পোপ বা গির্জা। উভয় প্রধানের ক্ষমতার মূল উৎস সৃষ্টিকর্তা এবং উভয় প্রধান স্ব-স্ব ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র ও স্বাধীন।

দূরদর্শন (Foresight)

১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে দূরদর্শন চালু করা হয়। সেই সময় সপ্তাহে তিন দিন দূরদর্শন চালু করা হয়। সেই সময় সপ্তাহে তিন দিন দূরদর্শন অনুষ্টান প্রচার ক্ষমতা। নিয়মত অনুষ্ঠান সম্প্রচার শুরু হয় ১৯৬৫ সালে। ১৯৭৬ সালে আকাশবাণী থেকে বেরিয়ে এসে পৃথক সংগঠন হয় টেলিভিশন নাম হয় দূরদর্শন। ১৯৮২ সালের পর এই মাধ্যমটির ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। ১৯৮২ সালের ১৫ আগস্ট ভারতে রঙিন পর্দায় দূরদর্শন চালু হয়। দূরদর্শন ৮৫.৪ শতাংশ মানুষের কাছে ও দেশের ৬৮.৪ শতাংশ অঞ্চলে অনুষ্ঠান প্রচার করছে। বর্তমানে দূরদর্শনের ৩৮টি কেন্দ্র অনুষ্ঠান প্রস্তুত করা হয় এবং ৭৭২টি ট্রান্সমিটারের সাহায্যে তা প্রচারিত হয়।

দেউলিয়াত্ব (Bankruptcy)

কোনো ব্যক্তির পক্ষে তার দেনা বা ঋণ পরিশোধ করার অসামর্থ্যকে 'দেউলিয়াত্ব' দেউলিয়া অবস্থা, ঋণশোধে অক্ষমতা, সম্পদবিনাশ করা বোঝায়। যে ব্যক্তিকে ঋণ পরিশোধ করতে অসমর্থ বলে ঘোষণা করা হয় তাকে 'দেউলিয়া' বলা হয়। এই ঘোষণা তার নিজের ইচ্ছায় বা ঋণদাতাদের দ্বারা আদায়ের মাধ্যমে করা হয়। এই সম্পর্কে প্রচলিত আইনের উদ্দেশ্য হলো ঋণী ব্যক্তির সম্পত্তি রক্ষা করা ও তা ঋণদাতাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার পর ঋণী ব্যক্তিকে ঋণের দায় হতে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত সে নিজের নামে ব্যবসায় বা লেনদেন করতে পারে না। অধিকন্তু, কোনো প্রকার জালিয়াতি করলে অথবা যথাযথ হিসাব না রাখলে, সে ব্যক্তি শাস্তিও পেতে পারে।

দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ (Dialectical Materialism)

মার্কসবাদের দর্শনগত ভিত্তিভূমি। তার দুটি উপাদানের একটি হলো হেগেলের ভাববাদী দ্বান্দ্বিক (dialectical) প্রণালী মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন তা একটি জটিল প্রত্যয়। হেগেল সেটি প্রাচীন গ্রিক তর্কশাস্ত্র থেকে গ্রহণ করেছিলেন। তার মর্ম হলো আলাপ-আলোচনা ও বিতর্কে প্রামাণ্য বিষয়ের (thesis) নেতিবাচক বিপরীত দিকগুলো (anti-thesis) তুলে ধরা, তারপর নয় (thesis) ও প্রতিনয়নের (anti-thesis) বাদানুবাদ থেকে একটা সমন্বয়ে (synthesis) উপনীত হওয়া। সংক্ষেপে দ্বান্দ্বিক প্রণালীটি হলো কোনো বিষয়ের দুটি বিপরীত দিকের মিলন তত্ত্ব।

প্রণালীটি হেগেল তাঁর ইতিহাসতত্ত্বে প্রয়োগ করেন। তাঁর দৃষ্টিতে ইতিহাস হলো একটি প্রক্রিয়া (প্রসেস) যার মধ্যে দিয়ে পরম সত্তা (ব্রহ্মও বলা চলে) নিরন্তর নিজেকে উন্মোচনের মধ্যে দিয়ে অগ্রগমন করে, কাল-পরম্পরায় নিজের সত্যস্বরূপ প্রকাশ করে, আদিম গোষ্ঠীজীবন থেকে ক্রমে অধিক পরিমাণে জাতীয় জীবনকে প্রকাশ করে। হেগেলের এই দ্বান্দ্বিক প্রণালীর তত্ত্ব মার্কস ও এঙ্গেলসকে আকৃষ্ট করে। উল্লেখ্য যে, হেগেল তাঁর তত্ত্বের প্রয়োগ শুধু অতীত বিষয়ে আবদ্ধ রাখেন এবং বলেন যে ইতিহাস বা যেকোনো বিষয়েই প্রযুক্ত হোক না কেন দর্শনের কাজ হলো যা ঘটে গেছে তার বিচার-বিশ্লেষণ করা। এখানে মার্কসের সঙ্গে তাঁর মতপ্রার্থক্য দেখা দেয়। মার্কস বলেন যে দর্শনের কাজ শুধু ব্যাখ্যা করাই নয়, পরিবর্তন করাও তার কাজ, হেগেলের অবস্থান থেকে এগিয়ে মার্কস দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে ভবিষ্যতেও প্রয়োগ করেন। হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রণালীর প্রধান যে তিনটি উপাদান মার্কস ও এঙ্গেলস গ্রহণ করেন তার একটি সংক্ষিপ্ত রূপরেখা দেওয়া হলো : ১. পরিমাণগত বিষয়ের গুণগত রূপান্তর ও তদ্বিপরীত বিধি। এই বিধি অনুযায়ী নতুন গুণগত পরিস্থিতির উদ্ভব এবং তার পরিণাম ব্যাখ্যা করা যায়। অলক্ষ্যে পরিমাণ রূপান্তরিত হয়ে এমন এক স্থানে পৌছায় যেখানে গুণগত পরিবর্তন সূচীত হয়। চিরাচরিত দৃষ্টান্ত হলো-জল গরম হয়ে ১০০° সেন্টিগ্রেডে পৌছে বাষ্প অথবা হত্যাকাণ্ড হয়ে ০° সেন্টিগ্রেডে নেমে বরফ হয়ে যায়। বাষ্প বা বরফে জল

হঠাৎই যেন লম্ফ দিয়ে রূপান্তরিত হয়। এই লম্ফটাকেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে বিপ্লব বলা হয়। ২. বৈপরীত্যের ঐক্য বিধি। বস্তুসত্তাগত সবকিছুর মধ্যে একই অঙ্গে দুটি বিপরীতধর্মী প্রকৃতি বিরাজ করে, কোনো পার্থক্য দর্শায় না। যেমন একটা বস্তুর পজিটিভ ও নেগেটিভ-বিপরীত দুই মেরুর সত্তাই থাকে; একই রাস্তার একদিক উত্তরে, অপর দিক দক্ষিণে গেছে। বিপরীতমুখী হলেও উভয় প্রকৃতি পরস্পর নির্ভরশীল। ঠিক তেমনি একটি পুঁজিবাদী দেশে বুর্জোয়া ও সর্বহারা একই সমাজদেহের অংশ হিসেবে পরস্পরযুক্ত। সর্বহারার শ্রমকে সস্তায় কেনে বুর্জোয়া শ্রেণি; আবার বুর্জোয়া শ্রেণির কাছে শ্রম বিক্রয় ছাড়া সর্বহারার উপায়ান্তর নেই। মার্কসীয় দৃষ্টিতে এই সমাজবিবর্তনের মধ্যে অন্তর্বিরোধ ব্যাখ্যা করা হয়। ৩. নেতির নেতিকরণ বিধি।

বিকাশ বা বিবর্তনের ধারায় নয় (thesis) প্রতিনয় (anti-thesis) ও সমন্বয় (synthesis) হলো এক একটি পর্যায় বিশেষ। নয় তার নিজস্ব অন্তর্বিরোধের ফরে ভেঙে পড়ে এবং প্রতিনয়ের পথ প্রশস্ত করে। প্রতিনয় সেইসব অন্তর্বিরোধের মীমাংসা করে বটে, কিন্তু সেটাও ভেঙে গিয়ে একটি নতুন রূপ পরিগ্রহ করে, যার মধ্যে ভেঙে যাওয়া নয় ও প্রতিনয়ের অভগ্ন উপাদানগুলো স্থান পায়। প্রতিনয়নের প্রতিনয় হলো সমন্বয়। সেজন্য এই বিধি হলো নেতির নেতিকরণ। উল্লিখিত ত্রিপর্যায়ের বিবর্তন পদ্ধতি মার্কস ও এঙ্গেলস মানুষের সমাজ-বিবর্তনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন। যথা আদিম সমাজ, দাস মালিকানা, সামন্ততন্ত্র, পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র। সামন্ততন্ত্রের অন্তর্বিরোধের ফলে তার নেতি হিসেবে উদ্ভূত হয় পুঁজিবাদ। কিন্তু পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধের দরুন সেই নীতির নেতি হিসেবে সমাজতন্ত্র গড়ে ওঠে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য মার্কসের ঐতিহাসিক বস্তুবাদ হলো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদের সম্প্রসারণ ও পরিপূরক।

দ্বান্দ্বিক প্রণালী এগিয়ে চলে ঘূর্ণায়মান পথে। কারণ সমস্ত বাদানুবাদের মিলন ঘটে একটা উচ্চতর পুনর্বিকাশে। মার্কস এঙ্গেলস হেগেলকে উল্টিয়ে পায়ের ওপর সোজা করে দাঁড় করিয়ে দেন এই অর্থে যে তাঁরা হেগেলের দ্বান্দ্বিক প্রণালীকে গ্রহণ করেছিলেন বটে, কিন্তু তাঁরা তার ভাববাদী পরমতত্ত্বের চালনশক্তিকে (মোটিভ ফোর্স) নাকচ করেন। পরিবর্তে তাঁরা বস্তুবাদী দৃষ্টিতে সামাজিক তথা অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াকে ইতিহাসের গতিপথের নির্দেশক বলে অভিমতপ্রকাশ করেন।

মার্কসীয় বস্তুবাদে বলা হয় যে বস্তুজগৎই হলো জ্ঞানের মূল উৎস। বস্তুজগতে ভাবের অধিগম্যতা থাকলেও বস্তু সম্পূর্ণরূপে ভাবনিরপেক্ষ। মানুষের বস্তুজগৎ সম্পর্কে জ্ঞান ও তৎসংক্রান্ত ভাব আসলে মনের ওপর বস্তুর সংবেদনের ফলেই ঘটে। মার্কসীয় মতে সংবেদনের মাধ্যমে মনের ওপর বস্তুজগতের প্রতিফলন ঘটলেও সেটা জ্ঞানার্জনকে উদ্দীপিত করে মাত্র এবং সেটা সম্পূর্ণ হয় কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে। সংবেদন ক্রিয়াশীল না হলে, সেটা সচেতন কর্মতৎপরতায় পরিণত হত না। পরিবেশের প্রতিক্রিয়ায় মানুষ যদি পরিবর্তনকামী না হত, তা হলে বিপ্লব মনুষ্যকৃত না হয়ে যান্ত্রিকভাবে ঘটত। তাই মার্কস বলেন যে, মানুষ কোনো কিছু দেখে তার ওপর নিজের ক্রিয়াশীলতার নিরিখে। জ্ঞানের ওপর এই ক্রিয়াশীলতার তত্ত্ব অনুযায়ী জ্ঞান যে

সক্রিয়তার (praxis) সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত সেটা মার্কসীয় দর্শনের একটি মস্ত অঙ্গ। মার্কসীয় মতে তাই তত্ত্ব ও প্রয়োগের মধ্যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে।

দ্বি-জাতীয় বিল (Hybrid Bill)

অনেক সময় একই বিলে সাধারণ ও বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত উভয় ধরনের বিলের বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। এদেরকে দ্বি-জাতীয় বিল বলা হয়। যেমন-জাতীয় স্বাস্থ্যনীতি সংক্রান্ত যদি কোন বিল উত্থাপিত হয় তাহলে একদিকে যেমন সকল জনসাধারণের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত স্বার্থকে জড়িত করে তেমনি বিশেষ শ্রেণির ব্যক্তিবর্গের (চিকিৎসকবৃন্দ) স্বার্থকেও জড়িত করে। বিশেষ ব্যক্তি বা স্থানের স্বার্থ জড়িত থাকার কারণে এ সমস্ত বিল পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য বাছাই কমিটিতে (select committee) পাঠানো হয় এবং এ সকল বিলের দ্বারা যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ আহত হন বা তাদের স্বার্থে আঘাত হানে (affected) তাহলে তারা এরূপ বিলের বিরুদ্ধে সংসদে পিটিশন দিতে পারেন। পিটিশনগুলো সংসদের একটি পিটিশন কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটির পিটিশন সংক্রান্ত রিপোর্টদানের পর বিলটি সংসদে আলোচিত হয়। উল্লেখ্য, যদিও এ ধরনের বিলে public ও private উভয় ধরনের বিলের বৈশিষ্ট্য বর্তমান, এটাকে সংসদে আলোচনার সময়ে public বিল হিসেবে ধরা হয়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (Second World War)

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সাল পর্যন্ত বিশ্বব্যাপী সংঘটিত যুদ্ধকে 'দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ' বলা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মতো দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনাও ইউরোপ থেকে ক্রমে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মূল কারণ ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তি। এই চুক্তির শর্তগুলো ছিল খুবই একপেশে ও প্রতিহিংসামূলক। এর ফলে পরাজিত দেশগুলোর মনে প্রতিশোধ গ্রহণের ইচ্ছা প্রবল হয়ে ওঠে। সেই সঙ্গে ইউরোপ-আমেরিকার অর্থনৈতিক মন্দাও কারণ হিসেবে যুক্ত হয়।

হিটলার ক্ষমতায় আসার পর প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরাজয়ের প্রতিশোধ স্পৃহার সঙ্গে জার্মানির রাজনৈতিক উচ্চাশাও বৃদ্ধি পায়। বিশুদ্ধ আর্যরক্তসম্পন্ন জার্মান জাতি বিশ্বে শ্রেষ্ঠ হিটলারের এই প্রচার জার্মানদের অভিভূত করে। এছাড়াও তাদের ছিল প্রচণ্ড ইহুদি বিদ্বেষ। সব মিলিয়ে তারা সাম্রাজ্য বিস্তারের নীতি গ্রহণ করে। কূটকৌশলে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ায় আধিপত্য বিস্তারের পর ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর হিটলার হঠাৎ পোল্যান্ড আক্রমণ করে বসে। এর দুদিন পর জার্মানির বিরুদ্ধে বিটেন ও ফ্রান্স যুদ্ধ ঘোষণা করে। এভাবে বিশ্বের বড় ও শক্তিশালী দেশগুলো ক্রমশই যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িত জার্মানি ও তার সহযোগীদের বলা হতো অ্যাকসিস পাওয়ারস (Axis Powers) বা অক্ষশক্তি। এর বিরোধী পক্ষের নাম অ্যালাইজ (Allies) বা

মিত্রশক্তি। অক্ষশক্তি দেশগুলো ছিল জার্মান, ইতালি, জাপান, রোমানিয়া, বুলগেরিয়া ইত্যাদি। আর মিত্রশক্তির দেশগুলো ছিল ব্রিটেন, ফ্রান্স, আমেরিকা, সোভিয়েত ইউনিয়ন, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, নরওয়ে ইত্যাদি। যুদ্ধের শুরুতে হিটলার বাহিনীর প্রাথমিক বিজয় সত্ত্বেও ১৯৪১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণ তাদের সর্বনাশের সূচনা করে। ক্রমে জার্মান বাহিনী পিছু হটতে থাকে। এক এক করে মুক্ত হয় যুগোস্লোভিয়া ও পূর্ব ইউরোপের দেশগুলো।

১৯৪৫ সালের প্রথম ভাগে মিত্রশক্তির সৈন্যরা চারদিক থেকে জার্মানিকে ঘিরে ফেলে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন। এর চারদিন পর জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। এতে ইউরোপের পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হয়ে এলেও এশিয়ায় জাপান আত্মসমর্পণ বা সন্ধি করতে অস্বীকৃতি জানিয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যায়। হিরোশিমা ও নাগাসাকি শহরে ৬ ও ৯ আগস্ট পরমাণু-বোমা নিক্ষিপ্ত হবার পর জাপান আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়। এরপর সম্পূর্ণভাবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এতে জীবন ও সম্পদের ক্ষয়ক্ষতি ছিল ব্যাপক ও প্রচণ্ড।

দ্বিতীয় ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Second Versailles)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জার্মানি সঙ্গে ইউরোপের মিত্রশক্তির চুক্তি। ১৯১৯ সালের ২৮ জুন যুদ্ধের বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এবং পরাজিত জার্মানির মধ্যে এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে স্বাক্ষরিত হয় বলে একে ভার্সাই চুক্তি বলা হয়। এ চুক্তি সম্পাদনের আলোচনায় অংশ নেন যুক্তরাষ্ট্রের উড্রো উইলসন, গ্রেট ব্রিটেনের ডেভিড লয়েড জর্জ, ফ্রান্সের জর্জ ক্লেমেসঁ এবং ইতালির অরলান্দো। রাশিয়া এতে অংশ নেয়নি। জার্মানির কোনো প্রতিনিধি রাখা হয়নি। এই চুক্তির মূল বৈশিষ্ট্য হলোঃ

১. জার্মানিকে খণ্ড-বিখণ্ড করা;

২. জার্মানিকে নিজেকে যুদ্ধাপরাধী হিসেবে স্বীকার করানো এবং যুদ্ধের ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য করা;

৩. এটা বিজয়ী রাষ্ট্র কর্তৃক বিজিত রাষ্ট্রের ওপর চাপিয়ে দেয়ার চুক্তি।

চুক্তির উল্লেখযোগ্য শর্তের মধ্যে ছিল, জার্মানির উপনিবেশগুলোকে লীগ অব নেশন্স-এর দায়িত্বে ছেড়ে দেয়া। ডানজিগকে স্বাধীন নগরে পরিণত করা; জার্মানির সৈন্যসংখ্যা ও অস্ত্রের পরিমাণ সীমাবদ্ধ করে দেয়া; রাইনল্যান্ড এলাকা মিত্রশক্তির দখলে আনা এবং তার বেসরকারিকরণ। এভাবে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া হয়। সর্বোপরি ১৯২১ সালে এ চুক্তি মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, জার্মানি ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। স্বভাবতই এ চুক্তি জার্মানির জন্য শুধুচরম অবমাননাকরই ছিল না জার্মান অর্থনীতির জন্যও এটা ছিল দুর্বহ। ১৯৩২ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসে এবং ১৯৩৫ সালেই ভার্সাই চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করে।

দ্বৈত নাগরিকতা (Dual Citizenship)

সাধারণত দ্বৈত নাগরিকতার ধারণা যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসনব্যবস্থায় স্বীকৃত। এই ব্যবস্থায় নাগরিকত্বের ক্ষেত্রে দুটি নীতি অনুসরণ করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক এবং ব্যক্তি যে অঙ্গরাজ্যের অধিবাসী সেই অঙ্গরাজ্যেরও নাগরিক। এটাকে যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় দ্বৈত নাগরিকতা বলে। তবে অনেক দেশে জন্মসূত্রে ও অনুমোদন সূত্রে নাগরিকতা অর্জনের পদ্ধতি চালু রয়েছে।

দ্বৈতশাসন (Dyarchy)

১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইনের ঘোষিত উদ্দেশ্য ছিল ভারতে দায়িত্বশীল শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করে ভারতীয়দের শাসনকার্যে অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া। কিন্তু আসলে ব্রিটিশ সরকার ভারতে পূর্ণ দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠা করতে প্রস্তুত ছিল না। কেন্দ্রে দায়িত্বশীল প্রতিষ্ঠার কোনো পরিকল্পনাই ছিল না। তারা শুধু প্রাদেশিক পর্যায়ে কিছু কিছু দায়িত্ব ভারতীয়দের হাতে দেওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। সেজন্য ১৯১৯ সালের আইনে প্রধান বিষয়গুলো কেন্দ্রের হাতে রেখে কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ প্রদেশের নিকট অর্পণ করা হয়। কিন্তু প্রাদেশিক বিষয়গুলোকে সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত এই দুভাগে ভাগ করে যে দ্বৈতশাসন প্রবর্তন করা হয় তার ফলে প্রাদেশিক পর্যায়ে দায়িত্বশীল সরকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সফল হয়নি। ১৯১৯ সালের ভারত শাসন আইন ভারত তথা বাংলায় পার্লামেন্টারি রাজনীতির গোড়াপত্তনে একটি তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপ। এ আইনে প্রথম বঙ্গীয় আইনসভায় সাধারণ নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য প্রেরণের বিধান করা হয়।

গর্ভনর জেনারেল ও তাঁর নির্বাহী পরিষদকে দায়িত্ব হয় রক্ষিত বিষয়গুলোর। আর অন্যান্য বিষয় যেমন শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্থানীয় সরকার বিষয়কে 'হস্তান্তর' করে এগুলোর দায়িত্ব দেয়া হয় আইনসভার কাছে দায়ী মন্ত্রীদের হাতে। এভাবে একই প্রদেশের আওতাধীন বিষয়গুলোকে দ্বৈতভাবে পরিচালনার যে ব্যবস্থা করা হয় তা দ্বৈতশাসন বা Dyarchy নামে পরিচিত হয়। দ্বৈতশাসন ভারতে ১৬ বছর কার্যকর ছিল। দ্বৈতশাসন ব্যবস্থা প্রথম থেকেই সমালোচিত হয়। কিছু বিষয়ের দায়িত্ব মন্ত্রীদের হাতে দেয়া হলেও প্রকৃত ক্ষমতা প্রাদেশিক গভর্নরের হাতেই থেকে যায়। প্রাদেশিক গভর্নরের যেকোনো বিলে ভেটো প্রদান করার ক্ষমতা ছিলো। তবু দেশীয় নেতাদের মন্ত্রিত্ব লাভ, মন্ত্রণালয় ও নির্বাহী কর্তৃত্ব পরিচালনার অভিজ্ঞতা ও ঐতিহ্য গড়ে তোলার দিক থেকে দ্বৈতশাসন ব্যবস্থার অবদান কম নয়। সংরক্ষিত বিষয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নিয়ে আধুনিক অর্থে 'মন্ত্রিসভা' তখন গঠিত না হলেও এটাই এ উপমহাদেশে মন্ত্রিসভার (Cabinet) আদি রূপ। (বিস্তারিত দেখুন: আবুল ফজল হক, *বাংলাদেশের শাসনব্যবস্থা ও রাজনীতি*, রংপুর, টাউন স্টোর্স, ১৯৯৮, পৃ. ১৪-১৬)।

দ্রব্য (Goods)

মানুষের অভাব মেটাতে পারে এমন ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তুগত অথবা অবস্তুগত সকল প্রকার জিনিসকে দ্রব্য বলা হয়। খাদ্য, কাপড়, আসবাবপত্র, পানি প্রভৃতি বস্তুগত এবং আলো, বাতাস, ব্যবসায়ের সুনাম প্রভৃতি অবস্তুগত জিনিসকেও দ্রব্য বলা হয়। কারণ এই সকল জিনিস মানুষের অভাবই মেটাতে পারে। সুতরাং, মানুষের অভাব মেটাতে সক্ষম যেকোনা জিনিসকেই দ্রব্য বলা হয়।

ধনিকতন্ত্র (Plutocracy)

বিত্তবান ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কতৃক পরিচালিত রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা। প্রাচীন গ্রিসের আথেন্সে সোফিস্টদের এই রাষ্ট্রশাসন পদ্ধতির প্রচলন ছিল। বর্তমানকালেও অলিখিত ধারায় বিশেষ ধরনের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ধনী ব্যক্তি রাষ্ট্রপরিচালক হন। যে ব্যক্তির প্রচুর অর্থ থাকে তিনি সরকারি উচ্চপদের অধিকারী। কারণ সেই অর্জনও বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ঘটে বিপুল বিত্তের। তবে এ ব্যবস্থা সব ক্ষেত্রে কার্যকর নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিপুল বিত্ত ব্যতিরেকে উচ্চপদে নির্বাচিত হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভারতেও সেই প্রবণতা আছে। অবশ্য ধনিকতন্ত্র না হলেও, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শাসনকর্তৃত্ব অর্জনের পর বিপুল বিত্ত সঞ্চয়েরও অনেক নজির আছে।

ধর্ম (Religion)

এক বা একাধিক অলৌকিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি বা সত্তার ধারণা এবং ওই শক্তি বা সত্তার আরাধনাই হলো ধর্ম। অতিপ্রাকৃত ও অলৌকিক শক্তি তথা ঈশ্বরের উপাসনায় বিশ্বাস। ধর্মের উৎপত্তি সম্পর্কে পণ্ডিতরা মোটামুটি একমত। বিশ্বাসের পেছনে অনুমান করা হয় যে ঐশ্বরিক শক্তি কর্তৃক মানুষ ও তার পরিবেশ নিয়ন্ত্রিত হয় এবং কৃতকর্মের ওপর লোকের জীবনে ভাল অথবা মন্দ ফলাফল নির্ভর করে। সমাজ ও সভ্যতায় ধর্মের ভূমিকা সম্পর্কে নানা তত্ত্ব ও সম্প্রদায়গত মতবাদ আছে। সব ধর্মই মনে করে যে ধর্মই হলো নৈতিকতার উৎসব; আবার অনেকে মনে করেন ধর্ম ইতিহাসের সবচেয়ে বড় চালিকা-শক্তি। কারও দৃষ্টিতে ধর্মের আচ্ছাদনে সামাজব্যস্থায় শোষণ ও পীড়নকে অব্যাহত রাখা হয়। তবে প্রাকৃতির ওপর মানুষের আধিপত্য বৃদ্ধির ফলে ঈশ্বরের ওপর লোকের আস্থা হ্রাস পাচ্ছে।

ইতিহাস ও রাষ্ট্রতত্ত্বে ধর্ম ও রাজনীতি অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে আছে; কী শাসিত, কী শাসক, উভয়ের মনেই সেটা প্রতিফলিত। আধুনিক পাশ্চাত্য রাষ্ট্রচিন্তায় প্রায় অধিকাংশ প্রত্যয় ও সামাজিক ও রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ধর্মীয় দৃষ্টিতে প্রভাবিত। যাজকীয় তথা ধর্মীয় অনুশাসনের মাধ্যমে আইন ও প্রাকৃত আইনের বিবর্তন, সার্বভৌমত্ব, সম্পত্তি, ন্যায্য মূল্য, সুদ আদায়, সামাজকল্যাণ, শিখা, রাজনৈতিক বাধ্যতা, আনুগত্য ইত্যাদি প্রত্যয়ে ধর্মীয় এবং আধ্যাত্মিক প্রভাব যথেষ্টই আছে। হিন্দু মুসলিম, খ্রিস্টান

প্রভৃতি ধর্মের শাস্ত্রগ্রন্থে নির্দেশিত বহু রাজনৈতিক বিধি-বিধান এখনও রাষ্ট্রজীবনে অনুসৃত হয়। ভাববাদী রাষ্ট্রদার্শনিকেরা অনেকাংশেই এই ধারার সমগোত্রীয়। তবে ধর্মীয় মতবাদের সাথে সমান্তরাল ধারায় বস্তুবাদী, নিরীশ্বরবাদী এবং ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রদর্শন গড়ে উঠেছে। কোনো কোনো রাষ্ট্রে ধর্মনিরপেক্ষ নীতি অনুযায়ী সরকার পরিচালিত হয়।

ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ (Secularism)

ইংরেজি সেকিউলারিজম-এর বাংলা প্রতিশব্দ। শব্দটি একধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। প্রথমটি হলো একটি দর্শন বা মনোভঙ্গী যার পশ্চাতে অতিপ্রাকৃত অর্থাৎ ঐশ কোনো শক্তির স্থান নেই। ইহজীবনসর্বস্ব এই প্রত্যয় অনুযায়ী কোনো কিছুই নিয়তিনির্দিষ্ট নয়, ব্যক্তিমানুষ তার সহজাত যুক্তিশীলতার সাহায্যেই নিজের আচরণ ও জীবনযাত্রার রীতিনীতি নির্ধারণে সক্ষম ; এই অর্থে সেকিউলারিজম সর্বাংশে নিরীশ্বরবাদী এবং মানবতাবাদের সমার্থক।

শব্দটির দ্বিতীয় অর্থের একটি ঐতিহাসিক পশ্চাৎপট আছে। ইউরোপে দ্বাদশ থেকে কয়েক শতক-ব্যাপী যে রেনেসাঁস আন্দোলন ঘটে তা স্পষ্টতই ছিল প্রাতিষ্ঠানিক খ্রিস্টান ধর্ম ও যাজক সম্প্রদায়ের আধিপত্যের বিরুদ্ধে উত্থান। মূলত এই মানবতন্ত্রী উত্থান ও আন্দোলনের ফলে ইউরোপীয় সমাজে কালক্রমে সেকিউলার অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষতার প্রসার ঘটে। বিজ্ঞানের চর্চা ও বিকাশ সহজ হতে শুরু করে। রাজতন্ত্রের দিব্য অধিকারতত্ত্বের মূলে ঘা পড়ে। ধর্ম ও রাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথকীকরণই ছিল সেকিউলারিজমের প্রধান তাৎপর্য। উদারনৈতিক গণতন্ত্রের পথ ক্রমে সুগম হয়। তেমনি ধর্মসংস্কারের পথও প্রসারিত হয়। এর আগে থেকে চলেছিল রাষ্ট্রশক্তি ও খ্রিস্টান শক্তির মধ্যে পারলৌকিক ক্ষমতার কাড়াকাড়ি। পরিশেষে রাষ্ট্র ও চার্চের মধ্যে দীর্ঘকালীন দ্বন্দ্বের বিরাম ঘটে। সেই বিরামের অভিঘাতে ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র গতিশীল বিকাশের পথে এগোয়।

উল্লেখিত দ্বিতীয় ধারায় সমস্ত মানুষই যে নাস্তিক হয়ে পড়ে তা নয়। মানবজীবনে পারত্রিক ও ঐহিক উভয় দিকই থাকে। তবে প্রথমটি মানুষের একান্তই ব্যক্তিগত ও নিজস্ব। মানুষের পারত্রিক বা পরলৌকিক বিশ্বাস ও সংস্কার নানা আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকলাপ ও ধর্মীয় জীবনের মূল বিষয়। পক্ষন্তরে মানবজীবনের দ্বিতীয় যে ঐহিক ধারা থাকে তার অঙ্গ হলো প্রকাশ্য সমাজ-জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিশীল সাধারণ যাবতীয় বিষয়, যেমন রাজনীতি, অর্থনীতি, আইন, প্রশাসন, বিবাহ, পরিবার, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি নানান রাষ্ট্রীয় কাজকারবার। উল্লিখিত দুটি ধারার কোনোটিই অপরটির ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ যেন না করে, দুটিই হলো একে অপরের থেকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র। প্রগতির নিরিখে সেটাই বাঞ্ছনীয়। পশ্চিমা দেশগুলোতে রাষ্ট্র সব ক্ষেত্রে সমান ধর্মনিরপেক্ষ নয় ; নিরপেক্ষতার তারতম্য দেখা যায় ; অবশ্য পশ্চিমা সব দেশেই প্রায় খানাপিনা, বিবাহ, কর্মসংস্থান ইত্যাদি বিষয়ে ধর্মনিরপেক্ষতা সামাজজীবনে বহু পূর্বেই দীর্ঘ প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল।

ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্রের মানসিক উৎস সমান। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা গণতন্ত্রের অন্তঃসার-রূপে স্বীকৃত। স্বাধীন মননসম্পন্ন ব্যক্তির পক্ষেই কেবল স্বাধীনতার সমাদর সম্ভব। সেই ব্যক্তির চাই আত্মনির্ভরতা শক্তি, চাই আপন যুক্তিশীল আত্মবিশ্বাস এবং ধর্মান্ধতার প্রভাবমুক্ত মানসিক দৃঢ়তা। সাম্য ও মৈত্রীর প্রতি অনুরাগ থাকায় জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায়ের ভেদবুদ্ধির প্রভাব থেকেও মানুষ মুক্ত। তাই ধর্মনিরপেক্ষতা ও গণতন্ত্র প্রায় সামার্থক। যথার্থ গণতন্ত্রে বিশ্বাসী মানুষের পক্ষে ধর্মনিরপেক্ষ হওয়া স্বাভাবিক।

ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো সম্প্রদায়-কেন্দ্রিকতা। প্রত্যেক ধর্ম নিজ ধর্মমতকে সত্য বলে গ্রহণ করছে এবং অন্য ধর্মমতকে ভ্রান্ত মনে করছে। এর ফলে ধর্মীয় সংঘাতের সৃষ্টি হচ্ছে। ধর্মের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এক হয়ে রয়েছে। আবার কখনও কখনও ইতিহাসে দেখা যায়, সম্প্রদায়গুলোর মধ্যেও পারস্পারিক সংঘর্ষ বিদ্যমান। ধর্মকে অসম্প্রদায়িক করে তোলার চেষ্টাও যুগে যুগে বহু মরমী সাধক, কবি, সাহিত্যিক, রাজনীতিক প্রমুখেরা চেষ্টাও করেছেন। তাঁরা ধর্মকে মানবতাবাদী চিন্তা-চেতনা দ্বারা অসাম্প্রদায়িক সমাজগঠনে কাঙ্ক্ষিত প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু আজও পৃথিবী সাম্প্রদায়িকতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতার মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও মানবতা-বিরোধী সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে উদারনৈতিক মানবতাবাদী ধারা পুনঃস্থাপনে প্রতিষ্ঠা করতে কল্যাণকামী রাষ্ট্র তথা বিশ্বসমাজ। ধর্মনিরপেক্ষতাই দূর করতে পারে আমাদের উগ্র-সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণ মানসিকতা। ধর্মনিরপেক্ষতা জাতিভেদ, ধর্মভেদকে অতিক্রম করে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখে না। সব ধর্ম রাষ্ট্র নির্বিশেষে সব বিশ্বাসী মানুষের অতিপ্রাকৃত ভাবনার ধারক। ধর্ম ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সুখ-সুবিধার বিধান দেয়। কিন্তু রাষ্ট্র বিষয়টি একান্ত ইহলৌকিক ও বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক সীমায় আবদ্ধ। রাষ্ট্র তার নাগরিকদের ইহলৌকিক কল্যাণের সাথে সংশ্লিষ্ট, পারলৌকিক শান্তি বা শাস্তি বিধানের বিষয়টি তার ক্ষমতা-বহির্ভূত। কাজেই রাষ্ট্র ও ধর্ম বৈপরীত্যের জন্যই রাষ্ট্রকে নিজস্ব চরিত্র রক্ষার্থে ধর্মনিরপেক্ষ হতে হয়। ঠিক একইভাবে ধর্মও রাষ্ট্র নিরপেক্ষ হয়েই তার চরিত্রের বিশুদ্ধতা রক্ষা করতে হয়। অনেকেই রাষ্ট্রকে ধর্মের সঙ্গে মিলিয়ে ফেলে, রাষ্ট্র ও ধর্ম উভয়েরই চরিত্র হনন করে। আমাদের রাষ্ট্রীয় সংবিধানের অন্যতম মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা স্থান পেয়েছে। ধর্ম সম্পর্কে আমরা যে অর্থ পেয়েছি, তা থেকে বলা যায় কোনো মানুষই ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না, এমনকি ধর্মহীন তো নয়। মানবতা, মনুষ্যত্বই হলো মানুষের ধর্ম। ধর্ম থেকে নিরপেক্ষ হলে কিংবা ধর্মহীন হলে মানুষ অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে বলা যায়, মানুষের রাষ্ট্রও ধর্মনিরপেক্ষ হতে পারে না, ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র মানুষ বসবাসের অনুপোযোগী হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু রাষ্ট্রেরও নিজস্ব ধর্ম রয়েছে। নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ডের জনগোষ্ঠী, শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি যা নিয়ে রাষ্ট্র গঠিত তাই রাষ্ট্রের ধর্ম। অর্থাৎ যা রাষ্ট্রকে ধারণ করে তাই রাষ্ট্রের ধর্ম। কাজেই বলা যায়, রাষ্ট্রের অধিবাসীদের যা ইহলৌকিক কল্যাণ সাধন করে তাই রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা। এই ধর্মনিরপেক্ষকতাই রাষ্ট্রের ধর্ম। কাজেই ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রের ধর্মপ্রাণ মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কোনো বিষয়কে যুক্ত করে না। কেননা ধর্মনিরপেক্ষতা কোনো

ধর্মহীনতাকে বুঝায় না। বরং রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা মানুষের প্রকৃতপক্ষে, সকল ধর্ম চর্চাকে প্রতিষ্ঠা দানের চেষ্টা করে। যে রাষ্ট্র কোনো বিশেষ ধর্মকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা করে, সেই রাষ্ট্র অন্যান্য ধর্মকে মর্যাদার দিক থেকে হীনদশার জন্ম দিয়ে থাকে। অথচ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা সেই রাষ্ট্রে অবস্থিত সকল ধর্মকেই সমান মর্যাদা প্রদান করে এবং কোনো ধর্মের প্রতি সামান্যতম পক্ষপাতিত্ব দেখায় না। যার ফলে সকল ধর্মের স্বাধীনতাও বজায় রাখার প্রয়াসী। কাজেই বলা যায়, ধর্মনিরপেক্ষতা সকল ধর্মের মর্যাদাকে অক্ষুণ্ন রাখে। ধর্মনিরপেক্ষতা রাষ্ট্রই হলো আধুনিক সভ্যরাষ্ট্র।

নগদ (Cash)

কোনো আদান প্রদানে অর্থের বিনিময়ে যখন কোনো পণ্য বা দ্রব্যাদি গ্রহণ বা প্রদান করা হয় তখন নগদ টাকার বিনিময়ে কার্যটি সম্পাদিত হলো বলে ধরা হয়। আবার তহবিলকেও অনেক সময় 'Cash' বা নগদ বলা হয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে 'Cheque' বা অঙ্গীকারপত্রের বিনিময়ে যখন অর্থ গ্রহণ করা হয়, তখন উক্ত 'Cheque' ইত্যাদি Cash করা হলো বলে গণ্য করা হয়।

নগররাষ্ট্র (City State)

প্রাচীনকালে গঠিত সামাজিক ও রাজনৈতিক একাত্মতার ভিত্তিতে স্বাশাসিত এক একটি নগর বা জনপদ। তৎকালীন গ্রিসের পুররাষ্ট্র (polis) এর সমার্থক শব্দ। ইতিহাসের আদিপর্বে নগররাষ্ট্রই ছিল সংঘবদ্ধ ও স্বাভাবিক সমাজজীবনের আধার। তারই ভিত্তিতে ক্রমে গড়ে ওঠে ব্যাবিলনীয় ও আসিরীয় সাম্রাজ্য। বিভিন্ন সময়ে নানা দেশে নগররাষ্ট্র গড়ে ওঠে। কিন্তু প্রাচীন গ্রিসের নগররাষ্ট্রসমূহ ছিল উজ্জ্বলতম। যেগুলো থেকে উত্তরকালে পশ্চিমা সভ্যতা ও রাষ্ট্রচিন্তা উৎসারিত হয়; যেগুলো থেকে (বিশেষ করে অ্যাথেন্স) গণতন্ত্রের ধ্যানধারণা উদ্ভুত হয়েছিল। তবে সবক্ষেত্রে সেগুলো গণতন্ত্রী রাষ্ট্র ছিল না। বেশিরভাগ ছিল রাজতন্ত্র অথবা গোষ্ঠীতন্ত্র। পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের স্বাধীন রাজতন্ত্রী শাসন এবং রেনেসাঁর সময়ে ইতালির রাজ্যগুলো ছিল নগররাষ্ট্র।
নগররাষ্ট্রের জনসংখ্যা বেশি হত না। ফলে নাগরিকদের সঙ্গে শাসকদের মধ্যে প্রত্যক্ষ পরিচয় থাকত। আশপাশের গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। প্রতিবেশি অন্যান্য নগররাষ্ট্রের অধিবাসীরা একই ভাষায় কথা বলত। পারস্পরিক বন্ধুত্ব, রেষারেষি, সংঘর্ষ দেখা দিত। বাস্তব নগররাষ্ট্রগুলো ছিল এক একটি উপজাতি অধ্যুষিত।

নবজাগরণ (Renaissance)

মধ্যযুগে যাজক শ্রেণির মধ্যে নৈতিক অধঃপতনও বিলাসবহুল জীবনযাপন জনমনে এক ধরনের নিস্পৃহভাব জাগিয়ে তোলে। পরলোক সম্পর্কে তাদের আগ্রহ কমে যায়। অর্থাৎ মধ্যযুগীয় কুসংস্কার ও ধর্মীয় প্রভাব থেকে মানুষ ক্রমশ নিজেকে মুক্ত করে অন্ধকার থেকে আলোর পথে অগ্রসর হয়। এরই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি চেতনা,

যুক্তিবাদীতা ও বৌদ্ধিক প্রবণতা বিকাশের মধ্যে দেখা যায়। প্রতিটি ব্যক্তি তার নিজস্ব যুক্তিবাদীতা ও বিবেক-বুদ্ধি অনুযায়ী পরিচালিত হবে। মানুষের মনে চেতনাবোধ জাগ্রত হবার সাথে সাথে নতুন ভাবে আবির্ভাব ঘটে। সে যে অফুরন্ত শক্তির অধিকারী তা জানতে পারে এবং তার যে স্বকীয় সত্ত্বা আছে সেটিকে সৃজনশীল কাজে লাগানো যেতে পারে। মানুষের সার্বিক বিকাশ কেবল মানুষের অন্তর্নিহিত সত্তার পূর্ণাঙ্গ বিকাশের দ্বারা সম্ভব। মানুষের এই অস্তিত্ব বা স্বাতন্ত্র্য আবিষ্কার হলো রেনেসাঁ বা নবজাগরণ। নবজাগরণের আভিধানিক অর্থ হল শিল্প বিজ্ঞান, ধর্ম-জ্ঞান, সাহিত্য, ব্যবসা-বাণিজ্যের উন্মেষ। মধ্যযুগের কূপমণ্ডুকতা ও সংকীর্ণতা থেকে মানুষ নিজেকে মুক্ত করে আলোর জগতে পদার্পণ করেছিল বলে নবজাগরণ আখ্যা দেওয়া যায়। মধ্যযুগে সমাজের সমস্ত স্তরে গির্জার প্রভাব এমন ব্যাপক ছিল যে মানুষ নিজের বিচার বুদ্ধি প্রায় হারাতে বসেছিল। আফিম যেমন মানুষকে অনেকটা বাহ্যজ্ঞানশূন্য করে দেয়, ধর্ম তেমন মানুষকে করে ফেলেছিল। তাছাড়া যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির ফলে পৃথিবীর নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক গড়ে উঠল এবং প্রায় একই সঙ্গে স্থাপিত হল নানা শহর, যেমন– প্যারিস, লিসবন, জেনোয়া, ফ্লোরেন্স, লন্ডন, হাসবুর্গ ও নুরেনবার্গ ইত্যাদি। আধুনিক যুগের শুরুতে আরব দেশগুলোর সাথে ইউরোপের সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং আরব দর্শনের সঙ্গে ইউরোপের পরিচয় হওয়ায় ইউরোপীয় নবজাগরণ উৎসাহিত হয়।

নমনীয় সংবিধান (Flexible Constitution)

নমনীয় সংবিধান গঠনতন্ত্র ; সহজ-পরিবর্তনীয় সংবিধান। যে গঠনতন্ত্রকে সহজে বা সাধারণ আইন তৈরির পদ্ধতিতে আইন পরিষদ কর্তৃক পরিবর্তন করা যায় তাকে নমনীয় বা সহজ পরিবর্তনীয় গঠনতন্ত্র বলা হয়। ইংল্যান্ডের গঠনতন্ত্র এই ধরনের। ইংরেজেরা কিন্তু এত রক্ষণশীল যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক পরিবর্তন সাধনের জন্য পার্লামেন্ট গঠন করিয়া ত্রিশ বৎসর কাল যাবৎ বিবেচনা করে বলিয়া লাস্কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন। কাজেই নামে নমনীয় বা সহজ পরিবর্তনীয় হইলেও কাজের বেলায় আইন প্রণয়ন করিয়া পরিবর্তন ঘটান সহজসাধ্য নয়। নিউজিল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ও আইরিন ফ্রি স্টেটের গঠনতন্ত্র লিখিত হলেও নমনীয়।

নরমপন্থী (Moderate)

প্রচলিত ব্যবহারিক ক্ষেত্রে নরমপন্থী হিসেবে চিহ্নিত হন তারাই যাঁরা বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন, কিন্তু কারও দেহে বা মনে আঘাত করেন না। বাহ্যিক আকারে ও চরিত্রে নরমপন্থী ক্রিয়াকলাপ জানা যায়। প্রথমত মুখোমুখি বাদ-প্রতিবাদের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক উপায়ে অসন্তোষের নিষ্পত্তি। ক্রমান্বয়িক ও অহিংস পদ্ধতিতে রাজনৈতিক পরিবর্তনে বিশ্বাস; নীতিপরায়ণ ব্যক্তিদের মধ্যে ঐকমত্যে এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায়

তার প্রতিফলন এবং আইনে রূপায়ণ করায় আস্থা। পরিস্থিতির পরিবর্তনের সঙ্গে ঐকমত্য স্থানান্তরিত হয়; সরকার ও জনমতের একই বিন্দুতে উপনীত হওয়াটাই রাজনীতির লক্ষ্য হওয়া কাম্য, সেটাই বিবাদ-বিরোধে মীমাংসার উৎস। পঞ্চম ঐকমত্যের সঙ্গে অমিল ঘটলেও তার প্রতি সহিষ্ণুতা রাখা চাই। রাষ্ট্রকেও মডারেট অর্থাৎ নরমপন্থী আখ্যা দেওয়া হয়, সেটা কেবল তার ভাবাদর্শের জন্য নয়; দেবার কারণ হলো যে নরমপন্থী রাষ্ট্র ভারসাম্য বজায় রেখে মীমাংসার পথ অনুসরণ করে। পুরসমাজে পরস্পরবিরোধী শক্তির মতো কারও সঙ্গে সংঘাত বা তার উচ্ছেদ চায় না। নরমপন্থী সরকারের অন্যতম লক্ষণ হলো বিরোধীপক্ষের অস্তিত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া। যুক্তি দেখানো হয় যে সীমিত ক্ষমতাসম্পন্ন সরকার এবং বিরোধী পক্ষের সমন্বয়ে আইনের শাসন রচিত হওয়া সম্ভব।

নর্মান যুগ (Norman Age)

নর্মান্ডির উইলিয়াম ১০৬৬ সালে ইংল্যান্ড জয় করেন। বিজয়ী উইলয়াম নিজেকে ইংল্যান্ডের রাজা হিসেবে ঘোষণা করেন। এই সময় থেকেই ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের ক্রমবিকাশের দ্বিতীয় পর্যায় বা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যুগের সূত্রপাত ঘটে। তখন নর্মান রাজা ক্ষমতা বৃদ্ধি ও কর্তৃত্বপূর্ণ ভূমিকা অধিকারী হন। রাজার ক্ষমতা বৃদ্ধির সাথে সাথে সামন্তব্যবস্থা (Feudal System) প্রবর্তন করা হয়। একটি সংগঠিত রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে রাজার স্বার্থেই সামন্তপ্রথার সূত্রপাত হয়। সুতরাং সামন্ত রাষ্ট্র ও রাজার সর্বময় কর্তৃত্ব নর্মান যুগের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

নাগরিক (Citizen)

আইনের দৃষ্টিতে কোনো ব্যক্তি যখন নির্দিষ্ট একটি রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে এবং সেই রাষ্ট্রের কাছ থেকে নিরাপত্তা ও সুযোগ সুবিধা লাভ করে তখন সেই ব্যক্তিকে ওই দেশের নাগরিক বলা হয়। বিভিন্ন দেশ ভিন্ন ভিন্ন নাগরিকত্বের বিধিবিধান প্রযোজ্য। সংশ্লিষ্ট দেশের আইন অনুযায়ী প্রযোজ্য হয়। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নাগরিকত্ব ও জাতীয়তা (nationality) সমার্থক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। একটি দেশের সংবিধান যেসব অধিকার ও কর্তব্য নির্দেশ করে সেগুলোর প্রতিপালন শর্তে নাগরিকত্ব নিরূপিত হয়। সেই কারণে প্রাচীনকাল থেকেই নাগরিকত্বের ভিত্তি নির্ধারণ এবং আইনকানুনের যৌক্তিকতা প্রদর্শনের চেষ্টা হয়ে এসেছে। অ্যারিস্টটল মনে করতেন কার্যনির্বাহী পদ গ্রহণের যোগ্যতা থাকলে নাগরিকত্বের অধিকার পাওয়া যায়। তাই ক্রীতদাসদের নাগরিকত্ব থাকত না। কাজেই নাগরিকত্ব আর প্রজাস্বত্ব এক নয়।

নাগাসাকি (Nagasaki)

নাগাসাকি জাপানের একটি গুরুত্বপূর্ণ নগরী। এই শহরে ১৯৪৫ সালের ৯ আগস্ট যুক্তরাষ্ট্র দ্বিতীয় পারমাণবিক বোমা নিক্ষেপ করে। এই বোমা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে

মূলত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। নাগাসাকিতে পারমাণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলে পৃথিবীর জঘন্যতম মানবতা বিরোধী ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়।

নাৎসিবাদ (Nazism)

এই মতবাদের প্রবক্তা ছিলেন জার্মানির চ্যান্সেলর ও ফ্যুয়েরার অ্যাডলফ হিটলার। তাঁর রচিত 'মেইন কাম্ফ'- ই হলো এই মতবাদের অন্যতম তাত্ত্বিক ভিত্তি। ১৯২০ সালে অক্টোবরে জার্মানির মিউনিক শহরে জার্মান ওয়ার্কার্স পার্টির সম্মেলনে দলের মতাদর্শরূপে শব্দটি গৃহীত হয়। দলের এই আদর্শ ইতালির দক্ষিণপন্থী ও স্বৈরতন্ত্রী ফ্যাসিস্ট দলের মতো। হিটলার নেতা হবার পর তিনি জাতিবিদ্বেষী, ইহুদিবিরোধী এবং উচ্চতর আর্য জাতি প্রত্যয় দলের মতাদর্শে অন্তর্ভূক্ত করেন। তাঁর প্রস্তাবে দলের দাবি হিসেবে গৃহীত হয় ভার্সাই চুক্তির সংশোধনের দাবিও। ইতালির ফ্যাসিস্টদের আনুষ্ঠানিক রীতিনীতিও নাৎসিরা অনুসরণ করে।

১৯৩৩ সালে হিটলার জার্মানির রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়ে উগ্র ও জঙ্গি জাতীয়তাবাদী মতবাদ কায়েমে ব্রতী হন এবং বিশ্বজয়ের জন্য জার্মান জাতিকে উদ্বুদ্ধ করার প্রয়াস পান। প্রচলিত অর্থে সমাজতন্ত্রী পথ সঠিক অনুসরণ না করলেও নাৎসিরা পুঁজিবাদকেও পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। ব্যক্তিগত মালিকানা বজায় থাকে; একচেটিয়া কোনো ব্যবসায়কে রাষ্ট্রীকরণ করা হয়নি; বরং মুষ্টিমেয় লোকের হাতে মূলধনের নিয়ন্ত্রণ চলে যায়। তবে সারা দেশের অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ সরকারি কর্তৃত্বাধীনে থাকে। কিন্তু ব্যক্তিগত মালিকানায় আস্থা এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনায় অনাগ্রহ প্রকাশ পায়। রাজনৈতিক তাগিদে, বিশেষ করে বেকার সমস্যা ঘোচাতে, দেশের অস্ত্রশক্তি বাড়াতে এবং যুদ্ধের উপযোগী শিল্পোন্নয়নের জরুরি প্রয়োজনে ব্যবসা-বাণিজ্যে সরকারি উদ্যম বিকশিত হয়।

রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নাৎসি দল ছাড়া অন্য সব দল নিষিদ্ধ ছিল। দলের নীতি নির্ধারণে সাধারণ সদস্যদের কোনো অধিকার থাকত না। হিটলারই ছিলেন একচ্ছত্র ক্ষমতায় আসীন একমাত্র নেতা। তাঁর নির্দেশ পালন করাই ছিল সদস্যদের কর্তব্য। কোনো কোনো শ্রেণির লোকেদের দলীয় সদস্যপদ গ্রহণ বাধ্যতামূলক ছিল। পার্টির সদস্য সংখ্যা তখন বিশ লক্ষ। ১৯৪৫ সালে সেটা ৬০ লক্ষে পৌছায়। ১৯৩৩ সালের ৩০ জানুয়ারি হিটলার জার্মানির চান্সেলর নির্বাচিত হন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজয়ের পর নাৎসি দল বেআইনি ঘোষিত হয়। ১৯৪৫ সালে চক্রীপক্ষে পরাজয় বরণ করলে এবং হিটলারের জীবনাবসান ঘটলে, এই মতবাদেরও কার্যত অবসান ঘটে। পশ্চিম জার্মানিতে নাৎসি মতাদর্শে বিশ্বাসীরা নয়া-নাৎসি নামে অভিহিত।

নাৎসি-সোভিয়েত চুক্তি (Nazi-Soviet Pact)

১৯৩৯ সালের ২৩ আগস্ট মস্কোয় রাশিয়ার মলোটোভ ও জার্মানির ভন রিবেনট্রপ চুক্তিকে স্বাক্ষর করেন। ১৩ বছর মেয়াদি এ চুক্তির শর্ত ছিল রাশিয়া ও জার্মানি

পরস্পর যুদ্ধে লিপ্ত হবে না এবং এক পক্ষ কারো সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেও অপরপক্ষ নিরপেক্ষতা বজায় রাখবে। এ চুক্তির গোপন শর্ত ছিল রাশিয়া ফিনল্যান্ড, লাটভিয়া, এস্তোনিয়া, পূর্ব পোল্যান্ড ও বেসারবিয়ায় সর্বেসর্বা থাকবে এবং জার্মানি লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ডের বাকি অংশ দখলে রাখবে। ১৯৪০ সালে জার্মানি বিভিন্ন ফ্রন্টে জয়লাভ করতে শুরু করলে উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সম্পর্ক খারাপের দিক মোড় নেয়। ১৯৪১ সালের ২২ জুন জার্মানির রাশিয়া আক্রমণ করলে এ চুক্তির অবসান ঘটে।

নারী-অধিকার আন্দোলন (Feminism)

নারীদের জন্য পুরুষের সমান সামাজিক ও আইনগত অধিকার ও মর্যাদা আদায়ের উদ্দেশে উনবিংশ শতাব্দীতে নারী স্বাধীনতাবাদ নামধারী এই উদারপনস্থী আন্দোলনের সূচনা ঘটে। ফরাসি বিপ্লবে নারীদের যোগদানের সময় থেকেই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে তাদের চেতনা ও আন্দোলন দানা বাঁধে। এই আন্দোলনের অনুসারী ও প্রবক্তাদের বলা হয় নারী স্বাধীনতাবাদী বা নারীবাদী। ইউরোপে তার পূর্ববর্তী শিল্প বিপ্লবের সময় মেয়েদের ব্যক্তিগত, সম্পত্তিগত কোনো অধিকার ছিল না। যুক্তরাজ্যে ১৭৯২ সালে মেরি উলস্টোন ক্র্যাফটের রচনাদি থেকে নারী জাগরণের সূত্রপাত ঘটে। তিনি প্রধানত চেয়েছিলেন নারীদের লেখাপড়া শেখার সমান সুযোগ। উনিশ শতকে এই সংগ্রামের ফলে নারীরা উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বিশেষ করে চিকিৎসা বিজ্ঞানে পুরুষদের কলেজে ভর্তির সুযোগ পায়। গোড়ার দিকে নারী অধিকার আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শিক্ষিত শ্রেণির পুরুষ শাসন থেকে কিছুটা মুক্ত নারীরা। তাঁরা দেখিয়েছিলেন যে নারীরা পুরুষদের তুলনায় নানাবিধ অধিকার থেকে বঞ্চিত ও সামাজিক মর্যাদায় সম-পর্যায়ভুক্ত নন এবং তাঁদের ওপর পুরুষেরা সব কিছুতে আধিপত্য করে। আন্দোলনের ফলে ইউরোপে কালক্রমে বিবাহিতা নারীরা আইনগত অনেক অধিকার পায়, বিশেষ করে স্বামীর সম্পত্তিতে উত্তরাধিকার, আশ্রয়ের অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ ও সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়ের অধিকার। নারী অধিকার আন্দোলনের বিভিন্ন ধারায় অন্যতম একটি দাবি ছিল ভোটাধিকার। যুক্তরাজ্যে ১৯১৮ সালে আংশিক এবং ১৯২৬ সালে পূর্ণ স্বীকৃতি পায়। আন্দোলন ক্রমে লেবার পার্টি ও কমিউনিস্ট পার্টির ছত্রছায়ায় সংসদীয় সংস্কার আন্দোলনের রূপ নেয়। উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৮৫৭ সাল থেকে বাঁচার উপযোগী বেতন এবং অনধিক ১০ ঘণ্টা কাজের সময় নির্ধারণের দাবিতে নারী শ্রমিক ও কর্মচারীরা প্রবল আন্দোলন সৃষ্টি করেন। ভোটাধিকারের রাজনৈতিক দাবির সঙ্গে অর্থনৈতিক অধিকারের দাবি মিশ্রিত হয়। ১৯১০ সালে কোপেনহেগেনে ইন্টারন্যাশনাল সোসালিস্ট উউমেন্স কনফারেন্স ক্লারা জেটকিনের নেতৃত্বে ৮ মার্চ তারিখটিকে আন্তর্জাতিক নারী দিবস হিসেবে পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। যুক্তরাজ্যে সমান বেতনের দাবিতে নারী শ্রমিক ও কর্মচারীরা ধর্মঘট করেন।

এরপর বিশ শতকের ষাটের দশক থেকে ইউরোপে নারী অধিকার আন্দোলন নারী মুক্তি (লিবারেশন) আন্দোলনে পরিণত হয়। মার্কসবাদী নারী আন্দোলনে বলা হয় যে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের সঙ্গে পুঁজিবাদের সম্পর্ক নিবিড়। এই মনোভঙ্গীর উৎস হলো

এঙ্গেলসের তত্ত্ব যে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে আদিম পিতৃশাসিত সমাজের উদ্ভব ঘটে। নারী আন্দোলনকে মার্কসীয় রাষ্ট্রচিন্তা প্রভাবিত করে। লেনিন, ট্রটস্কি প্রমুখের রচনায় নারী অধিকারের বিষয়টি বিশেষ স্থান পেয়েছে। রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েত দেশে নারীদের বিবাহ ও পরিবারের প্রশ্নটি সমস্যা আকারে দেখা দেয়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে নারী নির্যাতন পুঁজিবাদী সমাজের লক্ষণ। এঙ্গেলস মনে করতেন যে গৃহের বাইরে কর্মজীবন, তথা সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত হয়ে সমাজতন্ত্র আন্দোলনে যোগ দিলে নারী জাতির যথার্থ মুক্তি সম্ভব। লেনিনের মতে গৃহে বদ্ধ জীবন থেকে যে গ্লানি দেখা দেয় সেটা কাটিয়ে ওঠার জন্য নারীদের কাজে নিযুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

নারী অধিকার আন্দোলনে আমূল পরিবর্তনবাদী ও বিপ্লবীরা নারী পুরুষের বৈষম্যকে প্রাকৃতিক ও জৈবিক বরে মনে করেন যার সুযোগে পুঁজিবাদ তথা অর্থনৈতিক বৈষম্যের সূত্রপাত ঘটে। তাঁরা মনে করেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় নারীর হীনাবস্থার মূল কারণ হলো জৈবিক অসমতা।

নারী আন্দোলনের বিরুদ্ধপক্ষের বক্তব্য হলো যে নারী-পুরুষের মধ্যে যে সম্পর্ক বিরাজ করে এসেছে সেটা আকস্মিক কিছু নয়, বরং একটা প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় তা গড়ে ওঠে। নারী ও পুরুষ উভয়ে পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, সেই সম্পর্কের ভিত্তিতেই তাদের জীবন পরিপূর্ণতা লাভ করে। পুরুষের আধিপত্য একটি বাহ্যিক রূপ মাত্র; তাই দেশে নারী-পুরুষ সম্পর্কে আসল প্রকৃতি যাচাই করা যায় না। সমাজতন্ত্রীদের মতে, সমাজতান্ত্রিক সমাজ প্রতিষ্ঠা ব্যাতীত নারী-পুরুষের সমান মর্যাদা সুনিশ্চিতকরণ সম্ভবপর নয়। আবার ইসলামপন্থীদের মতে, ইসলামি সমাজব্যবস্থার মধ্যেই নারীর যথার্থ মর্যাদা নিহিত।

নিম্নবর্গের রাজনীতি (Subaltern Politics)

নিম্নবর্গ শব্দটি জনগণের সমার্থক হলেও এলিট কথাটির বিপরীত প্রত্যয়। গ্রামীণ ভদ্র-সম্প্রদায়, ক্ষয়িষ্ণু ভূস্বামী, উচ্চ ও মধ্যবর্তী কৃষক, শহুরে মধ্যবিত্ত ছাড়াও বিত্তহীন কৃষিজীবী ও শ্রমিকশ্রেণিকেও নিম্নবর্গের মধ্যে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে। বিভিন্ন শ্রেণির সমন্বয়ে গঠিত নিম্নবর্গ প্রত্যয়টির সূচনা করেছিলেন গ্রামশি। ইদানীং ইতিহাস, রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজতত্ত্বে ওই সকল শ্রেণির ভূমিকা ও অবদান সম্পর্কে পর্যালোচনা ও গবেষণা শুরু হয়েছে। কারণ এ পর্যন্ত সমাজ ও ইতিহাসের নানা প্রসঙ্গে প্রবরবর্গ ভারসাম্যহীন প্রাধান্য লাভ করেছে। নিম্নবর্গের ভূমিকা ও অবদান উপেক্ষণীয় নয়। গণতন্ত্রে এ শ্রেণির ভূমিকা অত্যধিক। ভোটাধিকার বিবেচনায় নিম্নবর্গের রাজনীতি গণতন্ত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ।

নিকোলো ম্যাকিয়াভেলি (Niccolò Machiavelli)

১৯৬৯ সালের ৩ মে হয়েছিল ইটালির ফ্লোরেন্স (Florence) শহরে ম্যাকিয়াভেলির জন্ম। তাঁর পিতা ছিলেন শহরের একজন শীর্ষস্থানীয় আইনজীবী। ম্যাকিয়াভেলির কৈশোর

থেকে যৌবনকাল সময়টাকে বলা হয় ফ্লোরেন্সের সোনালি যুগ (Golden Age)। সেই সময় ফ্লোরেন্সের শাসনক্ষমতায় ছিলেন লরেঞ্জো ডি. মেডিসি (Lorenzo-de Miedici)। ম্যাকিয়াভেলির বাল্য থেকে যৌবনকালের প্রথমভাগ সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না, তবে তিনি কিশোর বয়স থেকেই রাজনীতির প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং তাঁর ছিল প্রচণ্ড রকমের রাজনৈতিক পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা। তবে ১৪৯৪ সালে ফ্রান্সের সম্রাট অষ্টম চার্লস (Charles VIII) কর্তৃক ফ্লোরেন্স অধিকারের পূর্ব পর্যন্ত তিনি কোনো রাজনৈতিক পদে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি। ফ্লোরেন্স আক্রান্ত হওয়ার পর মেডিসি পলায়ন করেন। পরে সেখানে গিরোলামো সাভেনারোলার (Savonarola) নেতৃত্বে সরকার গঠিত হয়। এই সরকারের অধীনেই ১৪৯৮ সালে তিনি ফ্লোরেন্সের চেন্সরি (Chancry : আধুনিক সিভিল সার্ভিসের অনুরূপ একটি পদ) নির্বাচিত হন। তিনি ফ্লোরেন্সের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। এর পর অবশ্য তাঁর আরও উন্নতি হয়েছিল, তিনি চ্যান্সেলরও নির্বাচিত হয়েছিলেন এবং এই পদে ১৫১২ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই সময়ের মধ্যে ম্যাকিয়াভেলি নগরীর উন্নয়ন ও নাগরিক সুবিধার জন্য বেশকিছু ভালো কাজ করেন।

ফ্লোরেন্সের নাগরিকদের নিয়ে প্যারা-মিলিটারি ধরনের একটি নিরাপত্তা বাহিনী 'নাইন অব দি মিলিশিয়া' (Nine of the Militia) গঠন করেন। ফ্রান্সের বাহিনী সরিয়ে নিয়ে সেখানে এই আধা-সামরিক বাহিনী নিয়োগ করা হয়। এটা ম্যাকিয়াভেলির একটি বড় কাজ। তা ছাড়াও তিনি ফ্লোরেন্সের শাসনব্যবস্থা পরিচালনার জন্য ঔপনিবেশিক ফ্রান্সের লোকদের চেয়ে স্বদেশি লোকদের বেশি অগ্রাধিকার দিতেন। তবু তাঁর শাসনের সময়টাতে ইতালিতে খুব শান্তি ছিল না। ফ্লোরেন্সে ফ্রান্সপন্থি সরকার ছিল। কিন্তু এর মধ্যেও ছিল অভ্যন্তরীণ গোলযোগ। তবে ফ্লোরেন্সে ঔপনিবেশিক শাসক বা গভর্নর পিয়েরো সোডিরিনির (Piero) সাথে ম্যাকিয়াভেলির সম্পর্ক ভালো ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের শাসনক্ষমতা সম্পর্কে তাঁকে কখনও বড় ধরনের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দেয়া হত না। তাঁর যেকোনো সরকারি সিদ্ধান্তে অনুমোদনকালে প্রতিটি ব্যাপার খুঁটিয়ে দেখা হত এবং অনুমোদনে বিলম্ব হত। ম্যাকিয়াভেলি ১৫০০ সালে একবার ফ্রান্সের তৎকালীন রাজা দ্বাদশ লুই (Louis XII) এর দরবারে গিয়েছিলেন একটি রাজনৈতিক সদস্যা নিয়ে। সমস্যাটি ছিল- ইটালির পিসা (Pisa) নগরীর একটি ধর্মীয় সম্প্রদায়িক গোলযোগে সৃষ্টি। এই গোলযোগ দমনে ফ্রান্সের রাজার নিকট থেকে সহযোগিতা লাভের জন্যই তিনি যান।

এরপর ১৫০৩ সালে যখন রোমের মহামান্য পোপের (পোপ দ্বিতীয় জুলিয়াস) মনোনয়ন হয় তখনও তিনি তাঁকে সমর্থন দেন। এরপর ১৫০৭ সালে তিনি রোম সম্রাট ম্যাক্সিমিলিয়ান (Maximilian)-এর রাজদরবারেও গিয়েছিলেন রাজনৈতিক কারণে। ম্যাকিয়াভেলির জীবন শুরু হয়েছিল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। রাজনৈতিক এবং কূটনীতির ওপর তিনি অর্পণ করেছিলেন বাস্তব অভিজ্ঞতা। এ ছাড়া ছিল তাঁর প্রচণ্ড পর্যবেক্ষণক্ষমতা এবং লেখার প্রতিভা। এই অভিজ্ঞতা এবং প্রতিভাই তাঁকে পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত করেছিল একজন রাজনৈতিক লেখক হিসেবে। তিনি রাজনৈতিক গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন একটি নিজস্ব দর্শন। তিনি যে

ফ্লোরেন্সের এবং প্রাচীন রোমান সাম্রাজ্যের ইতিহাস প্রণয়ন করেছিলেন এর মূল ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তাঁর হাতে-কলমে রাজনীতির সাথে জড়িত থাকার এই অভিজ্ঞতা। তাঁর বিভিন্ন সময়ের লেখা পত্রাবলি থেকে জানা যায়, তিনি রাজনীতি এবং ইতিহাস সম্পর্কে ধীরে ধীরে কীভাবে অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন পর্যায়ক্রমে। তাঁর নিজের রাজনৈতিক জীবনে বড় রকমের ব্যর্থতা আসে ১৯৫২ সালে। এই বছরই তিনি চ্যান্সেলর নির্বাচনে হেরে যান। ম্যাকিয়াভেলি তাঁর এ রাজনৈতিক অবনতিকে সহজে মেনে নিতে পারলেন না। প্রতিশোধ তোলার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন। কেমন করে মেডিসিকে অপদস্থ করা যায়, তাঁর কর্মকাণ্ডকে ব্যর্থ করে তোলা যায় তার জন্য গোপনে তৎপরতা চালাতে লাগলেন। তাঁর বিরুদ্ধে গোপনে অপপ্রচারও চালাতে লাগলেন। রাজনৈতিক ক্ষমতা হারানোর পর ম্যাকিয়াভেলি ফ্লোরেন্স থেকেও সরে এলেন। চলে এলেন ফ্লোরেন্সেরই কাছাকাছি তাঁর নিজের শহর সান ক্যাসিয়ানোতে (San Casciano)। ক্রমে মেডিসি তাঁর প্রতি কিছুটা নরম হয়ে আসার পর মাঝে মধ্যে ফ্লোরেন্স শহরে আসতেন। সম্পর্কের তিক্ততাও অনেকখানি কমে আসে।

রাজনৈতিক জীবন থেকে সরে আসার পর ম্যাকিয়াভেলির শুরু হয় আরেক জীবন। শুরু করেন লেখালেখি। অনেকগুলো ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। তাঁর সবচেয়ে বিশ্বখ্যাত ও অমর সৃষ্টি হলো দি প্রিন্স (The Prince)। গ্রন্থটি প্রকাশ করেন ১৫১৩ সালে। দি প্রিন্স-ই তাঁর রচিত গ্রন্থসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য এবং অনবদ্য সৃষ্টি। এই গ্রন্থ পড়ে জানা যায়, তিনি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একনায়কতন্ত্রকে (Dictetorship) পছন্দ করতেন। তিনি যা করতেন বা বলতেন তা সম্পূর্ণ নির্ভয়েই করতেন। অবশ্য তিনি বিশ্বাস করতেন রাজনীতি হলো একধরনের শিল্প (Art), যার ভিত্তি হবে ব্যক্তিগত নৈতিকতা এবং ধর্মীয় অনুভূতি।

১৫১৮ সালে প্রকাশিত ম্যাকিয়াভেলির আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ ডিসকোর্সেস আপন লিভি (Discourses upon Livy)। এই গ্রন্থে তিনি গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের কথা বলেছেন। এখানে তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শে অনেকখানি পরিবর্তন এসেছে। তিনি অতীতের ইতিহাস থেকেই সমাজবিজ্ঞানের সূত্রকে সন্নিবেশিত করেছেন। কিন্তু তা হলেও তাঁর মূল আদর্শ ছিল দেশের প্রশাসন ব্যবস্থা কেন্দ্রীভূত ও শক্তিশালীকরণ। সেখানে স্বৈরতন্ত্র কিংবা গণতন্ত্র বড় কথা নয়, মূলকথা হলো দেশের জনগণের কল্যাণসাধন। বিশেষ করে দেশের প্রশাসনকে এমন শক্তিশালী ও মজবুত করতে হবে যা বহিঃশক্তির আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করতে পারে। ম্যাকিয়াভেলির তৃতীয় আরেকটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হলো হিস্টোরি অব ফ্লোরেন্স (History of Florence)| এটি লিখিত হয়েছিল ১৫২০ থেকে ১৫২৫ সালের মধ্যে। এই গ্রন্থে তিনি তাঁর রাজনৈতিক মতাদর্শকে আরও উন্নত এবং প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছেন। গ্রন্থটি তিনি উৎসর্গ করেন মহামান্য পোপ সপ্তম ক্লিমেন্টকে (Pope Clement-VII)। এখানেও অবশ্য তিনি শক্তিশালী সরকার এবং দুর্নীতিমুক্ত দেশ গঠনের কথা বলেছেন। তাঁর মতে এ দুটো জিনিস থাকলে দেশের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হবে। এর জন্য তিনি অবশ্য ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণের ওপর জোর দিয়েছেন। কারণ অতীত থেকে শিক্ষা

গ্রহণই হলো স্থায়ী শিক্ষা গ্রহণ, যা যা চিরন্তনভাবে প্রযোজ্য। এ গ্রন্থে তিনি আদিকাল থেকে ফ্লোরেন্সে ফ্রান্সের আক্রমণের মুহূর্ত পর্যন্ত ইতহাস তুলে ধরেছেন।

ম্যাকিয়াভেলির পত্রসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ১৫১৩ সালের ১০ ডিসেম্বর লেখা পত্রটি। এই পত্রটিতেই তিনি তাঁর লেখা প্রথম রাজনৈতিক গ্রন্থ দি প্রিন্সের তাৎপর্য এবং লক্ষ্য ব্যাখ্যা করেছিলেন। তিনি তাঁর জীবনের লক্ষ্য, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, আবেগ এবং মনের কথা ব্যক্ত করেছিলেন। এই পত্রটিতে ঘটেছিল ম্যাকিয়াভেলির জীবনাদর্শের মূল প্রতিফলন। ১৫২০ সালে অবশ্য ম্যাকিয়াভেলি একটি সরাসরি দায়িত্ব পেয়েছিলেন। তিনি একটি বাণিজ্যিক মিশনে লুক্কা (Lucca) গিয়েছিলেন এবং সেখানে শহরের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করেন এবং সেখানকার একটি রাজনৈতিক ইনিস্টিটিউশনে ইতিহাসের ওপর গবেষণা করেন। এই গবেষণার ওপর ভিত্তি করে একটি গ্রন্থও প্রণয়ন করেন। গ্রন্থটির নাম ছিল লাইফ অব ক্যাস্ট্রোসিও ক্রাস্ট্রাকানি (Life of Castruccio Castracani)। ক্ষুদ্র গ্রন্থটিতেও তিনি তাঁর নিজস্ব ধারার রাজনৈতিক আদর্শের কথা ব্যক্ত করেছেন। ম্যাকিয়াভেলির লেখার সঠিক মূল্যায়ন করা খুব সহজ নয়, কারণ তাঁর নিজেরই জীবন ও চরিত্র ছিল জটিলতাপূর্ণ। আর এ কারণে তাঁর লেখার মধ্যেও বিতর্কিত ভাবটি চলে এসেছে। তিনি ব্যক্তিগতভাবে ছিলেন উঁচুদরের একজন পণ্ডিত ব্যক্তি। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে দেখেছেন রাজনৈতিক ও প্রশাসনকি বিষয়কে। ব্যক্তিগতভাবে তিনি ছিলেন সৎ, তবে তাঁর দুর্বোধ্যতার কারণেই অনেক ক্ষেত্রে ভুল-বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছে। একসময় খ্রিস্টানদের রোমান ক্যাথলিক এবং প্রোটেস্ট্যান্ট দুটো দলই তাঁর প্রতি নাখোশ ছিল। অথচ তিনি কখনও সরাসরি ধর্মীয় ব্যাপারেই কোনো গ্রুপকে আঘাত করেননি।

ম্যাকিয়াভেলি ১৫১২ সালে ক্ষমতা থেকে অপসারিত হয়েছিলেন। এরপর ১৫২৭ সালে আবার একটি নতুন প্রশাসনের পতন হয় ফ্লোরেন্সে। তবে এর আয়ুষ্কাল ছিল মাত্র তিন বছর। এই নতুন সরকারও তাঁর অনুকূলে ছিল না। কারণ ইতিমধ্যে মেডিসির সাথেও তাঁর একটি গোপন সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। তিনি মেডিসি-পরিবারের কাছ থেকে নিয়মত আর্থিক সহযোগিতা পেতেন, যার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ায় মেডিসি সরে গেলেও নতুন সরকারেও ম্যাকিয়াভেলির জায়গা হলো না। নতুন প্রশাসন তাঁকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল। অনেক ধরাধরির পর তিনি একটি সামান্য পদ পেয়েছিলেন। কিন্তু সেই পদেও তাঁর পক্ষে বেশিদিন থাকা সম্ভব হয়নি। এর মধ্যেই ১৫২৭ সালের ২২ জুন তিনি হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে মৃত্যুবরণ করেন।

নিগমবদ্ধ রাষ্ট্র (Corporate State)

যে রাষ্ট্রে সরকার নাগরিকদের প্রতিনিধিত্ব করে না কিংবা তাদের কাছে জবাবদিহি করতে দায়বদ্ধ থাকে না। তার পরিবর্তে নাগরিকদের নিয়ে গঠিত বিভিন্ন নিগমের কাছে সরকারের জবাবদিহির দায়িত্ব থাকে। নিগমগুলো অনেকাংশে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বশাসিত রাজ্যের মতো এবং সেগুলোর অবস্থান হলো কেন্দ্রীয় শক্তি ও নাগরিকদের

মধ্যবর্তী স্থানে এবং স্বাধীন আনুগত্যের ভিত্তিতে সেগুলো একটিমাত্র সরকারে সমন্বিত ও সংযুক্ত থাকে। ফ্যাসিবাদী আন্দোলন নিগমবদ্ধ রাষ্ট্রের গণগ্রাহী। সংসদীয় বিধিব্যবস্থায় সরাসরি প্রশংসা ও স্বীকৃতি না পেলেও সরকার প্রায়শই বিভিন্ন ট্রেড ইউনিয়ন, চেম্বার অব কমার্স ও অনুরূপ সংগঠনের সঙ্গে পরামর্শ করে চলে, সেখানে নাগরিকদের ব্যক্তিগত ভূমিকা নগণ্য।

নিট সুদ এবং মোট সুদ (Net Interest and Gross Interest)

মূলধনের উৎপাদনের ক্ষমতা অনুযায়ী মূলধনের মালিককে যে অর্থ দেওয়া হয় তাকেই নিট সুদ বা প্রকৃত সুদ (Net Interest) বলা হয়। দেশের সর্বত্রই প্রকৃত সুদের হার সমান হয়। যদি কোনো সময় এই দেশের মধ্যে সুদের হারের তারতম্য থাকে তবে মূলধনের স্থানান্তরের দ্বারা সুদের হারের পার্থক্য দূরীভূত হয় এবং ফলে দেশব্যাপী একই সুদের হার বর্তমান থাকে। মূলধনের মালিক তার মূলধনের উৎপাদন ক্ষমতার জন্য যে নিট সুদ পেয়ে থাকে তাছাড়াও সে অন্যান্য কারণে সুদ হিসাবে অতিরিক্ত অর্থ ঋণ গ্রহীতাদের নিকট হতে নিতে পারে। সুতরাং নিট সুদ এবং অন্যান্য কারণে প্রাপ্ত সুদের সমষ্টিকেই মোট সুদ (Gross Interest) বলা হয়।

নিন্দাসূচক প্রস্তাব (Vote of Censure)

মন্ত্রীগণ কর্তৃক বিভাগীয়ভাবে গৃহীত নীতি, ও সম্পাদিত কার্যাবলীর জন্য মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যেকোনো সংসদ সদস্য নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারে। নিন্দাসূচক প্রস্তাব মন্ত্রীদের একক বা ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতাকে কার্যকর করার জন্য উত্থাপিত হয়। কোনো মন্ত্রণালয়ের বিভাগীয় দুর্নীতি বা ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীর বিরুদ্ধে সাধারণত বিরোধী দলীয় সদস্যরা নিন্দাসূচক প্রস্তাব উত্থাপন করে এবং সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই প্রস্তাবটি গৃহীত হয়। প্রস্তাব গৃহীত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকে পদত্যাগ করতে হয়। তবে সংবিধানিক ঐতিহ্য হলো যে, এরূপ নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পূর্বেই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী মান-সম্মান বাঁচিয়ে পদত্যাগ করেন। এরূপ পদত্যাগের ফলে ক্যাবিনেটের শক্তি শিথিল হতে বাধ্য।

নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য (Checks and Balances)

প্রত্যয়টি দ্বারা এমন এক বিধিব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে সরকারের বিভিন্ন বিভাগ ও তার অধিকর্তাদের ক্রিয়াকলাপ নির্দিষ্ট কর্মপরিধির মধ্যে সীমত থাকে ও লঙ্ঘিত না হয়। অপরের কর্মপরিধির মধ্যে অযথা প্রবেশ না হয়। এইসব কর্মপরিধি এবং ক্রিয়াকলাপ নিয়ন্ত্রণে রেখে সেগুলোর মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখার রীতি ও নীতি রাষ্ট্রদার্শনিকেরা দীর্ঘকাল পূর্বে উপলব্ধি করেন। প্রসারিত দৃষ্টিতে প্রত্যয়টি ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ তত্ত্বের সঙ্গে তুলনা করা যায়।

প্রত্যয়টি ম্যাকিয়াভেলির 'দ্য প্রিন্স' গ্রন্থে প্রথম উদ্ভব ঘটে। এ গ্রন্থে তিনি রাজা, অভিজাতশ্রেণি এবং জনগণের ক্ষমতার সীমা নির্ধারণ ও পারস্পরিক নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য রক্ষার সুপারিশ করেন। পরবর্তীকালে ইংল্যান্ডে স্টুয়ার্টদের রাজত্বকালে আইনসভা ও সরকারের মধ্যে ক্ষমতার পৃথকীকরণ তথা নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য প্রবর্তনের পেছনে ছিল জন লকের চিন্তা। পার্লামেন্ট ও রাজার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে তৃতীয় পক্ষ বিচারকমণ্ডলীর ভূমিকার কথা লক অবশ্য বলেননি। সরকারি বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্যের গুরুত্ব উপলব্ধি করেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জেফারসন। উনিশ শতকের ষাটের দশকে ইংল্যান্ডে রাষ্ট্রের এক অংশের স্বেচ্ছাচার অন্য অংশের দ্বারা আইনগত পদ্ধতিতে নিবারণের সূত্রপাত হয়। সরকারি কার্যকলাপের বিচারকমণ্ডলীর দ্বারা পর্যবেক্ষণ, দ্বি-কক্ষের আইনসভা ইত্যাদি ব্যবস্থা ওই পদ্ধতির অন্তর্গত।

নিয়মানুবর্তিতা (Discipline)

নিয়মানুবর্তিতা ; আদেশ বা নিয়ন্ত্রণের বশবর্তিতা। কোনো সুসংগঠিত সংস্থা, প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংগঠনের শৃঙ্খলা ও শালীনতা বজায় রাখাকে 'নিয়মানুবর্তিতা' বলা হয়। কোনো উচ্চপদস্থ প্রশাসনিক কর্মচারী কর্তৃক অধীনস্থ কর্মচারীদের ওপর নিজের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখাকেও 'নিয়মানুবর্তিতা' বলা হয়।

নিরপেক্ষতা (Neutrality)

যুদ্ধমান বা বিবদমান কোনো পক্ষে যোগদান না করে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখাকেই বলে নিরপেক্ষতা। আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে নিরপেক্ষ রাষ্ট্রসমূহ যুদ্ধমান কোনো পক্ষকেই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সমর্থন না করার অধিকার সংরক্ষণ করে। আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষেত্রে প্রচলিত এই শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। প্রথমটি দ্বারা বোঝায় যে ঘোষণার পরিবর্তে আচরণে অন্যান্য দেশের পারস্পরিক বিরোধে নিরপেক্ষ ভূমিকা গ্রহণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ইউরোপের ছোট ছোট রাষ্ট্র এবং অধুনা তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশ পশ্চিমা অথবা সোভিয়েত রাষ্ট্রগোষ্ঠীর আধিপত্য এড়াতে এই নীতি অনুসরণ করেছিল। নীতিটি তৃতীয় বিশ্বে প্রকারান্তরে এখন জোট নিরপেক্ষতায় পরিণত।

দ্বিতীয়টি দ্বারা বোঝায় যে একটি রাষ্ট্র যখন অন্যান্য রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধের সময় কারও পক্ষ গ্রহণ না করে যথার্থই নিরপেক্ষ থাকে। আন্তর্জাতিক আইনেও তাই আঠারো শতকে এই আচরণকে স্বীকৃতি দেওয়া হত। যদি কোনো দেশ নিরপেক্ষতায় নীতি ঘোষণা করে তা হলে আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে সে দেশ বিবদমান কোনো দেশকে সাহায্য করতে পারে। অনেকের মতে, বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতি এমনই আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করছে এবং স্বার্থ ও সমস্যাসমূহ এমনই পারস্পরিকভাবে গ্রথিত হয়েছে যে, এখন কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই আজ আর চূড়ান্ত বিচারে নিরপেক্ষ থাকা সম্ভব নয়। অনেক ক্ষেত্রে নিরপেক্ষরা মিলেই একটি পক্ষ হয়। যেমন: জোটনিরপেক্ষরা মিলেই আজ একটি জোট বা পক্ষে পরিণত হয়েছে।

নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament)

মূলত অস্ত্র হ্রাস-সংক্রান্ত বিষয়। শব্দগতভাবে মনে হতে পারে নিরস্ত্রীকরণ অর্থ অস্ত্রের সম্পূর্ণ উচ্ছেদকরণ কিন্তু মূলত এর অর্থ হলো অস্ত্র হ্রাসকরণ। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে বিরোধীপক্ষের সঙ্গে চুক্তির মাধ্যমে অথবা একতরফাভাবে সামরিক পথ পরিহার করার প্রক্রিয়া। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের সময় থেকে সাধারণভাবে সকল রাষ্ট্রের মধ্যে এবং সমস্ত ধরনের অস্ত্র ও শক্তিপ্রয়োগের রীতি সংবরণ অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণের প্রয়াস চলে আসেছ। ১৯২৬ সালে জেনেভাতে জাতিপুঞ্জের উদ্যোগে আলাপ-আলোচনার প্রস্তুতি হিসেবে একটি কমিশন গঠিত হয়। ১৯৩২ সালে জাতিপুঞ্জের সদস্যরা এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা প্রথম একটি নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনে মিলিত হন। অস্ত্র বাবদ বিভিন্ন রাষ্ট্রের বাজেটে অর্থ বরাদ্দ সংকোচন, সেনাবাহিনী হ্রাস ইত্যাদি উদ্দেশ্য নিয়ে একটি খসড়া পরিকল্পনা এবং সে বিষয়ে উপদেশদানের জন্য একটি স্থায়ী কমিটি গঠনের প্রস্তাব ওঠে। কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের নানাবিধ আপত্তির ফলে বিষয়টি শেষাবধি ধামা-চাপা পড়ে।

দ্বিতীয়টি বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ ধ্বংসাত্মক ক্রিয়াকলাপে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহার নিবারণের উদ্দেশে অ্যাটমিক এনার্জি কমিশন এবং ১৯৪৭ সালে সাধারণভাবে সমরসম্ভার ও সামরিকবাহিনী বৃদ্ধির প্রয়াসকে নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশে কমিশন ফর কনভেনশনাল আর্মামেন্টস নামে দুটি বিভাগ গঠন করেন। সর্বাধিক সমর্থন অর্জনের উদ্দেশে পৃথকভাবে ওই দুটি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু কোনো ঐকমত্যে উপনীত হতে না পারায় বিভাগ দুটি ১৯৫১ সালে জাতিসংঘের নিরস্ত্রীকরণ কমিশনে মিশে যায়। সোভিয়েত ইউনিয়ন চেয়েছিল প্রথমে চুক্তি স্বাক্ষরিত হোক, পরে পরিদর্শনের ব্যবস্থা হবে। পশ্চিমা দেশগুলো মনে করতো যে পরিদর্শনের পূর্বে চুক্তিস্বাক্ষর অর্থহীন। মতবিরোধ দীর্ঘকাল ধরে চলে, তবে ১৯৭৫ সালে স্বাক্ষরিত হেলোসিঙ্কি চুক্তির আগে সোভিয়েত ইউনিয়নের মনোভঙ্গী নরম হতে শুরু করে। ১৯৭২ এবং ১৯৭৪ সালে যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক আর্মস লিমিটেশন ট্রিটি সম্পাদিত হয়। কিন্তু চুক্তি লঙ্ঘন ও যথোচিত পরিদর্শনের অভাবে পশ্চিমা দেশগুলোর মধ্যে সন্দেহ রয়ে যায়। ১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙে যাবার পর সেখানকার পারমাণবিক অস্ত্র নির্মাণের কেন্দ্রগুলো পরিদর্শন এবং সেগুলো গুটিয়ে ফেলার জন্য যুক্তরাষ্ট্র নানা কৌশল প্রয়োগ করে। ১৯৯৩ সালে জানুয়ারিতে মস্কোয় যুক্তরাষ্ট্রের বিদায়ী প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বোরিস ইয়েলতসিনের মধ্যে স্ট্র্যাটেজিক আর্মস রিডাকশন ট্রিটি স্বাক্ষরিত হয় এই মর্মে যে ২০০৩ সালের মধ্যে উভয় দেশ তাদের পারমাণবিক যাবতীয় অস্ত্র দুই তৃতীয়াংশ কমিয়ে ফেলবে।

নির্বাচক বর্গ (Electoral College)

নির্বাচনে ভোট দেওয়ার অধিকারী ব্যক্তিদেরকে সমষ্টিগতভাবে বলা হয় নির্বাচকবর্গ। রাষ্ট্রপতি, উপরাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী, রাজ্যপাল, দলনেতা কিংবা ওই ধরনের উচ্চ কোনো

পদে পরোক্ষ নির্বাচনকল্পে নিযুক্ত, মনোনীত এক জনগোষ্ঠী। প্রকৃষ্ট উদাহরণ হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি অথবা উপরাষ্ট্রপতি যাঁরা নির্বাচকবর্গের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। কিংবা বিভিন্ন দেশের নির্বাচিত কার্ডিন্যালদের নিয়ে গঠিত নির্বাচকবর্গের মাধ্যমে পোপ নির্বাচিত হন। যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় আইনসভা অর্থাৎ কংগ্রেসের উভয়কক্ষে প্রতি অঙ্গরাজ্যের যতগুলো আসন আছে সেই সংখ্যার সঙ্গে দুই যোগ করে মোট যে সংখ্যা দাঁড়ায় ঠিক ততজন নির্বাচক সেই রাজ্যের বরাদ্দে নির্বাচক বর্গে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচক বর্গের কোনো সভা হয় না। নির্বাচকেরা যে যার নিজ রাজ্যের রাজধানীতে নির্দিষ্ট সময় ও স্থানে জড়ো হয়ে ভোটদান করেন। যদি কোনো প্রার্থী নির্বাচকবর্গে সামগ্রিকভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে না পারেন, তাহলে কংগ্রেসের হাউজ অব রিপ্রেজেন্টেটিভ স্থির করেন কে রাষ্ট্রপতি হবেন।

নির্বাচকমণ্ডলী (Electorate)

নির্বাচকমণ্ডলী গণতন্ত্রের একটি অপরিহার্য উপাদান। নির্বাচকমণ্ডলীকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চলতে পারে না। একসময় নগররাষ্ট্র বিদ্যমান ছিল। নগররাষ্ট্রে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা চালু ছিল। কিন্তু বর্তমানে নগর রাষ্ট্রের পরিবর্তে স্থাপিত হয়েছে জাতীয় রাষ্ট্র। রাষ্ট্রের আকার, আয়তন ও জনসংখ্যার বিপুলতার জন্য প্রাচীনকালের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন এখন অচল। প্রাচীন গ্রীস বা এথেন্সে নগর রাষ্ট্রের নাগরিকবৃন্দ একত্রিত হয়ে প্রতিনিধি নির্বাচন বা রাষ্ট্র পরিচালনার দিক নির্দেশনা প্রদান করতো। বর্তমানে এটা কল্পনা ছাড়া কিছু নয়। জনসাধারণ প্রতিনিধি নির্বাচনের দ্বারা পরোক্ষ পদ্ধতিতে শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করে থাকে। জনগণের পক্ষ থেকে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ দেশের শাসন পরিচালনা করে থাকেন। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে, তাহলে প্রতিনিধিগণ কীভাবে নির্বাচিত হন? তারা হলেন জনসাধারণের প্রতিনিধি, তাই জনসাধারণের দ্বারাই নির্বাচিত হন। সকল জনসাধারণের নির্বাচনের ক্ষমতা নেই। ভোটদাতাদের সমষ্টিতে গঠিত হয় নির্বাচকমণ্ডলী।

নির্বাচন ব্যবস্থা যেমন একদিনে আসেনি-তেমনি প্রতিনিধিত্বশীল গণতন্ত্রও রাতারাতি প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি। স্বৈরাচারের অবসান এবং গণতন্ত্রের বিকাশ লাভেই নির্বাচন ও নির্বাচকমণ্ডলীর গুরুত্ব স্বীকৃতি লাভ করেছে। তেমনি প্রতিনিধিত্বশীল ব্যবস্থাও বিভিন্ন বিবর্তনের পথ ধরে বর্তমান স্তরে উপনীত হয়েছে। ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট, ফ্রান্সের এস্টেটস্ জেনারেল, স্পেনে করটেস (Cortes), জার্মানিতে ডায়েট (Diet) ইত্যাদিতে প্রতিনিধিত্বের প্রচলন ছিল। কিন্তু উল্লিখিত দেশগুলোর আইনসভা সে সময়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় গঠিত ছিল না। কিছু সংখ্যক অভিজাত শ্রেণি সব কিছু নির্ধারণ করতেন। ব্রিটেনের আইনসভার সদস্যগণ ছিলেন রাজা কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তি। কোনো কোনো সময় সকল সদস্যকে মনোনয়ন দান করা হতো। প্রকৃত অর্থে তারা জনসাধারণের প্রতিনিধি ছিলেন না এবং তাদের প্রতি কোনো দায়-দায়িত্ব ছিল না। ১৬৮৮ সালের গৌরবময় বিপ্লবের পর প্রকৃতপক্ষে পার্লামেন্টের প্রাধান্য স্বীকৃত হয়। তার পরেই যে

প্রতিনিধিত্বশীল ধারা কার্যকরী হয়েছে তা বলা যায় না। তবে উক্ত বিপ্লবের পরে রাজতন্ত্রের অবসানে গণতান্ত্রিক শাসনের জয়যাত্রা শুরু হয়। এরপর ১৮২৮, ১৮৩২ ও ১৯৩২ সালের সংস্কার আইন বলে প্রকৃত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার সূত্রপাত এবং প্রতিনিধিত্বশীল শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

কোনো একটি নির্বাচনকেন্দ্রের (constituency) ভোটাধিকারসম্পন্ন নাগরিকেরা সমষ্টিগতভাবে নির্বাচকমণ্ডলী নামে অভিহিত। সেই কেন্দ্রের ভোটদাতারা সেই নির্বাচনকেন্দ্রের প্রতিনিধি নির্বাচন করেন। নির্বাচনপ্রথার বিবর্তন ধারার বিভিন্ন পর্বে সম্পত্তি, করপ্রদান এবং শিক্ষাগত যোগ্যতার ভিত্তিতে ভোটাধিকার দেওয়া হত। বর্তমানে অধিকাংশ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক মাত্রেরই ভোট দেবার অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। নির্বাচকমণ্ডলীর ভূমিকা হলো ভোট প্রদান, ভোটাধিকারের সদ্ব্যবহার, যোগ্য প্রার্থী নির্বাচন করা এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি রাখা।

নির্বাচন (Election)

রাজনীতিতে জনগণের অংশগ্রহণের প্রধান পথ বা উপায় হলো নির্বাচন। সাধারণভাবে যে পদ্ধতির মাধ্যমে জনগণ নিজেদের পছন্দমত প্রার্থী মনোনীত ও বাছাই করে তাকেই বলা হয় নির্বাচন। স্বাধীন ও অবাধ নির্বাচনে জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয় গণতান্ত্রিক সরকার। আর এটাই হলো গণতন্ত্রের অন্যতম প্রধান মূলনীতি। বাস্তবিক পক্ষে নির্বাচন হলো Lifeline of democracy. নির্বাচন হলো নিয়ম নীতি দ্বারা স্বীকৃত এমন একটি প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে জনগণ কর্তৃত্ব করার জন্য তাদের প্রতিনিধি বাছাই করে, বিভিন্ন ইস্যু নির্ধারণ করে এবং সরকারের স্বরূপ নির্ধারণ ও পরিবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ প্রাতিষ্ঠানিক নির্বাচন প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণের মাধ্যমে রাজনৈতিক মতামত প্রকাশ করে থাকে। এ ব্যবস্থাতে প্রতিটি সরকারই জনগণের সম্মতির ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। প্রতিটি নির্বাচন জনগণের মতামত প্রকাশের পথকে প্রসারিত করে। তাবে অগণতান্ত্রিক ব্যবস্থায়, স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের সুযোগ না থাকায় জনগণ মতামত প্রকাশের থেকে বঞ্চিত হয়। একটি জাতির রাজনৈতিক উন্নতি, তার সরকার ব্যবস্থার সুশৃঙ্খল পরিবর্তন এবং সামগ্রিকভাবে জাতির গণতান্ত্রিক বিকাশকে অব্যাহত রাখার জন্য মুক্ত ও অবাধ নির্বাচন একটি বৈধ ও উপযুক্ত পথ হিসেবে বিবেচিত হয়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার সকল বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করার ক্ষেত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি হিসেবে কাজ করে, যার দ্বারা ক্ষমতার পট পরিবর্তনের একটি মসৃণ পথ তৈরি করা যায়।

রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তি, রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং রাজনৈতিক দলের সিদ্ধান্তসমূহ জনগণের মতামতের দ্বারা প্রভাবিত। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান বিষয়গুলোকে মূল্যায়ন করার একটি সুশৃঙ্খল পন্থা হলো নির্বাচন। এই প্রক্রিয়া জনগণ স্বতঃস্ফূর্ত

অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে তাদের মতামত প্রকাশের সুযোগ পায় যা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরো সুসংহত করে।

নির্বাচন হলো মূলত মতপ্রদানের (ভোট) একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে কোনো পদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রিসে নির্বাচন প্রথা থাকলেও একসঙ্গে কিছু ব্যক্তিকে মনোনয়ন করা হত; এবং রোমে জনসমাবেশ থেকে ট্রিবিউন নির্বাচনের রীতি বিরাজ ক্ষমতা। মধ্যযুগে নির্বাচনপ্রথা রহিত যায়। গণতন্ত্রের প্রচলনের সময় থেকে নির্বাচন প্রথা গড়ে ওঠে। ইংল্যান্ডে ত্রয়োদশ শতকে সংসদীয় প্রথার সঙ্গে নির্বাচন প্রথা যুক্ত ছিল, ১৬৮৮ সালে সেটা সুনিয়মত হয় এবং ১৮৭২ সাল থেকে গোপন ব্যালট প্রথা প্রবর্তিত হয়।

নির্বাচন প্রথার উপাদান হলো : (১) প্রার্থীর যোগ্যতা, (২) নির্বাচকের যোগ্যতা, (৩) নির্বাচন পদ্ধতি, (৪) পদ্ধতির রূপায়ণ ও তার কর্মীবৃন্দ এবং (৫) নির্বাচনের নিয়মাবলি (জালভোট, ভীতিপ্রদর্শন, মিথ্যাপ্রচার, ব্যয়বাহুল্য ইত্যাদি নিবারণ)। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে প্রকাশ পায়। নির্বাচনের মাধ্যমে রাজনৈতিক দায়িত্ব, সুশৃঙ্খলভাবে নির্দিষ্ট সময়ান্তরে ক্ষমতাসীনদের থাকা অথবা না থাকার প্রশ্ন এবং দলীয় কর্মসূচির প্রতি নির্বাচকমণ্ডলী তথা জনগণের মনোভাব প্রতিফলিত হয়।

নির্বাচনপ্রথার সার্থকতা হলো প্রথমত দেশের রাজনৈতিক জীবনে নাগরিকদের প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষাভাবে যুক্ত থাকা, যার এক বিশেষ মূল্য আছে এবং দ্বিতীয়ত নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জনমনের গতিপ্রকৃতি জানা যায় ; নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিরা নির্বাচকদের অভীপ্সা মেনে চলেন। জনচিত্তে নেতাদের বৈধতা নির্ভর করে।

নির্বাচন ব্যবস্থা (The System of Election)

গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় নির্বাচন শাসন ক্ষমতা প্রাপ্তির একটি প্রক্রিয়া। ভোট দিয়ে জনগণ প্রতিনিধি নির্বাচন করে এবং তারাই দেশের সরকার বা শাসন পরিচালনা করেন। তাই ভোটদান পদ্ধতিও আলোচ্য বিষয়। বিষয়টি যত ভালই হোক না কেন পদ্ধতি যদি ভাল না হয়, তাহলে আশানুরূপ ফল পাওয়া যায় না। নির্বাচনের ক্ষেত্রে আমরা দুটি পদ্ধতি দেখতে পাই যথা; প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ নির্বাচন।

নির্বাচনী এলাকা (Constituency)

নির্বাচনী এলাকা ও নির্বাচকমণ্ডলী বিস্তারিত অর্থে যেকোনো ধরনের নির্বাচনের বেলাতেই নির্বাচনী এলাকা কথাটার প্রয়োগ হতে পারে। তবে জাতীয় বা প্রাদেশিক আইনপরিষদের সভ্য নির্বাচনকালে নির্দিষ্ট জনসংখ্যার ভিত্তিতে যখন এলাকা নির্ধারণ করা হয়, তখনই উক্ত অঞ্চলকে Constituency বা 'নির্বাচনী এলাকা' বলে অভিহিত করা হয়।

নির্বাচনী যুদ্ধ বিরতি (Electoral Truce)

কোনো নির্দিষ্ট আসনের উপনির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার জন্য দুই বা ততোধিক দলের মধ্যে ঐকমত্যে। কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার এমন কোনো দল আসন শূন্য হলে অন্য দল বা দলগুলো ওই আসনে পূর্ববর্তী দলের প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করার সৌজন্য দেখায়। এভাবে সৌজন্য দেখিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত থাকাকেই electroral truce বলে। অবশ্য কোয়ালিশনের শরিক নয় এমন দল ওই আসনে প্রার্থী মনোনীত করতে পারে। অথবা কোনো স্বতন্ত্র প্রার্থীও এখানে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। কেউই প্রতিদ্বন্দ্বিতা না করলে ওই আসনের উপনির্বাচনে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রার্থী নির্বাচিত হবার সুযোগ থাকে। নির্বাচনী যুদ্ধ বিরতি এক ধরনের সৌজন্য, বাধ্যতামূলকভাবে পালনযোগ্য বিধি নয়। (সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টোরি শব্দকোষ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

নির্বাচনী-কোটা (Electoral Quota)

নির্বাচনী-কোটা ; নির্বাচন সম্বন্ধীয় প্রয়োজনীয় নিম্নতম ভোট সংখ্যা। আনুপাতিক হারে প্রতিনিধি নির্বাচন পদ্ধতিতে নির্বাচনের জন্য যে সবচেয়ে কম সংখ্যক ভোটের প্রয়োজন, তাহাকে 'নির্বাচনী-কোটা' বলা হয়। টমাস হেয়র প্রবর্তিত প্রথায় যতগুলো আসন আছে তা দিয়ে ভাগ করলে যে ভাগফল হয় তার সহিত ১ যোগ করলে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তাহাকে কোটা বলে।

নির্বাসন (Banishment)

আদালত কর্তক দণ্ডাদেশ বা প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের আদেশ ক্রমে কোনো ব্যক্তিকে তার দেশ থেকে বা সে সাধারণত যে স্থানে বসবাস করে সে স্থান হতে বহিষ্কার করা বা জোরপূর্বক বের করে দেওয়াকে নির্বাসন বলে। নির্বাসন এক ধরনের শাস্তি যা কোনো ব্যক্তিকে গুরুতর অপরাধের জন্য দেওয়া হয়। এ সময় থাকাকালীন সময়ে কোনো অধিকার ভোগ করতে পারেনা।

নির্বাহ (Execution)

নির্বাহ 'একজেকিউশন' বলতে বোঝায় নির্বাহিক ক্ষমতা পরিচালনা এবং আদালতের রায় কার্যকর করার জন্য সরকারি কর্মচারীর প্রতি যে নির্দেশ পত্র বা হুকুমনামা জারী করা হয় এবং (৩) গুরুতর অপরাধে অপরাধী ব্যক্তির প্রতি আদালতের রায় অনুসারে প্রাণদণ্ডের যে আদেশ দেওয়া হয়।

নির্বিশেষ গণভোট (Plebiscite)

এটি এক ধরনের অধিকার সংক্রান্ত ভোটাধিকার। প্রাচীন রোমে অনুন্নত সম্প্রদায়ভুক্ত সাধারণ লোকেদের সংসদে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকাররীতি থেকে প্রত্যয়টির উদ্ভব

হয়েছে। বর্তমানে জনমত নির্ণয়কল্পে অবলম্বিত যে কোনো উপায় (যেমন গণভোট) যার মাধ্যমে কোনো রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বিশ শতকের রাজনীতিতে নানা বিষয়েই এই পদ্ধতি প্রযুক্ত হয়ে থাকে। একটি সাধারণ প্রয়োগ হলো যে কোনো এক ভূখণ্ডের ওপর দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী দেশের সর্বভৌমত্বের দাবি উঠলে ওই ভূখণ্ডের অধিবাসীদের মধ্যে এই পদ্ধতিতে জনমত নির্ণয় করা হয়, কিংবা সংবিধানসম্মত প্রশ্ন উঠলে, যেমন ১৯৭৫ সালে ইউরোপিয়ান ইকনমিক কমিউনিস্ট সদস্যপদ গ্রহণসূত্রে যুক্তরাজ্যে নির্বিশেষে গণভোট, অথবা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা প্রশ্নেই পদ্ধতিটির প্রয়োগ ঘটে। প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের ক্ষেত্রে সরাসরি জনমত গ্রহণের অসুবিধা কিংবা প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রের অকার্যক্ষমতা কাটিয়ে ওঠের পক্ষে নির্বিশেষ গণভোটের যথেষ্ট উপযোগিতা আছে।

নিষেধাজ্ঞামূলক রিট (Writ of Prohibition)

কোনো অধস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কোনো কর্তৃপক্ষ, সংস্থা বা ব্যক্তি তার এখতিয়ার বহির্ভূত (in excess of jurisdiction) কাজ করতে উদ্দ্যত হয়েছে কিংবা স্বাভাবিক ন্যায়নীতি (principle of natural justice) ভঙ্গ করতে যাচ্ছে এ অবস্থায় উচ্চতর আদালত যে আজ্ঞার মাধ্যমে উক্ত ব্যক্তি বা কর্তৃপক্ষকে উক্ত কাজ করা থেকে বিরত রাখেন তাকে নিষেধাজ্ঞামূলক রিট বলে।

নিষ্কর্মা কংগ্রেস (Cngress, Do-nothing)

পার্লামেন্টের অকর্মণ্যতা বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এমনকি কাজের গতিহীনতার সাথেও এর সম্পর্ক রয়েছে। কংগ্রেস যখন ইপ্সিত আইন পাস করতে ব্যর্থ হয় বা বিলম্ব করে তখন এর প্রতি বিরক্তি প্রকাশ করতে কথাটি প্রচলিত হয়। যুক্তরাষ্ট্রে কথাটির বহুল ব্যবহার প্রচলিত আছে। প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস ট্রুম্যান (Hary S. Truman, President 1945-1953) রিপাবলিকান কংগ্রেস সদস্যদের আলস্য ও কর্মহীনতা বুঝাতে প্রথম কথাটি ব্যবহার করেন। ১৯৪৮ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রচারাভিযানে এর ব্যাপক প্রচলন হয়। তারপর থেকে আইন প্রণয়ন ও পাস করতে কংগ্রেসের মন্থর ও গতিহীন কার্যপ্রক্রিয়া বোঝাতে ধারণাটি ব্যবহৃত হতে থাকে।

নেলসন ম্যান্ডেলা (Nelson Mandela)

নেলসন ম্যান্ডেলার জন্ম ১৯১৮ সালের জুলাই মাসে দক্ষিণ আফ্রিকার ট্রান্সকেই শহরে। পিতা ছিলেন কৃষ্ণাঙ্গ থিম্বু উপজাতীয় গোত্রের সর্দার হেনরি গাডিলা ম্যান্ডেলা। ম্যান্ডেলার যখন মাত্র বারো বছর বয়স তখন তাঁর বাবার মৃত্যু হয়। তবে সচ্ছল ছিল তাঁদের পারিবারিক অবস্থা। বাল্য কালটাও সুখেই কেটেছে। বাকি জীবনটাও সুখেই কেটে যাবার কথা ছিল। এসব গোত্রপতিদের আনন্দের জীবন যেভাবে কাটে, তেমনই বাল্যকাল কাটে বিলাস বাসনে। তারপর বিয়ে, সন্তানদের জন্মসদান এবং পরে পিতার

মতো আসীন হন গোত্রসর্দারের পদে। ম্যান্ডেলার প্রথমজীবনও কেটে যাচ্ছিল ভোগবিলাসে। কিন্তু অচিরেই তাঁর জীবন মোড় নিল ভিন্নখাতে। স্বাধীন প্রকৃতি তাঁকে নিয়ে গেল সম্পূর্ণ ভিন্ন এক সংকটময় পথে। স্কুলের পড়া শেষ করে তিনি নিয়মমত ভর্তি হয়েছিলেন কৃষ্ণাঙ্গদের জন্য নির্ধারিত স্কুল ফোর্ট হেয়ার কলেজে। কিন্তু পড়াশোনা বেশিদূর এগোতে পারেনি। ছাত্র-আন্দোলনে জড়িত থাকার অভিযোগে ১৯৪০ সালে কলেজ থেকে হন বহিস্কৃত। রাজনীতিতে এসে ম্যান্ডেলা অল্পদিনে সফলতা অর্জন করবেন তা কেউ ভাবেনি। অবশ্য এই সাফল্যের পেছনে কারণ ছিল। তিনি বাল্যকাল থেকেই ছিলেন একরোখা, দৃঢ়চেতা চরিত্রের মানুষ। অভিনব ছিল তাঁর চিন্তাচেতনা। তাই অনেকে ভেবেছিল, তিনি হলেন ধনাঢ্য গোত্রপতির এক বখাটে ছেলে, দুদিন পরেই তাঁর খেয়াল বদলে যাবে। তিনি বুঝতে পারবেন তাঁর ভুল। ফিরে যাবেন তাঁর জগতে। কিন্তু ম্যান্ডেলা ছিলেন সত্যিকার অর্থেই এক ভিন্নপ্রকৃতির মানুষ। তিনি অটল রইলেন তাঁর নিজের লক্ষ্য ও আদর্শে। তাঁর আদর্শ ছিল দেশে শ্বেতাঙ্গ বর্ণবাদী শাসনের অবসান ঘটানো এবং মাতৃভূমির স্বাধীনতা অর্জন তথা কৃষ্ণাঙ্গদের মুক্তি। ১৯৫০ সালে তিনি আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের যুব কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচিত হন। দেশের প্রতি প্রচণ্ড ভালোবাসা এবং নিষ্ঠা যেমন তাঁকে একদিকে দেশবাসীর কাছে দ্রুত জনপ্রিয় করে তুলতে থাকে, তেমনি অপরদিকে বর্ণবাদী শ্বেতাঙ্গ সরকারেরও সতর্ক দৃষ্টি পড়ে তাঁর প্রতি। প্রথমে বর্ণবাদী সরকার ম্যান্ডেলাকে লোভ দেখিয়ে, ভয় দেখিয়ে এ পথ থেকে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করতে থাকে। কিন্তু তাঁর আন্দোলন ও আদর্শ থেকে বিন্দুমাত্র সরাতে না পেরে সরকার তাঁর প্রতি শুরু করে জোর জুলুম আর নির্যাতন। এই জুলুমের প্রতিবাদে ম্যান্ডেলাও ১৯৫২ সালের জুন মাস থেকে আন্দোলনকে আরও জোরদার করে তোলেন। ফলে তিনি গ্রেফতার হন এবং বিচারে তাঁর নয় মাসের কারাদণ্ড হয়। শুধু তাই নয়, এ বছরেরই ডিসেম্বর মাসে জারিকৃত আরেক আদেশে শ্বেতাঙ্গ সরকার তাঁর নাগরিক অধিকার কেড়ে নেয় এবং তাঁর জোহান্সবার্গের বাইরে যাওয়ার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। বর্ণবাদী সরকার ক্রমাগত একের পর এক বৈষম্যমূলক আইন জারি করে দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গ জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়েই যেতে থাকে। নির্যাতন ক্রমে চরম আকার ধারণ করে। ১৯৬০ সালে সংঘটিত হয় দক্ষিণ আফ্রিকার শাপভিল নামক স্থানে এক ভয়াবহ হত্যাকাণ্ড। শ্বেতাঙ্গ সরকারে পুলিশের গুলোতে নিহত হয় ৭০ জন কৃষ্ণাঙ্গ এবং আহত হয় ১৭৬ জন। পুলিশ এক শান্তিপূর্ণ মিছিলের ওপর আকস্মিক হামলা চারিয়ে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায়। এতদিন দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছিল সহিংস আন্দোলন। কিন্তু শ্বেতাঙ্গ সরকার যখন হিংস্রতর পথ বেছে নিল, তখন বাধ্য হয়ে আফ্রিকানরাও তার মোকাবিলা করার সিদ্ধান্ত নিল। ম্যান্ডেলা এর তীব্র প্রতিবাদ করলেন, আন্দোলন ক্রমে সশস্ত্ররূপ নিতে শুরু করল। ম্যান্ডেলার বিরুদ্ধে আগে থেকেই রাষ্ট্রদ্রোহিতার মামলা ঝুলছিল। ১৯৬১ সালের ২ মার্চ তিনি একটি ষড়যন্ত্র মামলা থেকে মুক্তি পেলেন। কিন্তু তাতে তাঁর মন শান্ত হলো না। তিনি বুঝতে পারলেন, শুধু আন্দোলন চালিয়ে শ্বেতাঙ্গদের মোকাবিলা করা যাবে না। নামতে হবে

সশস্ত্র সংগ্রামে। ১৯৬১ সালের ৩০ মে ম্যান্ডেলা ঘোষণা করলেন, 'অহিংসনীতির অধ্যায়টি আমরা শেষ করেছি বলে আমি মনে করি।' কিন্তু সশস্ত্র সংগ্রাম করতে গেলে চাই সামরিক প্রশিক্ষণ, চাই অস্ত্রশিক্ষা। তাই তিনি সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য চলে গেলেন বিদেশে। তবে বিদেশে যাবার আগেই নিজের হাতে বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে সশস্ত্র সংগ্রামের উদ্বোধন করে দিয়ে গেলেন। সেই থেকে শুরু হলো দক্ষিণ আফ্রিকার কৃষ্ণাঙ্গদের সশস্ত্র সংগ্রাম। এক বছর প্রশিক্ষণ নিয়ে তিনি ১৯৬২ সালে আফ্রিকান জাতীয় কংগ্রেসের সামরিক শাখার প্রধান হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলেন। এরপরই ম্যান্ডেলার নেতৃত্বে কৃষ্ণাঙ্গরা সহিংসভাবে শুরু করল পাল্টা প্রতিরোধ। শুরু হলো শ্বেতাঙ্গ সরকারের অফিস ও কলকারখানায় হামলা। তৈরি হলো উমখোন্তো উয়ে সিজউলে (জুলু ভাষায় যার অর্থ 'জাতির বর্শা') নামে একটি গোপন সংগঠন। এই সংগঠনই চালাতে লাগল সশস্ত্র হামলা। দীর্ঘ দুবছর আত্মগোপন করে রইলেন ম্যান্ডেলা-রইলেন ছদ্মবেশে। ছদ্মবেশেই তিনি সাহায্য ও সমর্থন আদায়ের জন্য সফর করতে লাগলেন পৃথিবীর বহু দেশ। কিন্তু পশ্চিমা দেশগুলো তাঁর আহ্বানে কোনো সাড়া দিল না। ১৯৬২ সালের ৫ আগস্ট নাটোল নামক স্থানে সাতজন সহকর্মীসহ ম্যান্ডেলা ধরা পড়লেন। মার্কিন সি.আই.এ.-এর সহায়তায় শ্বেতাঙ্গ সরকার তাঁকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হলো।

আদালতে তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হলো, তাঁরা জনগণকে ধর্মঘটে উসকানি দিচ্ছেন এবং বৈধ পাসপোর্ট ছাড়াই দেশত্যাগ করতে প্ররোচিত করছেন। আদালত তঁঅকে পাঁচবছরের কারার্দণ্ড দিয়ে পাঠাল আফ্রিকার সবচেয়ে ভয়ংকর একটি কারাগারে। দুবছর পর রাষ্ট্র-উৎখাতের ষড়যন্ত্রে জড়িত থাকার আরেকটি সাজানো অভিযোগে ম্যান্ডেলাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দেওয়া হয়। তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় রোবেন দ্বীপের কারাগারে।

ম্যান্ডেলা জেলে গেলেও কৃষ্ণাঙ্গদের সশস্ত্র সংগ্রাম বন্ধ হলো না। তিনি কারাগারের ভেতর থেকেই গোপনে যোগাযোগ করে সশস্ত্র লড়াই পরিচালনা করে যেতে লাগলেন। তাঁর বিবৃতি এবং পত্রাদি রোবেন দ্বীপ থেকে গোপনে পাচার করা হতে লাগল বাইরে। ১৯৮৫ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার শ্বেতাঙ্গ প্রেসিডেন্ট পি.ডব্লিউ.বোথা এক চালাকির আশ্রয় নিলেন। লোভ দেখিয়ে আন্দোলনে ভাঙন ধরানোর মতোলব আঁটলেন। বোথা ম্যান্ডেলাকে মুক্তিদানের প্রস্তাব করলেন। সরকার ম্যান্ডেলাকে মুক্তি দিতে রাজি আছে এই শর্তে যে, তাঁকে (ম্যান্ডেলা) সশস্ত্র আন্দোলন পরিত্যাগ করতে হবে এবং তাঁকে রাজনীতি থেকে দূরে থাকতে হবে। বোথার ধারণা ছিল, কৃষ্ণাঙ্গ ম্যান্ডেলা মুক্তির লোভে তাঁর প্রস্তাব সানন্দে মেনে নেবেন। আর ম্যান্ডেলাকে যদি আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায়, তবে অন্য কৃষ্ণাঙ্গ নেতাদের কাবু করা সহজ হবে। কিন্তু ম্যান্ডেলা শ্বেতাঙ্গ সরকারের এই টোপ ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করলেন। বরং তিনি আরও তীব্রবেগে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার জন্য তাঁর সংগ্রামী সাথীদের আহ্বান জানালেন। দিতে লাগলেন সশস্ত্র যুদ্ধের নির্দেশনা। ১৯৮৭ সালে কৃষ্ণাঙ্গদের আন্দোলন আরেক ধাপ

এগিয়ে গেল। সেই বছরের মে মাসে সি সোয়েটান সংবাদপত্রের পাঠকরা তাদের প্রিয় নেতা নেলসন ম্যান্ডেলাকে দক্ষিণ আফ্রিকার রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত করল। নেলসন ম্যান্ডিলা শুধু দক্ষিণআফ্রিকার প্রথম কৃষ্ণাঙ্গ প্রেসিডেন্ট নন, আজও সারাবিশ্বের মুক্তিকামী মানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা।

নেহেরু পুরস্কার (Neheru Prize)

আন্তর্জাতিক সমঝোতা, সহানুভূতি ও মৈত্রী বৃদ্ধিতে সহায়তার ক্ষেত্রে জওহরলাল নেহেরু গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তার এ অবদানের জন্য ভারত সরকার কর্তৃক প্রদত্ত পুরস্কারের নাম 'নেহেরু পুরস্কার'। স্বাধীনতার পর থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত জওহরলাল নেহেরু (১৮৯৯-১৯৬৪) ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। নেহেরু পুরস্কার মূল্যমান এক লক্ষ ভারতীয় রুপি ও একটি প্রশংসাপত্র। এ পুরস্কার যারা লাভ করেছেন তাদের মধ্যে উ থান্ট, ড. মার্টিন লুথার কিং, আব্দুল গাফফার খান, মার্শাল টিটো, তানজানিয়ার জুলিয়াস নায়ারে, নেলসন ম্যান্ডেলার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

নৈরাজ্যবাদ (Anarchism)

এক ধরনের রাজনৈতিক দর্শন। এই মতাদর্শে কোনো ধরনেরই রাষ্ট্রব্যবস্থা স্থান নেই। মূলত এটি একটি সমাজদর্শন। নৈরাজ্যবাদ একটি সমাজ ও রাজনৈতিক দর্শন যা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবসানের কথা প্রচার করে। আইন, তা প্রয়োগকারী বাহিনী, প্রশাসন, ইত্যাদির সমন্বয়ে গঠিত রাষ্ট্র-ব্যবস্থা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-বিকাশের জন্য বাধা, একটি অত্যাচারের যন্ত্রস্বরূপ, এমন ধারণা থেকে এই মতবাদের উৎপত্তি। এই দর্শনানুসারে রাষ্ট্র মানুষ ও সমাজের জন্য অপ্রয়োজনীয়।

এই তত্ত্বের স্বাভাবিক অনুসিদ্ধান্ত হলো রাষ্ট্র-ব্যবস্থার অবসান ঘটিয়ে রাষ্ট্রবিহীন সমাজ-ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্য অর্জনের উপায় নিয়ে নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যে মত প্রার্থক্য রয়েছে। কেউ বিপ্লবের কথা বলেন, আবার কেউ - মানুষের সদিচ্ছার স্বাভাবিক বিজয়ের মাধ্যমে নৈরাজ্যবাদের প্রতিষ্ঠার কথা বলেন। রাষ্ট্রহীন সমাজ-ব্যবস্থার ব্যাপারে তাদের দিক নির্দেশনায়ও পার্থক্য দেখা যায়। সাধারণভাবে পারস্পরিক চুক্তি ও সদিচ্ছার ভিত্তিতে একটি বিকল্প অর্থনৈতিক ও সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার কথা কল্পনা করা হয়।

অরাজকতা বা সন্ত্রাসী-কর্মকাণ্ডের সাথে নৈরাজ্যবাদকে যুক্ত করা হলেও তত্ত্বগতভাবে এগুলোকে নৈরাজ্যবাদের সরাসরি পরিণতি বলা যায় না। নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তারা সকল ধরনের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় বিদ্যমান অনাচার ও অবিচারের বিরুদ্ধে মৌলিক প্রতিবাদের আন্দোলন গড়ে তুলেছেন। স্মিট, প্রুধোঁ, বাকুনিন, লাভরস, নিতসে প্রমুখ ছিলেন নৈরাজ্যবাদের প্রবক্তা। উনবিংশ শতাব্দীতে রাশিয়ায় নৈরাজ্যবাদী আন্দোলন বিশেষভাবে জোরদার হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রূপে

নৈরাজ্যবাদী আন্দোলনের উদ্ভব ঘটে। নৈরাজ্যবাদে সশস্ত্রবাহিনী, আদালত, জেলখানা বা লিখিত আইনের কোনো অবকাশ নেই। ইংরেজি অ্যানার্কিজম শব্দটি উৎপত্তি ঘটে গ্রিক শব্দ অ্যানার্কিয়া (অশাসন) থেকে। আদিপর্বে প্রত্যয়টি খ্রিস্ট্রয় অনুশাসনে পাওয়া যায়। মধ্যযুগে প্রচলিত ধ্যানধারণায় অবিশ্বাসী (heretic) খ্রিস্টান নস্টিক (gnostic) মতাবলম্বীদের মধ্যে নৈরাজ্যবাদী মনোভঙ্গী দেখা যেত। তাঁরা চাইতেন সামাজিক নিয়মশৃঙ্খলা ভেঙে আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন। ফরাসি বিপ্লব থেকেই প্রকৃতপক্ষে নৈরাজ্যবাদের দার্শনিক ও ইহলৌকিক বুনিয়াদ গাঁথা শুরু হয়। হিংসাত্মক কাজ রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে নৈতিক স্বীকৃতি পায়, জনগণকে পরিচালনার জন্য উচ্চশ্রেণির ষড়যন্ত্রীদের নেতৃত্বে সমাজ-বিপ্লবের ছক তৈরি হয়; যাতে ওপর থেকে একটা সাম্যবাদী সমাজ গঠিত হয়। ওপর থেকে সাম্যবাদী সমাজব্যবস্থা চাপিয়ে দেওয়াটা নৈরাজ্যবাদের একটা স্ববিরোধ হয়ে দাঁড়ায়। ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যভিত্তিক মতাদর্শ সমষ্টিবাদী রাজনৈতিক কর্মসূচির পক্ষে সঙ্গতিহীন।

নৈরাজ্যবাদী দর্শনের প্রবর্তক প্রুঁদ (১৮০৯-৬৫) নৈরাজ্যবাদের অসঙ্গতি কাটিয়ে তোলার উদ্দেশে একটা শিথিল ধরনের ফেডারেশনের সুপারিশ করেন- যেখানে কলকারখানা নিয়ে গঠিত ছোট ছোট কমিউন হবে সেই নতুন সমাজের অঙ্গ। প্রত্যয়টি উত্তরকালে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিজমের তত্ত্বের রূপ পরিগ্রহ করে। লাতিন আমেরিকার কোনো কোনো দেশে সেটা গণআন্দোলন হিসেবে দেখা যায়। রাশিয়ার নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক মিখাইল বাকুনিন (১৮১৪-১৯১০) গুপ্ত বিপ্লব ও প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ধ্বংস চাইতেন এবং মনে করতেন যে ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে মানুষের শুভসত্তা ফুটে উঠবে ও নবযুগের সূচনা হবে।

ইউরোপে শিল্পবিপ্লবের পর আর্থ-সামাজিক দুরবস্থা ও বিভিন্ন বৈপ্লবিক আন্দোলনের ব্যর্থতা থেকে নৈরাজ্যবাদের পথ প্রশস্ত হয়ে ওঠে। উগ্রপন্থী নৈরাজ্যবাদীদের মধ্যেও নানা গোষ্ঠীর তৎপরতা দেখা যেত। তার মধ্যে গোঁড়া মতান্ধ আদর্শবাদীরা ছিলেন যাঁরা হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি হিংসাত্মক কাজের মধ্যে দিয়ে প্রচারকর্মে লিপ্ত থাকতেন। ১৮৮০ খ্রি থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বাবধি রাশিয়া, পশ্চিম ইউরোপ, যুক্তরাজ্য ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রেও ইতস্তত বোমা নিক্ষেপ ও বন্দুকবাজির ঘটনা ঘটে। নৈরাজ্যবাদীরা রাশিয়াতে জার অ্যালেকজান্ডার, ইতালিতে রাজা হুমবার্ত, ফ্রান্সে প্রেসিডেন্ট কার্নো, অস্ট্রিয়াতে সম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ এবং যুক্তরাষ্ট্রে প্রেসিডেন্ট ম্যাকিনলেকে হত্যা করে। সরকারও যথারীতি কঠোরহস্তে ওইসব হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ দমন করে। ব্যক্তিগত সন্ত্রাস নিন্দিত ও পরিত্যক্ত হলেও ঝর্জ সর্ল-এর চিন্তায় তা স্বীকৃতি পায়। ফ্যাসিবাদীরা ও বামপন্থীদের অনেকেই গুপ্তহত্যার আশ্রয় নেয়। ১৮৭৭ সালে আন্তর্জাতিক নৈরাজ্যবাদী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তবে নৈরাজ্যবাদীরা স্থায়ী কোনো সংগঠন গড়তে পারেনি। ইতস্তত বিক্ষিপ্ত তাদের সামান্য অস্তিত্ব দেখা যায়। (সূত্র: সৌরেন্দ্রমোহন গঙ্গোপাধ্যায়, *রাজনীতির অভিধান*, কলকাতা: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লি., ২০১১)।

নোবেল পুরস্কার (Noble Prize)

ডিনামাইটসহ বিভিন্ন বিস্ফোরকের আবিষ্কারক সুইডিশ বিজ্ঞানী আলফ্রেড নোবেল 'নোবেল ফাইন্ডেশন' গঠন করে তাঁর সঞ্চয়কৃত বিপুল পরিমাণ অর্থ সেই ফাউন্ডেশনকে উইল করে দিয়ে যান। এই উইল অনুযায়ী ফাউন্ডেশন থেকে প্রতি বছর পদার্থবিদ্যা, রসায়নশাস্ত্র, চিকিৎসাবিজ্ঞান, সাহিত্য ও বিশ্বশান্তি প্রচেষ্টার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য আবদানের জন্য প্রতি ক্ষেত্রে বিশ্ব সেরা ব্যক্তিত্ব বা প্রতিষ্ঠানকে দেয়া হয়ে থাকে নোবেল পুরস্কার। পরবর্তীতে ১৯৬৯ সাল থেকে অর্থনীতিতেও নোবেল পুরস্কার প্রদান প্রবর্তিত হয়। প্রসঙ্গত, সুইডেনের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের ৩০০ বছর পূর্তি উপলক্ষে ১৯৬৮ সালে অর্থনীতিতে নোবেল পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ১০ ডিসেম্বর, ১৮৯৬ আলফ্রেড নোবেল মারা যান। তাঁর মারা যাওয়ার ৪ বছর পর অর্থাৎ ১৯০১ সাল থেকে নোবেলের মৃত্যুদিবসে অর্থাৎ ১০ ডিসেম্বর বিজয়ীদের হাতে পুরস্কারের অর্থ তুলে দেয়া হয়। উল্লেখ্য, নোবেলের উইল কের যাওয়া সম্পত্তির পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৬,০০,০০০ ক্রোনার (১ ডলার = ৭.৮৮ ক্রোনার)।

ন্যাটো (NATO)

উত্তর আটলান্টিক চুক্তি বা North Atlantic Traety Organization (NATO)। আটলান্টিক অঞ্চলের সোভিয়েত ব্লকের শক্তি ও সম্ভাব্য হামলার মোকাবিলার উদ্দেশেই ১৯৪৯ সালে ওয়াশিংটনে পশ্চিম ইউরোপ ও আমেরিকার বারোটি প্রধান দেশকে নিয়ে এই সংস্থাটি গঠিত হয়। পরে তাতে গ্রিস, তুরস্ক ও পশ্চিম জার্মানি যোগ দেয়। শুরুতে এর সদস্য ছিল যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, কানাডা, ফ্রান্স, হল্যান্ড, বেলজিয়াম, লুক্সেমবার্গ, ইতালি, ডেনমার্ক, নরওয়ে, আইসল্যান্ড ও পর্তুগাল। মূলত কমিউনিস্ট-বিরোধী রাষ্ট্রজোট হিসেবে গঠিত এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল শান্তিপূর্ণ উপায়ে বিবাদ-বিরোধের নিষ্পত্তি এবং সশস্ত্র আক্রমণের বিরুদ্ধে একক ও সম্মিলিত প্রতিরোধশক্তি গড়ে তোলা। জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সনদের ৫১ ধারা অনুযায়ী নাটো-র সদস্য কোনো দেশের ওপর আক্রমণ হলে সকলের ওপর আক্রমণ হিসেবে সেটির বিবেচনা ও যথোচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নাটোর সংসদে সদস্যদেশের রাষ্ট্রপ্রধান, মন্ত্রী, রাষ্ট্রদূত পর্যায়ের স্থায়ী প্রতিনিধিদের মধ্যে যেকোনো একজন প্রতিনিধিত্ব করেন। সামরিক কমিটিতে থাকেন সংশ্লিষ্ট সদস্য দেশসমূহের স্থায়ী প্রতিনিধি এবং সমরবিভাগের প্রধান সেনানায়কেরা। নাটোর-র সেনাবাহিনী বিভিন্ন আঞ্চলিক কমান্ডে বিভক্ত। এই চুক্তিতে মার্কিন প্রেসিডেন্টকে এমন ক্ষমতা প্রদান করা হয়, যাতে কোনো সদস্যরাষ্ট্র আক্রান্ত হলে, তিনি সরাসরি ন্যাটো সেনাবাহিনীকে সরাসরি যুদ্ধের নির্দেশ দিতে পারেন। ন্যাটোর নিয়ন্ত্রণে রাখা হয় বিশাল সামরিক ধ্বংসক্ষমতা। সংশ্লিষ্ট সদস্যদেশসমূহের 'চিফ অব স্টাফ'- দের নিয়ে এর সামরিক কমিটি গঠিত হয়। এর সদর দপ্তর প্যারিসের নিকটবর্তী রোকেনকোর্টে।

ন্যাটো-রাশিয়া সহযোগিতা চুক্তি (NATO-Russia *Cooperation* Pact)

২০০০ সালের ২৮ মে ইতালির রাজধানী রোমে রাশিয়া ও ন্যাটোর মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। চুক্তির উদ্দেশে বিরোধ নয়, পারস্পরিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। এ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া 'ন্যাটোর জুনিয়র পার্টনার' হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। আপাতত ন্যাটোর উনিশ দেশের সঙ্গে যুক্ত হয় রাশিয়া, যাকে অনেকে অভিহিত করেন 'ন্যাটো-২০' নামে। অবশ্য এ চুক্তির মাধ্যমে রাশিয়া ন্যাটোর সহযোগী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে, সদস্য হিসেবে নয়। চুক্তি অনুযায়ী ন্যাটো-রাশিয়া একটি কাউন্সিল গঠন করা হবে, যারা সন্ত্রাস প্রতিরোধ, শান্তিরক্ষা ও অস্ত্র নিয়ন্ত্রণসহ বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনার মাধ্যমে নিজেদের অবস্থান স্থির করবে। তবে ন্যাটো কোনো সিদ্ধান্ত নিলে রাশিয়ার ভেটো দেয়ার ক্ষমতা থাকবে না।

ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) (National Awami Party)

পাকিস্তান আমলে উভয় অঞ্চলভিত্তিক প্রথম বিরোধী রাজনৈতিক দল National Awami Party বা NAP। ১৯৫৭ সালের ২৬ ও ২৭ জুলাই ঢাকার 'রূপমহল' সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত দুই দিনব্যাপী এক সম্মেলনের মাধ্যমে ন্যাপ গঠিত হয়। এর ঘোষিত অন্যতম দাবি ছিল গণতন্ত্রবিরোধী যাবতীয় কালাকানুন বাতিল করা, ব্যক্তিস্বাধীনতা ও ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার প্রদান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পাদিত সকল সামরিক চুক্তি বাতলি এবং বাকস্বাধীনতা ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান করা। পাকিস্তানের প্রথম সারির বহু নেতা এই সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে 'সীমান্ত গান্ধী খান আবদুল গাফফার খান অন্যতম। কমিউনিস্ট পার্টি নিষিদ্ধ থাকায় তখন এই পার্টি বহু নেতা-কর্মী ন্যাপে যোদ দেন। ফলে ৬০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের মতো ও পথ নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বিভেদের পরিণতিতে এই দলটিও দুটি ভাগে বিভক্ত হয়। বিভক্ত ন্যাপে একটির নেতৃত্ব গ্রহণ করেন মওলানা ভাসানী, অন্যটির নের্তৃত্ব দেন অধ্যাপক মোজাফফ্র আহমদ। মওলানা ভাসানী পরিচালিত ন্যাপ প্রধানত কৃষক ও নিম্নবিত্ত শ্রেণির স্বার্থ সংরক্ষণের আন্দোলনে নিজেদের নিয়োজিত রাখে, ভোটের রাজনীতির পরিবর্তে শোষিত শ্রেণির মৌল প্রয়োজন মেটানোর রাজনীতিকেই প্রধান্য দিতে থাকে। একাত্তরের বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে এই দলটি অংশগ্রহণ করে। বর্তমানের উভয় ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি বহুদাবিভক্ত হলে প্রগতিশীল আন্দোলন সংগ্রামে এই দলটির নেতা-কর্মীদের ত্যাগ ও অবদান স্মরণীয়।

ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) (National League for Democracy)

ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি (এনএলডি) মিয়ানমারের একটি গণতান্ত্রিক দল। এটি মূলত একক কোনো রাজনৈতিক দল নয় বরং ১০৫টি গণতন্ত্রকামী রাজনৈতিক দলের সম্মিলিত প্লাটফর্ম। এই জোটের প্রধান নেত্রী হলেন মিয়ানমারের স্বাধীনতা' সংগ্রামের

কিংবদন্তি নেতা অং সানের কণ্যা অং সান সুচি। মিয়ানমারে সামরিক শাসন উৎখাত করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার নিয়ে ১৯৮৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে দেশের স্বৈরতন্ত্রবিরোধী ১০৫টি আন্দোলনসত বিরোধী দলের সমন্বয়ে ন্যাশনাল লীগ ফর ডেমোক্রেসি গঠিত হয়। সুচির নেতৃত্বে এনএলডি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে। ১৯৯০ সালের সামরিক জান্তা গণতান্ত্রিক বিশ্বের চাপের মুখে নির্বাচন অনুষ্ঠানিক বাধ্য হন। এ নির্বাচনে ৪৮৫টি আসনের মধ্যে ৩৯২টি আসনে এনএলডি জয়লাভ করে। কিন্তু তাতেও সামরিক জান্তা বিজয়ী এ দলকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে না দিয়ে অং সান সুচিসহ শীর্ষ নেতাদের গ্রেপ্তার করে কারাগারে নিক্ষেপ করে। ১৯৯৫ সালের ১০ জুলাই সুচিকে মুক্তি দেয় সামরিক সরকার এবং ২০০০ সালে আবার তাকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশেষে জাতিসংঘের চাপে ২০০২ সালের ৫ মে তিনি মুক্তিলাভ করেন। সুচির নেতৃত্বে এনএলডি তার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সংগ্রাম অব্যাহত রেখেছে। ২০০৪ সালে সরকার দলটির কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। ২০১০ সালের নির্বাচন বর্জন করে দলটি এবং পরবর্তী ২০১২ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে বিরোধী দলের ভূমিকায় যায়।

পক প্রণালী (Pak Pranali)

পক প্রণালী শ্রীলংকাকে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন করেছে। এই প্রণালীর মাধ্যমে আরব সাগর হতে বঙ্গোপসাগরে অতি সহজ পথে চলাচল করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের মধ্যে বাণিজ্য ও জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে এই প্রণালীর গুরুত্ব অনেক। এই প্রণালীর মাধ্যমে আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা ও মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর সাথে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুলোর বাণিজ্যিক জাহাজ সহজে চলাচলের অধিকার পায়। ভারত এই প্রণালীর সাহায্যে অনায়াসে শ্রীলংকায় পৌঁছতে পারে। বিভিন্ন সময়ে ভারত থেকে এই প্রণালী পার হয়ে লোকজন শ্রীলংকায় প্রবেশ করেছে। ভারতের তামিলনাড়ুর রাজধানী মাদ্রাজের সাথে এই প্রণালীর মাধ্যমে শ্রীলংকার তামিল বিচ্ছিন্নতাবাদী বিদ্রোহী গ্রুপ যোগাযোগ রক্ষা করে থাকে।

পকেট ভেটো (Pocket Veto)

যেকোনো বিল রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য পেশ করা হলে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিলেন না অথবা আইনসভায় পুনর্বিবেচনার জন্যও ফেরত পাঠালেন না; বরং তার টেবিলের ওপর ফেলে রাখাকেই পকেট ভেটো বলে। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পকেট ভেটো ক্ষমতার প্রয়োগ যুক্তরাষ্ট্রে সর্বাধিক। সেখানে রাষ্ট্রপতিকে বিল ফেরত পাঠানোর সময় সীমা ১০ (দশ) দিন। উক্ত সময়সীমার মধ্যে তিনি স্বাক্ষর নাও করতে পারেন কিংবা বিলটি ১০ দিনের মধ্যে ফেরত না পাঠিয়ে তাঁর বিলটি টেবিলে ফেলে রাখতে পারেন। যতদিন না নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হচ্ছে এই সময়ের মধ্যে যদি কংগ্রেস মূলতবি হয়ে যায় তাহলে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না। রুজভেল্ট, ট্রুম্যান, ক্লেভেল্যান্ড প্রমুখ রাষ্ট্রপতিগণ এ জাতীয় ভেটো সর্বাধিক প্রয়োগ করেছেন। আবার ভারতের

রাষ্ট্রপতিকে বিলে সম্মতি দানের জন্য কোন সময়সীমা বেঁধে না দেয়ায় তিনি সম্মতি জ্ঞাপন না করে কিংবা ফেরত পাঠিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য ফেলে রাখতে পারেন। এমনিভাবে যতদিন বিলটি ফেলে রাখবে ততদিন তা আইনে পরিণত হতে পারে না। মার্কিন রাষ্ট্রপতির মত ফরাসি রাষ্ট্রপতির কোনো ভেটো ক্ষমতা নেই। পার্লামেন্টে পাস হবার পর তিনি কোন বিলকে বাতিল করতে পারেন না। তবে এ ক্ষেত্রে তিনি এক ধরনের ভেটো ব্যবহার করতে পারেন। একে স্থগিত ভেটো (Suspersive Veto) বলা যেতে পারে। এ হলো সাময়িকভাবে ক্রিয়াশীল ভেটো। তিনি যে কোনো বিল পুরোপুরি বা বিলের অংশবিশেষ পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টকে অনুরোধ করতে পারেন। এই অনুরোধ অমান্য করা যায় না, সংবিধানের ১০ ধারার বলা হয়েছে: 'This reconsideration may not be refused চূড়ান্তভাবে গৃহীত আইন সরকারের কাছে প্রেরিত হওয়ায় ১৫ দিনের মধ্যে তা জারি (Promulgale) করেন, এ সময়সীমা অতিক্রান্ত হবার আগে তিনি সংশ্লিষ্ট আইনটি পুনর্বিবেচনার জন্য পার্লামেন্টকে বলতে পারেন।

পঞ্চশীল (Panchsil)

জোট নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির পাঁচটি সূত্র। ১৯৫৪ সালে ২৯ এপ্রিল তারিখে চীন ও ভারতের মধ্যে তিব্বত সম্পর্কে চুক্তি সম্পাদনকালে গৃহীত সহাবস্থান নীতির পাঁচটি সূত্র (১) পরস্পরের এলাকাগত অখণ্ডতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন ; (২) পারস্পরিক অনাক্রমণ ; (৩) পরস্পরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে অহস্তক্ষেপ ; (৪) সমতা ও পারস্পরিক কল্যাণ এবং (৫) শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। চুক্তিটি ওই বছরে স্বাক্ষরিত হয়েছিল দিল্লিতে। স্বাক্ষর করেন চীনের প্রধান মন্ত্রী চু এন লাই এন লাই এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু। চুক্তিটি গৃহীত হবার পর সোভিয়েত ইউনিয়ন, ব্রহ্মদেশ, ভিয়েতনাম, মিশর প্রভৃতি আরও কয়েকটি দেশ সেটিকে গ্রহণ করে ভারত ও চীনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়।

পঞ্চায়েত (Panchayat)

গ্রামীণ বিচারব্যবস্থার নাম। প্রাচীন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় অধিক প্রচলিত ছিল। বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যবস্থাতেও এ পদ্ধতি চালু ছিল। এখনও অনেক জায়গায় এ পদ্ধতি চালু রয়েছে। সাধারণত পাঁচজন প্রধান ব্যক্তিকে নিয়ে গঠিত গ্রামীণ বিচার সংস্থা। সেগুলোর প্রধান কাজ ছিল বর্ণব্যবস্থার (caste) বা কুলের (clan) কিংবা বণিকগোষ্ঠীর অন্তর্গত ব্যক্তিদের বিবাদ-বিসংবাদের বিচার ও সমাধান। এরূপ বিচারব্যবস্থা ভারতে আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতাব্দী থেকে চলে আসছে। বড় ধরনের দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা সরাসরি সরকারি বিচারালয়ে যেত। চিরকালে কোনো পক্ষ আইনজ্ঞ নিয়োগ করতে পারত না। রাজশক্তির প্রতীক হিসেবে কাষ্ঠদণ্ড ও জাতির নিজস্ব দেববিগ্রহ পঞ্চায়েতের বিচারে ব্যবহৃত হত। আপসে সমাধানের প্রয়াস পঞ্চায়েতী বিচারের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য ছিল পঞ্চয়েতের ঐকমত্যে হওয়ার রীতি।

বিচারের কঠোরতাকে করুণা বা মানবিক বিবেচনায় মোলায়েম করার চেষ্টাও হত। দোষ প্রমাণিত হলে দোষীকে জরিমানা অথবা জাতিচ্যুত কিংবা একঘরে করার প্রচলন ছিল। পূর্বকালে নিম্ন হতে উচ্চ বিচারালয়ে এবং প্রয়োজন হলে রাজার দরবারেও আপিল করা চলত। গান্ধী, বিপিনচন্দ্র পাল, চিত্তরঞ্জন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ মনীষীরা পঞ্চায়েত ব্যবস্থার গুণগ্রাহী ছিলেন। পঞ্চায়েতের সমর্থনে তাঁরা নানাপন্থা উত্থাপন করেন। দেশ স্বাধীন হবার পর ভারতের গ্রামঞ্চলে যে পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়েছে তার সঙ্গে প্রাচীন পঞ্চয়েত ব্যবস্থার কিছু সাদৃশ্য থাকলেও তার উদ্দেশ্য ও কর্মপরিধি এখন ভিন্ন। ইংরেজ আমলে ইউনিয়ন বোর্ড, ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড ইত্যাদি স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসনের যে ব্যবস্থা ছিল তার সঙ্গে কিছু কার্যক্রমের সংযোজন ও প্রাচীন নামকরণের সংমিশ্রণে বর্তমান পঞ্চায়েতী রাজ প্রবর্তিত হয়েছে। পঞ্চায়েতী রাজ ব্যবস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো রাজনৈতিক ক্ষমতার গণতান্ত্রিক বিকেন্দ্রীকরণ, গ্রামাঞ্চলে বিষয়সমূহ সংক্রান্ত ক্রিয়াকর্মের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব সংশ্লিষ্ট স্থানিক জনসাধারণের ওপর ন্যস্ত থাকে এবং আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয় ও বিচারব্যবস্থা ব্যয়বহুল না হয়। সেটা সম্পন্ন করতে হলে চাই কৃষিপণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি, গ্রামীণ শিল্পের উন্নয়ন, কর্মসংস্থান ও প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার, গ্রামীণ অধিবাসীদের মধ্যে সমবায়ী সম্পর্কে, পশ্চাৎপদ গ্রামীণ অধিবাসীদের দুর্গতির অবসান এবং বিকেন্দ্রিত ক্ষমতার প্রসার ও সেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহকে উৎসাহদান।

পতিবিপ্লব (Counter-Revolution)

যারা প্রচলিত রাষ্ট্র, সমাজ ও অর্থব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখতে চায় এবং এ কারণে বিপ্লবীদের বিপক্ষে দাঁড়ায়, তাদেরকে বলা হয় প্রতিবিপ্লবী। বিপ্লবের প্রত্যাগমন অর্থে ফরাসি দার্শনিক কঁদরসে শব্দটি ১৭৯৩ সালে প্রথম ব্যবহার করেন। পরে ১৭৯৬ সালে দে মেস্তার, যিনি প্রতিবিপ্লব চেয়েছিলেন, তিনি শব্দটি পাল্টা বিপ্লব নয় অর্থাৎ বিপ্লবের বিপরীতমূখীতা অর্থে ব্যবহার করেন। মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রত্যয়টি হলো প্রতিক্রিয়াশীল শ্রেণির সক্রিয় সংগ্রাম, যে শ্রেণি কোনো এক সমাজ বিপ্লবে ছিন্নমূল হয়ে, নতুন সমাজব্যবস্থার বিরোধিতা এবং পুরানো অচল ব্যবস্থার সংরক্ষণ এবং পুনঃপ্রতিষ্ঠা চায়।

পরিবর্তনীয় ব্যয় (Variable Cost)

কোনো প্রতিষ্ঠানের উৎপাদনের পরিমাণ পরিবর্তিত হওয়ার জন্য যে ব্যয়ের পরিবর্তন হয়ে থাকে তাকে পরিবর্তনীয় ব্যয় বলা হয়। উৎপাদনের পরিমাণ বাড়লে পরিবর্তনীয় ব্যয়ের পরিমাণও বাড়ে এবং উৎপাদনের পরিমাণ কমলে এই প্রকার ব্যয় কমে। যেমন— কাঁচামাল ক্রয়ের খরচ, শ্রমিকের মজুরী, বিদ্যুৎ ও জ্বালানির খরচ প্রভৃতি পরিবর্তনীয় ব্যয়ের অন্তর্ভূক্ত। এই পরিবর্তনীয় ব্যয় প্রাথমিক ব্যয় (Price cost) নামেও পরিচিত।

পরমাণু অস্ত্রহ্রাস চুক্তি (Comprehensive Test Ban Treaty-CTBT)

এটি ব্যাপকভিত্তিক পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের ৫১তম অধিবেশনে গৃহীত হয়। সম্পাদিত এই চুক্তিতে ১৫২টি দেশ স্বাক্ষর করেছে, যাদের মধ্যে মাত্র ৪১টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদনও করেছে। চুক্তিটি মূলত পারমাণবিক অস্ত্রেও যেকোনো পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বা অন্য কোনো ধরনের বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ করে, যা প্রকৃতপক্ষে পারমানবিক অস্ত্রের গুণগতমান বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয়াবহ অস্ত্র, বিশেষত আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষা বন্ধ করা। চুক্তিটির ১৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিশ্বে পারমানবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪টি দেশের প্রত্যেকটি কর্তৃক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত না হওয়া পর্যন্ত কার্যকর হবে না। চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখার তিন বছরের মধ্যে কার্যকরী না হলে ইতিমধ্যে যেসব দেশ স্বাক্ষর করেছে, তাদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে, যার উদ্দেশ্য হলো চুক্তিটির কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করার কৌশল উদ্ভাবন করা। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে স্বাক্ষরকারী ৯২টি দেশ নিয়ে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে পারমানবিক শক্তিধর ৫টি দেশের মধ্যে মাত্র ২টি দেশ (ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ কিছু দেশ এ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। বরং ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান একাধিক আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। অনেকে মনে করেন যে, সিটিবিটি-এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে অন্য কাউকে এরূপ অস্ত্র অর্জন করতে না দেওয়া। এসব দেশ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অচিরেই চুক্তিটি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করবে এবং মানব জাতির স্বার্থে গোটা বিশ্ব পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত হবে।

পরমাদেশ বা হুকুম জারি রীট (Writ of Mandamus)

পরমাদেশ বা হুকুম জারি রীট (Writ of Mandamus) একটি ল্যাটিন শব্দ। এর অর্থ হলো 'We command" অর্থাৎ "আমরা আদেশ বা হুকুম করছি"। কোনো অধস্তন আদালত, ট্রাইব্যুনাল, ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যদি তার আইনগত দায়িত্ব পালন করতে অস্বীকার করে কিংবা ব্যর্থ হয় তাহলে উচ্চতর আদালত যে আদেশের মাধ্যমে উক্ত আইনগত দায়িত্ব পালন করতে উক্ত আদালত ট্রাইব্যুনালকে বাধ্য করে তাকে হুকুম জারি রিট বা পরমাদেশ বলে।

পরিষদ (Assembly)

আইনসভা বিধানসভা বা কোনো লোকসমষ্টি বোঝাতে এসেম্বলি শব্দটি ব্যবহৃত হয়। সাধারণত কোনো দেশের পার্লামেন্টকে বুঝায়। এক্ষেত্রে পার্লামেন্ট ও পরিষদের কাজ

প্রায় একই। পরিষদ বিভিন্ন রকম হতে পারে। যেমনঃ জাতীয় পরিষদ (National Assembly), প্রাদেশিক পরিষদ (Provincial Assembly) ইত্যাদি। কোনো কোনো সময় বুদ্ধিবৃত্তিক (Intellectual) গ্রুপকে পরিষদ বলে। বুদ্ধিবৃত্তিক পরিষদ সদস্যরা একই রকম চিন্তার অনুসারী এবং কোনো বিষয়কে এককভাবে ব্যাখ্যা করেন। জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদকেও পরিষদ বলে। যেমন The General Assembly of the United Nations. জাতিসংঘের সকল সদস্য রাষ্ট্র এর সদস্য।
রাজনৈতিক দাবি আদায় বা অন্য কোনো কারণে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমাগম ঘটলে একে পরিষদ বলে। Unlawful Assembly বা 'বেআইনি জনতা' বলে একটি কথা প্রচলিত রয়েছে। সরকার বিরোধী জনসমাবেশকে সরকারি পক্ষ থেকে সাধারণত 'বেআইনি জনতা' বলে চিহ্নত করা হয়। পরিষদ বা আইন পরিষদের সদস্যদের Assembly বলে।

পরিষদীয় আন্দোলন (Conciliar Movement)

মধ্যযুগের শেষে গির্জায় পোপের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা যে সমস্যার সৃষ্টি করে তাতে ইউরোপের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত সমাজের প্রতিটি শ্রেণির বা প্রতিটি স্তরের মানুষের বিতর্কে লিপ্ত হওয়া ছিল অবধারিত। পোপ গির্জার একচ্ছত্র ক্ষমতার মালিকরূপে যাজকবৃত্তি বিতরণ ও নিজস্ব আদালতে মোকদ্দমার বিচার করতেন। এতে গির্জার ভাণ্ডারে বিপুল অর্থ সংগ্রহ হত। এসবের তিনি নিজস্ব পদ্ধতি ও কলাকৌশল অবলম্বন করতেন। এতে পোপের দরবার বিলাসিতায় ভরপুর হতো ঠিক, তবে দুর্নীতি ও অনাচার দ্বারা গির্জার পবিত্র উদ্দেশ্য কলুষিত হয়ে পড়ত। যাজক সম্প্রদায় স্বাভাবিকভাবে অসম্মানের ও তিক্ত সমালোচনার পাত্র হয়ে পড়ে। তারপর দু'জন, কখনও ৩ জন প্রতিদ্বন্দ্বি পোপ পদের জন্য প্রতিযোগিতা করে। এরাও একজন অপরজনের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বিষোদগার ও রাজনৈতিক প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে গোটা ব্যবস্থার ওপরে কলঙ্কের তিলক পরিয়ে দেয়। এতে পোপের মর্যাদা ধ্বংসের পথ প্রশস্ত হতে থাকে। গির্জার এই অধঃপতন দেখে মার্সিলিও ও গির্জাকে সংস্কারের প্রস্তাব দেন। পরবর্তীতে ইংল্যান্ডের ওয়াইক্লিক ও বোহেমিয়ার হুস এবং নিকোলাস অব কুসা গির্জার সংস্কার সাধনের নিমিত্ত পরিষদ গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করে আন্দোলনের রূপ দেন বলে এটিকে পরিষদীয় আন্দোলন বলা হয়। এই আন্দোলনকারীদের বক্তব্য ছিল ভগবানের দৃষ্টি সবাই সমান এবং কেউ কেউ উচ্চ বা নীচ নয়। পোপ এবং সাধারণ যাজকদের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকবে না। সকলেই ভগবানের সেবক। গির্জা পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী সমস্ত লোকের সম্মতি দ্বারা স্থিরকৃত হবে। যেহেতু খ্রিস্টানদের সংখ্যা কম নয় সকলের পক্ষে গির্জার প্রশাসনে অংশগ্রহণ করা সম্ভব নয়। সুতরাং খ্রিস্টধর্মে বিশ্বাসী লোকেরা একটি পরিষদ গঠন করবে এবং ধর্ম ও গির্জার প্রশাসন বিষয়ক সমস্ত সমস্যার মীমাংসা করবে। বস্তুত পরিষদের মাধ্যমে সমস্ত ক্ষমতা জনগণের হাতে ন্যাস্ত থাকবে। পরবর্তী মার্টিন লুথার ও অন্যান্য সংস্কারকদের আন্দোলনের পথ পরিষদীয় আন্দোলনের পথ প্রশস্ত করে দিয়েছেন।

পরোক্ষ নির্বাচন (Indirect Election)

পরোক্ষ নির্বাচনে জনগণ সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে না। নির্বাচকমণ্ডলী বা ভোটদাতা সরাসরি তাদের নির্বাচিত না করে একটি মধ্যম শ্রেণিকে ভোট দেয়। একে নির্বাচনী সংস্থা (Electoral College) বলা হয়। নির্বাচনী সংস্থা চূড়ান্তভাবে প্রতিনিধিদের নির্বাচন করে। কোনো কোনো দেশে আইনসভার সদস্যগণ নির্বাচক হিসেবে কাজ করেন। আমেরিকার রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ পদ্ধতিতে নির্বাচিত হন। তৎকালীন পাকিস্তানে অভিনব মৌলিক গণতন্ত্র সৃষ্টিতে পরোক্ষ নির্বাচনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত।

পলাশীর যুদ্ধ (Battle of Plassey)

অবিভক্ত বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার শেষ স্বাধীন নবাব ছিলেন সিরাজউদ্দৌলা। ১৭৫৭ সালের ২৩ জুন সেনাবাহিনী এবং রবার্ট ক্লাইভের অধীনে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সেনাবাহিনীর মধ্যে পলাশী নামক স্থানে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল ইতিহাসে তা 'পলাশীর যুদ্ধ' নামে খ্যাত। পলাশী পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগর মহকুমার কালীগঞ্জ থানায় ভাগীরথী নদীর তীরে অবস্থিত একটি গ্রাম। পলাশীর যুদ্ধে বিশাল সেনাবহর নিয়েও সিরাজউদ্দৌলা পরাজিত হন। তাঁর সৈন্যসংখ্যা ছিল ৩৫,০০০। অন্যদিকে ক্লাইভের সৈন্যসংখ্যা ছিল মাত্র ৩,০০০। সিরাজউদ্দৌলার সৈন্যদের মধ্যে ছিল ১৫,০০০ অশ্বারোহী আর ৫৩টি ভারী কামান। কোম্পানির ৩,০০০ সৈন্যের মধ্যে ছিল ৮০০ ইউরোপীয় ও ২,০০০ ভারতীয়। সিরাজউদ্দৌলার বিশাল সৈন্যদলের পরাজয়ের একমাত্র কারণ তার সেনাপতি মীর জাফর আলী খানের বিশ্বাসঘাতকতা। মীর জাফর নামটি বিশ্বাসঘাতকের প্রতীক। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসন ও প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার পথ সূচিত হয় পলাশীর যুদ্ধে জয়লাভের ফলে।

পশ্চিম তীর (West Coast)

পশ্চিম তীর হচ্ছে ইসরাইল অধিকৃত জর্দান নদীর (NY©ª CUfc) একটি পার্বত্য সমভূমি অঞ্চল। ১৯৮৮ সালে এই পশ্চিম তীর ও গাজা ভূখণ্ড নিয়ে তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসে ফিলিস্তিন রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হয়। ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাইল যুদ্ধের ফলে পশ্চিম তীরের অনেকাংশ ইসরাইলের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। ১৯৯৩ সালের ১৩ সেপ্টেম্বর ফিলিস্তিন স্বায়ত্বশাসন চুক্তি মতে এই পশ্চিম তীরের জেরিকো শহরকে স্বায়ত্বশাসিত অঞ্চলের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে।

পাক-ভারত যুদ্ধ (Pakistan-India War)

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশদের কাছ থেকে পাকিস্তান ও ভারত স্বাধীনতা লাভ করার পর দু দেশের মধ্যে তিনটি (ঘোষিত) যুদ্ধ সংঘটিত হয়। তাছাড়া কাশ্মীর প্রশ্নে সামান্ত যুদ্ধ

তো নিত্যদিনের ঘটনা। ১৯৪৮ সালে কাশ্মীর নিয়ে প্রথম যুদ্ধ বাধে। জাতিসংঘের মধ্যস্থতায় এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৬৫ সালে কাশ্মীর নিয়ে পুনরায় দু দেশের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। সোভিয়েত রাশিয়ার মধ্যস্থতায় তাসখন্দ চুক্তির মাধ্যমে এ যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। ১৯৭১ সালে আবারও দু'দেশে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং ১৯৭২ সালে সিমলা চুক্তির মাধ্যমে এ রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। তাছাড়া ১৯৯৯ সালের মে মাসে কাশ্মীরকে নিয়ে কারগিল পর্বতশৃঙ্গে পাক-ভারত যুদ্ধ সংঘটিত হয়।

পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) (Pakistan Peoples Party)

পাকিস্তানের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক দল। জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টি (পিপিপি) গঠন করেন ১৯৬৭ সালের নভেম্বরে। ভুট্টো পিপিপি গঠনের মাধ্যমে তখনকার ক্ষমতাসীন দল মুসলিম লীগের প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রধান বিরোধী দলীয় নেতা হিসেবে আবির্ভূত হন। 'ইসলামী সমাজতন্ত্র' এই রাজনৈতিক দলের আদর্শ হিসেবে ঘোষিত হয়। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে এবং জুলফিকার আলী ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। পরে ১৯৭১ সালে পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল কেন্দ্রিক (পূর্ব পকিস্তান) স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। এ প্রেক্ষিতে জুলফিকার আলী ভুট্টো শুধু পশ্চিম পাকিস্তান অঞ্চলে সরকার গঠন করেন। ১৯৭১ থেকে ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত পিপিপি পাকিস্তানের ক্ষমতায় থাকে। ১৯৭৭ সালে পিপিপিকে ক্ষমতাচ্যুত করে সেনাবহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং পিপিপি নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোকে ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। ১৯৮৮ সালের ১৯ নভেম্বর অনুষ্ঠিত সাধারণ নির্বাচনে পিপিপির প্রতিষ্ঠাতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর কণ্যা বেনজির ভুট্টোর নেতৃত্বাধীন পিপিপি জয়লাভ করে এবং বেনজির ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রেসিডেন্ট গোলাম ইসহাক খান বেনজির ভুট্টোকে বরখাস্ত করেন ১৯৯০ সালের ৬ আগস্ট। ১৯৯৩ সালের ৭ অক্টোবর সাধারণ নির্বাচনে আবার পিপিপি জয়লাভ করে এবং বেনজির ভুট্টো দ্বিতীয়বার প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ফারুক লেঘারি পিপিপি সরকারকে বরখাস্ত করে ১৯৯৬ সালের ৫ নভেম্বর। সবশেষে ২০০২ সালের সাধারণ নির্বাচনে পিপিপি দ্বিতীয় বৃহত্তম দল হিসেবে সংসদে ৬৩টি আসন লাভ করেছে। ২০০৭ সালের ২৭ ডিসেম্বর পার্টির নেতা বেনজির ভুট্টো এক হামলায় নিহত হন। ২০০৮ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারির সাধারণ নির্বাচনে দলটি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ২০১৩ সালের সাধারণ নির্বাচনে দলটি বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

পাগল সংসদ (Mad Parliament)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দীর্ঘ ইতিহাসের প্রথম পর্যায়ের একটি পার্লামেন্ট। ১২৫৮ সালের ১১ জুন অক্সফোর্ডে এ পার্লামেন্ট বসে। তখনকার পার্লামেন্ট আজকের মতো

জনপ্রতিনিধিত্বশীল ছিল না। তৃতীয় হেনরি তখন ইংল্যান্ডের রাজা। রাজার বিরোধী ব্যারনরা এ পার্লামেন্ট বসান। রাজার সমর্থকরা এ পার্লামেন্টকে 'পাগল' অ্যাখ্যা দেন। ঐতিহাসিকেরা বলছেন, 'পাগল' বলা হলেও এ পার্লামেন্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। 'প্রভিশনস অব অক্সফোর্ড' নামে একটি নতুন সংবিধান প্রণয়ন করে। রাজার ক্ষমতা সংকুচিত করে আইন প্রণয়ন করে। রাজাকে দেয় অর্থের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য ২৪ সদস্যের একটি কমিটি গঠন করে।

পানামা খাল (Panama Canel)

পানামা খালটি উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার মধ্যে অবস্থিত একটি যোজক খাল। এটা আটলান্টিক মহাসাগর ও প্রশান্ত মহাসাগরকে যুক্ত করেছে। ১৯০৪ সালে খালটির খনন কার্য আরম্ভ হয় এবং ১৯১৪ সালে খালটি জাহাজ চলাচলের জন্য সর্বপ্রথম উন্মুক্ত করা হয়। পানামা খালের দৈর্ঘ্য ৮০ কি. কি. প্রস্থ ৯০ হতে ৩০০ মিটার এবং গভীরতা ১৩ মিটার। খালটি অতিক্রম করতে প্রায় ৭-৮ ঘণ্টা সময় লাগে। এই খালের মধ্যে দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৫০ টি জাহাজ যাতায়াত করে। যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক খালটির মালিকানা ১৯৯৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর পানামার নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। এই খালের সামরিক গুরুত্ব অপরিসীম। এই খালের মাধ্যমে যুদ্ধকালীন সময়ে আটলান্টিক মহাসগর হতে প্রশান্ত মহাসগরে জাহাজ পাঠানো সম্ভব।

পানিপথের যুদ্ধ (Battle of Panipat)

১৫২৬, ১৫৫৬ ও ১৭৬১ সালে পানিপথ (বর্তমান হরিয়ানা রাজ্যে) নামক স্থানে মোট তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৫২৬ সালে প্রথম পানিপথের যুদ্ধে বাবুর আফগান শাসক ইব্রাহিম লোদিকে পরাজিত করে দিল্লি ও আগ্রা জয় করেন এবং ভারতে মোঘল সাম্রাজ্যের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর রাজ্য শাসন করেন তার পুত্র হুমায়ন। হুমায়ুনের মৃত্যুর পর মাত্র তেরো বছর বয়সে তার পুত্র আকবর সিংহাসন আরোহন করলে সুরী বংশের শাসক আদিল শাহ সুর এবং তার সেনাপতি হেমচন্দ্র বিক্রমাদিত্য (হিমু) মোঘল সাম্রাজ্য আক্রমণ করেন। এক সময় তারা আগ্রা ও দিল্লি দখল করে নেন। মোঘল সম্রাট আকবর এবং তার অভিভাবক বৈরাম খান ১৫৫৬ সালের ১৫ নভেম্বর পানিপথের প্রান্তরে হিমুর সেনাবাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। বৈরাম খানে সমর-নৈপুণ্যে এই যুদ্ধে মোঘলরা জয়লাভ করে। সম্রাট আকবর আবার দিল্লি ও আগ্রা দখল করেন। পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধ হয় ১৭৬১ সালে। আহমদ শাহ আবদালি ও মারাঠা শক্তির মধ্যে সংঘটিত এই যুদ্ধে মারাঠারা পরাজিত হয়।

পাবলিক বিল (Public Bill)

সমগ্র জনগণের বা জনগণের বৃহত্তর অংশের স্বার্থ জড়িত আছে এমন বিলকে পাবলিক বিল বা সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল বলে। যেমন জাতীয় শিক্ষানীতি বা স্বাস্থ্যনীতি

সংক্রান্ত বিল। তেমনি অর্থবিলও (Money Bill) সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল। কারণ এগুলো সমগ্রে জনগণের স্বার্থে প্রণীত হয়।

পারমাণবিক অস্ত্রবিস্তার রোধ চুক্তি (NPT)

পারমাণবিক অস্ত্রসংক্রান্ত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি হিসেবে এটা পরিচিত। প্রধান প্রধান পারমাণবিক শক্তিশালী এটা পরিচিত। প্রধান প্রধান পারমাণবিক শক্তিশালী দেশসহ (চীন ছাড়া) বহু দেশ এ চুক্তিটি স্বাক্ষর করে ১৯৬০ সালে এবং এটি ১৯৭০ সালে কার্যকর হয়। চুক্তির শর্ত মোতাবেক পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলো অন্য কোনো পারমাণবিক শক্তির অধিকারী দেশগুলো অন্য কোনো পারমাণবিক অস্ত্র নেই, এরকম দেশের কাছে কোনো অস্ত্র বিক্রয় করতে পারবে না কিংবা অস্ত্র তৈরিতে সহযোগিতাও করতে পারবে না।

পারমাণবিক অস্ত্রবিহীন দেশও এ চুক্তি মোতাবেক কোনো পারমাণবিক অস্ত্র তৈরি করতে পারবে না কিংবা কোনো দেশের কাছ থেকেও পারমাণবিক অস্ত্র ক্রয় করতে পারবে না। তবে কিছু কিছু কারণ নির্দেশ করে চীন, পাকিস্তান, ভারত, ইসরাইল, দক্ষিণ আফ্রিকা এ চুক্তিতে সই করা থেকে বিরত রয়েছে।

পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি
(Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)

১৯৬৩ সালের ৫ আগস্ট মস্কোয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও যুক্তরাজ্যের মধ্যে ত্রিপক্ষীয় পারমাণবিক পরীক্ষা (আংশিক) নিষিদ্ধকরণ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১০ অক্টোবর, ১৯৬৩ চুক্তিটি জাতিসংঘ কর্তৃক অনুমোদিত হয় এবং ফ্রান্স ও চীন ব্যতিরেকে বহু রাষ্ট্র এ চুক্তির আওতায় আসে। এ চুক্তির মূল কথা দুটি ১. ভূ-পৃষ্ঠে, মহাশূন্যে বা সমুদ্র তলদেশে কোনো প্রকার পারমাণবিক অস্ত্রের পরীক্ষা করা যাবে না এবং ২. শুধুমাত্র ভূ-গর্ভে পারমাণবিক পরীক্ষা চালানো যাবে। তবে সেক্ষেত্রেও নিশ্চিত করতে হবে যে, পারমাণবিক বিস্ফোরণজনিত কোনো তেজস্ক্রিয় রশ্মি বা অপর কোনো ক্ষতিকর ৃবুপসর্গ যেন ভূ-পৃষ্ঠের বাইরে আসতে না পারে। চুক্তিভুক্ত কোনো দেশ ইচ্ছা করলে তিন মাসের নোটিশ সাপেক্ষে এই চুক্তির আওতা থেকে সরে আসতে পারে।

পারস্য উপসাগর (Perslan hulf)

পারস্য উপসাগর সৌদি আরবের পূর্বে ও ইরানের পশ্চিমে অবস্থিত। পারস্য উপসাগর ভারত মহাসাগরের (Indian Ocean) একটি অংশ বিশেষ। উত্তরে সাত-এল আরব মোহনা থেকে দক্ষিণে হরমুজ প্রণালী পর্যন্ত এ অঞ্চল বিস্তৃত। এ উপসাগরের চারদিকে ৮টি রাষ্ট্র অবস্থিত: বাহরাইন, ইরান, ইরাক, সৌদি আরব, সংযুক্ত আরব আমিরাত, কুয়েত, ওমান ও কাতার। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার ৮০% ইরান ও ইরাকে বাস করে। পারস্য উপসাগর অতি প্রাচীনকাল থেকেই একটি বাণিজ্যিক

পথরূপে খ্যাতি অর্জন করে আসছে। পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলের ভৌগোলিক অবস্থান, অফুরন্ত তেল সম্পদ এবং সামরিক গুরুত্বের কারণে পারস্য উপসাগর এবং এর নিকটবর্তী অঞ্চলসমূহ দীর্ঘ এক শতাব্দী ধরে বৃহৎ শক্তির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক স্বার্থ ও দ্বন্দ্বের কেন্দ্রবিন্দু হয়ে পড়েছে।

পারস্য সভ্যতা (*Persian* Civilization)

পারস্য সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন ও সৃমদ্ধ সভ্যতা। 'ইরান' কথাটির উৎপত্তি 'এরিয়ান' (Aryan) শব্দ থেকে এর অর্থ 'আর্য'। এই 'আর্য' বা 'ইরানীয়রা'ই এই সভ্যতার আদি পত্তনকারী। কালক্রমে এদের পর্সিয়ান বা পারসিক বলে অভিহিত করা হতে থাকে। দক্ষিণাঞ্চলীয় ইরানের শক্তিশালী প্রদেশ 'পার্সিস' থেকেই এ নামের উদ্ভব। 'পার্সিস' বা 'পার্স'-এর ভাষা ছিল 'পার্সি' (পার্সিয়ান)। ইরানীয় ভূ-খণ্ডে প্রথম যে রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে তার নাম 'এলাম। খ্রিস্টপূর্ব তিন হাজার অব্দের এই রাষ্ট্রটি ছিল উপজাতীদের একটি সম্মিলিত সংঘ। এর রাজধানী ছিল সুসো। এটি ছিল মোসেপটেমিয়ার সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র।

পারস্যে নতুন যুগের সুচনা হয় ২২৬ খ্রিস্টাব্দে গ্রিক ও পার্শীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে সাসানীয় রাজবংশের ক্ষমতাশীণ হওয়ার ভেতর দিয়ে। এই বংশের সম্রাটরা প্রায় চার শতাব্দী ধরে পারস্যকে শাসন করে। তাঁদের শাসনামলেই পারস্য সভ্যতা বিকাশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে। পারসিকরা এ সময় জমিতে জলসেচ ও রাজস্ব আদায় ব্যবস্থা ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে, ভূমির মাপজোক ব্যবস্থা প্রবর্তন করে, নগরসমুহে ব্যবসা-বানিজ্যর প্রসার ঘটায়, নানা ধরনের শিল্পব্যবস্থা গড়ে তোলে। বণিকেরা বাণিজ্যসূত্রে চীন ছারত, আরব ও নাইজানশিয়ামে (Byzantium) নয়মত যাতায়াত শুরু করে। আদালতগুলো মর্যাদা ও পেশা নির্বিশেষে সকলের জন্য সুবিচার নিশ্চিত করে। এই সময় গ্রিক ও সংস্কৃত ভাষায় বহু গ্রন্থ ফার্সি ভাষায় অনুদিত হয়। স্থাপন করা হয় চিকিৎসাবিদ্যা শিক্ষাদানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়। শুধু তাই নয়, বাইজানশিয়াম থেকে খ্রিস্টানদের দ্বারা বিতাড়িত গ্রিক দার্শনিকরাও পারস্যে আশ্রয় নেন এব অবাধে তাঁদের দর্শনচর্চা ও মতো প্রকাশের স্বাধীনতা লাভ করে। প্রাচীন পারস্যের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিল্পকলার ক্ষেত্রে মিশরীয়, গ্রিক ও অ্যাসেরীয় সভ্যতার সুস্পষ্ট প্রভাব পড়লেও এসব ক্ষেত্রে তাদের স্বকীয়তাও উল্লেলখযোগ্য। সুলতান মাহমুদের সভ্যকবি ফেরেদৌসী রচিত 'শাহনামা' পারস্যের জাতীয় মহাকাব্য। এটি বিশ্বসাহিত্যের এক অমুল্য সম্পদ। পারসিক উপন্যাস 'শিরি-ফরহাদ' ও এক কালোত্তীর্ণ সাহিত্যকর্ম। পারিসিকদের সবচেয়ে মৌলিক অবদান ধর্মের ক্ষেত্রে। তাদের ধর্মের নাম জজরোস্ট্রিয়ানিজম (Zoroastrinaism) বাংলার জরথুস্ত্রবাদ রাখা হয়ে হয়েছে। এটি ধর্মের প্রবর্ততক জরথুস্ত্রের নামানুসালে এই ধর্মের অনুসারীরা ছিলেন অগ্নি উপাসক। বিশ্বধর্মের ইতিহাসে এই ধর্ম প্রভূত অবদান রেখেছে। ইদুদি ও খিস্টানদের ফেরেশতা-শয়তানের ধারা এই ধর্ম থেকেই আহৃত। এর শেষ বিচার দিনের ধারণা এবং সৎ ও

সরল জীবযাপন সংক্রান্ত রীতিনীতির কিছুটা প্রবাব ইসলাম ধর্মের ক্ষেত্রেও পরিলক্ষিত। পরে পারস্য সম্রাজ্য মুসলমানদের পদানত হলে এই ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেলেও একেবারে বিলুপ্ত হয়নি।

পার্ল হারবার (Pearl Harbour)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে অবস্থিত নৌ ও বিমান ঘাঁটি। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপান পার্ল হারবারে আক্রমণ চালায় এবং ঘাঁটির ক্ষতি সাধিত হয়। এই আক্রমণের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

পিউনিক যুদ্ধ (War of *Munich)*

৮১৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে স্থাপিত উত্তর আফ্রিকার কার্থেজ রাজ্য ধীরে ধীরে এত শক্তিশালী হয়ে ওঠে যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয়-দ্বিতীয় শতাব্দীতে ভূমধ্যসাগরীয় ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠত্ব লাভের জন্য রোমের সঙ্গে মোকাবিলা করতে থাকে। এভাবে কার্থেজ ও রোমের মধ্যে তিনটি যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ইতিহাসে এগুলোকে 'পিউনিক যুদ্ধ' বলা হয়। তৃতীয় যুদ্ধে প্রায় সকল কার্থেজবাসীকে দাস করা হয় এবং সম্পূর্ণ রাজ্য বিনষ্ট করা হয়। প্রথম যুদ্ধ সংঘটিত হয় ২৬৪-২৪১ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। এ যুদ্ধের প্রধান কারণ ছিল কার্থেজবাসী কর্তৃক সিসিলি অধিকার। রোম ও কার্থেজের মধ্যে প্রথম বড় যুদ্ধ ২৬২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে সংঘটিত হয়। ২১৮-২০১ খ্রিস্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত দ্বিতীয় পিউনিক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ২০২ খ্রিস্টপূর্বাব্দে আফ্রিকায় জামা নামক স্থানে চূড়ান্ত যুদ্ধ হয়। দ্বিতীয় যুদ্ধের ভয়ংকর পরাজয় সত্ত্বেও কার্থেজ পুনর্গঠিত হয় এবং শীঘ্রই শক্তিশালী রাজ্যে পরিণত হয়। এর ফলে ১৪৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে পুনরায় রোম ও কার্থেজের সম্পূর্ণ বিনাশের ফলে সমাপ্ত হয়। পিউনিক যুদ্ধে কার্থেজের সম্পূর্ণ পরাজয়ের প্রধান কারণ ছিল ভাড়া করা ও বেতনভোগী সৈনিক। নির্দিষ্ট বেতনপ্রাপ্ত এ সৈনিকদের মধ্যে যুদ্ধ করার উৎসাহ নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু তাদের দেশপ্রেম ছিল না, যা থাকার জন্য রোমের সৈন্যরা জয়লাভ করে।

প্যালেস্টাইন মুক্তি সংস্থা (PLO)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মুসলমান, খ্রিস্টান ও ইহুদিদের পবিত্র স্থান প্যালেস্টাইন তুরস্কের সুলতানের শাসনাধীন ছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন ব্রিটিশদের দখলে চলে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশরা ইহুদিদের পক্ষে প্যালেস্টাইন ত্যাগ করলে ১৯৪৮ সালে প্যালেস্টাইনে ইহুদিরা ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। ১৯৪৮ সালে মিসর অন্যান্য আরব রাষ্ট্রের সাথে একজোট হয়ে ইসরাইল আক্রমণ করে এবং পরাজিত হয়। অতঃপর ১৯৫৬, ১৯৬৭, ১৯৬৮ এবং ১৯৭৩ সালে আরবদের সাথে ইসরাইলের যুদ্ধ হয় এবং প্রত্যেকবারই আরবরা পরাজিত হয়। এমতাবস্থায় স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য

প্রখ্যাত গেরিলা নেতা ইয়াসির আরাফাত পিএলও সংস্থা গড়ে তোলেন। প্যালেস্টাইনকে মুক্ত করার জন্য ইয়াসির আরাফাত বিশাল গেরিলা বাহিনী গঠন করেন। ১৯৮৮ সালে প্যালেস্টাইনকে রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয় এবং ইয়াসির আরাফাত প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। জাতিসংঘ পিএলও-কে স্বীকার করে নিয়েছে। ইসরাইল সরকার প্যালেস্টাইনি গেরিলাদের ভয়ে ভীত হয়ে তাদের অবস্থানের ওপর বারবার আঘাত হানে। গেরিলাদের প্রধান অবস্থান লেবাননের রাজধানী বৈরুতে বারবার হামলা করে ধ্বংসস্তূপে পরিণত করা হয়। পিএলওর দাবির ব্যাপারে বর্তমানে সমগ্র পৃথিবী সোচ্চার। বৃহৎ শক্তিবর্গের সহায়তায় বর্তমানে ইসরাইল, আরব দেশসমূহ এবং পিএলওর মধ্যে শান্তিচুক্তি স্থাপিত হয়েছে। ১৯৯৩ সালের ১০ সেপ্টেম্বর পিএলও-ইসরাইল পরস্পরকে স্বীকৃতি দেয় এবং ১৩ সেপ্টেম্বর পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্তশাসন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এরপর বিভিন্ন ইস্যুতে তৎকালীন ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী আইজ্যাক রবিনের সাথে পিএলওর মতপ্রার্থক্য দূর হচ্ছিল। তিনি আততায়ীর গুলোতে নিহত হলে রবিনসন প্যারেজ তার অনুসৃত নীতিতে বহাল থাকেন। কিন্তু প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানেয়াহু প্রথম দিকে পিএলও-এর ওপর যথেষ্ট আন্তরিক ছিলেন না। এ বিষয়টিতে পিএলওসহ আরব তথা সমগ্র বিশ্ব উভয় দেশের মধ্যে মতপ্রার্থক্য দূর করার জন্য বিশেষভাবে ইসরাইলকে চাপ দিতে থাকে। তবে ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০০১ নির্বাচনে কট্টরপন্থী নেতা অ্যারিয়েল শ্যারন ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হয়ে যে আপোসহীন মনোভাব ব্যক্ত করেন তাতে নতুন করে শান্তি প্রক্রিয়ার অবসান ঘটে।

পিটিআই (PTI)

১৯৪৭ সালের ২৭ আগস্ট ভারতে পিটি সহ আইটি প্রতিষ্ঠিত হয়। রয়টার্স ও অ্যাসোসিয়েটেড প্রেস অফ ইন্ডিয়া (এপি) থেকে বিভিন্ন হয়ে গড়ে ওঠে এই সংবাদ সংস্থাটি। ভারতে এর মোট ১২৪টি নিউজ ব্যুরো আছে। চারটি মেট্রো শহরে এর অফিস বর্তমান।

পিটিশন অব রাইট (Petition of Right)

ব্রিটেনে সাধারণ মানুষের অধিকার ও পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে একটি মাইলফলক হলো পিটিশন অব রাইট। ১৬২৮ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট রাজা প্রথম চার্লসের কাছে এটি উপস্থাপন করা হয়। পিটিশন অব রাইট 'প্রজাদের অধিকার ও স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' বলে খ্যাত। মূলত ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার দ্বন্দ্বের ফলে এটি স্বাক্ষরিত হয়। এ ঘোষাণাপত্রের চারটি ধারা ছিল। এক. পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজাকে কোনো নাগরিক কোনো প্রকার দান, ঋণ, কর বা কোনো অর্থ দিতে বাধ্য হবেন না; দুই. কারণ না দেখিয়ে কোনো মানুষকে বন্দী বা গ্রেফতার করা যাবে না; তিন. সৈন্যদের আবাসনের ব্যবস্থা করতে নাগরিকদের বাধ্য করা যাবে না; চার. রাজা সামরিক শাসন জারি করতে পারবেন না।

পিটিশন অব রাইটকে অনেকে ঐতিহাসিক ম্যাগনাকার্টার পর ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় সাংবিধানিক অগ্রগতি বলে চিহ্নিত করেন। পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া রাজার করারোপ ক্ষমতা রহিত হয়। ফলে আর্থিক বিষয়াবলির ওপর পার্লামেন্টের ক্ষমতা ও প্রভাব বৃদ্ধি পায়।

পিটিশন (Petition)

সাধারণভাবে পিটিশন হলো কোনো কর্মকর্তা, সরকারি অফিস বা অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের কাছে প্রেরিত অনুরোধ বা আবেদন পত্র। পার্লামেন্টারি পরিভাষায় পিটিশন হলো নাগরিকদের বা ভোটারদের পক্ষ থেকে কোনো বিষয়ে পার্লামেন্টকে অবহিত করার অধিকার। পিটিশন পার্লামেন্টে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠী বা কোনো প্রতিষ্ঠান করতে পারে। নাগরিকদের পিটিশন পার্লামেন্টে সংসদ সদস্যরা উপস্থাপন করেন। মার্কিন কংগ্রেসে পিটিশনগুলোকে মেমোরিয়ালও (Memorial) বলা হয়। কংগ্রেসের সঙ্গে রাজ্য আইনসভাগুলোর সকল যোগাযোগ মেমোরিয়ালের মাধ্যমে হয়।

জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয় বা এমন কোনো পরিস্থিতি যা বিদ্যমান আইন ও বিধি অনুযায়ী মোকাবিলা করা যায় না সে সম্পর্কে পিটিশন করা হয়। পিটিশনের অধিকার একদিনে স্বীকৃত হয় নি। জনগণের অভাব অভিযোগ জানার জন্য পিটিশন করার অধিকার ব্রিটিশ রাজনীতিতে প্রথম স্বীকৃত হয় রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের (১২৩৯-১৩০৭) সময়। বলা হয় এটি রাজা প্রথম এডওয়ার্ডের একটি আবিষ্কার (innovation)।

পিটিশন হাতে লিখে স্বাক্ষর করে দিতে হয়। যে বিষয়ে পিটিশন করা হয় সে সম্পর্কে আবেদনকারীর প্রার্থনা উল্লেখ করতে হয়। কোনো বেসরকারি বিলের পক্ষ-বিপক্ষে, সংসদের অনিষ্পন্ন কাজ এবং জনগুরুত্বপূর্ণ যেকোনো বিষয় সম্পর্কে পিটিশন করা হয়। তবে আদালতে বিচারাধীন কোনো বিষয়, সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের মাধ্যমে উত্থাপনযোগ্য এবং আইন, বিধি, উপবিধি বা প্রবিধানের মাধ্যমে সমাধান করা যায় এমন বিষয়ে পিটিশন করা যায় না।

সংসদ সদস্য ছাপা একটি ফরমের মাধ্যমে পিটিশন উত্থাপন করেন। তিনি একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি দেন। কিন্তু বিবৃতির ওপর কোনো বিতর্ক হয় না। পিটিশন সংসদ সচিবের কাছে দেয়া যায় বা সদস্য নিজে সংসদে তা উপস্থাপন করতে পারেন।

পিটিশন সঙ্গে সঙ্গে পিটিশন কমিটিতে চলে যায়। জনগণের দাবি ও মতামত জানার জন্য পিটিশন ব্যবস্থা একটি ফলদায়ক উপায়। সকল সংসদের পিটিশন গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হয়। প্রথমদিকে সংসদে যখন সর্বজনীন প্রতিনিধিত্ব হতো না তখন পিটিশন অনগ্রসর সমাজ ও শ্রেণির আবেদন তুলে ধরার জন্য খুব কার্যকর বলে মনে হতো। এখন সংসদে প্রশ্ন উত্থাপন বা সংসদ সদস্যগণ কর্তৃক জনগুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা করার সুযোগ ও পরিসর বৃদ্ধি পাওয়ায় পিটিশনের গুরুত্ব কিছুটা কমেছে।

পিতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Patriarchal Theory)

এটি রাষ্ট্রের উৎপত্তি সংক্রান্ত মতবাদগুলোর মধ্যে প্রাচীন। এর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো, পূর্বে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার প্রথা প্রচলিত ছিল। পিতৃতান্ত্রিক পরিবারই সম্প্রসারিত হয়ে পরবর্তীতে রাষ্ট্রের জন্ম দেয়। কয়েকটি পরিবার একত্রে মিলিত হয়ে গড়ে তোলে গোত্র, গোত্র গড়ে তোলে উপজাতি। উপজাতীয় প্রধান হতেন কোনো না কোনো পরিবারের কর্তা ব্যক্তি। কয়েকটি উপজাতি মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছে বলে অনেকের ধারণা। সেখানেও পুরুষ ব্যক্তি শাসন ক্ষমতা গ্রহণ করে। এ মতাদর্শের প্রধান প্রবক্তা হলেন স্যার হেনরী মেইন। The Ancient Law (1861) এবং Early History of Institution (1875) গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তার কথায়, রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে। রাষ্ট্র হলো পরিবারের সম্প্রসারিত একটি রূপ। রাষ্ট্রের প্রধান হলেন একজন পিতা বা পুরুষ, সুতরাং রাষ্ট্রের জনসাধারণ তার সন্তানতুল্য। হেনরী মেইন এসব উদাহরণ দিয়েছেন ইহুদীদের ধর্মগ্রন্থ Old Testament থেকে। রোম এবং এথেন্সে এ রকম প্রমাণ পাওয়া যায়। সেখানে পরিবারের কর্তাদের সীমাহীন ক্ষমতা প্রদান করা হয়। ভারতের পরিবার ব্যবস্থার প্রতিও ইঙ্গিত প্রদান করা হয়। তত্ত্ব অনুসারে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে যে রাষ্ট্র গঠিত হয়েছে তার মূল তিনটি বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় যথা; আত্মীয়তার সম্পর্ক, স্থায়ী বিবাহ এবং পুরুষানুক্রমিক কর্তৃত্ব (Kinship, Permanent Marriage and Paternal Authority)। ক্ষমতা এক পুরুষের কাছে থেকে অন্য পুরুষ ব্যক্তি পাবে। মানুষকে গণ্য করা হয় তার গোষ্ঠীর সাথে যোগসূত্র স্থাপনে এবং সেটা হয় পুরুষ সদস্য হিসেবে। স্থায়ী বিবাহের দ্বারা কেবল এ রকম সম্বন্ধ স্থাপিত হতে পারে। নারী-পুরুষের স্থায়ী বিবাহ বন্ধনে সন্তানের জন্ম হয়। তারা সকলে মিলিত হয়ে পরিবার গঠন করে। প্রত্যেকের মধ্যে যোগসূত্র হয় ঘনিষ্ঠ, কেননা সেখানে রক্তের টান থাকে। পরিবারের প্রধানের ওপর অর্পিত থাকে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দানের ক্ষমতা। সুতরাং পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে যে রাষ্ট্র হয়েছে তা মূলত পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের মাধ্যমেই সম্ভব। কিন্তু বিজ্ঞানের যুগে প্রায় সবই প্রমাণ ছাড়া বিশ্বাসযোগ্য নয়, তাই পিতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি তা তেমন যুক্তিপূর্ণ নয়। ম্যাকলিনাল, মরগান ও হেনরী লুইস এর সমালোচনা করেছেন। সকল পরিবারে যে পিতা বা পুরুষের প্রাধান্য থাকে তা সঠিক নয়। কারও কারও মতে, " পিতৃতান্ত্রিক পরিবার পরে গড়ে উঠেছে। এমনও সমাজের প্রমাণ পাওয়া যায় যে, সেখানে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের পরে পিতৃতান্ত্রিক পরিবারের সৃষ্টি হয়েছে। তাই রাষ্ট্র যে পিতৃতান্ত্রিক পরিবার সম্প্রসারণে জন্মলাভ করেছে তা বলা যথার্থ ও যুক্তিসঙ্গত নয়। অবশ্য এ মতবাদ যেভাবেই সমালোচিত হোক না কেন, পরিবার আদিমতোম প্রতিষ্ঠান এবং তা বর্ধিত হয়ে যে রাষ্ট্রের সৃষ্টি সেকথা কেউ অস্বীকার করতে পারে না। মতবাদের মধ্যে স্থায়ী বিবাহ, গোষ্ঠী প্রীতি, রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা ইত্যাদির প্রতি মর্যাদা আরোপ করা হয়েছে। (সূত্রঃ ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

পুঁজিবাদ (Capitalism)

পুঁজিবাদ বা ধণতন্ত্র (ইংরেজি: Capitalism) বলতে এমন একটি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বোঝানো হয় যেখানে বাজার অর্থনীতিতে মুনাফা তৈরির লক্ষ্যে বাণিজ্য, কারখানা এবং উৎপাদনের উপকরণসমূহের ওপর ব্যাক্তিগত মালিকানার নিয়ন্ত্রণ থাকে।

পুঁজিবাদের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য অন্তর্ভূক্ত করে পুঁজির সঞ্চয়ণ, প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার এবং শ্রমিকের মজুরি। এটি হলোও সেই সমাজ সংগঠন যাতে পণ্য সম্পর্ক, মানে কেনাবেচার সম্পর্ক জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ে। এখানে পরিবার ও রাষ্ট্র থাকে। তবে পরিবার ক্রমাগত নিঃসঙ্গ পর্যায়ে নিছক বাণিজ্যিক বোঝাপড়ার জায়গায় গিয়ে ঠেকে। রাষ্ট্র এখানে জবরদস্তির হাতিয়ারগুলো ধরে রাখে। তবে ক্রমেই সে বাণিজ্যিক স্বার্থের খপ্পরে পড়ে, তার কার্যক্রম সম্প্রদায়ের পক্ষ হতে সেবা কেনাবেচার দালালিতে গিয়ে ঠেকে। এটি সমাজতন্ত্রের বিপরীত একটি অর্থব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থায় একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো ক্রেতা ও বিক্রেতার মধ্যে অবাধ প্রতিযোগিতা। এই অবাধ প্রতিযোগিতার মাধ্যমে দ্রব্যের দাম নির্ধারণ করা হয়। এই ধরনের অর্থব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের জন্য আলাদা কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে না। সয়ংক্রিয় একটি মূল্যব্যবস্থার মাধ্যমেই সবকিছু নির্ধারিত হয়। পুঁজিবাদীর কাজ হলো উৎপন্ন সামগ্রী বা পণ্য বাজারে বিক্রি করে মুনাফা অর্জন করা। পুঁজিবাদের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য হলো উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ে ব্যক্তিগত মালিকানা, বাজার অর্থনীতি ও শ্রম বিভাজন।

মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের একটি পর্যায় হলো পুঁজিবাদ এবং পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের মোটামুটি দুটি শ্রেণিতে সেই সমাজ থাকে বিভক্ত। শ্রমিকদের শ্রম থেকে অর্জিত উদ্বৃত্ত মূল্যে ভিত্তিতে পুঁজিবাদী তথা বুর্জোয়া শ্রেণি মূলধন সঞ্চয় করে ; শ্রমিক তথা সর্বহারা শ্রেণির কিছু সঞ্চিত হয় না, তারা বিত্তহীন থাকে। তত্ত্বটি মূলত মার্কসের।

এ ছাড়াও পুঁজিবাদের প্রকারভেদ আছে, যথা বাণিজ্যিক পুঁজিবাদ, কলকারখানা শিল্পের পুঁজিবাদ, আর্থিক পুঁজিবাদ (ইনিসিওরেন্স; ব্যাঙ্ক) ও রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ (যে অর্থনীতিতে জনকল্যাণকল্পে সরকার সরাসরি শিল্পবাণিজ্যে নামে)।

পুঁজিবাদের উদ্ভব ঘটে সামন্ততন্ত্রের মধ্যে; সেদিক থেকে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা অপেক্ষাকৃতভাবে অধিক প্রগতিশীল। পুঁজিবাদী উৎপাদন প্রণালীতে নৈপুণ্য ও সহযোগ থাকে, বিপুল সংখ্যক মানুষ একত্র কাজ করে ; সেটা উৎপাদনের সমাজীকরণের পক্ষে অনুকূল। কিন্তু শ্রমিকদের পরিশ্রমের পরিশ্রমের ক্রমবর্ধিষ্ণু যে ফসল মুনাফায় পরিণত হয়, সেই মুনাফা পুঁজিবাদী মালিকেরা ভোগ করে। উৎপাদনের সামাজিক চরিত্র এবং মুনাফার সেরকারি পুঁজিবাদী বণ্টনের মধ্যে পুঁজিবাদের অন্তর্বিরোধ নিহিত; সেখানেই পুঁজিবাদী শ্রেণির বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রাম উৎসারিত হয়, যেটা সর্বনাশা অর্থনৈতিক সংকটের দিকে সমাজকে নিয়ে যায়। মার্কসীয় তত্ত্বানুসারে সমাজ-বিবর্তনের বাস্তবানুগ ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যানুসারে সামাজিক পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে উপনীত

হয় যেখানে পুঁজিবাদের স্থান নিয়ে নেয় অধিকতর প্রগতিবাদী সমাজতন্ত্রী ব্যবস্থা। ঐতিহাসিক নির্দেশ্যবাদের অনিবার্য নিয়মে উৎপাদন সম্পর্ক এবং উৎপাদন শক্তির সামঞ্জস্য ঘটে।

পুঁজিবাদ, মুমূর্ষু (Moribund Capitalism)

পুঁজিবাদের বস্তুবাদী তত্ত্বানুযায়ী প্রতিটি সমাজব্যবস্থা তার চূড়ান্ত পরিণতিতে পৌঁছালে 'নিরাকরণের নিরাকরণ' প্রক্রিয়ায় তা অবক্ষয়িত হয়ে এক পর্যায়ে নতুন সমাজব্যবস্থার উদ্ভব হয়। এর মাধ্যমে অবলুপ্ত হয়ে যায় পুরাতন সমাজব্যবস্থা। বস্তুবাদীরা আরও মনে করেন যে, বহুজাতির কর্পোরেশন ও শিল্প গড়ে ওঠার মধ্য দিয়ে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত অবস্থায় পৌঁছে যায় এবং তার অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়। এই অবক্ষয়কে ঠেকানোর জন্যই পুঁজিবাদী ও সাম্রাজ্যবাদীরা বুনিয়াদি পুঁজিবাদের পথ থেকে সরে গিয়ে শ্রমিকদের উচ্চতর মজুরি দিতে বাধ্য হচ্ছে। বাজারে ক্রমবর্ধমান হারে শেয়ার ছাড়তে এবং একের পর এক কনসেশন দিতে বাধ্য হচ্ছে। সমাজতান্ত্রিক বিশ্বের আর্বিভাব ও বিকাশের ফলে পুঁজিবাদ ও সম্রাজ্যবাদের ধ্বংসের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয় বলেও সমাজতন্ত্রীরা দাবি করতেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ধ্বংসমুখী এই পুঁজিবাদকেই তাঁরা মুমূর্ষু পুঁজিবাদ বলে অভিহিত করতেন। অপরদিকে, সমাজতন্ত্র বিরোধীরা মনে করেন যে, পুঁজিবাদ আদৌ মুমূর্ষু নয়। তাঁদের মতে, যেটাকে আপোস বলে মনে হচ্ছে, সেটা আসলে বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উৎপাদনের উন্নততর বিকাশজনিত পরিস্থিতির ও পুঁজিবাদের মানবিক ও যৌক্তির দিকেরই অনিবার্য ফসল। তাঁরা আরও মনে করেন যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর জন্যই পুঁজিবাদ বরং দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে এবং সমাজতন্ত্রই বস্তুত এক অচল মুমূর্ষু ব্যবস্থায় পরিণত হয়েছে। (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

পুঁজিবাদ, রাষ্ট্রীয় (State Capitalism)

রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ হলো এমন এক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদন ও বন্টন ব্যবস্থা সমগ্র পুঁজিপতি শ্রেণির প্রতিনিধি হিসেবে রাষ্ট্র দ্বারা পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়। এই ব্যবস্থায় শিল্পসমূহের বিনিয়োগিত সমগ্র ও আংশিক পুঁজির মালিক রাষ্ট্র। রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় শিল্পপতিরাও শিল্পপুঁজির মালিক হতে পারেন বটে, তবে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রই পুঁজিপতিদের পক্ষে শিল্প নিয়ন্ত্রণ করে। কেউ-কেউ রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদকে সমাজতন্ত্র বলে চালানো চেষ্টা করেন। বস্তুত রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ ভিন্ন জিনিস। কারণ, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদ সমগ্র জনগণের স্বার্থে নয়, বরং পুঁজিপতি শ্রেণি ও তাদের প্রতিনিধি আমলাতন্ত্র প্রমূখের স্বার্থেই বলবৎ থাকে। তদুপরি রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের ক্ষেত্রে বুর্জোয়ারাই রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, সর্বহারারা বা তাদের প্রতিনিধিরা নয়। মোটকথা রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদও সকল অর্থেই পুঁজিবাদ ও শোষণমূলক।

পুঁজির কেন্দ্রীকরণ (Concentration of Capital)

সাধারণত বিভিন্ন শিল্প ও ব্যাবসা প্রতিষ্ঠানের একত্রীকরনের ফলে পুঁজির যে একত্রীকরণ ঘটে, তাকেই বলে পুঁজির কেন্দ্রীকরণ। যখন বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ঐকমত্যের ভিত্তিতে একত্রীভূত হয়ে যায় তখন এই কেন্দ্রীকরণ আপোসেই হতে পারে। আবার, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্যে বৈরী প্রতিযোগিতা সৃষ্টি হলে, ফলশ্রুতিতে দুর্বলতর প্রতিষ্ঠানসমূহ অস্তিত্ব হারিয়ে বৃহত্তর প্রতিষ্ঠানসমূহের উদরস্থ হয়ে গিয়েও পুঁজির কেন্দ্রীকরণ ঘটাতে পারে।

পূর্ণাঙ্গ বা চরম ভেটো (Absolute Veto)

রাষ্ট্রপতি কোনো বিল সম্মতি জ্ঞাপন করতে সরাসরি অস্বীকার করার ক্ষমতাকে পূর্ণাঙ্গ বা চরম ভেটো বলা হয়। তখন বিলটি আইনে পরিণত হয় না বা বাতিল হয়ে যায়। বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকারের আমলে এই ব্যবস্থা কার্যকর ছিল। মূল সংবিধানে রাষ্ট্রপতির চরম ভেটো প্রণয়নের কোনো বিধান ছিল না, বর্তমানেও নেই। বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার বিদ্যমান থাকাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি অনুরূপ ক্ষমতা প্রয়োগ করেনি। বর্তমানে ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির ভেটো প্রয়োগের বিধান রয়েছে। ভারতের সংবিধানে রাষ্ট্রপতিকে এই ক্ষমতা দেবার উদ্দেশ্য, আইনসভার হঠকারী ও অবিবেচনাপ্রসূত কাজ প্রতিরোধ করা। ব্রিটেনের রাজা বা রানির বিলে ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা আছে। রানী এ্যানী (Anne) ১৭০৭ সালে স্কটিশ মিলিশিয়া বিলে চরম ভেটো প্রয়োগ করেন। তারপর থেকে ব্রিটেনের চরম ভেটো কোনো রাজা বা রানি ভেটো প্রয়োগ করেনি। এই ক্ষমতা ব্রিটেনের রাজা বা রানির পরমাধিকার। বর্তমানে চরম রাজতন্ত্রের পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক বা সাংবিধানিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় রাজা বা রানির এই ক্ষমতা অপ্রচলিত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে রাষ্ট্রপতির চরম ভেটো প্রয়োগের ক্ষমতা নেই। কারণ যুক্তরাষ্ট্রে 'নিয়ন্ত্রণ ও ভারসাম্য নীতি' (Check and Balance) নীতি অকার্যকর হয়ে পড়বে এবং জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তৈরি আইনসভা (সিনেট) অর্থহীন হয়ে দাঁড়ায়।

পুলিৎজার পুরস্কার (*Pulitzer* Prize)

হাঙ্গেরি থেকে অভিবাসী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিখ্যাত সাংবাদিক জোসেফ পুলিৎজারের (১৮৪৭-১৯১১) নামানুসারে প্রবর্তিত পুরস্কারেরের রেখে যাওয়া অর্থ থেকে প্রতি বছর সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সঙ্গীতে যারা অবদান রাখেন তাদেরকে পুরস্কার দেয়া হয়। প্রতি বছর সাংবাদিকতায় ১৪ জন, সাহিত্যে ৬ জন এবং সঙ্গীতে ১ জনকে পুরস্কারে ভূষিত করা হয়। উপদেষ্টা বোর্ড কর্তৃক নির্বাচিত ব্যক্তিদেরকে নিউইয়র্কের কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ পুরস্কার দিয়ে থাকে। ১৯১৭ সাল থেকে এ পুরস্কার প্রদান শুরু হয়েছে। প্রতি বছর মে মাসে এ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়। পুরস্কারের মূল্যমান পূর্বে ছিল ৫০০ ডলার। বর্তমানে প্রতিটি পুরস্কারের মূল্যমান ৫ হাজার ডলার।

পুলিশী-রাষ্ট্র (Police State)

আধুনিক রাষ্ট্র কল্যাণমূলক রাষ্ট্র নয়, বরং পুলিশী রাষ্ট্র। যে রাষ্ট্রে সরকার সরকার তার বিরোধীপক্ষকে বেপরোয়াভাবে দমন করার জন্য পুলিশ, বিশেষত গোয়েন্দা পুলিশকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে সে রাষ্ট্রকে পুলিশী রাষ্ট্র বলা হয়। এই ধরনের রাষ্ট্রে সরকারের কর্তৃত্ববাদী চেহারা ফুটে ওঠে। কিংবা এই রাষ্ট্র কার্যত পুলিশরাই সর্বেসর্বা, সে কারণে রাষ্ট্রকেই পুলিশী রাষ্ট্র বলা হয়। এই ধরনের রাষ্ট্রকে জনকল্যাণমূলক রাষ্ট্রের বিপরীত রাষ্ট্র বলা যেতে পারে।

পূর্ণ কর্মসংস্থান (Full Employment)

লর্ড বিভারীজ তাঁর প্রণীত 'মুক্ত সমাজে পূর্ণ কর্মসংস্থান' (Full Employment in a Free Society) নামক গ্রন্থে এই কথাটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন যে, এটি হল এমন একটি অবস্থা, যে অবস্থায় বেকার মানুষের চাইতে কর্মখালির পরিমাণ অধিক থাকে। বলা বাহুল্য, এই পরিস্থিতিতে কর্মখালি এবং বেকার দুয়েরই অস্তিত্ব থাকলেও কর্মখালি থাকে অনুপাতে বেশি। এ-প্রসঙ্গে আরও ব্যাখ্যা দিয়ে তিনি বলেন যে, যুক্তরাষ্ট্র বেকারের পরিমাণ ৩%-এর অধিক হলে তা পূর্ণ কর্মসংস্থানের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ হবে না। তাঁর সংজ্ঞানুযায়ী অক্ষম এবং অনিচ্ছুকরা যথার্থ বেকার পর্যায়ভূক্ত নয়।

পেটি বুর্জোয়া (Petti-bourgeois)

পেটিবুর্জোয়া কথাটির অর্থ ছোট বা ক্ষুদ্র বুর্জোয়া। সর্বহারা ও বুর্জোয়ার মাঝামাঝি স্তর হলো পেটি বুর্জোয়া। পেটি বুর্জোয়ারাও উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিক হয়ে উদ্বৃত্ত মূল্য শোষণ করতে পারে ; অপরদিকে এরা বুর্জোয়াদের দ্বারা শোষিতও হয়ে থাকে। ফলে এদের চরিত্রের মধ্যে থাকে দ্বৈততা ও দোদুল্যমানতা বিদ্যমান। এরা বুর্জোয়াদের ওপর ক্ষুদ্ধও থাকে, আবার আপোস করতে দ্বিধা করে না। এরা নিজেরাও যৎকিঞ্চিৎ উৎপাদনের উপায়ের মালিক বিধায় এরা ঝুঁকিপূর্ণ কোনো আন্দোলনে অংশ নিতে ভয় পায়। এজন্য সমাজতন্ত্রীরা এদের বিপ্লবী বলে বিবেচনা করে না। তবে, জাতীয় বিপ্লবে এরা সমাজতন্ত্রীদের মিত্র হয়ে কাজ করে।

(সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

পেন্টাগন (Pantagon)

পেন্টাগন হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজধানী ওয়াশিংটন ডি.সি তে অবস্থিত একটি পাঁচ কোণবিশিষ্ট দালান। পাঁচ দিক বা কোণবিশিষ্ট বলেই এর নাম পেন্টাগন। এই দালানেই মার্কিন প্রতিরক্ষা বিভাগের সদর দফতর অবস্থিত। বর্তমানে পেন্টাগন (Pantagon) বলতে শুধু এই ভবনটিকেই বোঝায় না, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা কর্তৃপক্ষকেও বোঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সকল প্রতিরক্ষা কার্যক্রম পেন্টাগন থেকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

পেরেস্ত্রোইকা (Perestroika)

পেরেস্ত্রোইকা শব্দের অর্থ হলো সংস্কার বা পুনর্গঠন। সাবেক সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির সাধারণ সম্পাদক মিখাইল গর্বাচেভ দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সংস্কার সাধনের জন্য তা তুলে ধরতে শুরু করেন। আর এর মূল লক্ষ হচ্ছে, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র। তার মতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক স্থবিরতা থেকে কেটে উঠে বৈপ্লবিক পরিবর্তনের নামই পেরেস্ত্রোইকা। সোভিয়েত নেতা মিখাইল গর্বাচভ ঘোষিত অর্থনৈতিক সংস্কারনীতিই পেরেস্ত্রোইকা (Perestroika) নামে খ্যাত। তিনি পুরাতন সমাজতান্ত্রিক ধারণা থেকে বেরিয়ে এসে তাঁর গ্ল্যাসনস্ত বা খোলানীতির সঙ্গে সংগতি রেখে সোভিয়েত ইউনিয়নে উদারনৈতিক অর্থনীতি প্রবর্তনের এই উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ফলে ১৯৮৭ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপীয় কমিউনিস্ট দেশসমূহে নয়া অর্থনৈতিক হাওয়া বইতে শুরু করে। এরই সূত্র ধরে মার্কসবাদ আনুষ্ঠানিকভাবে বর্জিত হয়, স্ট্যালিন কঠোরভাবে সমালোচিত হন, খোদ লেনিনের রচনাবলীর বহ্ন্যুৎসব করা হয়, বহুদলীয় গণতন্ত্র প্রবর্তন করা হয়, ধর্ম, ব্যাক্তিমালিকানা ইত্যাদির পুনঃপ্রচলন শুরু করা হয় এবং একদা-বর্জিত বুর্জোয়া কালচারকে আবার অবাহন জানানো হয়। এরই ফলশ্রুতিতে সমাজতান্ত্রিক পূর্ব-জার্মানি স্বীয় অস্তিত্ব বিলুপ্ত করে পশ্চিম জার্মানির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং ১৯৯১ সালে 'ইউনিয়ন অব সোস্যালিস্ট সোভেয়েত রিপাবলিকস' পরিবর্তন করে সাভিয়েত ইউনিয়নের নতুন নামকরণ করা হয় 'ইউনিয়ন অব সভারিন সোভিয়েত রিপাবলিকস'। কিন্তু এটাও ছিল ক্ষণস্থায়ী। অচিরেই সোভিয়েত ইউনিয়নও ভেঙে যায়।

পৌর অধিকার (Civil Rights)

প্রত্যয়টি নাগরিক অধিকারের সাথে যুক্ত। নাগরিকরা আইনের দ্বারা বেষ্টিত যেসব অধিকার ভোগ করে থাকে। বলা যায়, মূলত নাগরিক হওয়ার দরুণ যেসব অধিকার লোকে ভোগ করে, এবং আইনের দ্বারা সেইসব অধিকার রক্ষিত হয়। প্রত্যয়টি মানবাধিকারের সমান যার পেছনে আইনানুগ সমর্থন সব ক্ষেত্রে থাকে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য দুটি প্রত্যয়ই সমার্থকভাবে প্রচলিত, একটির অস্বীকার মানে অপরটির অস্বীকার। তবে ইংল্যান্ডসহ বিভিন্ন দেশে পৌর অধিকার ব্যক্তি স্বাধীনতা অর্থে অধিক ব্যবহৃত ও প্রচলিত। মূল তাৎপর্য হলো রাষ্ট্র সমেতো অন্যদের প্রতি নির্দেশ যে, ব্যক্তিকে তার কাজেকর্মে ও চিন্তাভাবনায় অধিকার বা স্বাধীনতা দেওয়া। এর আওতায় কাজের অধিকার আসে কিনা সেটা তর্কসাপেক্ষ। কারণ সে ক্ষেত্রে ব্যক্তি নয়, রাষ্ট্রের ওপরই পূর্ণ কর্মসংস্থানের নির্দেশ বোঝায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানে পৌর অধিকার অন্তর্ভুক্ত হওয়া সত্ত্বেও কৃষ্ণবর্ণ নাগরিকদের সেই অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সূত্রে ১৯৬৪ সালে পৌর অধিকার আইন বিধিবদ্ধ হয়, তাতে বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে কিছু ধারা সংযোজিত হয়। কিন্তু কার্যত কোনো সুফল না হওয়ায়, অর্থাৎ আইন যথোচিতভাবে অনুসৃত না হওয়ার পৌর অধিকারের দাবিতে আন্দোলন গড়ে ওঠে।

বর্তমানে বাংলাদেশে স্থানীয় পর্যায় থেকে শুরু করে জাতীয় পর্যায়ে এ ধরনের নাগরিক অধিকার বিস্তৃত রয়েছে। নাগরিকরা আইনের অধীনে থেকে এ ধরনের অধিকার ভোগ করতে পারে।

প্যারা কমিউন (Para-commune)

বিশ্ব ইতিহাসের সর্বপ্রথম সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্রশক্তিই প্যারি কমিউন ছিল। ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ প্যারির শ্রমিকশ্রেণি এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে। সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে নির্বাচনের মাধ্যমে প্যারি কমিউন প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু প্যারির সর্বহারাদের সাংগঠনিক শক্তি তখনও পরিপক্বতা লাভ করেনি। প্রতিবিপ্লবীদের প্রতি কমিউন নেতাদের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল অত্যন্ত নরম। ফলে, যথাসময়ে প্রতিবিপ্লবীদের ওপর সামরিক আক্রমণ চালাতেও কমিউন ব্যর্থ হয়। পরিণামে প্রতিক্রিয়ার শক্তিসমূহ পুনরায় সংঘবদ্ধ হয়ে পড়ে, রাষ্ট্রক্ষমতা পুনরায় দখল করে ফেলে এবং নৃশংস বর্বরতার সঙ্গে বিপ্লবে অংশগ্রহণকারীদের ধ্বংস করে দেয়। মাত্র ৭২ দিন ক্ষমতায় থাকার পর ২৮ মে প্যারি কমিউনের পতন ঘটে (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

প্যারা মিলিটারি (Para-military)

সাধারণত প্যারা মিলিটারি একটি আধা সামরিক বা অনিয়মিত সামরিক বাহিনী। যারা সার্বক্ষণিক, বেতনভূক্ত ও নিয়মিত সামরিক বাহিনীর সদস্য নয় তবে সামরিক ট্রেনিংপ্রাপ্ত ও প্রয়োজনে দেশরক্ষার কাজে অংশ নিতে সমর্থ ও প্রস্তুত, তাদের সমন্বিত রূপই হল প্যারা মিলিটারি বা আধা সামরিক বাহিনী।

প্যারিস শান্তি চুক্তি (Paris Peace Accords)

১৯৭৩ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিস যুক্তরাষ্ট্র ও ভিয়েতনামের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় প্যারিস শান্তি চুক্তি। এ চুক্তির লক্ষ্য ছির ভিয়েতনাম ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে দীর্ঘদিনের দ্বন্দ্ব নিরসন। চুক্তির ফলে দু'দেশের মধ্যকার দীর্ঘদিনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের অবসান ঘটে।

প্রকৃত ব্যয় (Real Cost)

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে যে পরিমাণ পরিশ্রম এবং ব্যয়ের প্রয়োজন হয় তাকেই প্রকৃত ব্যয় বলা হয়। কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে উৎপাদনকারীর নিজের এবং তার শ্রমিকদের পরিশ্রম এবং মুলধন সঞ্চয়ীদের মানসিক অশান্তি প্রভৃতি উৎপাদনের প্রকৃত ব্যয়। শ্রমিক পরিশ্রম করতে যে কষ্ট অনুভব করে, যে ক্লান্তি ভোগ করে তাই শ্রমিকদের প্রকৃত ব্যয়। মূলধনের মালিক যখন সঞ্চয় করে মূলধন সরবরাহ করে তখন তাকে বর্তমান ভোগ হতে বিরত থেকে যথেষ্ট ত্যাগ স্বীকার করতে হয়। এই ত্যাগই হলো মূলধনের প্রকৃত ব্যয়।

প্রকৃতিবাদ (Naturalism)

প্রকৃতিবাদ অনুযায়ী বিশ্বজগতের সৃষ্টি, বিকাশ ও যাবতীয় ঘটনাবলী স্ব স্ব নিয়ম অনুযায়ী ঘটে থাকে। এটা অন্তর্নির্হিত নিয়মেই ঘটে থাকে। বিশ্বজগতের সৃষ্টি, ক্রমবিবর্তন বা এর আওতায় সংঘটির ঘটনাবলীর পেছনে ঈশ্বর বা অনরূপ কোনো অতিপ্রাকৃত শক্তির কোনো ভূমিকা নেই। এটাই হল প্রকৃতিবাদের মূল কথা।

প্রকৃতির রাজ্য (State of Nature)

হব্‌স তার লিভিয়াথান গ্রন্থের মধ্যে মানব প্রকৃতি বা চরিত্রের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা প্রকৃতির রাজ্যের মধ্যে সুন্দর হয়ে ফুটে উঠেছে। মানুষ স্বভাবতই স্বার্থপর,আত্মকেন্দ্রিক ও লোভী এবং সবকিছুর মধ্যে নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের প্রয়াস চালায়। তিনি বলেন যে, মানুষ যখন ভ্রমণে বের হয় তখন নিজে অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে অন্যের সাথে যায়, যখন ঘুমায় তখন বাড়ীর দরজা-জানালার খিল লাগায় এবং বাড়িতে থাকা সত্ত্বেও সিন্দুকের তালা লাগিয়ে রাখে। এখানে দেশবাসী,পাড়া-প্রতিবেশী, নিজের ছেলেমেয়ে ও বাড়ীর চাকর-বাকরদের সম্বন্ধে খারাপ ধারণা করা হয়। আইনের শাসন ও রাজনৈতিক ব্যবস্থা থাকার পরও এ অবস্থা হলে যেখানে আইন ও শাসন নেই সে সমাজের অবস্থা কেমন হবে তা সহজেই অনুমান করা যায়। সুতরাং যখন প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস ক্ষমতা তখন জীবন ছিল "সঙ্গিহীন,অসহায়,নোংরা,পাশবিক ও ক্ষণস্থায়ী" (Solitary, Poor, Nasty, Brutish and Short)। আইন-শৃংখলা ছিল না এবং যাদের শক্তি ছিল তারা দুর্বলদের অবদমন ক্ষমতা। প্রকৃতির রাজ্যে মানুষ ছিল স্বাধীন ও সমান এবং এ কারণেই এমন ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়। যেহেতু স্বাধীন সেহেতু সকলে সমান। সার্বভৌম শক্তির দ্বারা বলবৎযোগ্য কোনো আইন না থাকায় জঙ্গলের পশুর মতো বাস ক্ষমতা। সবল দুর্বলকে আক্রমণ ক্ষমতা এবং দুর্বল ভয়ে পালিয়ে যেত। তারা সব সময় সংঘাত ও দ্বন্দ্বে লিপ্ত থাকত। এক কথায় সেখানে যুদ্ধাবস্থা (State of War) বিরাজ ক্ষমতা। এ অবস্থায় প্রত্যেকটি মানুষ ছিল প্রত্যেকের বিরুদ্ধে (Every one was against every one)।[৬৩] অরাজক পরিবেশের জন্য মানব প্রকৃতিই দায়ী।

মানুষ জন্মগত স্বার্থপর (Man born selfish)-এ কথা থেকে শুরু করে মূল্যবান লেখা আরম্ভ করেছেন। তিনি মানব মনের তিনটি প্রকৃতির কথা উল্লেখ করেছেন-(ক) অন্যের সবকিছু আত্মসাৎ করার মানসিকতা, (খ) নিজের কোনো কিছু কাউকে না দেয়া এবং (গ) সম্মান ও প্রতিপত্তি অর্জনের প্রবণতা ও বাসনা। মানুষের আশা-আকাঙ্খা ছিল অপূরণীয় এবং এর একমাত্র পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে (....Desire for power after power up to death)। এসব প্রবণতাই প্রকৃতির রাজ্যে অশান্তি, অনাচার, অবিচার প্রভৃতি সৃষ্টি করেছে, যার জন্য জীবন ছিল দুর্বিষহ। এসবের হাত থেকে রক্ষার জন্য শক্ত হাতে শাসন করা দরকার বলে তিনি মনে করেন, কারণ তখন শাসন করার কেউ ছিল না। প্রত্যেকে যেন প্রত্যেকের শত্রু ছিল (Everyone was the enemy of everyone)। প্রকৃতির রাজ্যে কোনো আইন ছিল না, কোনো বিচার ছিল না এবং সম্পদের কোনো নিরাপত্তা

ছিল না (In the state of nature, there was no law, no justice and no security of property)। তাদের মধ্যে নৈতিকতা বোধ বলে কিছু ছিল না, সকলে ছিল স্বার্থপর ও কলহপ্রিয়। মূল প্রবণতা হলো ক্ষমতা লাভের প্রতি লোভ এবং বিরামহীন প্রচেষ্টা, যার পরিসমাপ্তি ঘটে মৃত্যুতে। ("A general inclination of all mankind is perpetual and restless, desire of power after power, that ceaseth only in death")। মানব সন্তানকে এর হাত থেকে রক্ষা করা যায় শুধুমাত্র চুক্তি সম্পাদনে শক্তিশালী শাসক সৃষ্টিতে। কেননা এরূপ পরিস্থিতিতে এমন শক্তিবান কেউ না থাকলে কারও জীবন রক্ষা হবে না। (সূত্রঃ ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

প্রগতিশীল (Progressive)

যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিকাশ এবং যেকারণে সমাজ ও সামাজিক সম্পর্কের স্বাভাবিক বিবর্তন নির্দ্ধিধায় মেনে নিতে পারে, তাদেরকেই বলা হয় প্রগতিশীল। তবে, সমাজতন্ত্রীদের মতে শুধু সমাজতন্ত্রীরাই প্রগতিশীল এবং যারা সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে না বা ভিন্ন ধরনের সমাজতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তারা প্রতিক্রিয়াশীল বা সংশোধনবাদী।

প্রচারণা (Propaganda)

ইংরেজি প্রোপাগান্ডা শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ প্রচারণা। সপ্তদশ শতাব্দীতে রোমে পঞ্চদশ পোপ গ্রেগরি কর্তৃক আহূত পবিত্র সমাবেশ (congregation) সূত্রে শব্দটির প্রচলন ঘটে। মমার্থ হলো কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান অথবা আদর্শের অনুকূলে কিংবা বিরুদ্ধে জনমত সৃষ্টির পদ্ধতি। জনমত সৃষ্টির বিষয় ধর্মীয়, সামাজিক, রাজনৈতিক অথবা সাংস্কৃতিক হতে পারে। প্রচারের যাবতীয় মাধ্যম ব্যবহৃত হতে বাধা নেই। বিশ শতকে প্রতি রাষ্ট্র ও অন্যান্য সংগঠন প্রচারের জন্য নানা ধরনের উপায় অবলম্বন করে। ইদানীং তার নতুন অভিধা হলো ইনফরমেশন সার্ভিস। সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী কমিউনিস্ট ও নাৎসি রাষ্ট্রের প্রচার বা অপপ্রচার বিশেষ গুরুত্ব অর্জন করে। প্রচার থেকেই মগজ ধোলাই কথাটির সৃষ্টি। মার্কসীয় দৃষ্টিতে প্রচারতত্ত্বের উদ্ভাবক ছিলেন প্লেখানব। লেনিনের লেখনীতে প্রত্যয়টি প্রসারতা লাভ করে।

প্রজাতন্ত্র (Republic)

যে শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন, তাকেই সাধারণত প্রজাতন্ত্র বলা হয়। প্রজাতন্ত্র হলো এমন একটি সরকার ব্যবস্থা যেখানে সর্বোচ্চ ক্ষমতা ভোগ করে জনগণ বা জনগণের একাংশ। এই রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইন পরিষদই সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী হয় এবং সরকার পার্লামেন্টের কাছে দায়ী থাকে। প্রজাতন্ত্রের প্রধান হন রাষ্ট্রপতি বা প্রেসিডেন্ট, যিনি নিজেও নির্দিষ্ট সময় অন্তর জনগণ কর্তৃক কিংবা পার্লামেন্ট কর্তৃক নির্বাচিত হন।

অবশ্য, রাষ্ট্রভেদে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার তারতম্য আছে। কোনো পেসিডেন্ট একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার প্রধান থাকেন, আবার কোনো ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রীই হন সরকার প্রধান, প্রেসিডেন্ট শুধুমাত্র রাষ্ট্রপ্রধান থাকেন। কোনো রাজা বা রানি এই জাতীয় সরকার ব্যবস্থায় সরকার প্রধানের পদটি পেতে পারেন না। ইংরেজি ভাষায় "প্রজাতন্ত্র" শব্দের প্রতিশব্দ 'republic'. এটি এসেছে লাতিন শব্দ res publica শব্দবন্ধটি থেকে, যার আক্ষরিক অর্থ "জনগণ-সংক্রান্ত একটি বিষয়"। প্রাচীন ও আধুনিক প্রজাতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলো নিজস্ব আদর্শ ও গঠন অনুযায়ী ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির হয়ে থাকে। সাধারণত রাজশক্তি-বিহীন রাষ্ট্রকেই প্রজাতন্ত্র বলা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্সে শাসনবিভাগ সংবিধান ও সাধারণ ভোটাধিকার, উভয়ের দ্বারাই বিধিবদ্ধ হয়।

যে সার্বভৌম রাষ্ট্রের শাসনব্যবস্তা রাজতন্ত্র অনুসারী নয়। বিভিন্ন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রে রাজা বা রানির যে ক্ষমতা থাকে সেটা প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তি যিনি রাষ্ট্রপতি অথবা প্রধানমন্ত্রী হয়ে থাকেন তাঁর ওপর বর্তায়। প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধানের ক্ষমতার উৎস হলো জনগণ; তাদের স্বেচ্ছা-আনুগত্যের অর্থাৎ সম্মতির ভিত্তিতে প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতাসম্পন্ন হন। প্রজাতন্ত্রী রাষ্ট্র ও রাজতন্ত্রী রাষ্ট্রের শক্তির ভিত্তি হলো যথাক্রমে সম্মতি ও আনুগত্য।

প্রজাতন্ত্রের প্রকারভেদ আছে। তাতে স্বৈরতন্ত্র থেকে শুরু করে নৈরাজ্যবাদী পর্যন্ত নানাবিধ প্রবণতা দেখা যায়। নির্বাচকমণ্ডলীর প্রতিনিধিরা প্রজাতন্ত্রের শাসনরীতি নির্ধারণ করেন। যুক্তরাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় পরিচালিত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। ফরাসি প্রজাতন্ত্রে কেন্দ্রের হাতে ক্ষমতা অনেকাংশে কেন্দ্রীভূত ; অঙ্গরাজ্যগুলোর কর্মপরিসর সুবিস্তৃত নয়।

প্রতিক্রিয়াশীল (Reactionary)

যারা পৃথিবীর সম্মুখ গতিকে বিশ্বাস করে না এবং পেছনের দিকে টেনে নিয়ে যেতে চায় তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। যারা আবার দাসযুগে বা সতীদাহ প্রথায় ফিরে যেতে চায়, যারা আধুনিকতায় বিশ্বাস করে না, যারা লিঙ্গ-বৈষম্য টিকিয়ে রাখতে চায় এবং নারী স্বাধীনতায় বিশ্বাস করে না তারা প্রতিক্রিয়াশীল। যারা সভ্যতার বিবর্তনে বিশ্বাস করে না, নিজের অন্ধত্বকে অন্যের ওপর চাপিয়ে দিতে চায়, মানুষকে মানুষ হিসাবে না দেখে হিন্দু বা মুসলমান হিসাবে দেখে তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। যারা রাষ্ট্রকে সকল মানুষের কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান না ভেবে হিন্দু অথবা মুসলমান যেকোনো এক গোষ্ঠীর সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায় তারা প্রতিক্রিয়াশীল। একইভাবে রাষ্ট্রকে যারা নারী বা পুরুষের সম্পত্তিতে অথবা কালো-মানুষ বা সাদা-মানুষের সম্পত্তিতে পরিণত করতে চায় তারা যেমন প্রতিক্রিয়াশীল তেমনি মনুষ্যত্বকে বিসর্জন দিয়ে যারা মানুষকে বিভিন্ন জাতে বিভাজন করে রাখে তারাও একইরকম প্রতিক্রিয়াশীল। যারা বিজ্ঞান শিক্ষার বিরোধিতা করে এবং মানুষকে অপসংস্কৃতিতে ডুবিয়ে রাখতে চায় তারাই প্রতিক্রিয়াশীল। যারা মানুষের বাক-স্বাধীনতাকে অস্বীকার করে এবং গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না তারা

প্রতিক্রিয়াশীল। পৃথিবীর নিজস্ব সূত্রানুসারে প্রতিক্রিয়াশীলরা সর্বদায়ই ব্যর্থ হয় কিন্তু প্রগতিকে এবং মানবতাকে হিংস্রভাবে আক্রমণ করে ভয়ংকর পরিস্থিতির সৃষ্টি করে।

পৃথিবীর যে সমস্ত জায়গায় প্রতিক্রিয়াশীলরা অধিক সক্রিয় তারমধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। বলা যায় বাংলাদেশটা প্রতিক্রিয়াশীলদের অভয়ারণ্য। তারা অসহনীয় করে তুলছে মানুষের জীবন-যাত্রা। মানুষের মননশীলতাকে, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে, শিল্প-সাহিত্যকে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোকে তারা প্রতিক্রিয়াশীল করে তুলছে। সংবাদপত্রগুলোর দিকে তাকালে দেখা যায় প্রতিক্রিয়াশীল রচনা, বিদ্যালয়গুলোতে জ্ঞানের বদলে পড়ানো হচ্ছে প্রতিক্রিয়াশীলতা, টেলিভিশন খুললে শোনা যাচ্ছে উচ্চকণ্ঠে প্রতিক্রিয়াশীল সম্প্রচার। সংবিধান সংশোধন করে প্রতিক্রিয়াশীলতাকে করা হচ্ছে প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ, শেকল দিয়ে বেঁধে রাখা হচ্ছে সৃজনশীলতাকে। অন্ধ করে রাখা হচ্ছে আধুনিকতাকে এবং সবকিছুকে দেখা হচ্ছে অবৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে। তারা প্রকৃত আন্দোলনে বিশ্বাস করে না কিন্তু আন্দোলনের নামে ভাংচুর করে এবং জান-মালের ক্ষতি করে। তারা গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না কিন্তু মুখে গণতন্ত্রের কথা বলে, তারা গণতন্ত্রের বিকৃত ব্যাখা উপস্থাপন করে মানুষকে বিভ্রান্ত করে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মানবিকতায় বিশ্বাস করে না, তারা ধর্মান্ধ। তারা ব্যক্তি স্বাতন্ত্রবাদকে অস্বীকার করে, ধর্ম দিয়ে তারা সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায়। স্বার্থ উদ্ধারের জন্য তারা ধর্মকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে। মুখে তারা পারলৌকিকতার কথা বলে কিন্তু ধর্মকে ব্যবহারের মাধ্যমে ইহজাগতিক লক্ষ্য হাসিল করে। প্রতিক্রিয়াশীলরা মূলত: ধর্ম-ব্যবসায়ী। তারা জানে না ধর্মের উৎপত্তি এবং বিবর্তনের ইতিহাস। এভাবে তারা মানুষকে পরিণত করছে অপমানুষে। তারা আগে আগে বৈজ্ঞানিক আবিস্কারের সুফল ভোগ করে, কিন্তু বিজ্ঞানের চরম বিরোধিতা করে। বাংলাদেশের আকাশ-বাতাশ আজ প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা ব্যাপকভাবে দূষিত হচ্ছে।

প্রগতি সব সময়ই প্রতিক্রিয়াশীলদের দ্বারা আঘাতপ্রাপ্ত হয় এবং রক্ষণশীলদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ হয় বটে, কিন্তু সে কখনও থেমে থাকে না এবং পেছনের দিকে কীভাবে যেতে হয় তা জানে না। হাজার বছরের ইতিহাস বা লক্ষ বছরের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আমরা দেখেছি প্রগতিশীলেরাই সভ্যতার বিনির্মাণকারী। যুগ যুগ ধরে রক্ষণশীলেরা ও প্রতিক্রিয়াশীলেরা নিক্ষিপ্ত হয়েছে আস্তাকূঁড়ে। তাই আমি মোটেই হতাশ নই, আমি আশাবাদী এবং সম্পূর্ণ আশাবাদি। সেই দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে আমি বলবো আসুন, আমরা যে যতটুকু পারি প্রগতির চাকাকে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে ভূমিকা রাখি। সকল প্রতিক্রিয়াশীলতাকে পেছনে ফেলে একটি বাসযোগ্য পৃথিবী গড়ে তোলার কাজে সম্পৃক্ত হই এবং আমাদের সন্তানদের উপহার দেওয়ার মতো করে বাংলাদেশকে সাজিয়ে রেখে যাই।

যারা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির স্বাভাবিক বিকাশ ও সেকারণে সমাজ বিবর্তনের ধারাকে মেনে নিতে পারে না, বরং পুরনো ব্যবস্থা মূল্যবোধ, চিন্তা-চেতনাকে আঁকড়ে ধরে রাখতে চায়, তাদেরকে বলা হয় প্রতিক্রিয়াশীল। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে (১৭৮৯-৯৩)

মননশীল যেসব ব্যক্তি বিপ্লবচিন্তার সমালোচনা করতেন তাঁদের প্রতিক্রিয়াশীল বলা হত। তারপর থেকে উনিশ শতকের ইউরোপে বিপ্লব অথবা সংস্কার আন্দোলনের বিরোধী ও বাধদানকারীদের মধ্যে খ্রিস্টান যাজক, অভিজাত শ্রেণি, রাজন্যবর্গ ও পুরনো অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানকে ধরা হত। শব্দটি বামপন্থীদের মধ্যে ব্যবহারবহুল হলেও ফ্যাসিস্টরাও সেটি প্রয়োগ করে। বামপন্থীরা যে পরিবর্তন চান তার বিরোধিতা যিনি করবেন তিনিই প্রতিক্রিয়াশীল ; অথবা বামপন্থীরা যে বিধিব্যবস্থার পরিবর্তন করেছেন সেগুলোকে কেউ পুনঃপ্রবর্তন করলে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল বলা হবে। রক্ষণশীলমাত্রেই এবং দক্ষিণপন্থী লেখক, নিয়মতান্ত্রিক, অহিংস ও ধীরে চলে নীতিতে বিশ্বাসী রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে শব্দটি নির্বিচারে ব্যবহৃত হয়। সাধারণত দেখা যায় যে কেউ কেউ পরিবর্তনের নামেই আপত্তি তোলেন, কিন্তু নিজে কোনো পরিবর্তনের প্রস্তাব তোলেন না ; কোনো ব্যাপারে বিবেচনার কোনো দাবি তাঁর থাকে না।

প্রতিনিধি (Delegate)

কোনো রাষ্ট্র বা সরকারকে প্রচলিত আইন অনুযায়ী স্বীকার করে তার সাথে স্বাভাবিক সম্পর্ক স্থাপন করা। নির্বাচকমণ্ডলী কর্তৃক নির্বাচিত ও এর পক্ষে কোনো সভা বা পরিষদে বা কোনো দলে বা গণতান্ত্রিক সম্মেলনে কাজ করার জন্য অনুমোদিত ব্যক্তিকে 'প্রতিনিধি' বলে। কোনো অঞ্চলে প্রতিনিধি যিনি মার্কিন আইন পরিষদের নিম্নকক্ষে (House of Representatives) বক্তৃতা করতে পারেন, কিন্তু ভোট দিতে পারেন না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যারীল্যান্ড, ভার্জিনিয়া ও পশ্চিম ভার্জিনিয়ার আইন পরিষদের নিম্নকক্ষের সদস্যকে 'প্রতিনিধি' বলা হয়।

প্রতিনিধি সভা (House of Representative)

মার্কিন আইনসভা কংগ্রেসের নিম্নকক্ষ। উচ্চকক্ষের নাম সিনেট। অস্ট্রেলিয়াসহ আরো ক'টি দেশের আইনসভার নিম্নকক্ষের নাম 'হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস্'। মার্কিন প্রতিনিধি সভার মোট সদস্য সংখ্যা ৪৩৫। সদস্যরা প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সভার সদস্য নির্বাচিত হওয়ার জন্য প্রার্থীকে কমপক্ষে ২৫ বছর বয়স্ক ও ৭ বছরের নাগরিকত্ব এবং সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাসিন্দা হতে হয়। সদস্যরা দু'বছরের জন্য নির্বাচিত হন। কোনো অঙ্গরাজ্য থেকে কতজন সদস্য হবেন তা জনসংখ্যার অনুপাতে নির্ধারিত হয়। প্রতিনিধি সভার সদস্যদের বলা হয় কংগ্রেসম্যান (Congressmen) বা কংগ্রেসউইমেন (Congreswemen)। স্পিকার প্রতিনিধি সভায় সভাপতিত্ব করেন। এ সভা আইন প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। রাজস্ব সংক্রান্ত সকল বিল অবশ্যই প্রতিনিধি সভায় উপস্থাপন করতে হয়।

প্রতিবিপ্লব (Counter Revolution)

কোনো বিপ্লবের ফলাফল ধ্বংসকরণার্থ নূতন বিপ্লব। স্থিতাবস্থার সমর্থনকারীদের পক্ষ হতে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রতি সঙ্ঘবদ্ধ বিরোধিতা। রাজনৈতিক বিপ্লবের

পরে বিপ্লবের ধারা বা গতিকে রদ করার জন্য ও বিপ্লবে যে সকল প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল আকারে ও তাৎপর্যের দিক হতে তাদের সম্পূর্ণ বিপরীত প্রতিষ্ঠানসমূহ স্থাপনের যে প্রতিক্রিয়া 'প্রতিবিপ্লব' বলতে তাই বোঝায়।

প্রতিযোগিতা (Competition)

প্রতিযোগিতা বা প্রতিদ্বন্দ্বিতা স্বাধীন বা অবাধ অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় নির্দিষ্ট মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে জিনিস বিক্রয় বা করে উৎপাদনের খরচ কমিয়ে অথবা জিনিসপত্রের মান উন্নত করে বাজার দখল করার জন্য উৎপাদনকারী বা বিতরণকারীদের মধ্যে যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তাকে প্রতিযোগিতা বলে।

প্রতিযোগিতামূলক সহাঅবস্থান (Competitive Co-existence)

বিশ্বের ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনৈতিক আদর্শ ও ব্যবস্থা অনুযায়ী দেশগুলো পরস্পর বিবাদে লিপ্ত হওয়ার বদলে, পারস্পরিক প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার নীতিকে সহযোগিতামূলক সহাবস্থান বলা হয়।

প্রতিরোধ কূটনীতি (Preventive Diplomacy)

জাতিসংঘ সম্ভাব্য যুদ্ধরত জাতিসমূহের মধ্যে সরাসরি আলোচনা অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা বা উভয়পক্ষের সাথে সরাসরি আলোচনা বৈঠকের মধ্য দিয়ে যুদ্ধ নিরসন ও প্রতিরোধ করে থাকে। জাতিসংঘ প্রবর্তিত এ কূটনৈতিক ব্যবস্থায় দুটি দেশের মাঝে যখন যুদ্ধ অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে, শান্তি প্রচেষ্টার সকল দিকই যখন স্তিমিত হয়ে পড়ে তখন জাতিসংঘ বিবদমান দুটি দেশের মাঝে যুদ্ধ প্রশমনে সরাসরি আলোচনার ব্যবস্থা করে থাকে। জাতিসংঘ প্রবর্তিত এ কূটনৈতিক ব্যবস্থাকে প্রতিরোধ কূটনৈতিক ব্যবস্থা (Preventive Diplomacy) বলা হয়ে থাকে।

প্রতিষেধ (Veto)

ভেটো শব্দটি লাতিন ভাষা থেকে আগত। অর্থ : আমি মানি না। কর্তৃত্ব বলে বা পদাধিকার বলে নিষেধাজ্ঞা। অর্থাৎ কোনো বিষয় বা প্রস্তাব কার্যকর করার ব্যাপারে একটি নেতিবাচক ভোটের দ্বারা প্রত্যাখ্যান বা নিষেধ করার ক্ষমতা, বা প্রতিষেধাধিকার। ভেটো বা নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রণালী বিশেষ। কোনো সংস্থায় প্রতিটি সদস্যকে এই অধিকার দেয়ার তাৎপর্য হলো যে, সকল সদস্য ঐকমত্যে না পৌঁছলে সংশ্লিষ্ট বিষয়টি রূপায়ণ করা যাবে না। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে জোর-জবরদস্তির বিকল্প হিসেবে এই কার্যপ্রণালী অপরিহার্য। রাষ্ট্রসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের স্থায়ী ও শক্তিশালী সদস্যদের এই অধিকার থাকায় তাদের কারও স্বার্থবিরোধী কোনো বিষয় আলোচিত হতে পারে না। প্রতিষেধ অবশ্য সময়বিশেষে প্রয়োজন হয়, যদি ক্ষমতাশালী সদস্যেরা আন্তর্জাতিক জনমতকে মান্য করে।

প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র (Direct Democracy)

যখন নাগরিকগণ সরাসরি প্রতিনিধি নির্বাচন বা শাসনকার্যে অংশগ্রহণ করতে পারে, তখন তাকে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বলা হয়। বৎসরের কোনো একটি নির্দিষ্ট সময়ে নাগরিকগণ কোনো স্থানে মিলিত হয়ে আইন প্রণয়ন, শাসন বিষয়ক নীতি নির্ধারণ,সরকারি আয়-ব্যয় সমর্থন ইত্যাদি কাজে অংশগ্রহণ করে। প্রাচীন গ্রীস বা রোমে এমনি শাসন প্রচলিত ছিল। নগর রাষ্ট্রগুলোর আয়তন এবং জনসংখ্যা ছিল কম, তাই তারা একত্রে বসে নিজেদের সমস্যার সমাধান ক্ষমতা কিন্তু বর্তমানকালে এটা একেবারেই অসম্ভব ব্যাপার। রাষ্ট্রের আয়তন ও জনসংখ্যা বিপুল বৃদ্ধি পেয়েছে। এত জনসংখ্যা মিলিত হয়ে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। সাধারণ একটি ছোট রাষ্ট্রের পক্ষেও তা সম্ভব নয়। বাংলাদেশের কথাই বলি না কেন, একত্রে সকলে বসে কোনো সিদ্ধান্ত নেওয়া অসম্ভব। তাছাড়া বৃহৎ গণজমায়েতের স্থানই বা কোথায় পাওয়া যাবে ? তৎকালে নগররাষ্ট্রে বসবাসকারী জনসাধারণের সংখ্যা খুব কম ছিল। তদুপরি অধিকাংশই ছিল নারী, ক্রীতদাস ও শ্রমিক শ্রেণি। এদের কোনো প্রকার রাজনৈতিক অধিকার ছিল না, ফলে জনসংখ্যা আরও কম হয়। রাষ্ট্রের সমস্যা ছিল কম এবং জনসাধারণের চিন্তা-চেতনার তেমন বিকাশ লাভ ঘটেনি। কিন্তু এসব কিছুর ব্যাপক পরিবর্তন হয়েছে। এমনি নানাবিধ কারণে প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক শাসন বিলুপ্ত হয়েছে। যে রাষ্ট্র্যব্যবস্থায় নাগরিকেরা নির্বাচিত প্রতিনিধির পরিবর্তে নিজেরাই যৌথভাবে সর্ববিধ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। বলা হয়ে থাকে যে প্রত্যক্ষ গণতন্ত্র সম্ভব যেখানে নির্বাচকমণ্ডলীর বৃহৎ নয়, যার ফলে কোনো বিষয়ে বারেবারে ভোট গ্রহণ করা যায়। প্রাচীন রাষ্ট্রব্যবস্থায় এই পদ্ধতি অনুসৃত হত। একথাও বলা হয় যে, প্রত্যক্ষ গণতন্ত্রে ব্যক্তিমানুষই হলো সার্বভৌম। প্রতিনিধিত্বমূলক পরোক্ষ ব্যবস্থায় নির্বাচিত কিংবা নিয়োজিত ব্যক্তিরা দায়িত্ববদ্ধ হিসাবে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকেন বটে, তবে তাঁরা জনগণের হাতের পুতুল হিসেবে কাজ করেন না।

প্রত্যক্ষ নির্বাচন (Direct Election)

প্রত্যক্ষ নির্বাচনে জনসাধারণ তাদের প্রতিনিধি নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারে। এ ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত। ব্রিটেনের কমন্সসভা, আমেরিকার প্রতিনিধি সভা, ভারতের পার্লামেন্ট এবং বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের সদস্যগণ জনসাধারণের প্রত্যক্ষ নির্বাচিত প্রতিনিধি। সদস্যগণ সরাসরি জনসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হন।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (First World War)

১৯১৪ সালের মাঝামাঝি থেকে ১৯১৮ সাল পর্যন্ত সংঘটিত যুদ্ধ। ইউরোপসহ পৃথিবীর প্রধান প্রধান শক্তিধর দেশগুলো এই যুদ্ধে জড়িত ছিল বলে এক বিশ্বযুদ্ধ বলা হয়। এই যুদ্ধে একপক্ষে ছিল অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, জার্মানি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়া এবং অপরপক্ষে ছিল সার্বিয়া, রাশিয়া, ফ্রান্স, ব্রিটেন, জাপান, ইতালি ও আমেরিকা। প্রথম পক্ষকে বলা

হতো কেন্দ্রীয় শক্তি বা সেন্ট্রাল পাওয়ার (Central Powers) এবং দ্বিতীয় পক্ষকে মিত্রশক্তি বা অ্যালাইড পাওয়ার (Allied Powers)।

বসনিয়ার রাজধানী সারায়েভো শহরে অস্ট্রিয়ার যুবরাজ আর্কডিউক ফ্রানৎস ফার্ডিনান্ড এক সার্বিয়াবাসীর গুলিতে নিহত হন ১৯১৪ সালের ২৮ জুন। অস্ট্রিয়া এই হত্যাকাণ্ডের জন সার্বিয়াকে দায়ী করে এবং ২৮ জুলাই সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। এক পর্যায়ে দুদেশের বন্ধু রাষ্ট্রগুলো ধীরে ধীরে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়। তবে অস্ট্রিয়ার যুবরাজের হত্যাকাণ্ডই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের একমাত্র কারণ ছিল না। উনিশ শতকের শিল্পবিপ্লবের ফলে সহজে কাঁচামাল সংগ্রহ এবং তৈরি পণ্যসামগ্রী বিক্রির জন্য উপনিবেশ স্থাপনের প্রতিযোগিতা, পূর্বের দ্বন্দ্ব-সংঘাত, ঈর্ষা, সন্দেহ ইত্যাদিও ইউরোপের দেশগুলোকে যুদ্ধে লিপ্ত হতে ইন্ধন যোগায়। এই যুদ্ধে ব্রিটেন যুদ্ধাস্ত্র হিসেবে প্রথম ট্যাঙ্ক ব্যবহার করে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে মিত্রশক্তির জয় হয়। ১৯১৮ সালের ১১ নভেম্বর জার্মানির শান্তি প্রার্থনার পর ১৯১৯ সালের ১০ জানুয়ারি অনুষ্ঠিত ভার্সাই চুক্তির মাধ্যমে যুদ্ধের সমাপ্তি ঘটে। এই যুদ্ধে ৮৫ লক্ষ লোক নিহত ও ২ কোটি ১০ লক্ষ লোক আহত হয়। যুদ্ধে ব্যয় হয়েছিল ৮ হাজার কোটি ডলার।

প্রথম ভার্সাই চুক্তি (Treaty of Second Versailles)

ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৭৮০ সালে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত হয় প্রথম ভার্সাই চুক্তি। দেশ দুটির মধ্যে স্বাধীনতা রক্ষায় সমঝোতা সাধনের উদ্দেশে এই চুক্তিটি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির ফলে ৪ জুলাই ১৭৭৬ ব্রিটেনের কাছ থেকে যুক্তরাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করে।

প্রথম ভাষণ (Maiden Speech)

নবাগত সদস্যের পার্লামেন্টে প্রথম ভাষণ। প্রথম ভাষণ সকল সদস্যের জন্যই স্মরণীয় ঘটনা। অন্য সদস্যরাও নবাগতের ভাষণ গুরুত্ব দিয়ে শ্রবণ করেন। নতুন সদস্য ভাষণ দিতে থাকলে সৌজন্যবশত সাধারণত তাঁকে কোনো রকম বাধা দেয়া হয় না। নবাগত সদস্য এবং অন্য কোনো সদস্য এক সঙ্গে কথা বলতে চাইলে নতুন সদস্য অগ্রাধিকার পান। নতুন সদস্য বক্তব্য দিয়ে শেষ করার পর পরবর্তী বক্তা তাঁকে অভিনন্দিত করেন।

সকল নতুন সদস্য যে প্রথম ভাষণ ভালোভাবে দিতে পারেন তা নয়। অনেকে জড়তায় ভোগেন। স্পষ্ট করে নিজেকে প্রকাশ করতে পারেন না। কোনো কোনো সদ্য হাস্যকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি করেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে নবাগত একজন সদস্য প্রথম ভাষণ দিতে গিয়ে একট মজার ঘটনার জন্ম দেন। এ সদস্যের নাম জোসেফ এডিসন (Joseph Addison) তিনি ভাষণ দিতে শুরু করেন এভাবে 'Mr. Speaker, I conceive.' তার পর থেমে যান। যেন নিজের শব্দে নিজেই ভয় পেয়ে গেছেন। তারপর আবার বলা শুরু করেন : 'I conceive, Mr. Speaker...' এরপরই তিনি থেমে যান। স্পিকার সবার দৃষ্টি

আকর্ষণ করেন এবং নবাগত সদস্যকে বলতে দিলে তিনি বলেন : 'Sir I conceive...' কক্ষে হাস্যরোল আরম্ভ হয়। তাঁকে আর সুযোগ দেয়া হয় নি। পরবর্তী বক্তা স্পিকারকে লক্ষ্য করে বলেন : 'Sir, the honourable gentleman has just conceived three times and brought forth nothing'. (সম্মানিত সদস্য তিনবার গর্ভধারণ করলেন কিন্তু কিছুই ওসব করতে পারলেন না।) প্রাক্তন ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বেনজামিন ডিসরেলি (Ben‡jvemain Disrali) তাঁর *The young Dure* উপন্যাসে একজন নবাগত সদস্যের প্রথম ভাষণ সম্পর্কে লিখেন : 'Then there was a maiden speech, so inaudible, that it was doubted whether, after all, the young oratar really did lose his virginity.' (সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টোরি শব্দকোষ, ঢাকাঃ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

প্রথাগত আইন (Common Law)

সাধারণত প্রথা হলো একটি সাধারণ বা গতানুগতিক (Usual practice) অনুশীলন মাত্র। এর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন আদৌ বাধ্যতামূলক নয়। কোনো একটি বিশেষ প্রয়োজন মেটানোর জন্য অথবা সংকট থেকে নিস্কৃতি পাবার জন্য একটি প্রথার প্রবর্তন করা হয়েছিল। একই প্রথার পুনরাবর্তন শেষ পর্যন্ত একটি স্থায়ী আইন বলা হয়। যেমন– সংসদের অধিবেশন বছরে দু'বার ডাকতে হবে এটা একটা প্রথা। এটি কোনো আইন নয়। সংসদের অধিবেশন বছরে দু'বার ডাকা না হয়, তাহলে আইন লঙ্ঘন করা হবে না। ঠিকই কিন্তু বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দেবে যার হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার উপায় নেই। যদিও পার্লামেন্টের দ্বারা এগুলো রচিত ও বিধিবদ্ধ হয়নি। বিচার বিভাগীয় স্বীকৃতির মাধ্যমে শাসনতান্ত্রিক আইনের মর্যাদা পেয়েছে। যেমন– রাজার বিশেষাধিকারসমূহ, বুদ্ধির সাহায্যে বিচারের অধিকার, বাক ও মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা, সমাবেশের স্বাধীনতা প্রভৃতি প্রথাগত আইনের অন্তর্ভূক্ত।

প্রবৃত্তি, সহজাত (Instinct)

সহজাত প্রবৃত্তি হল এক ধরনের বোধ, ভাব বা অনুভূতি যা জন্মগত, পরিবেশ নিরপেক্ষ এবং বংশ-বংশানুক্রমে মানুষের মধ্যে প্রবাহমান। এটা কোনো প্রযুক্তিগত বা প্রশিক্ষণের দ্বারা সৃষ্ট নয়, বরং স্বকীয় প্রবণতা। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, মৌমাছি কর্তৃক মৌচাক কিংবা উইপোকা কর্তৃক ঢিবি তৈরি তাদের বুদ্ধিবৃত্তিপ্রসূত বা প্রযুক্তিগত অনুশীলনের ফল নয়, বরং সহজাত প্রবৃত্তিরই ফল। অনুরূপভাবে, বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ, সন্তানবাৎসল্য, সুখ-আনন্দ, আঘাত-বেদনা ইত্যাদি মানুষসহ প্রায় সমগ্র প্রাণীকুলেরই সহজাত প্রবৃত্তি। মানুষ বুদ্ধিবৃত্তির বিচারে অন্য কোনো পশুর সঙ্গে আদৌ তুলনীয় নয় বটে, কিন্তু সহজাত প্রবৃত্তিসমূহ থেকেও মুক্ত নয়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণা আরও প্রমাণ করেছে যে, নেতৃত্বের মোহ মানুষসহ অন্যান্য প্রাণীর, বিশেষত উন্নততর প্রাণীর সহজাত প্রবৃত্তি। কট্টর বস্তুবাদীরা মনে করতেন যে, নেতৃত্বের মোহ, বিদ্বেষ, স্বামী-স্ত্রীর পরস্পরকে একচ্ছত্র অধিকারে রাখার ঝোঁক ইত্যাদি আসলে

ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত মানসিকতারই ফল। কিন্তু একটি ভেড়ার পাল বা জংলি হস্তীযূথের মধ্যে না আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তি, না আছে ব্যক্তিগত সম্পত্তিজনিত কমপ্লেক্স। অথবা তাদের মধ্যেও নেতা আছে, অন্যদের ওপর প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস, প্রতিহিংসা ও বিদ্বেষ আছে। এ থেকে এটাই প্রমাণিত হয় যে, 'মন মানসের সবটাই বস্তুগত পরিস্থিতির ফসল', এ ধারণা আসলে নিতান্তই যান্ত্রিক। জিনেটিকসের বিকাশ বা জিনপ্রযুক্তি-সম্পর্কিত জ্ঞান এ ধারণাকে আরও সুদৃঢ় করেছে। তাই, যথার্থ বৈজ্ঞানিক যুক্তিসম্পন্ন মানুষ মনে করেন যে, জ্ঞান মেধা আচরণ, আবেগ ইত্যাদির ক্ষেত্রে জন্মগত বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে ভিত্তি, পরিবেশ হচ্ছে সেগুলোর প্রকাশ ও বিকাশের শর্ত। বস্তুত, জন্মগত বৈশিষ্ট্য ও পরিবেশগত পরিস্থিতি এ দুয়ের পারস্পরিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া মধ্য দিয়ে মানুষের মননশীলতা, ঝোঁক, রুচি ইত্যাদি গড়ে ওঠে। এজন্যই হুবহু একই পরিবেশে, এমনকি একই পরিবারেও এক একজনের এক এক রকম মেধা, রুচি ও মানসিকতা দেখা যায়। বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদীরা আরও মনে করেন যে, মানুষ যেহেতু প্রাণীজগতের সদস্য, সেহেতু মানুষ কোনদিনই রিপু ও আবেগ থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে না, সম্পূর্ণ মুক্ত হতে পারবে না হিংসা, বিদ্বেষ, লোভ, লালসা মোহ, ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য, নৃতাত্ত্বিক স্বাতন্ত্র্য, মননশীলতার ভিন্নতা ইত্যাদির কবল থেকে; ফলে কখনোই সম্ভব হবে না রাষ্ট্রহীন একক বিশ্বসমাজব্যবস্থা।

প্রযুক্তি (Technology)

প্রযুক্তি হলো মানুষ কর্তৃক উদ্ভাবিত কৌশল, যা দিয়ে মানুষ প্রকৃতি বা প্রকৃতিপ্রদত্ত বিষয়কে নিজের প্রয়োজন অনুযায়ী কাজে লাগাতে পারে। প্রযুক্তির ধারা কখনোই স্থবির থাকে না বরং সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রযুক্তির প্রগতিশীল বিকাশ ঘটাতে থাকে। বস্তুত, প্রযুক্তিগত বিকাশের ফলেই উৎপাদনব্যবস্থা উৎপাদন ও উৎপাদন সর্ম্পকের গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে এবং সমাজ, সংস্কৃতিও পরিবর্তন ঘটে। সভ্যতার উষালগ্নে রাষ্ট্রব্যবস্থায় পাথরনির্মিত হাতিয়ার থেকে শুরু করে বর্তমান সময়ের কম্পিউটার বা মহাকাশযান পর্যন্ত সকল উদ্ভাবিত কৌশল, এমনকি ভবিষ্যতে আবিষ্কৃতব্য অনুরূপ সকল কৌশলই বস্তুত প্রযুক্তি বা কূট-কৌশলের অর্ন্তগত। বিজ্ঞান-প্রযুক্তির উন্নয়ন অনেকটা জ্যামিতিক হার বা Geometric Progression-এ ঘটে।

প্রযুক্তিবাদ (Technocracy)

প্রযুক্তিবাদীরা মনে করেন যে, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিশ্বপরিস্থিতে একমাত্র প্রযুক্তিবিদরাই সমাজ ও রাষ্ট্রের যথার্থ নেতৃত্ব দিতে পারেন এবং শুধু তাঁদের নেতৃত্বেই সমন্বিত উন্নয়নের ধারা সুনিশ্চিত করা সম্ভবপর। এই মতবাদীদের প্রচেষ্টা হল, রাজনীতি ও প্রশাসনসহ সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল সেক্টর ও বিভাগের ওপর প্রযুক্তিবিদের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা করা। এই মতবাদের প্রবক্তারা মনে করেন যে, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের পরিপ্রেক্ষিতে শিল্প, কৃষি, ব্যাবসা-বাণিজ্য তো বটেই, এমনকি প্রশাসন, সংস্কৃতি

ইত্যাদির ক্ষেত্রেও প্রভাব ও গুরুত্ব ধীরে ধীরে একচ্ছত্র হয়ে উঠছে (সূত্র: হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

প্রয়োগবাদ (Empiricism)

প্রয়োগবাদ বা অভিজ্ঞতাবাদ বা হাতুড়েবাদ; ইংরেজিতে Empiricism। এই দার্শনিক মতানুসারে কেবল প্রয়োগ বা অভিজ্ঞতার মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানই একমাত্র যথার্থ জ্ঞান। জ্ঞানের অন্য কোনো পদ্ধতি গ্রহণযোগ্য নয়। এই মতবাদীরা, তাঁদের স্ব স্ব অভিজ্ঞতার বাইরে আর কোনোকিছুই জানার তোয়াক্কা করেন না; গ্রহণ করেন না অন্যদের অভিজ্ঞতা ও গবেষণার ফসল। প্রয়োগবাদ তাই একপেশে, সীমাবদ্ধ, হাতুড়ে ও অবৈজ্ঞানিক বলে বিবেচিত (সূত্র: হারুনূর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

প্রশান্ত মহাসগার (*Prasanta* Ocean)

প্রশান্ত মহাসাগর গভীর রাত ও আয়তনের পৃথিবীর বৃহত্তম মহাসাগর। সমগ্র পৃথিবীর আয়তনের তিন ভাগের এক ভাগ স্থান জুড়ে আছে এই মহাসগর। এটি পৃথিবীর মোট জলভাগের অর্ধেক জলের আধার। এ আয়তন ১৬,৫২,৪৭,১৮০ বর্গ কিলোমটিার বা ৬,৩৮,০১,৯৩৬ বর্গমাইল। উত্তর থেকে দক্ষিণে এর বিস্তার ১৫,০০০ কিলোমিটার বা ৯৩২০ মাইল। এর গভীরতা কোথাও কোথাও এত বেশি যে সেখানে পৃথিবীর স্থলভাগের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টের ৮,৮৪৮ মিটার বা ২৯,০২৮ ফুট উচ চুড়াটিও ডুবে যাবে। এই মহাসাগরেই রয়েছে পৃথিবীর গভীরতম খাল মারিয়ানা ট্রেঞ্চ (Tmariana Trenech), যার গভীরতা ১০.৮৬ কিলোমিটার বা ৫৯৪০ ফ্যাদম। এ মহাসাগরের অধিকাংশই গভীর সমুদ্রের সমভূমি অঞ্চল দিয়ে গঠিত। এর গভীরতা গড়ে ৭.২৪ কিলোমিটার বা ৪০০০ ফ্যাদম। তবে এ মহাসাগরের প্রায় ৭৮ ভাগ স্থানের গভীরতা ৩.৬৫ কিলোমিটার বেশি। প্রশান্ত মহাসগারের পূর্ব পাশে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ, পশ্চিমে এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া মাহাদেশ, উত্তরে উত্তর আমেরিকা ও এশিয়ার সংযোগস্থল বেরিং প্রণালী, দক্ষিণ আন্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশ। উত্তর দিকে বেরিং প্রণালীর দ্বারা সুমেরু মহাসাগর ও উত্তর মেরুর সঙ্গে এবং দক্ষিণ দিকে অ্যান্টার্কটিকা মহাদেশের দক্ষিণ মেরুর সঙ্গে এই মহাসাগরের যোগ রয়েছে। ফলে প্রশান্ত মহাসাগরে উত্তরে ও দক্ষিণে প্রচণ্ড শীত পড়ে। সেখানে বছররে বেশিরভাগ সময় বরফশৈল ভেসে বেড়ায়।

প্রশান্ত মহাসাগরে ২৫ হাজরে মতো দ্বীপ আছে। এই সংখ্যা পৃথিবীর অন্য সব সাগর মহাসাগরের দ্বীপ দ্বীপুঞ্জের মোট সংখ্যার চেয়েও বেশি। এখানে প্রবাল দ্বীপ সবচেয়ে বেশি। মলোনেশিয়া অঞ্চলের সলোমন ও ফিজি, মাইক্রোনেশিয়া অঞ্চলের ক্যারোলিন, মার্শালা গিলবার্ট এবং পলিনেশিয়া বুক, লাইন, সোসাইটি ও টুয়ামাটো ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য প্রবাল্লীপ। এছাড়াও ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ ইন্দোনেশিয়া, পাল হারবার, হওয়াই , হনলুলু, তাইওয়ান, তাসমেনিয়া প্রভৃতি বিখ্যাত দ্বীপ এই মহাসাগরেরই

অবস্থিত। জাপান থেকে দক্ষিণে নিউজিল্যান্ড অঞ্চলের দ্বীপগুলো 'হারিকেন' ঘূর্ণিঝড়ের এলাক বলে চিহ্নিত। চীন ও ফিলিপাইন অঞ্চলে প্রশান্ত মহাসাগরের হারিকেন ঘুর্নিঝড়ের নাম টাইফুন। পূর্ব উপকুলে আমেরিকার উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত সম্পূর্ণ অঞ্চল ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরির জন্য বিখ্যাত।

প্রশান্ত মহাসেগারের প্রসিদ্ধ বন্দরগুলোর মধ্যে অকল্যান্ড, সিডনি, ব্রিসবেন, ম্যানিলা, সিঙ্গপুর, অ্যাঞ্জেলস, সান সালভাদোর, পানামা উল্লেখযোগ্য। তিমি, হাঙ্গর, পিরানহা, ডলফিন, অক্টোপাস প্রভৃতি হিংস্র ও বিচিত্র জলজ প্রাণী এই মাহাসাগরে পওয়া যায়। পর্তুগিজ অভিযাত্রী ফ্রার্দিনান্দ মাজেলান প্রশান্ত মহাসাগরের নাম দেন 'প্যানিফিক' অর্থ 'শান্ত'। সম্ভববত এই মহাসগারের অথৈ নীল জলরাশির গভির শান্ত ধীরস্থির স্বভাবের জন্য মাজেলান এই নাম দিয়েছিলেন।

প্রশাসনিক স্বচ্ছতা (Administrative Accountiblity)

সরকারি প্রশাসন ব্যবস্থাকে অধিকতর গণমুখী ও দুর্নীতিমুক্ত করার প্রচেষ্টা থেকেই প্রশাসনিক স্বচ্ছতার ধারণার উদ্ভব ঘটেছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতা এমন একটি ধারণা, যা নাগরিক এবং প্রশাসনের মধ্যকার সম্পর্ক প্রকাশ করে। স্বচ্ছতা জনসাধারণের দৈনন্দিন চাহিদার ব্যাপারে প্রশাসনের যথাযথ সাড়া দান নিশ্চিত করে। যার ফলে সরকার নাগরিকদের জন্য যা করছে নাগরিকগণ তা জানতে পারে, অন্যদিকে সরকারও অনুমান করতে পারে যে, জনসাধারণ তার থেকে কী আশা করছে। প্রশাসনিক স্বচ্ছতার মৌলনীতি হচ্ছে তথ্য সামগ্রিতে ভোক্তা সাধারণের প্রবেশাধিকার যাতে তারা তাদের বৈধ স্বার্থ মেটাতে পারেন।

প্রশাসনিক আইন (Administrative Law)

আইনের যে শাখায় রাষ্ট্রীয় বিভিন্ন বিভাগ, মন্ত্রণালয়, প্রশাসনিক দপ্তর ও সরকারি কাজকর্ম নিয়ন্ত্রিত হয়। পক্ষান্তরে, সাংবিধানিক আইনের কেবল সরকার ও আইনসভার কার্যবিধি নির্বাহ হয়। এ ছাড়া আইনসভায় গৃহীত আইনের বাইরে সরকারি প্রশাসন ও কার্যনির্বাহ সূত্রে সরকার অনেক সময়ে কিছু রীতিনীতি ও নিয়মাবলি নির্ধারণ করে যেগুলো আদালতে প্রশাসনিক আইন হিসাবে স্বীকৃতি পায়। আধুনিক রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের বিকেন্দ্রিত ব্যবস্থায় সরকারের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৃদ্ধি পেয়েছে। ফ্রান্সে সরকারের হাতে এইভাবে প্রশাসনিক আইন প্রবর্তনের ক্রমবর্ধন নিয়ন্ত্রণের জন্য প্রশাসনিক আদালত গঠিত হয়েছে। নাগরিকদের প্রাকৃত অধিকার লঙ্ঘনের প্রশ্নে প্রশাসনিক আইনের যৌক্তিকতা নির্ভর করে।

প্রশাসনিক আদেশ (Executive Order)

প্রশাসনিক আদেশ গঠনতন্ত্রের কোনো ধারা বা শর্ত, কোনো আইন বা সন্ধিপত্রাদি ব্যাখ্যা করা ও কার্যে পরিণত করার জন্য রাষ্ট্র প্রধান বা তাঁর অধীনস্থ প্রশাসনিক

কর্মচারীগণ কর্তৃক কোনো নিয়ম বা বিধি প্রণয়ন করা ও প্রকাশ করা। প্রশাসনিক বিভাগ ও শাখার সংগঠন ও পদ্ধতি সম্পর্কে এই প্রকারে আদেশ-নির্দেশ দেওয়া হয়। আইন হিসেবে এটা সাধারণভাবে প্রযোজ্য। সরকারি কর্মচারীদের হাতে বিবেচনামূলক ক্ষমতা অর্পণ করার ফলে এই প্রকার আদেশের ব্যবহার বহুল পরিমাণে বেড়ে গেছে।

প্রশ্ন জিজ্ঞাসা (Interpollations)

পার্লামেন্টের যেকোনো সদস্য শাসন সংক্রান্ত বিষয়ে যেকোনো মন্ত্রীকে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য থাকেন। এভাবে অধিবেশন চলাকালীন সময়ে প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করে মন্ত্রীদেরকে দায়িত্বশীল রাখার চেষ্টা করা হয়। প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মূল উদ্দেশ্য হলো বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের দৈনন্দিন কাজকর্ম, সাফল্য ও ব্যর্থতার সঠিক খবর জানা এবং তার সাথে সাথে মন্ত্রীদের কাজের সমালোচনা করা।

প্রাইভেট বিল (Private Bill)

কোনো বিশেষ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, ব্যক্তিসংঘ বা বিশেষ কোনো অঞ্চলের স্বার্থজড়িত আছে এমন বিলকে বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত বিল বলে। রাষ্ট্রপতির বেতন ও ভাতা সম্পর্কিত বিল বা সংসদ সদস্যদের বেতন ও ভাতাদি সম্পর্কিত বিল বা স্থানীয় সরকারের ক্ষমতাবৃদ্ধি বা সংকোচনের জন্য আনীত বিল ইত্যাদি বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি বা অঞ্চলকে শুধু জড়িত করে।

প্রাকৃত অধিকার (Natural Rights)

রাষ্ট্র ও সমাজের প্রচলিত আইনের বাইরে নাগরিকদের কিছু অধিকার থাকে। বিশেষ করে রাজা, রাষ্ট্র বা জনসমাজ কর্তৃক প্রবর্তিত আইনকানুনের বাইরে মানুষের যেসব জন্মগত ও নৈতিক অধিকার থাকে। সেগুলো সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ও মৌলিক অধিকার। আধুনিককালে মানবাধিকার প্রত্যয়টি প্রাকৃত অধিকারেরই একটি নবীন রূপ এবং আধুনিক উদারতন্ত্রী ভাবুকদের কাছে সবিশেষ সমাদৃত। প্রাকৃত অধিকার এবং প্রাকৃত সুবিচার আইনজ্ঞদের কাছে সমগোত্রে স্বীকৃত পায়। আইনানুগ অধিকারের বাইরে প্রাকৃত অধিকারের স্থান আছে। তবে যেদেশে আইনের শাসন নেই সেদেশে প্রাকৃত অধিকারের প্রশ্ন ওঠে না।

প্রাকৃত অধিকার নামে কিছু থাকতে পারে বলে বেনথাম মনে করতেন না। অন্য দিকে হবস, লক, কান্ট প্রমুখ দার্শনিকদের কাছে প্রত্যয়টি নানাভাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। লকের বিচারে প্রাকৃত অধিকারের অবকাশ চতুর্বিধ ক্ষেত্রে: জীবন, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি; তার মধ্যে প্রথমটি ছাড়া বাকিগুলো হস্তান্তরযোগ্য। শর্তসাপেক্ষ সব অধিকার আইনের দৃষ্টিতে ছাড়া সম্ভব, কিন্তু জীবনের অধিকার হস্তান্তর কোনো আইনে সিদ্ধ নয়।

প্রাকৃত অধিকারের মানদণ্ডে আইনানুগ অধিকারের মূল্যবিচার হয় এবং ব্যক্তিমানুষের জীবননির্বাহ, শ্রম এবং সম্পত্তির ব্যবহারে সেটা অপরের বিশেষ করে রাষ্ট্রের দমন কিংবা হস্তক্ষেপ নিবারণ করে। প্রাকৃত অধিকার যে স্বতঃসিদ্ধভাবে গ্রহণযোগ্য এবং মূলত সেটা মানবপ্রকৃতি থেকে উৎসারিত সে বিষয়ে বিস্তর মতোভেদ আছে।

প্রাকৃতিক আইন (Natural Law)

বিশ্বপ্রকৃতি যে নিয়মে পরিচালিত হয় এবং প্রাকৃতিক ঘটনাবলী ঘটে থাকে, তাকেই বলে প্রাকৃতিক আইন। যেমন, মধ্যাকর্ষণের নিয়ম, গতির নিয়ম, বিপরীত সত্তার দ্বন্দ্বের নিয়ম ইত্যাদি। এই আইনের প্রবক্তারা সামাজিক ক্ষেত্রেও প্রাকৃতিক আইন বলবৎযোগ্য বলে বিবেচিত করেন।

প্রাকৃতিক ধর্ম (Natural Religion)

মানুষের বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সৃষ্ট এবং সৃষ্টিকর্তাসহ সকল প্রকার অতিপ্রাকৃত শক্তির সঙ্গে সম্পর্কহীন ধর্ম।

প্রাচীন যুগ (Ancient Period)

সময় ও ঘটনার প্রবাহকে এক একটি স্বতন্ত্র যুগ দিয়ে চিহ্নিত ও বিচ্ছিন্ন করা যায় না। কিন্তু এই প্রাথমিক অসুবিধা সত্ত্বেও পণ্ডিতেরা আলোচনার সুবিধার্থে ইতিহাস ও রাজনীতিক ধ্যান ধারণার বিকাশকে বিভিন্ন যুগে ভাগ করেছেন। তেমন একটি সময় প্রাচীন যুগ। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ শতক থেকে ৬২৯ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন যুগ। এই যুগকে গ্রিক দর্শনের যুগও বলা হয়। গ্রিক দর্শনের যুগকে আবার ৩ ভাগে ভাগ করা হয় যথা: প্রাক-সক্রেটিস যুগ (Pre-Socrates Perio) গ্রিক দার্শনিক থেলিস্ (Thales) থেকে সোফিস্টদের (Sophists) দার্শনিক চিন্তধারা পর্যন্ত এর বিস্তৃত। সক্রেটিস (Socraties), প্লেটো (Plato) ও অ্যারিস্টটল (Aristotle) এর দর্শন। অ্যারিস্টটল পরবর্তী দার্শনিকবৃন্দের দর্শন থেকে প্রোক্লাস (Proclas) এর দর্শন পর্যন্ত বিস্তৃত। সফোক্লিস (Sopocles), ইউরিপাইড্স (Uripides), সোলোন (Solon), ফিদাস (Phidas), পলিকিটাস (Policletus), ইউক্লিড (Euclid), হিপ্পোক্রেটস্ (Hippocrates) প্রমূখ।

প্রাচ্য রাষ্ট্রদর্শন (Oriental Political Thought)

খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য দর্শনের পাশাপাশি প্রাচ্যের দেশসমূহে রাষ্ট্রদর্শনের প্রভাব অব্যাহত থাকে। ওই সময় সাময়িককালে চীন, মিশর সিরিয়া, ভারত ও ইরানে রাষ্ট্রদর্শনের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। এই সব দর্শনকে ওই একই কারণে প্রাচ্য রাষ্ট্রদর্শন বলে (Oriental Political Thought) অভিহিত করা হয়।

প্রার্থী (Candidate)

প্রার্থী, সাধারণ অর্থে, যেকোনো ব্যাপারে প্রতিযোগীর ওপরই এটা প্রযোজ্য। তবে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে এটা বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। আইনপরিষদের সভ্য হবার জন্য যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে তাদের প্রত্যেককেই প্রার্থী বা 'Candidate' বলা হয়ে থাকে , যেমন-'Presidential Candidate'.

প্রিভি কাউন্সিল (Privy Council)

প্রিভি কাউন্সিল প্রথম দিকে ব্রিটিশ রাজা বা রানির উপদেষ্টা কাউন্সিল ছিল। এখন আর এটিকে উপদেশের জন্য ডাকা হয় না। বর্তমানে রাজা বা রানি প্রিভি কাউন্সিলের সামনে কোনো বিল বা ঘোষণা অনুমোদন দান করেন এবং ধরে নেওয়া হয় যে রাজা বা রানি প্রিভি কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত করেছেন। বস্তুত রানির অনুমোদনের জন্য প্রেরণের পূর্বে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় বিষয়টি বিবেচনা ও সুপারিশ করে। বলাবাহুল্য, মন্ত্রিসভাও প্রিভি কাউন্সিলের একটি অনানুষ্ঠানিক কমিটি এবং সকল কেবিনেট মন্ত্রী (এবং কতিপয় অন্যান্য মন্ত্রী) পদাধিকার বলে প্রিভি কাউন্সিলের সদস্য। কোনো কোনো সময় রাষ্ট্রের জন্য অসাধারণ কাজের পুরস্কার হিসাবেও 'প্রিভি কাউন্সিলার' এই অবৈতনিক উপাধি প্রদান করা হয়। প্রিভি কাউন্সিলরদের সম্বোধন করা হয় 'নাইট অনারেবল' বলে। প্রিভি কাউন্সিলের বিভিন্ন কমিটি আছে যেগুলো বসে কদাচিৎ। তবে এর মধ্যে যে কমিটিটি প্রায়শই বসে, সেটি হলো বিচারসংক্রান্ত কমিটি। এই কমিটি সাধারণত বিচার বিভাগীয় উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা (যেমন— লর্ডস, সাবেক জর্জ প্রভৃতি) যাঁরা প্রিভি কাউন্সিলরও বটে তাঁদের নিয়েই গঠিত হত। ব্রিটিশ কমনওয়েলথের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত আপিলের শুনানি প্রদান ছাড়াও রাজা বা রানি কর্তৃক প্রেরিত চার্চ সংক্রান্ত আপিলের শুনানি প্রদানও প্রিভি কাউন্সিলের এই কমিটির দায়িত্বের অর্ন্তভূক্ত।

প্রেশার গ্রুপ (Pressure Group)

প্রেশার গ্রুপ বা চাপসৃষ্টিকারী গ্রুপ ঠিক রাজনৈতিক দল নয়, বরং কিছু লোকের সংঘ বা সমিতি, যে সমিতি কোনো একটি বিশেষ লক্ষ্য হাসিলের জন্য সরকার বা সংশ্লিষ্ট দল বা মহলের ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। প্রেশার গ্রুপ তাদের লক্ষ্য হাসিলের জন্য যে সমস্ত পন্থা অবলম্বন করতে পারে, তা হল সংবাদপত্রে লেখালেখি, জনমত সৃষ্টি, গণদরখাস্ত প্রদান, সভা মিছিলাদি অনুষ্ঠান, ধর্মঘট প্রভৃতি। প্রেশার গ্রুপের কাজ হয় মূলত প্রচারধর্মী।

প্রোটোকল (Protocol)

প্রোটোকল হলো একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে কোনো চুক্তি বা কার্য সম্পাদনের পূর্ব প্রস্তুতি বা আনুষ্ঠানিকতা। সাধারণত একাধিক রাষ্ট্র, সরকার বা পক্ষের মধ্যে আনুষ্ঠানিক চুক্তি

সম্পাদিত হওয়ার আগে কূটনৈতিক পর্যায়ে চুক্তির যে চূড়ান্ত দলিল তৈরি করা হয় সেটাকেই প্রোটোকল (Protocol) বলে। তা ছাড়া, কূটনৈতিক শিষ্টাচার বা আচরণবিধিকেও প্রোটোকল বলা হয়।

প্লেটো (Plato)

প্লেটোর জন্ম খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭ সালে একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারে। যুবক বয়সেই বিশিষ্ট দার্শনিক সক্রেটিসের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ঘটে এবং প্লেটোর বন্ধু ও পরামর্শদাতায় পরিণত হন। খ্রিস্টপূর্ব ৩৯৯ সালে ৭০ বছর বয়সী সক্রোটিসকে দর্শনহীনতা ও এবং এথেন্সের যুবকদের বিপথগামী করার সুস্পষ্ট অভিযোগে বিচার করা হয়। সক্রেটিসকে দোষী সাব্যস্ত করে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করা হয় এবং তাঁর সাজা কার্যকর করা হয়। প্লেটো সেক্রটিসেকে তাঁর দেখা 'সবচেয়ে প্রজ্ঞাবান, ন্যায়পরায়ণ ও শ্রেষ্ঠলোক' হিসেবে বিবেচনা করতেন। সেই সক্রেটিসের মৃত্যুদণ্ড প্লেটোর মধ্যে গণতান্ত্রিক সরকারবিরোধী এক দীর্ঘসূত্রী অনীহা এনে দেয়। সক্রেটিসের মৃত্যুর কিছুদিনের মধ্যেই প্লেটোর এথেন্স ত্যাগ করেন এবং পরবর্তী দশ-বারো বছর বিদেশ ভ্রমণে কাটান। খ্রিস্টপূর্ব ৩৮৭ সালের দিকে এথেন্সে ফিরে এলে প্লেটো 'দি অ্যাকেডেমি' নামে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন যা পরবর্তী নয়শত বছর ধরে চালু ছিল। জীবনের বাকি চল্লিশ বছর প্লেটো এথেন্সে শিক্ষকতা ও দর্শন সংক্রান্ত লেখালেখি করে কাটান। তাঁর একজন বিখ্যাত ছাত্র হচ্ছেন অ্যারিস্টটল, যিনি সতেরো বছর বয়সে অ্যাকাডেমিতে আসেন। প্লেটোর বয়স তখন ষাট। খ্রিস্টপূর্ব ৩৪৭ সালে আশি বছর বয়সে প্লেটোর মৃত্যু হয়। প্লেটো ছিলেন প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক। তিনি পাশ্চাত্য রাজনৈতিক দর্শনের এবং আধুনিক মানুষের নৈতিক ও অধিবিদ্যামুলক চিন্তাভাবনার সূচনলগ্নের প্রতিনিধিত্ব করেন। এ সমস্ত বিষয়ে তাঁর দুরকল্পনা বিগত ২৩০০ বছর ধরে পঠিত হয়ে আসছে। প্লেটোকে তাই পাশ্চাত্য চিন্তার একজেন পিতৃপুরুষ বিবেচনা করা হয়। প্লেটোর পিতার নাম এরিস্টন আর মাতার নাম পেরিক্টন। প্লেটোর পিতৃদত্ত নাম চির এরিসটোক্লিস। প্লেটোর গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে- *রিপাবলিক, দ্রঅপোলজি, ল্যাচেস, লজ, ফিডো, ক্রিটো, জর্জিয়াস, ফায়োডো, পারমিনাইইডস, মিয়েউস, প্রটাগোরাস, প্রিস্পাজিয়াম, আইনয়ন, মেনো, থিয়ায়েটটাস, চারমাইডিস, ইউাথডেমাস, ফিরেবাস, ফায়েডাস, স্টেটসম্যান, সোফিস্ট প্রভৃতি।* প্লেটোর সবেচেয় বিখ্যাত গ্রন্থ *দি রিপাবলিক*। এই গ্রন্থে প্লেটোর আদর্শরাষ্ট্রের ধারণা সংকলিত আছে। এই গ্রন্থে উপস্থাপিত তাঁর চিন্তাকে সরলীকরণ করে বলা যায় যে, প্লেটোর বিবেচনায় শ্রেষ্ঠ সরকার পদ্ধতি হচ্ছে অভিজাততন্ত্র। অভিজাততন্ত্র বলতে প্লোটা বংশানুক্রমিক অভিজাততন্ত্র অথবা রাজতন্ত্রকে বোঝাননি। এর অর্থ মেধার অভিজাতন্ত্র, অর্থাৎ রাষ্ট্রের শ্রেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাবানদের শাসন। এতে নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত হবেন না। সংযোজন পদ্ধতির মাধ্যমে নির্বাচিত হবে। যারা ইতিমধ্যেই শাসকশ্রেণি বা অভিবাকশ্রেণির সদস্য তাঁরা শুধুমাত্র মেধার ভিত্তিতে এই শ্রেণিতে অতিরিক্ত সদস্য সংযোজন করতে পারবেন। অভিভাবকশ্রেণিতে সদস্য হবার যোগ্যতা

প্রমাণের জন্য সকল নারী ও পুরুষকে সুযোগ দেয়া উচিত বলে প্লেটো বিশ্বাস করতেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, প্লেটো হচ্ছেন সর্বপ্রথম এবং অনেক দিনের জন্য একমাত্র গুরুত্বপূর্ণ দার্শনিক, যিনি নারী ও পুরুষের মৌলিক সাম্যের কথা উল্লেখ করছেন। সুযোগের সাম্য চিহ্নিত করার জন্য প্লেটো সকল শিশুর শিক্ষা ও প্রতিপালন রাষ্ট্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হওয়া উচিত বলে মতো প্রকাশ করেন। শিশুদের প্রথমে দৈহিক প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। কিন্তু সংগতি, গণিত এবং অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষকও অবস্থা করা চলবে না। বিভিন্ন স্তরে ব্যাপক পরীক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে। পরীক্ষায় অপেক্ষাকৃত কম সফল ব্যক্তিদের জন্য অতিরিক্ত শিক্ষার ব্যাবস্থা করতে হবে।

এছাড়া কেবল তারাই অভিভাবকশ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত হবে না যারা সুপষ্টভাবে জনকল্যাণে আগ্রহী হবেন। অভিভাবশ্রেণির সদস্যপদ সকলের কাছে অভিপ্রেত বস্তু নাও হতে পারে। তাঁদেরকে খুব সামান্য ব্যক্তিগত সম্পদ প্রদান করা হবে এবং তাদের জমির মালিকানা ও ব্যক্তিগত বাড়ি থাকবে না তাদেরকে নিকৃষ্ট হাতের নগণ্য সম্মানী দেওয়া হবে। এবং তাঁরা স্বর্ণ অথবা রৌপ্যের মালিক হবেন। না। অভিভাবকশ্রেণির সদস্যদের আলাদা পরিবার থাকবে না, তাঁরা একই সঙ্গে খাদ্য গ্রহণ করবেন, এবং তাঁদের সাধারণ সঙ্গ থাকবে। এই দার্শনিক রাজাদের বস্তুগত সম্পদ থাকবে না, জনগণের সেবাই তাদের সন্তুষ্টি। সংক্ষেপে এই ছিল প্লেটোর আদর্শ প্রজাতন্ত্রের ধারণা। *দি রিপাবলিক* বহু শতাব্দী ধরে ব্যাপকভাবে পঠিত হয়েছে। অবশ্য যে-রাজনৈতিক পদ্ধতির কথা এখানে উল্লিখিত আছে সেটিকে বাস্তবে কোনো সরকারি ব্যবস্থার মডেল হিসেবে কখনো ব্যবহার করা হয়নি। প্লেটোর সময় থেকে বর্তমান পর্যন্ত বেশিরভাগ ইউরোপীয় রাষ্ট্র বংশানুক্রমিক রাজতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয়েছে। গত কয়েক শতকে বেশকিছু দেশ গণতন্ত্রকে রাষ্ট্রব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছে। সামরিক শাসন এবং হিটলার ও মুসোলিনির মতে বক্তৃতাবসর্বস্ব নিপড়িনমূলক সরকারেরও উদাহারণ রয়েছে। কোনটি প্লেটোর আদর্শ প্রজাতন্ত্র অনুরূপ নয়। কখনও কোনো রাজনেতিক দল প্লোটোর সূত্র গ্রহণ করেননি; কার্ল মার্কসের মতো তাঁর সূত্রের ওপর নির্ভর করে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন হয়নি। কিন্তু এটা ভাবা বোধকরি ঠিক হবে যে, প্লেটোর ভাবনা সম্মানিত হলেও ব্যবহারিক প্রয়োগে তাঁকে সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে যাওয়া হয়েছে। একথা সত্য, কোনো ইউরোপীয় বেসামরিক সরকার সরাসরি প্লেটোর মডেল অনুযায়ী সৃষ্ট হয়নি, তবুও মধ্যযুগীয় ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ এবং প্লেটোর অভিভাবকশ্রেণির মধ্যে বিস্ময়কর মিল রযেছে বলে যুক্তি প্রদর্শিত হয়েছে। মধ্যযুগীয় চার্চ ছিল একটি চিরস্থায়ী ও স্বনির্মিত এলিটশ্রেণি। যার সকল সদস্যকে একটি স্বীকৃত দর্শনে প্রশিক্ষণ নিতে হত। আদর্শভাবে পারিবারিক অবস্থান নির্বিশেষে সকল পুরুষ যাজকশ্রেণিতে অন্তর্ভূক্ত হতে পারতেন, অবশ্য মহিলাদেরকে বাদ দেয়া হত। নীতিগতভাবে এই শ্রেণির সদস্যদের কোনো ব্যক্তিগত পরিবার ছিল না এবং আত্মন্নয়নের বাসনা পরিহার করে তাঁরা তাদের অনুসারীদের স্বার্থ সম্পর্কেই সচেতন থাকবেন বলে আশা করা হত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকার-কাঠামোও প্লেটোর আদর্শ দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে।

আমেরিকান সাংবিধানিক কনভেনশনের অনেক সদস্যই প্লেটোর রাজনৈতিক ধারণার সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সংবিধানের মূল উদ্দেশ্য ছিল জনগণের আকাঙ্ক্ষা নির্দিষ্ট করে সেটিকে বাস্তবে রূপ দেয়া, কিন্তু একই সাথে সর্বশ্রেষ্ঠ ও প্রজ্ঞাবানদের নির্বাচিত করে রাষ্ট্র শাসন করার ক্ষমতা দেওয়াও ছিল এর লক্ষ্য।

প্লেটোবাদ (Plato)

প্লেটোবাদ হল গ্রিক দার্শনিক প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) এর মতবাদ। তাঁর রচনাবলী কথোপকথনের আকারে রচিত। তার মধ্যে প্রোটাগোরাস, ফেডো, সিম্পোজিয়াম, রিপাবলিক ইত্যাদিই সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। তাঁর রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্পর্কিত মতবাদ 'রিপাবলিক' গ্রন্থে প্রকাশ পায়। প্লেটোই সর্বপ্রথম নীতিতত্ত্ব (Principles of Ethics) প্রণয়ন করেন। তাঁর দার্শনিক মত হল এই যে, বিশ্বপ্রকৃতি, মানুষ ও সকল বস্তু এক শাশ্বত (অবিনশ্বর) ভাব ও নিয়মেরই বহিঃপ্রকাশ। সমাজনীতি সম্পর্কে তিনি বলেন যে, সমাজব্যবস্থা এমন হওয়া উচিত, যাতে সমাজের প্রত্যেক সদস্য পূর্ণমাত্রায় ন্যায়বিচার পায়, পূর্ণমাত্রায় তাদের সর্বাঙ্গীন মঙ্গলবিধান সম্ভাবপর হয় এবং প্রত্যেকের জীবন পূর্ণমাত্রায় বিকশিত হতে পারে। রাজনীতি সম্পর্কে তিনি 'রিপাবলিক'-এ বলেন যে, যে-সরকার প্রজাদের নৈতিক আদর্শে শক্তিমান করার চেষ্টা করে না, যে-সরকার পবিত্র, সত্য ও মঙ্গলময় বিষয়ে প্রজাদের উদ্বুদ্ধ করার মাধ্যমে মর্যাদাশীল জাতিগঠনের প্রয়াস পায় না, সে-সরকার সরকার নামেরই অযোগ্য। প্রেম সম্পর্কে তাঁর মত হল এই যে, নিষ্কাম, ইন্দ্রিয়-লালসামুক্ত আত্মার সঙ্গে অনুরূপ আত্মার মিলনের মধ্যেই সত্যিকার প্রেমের মর্ম নিহিত।

প্লেবিয়ান (Plebian)

প্লেবিয়ান গ্রিক শব্দ যার অর্থ ইতরজন। প্রাচীন যুগে গ্রিক ও রোমান সভ্যতা দাস সমাজভিত্তিক ছিল। এই সমাজে ক্রীতদাস বা প্লেবিয়ানদের ভোটাধিকার তো দূরের কথা, কোনো প্রকার নাগরিক বা মানবিক অধিকারই ছিল না; তাদেরকে সিটিজেন বা নাগরিক বলেই গণ্য করা হত না। বস্তুত, প্লেবিয়ানরা মালিকশ্রেণি বা প্যাট্রিশিয়ানদের অন্যান্য গৃহস্থালির দ্রব্য বা পশুপাখির মতোই দ্রব্য বা পণ্যসামগ্রী ছিল মাত্র। অবশ্য, আধুনিককালে প্লেবিয়ান বলতে সাধারণ জনগণকেই বোঝায়। এই শব্দ থেকেই প্লেবিসাইট বা গণভোট কথাটির উৎপত্তি।

ফকল্যান্ড (Falkland)

ফকল্যান্ড একটি প্রবীণ ব্রিটিশ উপনিবেশ। আর্জেন্টিনা হতে ৪০০ মাইল পূর্বে দক্ষিণ আটলান্টিক মহাসাগরে অবস্থিত একটি দ্বীপ। এর রাজধানী পোর্টস্ট্যানলী। এ দ্বীপের অধিকারকে কেন্দ্র করে ১৯৮২ সালের এপ্রিল-জুন মাস পর্যন্ত আর্জেন্টিনা ও ব্রিটেনের মধ্যে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয়।

ফরায়েজি বিদ্রোহ (Faraiji Movement)

ওহাবি আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত হাজী শরিয়তউল্লাহ ১৮২০ সালে ফরায়েজি মতবাদ প্রচার শুরু করেন। তাঁর মৃত্যু পর তাঁর পুত্র মুহাম্মদ মহসীন (দুধু মিয়া) এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ফরায়েজিরা স্বাধীন রাজ্য স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করেন, দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খলিফা বা প্রতিনিধি নিয়োগ করেন, জমিদার ও নীলকরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন এবং ১৮৩১ সালে বেআইনি কর দিতে অস্বীকার করেন। হিন্দু প্রজারাও এই আন্দোলনে যোগ দেয়। ফরায়েজিরা ঘোষণা করেন, "জমি আল্লাহর দাম ব্যক্তি মালিকানায় বা বংশ পরম্পরায় জমি ভোগ করার অধিকার কারও নেই।" ১৮৩৮ সালে বিদ্রোহ প্রবল হলে উঠলে দুধু মিয়া গ্রেফতার হন, কিন্তু অপরাধ প্রমাণিত না হওয়ায় মুক্তিলাভ করেন। অতঃপর ফরায়েজিরা মহাজনদের ঋণ পরিশোধ বন্ধ করে দেন এবং নিজস্ব আদালত স্থাপন করেন। ১৮৫৭ সালে দুধ মিয়া পুনরায় গ্রেফতার হন এবং মুক্তি পান। ১৮৬০ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। ফরায়েজি বিদ্রোহের মৌল উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে গোঁড়ামিমুক্ত ও সর্বজনীন করা, ইংরেজদের বিতাড়ন করা এবং প্রজাদের শোষণমুক্ত করা। বস্তুত ফরায়েজি বিদ্রোহ ছিল ওহাবি আন্দোলনেই অংশবিশেষ।

ফরাসি বিপ্লব (French Revolution)

১৭৭৮ থেকে ১৭৯৯ সাল পর্যন্ত ফ্রান্সের নানা উত্তাল ঘটনাধারা 'ফরাসি বিপ্লব' নামে ইতিহাস প্রসিদ্ধ হয়ে আছে। ফরাসি দেশে সামন্ত যুগের পুরনো বিধি-বিধান পাল্টে আধুনিক যুগের সূচনা ঘটে এবং রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও পুরোহিততন্ত্রের সম্মিলিত সামাজিক আধিপত্যের অবসান হয় এই বিপ্লবের ফলে। ইতিহাসবিদগণ সাধারণভাবে ফরাসি বিপ্লবের যেসব কারণ নির্দেশ করে থাকেন সেগুলো হলো: ১. গোটা ইউরোপে তৎকালীন ফ্রান্সের জনসংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি এবং জনগণের জন্য পর্যাপ্ত খাবার ছিল না, ২. ধনী ও নতুন বুর্জোয়াদের ক্ষমতায় কোনো ধরনের অংশ ছিল না, ৩. চাষীরা ছিল সচেতন এবং সামন্তব্যবস্থায় তাদের দুর্গতির অন্ত ছিল না, ৪. সামাজিকও রাজনৈতিক পরিবর্তনের কথা যেসব দার্শনিক বলতেন তাঁদের বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল, ৫. আমেরিকার স্বাধীনতাযুদ্ধে ফরাসি সহায়তা রাষ্ট্রীয় কোষাগার প্রায় শূন্য করে তুলেছিল।

সব মলিয়ে সংকট ঘনিয়ে আসছিল এবং পরিবর্তনের জন্য উন্মুখ হয়ে উঠছিল সবাই। ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুইয়ের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে অভিজাত সম্প্রদায় চাচ্ছিল তাদের ক্ষমতা জোরদার করে নিতে। পক্ষান্তরে রাজা যখন এস্টেটস জেনারেল বা অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন, তখন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা তাদের অধিকতর ব্যাপকভিত্তিক পরামর্শক সভা ডাকতে বাধ্য হলেন, তখন সাধারণ মানুষের প্রতিনিধিরা তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করলো। ইংল্যান্ডের শাসনতন্ত্র ও বিচারব্যবস্থা এবং আমেরিকার স্বাধীনতা সংগ্রামের সাফল্যে উদ্বুদ্ধ ফরাসি দার্শনিক লেখকবৃন্দ (যেমন- ভলত্যার, রুশো) পুরনো বিধানকে বাতিল করে ব্যক্তি

অধিকার ও প্রতিনিধিত্বশীল সরকারের পক্ষে জোরালো মত প্রচার করেছিলেন। ত্রিমুখী এই টানাপোড়নে শেষ থার্ড এস্টেটস বা জনগণের পক্ষের শক্তি নিজেদেরকে জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ হিসেবে ঘোষণা করে এবং একটি লিখিত ফরাসি সংবিধান প্রণয়েনের দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করে। বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ ও দখলের মাধ্যমে জনগণের বিপ্লবী অভ্যুত্থান জয়যুক্ত হয় এবং আজও এই তারিখটি বিশ্বব্যাপী ফরাসি বিপ্লবের দিন হিসেবে পালিত হয় ১৭৮৯ সালের ১৪ জুলাই।

নতুন জাতীয় পরিষদের যুগান্তকারী সিদ্ধান্তের মধ্যে ছিল সামন্তবাদের অবসান সংক্রান্ত ডিক্রি এবং মানুষের অধিকার সংক্রান্ত ঘোষণা। সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার বাণী উচ্চারণকারী ফরাসি বিপ্লব নানা জটিলতার ভেতর দিয়ে অগ্রসর হয়ে অবশেষে নেপোলিয়নের অভ্যুদয় আবার একনায়কী ব্যবস্থায় পতিত হয়। কিন্তু ফরাসি বিপ্লবের পর কোনো কিছু আর আগের মতো ছিল না। বিপ্লবের প্রতিক্রিয়া মুছে ফেলার শক্তি নেপোলিয়নেরও ছিল না। অভিজাতশ্রেণী ও ধর্মগুরুরা বিপ্লবের পূর্বের ক্ষমতা আর ফিরে পায়নি। মধ্যবিত্ত শ্রেণি ও কৃষকদের বর্ধিত অধিকার ও অর্জনকে সমীহ করে চলতে হয়েছিল সবাইকে। বিশ্বব্যাপী মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে যুগ যুগ ধরে প্রেরণাসঞ্চারী হয়ে আছে ফরাসি বিপ্লব।

বিপ্লবের মধ্য দিয়ে প্রমাণিত হয়েছে যুক্তি ও স্বাধীনতাই সত্য, নিয়ন্ত্রণ ও নিবর্তন মিথ্যা, কুসংস্কার ও ধর্মীয় বিধিনিষেধ, সাবেকি ব্যবস্থা চলতে পারে না। চাই নতুন ব্যবস্থা, অমূল সংস্কার, জমিদারের শোষণ, চার্চের সেলামী, রাজার খাজনার চাপে জনজীবন বিপর্যস্ত। সামন্ততান্ত্রিক চাপ ও ধর্মীয় বিধিনিষেধের ভার থেকে এবং সরকারি নিয়ন্ত্রণের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হবার জন্য ধনিক শ্রেণি ও আকুল। ফরাসি বিপ্লব গরিব ও ধনী সকলকে একত্র করেছে পুরোনো ব্যবস্থা ধ্বংস করে। ফরাসী বিপ্লবের সার্থকতা হল রাজতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র সামন্ততন্ত্রের সংকীর্ণ স্বার্থপর নৈতিকতার বিরুদ্ধে আমরা পেলাম নতুন নৈতিকতার ধারণা শোষকদের প্রতি ঘৃণা, পুরনো কুসংস্কার ও বিধিনিষেধের বিরুদ্ধে রুখে দাড়ানোর শক্তি, জনগণের প্রতি ভালোবাসা ও দেশপ্রেম।

ফিজি (Fiji)

অস্ট্রেলিয়ার পূর্বে দক্ষিণ-প্রশান্ত মহাসাগরের একটি দ্বীপ। ১৯৭০ সালের ১০ অক্টোবর এটা ব্রিটেনের নিকট হতে স্বাধীনতা লাভ করে। এর রাজধানীর নাম সুভা। এর আয়তন ৭১০০ বর্গমাইল। লোকসংখ্যা প্রায় ৬ লক্ষ ২৫ হাজার।

ফিনিসীয় সভ্যতা (*Phoenicians* Civilization)

সিরিয়ার মরুভূমির পশ্চিমে অবস্থিত লেবানন পবর্তশ্রেণি ও ভূমধ্যসাগরের পূর্ব উপকূলের মধ্যবর্তী ২০০ মাইল লম্বা ও ২০ মাইল চওড়া সংকীর্ণ পার্বত্য দেশ প্রাচীনকালে ফিনিসিয়া (Phoenica) নামে পরিচিতি ছিল। পরবর্তী কালের কেননা নামে পরিচিত ভূমিই ফিসিসিয়া। এই নামটি গ্রিকদের দেয়া। তবে কেনান অঞ্চলের বলে

তারা কখনো কখনো কেনানী নামেও পরিচিত। এমনকি তাদের প্রধান নগর সিডোন থেকে এরা সিডোনীয় নামেও অভিহিত হয়। তাদের ভাষা সেমিটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। ফিনিসীয়রা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন নগররাষ্ট্রে বাস করতো। নগরগুলো ঐক্যবদ্ধ করে তারা কোনো একক বড় রাষ্ট্র গড়ে তুলতে পারেনি। সমুদ্রতীরের বাসিন্দা হিসেবে তারা দক্ষ নাবিক এবং নৌচালনায় বিশেষ পারদর্শী ছিল। তারা ব্যবসা-বাণিজ্যেও ছিল পরাঙ্গম। তারা ছিল প্রাচীন পৃথিবীর আদিম বণিক সম্প্রদায়। বাণিজ্যের স্বার্থে প্রাচীন মিশরের সঙ্গে তাদের ঘনিষ্ঠতা ছিল। ফলে তারা পারস্পারিকভাবে একে অপরকে সাংস্কৃতিক দিকেও প্রভাবিত করেছিল। ব্যাবিলনের সঙ্গেও তাদের বাণিজ্যিক লেনদেন ছিল। ব্যাববিলনীয় সভ্যতা ফিনিসীয়দের খুবই প্রভাবিত করে। তারা ব্যাবিলনীয়দের কিইনিফর্ম লিখনপদ্ধতি গ্রহণ করে এবং পুরাকাহিনীগুলো সারা দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বাণিজ্য করতে গিয়ে ছড়িয়ে দেয় (যেমন, মহাপ্লাবনের কাহিনী)। খ্রিস্টপূর্ব এগারো শতক থেকে ফিনিসীয়রা স্বাধীনভাবে প্রায় আড়াইশ বছর অপ্রতিহত ক্ষমতা ভোগ করে। সারা ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল তাদের প্রভাবাধীনে চলে আসে। জিব্রাল্টার প্রণালীর উভয় পাশ পর্যন্ত এর প্রভাব বিস্তৃত হয়। খ্রিস্টপূর্ব ছয় শতকে তারা সম্ভবত আফ্রিকা পরিভ্রমন করে। আফ্রিকার উত্তরে অবস্থিত কার্থেজ ছিল তাদের প্রধান উপনিবেশ, বিশাল বানিজ্যকেন্দ্র। ফিনিসীয়দের উপনিবেশগুলোও মুল মার্তৃনগরগুলোর মতো করে তৈরি হতো। বহু কারিগর- শিল্পশ্রমিক, ব্যবসায়ী ও নাবিক সেখানে বসবাস ক্ষমতা। ফিনিসিয়ায় অবস্থি ত সিডোন, টায়ার ইত্যাদি নগর বানিজ্যকেন্দ্র হিসেবে তৎকালে জগদ্বিখ্যাত হয়ে ওঠে। খ্রিস্টপূর্ব নয় শতকের মাঝামাঝি অ্যাসেরীয়রা ফিসিসিয়ার নগরগুলো দখল করে নেয়। পরে এগুলো অধিকৃত হয় ব্যবলিনীয়দের দ্বারা। এর পরে পারসিকেরা তাদের ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। তাবে পারসিকদের সময় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং নৌ-দক্ষতার কাজকর্ম পুরোদমে চলে। অতঃপর ফিনিসীয়রা গ্রিকদের অধীনে চলে যায় এবং গ্রিক ভাষা ও সংস্কৃতি তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। ৬৪ সালে রোমানরা ফিনিসীয়দের আবাসস্থলকে প্রদেশে পরিণত করে এবং বৈরুত নামক স্থানে একটি আইন বিদ্যালয় স্থাপন করে। খ্রিস্টীয় ছয় শতকের দিকে আরবেরা ফিনিসীয়া অঞ্চল দখল করে। বিভিন্ন দেশের দ্বারা বিজিত হতে ফিনিসীয়রা তাদের আদি বৈশিষ্ট্য হারিয়ে ফেলে। কিন্তু বিশ্বে তাদের বিশেষ দুটি অবদান অনস্বীকার্য: এক. সভ্যতার ধারক হিসেবে নানা স্থানে তা বিস্তৃত করা এবং দুই. তাদের অঞ্চল থেকে গ্রিক অক্ষরের উদ্ভব, যা থেকে পরবর্তী রোমান এবং ইউরোপীয় বর্ণমালার উৎপত্তি। গ্রিক সভ্যতার শ্রেষ্ঠ কাল হচ্ছে খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চাশ শতকে থেকে শুরু করে কয়েক দশক পর্যন্ত স্থায়ী এথেন্সে পেরিকিসের শাসানামল। এই সময় বিজ্ঞান, সাহিত্য, শিল্পকলা দর্শনসহ বিভিন্ন ক্ষেত্র চরম সাফল্য অর্জিত হয়।

পারস্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধে (খ্রিস্টপূর্ব ৪৯০-৪৮০) জয়লাভ করার পর এথেন্স হয়ে ওঠে এই সভ্যতার পীঠস্থান। এই সময় অবীনত হয়। এসব নাকের রচয়িতাদের মধ্যে প্রধানতম হলে ইস্কাইলাস, সোফোক্লেস, এউরিপিদের ও আরিস্তোফাসেন। বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে রঙ্গমঞ্চ বা থিয়েটার প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক অবদান গ্রিকদেরই।

ইতিহসাশাস্ত্রে সূত্রপাত হয় প্রাচীন গ্রিস থেকেই। হোরোডোটাসকে বলা হয় 'ইতিহাসের জনক'। খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গ্রিক দর্শনের আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত করে আলেস। এরপর আবির্ভূত হন দিকপাল দার্শনিক সক্রেটিস, প্লেটো, অ্যারিস্টটল, হেরোডেটাস, ডিমোক্রিটাস, আনাক্সোগোরাস প্রমুখ। এদেরই সৃষ্ট দর্শন সমগ্র পাশ্চাত্য ও আধুনিক জগতের চিন্তার গোড়াপত্তন করে। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে গ্রিক সভ্যতার অবদান অতুলনীয়। গণিতশাস্ত্রের সূচনাকালীন হিসেবে পিথাগোরাস অমর হয়ে আছেন। হিপোক্রেটিস চিকিৎসাশাস্ত্রকে কুসংস্কারমুক্ত করে বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর দাঁড় করান। খ্রিস্টপূর্ব দশক থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে গ্রিক ভাস্কর্য, স্থাপত্য চিত্রকলার বিকাশ হতে শুরু করেন। গ্রিসের অলিম্পিক ক্রীড়াকলার অনুসরণে বর্তমান কালে অনুষ্ঠিত অলিম্পিক গেমস এই সভ্যতার কালোত্তীর্ণ প্রভাবকে তুলে ধরে।

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন (Philadelphia Convention)

ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন আমেরিকার স্বাধীনতার ইতিহাসে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা করেছিল। ১৭৮৭ সালে জর্জ ওয়াশিংটনের নেতৃত্বে ফিলাডেলফিয়ার একটি সম্মেলন (Convention) আহ্বান করা হয় যাকে ফিলাডেলফিয়া সম্মেলন (Philadelphia Convention) বলা হয়। এই সম্মেলনে সর্বপ্রথম আমেরিকার ১৩টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এবং সেই উদ্দেশে একটি সংবিধান রচিত ও বিধিবদ্ধ হয়। এই সম্মেলনের অধিবেশন ১৭৮৭ সালের মে মাসের শেষ সপ্তাহে শুরু হয়ে সেপ্টেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে শেষ হয়। প্রথমে মার্কিন সংবিধানের মাত্র ৭টি অনুচ্ছেদ ও ১টি প্রস্তাবনা নিয়ে সংবিধান রচিত ও গৃহীত হয়। ১৩টি অঙ্গরাজ্য নিয়ে যুক্তরাষ্ট্র সৃষ্টি হলেও বর্তমানে অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ৫০। এইসম্মেলনে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসাবে ৭৪ জনকে নির্বাচিত করা হলেও যোগদানের জন্য এসেছিল ৫৫ জন এবং শেষ পর্যন্ত ৪২ জন হাজির ছিলেন। সংবিধানটির আয়তন মুদ্রিত অবস্থায় ১০-১২ পৃষ্ঠার বেশি ছিল না। বর্তমানে ২৬বার সংশোধিত হবার পর এখনও শব্দ সংখ্যা ৬ হাজার অতিক্রম করেনি মুদ্রিত পৃষ্ঠার সংখ্যা ১৫-১৬ এর বেশি হবে না।

ফিলিস্তিন (Palestine)

ফিলিস্তিন প্রাচীনকালের একটি ইহুদি জাতি, যারা বর্তমান প্যালেস্টাইন অঞ্চলে বসবাস করত। এরা পরবর্তীতে অত্যন্ত দুর্নীতিবাজ হয়ে পড়ে এবং সকল সমাজপ্রগতির বিরোধিতা করে। জার্মান কবি হেইনে (Heine) প্রগতি বিরোধীদের এই নামে অভিহিত করতেন। লেনিন নীতিভ্রষ্ট লোকদের এই নামে চিহ্নিত করতেন।

ফুহরার (Fuhrer)

ফুহরার একটি জার্মান শব্দ যার অর্থ হচ্ছে নেতা। জার্মানির নাৎসিনেতা ও একনায়কত্ববাদী নেতা হিটলার ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসার পর ফুহরার উপাধি গ্রহণ করেন।

ফেডারেশন (Federation)

কতিপয় স্বকীয়তা সম্পন্ন রাষ্ট্রের বা রাজ্যের ইউনিয়নই হল ফেডারেশন বা যুক্তরাষ্ট্র। এখানে একটি কেন্দ্রীয় সরকার বিদ্যমান থাকে এবং প্রত্যেক প্রদেশে প্রাদেশিক সরকার বিদ্যমান থাকে। তবে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ যেমন- প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত, মুদ্রাব্যবস্থা ও রাজস্ব সংক্রান্ত বিষয় কেন্দীয় সরকারের হাতে ন্যস্ত। কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ন্যস্ত থাকে। ফেডারেল সরকারের রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত যাবতীয় কাঠোমো বিদ্যমান থাকে এবং ফেডারেল সরকারের সিদ্ধান্তসমূহ অঙ্গরাজ্যসমূহ এবং তাদের নাগরিকদের ওপর প্রযোজ্য হয়। সার্বভৌম ক্ষমতা অংশত ফেডারেল সরকারের ওপর এবং অংশত অঙ্গরাজ্যসমূহ ওপর ন্যস্ত থাকে। যুদ্ধ-ঘোষণা, শান্তি স্থাপন, বৈদেশিক চুক্তি সম্পাদন ইত্যাদির ক্ষেত্রে ফেডারেল সরকারের পূর্ণ কর্তৃত্ব থাকে। অপরদিকে, অঙ্গরাজ্য বা রাষ্ট্রসমূহ স্ব স্ব পরিধিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ কর্তৃত্ব, স্বাধিকার ও স্বায়ত্ত্বশাসনের ক্ষমতা ভোগ করে। ১৮৮৭ সাল পরবর্তী মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ১৮৪৮ সাল পরবর্তী সুইজারল্যান্ড, বর্তমান ভারত ফেডারেশন এর উদাহরণ।

ফেবিয়ান সোসাইটি (Fabian Society)

ফেবিয়ান সোসাইটি একটি সংস্কারপন্থী সমাজবাদী দল। সিডনী ওয়েব ও বিয়াট্রিস ওয়েব, জর্জ বার্নার্ড শ, গ্রাহাম ওয়ালাস, জি. ডি.এইচ. কোল, এডওয়ার্ড আর পিজ প্রমুখ ইংল্যান্ডের একদল উদারপন্থী পণ্ডিত, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী এই মতবাদ প্রচারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। রোমান সেনাপতি জেনারেল কুইন্‌টাস ফেবিয়াস ম্যাকসিমাস্ ভেরুক্‌সাসের-এর নামানুসারে ১৮৮৪ সালে লন্ডনে ফেবিয়ান সোসাইটি জন্ম হয়। রোমান সেনাপতি ফেবিয়াস ম্যাক্সিমাস হ্যানিবলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে গিয়ে কালক্ষেপ করা এবং চূড়ান্ত লড়াই এড়ানোর যে-কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, ফেবিয়ানরা সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য সেই কৌশলকেই যথার্থ বলে বিবেচিত করতেন। তাঁরা শ্রেণিসংগ্রামের জন্য শ্রমিকশ্রেণির অপরিহার্যতা এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। তাঁরা মনে করতেন যে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কার এবং সামাজিক ক্রমবিবর্তনের প্রক্রিয়াতেই পুঁজিবাদী সমাজের সমাজতান্ত্রিক সমাজে রূপান্তর সম্ভবপর। ১৯০০ সালে এই সোসাইটি বিলাতের লেবার পার্টির একটি অংশে পরিণত হয়ে যায়।

ফেয়ার ডিল (Fair Deal)

ফেয়ার ডিল কথাটি ন্যায় ব্যবহার, সততা-পরায়ণ আচরণ অর্থে ব্যবহৃত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের নিজ ডিল বা নয়া ব্যবস্থার মতোই প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান ১৯৪৯ সালে জানুয়ারি মাসে জনগণের, বিশেষ করে নিম্ন আয় শ্রেণির লোকদের জীবন যাত্রার মান্নোয়নের উদ্দেশে এক নীতি বা ন্যায্য ব্যবস্থা ঘোষণা করেন। এর উদ্দেশ্য ছিল মার্কিন জনগণের (বিশেষত নিম্ন আয়ের জনগণের) জীবন-মানের উন্নয়ন এবং

নাগরিক অধিকার সংরক্ষনের বিভিন্ন ব্যবস্থা প্রবর্তন ও ন্যায্য শ্রম আইন প্রণয়ন ইত্যাদির মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা। কিন্তু এই ব্যবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনীতির সম্ভাবনা বাতিল করা হয়। তবে বলা হয় যে, জনগণের বাসস্থান, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা কর্মসূচি এবং জাতীয় উন্নয়ন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের শর্ত হিসাবে অবস্থিত মুদ্রাস্ফীতি ও মুদ্রা সংকোচন ঠেকাতে হবে এবং তার জন্য প্রেসিডেন্টের প্রভাবকে কাজে লাগানোই হবে যথার্থ উপায়। এই ব্যবস্থায় বিদেশে অর্থনৈতিক ও সামরিক সাহায্যের বিষয়ও সন্নিবেশিত করা হয়।

ফ্যাসিবাদ (Fascism)

ফ্যাসিবাদ (ইংরেজি: Fascism) হচ্ছে র‍্যাডিক্যাল কর্তৃত্বমূলক জাতীয়তাবাদের একটি রূপ। যা বিংশ শতাব্দীর শুরুর দিকে ইউরোপে খ্যাতি লাভ করে। ১ম বিশ্বযুদ্ধের পর ইটালিতে ফ্যাসিবাদ উৎপত্তি লাভ করে জাতীয় সিন্ডিক্যালবাদ দ্বারা প্রভাবিত হয়। এটি বিশেষভাবে বামপন্থী রাজনীতির উপাদান গ্রহণের মাধ্যমে ডানপন্থী রাজনীতিতে অবস্থান গ্রহণ করে; এবং এটি ছিল সমাজতন্ত্র, উদারতাবাদ, সাম্যবাদ, ডানপন্থী রক্ষণশীল, গণতান্ত্রিকের বিরোধী। যদিও ফ্যাসিবাদকে বাম-ডান রাজনীতিতে সাধারণভাবে দূর ডানে জায়গা দেয়া হয়, কতিপয় স্ব-ব্যাখ্যাত ফ্যাসিবাদী এবং কিছু মন্তব্যকারীরা বলেছেন যে এই বিবরণ যথার্থ নয়। এটি মুলত রাষ্ট্রের সকল মানুষকে একাত্ম করে একটি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে।

দেশের সকল শ্রেণির মানুষকে একাত্ম করাই অর্থাৎ শ্রেণিবিভাজন দূর করে রাষ্ট্র পরিচালনা করাই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্য। অনেক বিশ্লেষকের মতে ফ্যাসিবাদ পুঁজিবাদ ও সাম্যবাদের মাঝখানে অবস্থিত বা তৃতীয় "অবস্থান" বলেও উল্লেখ করেছেন। ফ্যাসিবাদী অর্থনীতি স্বনির্ভরতার ওপর গুরত্ব দেয়।

ইতালির জাতীয় শ্রমিক আন্দোলন জাতীয়তাবাদ থেকে ফ্যাসিবাদ উত্থান হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে কোনো রাজনৈতিক দলই খোলাখুলিভাবে নিজেদের ফ্যাসিবাদী বলে দাবি করতে চায় না। এখন সাধারণত রাজনৈতিক দলগুলো বিরোধী দলের প্রতি ঘৃণা বা রাগ প্রকাশের জন্য এই শব্দ ব্যবহার করে। ফ্যাসিবাদী রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে জার্মানির অ্যাডলফ হিটলার এবং ইতালির বেনিতো মুসোলিনি উল্লেখযোগ্য।

শাসকগোষ্ঠী যখন গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সামাল দিতে পারে না, তখনই এই পথের আশ্রয় নেয়। ফ্যাসিবাদীরা আঘাত হানে প্রধানত প্রগতিশীল শক্তি ও শ্রমিক শ্রেণির ওপর। ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো ফ্যাসিজম (fascism)। এই মতাদর্শ হলো জাতীয়তাবাদী, স্বৈরতন্ত্রী ও কমিউনিস্ট-বিরোধী। প্রাচীন রোমে ম্যাজিস্ট্রেটের আধিকারিক একটি কুঠার মাঝখানে রেখে একগুচ্ছ লোহার রড সমেতো যে রাষ্ট্রীয় প্রতীক বহন করতেন সেটাই ছিল ফ্যাসিবাদের প্রতীকচিহ্ন। এই আন্দোলন নিজেদের না ধনতান্ত্রিক, না সমাজতান্ত্রিক বলে দাবি ক্ষমতা এবং একটি রাষ্ট্র হিসাবে নিজেদের ব্যবস্থা সুপারিশ করতো। মুসসোলিনি নিজেই লিখেছেন যে 'ফ্যাসিবাদ হলো একাধারে

কর্ম ও চিন্তা'। বস্তুত সেটা ছিল পরস্পরবিরোধী দুটি মনোভাব-তত্ত্ববিমুখ কর্মবাদিতা ও হেগেলীয় অধিবিদ্যার সমন্বয়। কর্মবাদের উৎস ছিল উনিশ শতকের সিন্ডিক্যালিস্ট বিশেষ করে মুসসোলিনির গুরু ঝর্ঝ-এর মতাদর্শ। সর্ল-এর ছিল হিংসাশ্রয়ী মনোভঙ্গী, যাতে ভাঙনের মাধ্যমে গঠনের পথে এগোনোর কথা বলা হয়। সর্বপ্রথম ১৯২২ সালে ইতালিতে ফ্যাসীবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। তারপর এর গোড়াপত্তন হয় জার্মানিতে ১৯৩৩ সালে।

ইতালির যুব সম্প্রদায়ের অজ্ঞানতা ও আক্রমণাত্মক প্রবণতাকে ফ্যাসিবাদ ইন্ধন জোগাত। ফ্যাসিবাদের দুই মহানায়ক ছিলেন ইতালির বেনিটো মুসোলিনি এবং জার্মানির এডলফ হিটলার। বস্তুত প্যাসিবাদ পুঁজিবাদরেই সন্তান। পুঁজিবাদীরা ফ্যাসীবাদের আশ্রয় নেয় দুটি সময়ে, ১. তার বিকাশের সময়ে এবং ২. তার ধ্বংসের সময়ে। ফ্যাসিবাদ জঙ্গি ক্রিয়াকলাপ ও যুদ্ধকেও আহ্বান করে, কারণ তাতে জাতীয় আবেগ তীব্র হয়, এবং সমগ্রের স্বার্থে আত্মাহুতির প্রবণতা উৎসাহিত হয়।

ফ্যুরিয়ার, চার্লস (Francois-Marie-Charles Fouri)

কাল্পনিক সমাজতন্ত্রের একজন বিশিষ্ট রূপকার চার্লস ফ্যুরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭)। তিনি বুর্জোয়া সমাজের কড়া সমালোচনা করেন এবং দারিদ্র্য ও সম্পদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বকে তুলে ধরেন। তাঁর মতে, মানুষের সকল অনুভূতি ও আবেগ (প্রেম, পিতৃত্ব, মাতৃত্ব, বন্ধুত্ব,উচ্চাশা ইত্যাদি) মূলত ভালো। সুতরাং, এগুলোকে অবদমিত কর উচিত নয়। স্খলনের জন্য মানুষ দায়ী নয়, দায়ী সামাজিক পরিস্থিতি। তাই সমাজকে এমনভাবে পরিবর্তন করা উচিত, যাতে মানুষের আবেগ-অনুভূতি স্ফূর্তি পায় এবং বিকাশলাভ করে। তাঁর উদ্ভাবিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় এক-একটি অঞ্চল বা ফ্যালাং-এ কয়েকটি উৎপাদন ইউনিট থাকবে; ওই ফ্যালাং-এর প্রত্যেক সদস্য নিজেদের পছন্দ অনুযায়ী কোনো-একটি উৎপাদন ইউনিটে যোগদান করবে। পেশার সঙ্কীর্ণতা মানুষের সীমিত করে বিধায় তা পরিহার করা হবে এবং ফ্যালাং-এর প্রত্যেক সদস্যই এক থেকে দেড় ঘণ্টা করে এক-একটি কাজ করবেন এবং এভাবে অনেকগুলো ক্ষেত্রে প্রতিদিন কাজ করে যাবেন। ফলে, কাজ হবে একটি বৈচিত্র্যময় আনন্দ এবং এতে উৎপাদনও বেড়ে যাবে। এই ব্যবস্থায় সম্পদের বণ্টন হবে শ্রম ও প্রতিভার ভিত্তিতে। শারীরিক ও মানসিক শ্রমের দ্বন্দ্ব এবং গ্রাম ও শহরের দ্বন্দ্ব নিরসনে তাঁর মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু তিনি সর্বহারা শ্রেণির মার্কসীয় ঐতিহাসিক ভূমিকা গ্রহণ করেননি বিধায় বিপ্লবের গুরুত্বও স্বীকার করেননি। তিনি মনে করতেন যে, জনগণের মধ্যে, বিশেষত পুঁজিপতিদের মধ্যে সমাজতান্ত্রিক প্রচারণাই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রধান উপায়।

ফ্রন্ট (Front)

সাধারণত ফ্রন্ট শব্দের অর্থ হলো মহড়া, সক্রিয় সহযোগিতা ও কার্যক্ষেত্রে ঐক্য। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ শক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মপন্থার ভিত্তিতে কার্যক্ষেত্রে

একাধিক শক্তির মিলন বা ঐক্য। অর্থাৎ কোনো বিদেশি শাসক শোষক বা দেশীয় স্বৈরাচারী সরকার বা আগ্রাসনকারীর বিরুদ্ধে বিভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী বা সংগঠনের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম। সাধারণত ফ্রন্টের শরিকসমূহ নিজ নিজ আদর্শ বা স্বকীয়তা বিসর্জন না দিয়েই কতিপয় সাধারণ কর্মসূচির ভিত্তিতে ঐক্যবদ্ধ হয়। সাধারণ লক্ষ্য অর্জিত হলে ফ্রন্টের প্রয়োজনীয়তাও ফুরিয়ে যায়। আবার অনেক সময় রেডিক্যাল একক সংগঠনের ক্ষেত্রেও 'ফ্রন্ট' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। যুদ্ধের এক একটি ক্ষেত্রেও ফ্রন্ট বলা হয়ে থাকে।

ফ্রন্ট, জাতীয় (National Front)

জাতীয় ফ্রন্ট হলো কোনো পরাধীন বা অর্ধ-স্বাধীন দেশের জাতীয় স্বাধীনতার জন্য বিদেশি শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে উক্ত দেশের বিভিন্ন দেশপ্রেমিক ও শ্রেণি সংগঠনের ফ্রন্ট। বিদেশি শত্রু দ্বারা কোনো স্বাধীন দেশ আক্রান্ত হলে বা আক্রান্ত হওয়ার কোনো আশঙ্কা দেখা দিলে ওই স্বাধীন দেশের বিভিন্ন শ্রেণি ও পার্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে জাতীয় ফ্রন্ট গঠন করতে পারে। এই ফ্রন্টের বিশেষ শর্ত হলো বিভিন্ন পার্টি ও শ্রেণির পরস্পরের কাজে প্রকাশ্য সমালোচনার অধিকার রয়েছে। জাতীয় মুক্তিফ্রন্টও জাতীয় ফ্রন্টেরই একটি রূপ।

ফ্রাঙ্কেনস্টাইন (Frankenstein)

উনবিংশ শতাব্দীর ব্রিটিশ মহিলা সাহিত্যিক মিসেস মেরি শেলি (১৭৯৭-১৮৫১) তাঁর উপন্যাসে ফ্রাঙ্কেনস্টাইন নামক চরিত্রটি সৃষ্টি করেন। তিনি এক বৈজ্ঞানিক গবেষণার মাধ্যমে ডাঃ ফ্রাঙ্কেনস্টাইন এক মানবরূপী দানবের সৃষ্টি করেন, যে দানব পরিনামে তার স্রষ্টাকেই হত্যা করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ফ্রাঙ্কেনস্টাইনের দানব বলতে এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রতিষ্ঠা করা কিংবা এমন কোনো প্রতিষ্ঠান তৈরি করা কিংবা এমন কোনো কর্মসূচি গ্রহণ করা বা কর্মকাণ্ড শুরু করাকে বোঝায় যার পরিণতি তার স্রষ্টা বা উদ্যোক্তার জন্যই ধ্বংস কিংবা মহাবিপদ ডেকে আনে। (সূত্র: হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

ফ্রাঙ্কো (Francisco Francoy Bahamonde)

ফ্রাঙ্কো (১৮৯২-১৯৭৫) ইউরোপের সর্বকনিষ্ঠ জেনারেল ছিলেন। তিনি ১৯৩৬-৩৯ সালের স্পেনীয় গৃহযুদ্ধ (Spanish Civil War)-র সময় জাতীয়তা বাহিনীর নেতৃত্ব দেন এবং সেনাবাহিনী প্রধান ও অস্থায়ী সরকারের প্রধান হন। তিনি সফলভাবে গৃহযুদ্ধ দমন করেন এবং স্পেনের একচ্ছত্র একনায়ক হিসাবে আর্বিভূত হন। তিনি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান, প্রধানমন্ত্রী ও একমাত্র বৈধ রাজনৈতিক দলের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। আমৃত্যু তিনি ছিলেন সশস্ত্র বাহিনীসমূহের সুপ্রিম কমান্ডার। তাঁর আমলের

স্পেন কার্যত একটি কর্পোরেট রাষ্ট্র ছিল এবং অনেকটা বেনিটো মুসোলিনির স্টাইলে তিনি দেশ শাসন করতেন। ফ্রাঙ্কোর কোনো সুনির্দিষ্ট আদর্শ না থাকলেও তিনি ছিলেন রক্ষণশীল, ধর্মনিষ্ঠ, সমাজতন্ত্র-বিরোধী এবং কর্তৃত্ববাদী। তাঁর মৃত্যুর পর অবশ্য স্পেনে উদার রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

ফ্রেডরিক হেগেল (Georg Wilhelm Friedrich Hegel)

দর্শনশাস্ত্রের আধুনিক পর্বে যাঁদের বড় রকমের অবদান রয়েছে জর্জ উইলহেম ফ্রেডরিক হেগেল (George Wilhelm Friedrich Hegel) তাঁদের মধ্যে অন্যতম। তিনি মূলত কান্ট (Kant), ফিচ (Fichte) এবং শেলিং (Schelling)-এর দার্শনিক ধারার সর্বশেষ ব্যক্তিত্ব। নিজস্ব স্বকীয়তা ও বৈশিষ্ট্যের জন্য হেগেল জার্মান-দর্শনে একটি চূড়ান্ত সাফল্য অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। তাঁর দর্শনের মূল অনুপ্রেরণা তিনি অনুভব করেছিলেন খ্রিস্টান ধর্মীয়তত্ত্ব থেকে এবং তাকে নিজের গভীর তাত্ত্বিক চেতনা দ্বারা মণ্ডিত করে উপস্থাপন করেছিলেন। যুক্তি, প্রাকৃতিক সম্পর্ক, মানবতাবোধ এবং স্বর্গীয় চেতনায় সম্পৃক্ত করে তিনি তাঁর দর্শনকে করে তুলেছেন মার্জিত ও পরিপক্ক। তাঁর এই দর্শন পরবর্তী সময়েও প্রচণ্ড প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়েছিল। ডেনমার্কীয় অস্তিত্ববাদী, মার্কসবাদী ভিয়েনার বস্তুবাদী এবং ব্রিটেনের বিশ্লেষণাত্মক দর্শনের অগ্রদূত হেগেল জি. এফ. মোর (G.F Moore)-এর ওপরও দারুণ প্রভাব ফেলতে সক্ষম হয়। হেগেল ছিলেন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ দার্শনিকদের মধ্যে অন্যতম। হেগেলের জন্ম হয়েছিল জার্মানির স্টুটগার্ট (Stuttgart) শহরে ১৭৭০ সালের ২৭ আগস্ট। তিনি ছিলেন সরকারের রাজস্ব বিভাগের জনৈক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তার পুত্র।

তাঁর লেখাপড়ার হাতেখড়ি হয় মায়ের কাছে। তারপর ভর্তি হন স্থানীয় স্টুটগার্ট গ্রামার স্কুলে (Stuttgart Grammar School)। এখানেই তিনি প্রথম ল্যাটিন ভাষা শিক্ষা করেন। ছাত্রজীবন থেকেই প্রচণ্ড মেধাবী ছিলেন হেগেল। তিনি যখন স্কুলে পড়তেন তখনি দেশের সাহিত্য ও শিল্প সম্পর্কে খবর রাখতেন শুধু খবরের কাগজ পড়ে পড়ে দেশের শিল্পী-সাহিত্যিকদের একটি তালিকা প্রণয়ন করেছিলেন এবং নামগুলোকে আদ্যক্ষর অনুসারে সাজিয়েছিলেন। এ ছাড়া অঙ্কের সূত্রগুলোকেও তিনি সংগ্রহ করেছিলেন। তাতেই প্রমাণ পাওয়া যায় তিনি পড়াশোনায় কেমন আগ্রহী ছিলেন। ১৭৮৮ সালে হেগেল বাবা-মায়ের আদেশে উচ্চশিক্ষার জন্য চলে আসেন টিবিংজেন (Tibingen) শহরে। এখানে তিনি দুবছর পর্যন্ত ধর্ম ও শিল্পসাহিত্যের ওপর অধ্যায়ন করেন। যদিও তিনি ধর্মতত্ত্ব (Theology) নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন, তবু ধর্মের গোঁড়ামি তাঁর পছন্দ হত না। ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি ডিগ্রি লাভ করেন ১৯৭১ সালে। হেগেলের একটি বড় দুর্বলতা ছিল, তিনি ভালো বক্তৃতা দিতে পারতেন না। মুখে ভালো বোঝাতে পারতেন না। কিন্তু লিখতে পারতেন ভালো। তাই পরবর্তী সময়ে তাঁর ছাত্ররা তাঁকে 'বুড়ো মানুষ' (The old man) বলে ডাকত। হেগেলের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের মধ্যে অন্যতম ছিরেন দার্শনিক ও কবি সেজিএফ হোল্ডারলিন (JCF Holderlin) এবং অপরজন ছিলেন

প্রাকৃতিক দার্শনিক এফ. ডাব্লিউ. জে. শেলিং (F. W. J. Schelling)। এঁরা তিনজনে মিলে একদা চার বছর ধরে গ্রিক ট্র্যাজেডি সাহিত্য বিষয়ে পড়াশোনা করেছিলেন। এ ছাড়া তাঁরা এই সময় ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসের ওপরেও পড়াশোনা করতেন।

কলেজ থেকে পাস করে আসার পর হেগেল ইচ্ছে করলেই সরকারি পদে চাকরিতে ঢুকতে পারতেন। কিন্তু তিনি দর্শনে আরো অধ্যয়ন করতে শুরু করেন। সেই সাথে ছাত্র পড়াতেন। এর পরের তিনবছর তিনি বার্নেতেই (Berne) ছিলেন। এই সময়টাতে তিনি লাইব্রেরিতে প্রচুর পড়াশোনা করেন এবং এডওয়ার্ড গিবনের (Edward Gibbon) *The Fall fo Foman Empire* পাঠ করেন। এ ছাড়া তিনি রোমান সাহিত্যও প্রচুর পাঠ করেন। এই সময় তিনি ইমান্যুয়েল কান্টের (Immanuel Kant) জটিল দর্শনও পড়েন। শুধু পাঠ নয়, কান্টের দর্শনের বহু বিতর্কিত বিষয় নিয়ে গবেষণাপত্রও তৈরি করেন। তিনি কান্টের দর্শনের ওপর নিজস্ব মতবাদ বিশ্লেষণ করেন। ধর্মের অলৌকিক বিশ্বাসের ঐতিহাসিক সত্যতা যাচাই করে দাঁড় করান বাস্তবসম্মত নিজস্ব মতবাদ। তিনি যিশুখ্রিস্টের জীবনের ঐতিহাসিক সত্য যাচাইয়েল চেষ্টা করেন। বার্নেতে হেগেল নিঃসঙ্গ জীবন কাটাতেন। ১৭৯৬ সালে বার্নে থেকে চলে এলেন ফ্র্যাংকফোর্টে। এখানে এসে আবার মিলিত হন হোল্ডারলিনের সাথে।

হেগেলের অনেক রচনা ছিল খ্রিস্টানদের গির্জায় পাদরিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু সে বক্তব্য অবশ্যই খ্রিস্টানধর্মেল বিরুদ্ধে নয়। কারণ তিনি অন্তরে যে ধর্মীয় অনুপ্রেরণা লাভ করতেন তা নিছক আনুষ্টানিকতা নয়, তা ছিল একান্ত মানবতাবোধে সিঞ্চিত। ১৭৯৮ সালে হেগেল আবার তাঁর পুরনো দর্শনে ফিরে গেলেন, যেটা বার্নেতে থাকতেই শুরু করেছিলেন দু-তিন বছর আগে। সেই পুরনো দর্শনকে সংশোধন করে আবার তাকে দান করলেন নবরূপ। লিখলেন বিখ্যাত গ্রন্থ *দি স্পিরিট অব ক্রিশ্চিয়নিটি অ্যান্ড ইট ফেইট* (The Spirit of Christinity and its Fate)। বইটি দীর্ঘদিন পরে প্রকাশিত হয় ১৯০৭ সালে। এই সময়ের মধ্যে অবস্থার পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি নিজের পড়াশোনার দিকে মনোযোগী হন।

১৭৯৯ সালে তাঁর পিতার মৃত্যু হয়। এবার তাঁকে মুখোমুখি হতে হয় বাস্তবের। এতদিনে কোনোমতে চলে যাচ্ছিল, এবার নির্দিষ্ট একটি আয়ের পথ ধরতে হবে। অতঃপর রোজগারের আশাতে তিনি ১৮০১ সালে চলে আসেন জেনা (Jena)-তে। এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ে শেলিং দীর্ঘদিন অধ্যাপনা করছিলেন। হেগেলও এসে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের চাকরির জন্য ইন্টারভিউ দিলেন এবং তাঁর চাকরিও হলো। এই সময় (১৮০১-২) তাঁর বিভাগে ছাত্রের সংখ্যা ছিল মাত্র ১১ জন। ১৮০৪ সালের মধ্যে সেই সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ৩০ জনে। ১৮০৫ সালে তিনি জেনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপকের পদ লাভ করেন। এ সময় প্রকাশিত হয় তাঁর আরেকটি বিখ্যাত দর্শনগ্রন্থ *দি ফেনোমেনোলজি অব মাইন্ড* (The phenomenology of mind-1807)। এই বইটিতে হেগেল মানবমনের দুর্জ্ঞেয় রহস্যের কথা আলোচনা করেছেন। তাঁর এই গ্রন্থটি দার্শনিকমহলে প্রচণ্ড আলোড়ন সৃষ্টি করলেও আর্থিক দিক থেকে খুব একটা

লাভবান হতে পারলেন না তিনি। অতঃপর আর্থিক সচ্ছলতা লাভের জন্য তিনি *বেম্বারজার জেইটিং (Bamberger Zeiting)* নামে একটি মাসিক পত্রিকায় সম্পাদকের পদ গ্রহণ করেন (১৮০৭-০৮)।

১৮১১ সালে ম্যারিল ভন টার্চার (Maril von Turcher) নামে ২২ বছর বয়স্কা নুরেনবার্গের এক সুন্দরী মহিলাকে হেগেল বিয়ে করেন। হেগেলের বিবাহিত জীবন ছিল খুবই সুখের। এই সুখী দম্পতির ছিল দুটো পুত্রসন্তান। কার্ল (Karl), যিনি পরবর্তীকালে হয়েছিলেন বিশ্বখ্যাত ঐতিহাসিক। অপর পুত্র ইম্যানুয়েল (Emmanual) ছিলেন ধর্মতত্ত্বের বিষয়ে আগ্রহী। ১৮১২ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর *সায়েন্স অব লজিক* (Science of Logic)-এর প্রথম খণ্ড এবং ১৮১৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় এর দ্বিতীয় খণ্ড।

এই সময় তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ে সর্বত্র। তাঁকে অধ্যাপকের পদ গ্রহণের জন্য আহ্বান করা হয় বার্লিনের আর্লাঞ্জেনস (Erlangen) এবং হেইডেলবার্গ (Heidelberg) থেকে। তিনি হেইডেলবার্গের আহ্বান গ্রহণ করেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাদানের জন্য হেগেল ১৮১৭ সালে প্রকাশ করেন। এনসাইক্লোপিডিয়া অব দি ফিলোসোফিক্যাল সায়েন্স ইন আউটলাইন (Encyclopaedia of the philosophical science in outline)। এরপর তিনি আবার চলে আসেন বার্লিনে। বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনশাস্ত্রের অধ্যাপকের পদটি দীর্ঘদিন ধরে খালি পড়ে ছিল। এই পদে আগে ছিলেন বিখ্যাত দার্শনিক ফিচ (Ficths)। তিনি মারা যাওয়ার পর পদটি খালি হয়।

এখানে আসার পর ১৮২১ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর আরেকটি বিখ্যাত দর্শন-গবেষণাপত্র *ফিলোসোফি অব রাইটস* (The Philosphy of Rights)। তিনি বার্লিন বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৮২০ থেকে ১৮২৯ সাল পর্যন্ত ছিলেন। এই সময় তিনি ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্পর্কে তাঁর বাস্তববাদী মতামত প্রকাশ করেন। ধর্মপালন সম্পর্কেও হেগেল কথা বলেন। তাঁর মতে প্রচলিত আনুষ্ঠানিক কথাসর্বস্ব ধর্মপালন ফলপ্রসূ নয়। তিনি ধর্মানুষ্ঠানকে একান্ত সত্যের বেদিতে ও বাস্তবসম্মত করতে চাইতেন। এর জন্যই পড়তে হবে দর্শনশাস্ত্রকে। দর্শনই ধর্মের ব্যাপারে সত্যের সন্ধান দিতে পারে।

তিনি বিশ্বাস করতেন, সমস্ত মানবসমাজ একমাত্র আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তির মধ্যদিয়ে উন্নতি করতে পারে। তবে সেই আধ্যাত্মিক ও নৈতিক শক্তি লাভ। করতে অবশ্যই তাঁকে আগে নিজেকে জানতে হবে। একমাত্র আত্মোপলব্ধির মধ্যদিয়েই সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব। দর্শনে বিশেষ অবদানের জন্য তিনি ১৮৩১ সালে জার্মানে সম্রাট তৃতীয় উইলিয়ামের (William-III)-এর কাছ থেকে পুরস্কার ও অভিনন্দন লাভ করেন।

এই সময় প্রকাশিত হয় তাঁর *ইয়ারবুক ফর ফিরোসফিক্যাল ক্রিটিসিজম* (Yearbood for Philosophical Criticism)। ১৮৩০ সালে জার্মানর বিপ্লব হেগেলের জন্য ছিল একটি মস্তবড় আঘাত। এরপর ১৮৩১ সালে জার্মানিতে দেখা দেয় কলেরা মহামারী। তবু এই আতঙ্কের মধ্যেও তিনি *সায়েন্স অব লজিক* (প্রথম খণ্ড)-এর সংশোধন করেন। এই সময় তিনি নিজেও কলেরা রোগে আক্রান্ত হন। এই অসুখ আর ভালো হয়নি। অবশেষে কলেরা রোগেই তিনি ১৮৩৯ সালের ১৪ নভেম্বর পরলোকগমন করেন।

বক্সার বিদ্রোহ (Boxer Insurgency)

বক্সার বিদ্রোহ হলো ১৯০০ সালে চীনে সংঘটিত বিদেশি শক্তিবিরোধী বিদ্রোহ। চীনে ইউরোপীয় বাণিজ্যের দ্রুত সম্প্রসারণ এবং জার্মানি কর্তৃক কিরায়ওচো অধিকার (১৮৯৭), রাশিয়া কর্তৃক পোর্ট আর্থার দখল ও ব্রিটেন কর্তৃক ওয়েই হাই-ওয়েই অধিকার (১৮৯৮) ইত্যাদির ফলে উত্তর চীনের জনগণের মধ্যে তীব্র বিদেশি শক্তির বিরোধীতা দেখা দেয়। এহেন পরিস্থিতিতে, তৎকালীন চীন সরকারের প্রচ্ছন্ন প্রশ্রয় এবং বিধবা সম্রাজ্ঞী শুশির সমর্থনে তরুণ চীনারা এক গোপন সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংগঠনের নাম ছিল 'সমছন্দিত মুষ্টিবদ্ধ হস্তসমূহের সমিতি' (Society of Harmonious Fists) এবং এর সদস্যেরা সংক্ষেপে মুষ্টিযোদ্ধা বা বক্সার বলে পরিচিত হয়। তারা নবদীক্ষিত খ্রিষ্টান ও খ্রিষ্টান ধর্ম প্রচারক এবং বিদেশি নিয়ন্ত্রণাধীন রেল-কর্মচারীদের ওপর আক্রমণ চালায়। এর প্রত্যুত্তরে অ্যাডমিরাল সেমুন-এর নেতৃত্বে বিদেশিরা রাজধানী পিকিং (বর্তমানে বেজিং) দখল করতে উদ্যত হলে ঠাকুর দুর্গ থেকে তাদের ওপর গোলাবর্ষণ করা হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে পিকিংয়ে বক্সার ফেটে পড়ে। ১৯ জুন (১৯০০) পিকিংস্থ জার্মান মিনিস্টার আততায়ীর হাতে নিহত হন এবং প্রায় সকল বিদেশি দফতরসমূহ মুক্ত করা হয়। কিন্তু এই বাহিনী এর পরপরই বেপরোয়া লুটপাটের তাণ্ডব শুরু করে। বছরের শেষদিকে ভন ওয়াল্ডেসির নেতৃত্বে এক জার্মান বাহিনী পিকিংয়ে এসে জার্মান মিনিস্টার হত্যার প্রতিশোধের নামে ব্যাপক নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে। এই বিদ্রোহ সেনসি ও মাঞ্চুরিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রত্যুত্তরে রুশবাহিনী প্রদেশ দুটির ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। বক্সার বিদ্রোহ দমনের জন্য বিদেশি শক্তিসমূহ যে-হিংস্র পদ্ধতি গ্রহণ করে, তা বিদেশি বিরোধীতা আরও বাড়িয়ে দেয় এবং ফলশ্রুতিতে বিপুল সংখ্যক চীনা তরুণ সান ইয়াৎ সেনের নেতৃত্বাধীন জাতীয়তাবাদী ও প্রজাতন্ত্রী আন্দোলনে যোগদান করে।

বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (Partition of Bangal Movement)

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ রাজত্বের শুরুতে বঙ্গ বিহার উড়িষ্যা অঞ্চল একজন ছোটলাট বা গভর্ণরের দ্বারা শাসিত হত। বিশাল এলাকা একজন গর্ভনরের পক্ষে শাসন করা ছিল দুরুহ। তাই ১৯০৫ সালে বড়লাট লর্ড কার্জনের উদ্যোগে ঢাকাকে রাজধানী করে আসাম ও বঙ্গ বা বাংলার রাজশাহী বিভাগ, ঢাকা বিভাগ ও চট্রগ্রাম বিভাগ নিয়ে 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশ গঠিত হয়। বঙ্গের বাকি অংশ বিহার এবং উড়িষ্যা নিয়ে গঠিত হয় অপর একটি প্রদেশ। এই বিভক্তিকে হিন্দুরা নাম দেয় 'বঙ্গভঙ্গ' এবং। তারা বঙ্গভঙ্গকে 'বঙ্গমাতার অঙ্গচ্ছেদ' বলে এর কঠোর সমালোচনা করেন এবং এর বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কংগ্রেস এই আন্দোলনের প্রতি সমর্থন জানায়। এই আন্দোলন হিন্দু জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে। বলাবহুল্য, মুসলমানরা বঙ্গভঙ্গের প্রতিই সমর্থন জানায়, কেননা নবগঠিত 'পূর্ববাংলা ও আসাম' প্রদেশে পরিপূর্ণভাবে মুসলিম প্রাধান্যই কায়েম হয়। কলকাতায় আইনজীবী,

সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী ও অন্যান্য পেশাদারী মানুষ তাঁদের প্রভাব কমে যাবে বলে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলনকে সমর্থন জানায়। বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনও শুরু হয়। তীব্র সন্ত্রাসের পরিপ্রেক্ষিতে ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ রদ করে আবার উভায় প্রদেশকে এক প্রদেশে রূপায়িত করা হয়।

বদরের যুদ্ধ (Battle of Badr)

হযরত মুহাম্মদ (সা)-এর মক্কা থেকে মদিনায় হিজরতের দ্বিতীয় বছরে (৬২৪ খ্রি.) মক্কার কাফিরদের সঙ্গে মুসলামানদের এই যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এতে মুসলমান বাহিনী জয়লাভ করে। হযরত মুহম্মদ (সা) সঙ্গী-সাথীসহ মদিনায় হিজরতের পরও মক্কার কাফিররা নিশ্চিত ও নিরাপদবোধ করতে পারেনি। তারা তাই ইসলামকে তার প্রাথমিক ও অসংগঠিত অবস্থায় নির্মূল করে দেওয়াই সঙ্গত মনে করে। এই পরিকল্পনাকে বাস্তবায়িত করার লক্ষ্যে তারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে এক বিরাট বাহিনী প্রেরণ করে। বদর নামক প্রান্তরে উভয় দল মুখোমুখি হয়। এই অসম যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীতে ছিল মাত্র ৩১৩ জন সৈন্য, ৭০টি উট, ২টি ঘোড়া, ৬০টি বর্ম এবং অল্পসংখ্যক তরবারি। মক্কাবাহিনীতে ছিল ১ হাজার উট, ১০০ সুসজ্জিত অশ্বারোহী সৈন্য, ৬০০ বর্ম এবং অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ৩০০ জন পদাতিক সৈন্য। হযরত মুহাম্মদ (সা) এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এই যুদ্ধে বিরাট ও সুসজ্জিত মক্কাবাহিনী ক্ষুদ্র মুসলিম বাহিনীর কাছে পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে মুসলমানরা পরাজিত হলে ইসলামের অগ্রযাত্রা অঙ্কুরে বিনষ্ট হয়ে যেত বলে এই যুদ্ধকে ইসলামের ইতিহাসে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও 'চূড়ান্ত মীমাংসাকারী' যুদ্ধ হিসেবে অভিহিত করা হয়।

বন্দী প্রদর্শন রিট (Habeas Corpus)

বন্দী প্রদর্শন রিট কথাটির শাব্দিক অর্থ হলো 'have his body' অর্থাৎ 'To have a body before the court' অর্থাৎ "বন্দী ব্যক্তিকে সশরীরে হাজির করা"। কোনো ব্যক্তিকে সরকার বা অন্য কেউ আটক করলে কী কারণে তাকে আটক করা হয়েছে তা জানার জন্য বন্দীকে আদালতে হাজির করার নির্দেশ দিয়ে উচ্চতর আদালত আটককারীকে যে আদেশ দিয়ে থাকেন তাকে বন্দী প্রদর্শন রিট বলে। বৈধ কারণ ব্যতীত আটককে বাধাদান তথা ব্যক্তি-স্বাধীনতাকে (personal liberty) নিশ্চিত করার জন্য এ রিট জারি করা হয়। আইনগতভাবে কোনো ব্যক্তিকে আটক করা না হলে আদালত এ রিটের মাধ্যমে বন্দীকে মুক্তির নির্দেশ দিতে পারে (সূত্রঃ মোঃ আব্দুল হালিম, *সংবিধান, সাংবিধানিক আইন ও রাজনীতি : বাংলাদেশ প্রসঙ্গ*, ঢাকা : সিসিবি ফাউন্ডেশন, ২০১৩)।

বন্দে মাতরম (Bhonda-ma-taram)

বন্দে মাতরম ভারতের জাতীয় সংঙ্গীত এবং এর রচয়িতা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বন্দে মাতরম এর অর্থ হচ্ছে, 'হে মাতা তোমায় প্রমাণ'। এখানে মাতা বলতে দেশকেই

বোঝানো হয়েছে। বাঙালি কথাসাহিত্যিক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'আনন্দমঠ' উপন্যাসের মাধ্যমে এই কথাগুলোকে বিশেষ তাৎপর্যে নিয়ে আসেন। এই স্লোগানটি ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা ব্যবহৃত হত। বর্তমানে ভারতেও স্লোগানটির বহুল প্রচলন রয়েছে।

বফোর্স কেলেঙ্কারি (Bopors Scandal)

সুইডেনের এ.বি. বর্ফোর্স নামে একটি অস্ত্র নিমার্তা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ভারতের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী ১৯৮৬ সালের ২৪ মার্চ অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই চুক্তি মোতাবেক মোট ১৪৩৭ কোটি ৭২ লক্ষ রুপি মূল্যে ১৫৫ মিলিমিটার ব্যসের চারশোটি কামান সরবরাহ করা হয়। অমনি ভারত জুড়ে হৈ চৈ শুরু হয় এবং বিরোধীদল অভিযোগ তোলে যে, তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধী এবং ডিল বাবদ ৬৪কোটি রুপি ঘুষ গ্রহণ করেছেন। কংগ্রেস সরকারের তৎকালীন অর্থমন্ত্রী ডি পি সিংও এই দুর্নীতির প্রতিবাদে কংগ্রেস ছেড়ে জনতা দলে যোগ দিলে এবং বর্ফোস কেলেঙ্কারির বিচার দাবি করলে রাজীব গান্ধী ভয়ানকভাবে বিতর্কিত হয়ে পড়েন। সারা ভারত জুড়ে স্লোগান ওঠে, "গলি গলি মে শোর হ্যায়, রাজীব গান্ধী চোন হ্যায়"। ফলে, ১৯৮৯ সালের নির্বাচনে কংগ্রেস হেরে যায়। পরবর্তীতে ভিপি সিং প্রধানমন্ত্রী হলে এই মামলার তদন্ত শুরু হয় এবং ৮৩ জনের সাক্ষ্য গ্রহণ করা হয়। ইতিমধ্যে ১৯৯১ সালের ২১ মে রাজীব গান্ধীকে হত্যা করলে তদন্ত শ্লথ হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৯৯ সালের নির্বাচনে বিজেপি কোয়ালিশন সরকার ক্ষমতাসীন হলে আবার মামলাটি চাঙ্গা হয়ে ওঠে। এর মধ্যে সুইডেন থেকে প্রেরিত নথিপত্র থেকে জানা যায় যে, কোয়েত্রিচিচ ও তাঁর স্ত্রী মারিয়া, উইন চাড্ডা ও তাঁর স্ত্রী কান্তা, পুত্র হর্ট চাড্ডা ও এস.কে. ভাটনগর প্রমুখ এই কেলেঙ্কারিতে জড়িত ছিলেন (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

বয়কট (Boycott)

বয়কট হলো কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, কর্তৃপক্ষ, দেশ বা বস্তুকে সমবেতভাবে বর্জন করা। সামাজিক, অর্থনেতিক, রাজনৈতিক ইত্যাদি যেকোনো ব্যাপারে অনমনীয় কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সরকারকে তার অনুসৃত আচরণ ও কর্মপন্থা থেকে নিবৃত্ত করার জন্য চাপ সৃষ্টির এক বিশেষ পদ্ধতি বয়কট। ১৮৮০ সালে আয়ারল্যান্ডের এক ভূস্বামীর খাজনা আদায়কারী ক্যাপ্টেন বয়কট নামক জনৈক ব্যক্তিকে আইরিশ লিগ কর্তৃক সর্বতোভাবে বর্জন ও একঘরে করার ঘটনা থেকে প্রত্যয়টির সূত্রপাত ঘটে। ভারতীয় সমাজে ধোপা-নাপিত বন্ধের রীতি এক ধরনের বয়কট। কোনো ব্যক্তি কিংবা প্রতিষ্ঠানকে বয়কট করার পেছনে ন্যায্য কারণ থাকতে পারে, কিন্তু অনেক সময়ে অযথা ষড়যন্ত্র করে কারও বিরুদ্ধে বয়কটের পদ্ধতি প্রযুক্ত হতে দেখা যায়। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও নিষেধাজ্ঞা (embargo) এবং শাস্তি (sanction) ব্যবস্থা হিসেবে কোনো দেশের

বিরুদ্ধে অবরোধ ব্যবস্থা বয়কটের রকমফের মাত্র। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কোনো দেশের বৈদেশিক নীতি গ্রহণীয় না হলে সেদেশের রাজনীতিকদের বয়কট করার প্রচলন আছে। যুক্তরাষ্ট্রে কোনো কোনো অঙ্গরাজ্যে বিশেষ কিছু ধরনের বয়কট রীতি আইনবিরুদ্ধ। ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন পর্যায়ে বিদেশি পণ্য বয়কট করার কর্মসূচি গৃহীত হয়। বর্তংমানে শব্দটি দেশ, বস্তু, গোষ্ঠী ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়।

বয়স্কাউট (Boy Scout)

সাত বছরের বেশি বয়সী বালকদের আন্তর্জাতিক সংগঠন, যা খেলাধুলা ও সামাজিক সেবাকর্মের মাধ্যমে তাদের শারীরিক, মানসিক, চারিত্রিক বিকাশ সাধনে সহায়তা করে এবং তাদের আত্মপ্রত্যয়ী ও সুনাগরিক হওয়ার শিক্ষা দেয়। এটি মূলত একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন শুরু হয় ১৯০৮ সালে। উদ্যোক্তা ব্রিটিশ লে. জে. স্যার রবার্ট ব্যাডেন পাওয়েল। এ সংগঠনের বানী (mote) প্রস্তুত হও এবং স্লোগান 'প্রতিদিন একটি করে ভালো কাজ কর'। সদর দপ্তর ওয়ার্ল্ডস স্কাউটস ব্যুরো (জেনেভা), সুইজারল্যান্ড।

বর্ণবাদ (Racism)

বর্ণবাদ হলো কোনো জনগোষ্ঠীর প্রতি অন্য গোত্রের কারণে এক ধরনের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে বৈষম্যমূলক আচরণের নীতি। সংখ্যালঘিষ্ঠ শ্বেতাঙ্গ শাসিত দক্ষিণ আফ্রিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষ্ণকায়দের প্রতি যে অমানবিক বৈষম্যমূলক আচরণ ও নীতি অনুসৃত হয়, সেই নীতিই বর্ণবাদের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। স্থানীয় ভাষায় এই বর্ণবাদকে বলা হয় অ্যাপার্টহিড (Apartheid).

বলকান চুক্তি (Balkan Pact)

১৯১৪ সালের ৯ আগস্ট গ্রিস, তুরস্ক ও যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে সম্পাদিত সামরিক মৈত্রী চুক্তি। ইতালি বুলগেরিয়া আক্রমণ করতে পারে- এ আশঙ্কায় এ চুক্তি সম্পাদিত হয়। গ্রিক পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম লক্ষ্য ছিল যুগোস্লাভিয়ার সঙ্গে মৈত্রী। এ চুক্তির ফলে গ্রিস এবং তুরস্কের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন ঘটলেও সাইপ্রাসের সংকটকে কেন্দ্র করে এ সম্পর্কের অবনতি ঘটে। অপরদিকে পরিবর্তিত বিশ্ব পরিস্থিতিতে গুযোস্লাভিয়াও এ চুক্তি সম্পর্কে উদাসীনতা প্রদর্শন করে। এমতাবস্থায়, বলকান চুক্তি তাৎপর্য হারিয় ফেলে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ১৯০৪ সালে প্রথম বলকান চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল গ্রিস এবং যুগোস্লাভিয়ার মধ্যে।

বলকান যুদ্ধ (Balkan Wars)

দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ বলকান উপদ্বীপের দেশ তুর্কি সাম্রাজ্যের অধীনতা থেকে মুক্ত হতে চেয়েছিল। এজন্য বিশ শতকের প্রথম দিকে তুর্কি সাম্রাজ্যের ক্ষমতার টলমলে অবস্থা

দেখে তারা তুর্কিকে পরাজিত করে নিজেদের স্বতন্ত্র দিবস হিসেবে ঘোষণা করে। জয়ের আনন্দ-উল্লাস শেষ হতে না হতেই তারা জয় করা প্রদেশগুলোর বিভাজনের প্রশ্ন নিয়ে নিজেদের মধ্যে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। বলকানের প্রথম যুদ্ধ তুর্কি ও বলকান রাজ্যগুলোর মধ্যে সংঘটিত হয় ১৯১২ সালে। বলকান রাজ্যগুলো অসাধারণ সফলতা দেখায় এবং তুর্কি সৈন্যরা পরাজিত হয় এ যুদ্ধে। আদ্রিয়ানোপলের গুরুত্বপূর্ণ দুর্গ তুর্কিদের কাছ থেকে গ্রিক সৈন্যরা ছিনিয়ে নেয়। আলবেনিয়া সার্বিয়া ও মন্টিনিগ্রো অধিকার করে। বুলগেরিয়া আক্রমণ করতে করতে কনস্ট্যান্টিনোপলের অতি নিকটে পৌঁছে গেলে তুর্কির সন্ধি করা ছাড় উপায় থাকে না। সন্ধি করতে দুপক্ষ লন্ডনে উপস্থিত হলেও স্থায়ী সন্ধিতে উপনীত হতে না পারায় বৈঠকে ভেঙে যায়। পরবর্তীতে তুর্কিরা আরো খারাপভাবে পারাজিত হয় এবং তুর্কির সুলতান পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করে। দুই পক্ষের প্রতিনিধি লন্ডনে মিলিত হয়ে সন্ধি করে ১৯১৩ সালের ৩০ মে।

সার্বিয়া আলবেনিয়াকে পৃথক রাজ্য হিসেবে ঘোষণা করায় বিরোধিতা করে। এ প্রেক্ষাপটে ২৯ জুন ১৯১৩ সালে বুলগেরিয়া ও সার্বিয়া যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। শুরু হয় দ্বিতীয় বলকান যুদ্ধ। এ যুদ্ধে সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, গ্রিস ও রুমানিয়া একত্র হয়ে বুলগেরিয়ার বিরুদ্ধে অন্যান্য বলকান রাজ্যগুলোকে সাহায্য করেছিল। প্রায় এক মাস যুদ্ধের পর বুলগেরিয়া সন্ধির প্রার্থনা করে। এ দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হয় ১০ আগস্ট রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেষ্টে।

বলকান স্টেটস (Bulkan States)

বসনিয়া, হার্জেগোভিনা, ক্রোশিয়া, শ্লোভানিয়া, মেসিডোনিয়া, কসভো, গ্রীস, তুরস্ক, আলভেনিয়া, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো ও তুরস্কেও ইউরোপীয় অংশ নিয়ে বলকান অঞ্চল গঠিত। এ অঞ্চল বিশ্বেও অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনার সাক্ষী। এ অঞ্চল দীর্ঘ ৪০০ বছর তুর্কী উসমানীয় সালতানাতের অধীনে ছিলো। পরে এ অঞ্চলের অধিকাংশ রাষ্ট্রে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। সমাজতন্ত্রের পতনের পর এ অঞ্চলের দেশগুলো মুক্তবিশ্বের সাথে মেলামেশার সুযোগ পায়। সারাজেভো শহরে সার্বীয় সন্ত্রাসবাদী কর্তৃক অস্ট্রীয় যুবরাজ ডিউকের হত্যাকাণ্ডের তাৎক্ষনিক কারণে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়। বর্তমানে এই রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন।

বলশেভিকবাদ (Bolshevism)

বলশেভিক হলো মার্কসবাদী রাশিয়ান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির একটি উপদল যা ১৯০৩ সালের দ্বিতীয় পার্টি কংগ্রেসে এর অপর উপদল মেনশেভিক থেকে আলাদা হয়ে যায়। বলশেভিকেরা একটি মাত্র গুরুত্বপূর্ণ ভোটে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাই তাদের এই নাম। পরবর্তীতে তারা সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টিতে রূপান্তরিত হয়। বলশেভিকেরা ১৯১৭ সালের রুশ বিপ্লবকালীন অক্টোবরের বিপ্লবের সময় রাশিয়ার ক্ষমতা আসে এবং রাশিয়ান সোভিয়েত ফেডারেটিভ

সোস্যালিস্ট রিপাবলিকের পত্তন করে যা পরবর্তীকালে ১৯২২ সালে গঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের মুখ্য প্রশাসনিক অঞ্চল হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভ্লাদিমির লেনিন এবং আলেকজান্ডার বগদানভ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বলশেভিক ১৯০৫ সাল নাগাদ একটি গণসংগঠনে পরিণত হয় যার সদস্য মূলত ছিল অভ্যন্তরীণ গণতান্ত্রিক পদবিন্যাসে সংগঠিত শ্রমিক জনগোষ্ঠী য কেন্দ্রীভূত গণতান্ত্রিক নীতিতে পরিচালিত হতো। তারা নিজেদেরকে রাশিয়ার বিপ্লবী শ্রম শ্রেণির নেতা হিসেবে বিবেচনা ক্ষমতা। তাদের বিশ্বাস ও কার্মকাণ্ডকে প্রায়ই বলশেভিকবাদ হিসেবে অভিহিত করা হয়।
সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে নির্বাসনের পর বিপ্লবী বলশেভিক নেতা লিওন ট্রটস্কি তার প্রত্যক্ষ করা প্রকৃত লেনিনবাদ এবং জোসেফ স্টালিনের নেতৃত্বে পরিচালিত রাষ্ট্র ও দলের মধ্যকার পার্থক্য বোঝাতে সাধারণভাবে "বলশেভিক" এবং "বলশেভিস্ট শব্দ দুটি ব্যবহার করতেন।

'বলশেভিক' রুশ শব্দ 'বলশেভিনস্টভো' বা সংখ্যাগরিষ্ঠ থেকে বলশেভিক শব্দের উ'পত্তি। রাশিয়ার বলশেভিক দলের মতবাদ ও কর্মপন্থা। শব্দটি অনেকসময় লেনিনবাদের সঙ্গে সমার্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে; বস্তুত এটি মার্কসীয় সমাজতন্ত্রী বিপ্লবকে বোঝায়; পক্ষান্তরে লেনিনবাদ হলো সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের তত্ত্বগত (তত্ত্ব ও প্রয়োগ) বিশ্লেষণ। বলশেভিকবাদের প্রবর্তক ছিলেন লেলিন। কার্যত বৈপ্লবিক পরিবর্তনে এটিকে একটি পদ্ধতি হিসাবে নিয়েছেন কোনো কোনো মার্কসীয় নেতা (স্তালিন, ট্রটস্কি, মাও জে দং)। লন্ডনে অনুষ্ঠিত রাশিয়ান সোসাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (১৯০৩) বলশেভিকবাদের জন্ম হয়। সেই থেকে লেনিন এই মতবাদকে এটি "রাজনৈতিক চিন্তার ধারা এবং একটি রাজনৈতিক দল" হিসেবেও দেখতেন। ওই কংগ্রেসের আলোচনায় পার্টির নিয়মাবলির প্রথম ধাায় পার্টির সদস্যপদ গ্রহণের বিষয়ে লেনিন ও তাঁর অনুগামীদের সঙ্গে মার্টভের বিতর্কে ভোটাভুটি হয়। লেনিন চেয়েছিলেন যাঁরা সক্রিয় এং রাজনৈতিক মতাদর্শে পার্টির প্রতি অনুগত তাঁদেরই কেবল সদস্যদ পদ দেওয়া হোক; সোসাল ডেমোক্রেটিক পার্টির অন্যান্য নিষ্ক্রিয় সদস্যদের মতো কেবল ট্রেড ইউনিয়নের ভিত্তিতে সদস্যপদ প্রদান অর্থহীন। এই মতপ্রার্থক্য থেকে সদ্যাজাত আর এসডিএলপি দল বলশেভিক অর্থাৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং মেনশেভিক অর্থাৎ সংখ্যালঘিষ্ঠ এই দুটি গোষ্ঠীতে ভাগ হয়ে যায়। পার্টির সপ্তম সম্মেলনের (এপ্রিল, ১৯১৭) পর থেকে বলশেভিক শব্দটি সরকারিভাবে পার্টির নামের শেষে বন্ধনীতে যুক্ত হয়। ১৯১৮ খ্রি মার্চ থেকে পার্টির পরিবর্তিত নাম হয় রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এবং ১৯২৫ খ্রি ডিসেম্বর থেকে অল ইউনিয়ন কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)। ১৯৫২ খ্রি থেকে বলশেভিক শব্দটি বাদ গিয়ে পার্টির নাম হয় কমিউনিস্ট পার্টি অব সোভিয়েত ইউনিয়ন।

অনেকের মতে বলশেভিকবাদ হলো লেনিনবাদের নামান্তর, যেটা পার্টির কমসূচি ও লেনিনের তত্ত্বে বিধৃত। তাতে মেনশেভিকদের নিয়মতান্ত্রিক পরিবর্তনের বদলে সহিংস বিপ্লবের সুপারিশ করা হয়। তাতে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রানুগতা ও সর্বহারা শ্রেণির নামে

যাবতীয় ক্ষমতা বর্তাবে রাষ্ট্রের ওপর এবং ওই শ্রেণিরই নামে চলবে একনায়কতন্ত্র। ১৯১৭ খ্রি বলশেভিকরা রাশিয়ায় বিপ্লবের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসে।

বসরা (Bosra)

ইরাকের অন্যতম প্রসিদ্ধ বন্দর। সাত-ইল-আরব নদীর তীরে অবস্থিত। এ বন্দর দিয়ে ইরাক তার তৈল সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে। ইরান-ইরাক যুদ্ধে ইরানী হামলায় এ স্থান ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এটা খেজুরের জন্য প্রসিদ্ধ।

বস্তুবাদ (Materialism)

বস্তুবাদ (ইংরেজিঃ Materialism) হলো দর্শনের সবচেয়ে প্রাথমিক মতবাদগুলোর একটি। বস্তুবাদী মতবাদ এটি ধারণ করে যে আমাদের চারপাশের জগতের যেসব জিনিস অস্তিত্বশীল তা হয় বস্তু অথবা শক্তি। বস্তুবাদ অনুযায়ী সব জিনিসই বস্তু দ্বারা গঠিত, এবং সব প্রপঞ্চ (চেতনাসহ) বস্তুর পারস্পরিক আন্তক্রিয়ার ফলাফল। অন্য কথায় বস্তু হচ্ছে একমাত্র সারবস্তু এবং বাস্তবতা হচ্ছে শক্তি এবং বস্তুর প্রকৃত ঘটনা-অবস্থার পরিচায়ক।

এই মতবাদ অনুসারে, পৃথিবী বস্তুগত, তার অস্তিত্ব আছে বিষয়গতভাবে, চৈতন্যের বাইরে, ও চৈতন্যনিরপেক্ষভাবে। বস্তুবাদ অনুসারে, বস্তুই মুখ্য, তা কারো দ্বারা সৃষ্ট হয়নি এবং আছে বাহ্যিকভাবে; চৈতন্য, চিন্তন হলো বস্তুরই একটি গুণধর্ম। এই মতবাদ অনুযায়ী, পৃথিবী ও তার নিয়মগুলো জ্ঞেয়। বস্তুবাদ ভাববাদের বিরোধী এবং তাদের সংগ্রামই ঐতিহাসিক-দার্শনিক প্রক্রিয়ার আধেয়। বস্তুবাদ কথাটি ১৭শ শতাব্দীতে ব্যবহৃত হয়েছিল প্রধানত বস্তু সম্বন্ধে পদার্থবিদ্যাগত ধারণাগুলোর অর্থে এবং ১৮শ শতাব্দীর গোড়ার দিক থেকে তা ব্যবহৃত হয়েছে দার্শনিক অর্থে, ভাববাদের বৈপরীত্যে।

যে দার্শনিক মতবাদ যাবতীয় আধ্যাত্মিক বিষয়কে অস্বীকার করে এবং শুধুমাত্র বস্ত্র ও বস্তুর গতিকেই বিশ্বের সকল প্রাকৃতিক ও সামাজিক ঘটনার নিয়ামক বলে বিবেচনা করে সেই মতবাদকেই বলা হয় বস্তুবাদ। দর্শন শাস্ত্রের অন্তর্গত অধিবিদ্যা বিষয়ক প্রত্যয়, যা বলতে বোঝায় জাগতিক যাবতীয় অস্তিত্বের আধার হলো বস্তু (matter)। বস্তুময় জগৎ হলো চিরন্তন এবং স্থান ও কালের নিরিখে অসীম। বিবর্তনের ধারায় উদ্ভূত মানুষের ভাব ও চেতনা বস্তুভিত্তিক ও বস্তুরই প্রতিফলন। বস্তুর সমন্বয়ে গঠিত মাস্তিষ্কের ক্রিয়া হলো চিন্তন ও চেতনা। বস্তুবাদী দর্শনের বিপরীত ধারা হলো ভাববাদ। বস্তুবাদী দর্শনে বস্তুকেই সব কিছু অগ্রবর্তী বলে মনে করা হয়। বিশ্বতত্ত্ব (cosmology) বিচার প্রসঙ্গে বস্তুবাদীরা দু'শেণিতে বিভক্ত। এক শ্রেণির বিশ্লেষণ পদ্ধতি যান্ত্রিক (mechanistic) এবং অপর শ্রেণির পদ্ধতি দ্বান্দ্বিক (dialectical)। মার্কসীয় দর্শনে বস্তুবাদ দ্বিবিধ ধারায় বিবেচিত হয়েছেঃ এক. ইতিহাস, সমাজ ও অর্থনীতির ভিত্তিতে

ঐতিহাসিক বস্তুবাদ ও দুই. হেগেলের প্রভাবে গঠিত প্রত্যয় নয়, প্রতিনয় ও সমন্বয় উদ্ভূত দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ।

মানুষের তথা সমাজের ইতিহাসের সঙ্গে জড়িত ঐতিহাসিক বস্তুবাদের সারমর্ম হলো সামাজিক বিধিব্যবস্থার মূলে অর্থনৈতিক উৎপাদনের চালিকা শক্তি ও উৎপাদনের অন্তর্গত শ্রেণি সম্পর্কের অন্তর্বিরোধ ঐতিহাসিক প্রক্রিয়াকে যুগপৎ গতিশীল করে তোলে। রাজনৈতিক আধিপত্য, অর্থনৈতিক শোষণ ও সামাজিক বিষয়াদি সম্পর্কিত তত্ত্ব কিংবা লোকের মূল্যবোধ, চিন্তাভাবনা ও নৈতিক মনোভঙ্গী অনুযায়ী নানান সামাজিক তত্ত্ব বস্তুবাদী কিংবা ভাববাদী আখ্যায় অভিহিত হয়। অন্যদিকে মার্কসীয় দৃষ্টিতে বস্তুবাদের দ্বান্দ্বিক ধারায় বস্তুর গতিপ্রকৃতি বিরোধ, সমন্বয় ও পুনর্বিরোধের মধ্যে দিয়ে উর্ধ্বমুখী ঘূর্ণায়মন (spiral) অগ্রগমনের ধারায় নিয়ন্ত্রিত।

বস্তুবাদ গ্রিস, ভারত প্রভৃতি দেশে প্রাচীনকালেই দেখা দেয়। আঠারো শতকে ইউরোপের বুদ্ধিবিভাসিত আন্দোলনকালে (Enlightenment) মনে করা হত যে বস্তুর বাইরে কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। যেসব বিষয় মানসিক বা ভাবগত বলে মনে করা হয় সেগুলো প্রকৃতপক্ষে বস্তুগত প্রক্রিয়া দেখার ভঙ্গিতে ভাবগত বলে অনুভূত হয়।

বস্তু সম্পর্কে আধুনিক বৈজ্ঞানিক ধারণা পরিবর্তিত হয়ে যাওয়ায় আঠারো শতকে নিউটনের ধ্রুপদী mechanistic প্রত্যয় ত্রুটিপূর্ণ বলে মনে করা হয়। বৈজ্ঞানিকদের অভিমতের ভিত্তিতে মানবেন্দ্রনাথ রায় মনে করেন যে বস্তু বা জড় এখন নিছক একটা স্পর্শনীয় সত্তা (hard lump of reality) নয়। আইনস্টাইন, প্ল্যাঙ্ক প্রমুখ পদার্থবিদদের বক্তব্য বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তিনি বলেন যে পদার্থবিদ্যার সাম্প্রতিক চিন্তাভাবনা বস্তু সম্পর্কে পূর্বতন সংকীর্ণ ধারণা ভেঙে দিয়েছে। সেজন্য তাঁর মতে বস্তুবাদকে physical realism নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

মনোজগৎ বস্তুর অন্তর্গত। মানুষও প্রাকৃতিক জগতের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। মানুষের আচরণ মনোবিদ্যা নিয়ন্ত্রণ করে, যার ভিত্তি হলো শারীরবিদ্যা ও রসায়ন। পদার্থবিদ্যা ও মনোবিদ্যার মধ্যে এক সেতুবন্ধ রচিত হয়েছে। সর্বতোভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত তত্ত্ব না হলেও physico-chemical substance-এ গঠিত দেহের বিকাশেই তিনি প্রাণের উৎস দর্শিয়েছেন। জৈব বিবর্তনের ধারায় প্রাণ ও মস্তিষ্কের পরিণত অবস্থায় চিন্তন এক বস্তুনিরপেক্ষ সত্তা অর্জন করেছে। চিন্তন মস্তিষ্কের ক্রিয়া ; কিন্তু তা স্বাধীন গতিতে অগ্রসর হয়। বস্তুবাদে চিন্তন একটি "objective reality" হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছে। পরিবেশ তাকে প্রভাবিত করে, কিন্তু নিয়ন্ত্রণ করে না। উভয়ের যুগপৎ ও সমান্তরাল গতি ইতিহাসের জৈবপ্রক্রিয়ার (organic process) বিচার-পদ্ধতি সৃজন করেছে ; বস্তু ও চেতনাকে মানবেন্দ্রনাথ অদ্বয় (monistic) সত্তায় সমন্বিত করেছেন। পক্ষান্তরে পূর্বোক্ত যান্ত্রিক ও দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিতে বস্তু ও চেতনা দ্বৈতরূপে বিশ্লেষিত হয়েছে।

উল্লিখিত যান্ত্রিক প্রত্যয়কে তিনি প্রত্যক্ষপূর্ব জ্ঞানপদ্ধতি (a-priori) হিসেবে দেখেছেন, যাতে জগৎপ্রকৃতি যেন একটা ঘড়ির মতো পূর্বনির্ধারিত এক পরিণামবাদী

(teleological) নিয়মে ক্রিয়াশীল, তাঁর মতে প্রকৃতিবিজ্ঞান এখনকার দৃষ্টিতে অবরোহী (deductive) প্রণালীতে চলে না। আরোহী (inductive) পদ্ধতিই বিজ্ঞানসম্মত।

প্রকৃতি বিজ্ঞান কোনো দেওয়াল লিখন নয়। কতগুলো প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া বারে বারে ঘটে, যার অপরিবর্তনীয় সম্পর্ক গবেষণার মাধ্যমে গাণিতিক সূত্রে পরিমাপ করা সম্ভব। এবং প্রকৃতির বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মধ্যেও এই যোগসূত্র থাকে। সেইসব ঘটনার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে মানবেন্দ্রনাথ এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেন যে বস্তুবাদের পশ্চাতে এক নিয়ম নিয়ন্ত্রিত জগৎ (law-governed universe) প্রত্যয় কাজ করে। জগতের বিভিন্ন নিয়ম নিয়ন্ত্রিত অংশের মধ্যে একটা শৃঙ্খলা (order) পরিলক্ষিত হয়। সেটি পরিণামবাদী নয়। তদনুযী প্রকৃতির অংশ হিসেবে বস্তু ও প্রাণের মধ্যে কোনো ফাঁক নেই। জৈব বিবর্তন ধারায় সঞ্জাত মানুষের যুক্তিবোধ সেই নিয়ম নিয়ন্ত্রিত জগতের অংশ। তাতে মানুষের সব আচরণই ব্যাখ্যা করা যায়।

বহিঃসমর্পণ (Extradition)

অপরাধমূলক কাজে অভিযুক্ত কিংবা দণ্ডিত কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো রাষ্ট্রে পলায়ন অথবা আশ্রয় গ্রহণ করলে অভিযোগকারী রাষ্ট্রের কাছে তাকে সমর্পণ করা হয়। সমর্পণ সংক্রান্ত বিষয়ে কোনো আন্তর্জাতিক আইন না থাকায় এক বা একাধিক রাষ্ট্রের মধ্যে বহিঃসমর্পণ বিষয়ে সবিস্তারে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে। ওইসব চুক্তিতে বিশেষ করে যুক্তরাজ্যে রাজনৈতিক অপরাধ ব্যতিরেকে অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অপরাধে অভিযুক্ত দোষী ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রের হাতে তুলে শর্ত থাকে। যুক্তরাষ্ট্রে অঙ্গরাজ্যগুলোর মধ্যে একটি আন্তঃরাজ্য আইন অনুসারে অপরাধীকে সমর্পণ করা হয়। তবে সেখানে একটি রাজ্যের গভর্নর অপর কোনো রাজ্যের অভিযুক্ত আসামীকে হস্তান্তর নাও করতে পারেন। সাধারণত কোনো আইনেই রাজনৈতিক অপরাধীকে নানা কারণে সমর্পণ করার রীতি থাকে না। অবশ্য রাজনৈতিক অপরাধীদের বিরুদ্ধে অনেক সময় ফৌজদারি মামলা থাকে। বৈদেশিক নীতি ও কূটনৈতিক কারণে ক্ষেত্রবিশেষে প্রচলিত রীতি শিথিল করা হয়।

বহুত্ববাদ (Pluralism)

বহুত্ববাদ সম্বন্ধে তিন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গী আছে: প্রথম, যে মতবাদে রাজনৈতিক ক্ষমতা বিভিন্ন ধরনের প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে বিকিরণ করা হয়, এবং সেইসব প্রতিষ্ঠান একে অপরের ক্রিয়াকলাপকে সীমত রাখতে পারে, কিংবা অন্য প্রতিষ্ঠানের সাহায্য নিতে পারে, যেগুলোর কোনোটাই সার্বভৌম নয়। বহুত্ববাদ হলো এক ধরনের "সীমত সরকার" ; দ্বিতীয় মতানুসারে দেশের সংবিধানে এমন বিধান থাকা বাঞ্ছনীয় যাতে নানাবিধ সামাজিক রীতিনীতি, ধর্মীয় ও নৈতিক বিশ্বাস, প্রতিষ্ঠানগত আচরণ সমভাবে স্বীকৃত এবং যাবতীয় রাজনৈতিক অধিকার সংবিধানে নিহিত থাকে, এবং রাষ্ট্র ব্যতীত অন্য কোনো প্রতিষ্ঠান সেই অধিকারের উৎস হবে না; তৃতীয় মতানুসারে বিভিন্ন

সামাজিক প্রক্রিয়া ও প্রত্যয় ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের এক বা দুটি ভিত্তির পরিবর্তে নানা ধরনের ভিত্তি থাকতে পারে।

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ (Bangladesh Awami League)

বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ দেশের অন্যতম বৃহৎ ও পুরাতন রাজনৈতিক দল। আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতাবৃন্দ প্রায় সকলেই ছিলেন পাকিস্তান মুসলিম লীগের সদস্য। বিভিন্ন অবস্থার প্রেক্ষিতে ১৯৪৯ সালের ২৩-২৪ জুন মুসলিম লীগের প্রগতিশীল অংশের কতিপয় নেতা-কর্মী ঢাকার রোজ গার্ডেনে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। এই সম্মেলনে মাওলানা আব্দুল হামিদ খান ভাসানীকে সভাপতি করে 'আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সাধারণ সম্পাদক হন শামসুল হক এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। পরবর্তীতে ১৯৫৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ঢাকায় অনুষ্ঠিত দলের কাউন্সিল অধিবেশনে আওয়ামী মুসলিম লীগকে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে রূপ দেয়ার জন্য দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেয়া হয়। তখন থেকে দলটি আওয়ামী লীগ নামে একটি অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত আওয়ামী লীগ ভাষা আন্দোলন সহ সকল গণতান্ত্রিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ যুক্তফ্রন্টের সাথে ঐক্যবদ্ধভাবে অংশগ্রহণ করে এবং যুক্তফ্রন্ট কর্তৃক অধিকৃত ২১৯টি আসনের মধ্যে ১৪৩টি আসন লাভ করে যুক্তফ্রন্টের বৃহত্তম অঙ্গদল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৬৬ সালের ৬-দফা কর্মসূচি প্রচারের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং এরই ধারাবাহিকতার ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান হতে সকল আসনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় পরিষদের ১৬৯টি আসনের মধ্যে ১৬৭ টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৮৮টি আসন লাভ করে।

১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন ওসার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। স্বাধীন বাংলাদেশের শাসনভার অর্পিত হয় আওয়ামী লীগের হাতে। নতুন সংবিধানের অধীনে ১৯৭৩ সালের ৭ মার্চ তারিখে স্বাধীন ও সার্বভৌম বাংলাদেশের প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৭৩.২০ ভোট ও ২৯৩ টি আসন লাভ করে। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ২৪.৫৫ ভোট ও ৩৯টি আসন লাভ করে সংসদের বৃহত্তম বিরোধী দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৮৬ সালের ৭ মে অনুষ্ঠিত তৃতীয় জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অংশগ্রহণ করে ২৬% ভোট ও ৭৬টি আসন লাভ করে পুণরায় প্রধান বিরোধী দলের মর্যাদা পায়। ১৯৯১ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত পঞ্চম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের মাধ্যমে বাংলাদেশে সংসদীয় ব্যবস্থা পূন:প্রবর্তিত হয়। এই নির্বাচনে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ ৩০% ভোট ও ৮৮টি আসন লাভ করে প্রধান বিরোধী দল হিসেবে

সংসদে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। ১৯৯৬ সালের ১২ জুন সপ্তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৭.৪৪% ভোট এবং ১৪৬টি আসন পেয়ে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। দীর্ঘ ২১ বছর পর আবার রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় আসীন হয়। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৪০.১৩% ভোট ও ৬২টি আসন পেয়ে পুনরায় সংসদের বিরোধী দল হিসেবে আবির্ভূত হয়। ২০০৮ সালের ২৯ ডিসেম্বর নবম সংসদ নির্বাচনে নিরুঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে সরকার গঠন করে এবং পাঁচ বছর পূর্ণ করে পরবর্তী দশম সংসদ নির্বাচনে বিরোধী দল বিএনপির অংশগ্রহণ ছাড়াই একক নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে পুনরায় ক্ষমতায় আসে। কাজেই দেখা যাচ্ছে প্রতিষ্ঠার পর থেকেই আওয়ামী লীগ তৎকালীন পাকিস্তান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশের রাজনীতিতে কখনো সরকারি দল হিসেবে আবার কখনো বিরোধী দল হিসেবে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে।

বাংলাদেশ গণপরিষদ (Bangladesh Constituent Assembly)

গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা হচ্ছে প্রতিনিধিত্বমূলক। যেহেতু জনসাধারণের অভিপ্রায়ের অভিব্যক্তির সর্বোচ্চ প্রকাশ প্রতিফলিত থাকে সংবিধানে, সেহেতু সংবিধান পণয়নের লক্ষ্যে পাপ্তবয়স্ক তথা ভোটাধিকারপাপ্ত অংশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভোটে নির্বাচিত গণপতিনিধিদের সমন্বয়ে গঠিত হয় গণপরিষদ। গণপরিষদের মূল কাজ হচ্ছে সংবিধান পণয়ন করা। গণপরিষদের অধিবেশনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ একত্রিত হয়ে সুনির্দিষ্ট কার্য-পণালী বিধি অনুযায়ী আলোচনা-পর্যালোচনার ভিত্তিতে স্ব-স্ব রাষ্ট্রের উপযোগী সংবিধান প্রণয়ন করে থাকে। এ-কাজটি সমাধা হওয়ার পর প্রণীত, গৃহীত ও বলবৎকৃত সংবিধান অনুযায়ী রাষ্ট্র পরিচালিত হয়ে থাকে এবং গণপরিষদ বিলুপ্ত হয়ে যায়।

স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের জন্য একটি সংবিধান রচনার দায়িত্ব দেয়া হয় এ পরিষদকে।'৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তান জাতীয় পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের পরিষদ ও পূর্ব পাকিস্তান প্রাদেশিক পরিষদে যেসব সদস্য নির্বাচিত হয়েছিলেন তাঁদের নিয়ে বাংলাদেশ গণপরিষদ গঠিত হয়। গণপরিষদের সদস্য ছিলেন ৪৩০ জন। রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত 'বাংলাদেশ গণপরিষদ আদেশ ১৯৭২' অণুযায়ী গণপরিষদ গঠিত ও কার্যক্রম শুরু করে।

গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন বসে ১৯৭২ সালের ১০ এপ্রিল। গণপরিষদ থেকে আইনমন্ত্রী ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে একটি 'খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি' গঠিত হয়। খসড়া সংবিধান প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক উথাপিত খসড়া সংবিধান ১৯৭২ সালের ৪ নভেম্বর গণপরিষদে গৃহীত হয়। ১৬ ডিসেম্বর থেকে 'গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান' কার্যকর হয়। সংবিধান কার্যকর হওয়ার পর গণপরিষদ ভেঙে দেয়া হয়।

বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (Bangladesh Nationalist Party-BNP)

১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর তারিখে বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান কর্তৃক গঠিত রাজনৈতিক দলের নাম বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল। ১৯৫৫ সালে তৎকালীন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে জিয়াউর রহমান (জন্ম ২৯.১.১৯৩৬) কমিশন লাভ করেন। ১৯৬৫ সালে পাক-ভারত যুদ্ধের সময় খেমকারান সেক্টরে যুদ্ধ করেন। ১৯৭১ সালের ২৬ মার্চ পাক হানাদার বাহিনী অপরেশন সার্চলাইট শুরু করলে চট্টগ্রামস্থ দ্বিতীয় ইস্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড হিসাবে বিদ্রোহ করেন এবং ২৭ মার্চ চট্টগ্রাম কালুরঘাট বেতারকেন্দ্র থেকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের পক্ষে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। তিনি মুক্তিযুদ্ধের সময় জেড-ফোর্সের অধিনায়ক ছিলেন। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হন। ১৯৭৫ সালের ৭ সেপ্টেম্বর সিপাহি জনতার অভ্যুত্থানের ফলস্বরূপ জিয়াউর রহমান রাষ্ট্রীয়ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৭৭ সালের ২১ এপ্রিল প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করেন। প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করেই তিনি ১৯ দফা কর্মসূচি ঘোষণা করেন এবং তারই ভিত্তিতে জাতীয় গণতান্ত্রিক দল (জাগদল) গঠন করেন। বিচারপতি আবদুস সাত্তারকে জাগদলের প্রধান মনোনীত করা হয়। ১৯৭৮ সালের ১ সেপ্টেম্বর জাগদলের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বিএনপি গঠন করা হয় এবং প্রেসিডেন্ট জিয়া সরাসরি এ দলের চেয়ারম্যান-এর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে এ-দল বিজয়ী হয় এবং ১৯৭৫-এর পর পুনরায় বাংলাদেশে পার্লামেন্ট চালু হয়। ১৯৮১ সালের ৩০ মে প্রেসিডেন্ট জিয়া সেনাবাহিনীর কিছু সংখ্যক বিদ্রোহী অফিসারের হাতে নিহত হন। ভাইস প্রেসিডেন্ট বিচারপতি আবদুস সাত্তার দেশের প্রেসিডেন্ট ও দলের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। বিচারপতি সাত্তার নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার কয়েক মাস পরই ১৯৮২ সালের ২৪ মার্চ তৎকালীন প্রধান সেনাপতি হুসেইন মুহম্মাদ এরশাদ এক সামরিক ক্যু-এর মাধ্যমে বিএনপি সরকারকে উৎখাত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেন। উৎখাত হওয়ার পর বিচারপতি সাত্তার রাজনীতি থেকে সরে যান এবং নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়ার স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া দলের চেয়ারপার্সনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। খালেদা জিয়ার নেতৃত্বে বিএনপি এরশাদের বিরুদ্ধে লাগাতার আপোসহীন আন্দোলন পরিচালনা করে। ১৯৮৯-৯০ সালে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির যুগপৎ আন্দোলনের ফলে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে এবং ১৯৯১-এর পার্লামেন্ট নির্বাচনে বিএনপি বিজয়ী হয়ে পুনরায় রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং খালেদা জিয়া প্রথম বারের মত প্রধানমন্ত্রী হন। ১৯৯৬ সালের নির্বাচনে বিএনপি পরাজিত হয় এবং আওয়ামী লীগের 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ'-এর বিপরীতে 'বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ'। আর বিএনপির কর্মসূচি হচ্ছে ১৯৭৭ সালে ঘোষিত ১৯ দফা কর্মসূচি, যার মধ্যে রয়েছে দেশের স্বাধীনতা অখন্ডতা ও সার্বভৌমত্বরক্ষা, গণতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ, অর্থনৈতিক ন্যায়বিচারের সমাজতন্ত্র, আত্মনির্ভরশীলতা, উৎপাদন বৃদ্ধি, অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, চিকিৎসা ও বাসস্থানের সংস্থান, নারীর মর্যাদা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন, শ্রমিককল্যাণ, জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ, সমতাভিত্তিক পররাষ্ট্রনীতি, প্রশাসনের

বিকেন্দ্রীকরণ, দুর্নীতি সমাজ, ধর্ম , বর্ণ, গোত্র, নির্বিশেষে সকল নাগরিকের অধিকার সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়। বিএনপি তাদের রাজনীতিকে 'উৎপাদনের রাজনীতি' বলেও দাবি করে থাকে। বিএনপিতে মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের লোক, মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী লোক, সাবেক সাম্যবাদী-সমাজতন্ত্রী, মুসলিম লীগ প্রমুখ রক্ষণশীল ঘরানার লোকসহ বিভিন্ন ঘরানা ও চিন্তাচেতনার মানুষের অবস্থিতি রয়েছে। বিএনপি বাংলাদেশের বৃহত্তম দুটি দলের অন্যতম দল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ভাবমূর্তি যেমন আওয়ামী লীগ মূল চালিকাশক্তি তেমনি বিএনপির মূল চালিকাশক্তি হচ্ছে জেনারেল জিয়াউর রহমানের ভাবমূর্তি।

বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি (Bangladesh Communist Party)

বাংলাদেশের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন দল হচ্ছে কমিউনিস্ট পার্টি। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের তাশখন্দ শহরে ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর এই রাজনৈতিক দলের জন্ম। ১৯২২ সালের মাঝামাঝি ভারতবর্ষের কলকাতা, মুম্বাই, মাদ্রাজ, পঞ্জাব ও উত্তর প্রদেশে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৪৮ সালের ৬ মার্চ নতুন করে গঠিত হয় দলটি। প্রথমে সারা পাকিস্তানে একটি কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিট ব্যুরোর অধীনে তৎপরতা অব্যাহত থাকে। পরে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির পূর্ববঙ্গ শাখা প্রায় স্বতন্ত্রভাবেই কাজ শুরু করে। মধ্য ষাটের দশকে এসে কমিউনিস্ট আন্দোলনে মতো ও পথ নিয়ে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে যে মতদ্বৈততা দেখা দেয়, তার-ই জের হিসেবে কমিউনিস্ট পার্টি দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়ে। কমিউনিস্টদের একটি গ্রুপ এ সময় থেকে 'মস্কোপন্থী' এবং অপরটি 'পিকিংপন্থী' হিসেবে পরিচিত লাভ করে।

১৯৭১ সালে মস্কোপন্থীরা মুক্তিযুদ্ধে ভূমিকা পালন করে। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ মস্কোপন্থী দলটির নামকরণ করা 'বাংলাদেশর কমিুনিস্ট পার্টি, ইংরেজিতে Communist Party of Bangladesh (CPB) মধ্য আশির দশকে সাবেক সেভিয়েত ইউনিয়সনহ পূর্ব ইউরোপের দেশে কমিউনিস্ট সরকারের পতনের ঘটনা এ দলটির ওপরও প্রভাব ফেলে। ৯০ এর দশকের গোড়ার দিকে মস্কোপন্থীরা আবার দুভাগে বিভক্ত হয়। একটি গ্রুপ 'বাংলাদেশ কমিউনিস্ট পার্টি (সিপিবি) নাম বজায় রাখে এবং এখনো এ নামেই রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে। আর অপর অংশটি কমিউনিস্ট আদর্শ ত্যাগ করে নিষ্ক্রিয় অথবা অন্য রাজনৈতিক দলে যোগদান করেছে। এছাড়াও কমিউনিস্ট ভাবাদর্শে বিশ্বাসী অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দল বিভিন্নভাবে তাদের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

বাইজান্টাইন সভ্যতা (Byzantine Civilization)

সিরিয়া, মিশর ও প্যালেস্টাইনকে নিয়ে গঠিত পূর্ব-রোমক সাম্রাজ্য বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য নামে পরিচিত। রোমক সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী রাষ্ট্র হিসেবেও এটি ইতিহাসখ্যাত।

প্রতিষ্ঠা করেন সম্রাট কন্সটান্টাইন ৩৩০ সালে। রাজধানী ছিল কন্সটান্টিয়ানের শানসামলে বাইজান্টাইন শিল্পকলা, স্থাপত্যশিল্প ও চারুকলার চরম বিকাশ ঘটে। এসবের সমাহারে এই সভ্যতার উৎপত্তি ও বিকাশ এবং ক্রমে তা স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী হয়। এই সভ্যতার বিকাশে গ্রিক সভ্যতা ও প্রাচ্য সভ্যতারও প্রভূত অবদান রয়েছে। বাইজান্টাইন চারুকলার উদ্ভব ঘটে খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে। গ্রিক হেলেনিক ও প্রাচ্য ঐতিহ্যের সংমিশ্রণে উদ্ভূত এই শিলারীতির ক্ষেত্রে গঠন সৌকর্যের চেয়ে অলংকার বাহুল্যই প্রধান বৈশিষ্ট্য। ৫২৭ সালে সম্রাট প্রথম জাস্টিনিয়ান সিংহাসনে আরোহণ করে রোমান সাম্রাজ্যের হৃতগৌরব ফিরিয়ে আনেন। তিনি রোমান আইন লিপিবদ্ধ এবং তা সময়োপযোগী করেও ইতিহাসে স্মরণীয় হয়ে আছেন। তিনি গ্রিক ভাষাকে তার সাম্রাজ্যের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চালু করেন। এ সময় বহু অমূল্য ইতিহাস ও সহিত্যগ্রন্থ রচিত হয়। এই সময়েই বাইজান্টাইন চারুকলারও স্বর্ণযুগের সুচনা হয়। পাথ ও পোড়ামাটির ওপর অঙ্কিত চিত্রাবলী এই সময় বিশেষভাবে বিকাশলাভ করে। মধ্য ইতালীয় রাভেনাতে ষষ্ঠ শতকে নির্মিত গির্জাগুলো মোজাইককর্ম এর অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। বাইজান্টাইন সঙ্গীতকলা একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার অধিকারী। এর মূল অংশজুড়ে রয়েছে খ্রিস্টের ধর্মীয় প্রার্থনা সংবলিত গান। তুর্কিদের দ্বারা ১৪৫৩ সালে কন্সটান্টিনেপল অধিকারের ভেতর দিয়ে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

বাকশাল (BAKSHAL)

বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগের সংক্ষেপিত নাম বাকশাল (BAKSHAL) ১৯৭৫ সালের ২৪ জানুয়ারি সংবিধানের চতুর্থ সংশোধনীবলে বহুদলীয় সংসদীয় সরকারপদ্ধতির পরিবর্তে দেশে রাষ্ট্রপতিশাসিত শাসনব্যবস্থা প্রবর্তন করা হয় এবং দেশের সব রাজনৈতিক দল বিলুপ্ত করে এককন রাজনৈতিক দল বাকশাল গঠন করা হয়। এর চেয়াম্যান নিযুক্ত হন বাংলাদেশের তৎকালীন প্রেসিডেন্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাকশালে একীভুত হয়ে যাওয়া প্রধান তিনি রাজনৈতিক দল ছিল যথাক্রমে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ, মণি সিংহের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ও অধ্যাপক মুজাফফর আহমদের নেতৃত্বাধীন ন্যামনাল আওয়ামী পার্টি বা ন্যাপ। এছাড়া এর অঙ্গ সংগঠনের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন শ্রমিক ও কৃষকের পাশাপাশি দেশের শীর্ষস্থানীয় সামরিক কর্মকর্তা, সাংবাদিক, ছাত্র, যুবক, বুদ্ধিজীবী ও শিল্পী-সাহিত্যিকসহ সমাজের প্রায় সর্বস্তরের নেতা-কর্মী ও প্রতিনিধবৃন্দ। বাকশালের আদর্শ ও লক্ষ্য ছিল দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কৃষক শ্রেণির জীবযাত্রার মনোন্নয়ন করা এবং তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে সমবায়ভিত্তিক কৃষি উৎপাদনব্যবস্থা গড়ে তোলা, শ্রমিক শ্রেণির সক্রিয় অংশগ্রহণ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কল-কারখানা পরিচালনা, ব্যবস্থাপনা ও উৎপাদন-ব্যবস্থা পুনর্গঠন, সরকারি প্রমাণ ও বিচার বিভাগের বিকেন্দ্রীকরণ এবং পুনর্বিন্যাস সাধারণ, দুর্নীতি ও সন্ত্রাসবাদী তৎপরতরা কঠোর হস্তে দশ, জনসংখ্যা হ্রাসকরণ পরিকল্পনা জোরদারকরণ, শোষিতের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও সমাজতন্ত্র কায়েম এবং শিল্প-কারখানাসহ ব্যাংক, বীমা ইত্যাদি জাতীয়করণ ও শিক্ষাব্যবস্থার যুগোপযোগী

সংস্কার সাধন করা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব একদলীয় ব্যবস্থা প্রবর্তনের পক্ষে যে সব যুক্তি প্রদর্শন করে সেগুলো হলো নিম্নরূপঃ

(১) সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি বিরোধী দলগুলোর কোনো আস্থা ছিল না। তারা জোরপূর্বক সরকারকে উৎখাত করতে চায় এবং আন্দোলনের নামে অসংখ্য রাজনৈতিক কর্মীকে হত্যা করে।

(২) উগ্রপন্থী বাম ও পাকিস্তানের সঙ্গে যোগসাজশকারী ডান গোষ্ঠীসমূহ বাংলাদেশকে মেনে নেয়নি। তারা দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করতে থাকে।

(৩) অফিস-আদালত, কর-কারখানা ও রাজনীতি-সর্বত্র 'ফ্রী স্টাইল' বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হয়, যার ফলে প্রশাসনের দক্ষতা ও উৎপাদন ব্যাহত হয়।

বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থা জনগণের মঙ্গল সাধনে ব্যর্থ হয়। যখন সাধারণ মানুষ খেতে পায় না তখন একটা ক্ষুদ্রগোষ্ঠী দুর্নীতি ও ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতা ও সম্পদ দখলের সীমাহীন প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। মুষ্টিমেয় ধনী ও লুটেরাদের এই গণতন্ত্রের স্থলে "শোষিতের গণতন্ত্র" প্রতিষ্ঠার জন্য সাংবিধানিক পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান নিহত হওয়ার পর দেশের রাজনৈতিক পট পরিবর্তিত হলে বাকশাল নামধারী দলটি আর সক্রিয় থাকে না। কিন্তু পরে ১৯৮৭ সালে আওয়ামী লীগের একটি অংশের উদ্যোগে এর পুনরুজ্জীবন ঘটে। তবে ১৯৯১ সালে এর কর্মীরা আওয়ামী লীগে পুনরায় যোগদান করলে বাকশালের আনুষ্ঠানিক বিলুপ্তি ঘটে।

বাক-স্বাধীনতা (Freedom of Expression)

বাক-স্বাধীনতা ; স্বাধীনভাবে মতামত প্রকা করার অধিকার। বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীন চিন্তাধারা প্রকাশ করিবার অধিবার গঠণতন্ত্রের একটি মূলমন্ত্র। শাসনতন্ত্রে জনগণকে এই বাকস্বাধীনতা ও স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করার অধিকার দেওয়া হয়েছে; তবে রাষ্ট্রের নিরাপত্তার খাতিরে ও বৈদেশিক রাষ্ট্রের সঙ্গে বন্ধুত্বমূলক সম্বন্ধ বজায় রাখার জন্য এই অধিকারের ওপর যুক্তি রাখার জন্য এই অধিকারের ওপর যুক্তিসঙ্গত ভাবে আইনের নিয়ন্ত্রণ থাকতে হবে।

বাগদাদ চুক্তি (The Baghdad Pact)

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষার নামে সম্পাদিত আন্তর্জাতিক চুক্তি। ১৯৫৩ সালে মার্কিন স্বার্থরক্ষার উদ্দেশে সম্পাদিত এ চুক্তি ১৯৫৫ সালের ইরাকের রাজধানী বাগদাদে স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত এ চুক্তি মধ্যপ্রাচ্য শান্তি চুক্তি সংস্থা নামে পরিচিত ছিল। এতে স্বাক্ষর করে ইরাক, ইরান, পাকিস্তান, তুরস্ক ও ব্রিটেন। ১৯৫৬ সালে পর্যন্ত এর প্রধান কার্যালয় ছিল বাগদাদে। ১৯৫৮ সালের পর ইরাক এ চুক্তি বর্জন করলে এর নতুন নাম হয় কেন্দ্রীয় চুক্তি সংস্থা বা CENTO। নতুন কার্যালয় স্থাপিত হয় তুরস্কের রাজধানী আঙ্কারায়। যুক্তরাষ্ট্র এ চুক্তিতে স্বাক্ষর না করেও এর পেছনে প্রধান শক্তির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়।

বাজারের সংজ্ঞা (Definition of Market)

সাধারণ অর্থ 'বাজার' বলতে একটি স্থানকে বোঝায় যেখানে বিভিন্ন প্রকার পণ্য ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। কিন্তু অর্থনীতিতে বাজার বলতে কোনো নির্দিষ্ট স্থানকে বোঝায় না। বরং বাজার বলতে কোনো পণ্যকে বোঝায় যার ক্রয়-বিক্রয় নিয়ে ক্রেতা ও বিক্রেতাদের মধ্যে প্রতিযোগিতা হয় এবং এভাবে একটি নির্ধারিত মূল্যে পণ্যটি ক্রয়-বিক্রয় হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ, পাটের বাজার, সোনার বাজার, শেয়ার বাজার ইত্যাদি। বাজার বলতে স্থান বোঝায় না, বরং এক বা একাধিক পণ্যকে বোঝায় যা ক্রেতা-বিক্রেতার মধ্যে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে ক্রয়-বিক্রয় হয়।

বাজেট (Budget)

বাজেট ফরাসি শব্দ bougette' ইংরেজী Budget শব্দটির উদ্ভব হয়েছে। এর অভিধানিক অর্থ হচ্ছে থলে বা অফিসের কাগজপত্র বহনকারী একটি চামড়ার থলে বা ব্যাগ। অর্থ দপ্তরের মন্ত্রী সরকারের আয়-ব্যয়ের হিসাবের কাগজপত্র থলের মধ্যে বহন করে নিয়ে যেতেন। তাই পরবর্তীকালে সরকারের হিসাব-নিকাশকে বাজেট বলা হয়। বাজেট বলতে একটি নির্দিষ্ট সময় সাধারণত এক বছরের মধ্যে রাষ্ট্রের বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের পরিমাণ এবং আয়ের বিভিন্ন রকম উৎস ও পরিমাণ সংবলিত হিসাবকে বোঝায়। অর্থাৎ আগামী আর্থিক বছরের জন্য সরকারের আয় ও ব্যয়ের সম্ভাব্য হিসাব। গণতান্ত্রিক দেশে প্রতি অর্থ বছরের শুরুতে অর্থমন্ত্রী প্রস্তাবিত বাজেট পার্লমেন্টে উত্থাপন করেন। পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হলেই বাজেট পাশ করা হয় বলে ধরা হয়। সরকার ছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের বাজেট তৈরি করতে পারে। বিভিন্ন প্রকারের কর, রাজস্ব, ফি, রাষ্ট্র পরিচালিত ব্যবসা ও বিদেশি ঋণ এবং সরকারের অন্যান্য আয় ও সাধারণ ব্যয় নিয়ে বাজেট তৈরি করা হয়। সরকারি বাজেট প্রধানত দু'রকম হতে পারে; যথা- রাজস্ব বাজেট ও উন্নয়ন বাজেট। অবশ্য, অগণতান্ত্রিক দেশেও বাজেট প্রণয়ন ও পাশের রেওয়াজ আছে। বর্তমান অর্থে বাজেট ১৭৩৩ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়।

বাজেট অধিবেশন (Budget Session)

সংসদের বাজেট অধিবেশন। প্রতি বছর শুরুতে অর্থমন্ত্রী সংসদে বাজেট উপস্থাপন করেন। সংসদের যে অধিবেশনে বাজেট উপস্থাপিত হয় তা-ই বাজেট অধিবেশন অর্থমন্ত্রী যেদিন উপস্থাপন করেন সেদিন বাজেট সম্পর্কে বা অন্য কোনো বিষয়ে কোনো আলোচনা হয় না। ক. বাজেট সম্পর্কে সাধারণ আলোচনা; খ. মঞ্জুরি দাবি ও দায়মুক্ত ব্যয় সম্পর্কিত নির্দিষ্টকরণ এবং গ. অন্যান্য ব্যয় সম্পর্কিত মঞ্জুরি দাবির ভোটগ্রহণ– এ তিনটি স্তরে বাজেট অধিবেশনে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

বাজেট, উন্নয়ন (Development Budget)

সাধারণত দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নমূলক কাজে সাহায্য প্রকল্পের জন্য তৈরি বাজেট হলো উন্নয়ন বাজেট। উন্নয়নমূলক প্রকল্প যেমন- রাস্তাঘাট নির্মাণ, রেল লাইন, জলসেচ ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের নিমিত্ত বাঁধ প্রভৃতি ব্যয়ই উন্নয়ন বাজেটের প্রধান খাত। রুটিনকাজের বাইরে আস্তঃকাঠামো, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ইত্যাদি খাতে উন্নয়নই এ-বাজেটের বিষয়। রাজস্ব বাজেটের উদ্বৃত্ত (যদি থাকে) এবং বৈদেশিক ঋণ ও সাহায্যে (অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের ক্ষেত্রে) ইত্যাদিই হলো উন্নয়ন বাজেটের আয়ের উৎস।

বাজেট, রাজস্ব (Revenue Budget)

যে বাজেটে সরকারের দৈনন্দিন খরচ নির্বাহের ব্যবস্থা থাকে তাই রাজস্ব বাজেট। রাজস্ব বাজেটে রাষ্ট্রের সাধারণ প্রশাসন, প্রতিরক্ষা, সামাজিক কার্যাবলী এবং অন্যান্য কার্যাবলীর চলতি ও দৈনন্দিন খরচ নির্বাহ করে। এই বাজেটের আয়ের উৎস আমদানি শুল্ক, আবগারি শুল্ক, বিক্রেয়কর, আয়কর, ভূমি খাজনা ইত্যাদি। আর এই বাজেটের মূল ব্যয় হল সরকারি কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা, সরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের রক্ষণাবেক্ষণ এবং কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সমাজকল্যাণ, আইন-শৃঙ্খলা, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি ক্ষেত্রে রুটিন বা নির্ধারিত ব্যয়।

বাথ পার্টি (Ba'ath Party)

বিশ্বের অন্যতম আলোচিত সমালোচিত একদলীয় শাসক সাদ্দাম হোসেনের ইরাক শাসনের অন্যতম হাতিয়ার ছিল বাথ পার্টি। বাথ পার্টির পুরো নাম 'দ্য আরব সোশ্যালিস্ট বাথ পার্টি'। এ নামেই ১৯৪৭ সালের এপ্রিলে সিরিয়ার রাজধানী দামেস্কে দলটির জন্ম হয়েছিল ফরাসি শিক্ষায় শিক্ষিত কয়েকজন সিরীয় বুদ্ধিজীবীর উদ্যোগে। এদের মধ্যে অন্যতম গ্রিক অর্থডক্স খ্রিস্টান মিশেলে আফলাক ও সুন্নী মুসলিম সালাহ-আল দীন আল-বিতার। এ পার্টির প্রধান আদর্শ হচ্ছে আরব ঐক্য ও ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদ। তবে এর পাশাপাশি বাথ পার্টি তখন সমাজতান্ত্রিক আদর্শও ধারণা করে। ১৯৫৪ সালে এ দল আক্রাম ইরানির আরব সোশ্যালিস্ট পার্টির সঙ্গে একীভূত হয়ে যায়। তখন এর নাম দেয়া হয় বাথ আরব সোশ্যালিস্ট পার্টি। আরবি ভাষায় 'বাথ' শব্দের অর্থ হচ্ছে রেনেসাঁ বা পুনর্জাগরণ। একজন বাথিস্ট বা বাথ পার্টির জন্য নিবেদিত ব্যক্তিরা বৃহত্তর আরব জাতির ঐক্য ও আঞ্চলিক পর্যায়ে স্বাধীন আরব রাষ্ট্রের অস্তিত্বে বিশ্বাস করে। সিরিয়ায় মূল বাথ পার্টির জন্মের ১১ বছর পর ১৯৫১ সালে এ দলের ইরাক শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। তিন বছর পরে এ পার্টির সদস্য সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০০-তে। ১৯৫৬ সালে সাদ্দাম হোসেন মাত্র ২০ বছর বয়সে এ পার্টিতে যোগ দেন। সামরিক বাহিনীর সহযোগিতায় সংঘটিত এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে তৎকালীন শাসক ব্রিগেডিয়ার আবদেল করিম কাশেমকে উৎখাত করে বাথ পার্টি ১৯৬৩ সালের ৮

ফেব্রুয়ারি ইরাকের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে। বামপন্থীরা মৌলবাদী আরব জাতীয়তাবাদের আদর্শে বিশ্বাসী ছিল। সে কারণেই ফিলিস্তিন ইস্যুকে সামনে নিয়ে বাথ পার্টি আধুনিক জাতীয়তাবাদের ওপর জোর দিয়ে পথ চলা শুরু করে। ৮০-র দশকে আরব বিশ্বের সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য দল হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করে বাথ পার্টি। তখন দলটির দাবি ছিল তাদের সদস্য সংখ্যা ১৫ লাখ ছাড়িয়ে গেছে, যাদের মধ্যে মাত্র ১০ শতাংশ ছিল ইরাকি। মূলত সামরিক বাহিনীর আদলেই গড়ে তোলা হয় ইরাকি বার্থ পার্টির কাঠামো। প্রত্যন্ত গ্রামেও এ পার্টির তিন থেকে সাত সদস্যের সেল গঠন করা হয়, যা আঞ্চলিক ও জাতীয় কমান্ডে বিস্তৃত ছিল। ১৯৮০ সালে বাথ পার্টির প্রাথমিক আদর্শ সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদের দিকে ধাবিত হয়। এ সময় জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানে বেসরকারিকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়। সাম্প্রতিক ইরাক যুদ্ধে সাদ্দাম হোসেনের ক্ষমতাচ্যুতির সঙ্গে সঙ্গে দৃশ্যত ইরাকি বাথ পার্টির কাঠামোও ভেঙে পড়ে।

বান্দুং সম্মেলন (Bandhung Summit)

ইন্দোনেশিয়ার অবস্থিত অন্যতম শহরের নাম বান্দুং। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে প্রথম এ স্থানে গুরুত্বপূর্ণ আফ্রো-এশীয় দেশের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৫৫ সালের এপ্রিল মাসে ইন্দোনেশিয়ার বান্দুং-এ আফ্রিকা ও এশিয়ার ২৯ টি দেশ আফ্রো-এশীয় সংহতি গড়ে তোলার উদ্দেশে এক সম্মেলনে মিলিত হয়। ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু, চীনের প্রধানমন্ত্রী চৌ এন লাই এবং ইন্দোনেশিয়ার প্রেসিডেন্ট আহমদ শোয়েকার্নো এই উদ্যোগ নেয়। এই সম্মেলনই বান্দুং সম্মেলন নামে খ্যাত। এই সম্মেলনে তাইওয়ার, ইসরায়েল, দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ কোরিয়া, দক্ষিণ ভিয়েতনাম, ও উত্তর ভিয়েতনামকে দাওয়াত দেওয়া হয়নি। এই সম্মেলনে আফ্রো-এশীয় সংহতির মূলনীতি হিসেবে 'পঞ্চশীলা' কে গ্রহণ করে। বান্দুং সম্মেলনে সিয়াটোর তীব্র সমালোচনা করা হয় এবং আফ্রিকা ও এশিয়ার ব্যাপারে আফ্রো-এশিয়ার দেশসমূহকে পাশ কাটিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার দরুন পশ্চিমা শক্তিসমূহেরও সমালোচনা করা হয়। অবশ্য ষাটের দশকেই এই সংহতিতে ভাঙন ধরে যায়।

বাফার স্টেট (Buffer State)

সাধারণত দুইটি শক্তিশালী রাষ্ট্রের মধ্যবর্তী ক্ষুদ্র নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বা সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রক রাষ্ট্র। দুটি বৃহৎ বিবদমান রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষ বা সংঘাত এড়ানোর জন্য দু'রাষ্ট্রের মাঝখানে যে ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থাপন করে বা বজায় রাখা হয়, সেই রাষ্ট্রকেই বলা হয় বাফার স্টেট। যদিও বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিকে যুদ্ধেও জন্য সুবিধাজনক মনে করে অথবা অন্য কোনো কারণে দখল করতে চায়, কিন্তু পরস্পরের মধ্যে শত্রুতা বা অবিশ্বাসের আশঙ্কায় কোনো রাষ্ট্রই এটাকে দখল করতে সাহস করে না। দুটি শক্তিশালী রাষ্ট্র একই সীমানায় পাশাপাশি থাকলে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ বাধতে পারে। এই আশঙ্কায় উভয় রাষ্ট্র চুক্তি করে মধ্যবর্তী স্থানে নিরপেক্ষ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র স্থাপন করে।

বাবরী মসজিদ (Babri Mosqu)

বাবরী মসজিদ ভারতের উত্তর প্রদেশের অযোধ্যা শহরে অবস্থিত মুসলমানদের ঐতিহাসিক মসজিদ। এটা মোগল সম্রাট কর্তৃক ষোড়ষ শতকে প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু হিন্দুরা এই জায়গাটিকে তাদের দেবতা রামের জন্মস্থান বলে মনে করে এবং তারা দাবি করে যে, এখানে যে পূজা মন্দিরটি ছিলো সেটিকে ভেঙে সম্রাট বাবর তৎস্থানে এই মসজিদটি নির্মাণ করেছে। ভারতের হিন্দু মৌলবাদী দল বিজেপি এই মসজিদটি ধ্বংস করে সেখানে মন্দির স্থাপন করতে চায়। এ বিষয়টি নিয়ে অযোধ্যার হিন্দু-মুসলিমদের মধ্যে সংঘাত সৃষ্টি হয়। ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর হিন্দু মৌলবাদী ও চরমপন্থীরা এই মসজিদটির আংশিক ক্ষতি সাধন করে। ফলে সর্বত্র এর প্রতিবাদের ঝড় উঠে। ভারতের কংগ্রেস সরকার মসজিদটি পুনঃসংস্কারের অঙ্গীকার করায় পরিস্থিতি শান্ত হয়।

বামপন্থা (Leftism)

সমাজতন্ত্রী ও প্রগতিশীলদেরই এখন সাধারণভাবে বামপন্থী বলা হয়। রাজনৈতিক চিন্তা ও ক্রিয়াকলাপে ব্যবহারবহুল বাম শব্দটির সুস্পষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে যখন গণপরিষদের অধিবেশন চলত (১৭৮৯-৯১) তখন বিপ্লবী অর্থাৎ তৃতীয় বর্গের সাধারণ প্রতিনিধিরা অধ্যক্ষের বাম দিকে বসতেন। বিরোধী রক্ষণশীল প্রথম বর্গের পরিবর্তনবিমুখ উচ্চশ্রেণির প্রতিনিধিরা দূরে সরে গিয়ে অধ্যক্ষের দক্ষিণ দিকে বসতেন। দ্বিতীয় বর্গের উদারতন্ত্রী যেসব প্রতিনিধি সীমত পরিবর্তন চাইতেন তাঁরা মধ্যস্থলে বসতেন। বাম ও দক্ষিণ দিকে আসন গ্রহণ সূত্রে বামপন্থী ও দক্ষিণপন্থী প্রত্যয়দুটির প্রচলন ঘটে।

উৎপত্তিগত বিশেষ তাৎপর্য না থাকলেও দু'শো বছরের বিবর্তনের ধারায় শব্দটি এক আবেগপূর্ণ আদর্শের রূপ পরিগ্রহ করেছে যার সারবত্তা হলো প্রগতি, আশাবাদ, বৈজ্ঞানিক মনোভঙ্গী, শোষণের বিরোধিতা, অর্থনৈতিক সাম্যের দাবি ও গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ; জাতি, ধর্ম ও বর্ণবিদ্বেষের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ ; রাষ্ট্রীয় স্বৈরতন্ত্র ও যুদ্ধের জিগিরকে প্রতিরোধ করা। তবে তার অর্থ এই যে দক্ষিণপন্থীরা ওই ধরনের আন্দোলনে যুক্ত থাকেন না। মানুষের যথার্থ কল্যাণসাধনে রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার নানা পরিবর্তনে বহু বিচিত্র মতাদর্শের ব্যক্তি ও সংস্থার নাম ইতিহাসে পাওয়া যায় যাঁরা বামপন্থী রূপে পরিচিতি হননি।

সাধারণভাবে দেখা গেছে যে বাম মতাদর্শীরা বরাবরই বিরোধী ভূমিকায় থাকেন, অর্থাৎ যাঁদের শাসন ক্ষমতায় যাবার সম্ভাবনা কম, ক্ষমতা পেলে তারই নেশায় তাঁদের আদর্শচ্যুতি ঘটে। সেজন্য ট্রটস্কি বিপ্লবকে চিরস্থায়ী করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে বামপন্থীদের ক্ষমতায় আসতে দেখা গেছে। তার অর্থ এই নয় যে তাতে তাঁদের বামসত্তা চলে যায়। প্রচলিত দৃষ্টিতে দক্ষিণপন্থী হবেন ধনী ও উৎপীড়ক শ্রেণির অন্তর্গত। আর দরিদ্র ও নিপীড়িত শ্রেণির প্রতিনিধি হলেন

বামপন্থীরা। অর্থাৎ বাম ও দক্ষিণের পার্থক্য দাঁড়াচ্ছে ধনী ও দরিদ্রের শ্রেণি বিভাজনে। কথাটা অনেকাংশে সত্যি হলেও ইতিহাসে এমনও দেখা গেছে যে দক্ষিণপন্থীদের পেছনে দরিদ্র মানুষের বিপুল সমর্থন আর বামপন্থীদের সঙ্গে ধনী, পুঁজিপতি ও জমিদার শ্রেণির পূর্ণ সহযোগ।

কারও কারও মতে বামপন্থীরা সদাই আন্দোলন চাই স্থিতাবস্থা ভাঙার জন্য। দক্ষিণপন্থীরা সাধারণত রক্ষণশীল, তারা প্রচলিত বিধিব্যবস্থা বজায় রাখার পক্ষপাতী; তারই মাপকাঠিতে প্রগতিবাদী ও প্রতিক্রিয়াশীল অভিধা চিহ্নিত হয়। প্রশ্ন ওঠে তা হলে ফ্যাসিবাদীদের কোনো গোত্রে ফেলা হবে? তারাও তো চাইত আন্দোলন ও রাষ্ট্রব্যবস্থার পরিবর্তন।

বামপন্থী সংজ্ঞা নিরূপণে অন্যতম মানদণ্ড হলো লক্ষ্য ও মাধ্যমের মধ্যে সামঞ্জস্যের প্রশ্ন। বামপন্থী লক্ষ্যে পৌঁছাতে চরম মাধ্যম অনুসরণ করতে হয়। কার্যত ১৮৫০ সালের পর স্বয়ং কার্ল মার্কসই চরমপন্থীদের সংস্রব ত্যাগ করেন। লেনিন সংসদীয় নির্বাচনে কৌশলগত কারণে অংশগ্রহণের পক্ষপাতী ছিলেন। উল্লেখ্য, হিংসাত্মক কার্যকলাপ কিংবা আপসহীন সংগ্রামী প্রবণতা ক্ষেত্রবিশেষে দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও দেখা যায়।

আদিপর্বে বামপন্থী আন্দোলন ছিল মূলত রাজনৈতিক। ধর্মের নাগপাশ থেকে মুক্তি এবং সামন্ততন্ত্র ও রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠাই ছিল প্রথম পর্যায়ের মূল আদর্শ। ব্যক্তিস্বাধীনতা ও সর্বজনীন ভোটাধিকার আদায় করাই ছিল তখন দীর্ঘকালের দাবি। ক্রমে তার সঙ্গে যুক্ত হয় ট্রেড ইউনিয়নের অর্থনৈতিক দাবি। ফরাসি বিপ্লবের সময় থেকে অর্থনৈতিক সাম্যের ভাবনা অঙ্কুরিত হয়েছিল, সেই ভাবনাই কালক্রমে সমাজতন্ত্রী মতাদর্শের রূপ নিয়ে বামপন্থী আদর্শের অন্যতম প্রধান উপাদান হয়ে ওঠে।

গণতন্ত্র প্রথমাবধি আদর্শের প্রধান উপাদান ছিল। পরবর্তীকালে সেটির পরিসর সংকুচিত হয়ে পড়ে। মার্কস গণতন্ত্রী অধিকারকে সাময়িকভাবে শুধু সর্বহারা শ্রেণির মধ্যে সীমত রাখার সুপারিশ করেন। তৎকালীন বিভিন্ন বামপন্থী গোষ্ঠী যেমন নৈরাজ্যবাদী ও সিন্ডিক্যালিস্ট মতাদর্শে গণতন্ত্রকে অবাধ ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি।

বিশ শতকের শেষ দশকে বামপন্থী মতাদর্শে স্থিতাবস্থা অবসানের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও মাধ্যম ও লক্ষ্য নিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সোসালিস্ট ও কমিউনিস্ট আন্দোলনে নতুন মানসিকতা দেখা দিয়েছে। সাধারণভাবে শিল্পবাণিজ্য তথা অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণ ও সমানধিকারের দাবি থাকলেও অধিকাংশ দেশেই বামপন্থী মহলে মিশ্র অর্থনীতির প্রতি আসক্তি গড়ে উঠেছে। তাঁদের মতে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতির অর্থ এই নয় যে উৎপাদনের সকল ক্ষেত্রেই রাষ্ট্রীয় মালিকানা থাকা চাই।

বার্লিন টানেল (Berlin Tunnel)

ইউরোপে স্নায়ুযুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন সিআইএ কমিউনিস্ট পূর্ব জার্মানিতে গোয়ান্দা তৎপরতা চালানোর উদ্দেশে পশ্চিম বার্লির থেকে আধা কিলোমিটার দীর্ঘ বার্লিন সুড়ঙ্গ

বা টানেল নির্মাণ করে যার মধ্য দিয়ে পূর্ব জার্মানির একটি আর্মি রাডার স্টেশনের তলা দিয়ে চলে যায়। ১৯৫৪ সালের গোড়ার দিকে একটি দ্বিতল বাসে সিআইএ ও ব্রিটিশ গোয়ান্দা কর্মকর্তারা সুড়ঙ্গ প্রকল্পের ব্যাপারে আলোচনায় মিলিত হলে ব্রিটিশ গোয়ান্দা সংস্থা কেজিবির আন্ডারওভার এজেন্ট জর্জ ব্ল্যাক বিষয়টি জেনে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে মস্কোকে তা জানিয়ে দেয়। মস্কো না জানার ভান করে থাকে এবং এক বছর পর রুটিন চেকআপ করতে গিয়েই যেন টানেলটিই সন্ধান পেয়েছে বলে টানেলটি বন্ধ করে দেয়। বার্লিনে সিআইএ-র অপারেশন বেসের সাবেক প্রধান ডেভিড মারফি, সিআইএর রেডিও ল্যাবরেটারির সাবেক পরিচালক জর্জ বেইলি ও কেজিবির অবসরপ্রাপ্ত লেফটেন্যান্ট জেনারেল সার্গেই কন্দ্রাসভ 'ব্যাটল গ্রাউন্ড বার্লিন : দি সিআইএ ভার্সাস কেজিবি ইন দ্য কোল্ড ওয়ার' শীর্ষক বইটি লিখে প্রকাশ করলে বিশ্ববাসী এ ব্যাপারে জানতে পারে।

বাস্তব রাজনীতি (Realpolitik)

জার্মান ভাষায় রিয়েলপলিটিক কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ। ইউরোপে ১৮৪৮-৪৯ সালে বৈপ্লবিক উত্থানকালে জার্মান উদারতন্ত্রী রাষ্ট্রনায়কদের অনুসৃত কর্মে বাস্তব রাজনৈতিক বোধের অভাবের সমালোচনাসূত্রে লুডভিগ ফন রোকাউ তাঁর এক বইতে (১৮৫৩) শব্দটি প্রয়োগ করেন। বিসমার্কের নেতৃত্বে জার্মানির সংযুক্তর আগে ও পরে শব্দটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য বিষয়াদির প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা বাস্তব রাজনীতির চরিত্র, প্রতিপক্ষের কথার চেয়ে তার কাজের মধ্যেদিয়ে তাকে সঠিক জানা এবং সময়মতো শক্তিপ্রয়োগের জন্য প্রস্তুত থাকা। মাখপলিটিক ক্ষমতার অনুরূপ অপর একটি শব্দ। তাতে দেশের ও বিদেশের বিবেচনার একমাত্র বিষয়বস্তু হলো ক্ষমতা। ক্ষমতাহীন গোষ্ঠী বিবেচনার পদবাচ্য নয় এবং যার যতটা ক্ষমতা আছে সে ততখানিই বিবেচ্য। এই মূল্যবোধশূন্য বিবেচনারীতি বাস্তব রাজনীতির বৈশিষ্ট্য। লোকের ভাবনার মধ্যে দিয়ে না দেশে বিশ্বপরিবেশকে তার বাস্তব চেহারা অনুযায়ী দেখা হয়। ক্ষমতার রাজনীতির কার্যত রাজনীতির প্রকৃতিকেই বদল করে ; রাজনীতির নৈতিক ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করে দেয়। তবে বাস্তব রাজনীতি ও ক্ষমতার রাজনীতির মধ্যে একটা সূক্ষ্ম প্রভেদ আছে। প্রথমটি বাস্তব বিষয় হিসেবে অধিকারকে স্বীকৃতি দেয়; দ্বিতীয়টি অধিকার অর্জনের ক্ষমতার ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করে।

বাস্তিল (Bastille)

ফ্যান্সের রাজধানী প্যারিস নগরীতে অবস্থিত ইতিহাস বিখ্যাত একটি দূর্গ। এই দূর্গে রাজনৈতিক বন্দিদের আটক রাখা হত। ফরাসি বিপ্লবের শুরুতে (১৭৮৯) বিপ্লবী জনতা বাস্তিল দূর্গ অবরোধ করে। ১৭৮৯ সালের ১৮ জুলাই বিপ্লবী জনতা উক্ত দূর্গসহ কারাগার দখল করে এবং ধূলিস্মাৎ করে দেয়। এই দূর্গের পতনের মাধ্যমেই ফরাসি বিপ্লবের প্রারম্ভ সূচিত হয়। প্যারিসের চতুর্দশ শতাব্দীতে তৈরি-সুরক্ষিত কারাগারের নাম বাস্তিল। ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের সময় এটাকে ধ্বংস করে দেয়া হয়।

বিকল্প ভোট (Alternate Vote)

বিকল্প ভোট হলো নির্ণায়ক ভোট। এটি হল একটি নির্বাচনব্যবস্থা, যাতে নির্বাচকমণ্ডীকে দ্বিতীয়বার প্রতিনিধিত্ব সাব্যস্ত করার অধিকার প্রদান করা হয়। নির্বাচনে যখন সমসংখ্যক ভোট পাওয়ায় কোন প্রার্থী নির্বাচিত হতে পারে না তখন অনেক সময় নির্ণায়ক ভোট প্রদানে উক্ত প্রার্থীদের কোনো একজনের নির্বাচন সম্পাদিত হয়ে থাকে। এইরূপ নির্বাচনব্যবস্থায় কোনো প্রার্থী যদি নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে, তা হলে বিকল্প ভোটের আর প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু কোনো প্রার্থীই যদি প্রথমবারে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ না করে, তা হলে প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী দুজন প্রার্থীকে যারা ভোট দিয়েছিল তাদের ছাড়া বাকি প্রার্থীদের ভোট দানকারীদের এই সুযোগ দেওয়া হয়, যাতে তারা প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী যে-কোনো একজনের পক্ষে পুনরায় ভোট দিতে পারে। প্রথমবারে প্রাপ্ত ভোটের সঙ্গে দ্বিতীয়বারে প্রাপ্ত ভোট যোগ করার পর প্রথম ও দ্বিতীয় প্রার্থীর মধ্যে যিনি সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেন, তাঁকেই নির্বাচিত বলে ঘোষণা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, ফ্রান্সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা চালু আছে। এরূপ নির্ণায়ক ভোট ব্যবস্থা কোনো দেশের সংবিধানে অন্তর্ভুক্ত থাকে।

বিকল্প সদস্য (Alternate Member)

বিকল্প সদস্য বলতে কোনো দলের বা সংগঠনের অতিরিক্ত ও সংরক্ষিত সদস্যকে বোঝায়। সাধারণত সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী দলের কেন্দ্রীয় কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও পলিট ব্যুরোর কিছুসংখ্যক বিকল্প সদস্য থাকেন। বিকল্প সদস্যেরা স্ব স্ব স্থানের কাঠামোর দ্বিতীয় পর্যায়ের সদস্য। উক্ত কাঠামোর কোনো পদ খালি হলে তা বিকল্প সদস্যদের মধ্য থেকেই সাধারণ পূরণ করা হয়। তা ছাড়া সংশ্লিষ্ট কমিটির বর্ধিত সভার বিকল্প সদস্যরাও আসনগ্রহণ করে থাকেন।

বিকেন্দ্রীকরণ (Decentralization)

ক্ষমতার ভাগাভাগিকে বুঝায়। কেন্দ্র থেকে স্থানীয় সকল স্তরে ক্ষমতার ভাগাভগি। সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তা বাস্তবায়নের ক্ষমতাকে একক কর্তৃপক্ষ বা কেন্দ্রের হাতে সীমাবদ্ধ না রেখে বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে দেওয়াকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে। কেন্দ্রাভিমুখে গমনশীলতার বিপরীত প্রক্রিয়া। কেন্দ্রীয় একক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক সংস্থা হতে বহুধা বিভক্ত স্বশাসিত প্রতিষ্ঠানের বিকেন্দ্রিত বা স্থানান্তরিত রাষ্ট্রক্ষমতা। কার্যনির্বাহী একটি কেন্দ্রীয় সংস্থার পরিবর্তে ক্রমনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত বিভিন্ন কার্যনির্বাহী সংস্থার কাছে কাজকর্মের জবাবদিহির প্রয়োজন ঘটে। ফলে স্থানীয় ও আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য ও প্রয়োজন অনুযায়ী কর্মপন্থা গ্রহণ ও সম্পাদন সম্ভবপর হয়।

কেন্দ্রীভূত শক্তি ও সংস্থার হতে ক্ষমতা কুক্ষিগত হয়ে পড়ার প্রতিকার হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণের চাহিদা প্রকাশ পায়, যাতে সর্বনিম্ন স্তরের সাধারণ মানুষের আশা

আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ হতে পারে। যদিও সার্বভৌমিকতা রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় শক্তির আধারে অধিষ্ঠিত থাকে, কিন্তু সেটা কোনো বিমূর্ত সত্তা নয়; সর্বনিম্ন স্তরে বিন্যস্ত স্থানিক পর্যায় পর্যন্ত ক্ষমতা বিকেন্দ্রিত হলে গণতন্ত্র ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা বিকশিত হবার সুযোগ পায়। বিকেন্দ্রীকরণের ব্যাপারটি রাষ্ট্রীয় প্রশাসন থেকে শুরু করে ব্যবসা প্রশাসন পর্যন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে।

বিক্ষোভ (Agitation)

দেশের কোনো একটা বিশেষ সামাজিক অথবা রাজনৈতিক অন্যায়ের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধ করার কৌশল হচ্ছে বিক্ষোভ। তখন জনসাধারণের কাছে কোনো ঘটনাবলী সম্পর্কে বিচার শক্তির চাইতে ভাবাবেগই অত্যাধিক গুরুত্ব পায়। বিক্ষোভ সৃষ্টিকারীদের সাফল্য উক্ত ভাবাবেগের গভীরতার ওপর বিশেষভাবে নির্ভর করে। অর্থাৎ কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে যখন জনসমষ্টি ঐক্যবদ্ধ হয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করে তাকে বিক্ষোভ বলা হয়।

বিচার বিভাগ (Judiciary)

সরকারের তিনটি অঙ্গের মধ্যে বিচার বিভাগ গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা আইনের একমাত্র উৎস নয়। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন ছাড়াও অনেক উৎস থেকে আইন তৈরি হয়। সেগুলোও আইনের মতো মান্য করা হয়। প্রথা, শাসন বিভাগীয় নির্দেশ, বিচারকের রায় ইত্যাদি সমান প্রযোজ্য। আইনের উৎস হিসেবে বিচারকের রায় গুরুত্বপূর্ণ। আইনসভা আইন প্রণয়ন করে কিন্তু সকল আইনের অর্থ বুঝে না এবং যথার্থ ব্যাখ্যা করতে পারে না। শাসনকার্য পরিচালনা করতে গিয়ে কোনো জটিল সমস্যার সম্মুখীন হলে শাসন বিভাগ নিজে তার সমাধান করতে পারে না। এসব সমাধানের জন্য বিচার বিভাগের শরণাপন্ন হতে হয়। আইনসভা কর্তৃক প্রণীত আইন বাস্তবে প্রয়োগ করে শাসন বিভাগ কিন্তু যদি কেউ কোনো আইন অবমাননা করে, তবে তার বিচার করার অধিকার শাসন বিভাগের নেই। দেশে সর্বজন গ্রহণযোগ্য জনকল্যাণকর আইন প্রণীত হবে এটাই সকলের কাম্য এবং সে আইনের বিধানানুসারে শাসন বিভাগ এমনভাবে দেশ শাসন করবে যেন জনসাধারণের মৌলিক অধিকার পরিপূর্ণরূপে রক্ষিত হয়- এটাই প্রত্যাশা। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করতে না পারলে সে সমাজ যত শিক্ষিত এবং সমৃদ্ধশালী হোক না কেন সেটা মানুষের সমাজ হতে পারে না। মানুষ সমাজের জন্য সর্বপ্রথম যা প্রয়োজন তা হলো ন্যায়বিচার। প্লেটো তার বিখ্যাত গ্রন্থ "রিপাবলিক"-এ বহু বিষয়ে আলোচনা করেছেন সত্য কিন্তু তার মূল বিষয় ছিল ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা। আদর্শ রাষ্ট্রের জন্য প্রাথমিক প্রয়োজন ন্যায়বিচার। বার্কার বলেছেন, "প্লেটোর রিপাবলিকের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করা।" ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দক্ষ ও নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ আবশ্যক। তাই সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে এর গুরুত্বই অধিক।

বিচারবিভাগীয় কাজ নয়, এমন কিছু কাজও বিচার বিভাগ করে থাকে। যেমন, কোনো বিশেষ ক্ষেত্রে কর্মচারী নিয়োগ, লাইসেন্স অনুমোদন, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারের ব্যবস্থা, নাবালকের অভিভাবক নিয়োগ, কোনো প্রতিষ্ঠানের অছি নিয়োগ ইত্যাদি কার্য সম্পাদন। নানান মামলায় নিষেধাজ্ঞা জারি বিচারবিভাগের নিয়মিত একটি কাজ। বিচার বিভাগের মৌলিক (original) অথবা নিম্ন আদালত থেকে উচ্চ আদালতে পুনর্বিচারের আপিলের শুনানি ও বিচার করার অধিকার থাকে।

মামলার বিচারকালে বিচারবিভাগ রাষ্ট্রীয় আইনের প্রয়োগও ব্যাখ্যা করে। অনেক ক্ষেত্রে বিচারবিভাগ নতুন আইনের সৃষ্টি করে, অর্থাৎ বিভিন্ন মামলায় প্রদত্ত রায় আইনের সমান মর্যাদা লাভ করে। ক্ষমতার পৃথকীকরণ নীতি অনুযায়ী বিচার বিভাগ ছাড়া সরকারের অপর দুটি বিভাগ, অর্থাৎ আইনসভা ও প্রশাসন বিভাগ থেকে স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতা বজায় রাখে। বিচার বিভাগের পবিত্র দায়িত্ব হলো যে, কোনো অভিযুক্ত ব্যক্তির যথোচিত বিচার করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা এবং দেশে আইনের নিরপেক্ষতা বজায় রাখা। বিচার বিভাগের কার্যসম্পাদনে কোনোরকম হস্তক্ষেপ করা অনৈতিক ও অনুচিত। বিচারকদের নিয়োগ, পদোন্নতি ও কর্মচ্যুতির বিষয়ে ক্ষমতাসীন দলের হস্তক্ষেপ বিচারকদের নিরপেক্ষতা ও স্বাধীনতাকে ক্ষুণ্ণ করে।

বিচ্ছিন্নতা (Isolation)

বিচ্ছিন্নতা হলো কোনো রাষ্ট্র, সংঘ, প্রতিষ্ঠান বা দল থেকে বেরিয়ে আসা বা বিচ্ছিন্ন হওয়া। আর যারা এভাবে বিচ্ছিন্ন হতে চান তাঁদেরকে বিচ্ছিন্নতাবাদী বলা হয়। যেমন, ১৭৭৬ সালে আমেরিকার ১৪ টি ব্রিটিশ কলোন গ্রেট ব্রিটেন থেকে বিচ্ছন্ন হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গঠন করে। অথবা যেমন, ১৯৭১ সালে পাকিস্তান থেকে পূর্ব-পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশে পরিণত হয়।

বিচ্ছিন্নতাবোধ (Alienation)

অন্য কোনো দেশর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে বা অন্যান্য দেশের স্বার্থসংশ্লিষ্ট দ্বন্দ্ব বা যুদ্ধবিগ্রহে না জড়িয়ে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র থাকার নীতিই হলো বিচ্ছন্নতাবোধ। বিশেষ এক মানসিক অবস্থা যা নিয়ে রুশো, হেগেল, মার্কস, ফ্রয়েড প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকগণ বিভিন্ন দৃষ্টিতে আলোচনা করেছেন।

মার্কসের দৃষ্টিতে উল্লিখিত মানসিক অবস্থার উদ্ভব হয় যখন কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী, প্রতিষ্ঠান বা সমাজ ১. তার কাজের ফসল কিংবা মূল কাজ, ২. তার বসবাসের পরিবেশ, ৩. অন্যান্য মানুষ অথবা ৪. নিজের মানবিক সম্ভবনার কাছে থেকে বিচ্ছিন্ন বোধ করে। বিচ্ছিন্নতা ব্যাপারটা কার্যত আত্ম-বিচ্ছিন্নতা, অর্থাৎ মানুষ নিজেই তার নিজস্ব ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে নিজের সম্ভাবনা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকে। বিচ্ছিন্নতাবোধের তাই মূলকথা হলো আত্ম-বিচ্ছিন্নতা।

বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টি ফ্রান্সে রুশো এবং জার্মানিতে গ্যয়টে, শিলার প্রমুখ ইউরোপীয় আলোকিত শতাব্দীর মনীষীদের চিন্তায় উদ্ভূত হয়। বস্তুগতভাবে প্রত্যয়টি ব্যক্তিগত মালিকানা সম্পর্কের অমানবিক চরিত্রের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। বিষয়টি জার্মান দর্শনের প্রতিফলিত হয়। নানা দিক থেকে প্রত্যয়টি তাৎপর্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়। ফিকটে, হেগেল ফয়েরবাক ও মার্কস নিজ নিজ দৃষ্টিতে প্রত্যযটিকে বিচার করেন।

প্রত্যয়টি মার্কসীয় মতবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। মার্কসীয় এব অমার্কসীয় উভয় মহলেই এটি সাম্প্রতিককালে ব্যাপক আলোচনার একটি বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। মার্কস তাঁর প্রথম দিককার রচনাদিতে, বিশেষ 'ইকনমিক অ্যান্ড ফিলসফিক্যাল ম্যানাস্ক্রিপ্টস' (১৮৪৪) বইতে প্রত্যয়টির নিজ দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বিশদ বিশ্লেষণ করেন। তাঁর মতে সামাজিক বিকাশের বিশেষ এক পর্ডায়ে বিচ্ছিন্নতাবোধ স্ববিরোধের পরিচয় দেয়। ব্যক্তিগত সম্পত্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্নতাবোধের উদয়কে তিনি একত্র পরস্পরবিরোধী শ্রমবিভাগ হিসেবে প্রত্যক্ষ করেন। তাতে বিচ্ছিন্নতাবোধ মানুষর সমস্ত কাজকর্মেই প্রতিফলিত হয়; প্রতিটি কাজ সমাজের পরস্পরিচ্ছিন্ন এক-একটি জনগোষ্ঠীর একচেটিয়া অধিকারে আবদ্ধ। শ্রমের বিচ্ছিন্নতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে মার্কস প্রসঙ্গত পুঁজিবাদী সম্পর্ক ও সর্বহারার অবস্থা, শ্রমিক ও তার উৎপন্ন সামগ্রী, সমাজ সম্পর্কের বস্তুগত চরিত্র, সমাজে অমানবিক শক্তির আধিপত্য, শ্রমিকের কায়িক ও নৈতিক অবনতি ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পুঁজিবাদী সম্পত্তির অবসানের মাধ্যমে তিনি বিচ্ছিন্নতাবোধের সমাধানের পথ প্রদর্শন করেন। শ্রমের বিচ্ছিন্নতার ওপরই যে যাবতীয় বিচ্ছিন্নতাবোধ নির্ভর করে এই উপলব্ধি থেকেই প্রকৃত সমাজজীবনের স্ববিরোধ ও ভ্রান্ত ধারণা সমূহ বোঝা যায়। এর ভিত্তিতেই প্রয়োগের ওপর তত্ত্বের নির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠা লাভ করে, দর্শন পুনর্গঠিত হয়। ১৮৫০ ও ১৮৬০-এর দশকে মার্কস তাঁর পূর্বতন বিচ্ছিন্নতাবোধ প্রত্যয়টির জায়গায় একটি সমন্বিত চিন্তাধারা উপস্থাপিত করেন; তার মধ্যে অবশ্য পুঁজিবাদ উৎপাদন ব্যবস্থায় বিচ্ছিন্নতাবোধ একটি বৈশিষ্ট্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়েছে।

বিতর্ক (Debate)

মূলত সংসদ সদস্যদের মধ্যে আলোচনা ও তর্ক বিতর্ক। রাষ্ট্রপতির ভাষণ, জনগুরুত্বপূর্ণ কোনো বিষয়, উত্থাপিত কোনো প্রস্তাব বা বিলের ওপর সদস্যদের মধ্যে বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। বিতর্কে সদস্যরা নিজ নিজ বক্তব্যের পক্ষে যুক্তি ও অন্যের বক্তব্যের জবাবে পাল্টা যুক্তি তুলে ধরেন। বিতর্ক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে পার্লামেন্টকে স্বচ্ছতা দান করে। পার্লামেন্টে বির্তকের সুনির্দিষ্ট নিয়ম রয়েছে। বির্তকের জন্য নির্ধারিত সময়ও রয়েছে। বির্তকের পরিণতিতে বিষয়টি ভোটে দেয়া না-দেয়া অথবা প্রস্তাব গ্রহণ বর্জন হয়। সকল সদস্যকে পার্লামেন্টের সংশ্লিষ্ট বিধি মেনে বিতর্কে অংশ নিতে হয়। সকল সদস্য বক্তব্য রাখার অনুমতিও স্পিকারের কাছ থেকে গ্রহণ করেন। একই সময় একাধিক সদস্য বক্তব্য রাখতে চাইলে স্পিকার যিনি আগে আগ্রহ

দেখিয়েছেন তাঁকে সুযোগ দেন। বিতর্কের সময় স্পিকারকে সম্বোধন করে (মাননীয় স্পিকার বা Honorable Speaker) বক্তব্য রাখতে হয়। অন্য কোনো সদস্যকে সরাসরি লক্ষ্য করে বক্তব্য রাখা শোভন হয়। তবে অন্য কোনো সদস্যের প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হলে তাঁর প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হয় (যেমন সরকারি বা বিরোধী দলের 'সম্মানিত সদস্য')। বিতর্ক পার্লামেন্টের প্রাণশক্তির পরিচায়ক। বিতর্ক যত বেশি সুস্থ, সুন্দর ও যুক্তিভিত্তিক হয় পার্লামেন্টের মর্যাদা ততই বৃদ্ধি পায়।

বিদেশি বিনিময় হার (Rate of Foreign Exchange)

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অন্যতম সমস্যা হলো এক দেশের অর্থকে অন্য দেশের অর্থে রূপান্তর করা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার অর্থ প্রচলিত আছে। বিভিন্ন দেশের পরস্পরের মধ্যে দেনা-পাওনা মেটাতে হলে এক দেশের অর্থকে অন্য দেশের অর্থে রূপান্তরিত করতে হয়। যে হারে এক দেশের অর্থ অন্য দেশের অর্থের সাথে বিনিময় হয় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার (Rate of Exchange) বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ যদি বাংলাদেশের ১ টাকার পরিবর্তে ইংল্যান্ডের ১ শিলিং ও ৪ পেন্স পাওয়া যায় তাহলে বাংলাদেশ ও ইংল্যান্ডের মধ্যে বিনিময় হার হল ১ টাকা = ১ শিলিং ৪ পেন্স। সুতরাং কোনো দেশের অর্থের বিনিময়ে অপর দেশের অর্থ যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাকে বৈদেশিক বিনিময় হার বলা হয়। এটাকে অর্থের বহির্মূল্যও বলা হয়।

বিদ্রোহ (Insurgency)

আন্তর্জাতিক আইনে ব্যবহৃত শব্দ, যার অর্থ হলো আইনসম্মতভাবে গঠিত সরকারের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। সঠিক অর্থে এটিকে বিপ্লব কিংবা গৃহযুদ্ধ অথবা যুধ্যমান অবস্থা বলা যায় না। এই ধরনের বিদ্রোহের কোনো আইনসঙ্গত সত্তা নেই, যেটা যুদ্ধের ক্ষেত্রে থাকে। বিদ্রোহে ক্ষমতাসীন সরকার যেমন জবর-দখলকারী বা বিদেশাগত নয়, তেমনি বিদ্রোহীরা দেশেরেই অধিবাসী। নিষ্পত্তির জন্য আলাপ-আলোচনা চালাবার সময় বিদ্রোহী সরকার আন্তর্জাতিক সত্তা লাভ করে।

বিধিবদ্ধ আইন (Statutes)

শাসনতান্ত্রিক সংকট নিরসনের জন্য পার্লামেন্ট যে সকল বিধিবিধান আইন প্রণয়ন করে এবং সেগুলো পরবর্তীতে সংবিধানের একটি অঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে সেই সকল বিধিবিধান ও আইনগুলোকে বিধিবদ্ধ আইন (Statutes) বলা হয়। তবে সকল আইন সংবিধানের উৎস নয়; শুধু ওই সকল আইনই সংবিধানের উৎস যেগুলো সরকারের বিভিন্ন বিভাগের সম্পর্কিত। ব্রিটিশ সংবিধানের উৎস হিসেবে বিধিবদ্ধ আইন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। পার্লামেন্ট বিধিবদ্ধ আইনের দ্বারা রাজার ক্ষমতা হ্রাস ও নিজের ক্ষমতা বৃদ্ধি, জনগণের ভোটাধিকার সম্প্রসারণ, সরকারি কর্মচারীদের ক্ষমতা ও দায়িত্ব নির্ধারণ প্রভৃতি সম্পাদন করেছে। এ সকল বিধিবদ্ধ আইনের মধ্যে

১৬৭৯ সালের Habeas Corpus Act, ১৭০১ সালের Act of Settlement, ১৮৩২, ১৮৬৭ ও ১৮৮৪ সালের Reorms Acts, ১৯১১ সালের The Representation of the People Act.

বিপ্লব (Revolution)

বিপ্লব শব্দের অর্থ হলো আমূল পরিবর্তন। মার্কসবাদ অনুযায়ী বিপ্লব হলো এক শ্রেণিকে উৎখাত করে অপর শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্র ক্ষমতা দখল। মার্কসবাদী বিপ্লবের বস্তুগত ও সাংগঠনিক প্রস্তুতি দীর্ঘদিনের হলেও ক্ষমতাদখলের ব্যাপারটি ঘটে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে এবং আকস্মিকভাবে। দৃষ্টান্ত দিয়ে যদি অর্থ বোঝানো যায় তা হলে প্রশ্ন ওঠে যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব সঠিক অর্থে একটি বিপ্লব ছিল কি না, সেটা অভিধানগত অর্থ দিয়ে নির্ণয় করা কঠিন। শব্দটির সরল অর্থ হলো সম্পূর্ণ ঘুরে যাওয়া, যেমন একটা চাকা ঘোরে। সপ্তদশ শতকে ইংল্যান্ডে যে মহিমান্বিত (গ্লোরিয়াস) বিপ্লব (১৬৮৮) ঘটে সেই সময়ে উদ্ভূত বিপ্লব শব্দটির অর্থ ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তিত হয়েছে। ওই সময়ে মানুষের দুর্গতি ও শোচনীয় জীবনযাত্রার পরিবর্তন অনেকটা ভাগ্যচক্র ঘুরে যাওয়ার মতো ছিল। এখন অর্থ দাঁড়িয়েছে যে যুগপৎ সামাজিক ও রাজনৈতিক পর্যায়ে পূর্বতন সমাজব্যবস্থার দৃঢ়মূল আশা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নানাবধি অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের আমূল রূপান্তর। সময়বিশেষে হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নেওয়া হয়। অবশ্য যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লবে ব্যতিক্রম ছিল। কারণ অনেকাংশেই সেটা ছিল শান্তিপূর্ণ এবং সেটা যুক্তিবহ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে একটি সংবিধানে পরিণতি লাভ করে। মানব-ইতিহসে ওই সংবিধানটি রাষ্ট্রবিজ্ঞানের একটি অভূতপূর্ব ফলিত অবদান হিসেবে পরিচিত। কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর দৃষ্টিতে মানুষের কাছে বিপ্লব অর্থাৎ রাজনৈতিক রূপান্তররের মূল অবদান হলো মুক্তির এবং এমন একটি সংবিধানের সন্ধান যার সাহয্যে মুক্তি সুনিশ্চিত হবে। ইংল্যান্ডের মহিমান্বিত (গ্লোরিয়াস) বিপ্লব এব যুক্তরাষ্ট্রের বিপ্লব সঠিক অর্থে বিপ্লবের আদর্শপূর্তি উজ্জ্বল দৃষ্টান্তে সার্থক ও উত্তীর্ণ বলে তাঁরা মনে করেন। এর আংশিক কারণ হলো উভয় ক্ষেত্রেই হিংসাত্মক পথকে এবং পরবর্তীকালের বিপ্লবসমূহের মতো সামাজিক উলটপালটকে পরিহার করা হয়, এবং আংশিক অন্য কারণ হলো যে যখন রূপান্তর ঘটে রাজনৈতিক স্তরে, তখন সামাজিক সচলতা ও দৃঢ়মূল স্থায়িত্ব বজায় থাকে।

কিন্তু বেশিরভাগ সমাজবিজ্ঞানী উল্লিখিত দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেন না। অহিংস ও সহিংস বিপ্লবের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান আছে। এই মনোভঙ্গীর আদি প্রবক্তা ছিলেন মার্কস; সেই মনোভঙ্গীতে ফরাসি বিপ্লবকে একটি নতুন পথের নজির হিসেবে দেখা হয়, যার মধ্যে দিয়ে অন্তর্নিহিত অনেক অনাবিষ্কৃত শক্তি মুক্তি পায়। তার ফলে মার্কসীয় বিপ্লণবের তত্ত্ব উদ্ভূত হয়।

মার্কসীয় বিপ্লবতত্ত্বের দুটি ভাষ্য আছে। প্রথমটিকে বলা হয় যে উৎপাদিকা শক্তি বিকশিত হয়ে এমন এক স্থানে পৌছয় যেখানে তাকে উৎপাদিকা সম্পর্ক শৃঙ্খলিত করতে শুরু করে। সেই বিপুল শক্তিকে কিছুকাল শৃঙ্খলাবদ্ধ রাখা যায়, পরে শৃঙ্খল

ভেঙে চূর্ণ হয়ে যায় সমগ্র সমাজ-সংগঠনে। দ্বিতীয়টিকে বলা হয় যে বিপ্লব হলো উৎপাদনী সম্পর্কে শ্রেণিসংগ্রামের পরিণতি। সেটি সমাজের প্রতিটি স্তরে সঞ্চারিত হয়, সংগ্রাম প্রকাশ্যে দেখা দেয়, শাসকের স্থান কেড়ে নেয় শাসিতেরা। দ্বিতীয় ভাষ্যটি ফরাসি বিপ্লবের চিন্তা থেকে গৃহীত এবং হেগেল-এর প্রভু-ভৃত্য সম্পর্কের বিশ্লেষণে অনুপ্রাণিত। দুটি ভাষ্যই অবশ্য অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। কারণ দুটির পেছনেই বিদ্যমান একই তত্ত্ব আছে যেটা হলো সমাজব্যবস্থার ভিত্তিমূলে সদাই এক স্ববিরোধী দ্বন্দ্বের ক্রিয়াশীলতা।

মার্কসীয় দর্শনের একটা গোড়ার কথা যে বিপ্লবে একটি শ্রেণি অপর একটি শ্রেণি দ্বারা পরাভূত হয়। সেজন্য সামন্ততন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র পর্যন্ত পৌছাতে প্রয়োজন দুটি বিপ্লবের। প্রথমটি বুর্জোয়াজি অভিজাতবর্গ ও সামন্ততন্ত্রীদের উচ্ছেদ করে, যেটাকে বলা হয় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং পরবর্তী যে বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণি বুর্জোয়া শ্রেণিকে উচ্ছেদ করে সেটা হলো সর্বহারা বিপ্লব। সেই দৃষ্টিতে রাশিয়ায় ১৯১৭ সালে সহসা যে অভ্যুত্থান ঘটেছিল সেটা ছিল সর্বহারা বিপ্লব। তার আগে ওই বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে বুর্জোয়া বিপ্লব সাঙ্গ হয়। লেনিনবাদী বিপ্লবের তত্ত্বে বিপ্লবের এজেন্ট অর্থাৎ বাহকের ভূমিকায় গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে ; তাতে কেবল বস্তুগত (objective) অবস্থাই নয়, মনোগত (subjective) প্রস্তুতিও থাকা চাই। আরও সোজা করে বলরে বলতে হয় যে বিপ্লবের পেছনে দেশের কিছু সুসংগঠিত গোষ্ঠী বা দলের সক্রিয় বিদ্রোহমূলক ভূমিকা থাকা চাই। লেনিনের দৃষ্টিতে সংহত ও পুঞ্জীভূত ক্ষমতার সাহায্যে বিপ্লব সিদ্ধ হতে পারে; মার্কসের চিন্তায় সামাজিক প্রক্রিয়ায় বিপ্লবের পরিস্থিতি অগ্রসর হয়, অম্য যে শক্তি ফরাসি বিপ্লবকে পরিণত রূপ দিয়েছিল, তার উৎপত্তি ঘটে সামাজিক স্তরে।

মানবেন্দ্রনাথ রায় বিপ্লবের এক ভিন্ন সংজ্ঞা নিরূপণ করেছেন। তাঁর মতে অর্থনৈতিক অসাম্য দূর করাই বিপ্লবের একমাত্র লক্ষ্য নয়। মানুষের সহজাত সম্ভাবনার বিকাশে বাধাস্বরূপ যেকোনো সামাজিক প্রতিবন্ধকতা নির্মূল করাই বিপ্লবের আদর্শ। প্রচলিত সমাজব্যবস্থা সময়বিশেষে মানুষের দৈহিক অস্তিত্ব ও মানসিক বিকাশ সৃষ্টিশীল সত্তার প্রতিকূলতা করে। প্রগতি ও মুক্তির আকাঙ্ক্ষা মানুষকে বিপ্লবের সাহায্যে ওই সব অন্তরায়গুলোকে অপসারণের প্রেরণা জোগায়। নতুন দর্শনের আলোয় মানুষ নতুনতর সমাজব্যবস্থা গড়ে তোলে। মুক্তি ও সৃজনীশক্তির আকাঙ্ক্ষাসম্পন্ন মানুষের মনোভাবকে মানবেন্দ্রনাথ 'রোমান্টিক' আখ্যা দিয়েছেন। বিপ্লব সেই অর্থে রোমান্টিক এবং যুক্তিসম্মত। যুক্তিনির্ভর মন থেকেই মুক্তির আবেগ উদ্ভূত হয়। তাঁর রোমান্টিক বিপ্লবের প্রত্যয় সম্পূর্ণ যুক্তিবহ ও নীতিসম্মত।

বিপ্লব, ইংল্যান্ডের (English Revolution)

ইংল্যান্ডের বিপ্লব ১৬৪২ সাল থেকে ১৬৮৯ সাল পর্যন্ত সময়ে সংঘটিত হয়। এর প্রথম অংশ (১৬৪২-৪৮) কে ক্রমওয়েল বিপ্লব এবং দ্বিতীয় অংশকে (১৬৮৮-৮৯) ইংলিশ

বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লব শিল্প-বিকাশের পথে বাধাস্বরূপ সামন্তবাদের মূলোৎপাটন করাই উদ্দেশ্য। ১৬০৩ সালের দিকে বুর্জোয়াশ্রেণি মোটামুটি শক্তিশালী হয়ে উঠলে সামন্তবাদের সমর্থক ক্যাথলিক ও পুঁজিবাদের সমর্থক প্রোটেস্ট্যান্টদের মধ্যে বিরোধ শুরু হয়। ১৬৪২ সালে রাজা প্রথম চার্লস বুর্জোয়া প্রতিনিধিদের আধিপত্যপূর্ণ পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং পার্লামেন্টের নেতা অলিভাব ক্রমওয়েল, কিম ব্যাম্পডেন প্রমুখকে গ্রেফতার করার উদ্যোগ নেন। ব্যবসায়ী ও ধনীদের প্রতিরোধের মুখে রাজা চার্লস পালিয়ে গিয়ে এক নয়া সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলেন। ১৬৪৪ ও ১৬৪৭ সালে ক্রমওয়েলের হাতে রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। ক্রমওয়েলের হাতে রাজকীয় বাহিনী পরাজিত হয়। ১৬৪৭ সালে পুনরায় যুদ্ধ শুরু হয়। রাজা স্কটল্যান্ডে পালিয়ে গিয়ে প্রতিরোধ গড়ে তোলেন। ১৬৪৯ রাজা প্রথম চার্লস চূড়ান্তভাবে পরাজিত ও বন্দি হন। বিচারে তাঁর শিরশ্ছেদ করা হয়। এর ফলে ক্যাথলিকরা বিতাড়িত হয় এবং ধণিকশ্রেণীর কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়। ক্রমওয়েওয়েলের মৃত্যুর পর ১৬৬০ সালে বিপ্লবীদের দক্ষিণপন্থি অংশ রাজতন্ত্রের সঙ্গে আপোস করে এবং প্রথম চার্লসের পুত্র দ্বিতীয় চার্লসকে ক্ষমতায় বসায়। দ্বিতীয় চার্লসের পুত্র জেমস্ ক্যাথলিকতন্ত্র পুনঃপ্রতিষ্ঠায় উদ্যত হলে আবার যুদ্ধ শুরু হয়। ১৬৮৯ সালে জেমস্ পালিয়ে যান এবং উইলিয়াম অব অরেঞ্জ ও মেরি রাজা-রানি পদে অধিষ্ঠিত হন। নতুন রাজা-রানি পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব ও এর দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্রকে স্বীকার করে নেন। ১৬৮৯ সালের এই বিপ্লব 'ইংলিশ বিপ্লব' নামে খ্যাত। ইংল্যান্ডের বুর্জোয়াশ্রেণি রাজতন্ত্রের সঙ্গে এক ধরনের আপোসের পথ গ্রহণ করে, যার ফলে রাজতন্ত্র ও হাউস অব লর্ডস থেকে যায়; কিন্তু প্রকৃত রাষ্ট্রক্ষমতা বুর্জোয়াশ্রেণির হাতেই চলে আসে।

বিপ্লব, জাতীয় (National or Nationalist Revolution)

জাতীয় বিপ্লব হলো কোনো দেশের জনগণের জাতীয় স্বাধীনতালাভের উদ্দেশে বিদেশি দখলদারীত্বের বিরুদ্ধে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশ স্থাপনের জন্যই যে বিপ্লব সংঘটিত হয়। বিদেশিরা উৎখাত হলে জাতীয় পুঁজির বিকাশ সহজ হবে, এই আশায় সাম্রাজ্যবাদ-উপনিবেশবাদ কর্তৃক পদানত জাতীয় বুর্জোয়ারাও জাতীয় বিপ্লবে অংশগ্রহণ করে। অনেকে ক্ষেত্রে উপনিবেশ বা আধা-উপনিবেশের বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবী ও এলিট প্রমুখের নেতৃত্বে পরিচালিত সংগ্রামের মধ্য দিয়েও জাতীয় স্বাধীনতা অর্জিত হয়। যেমন ভারত ও পাকিস্তানের স্বাধীনতা। আবার অনেকে ক্ষেত্রে তা অর্জিত হয় সর্বহারা ও শ্রেণির নেতৃত্বে। যেমন : চীন ও উত্তর কোরিয়ার স্বাধীনতা।

বিপ্লব, জাতীয় গণতান্ত্রিক (National Democratic Revolution)

উপনিবেশবাদীরা তাদের শাসন-শোষণের স্বার্থে উপনিবেশসমূহে একদিকে জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে নস্যাৎ করে অন্যদিকে জাতীয় পুঁজির বিকাশের সম্ভবনাকে দাবিয়ে রাখার উদ্দেশে স্থানীয়ভাবে সামন্তবাদকে কায়েম রাখে এবং সঙ্গে আঁতাত

করে। ফলে উপনিবেশের মুক্তিকামীদের সামনে থাকে দুটি দিক : এক উপনিবেশবাদের কবল থেকে জাতীয় মুক্তি বা জাতীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব অর্জনের দিক এবং দুই সামন্তবাদ (যা গণতন্ত্রের অন্তরায়) কে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্র কায়েমের দিক। এই দুই কাজ একই সঙ্গে সম্পন্ন করতে হয় বলে এরূপ বিপ্লবকে বলে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব। বনেদি উপনিবেশে জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপ হয় জনগণতান্ত্রিক। অর্থাৎ এ-বিপ্লব বুর্জোয়াদের নেতৃত্বে সম্পাদিত হলে তাকে বলে বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব এবং সর্বহারা শ্রেণির নেতৃত্বে সম্পন্ন হলে এর নাম হয় জনগণতান্ত্রিক বিপ্লব (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

বিপ্লব, মার্কিন (American Revolution)

আমেরিকা ১৯৭৬ সালে এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্রিটিশ শাসনের কবলমুক্ত হয়, সেই সংগ্রামেই মার্কিন বিপ্লব নামে খ্যাত। ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতা ঘোষণা করা হলেও, এই যুদ্ধ শুরু হয় ১৭৭৫ সালে এবং ১৭৮৩ সাল পর্যন্ত তা অব্যাহত থাকে। পূর্ব থেকেই ব্যবসা-বাণিজ্য ও স্বাধীনতার সরকার প্রশ্নে ব্রিটিশদের সঙ্গে আমেরিকানদের বিবাদ চলে আসছিল। ১৭৭৫ সালে ব্রিটিশ সরকার স্ট্যাম্প ধার্য করলে অবস্থা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। ১৭৭৩ সালে মার্কিনীরা বোস্টনে তিনটি ব্রিটিশ-জাহাজের পণ্য সমুদ্রে ফেলে দেয়। ১৭৭৪ সালে ফিলাডেলফিয়া নগরে এক কংগ্রেস সমবেত হয়ে বিভিন্ন রাষ্ট্রের প্রতিনিধিগণ মার্কিন জনগণের মৌলিক অধিকার-সংবলিত এক ঘোষণাপত্র তৈরি করেন। ১৭৭৫ সালে মার্কিন জনগণ একদল ব্রিটিশ সৈন্যের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদের পরাজিত করে। এই আক্রমণের মধ্য দিয়েই বিরোধ যুদ্ধরূপ পরিগ্রহ করে। জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিনবাহিনীর প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই সময় আমেরিকায় অবস্থিত ফরাসি সৈন্যেরা স্বাধীনতাকামী মার্কিনীদের পক্ষ অবলম্বন করে। ১৭৭৬ সালে ১৩ টি রাজ্য স্বাধীনতা ঘোষণা করে। ১৭৮১ সালে প্রধান ব্রিটিশ সেনাপতি লর্ড কর্নওয়ালিশ পরাজিত হয়ে জর্জ ওয়াশিংটনের নিকট আত্মসমর্পণ করলে স্থলভাগের যুদ্ধ প্রধানত শেষ হয়ে যায়। ১৭৮৩ সালে এক শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হলেও ১৮১৪ সাল পর্যন্ত জলযুদ্ধ বলবৎ ছিল। ১৭৮৭ সালে স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র রচিত হয়। এই সময় জর্জ ওয়াশিংটন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। ১৮০০ সালের পর অন্যান্য রাজ্যও মূল ১৩ টি রাষ্ট্রের সঙ্গে যোগদান করে। ১৯০৩ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজ্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪৫ টিতে। পরবর্তীতে আরও কিছুসংখ্যক রাজ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যোগদান করে। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যের সংখ্যা ৫০।

বিপ্লব, রুশ (Russian Revolution)

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর তারিখে কেরনস্কি সরকারকে উচ্ছেদ করে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি তথা রাশিয়ার সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলই বিশ্বের কাছে

রুশবিপ্লব হিসেবে পরিচিত। খাদ্যভাব মোকাবিলায় কেরনস্কি সরকারের ব্যর্থতা ও প্রবঞ্চনার পরিপ্রেক্ষিতে এ বছরের প্রথম থেকেই তীব্র শ্রমিক বিক্ষোভ শুরু হয়। এ সময় রসদহীদ, অস্ত্র গোলাবারুদের পর্যাপ্ত সরবরাহ বঞ্চিত বিক্ষুব্ধ সৈন্যেরাও বিদ্রোহী শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দেয়। ৩ জুলাই পেট্রোগ্রাডে প্রায় পাঁচ লক্ষ শ্রমিক ও সৈন্যদের এক শোভাযাত্রার ওপর কেরন্‌স্কির অনুগত সৈন্যরা গোলাবর্ষণ করলে কয়েক হাজার শ্রমিক ও সৈন্য নিহত হয়। তখন সেনাপতি কোনিলভের নেতৃত্বে এক বিমানবাহিনী বলশেভিক প্রভাবিত পেট্রোগ্রাড অভিমুখে অভিযান পরিচালনা করলে স্ট্যালিনের নেতৃত্বাধীন লালফৌজ তাদের পরাজিত ও পালিয়ে যেতে বাধ্য করে। ইতিমধ্যেই লেনিন সুইজারল্যান্ড থেকে রাশিয়ায় চলে এসেছিলেন এবং স্ট্যালিন সাইবেরিয়া থেকে পেট্রোগ্রাডে এসে অবস্থান নিয়েছিলেন। ৬ নভেম্বর রাতে লেনিন তাঁর গোপন আশ্রয়স্থান থেকে বেরিয়ে এসে স্মোলনি প্রাসারে উপস্থিত হন এবং বিপ্লবের নেতৃত্বে গ্রহণ করেন। রাতের মধ্যেই তাঁরা নগরীর কেন্দ্রস্থল দখল করেন এবং 'শীত প্রাসাদ' ঘিরে ফেলেন। দুর্গের সৈন্যেরা বলশেভিকদের পক্ষে যোগদান করে এবং যুদ্ধজাহাজ অরোরাও বিপ্লবীদের পক্ষে যোগ দিয়ে শীতপ্রাসাদের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে। ফলে শীতপ্রাসাদ-এর পতন ঘটে এবং কেরেন্‌স্কি মন্ত্রিসভার অধিকাংশ সদস্য গ্রেফতার হন। ওই দিনই স্মোলনি প্রাসাদের বিপ্লবকেন্দ্র থেকে কেরন্‌স্কি সরকারের উচ্ছেদ ও নিখিল রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের ইশতেহার জারি করা হয়। এই ইশতেহারের ফলে জার পরিবার, জমিদার ও কৃষকদের বিপুল পরিমাণ জমি (৪০ কোটি একর) বাজেয়াপ্ত করে ভূমিহীনদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। এ ছাড়া যাবতীয় খনিজসম্পদ, নদী ইত্যাদিকেও জনগণের সম্পত্তিরূপে ঘোষণা করা হয়। মস্কোয় প্রচন্ড যুদ্ধের পর বলশেভিকরা বিজয় লাভ করে। বিভিন্ন পুঁজিবাদী দেশের সহায়তায় বিপ্লব বিরোধীরা ১৯২১ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চালিয়ে যায়। কিন্তু গণ প্রতিরোধের মুখে শেষ পর্যন্ত তাদের সম্পূর্ণ পরাজয় ঘটে।

বিপ্লব, সবুজ (Green Revolution)

বর্তমানে অনুন্নত বিশ্বে সবুজ বিপ্লব কথাটাকে জনপ্রিয় করে তোলার প্রয়াস চালিয়ে যাওয়া হচ্ছে। "অধিক শস্য ফলাও" এই বিপ্লবের হচ্ছে সবুজ বিপ্লব প্রবক্তাদের স্লোগান। তাঁরা মনে করেন যে, নিবিড় কৃষির মধ্যেই অনুন্নত বিশ্বের জনগণের দারিদ্র্য ও ক্ষুধার কবল থেকে মুক্তির চাবিকাঠি নিহিত। বস্তুত অনুন্নত বিশ্বে সবুজ বিপ্লবের প্রবক্তারা প্রকারান্তরে শিল্পায়নেরই বিরোধীতা করেন। এই মতবাদের বিরোধীরা মনে করেন যে, শিল্পবিপ্লব কৃষিবিপ্লবের পূর্বশর্ত। সুতরাং শিল্পবিপ্লবের ওপর গুরুত্ব না দিয়ে ' সবুজ বিপ্লব' 'অধিক খাদ্য ফলাও' 'কৃষি বিপ্লব' ইত্যাদি স্লোগানে মুখর হওয়া আসলে অনুন্নত দেশসমূহের অনুন্নত রাখা তথা উন্নত দেশসমূহের বাজার হিসেবে বহাল রাখারই কৌশলমাত্র।

বিপ্লব, সাংস্কৃতিক (Cultural Revolution)

সাংস্কৃতিক বিপ্লব হলো এমন এক বিপ্লব যা বিপ্লবী পরিবর্তনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে এক শ্রেণির পতন ও অন্য শ্রেণির অভ্যুদয় ঘটালেও পুরানো সমাজব্যবস্থার চিন্তা-চেতনা, ঝোঁক, আশা-আকাঙ্খা, আচার-আচরণ ও মূল্যবোধ রাতারাতি পরিবর্তন করা যায় না। এগুলো বহাল থাকলে আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা পরিবর্তন দুষ্কর হয়ে পড়ে। তা ছাড়া রাষ্ট্রক্ষমতার পরিবর্তনও যেকোনো ধরনের প্রতিবিপ্লব ঘটে যাওয়ার আশঙ্কা থেকে যায়। ফলে, আর্থ-সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা পরিবর্তনের পাশাপাশি পূর্বতন, পশ্চাৎমুখী ও ক্ষতিকর চিন্তা-চেতনা, আশা-আকাঙ্খা, আচার-আচরণ, মূল্যবোধ ইত্যাদিরও আমূল পরিবর্তনের ধারা অব্যাহত রাখতে হয়। এটাকেই বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সম্পন্ন হলে পুঁজিবাদী ধ্যান-ধারণা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠা করাই হল সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাজ। অনরূপভাবে, ইসলামি বিপ্লব হলেও দেখা যায় যে, অনৈসলামিক সংস্কৃতিক বিরুদ্ধে অব্যাহত সংগ্রাম অপরিহার্য হয়ে পড়ে। মোটকথা, সকল বিপ্লবের ক্ষেত্রেই উক্ত বিপ্লববিরোধী সংস্কৃতিকে পরিবর্তনে বিপ্লবী সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠার লড়াই অব্যাহত রাখতে হয়।

বিবর্তন ও বিপ্লব (Evolution and Revolution)

বিবর্তন ও বিপ্লব সমাজ বিকাশের অবিচ্ছেদ্য দুটি দিক। সাধারণত ক্রমিক ও শৃংখলাপূর্ণ পরিবর্তনের মাধ্যমে কোনো বস্তু যখন এক অবস্থা থেকে অন্য অবস্থায় পরিবর্তিত বা রূপান্তরিত হওয়াকে বিবর্তন বলে। অর্থাৎ বিবর্তন হল কোনো একটি অবস্থান সেই গুণগত পরিবর্তনের যা ধীরে ধীরে সঞ্চালিত হতে থাকে। আর বিপ্লব হল দ্রুত গুণগত বা আকস্মিক পরিবর্তন। সমাজে একটি গুণগত পরিবর্তন সংঘটিত হলে পরিবর্তিত পরিস্থিতিও দ্বান্দ্বিক নিয়মে ক্রমপরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটাতে থাকে। এভাবে, গুণগত পরিবর্তনের বস্তুগত ভিত্তি রচিত হয়। কিন্তু চূড়ান্ত পরিবর্তনের জন্য বিপ্লবের প্রয়োজন পড়ে। মার্কিসবাদীরা মনে করেন যে, বিবর্তনমূলক প্রক্রিয়া না থাকলে সমাজের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের বিকাশ ঘটত না। আবার বিপ্লবের পথ পরিহার করে স্বতঃস্ফূর্ততার ওপর সব ছেড়ে দিয়ে বসে থাকলেও সমাজের ঈপ্সিত ও যথার্থ পরিবর্তন সাধিত হত না।

বিবর্তনতত্ত্ব (Theory of Evolution)

সর্বপ্রথম প্রাণিজগৎ সম্পর্কে চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২) বিবর্তন তত্ত্ব হাজির করেন। এই তত্ত্ব বহু শতাব্দীর নির্বাচনী প্রক্রিয়ার ফলাফল ছিল। প্রাণিবিদ্যা, ভূবিদ্যা ও নৃতত্ত্বের আবিস্কারসমূহ এবং ডারউইনের বিশ্বব্যাপী অনুসন্ধানমূলক সফরেরই ফল এই তত্ত্ব ছিল। এই তত্ত্বানুযায়ী মিউটেশন, বংশগতি ও নির্বাচন (গৃহ পরিবেশে কৃত্রিম এবং প্রাকৃতিক পরিবেশে স্বাভাবিক) প্রাণিজগতের বিবর্তনের কারণ হল। বাহ্যিক পরিবেশের পটভূমিকায় যারা সবচেয়ে যোগ্য, তারাই টিকে থাকে এবং বংশবিস্তার করে। প্রাকৃতিক

নির্বাচন অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ক্রমাগত বাইরের পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর উপযোগী করে গড়ে তোলে এবং প্রাণীর গঠন ও কার্যক্ষমতা বিকাশসাধন করে। এই তত্ত্বানুযায়ী মানুষসহ প্রতিটি প্রাণীই দীর্ঘদিনের সম্পর্কই বিবর্তনের মধ্য দিয়েই আজকের স্ব স্ব আকারে এসে পৌঁছেছে। ভাবিষ্যতেও এই বিবর্তনের প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকবে। পরিবর্তিত পরিবেশের সঙ্গে যেসব প্রাণী খাপ খাওয়াতে পারবে না, তারা নিঃশেষ হয়ে যাবে, যেমন অতীতে হয়েছে ডায়নোসরসহ অনেকে, আজও হচ্ছে সোনালে ঈগলসহ অনেকে প্রাণী। ডারউইনের এই তত্ত্বের মধ্যে বুর্জোয়া দৃষ্টিভঙ্গী থাকলেও এই তত্ত্ব প্রাণীজগতের উদ্ভব সম্পর্কিত ভাববাদী ও আদি ভৌতিক ধারণার মর্মমূলে আঘাত হানে এবং এ ব্যাপারে, তথা মানুষ ও মানবসমাজের বিকাশের ব্যাপারে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী বিশ্লেষণের ভিত্তি স্থাপন করে। এঙ্গেলস এই তত্ত্বের আরও বিকশিত করে প্রমাণ করেন যে, আদি এপ-সদৃশ (বানর নয়) অবস্থা থেকে মানুষের বর্তমান অবস্থায় আসার মূলে রয়েছে তার ক্রমবিকাশমান শ্রম ও ভাষা। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এপ (Ape) একটি শারীরিক গঠনের নাম, কোনো নির্দিষ্ট প্রাণীর নাম নয়। কিন্তু অনেকে এপকে বানর বলে ভুল করেন এবং বিবর্তনবাদের ভুল ব্যাখ্যা করে বলেন যে, মানুষ বানর থেকে এসেছে এবং এটাই নাকি বিবর্তনবাদীদের তত্ত্ব। আসলে বানর (Monkey) মানব-পবিবার (Anthropoid Family)-এর সদস্যই নয়। উল্লেখ্য যে, বিবর্তনতত্ত্ব ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে অনেকাংশে সাংঘর্ষিক। যেমন : বাইবেল অনুযায়ী মানুষের 'অ্যাডাম' একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষ হিসেবে বর্তমান আকৃতিতে উত্তরণ। কিন্তু বিবর্তনতত্ত্ব অনুযায়ী মানুষের উৎপত্তি পানিতে, অ্যামিবা হিসাবে; তারপর জলচর অবস্থা, উভচর অবস্থা ইত্যাদির বহুস্তর পার হয়ে মানুষের বর্তমান আকৃতিতে উত্তরণ। বিবর্তনতত্ত্বানুযায়ী বিবর্তনপ্রক্রিয়া শাশ্বত, যতদিন সৃষ্টি থাকবে, ততদিন বিবর্তনের প্রক্রিয়া চলবেই। আর্থ-সামাজিক, শারীরিক, মানবিক, মেধাগত বিবর্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত ও পরস্পর ক্রিয়াশীল এই বিবর্ততত্ত্বের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক।

বিবিস (BBC)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধে যোগাযোগের ক্ষেত্র বেতারের সফল ব্যবহারের পরিপ্রক্ষিতে ১৯২২ সালে লন্ডনে ব্যক্তিগত মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত হয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কোম্পানি। তখন এর অনুষ্ঠান সম্প্রচার করতে হতো কেবল সন্ধ্যার দিকে একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত। ১৯২৩ সালে এটি পরিণত হয় একটি পাবলিক কোম্পানিতে এবং এর নাম দেয়া হয় ব্রিটিশ ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন সংক্ষেপে, বিবিস (BBC)। বেতার অনুষ্ঠান সম্প্রচারে একে যে অধিকার দেয়া হয়, সেটা একচেটিয়াভাবে বহাল থাকে ১৯৭২ সাল পর্যন্ত। তার পরের বছর থেকে ব্রিটেনে চালু হয় বাণিজ্যিক বেতার। ১৯৩৮ সালের ৩ জানুয়ারি থেকে প্রথম দুটি বিদেশি-আরবি ও পর্তুগীজ ভাষায় বিবিসি বহির্দেশীয় অনুষ্ঠান প্রচার শুরু করে। এই উপমহাদেশের ভাষাগুলোর মধ্যে হিন্দি ভাষায় প্রথম অনুষ্ঠান প্রচারিত হয় ১৯৪০ সালের ১১ মে থেকে। এরপর পর্যায়ক্রমে শুরু হয় তামিল, বাংলা গুজরাটি, মারাঠি, উর্দু এবং নেপালি ভাষায় অনুষ্ঠান সম্প্রচারের কাজ।

বিবিসি ওয়ার্ল্ড সার্ভিস থেকে বর্তমানে ইংরেজিসহ মোট ৩৬টি ভাষায় অনুষ্ঠান প্রচার করা হয়। বিবিসির সদর দপ্তর লন্ডনের WC2B 4PH-এর 'বুশ হাউস'- (স্ট্রান্ড) অবস্থিত।

বিবিসির বাংলা বিভাগ চালু হয় ১৯৪১ সালের ১১ অক্টোবর বিশ্ববিখ্যাত ঔপন্যাসিক জর্জ অরওয়েলের (George Orwell) লিখিত একটি বার্তালিপি সম্প্রচারের মাধ্যমে। আরওয়েলের জন্ম ব্রিটিশ শাসনাধীন বঙ্গদেশে, ১৯০৩ সালে। বিবিসির স্নায়ুকেন্দ্র হচ্ছে এর বার্তাকক্ষ। এখান থেকে ৩৬টি ভাষার জন্য দিনরাত সংবাদ বুরেটিন তৈরি হয়। এই কক্ষের সবচেয়ে বড় বিবেচনা হচ্ছে প্রাপ্ত খবরের অনুপুঙ্খ অনুসন্ধান, দ্রুততা এবং নির্ভুলতা। এ কারণেই বিশ্বজুড়ে বিবিসি সম্প্রচারিত খবরের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি।

বিভ্রান্ত পার্লামেন্ট (Addled Parliament)

ব্রিটেনের রাজা প্রথম জেমস (১৫৬৬-১৬১৬) কর্তৃক আহূত দ্বিতীয় পার্লামেন্ট। প্রথম জেমস যখন সিংহাসনে বসেন তখন তার বয়স মাত্র ১৩ মাস। তার অপ্রাপ্তবয়স্কতার সুযোগে বিভিন্ন প্রভাবশালী ধর্মীয়গোষ্ঠী এবং অভিজাতদের মধ্যে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পরে প্রাপ্তবয়স্ক ও সক্ষম রাজা প্রথম জেমসের শাসনামলে রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের মতবিরোধ শুরু হয়। রাজা পার্লামেন্টের সম্মতি না নিয়ে কর বৃদ্ধি করেন। পার্লামেন্ট এতে ক্ষুব্ধ হয়। ১৬১৪ সালে রাজা পার্লামেন্ট আহ্বান করেন। উদ্দেশ্য ছিলো রাজার রাজস্ব বৃদ্ধির আইন পার্লামেন্ট দিয়ে পাস করানো। ৫ এপ্রিল থেকে ৭ জুন পর্যন্ত এ পার্লামেন্ট অধিবেশন করে। কিন্তু পার্লামেন্ট রাজার ইচ্ছা অনুযায়ী রাজস্ব বৃদ্ধি করে আইন পাস করা থেকে বিরত থাকে। এবং শর্ত আরোপ করে যে, আগে রাজা পার্লামেন্টের অনুমোদন ছাড়া যে কর বৃদ্ধি করেছেন তা বাতিল করতে হবে। রাজা তা করা থেকে বিরত থাকেন। ফলে পার্লামেন্ট কোনো আইন না করেই বিলুপ্ত হয়। কোনো আইন পাশ না করায় এ পার্লামেন্টকে Addled বা বিভ্রান্ত পার্লামেন্ট বলা হয়।

বিমস্টেক (BIMSTEC)

বিমসটেক এর পূর্ণ রূপ হলো বে অব বেঙ্গল ইকনমিক কো-অপারেশন অর্গানাইজেশন বা বঙ্গোপসাগর অর্থনৈতিক সহযোগিতা সংগঠন। এই আঞ্চলিক সংগঠনটি ১৯৯৭ সালের ৭ জুন মাসে ব্যাংককে গঠিত হয়। এর সদস্য দেশ বাংলাদেশ, ভারত, শ্রীলংকা ও থাইল্যান্ড ছিল। পরে এই সংস্থার নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় বাংলাদেশ, ইন্ডিয়া শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ইকনমিক কো-অপরেশন, সংক্ষেপে BISTEC. এরপর মায়ানমার এই সংস্থায় যোগ দিলে এর নামকরণ করা হয় BIMSTEC. জোটভূক্ত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে বাণিজ্য, পর্যটন, বিনিয়োগ, শিল্প, প্রযুক্তি, মানব সম্পদ উন্নয়ন, কৃষি, জ্বালানী ও অবকাঠামো নির্মাণে পারস্পরিক সংযোগ রক্ষা করবে। তাছাড়া সার্বভৌমত্ব, সমতা, ভৌগোলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা, অপরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা, শান্তিপূর্ণ সহ-অবস্থান ও পারস্পরিক কল্যাণ নীতির ভিত্তিতে জোটভূক্ত দেশ একে

অপরের সহযোগিতা ও সংযোগ রক্ষা করবে। এই জোট দক্ষিণ এশিয়া এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলোর সংস্থা আসিয়ানের মধ্যকার একটি যোগসূত্র হিসেবে কাজ করছে।

বিরাট বিভেদ (Great Schism)

ইতিহাসের ঘটনাবলী আপন প্রবাহ বজায় রেখে চলে। সমাজ ও প্রতিষ্ঠা অনেক সময় এই ঘটনাবলীর সাথে সামঞ্জস্য রক্ষ করে। কখনও সমাজের সার্বিক বিকাশ ও কালের আবর্তে ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করে। এইভাবে চলছে সমাজের গতিধারা। এই ধারাকে কোনো যুগ দিয়ে চিহ্নিত করা যায় না তবু ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সমস্যা মোকাবিলার জন্য নানাযুগে নানা পদ্ধতি প্রয়োগ করে। তেমনি মধ্যযুগ নামে একটা যুগের পরিচয় আমরা পাই। চিন্তাধারা অথবা বৌদ্ধিক বিকাশের দিক থেকে মধ্যযুগ অনুর্বর। দৃষ্টিভঙ্গি ও প্রতিষ্ঠানের পরিবর্তনই মধ্যযুগের পরিসমাপ্তি সূচনা করে। মধ্যযুগে পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনা ও পুরাকথার রাজত্ব, রাজনীতিক তত্ত্ব যে ছিল না তা নয়, তবে বাস্তব পরিস্থিতির সাথে কোনো প্রকার সামঞ্জস্য ছিলনা। তবে পঞ্চদশ শতকের শুরুতে মানুষের মন অনেকটা যুক্তিবাদী হয়ে ওঠে। প্রতিটি বিষয়ে সমালোচনার দৃষ্টি দিয়ে বিচার করতে আগ্রহী হয়। ফলে যাবতীয় বৌদ্ধিক চিন্তাধারা নতুন রাস্তা ধরে অগ্রসর হতে থাকে। পণ্ডিতেরা এই দৃষ্টিভঙ্গীকে মধ্যযুগের সমাপ্তি ও আধুনিক যুগের সূচনা বলে অভিহিত করেছেন। মধ্যযুগের শেষ অবস্থাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিরাট বিভেদ (Great Sehism) নামক ঘটনার মধ্যে। গির্জার সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে সারা ইউরোপে প্রচণ্ড আন্দোলন গড়ে ওঠে। এজন্য গির্জা দায়ী ছিল, কেননা মধ্যযুগের শেষের দিকে গির্জার মোহান্তরা ভোগবিলাসে ও আড়ম্বরপূর্ণ জীবন যাপনে অভ্যস্ত হয়ে ওঠে। এসব কাজে পোপের সমর্থন ছিল। তাছাড়া গির্জা অর্থের বিনিময়ে মুক্তিপত্র বিক্রি করত। যত পাপ কাজ করা হোক না কেন অর্থের বিনিময়ে মুক্তিপত্র কিনে নিলে তার সম পাপ থেকে পরকালে মুক্তি পাবে। ফলে তারা অর্থের দিক দিয়েও শক্তির সঞ্চয় করে। এই সব কারণে গির্জার ওপর জনগণের আস্থা ক্রমশ কমতে শুরু করে দিয়েছিল। ঠিক এই সময় দেখা দিয়েছিল বিরাট বিভেদ, বিরাট বিভেদ গির্জাকে চরম সঙ্কটের মুখে ঠেলে দেয়। চতুর্দশ শতাব্দীর শেসের দিকে রাজারা অনেকখানি ক্ষমতা সঞ্চয় করে ফেলেছিলেন এবং তাঁরা গির্জার কর্তৃত্ব তারা মানতে রাজী ছিলেন না। কিন্তু গির্জা ও কর্তৃত্ব ছাড়তে রাজী না হওয়ায় তিক্ততা দেখা দেয়। এদিকে ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে একাধিক গির্জার মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হয়। এবং এর পেছনে ছিল পোপদের আধিপত্য। রাজারাও এর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। চতুর্দশ শতাব্দীর শেষে বিভেদ চরম আকার ধারণ করে এবং পোপ সহ সমস্ত গির্জার মর্যাদা জনসমক্ষে হ্রাস পায়।

বিরাষ্ট্রীয়করণ (Denationalisation)

বিরাষ্ট্রীয়করণ বলতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যবসা বাণিজ্য ও শিল্প কারখানাসমূহ ব্যক্তিগত মালিকানায় ফেরত দেওয়াকে বোঝায়। বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা

গেছে যে রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প-কারখানা ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের সংশ্লিষ্ট আমলা, কর্মকর্তা ও ট্রেড ইউনিয়ন নেতারা সার্বিক দিয়ে লাভবান হয়। দেশ ও জাতি এ থেকে তেমন উপকৃত হয় না। তাই বর্তমানে বিশ্বজুড়ে বিরাষ্ট্রীয়করণের ব্যাপক প্রক্রিয়া চলছে।

বিরোধ (Antagonism)

বিরোধ বা বৈপরীত্য হলো পরস্পর বিরোধী দুই শক্তির মৌলিক দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ। দার্শনিক ও সামাজিক অর্থে সমাজ অথবা কোনো বস্তুর অভ্যন্তরীণ মূলগত দ্বন্দ্বের ফল হিসাবেই এই বিরোধের সৃষ্টি। সুতরাং দ্বন্দ্ব (Contradiction) ও বিরোধ এক নয়। প্রথমটি কারণ, দ্বিতীয়টি তার ফল।

বিল (Bill)

আইনে পরিণত করার জন্য উত্থাপিত প্রস্তাব। আইনের খসড়া। বিল পার্লামেন্ট কর্তৃক পাস হওয়ার পর আইনে পরিণত হয়। প্রত্যেক বিলে একটি শিরোনাম থাকে। বিল কিছু দফা ও উপ-দফায় বিভক্ত হয়।
বিষয়, উত্থাপনের উপায় ও পাসের নিয়ম অনুযায়ী বিল শ্রেণীভুক্ত হয়। কোনো বিষয়ে বিল প্রণীত হয়েছে তা বিবেচনায় রেখে পাবলিক বিল, প্রাইভেট বিল, বা মিশ্র বিল। সাধারণত দু'শ্রেণীভুক্ত বিল হয়। যেসব বিল পাস হতে পার্লামেন্টের সাধারণ সংখ্যাগরিষ্ঠতাই যথেষ্ট সেসব বিলকে সাধারণ বিল এবং যেসব বিল পাস হতে দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতি দরকার ও প্রয়োজনে গণভোট অনুষ্ঠান করতে হয় সেসব বিলকে বিশেষ বিল বলে। বিল পাস হওয়ার নিয়ম সকল দেশে সম্পূর্ণত এক রকম নয়। সাধারণ কিছু নিয়ম সব সংসদেই পালিত হয়। সংসদে উত্থাপন, বিলের ওপর আলোচনা, প্রয়োজনে কমিটিতে পাঠানো, পার্লামেন্ট কর্তৃক অনুমোদিত হওয়ার পর রাষ্ট্রপ্রধানের স্বীকৃতি ইত্যাদি নিয়ম প্রায় সকল অনুসৃত হয়।

বিল অব রাইটস (Bill of Rights)

বিল অব রাইটস্, গণঅধিকার সম্বলিত এমন একটি বিল, যা ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রের অংশ। গ্রেট ব্রিটেনে গৌরবময় বিপ্লবের পর স্টুয়ার্ট রাজা দ্বিতীয় জেমস্ ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার পর পার্লামেন্ট দ্বিতীয় জেমসের কন্যা মেরী ও জামাতা উইলিয়ামকে সিংহাসনে বসান। এই সময় পার্লামেন্ট তার অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দেশে ১৬৮৯ সালেই 'ঐতিহাসিক অধিকারের বিল' প্রণয়ন করে। ইংল্যান্ডে এই আইনের মাধ্যমে আইন প্রণয়নের ব্যাপারে পার্লামেন্টের প্রাধান্য এবং নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র পতিষ্ঠিত হয়। অধিকারের বিল বিধিবদ্ধ হওয়ার পর পার্লামেন্টের অনুমোদন ব্যতীত কর ধার্য, রাজস্ব সংগ্রহ ও নির্বাচনে হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ করা হয়। ব্রিটেনের পার্লামেন্টের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে অধিকারের বিল একটি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা। সাধারণত মানুষের মৌলিক অধিকারের তালিকা বা ঘোষণাপত্র। সরকারি যে কোনো শাখার নিয়ন্ত্রণমুক্ত থেকে

নিরাপদে যে সকল মৌলিক অধিকার ভোগ করা হয়, তার তালিকা বা ঘোষণাপত্র। পরবর্তিতে অনেক দেশে শাসনতন্ত্রে জনগণের মৌলিক অধিকার অন্তর্ভুক্ত করে। উদাহরণস্বরূপ ফ্রান্সে জনগণ ও নাগরিকদের অধিকারসংক্রান্ত ঘোষণা (Declearation of the Rights of Man and of the Citizen, 1789)-এর কথা উল্লেখযোগ্য। কানাডায় ১৯৮২ সালে অধিকার ও স্বাধীনতাসংক্রান্ত চার্টার (Charter of Rights and Freedoms) সে দেশের শাসনতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত হয়। জনগণের বক্তব্যের স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, সভা সমিতির স্বাধীনতা, নিজের সম্পদের ওপর অধিকার, নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়ার অধিকার, দ্বৈত শাস্তি রদ, শিক্ষার অধিকার, কর্মসংস্থানের অধিকার ইত্যাদি সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যেই এরূপ বিল প্রণয়ন, পাশ ও সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত করা হয়ে থাকে।

বিল পুনর্বিবেচনা

অর্থবিল ব্যতীত রাষ্ট্রপতির নিকট উপস্থাপিত অন্যান্য বিল সম্পূর্ণ পুনর্বিবেচনার জন্য কিংবা বিলটির কোনো বিশেষ বিধান পুনর্বিবেচনার জন্য অথবা নির্দিষ্ট সংশোধনী বিবেচনার অনুরোধসহ একটি বার্তাসহ সংসদে ফেরত পাঠাতে পারেন। তিনি পেশকৃত বিলটি পুনর্বিবেচনার জন্য সংসদে ফেরত পাঠালে ওই বিলটি সম্পর্কে পুনরায় সংসদীয় প্রক্রিয়ার সূত্রপাত হয়। সংসদ অধিবেশনরত থাকলে স্পিকার রাষ্ট্রপতির বার্তাটি সংসদ সদস্যদের উপস্থিতিতে পাঠ করে শোনান। যদি সংসদ অধিবেশন না থাকা বার্তাটি বুলেটিনে প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। এবং বুলেটিনের কপি সদস্যদের নিকট প্রেরণ করা হয়। অতঃপর সংসদে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরতপ্রাপ্ত বিলটি সংসদের টেবিলে উপস্থাপন করা হয়। সরকারি বিলের ক্ষেত্রে কোনো মন্ত্রী কিংবা বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে কোনো সদস্য সংসদের উপস্থাপনের জন্য এরূপ প্রস্তাবের নোটিশ দিতে পারেন যে, ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতির বার্তা কিংবা রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত সংশোধনী বিবেচনার জন্য গ্রহণ করা হয়। এবং দিনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়। অনুরূপ প্রস্তাব সংসদে ভোটে গৃহীত হবার পর বিলটির দফাওয়ারী বিবেচনাকালে রাষ্ট্রপতির সুপারিশকৃত সংশোধনীসহ অন্যান্য সংশোধনী সংসদের বিবেচনায় আনতে পারে। বস্তুত রাষ্ট্রপতির প্রস্তাবিত সংশোধনীটি কোনো মন্ত্রী বা সদস্যের প্রস্তাবক্রমেই সংশোধনী হিসেবে বিবেচিত হতে পারে। এ পর্যায়ে বিলটি জনমত যাচাইয়ের জন্য প্রচার কিংবা কোনো কমিটিতে প্রেরণের সুযোগ নেই। কারণ রাষ্ট্রপতির বার্তাটি বিবেচনার জন্য গ্রহণের প্রস্তাবের ওপর আলোচনা এবং প্রস্তাব গৃহীত হবার পর বিলটির দফায় কোনো সংশোধনী থাকলে ওই সংশোধনী বিবেচনা করা যেতে পারে। সংশোধনীগুলো গ্রহণ বা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে আলোচনার সমাপ্তি ঘটে। বিলের দফায় কোনো সংশোধনী গৃহীত না হলে নোটিশদাতা সদস্য বা মন্ত্রী প্রস্তাব করতে পারেন। সংসদে মৌলিকভাবে গৃহীত বিলটি পুনরায় গ্রহণ করা হোক। পঞ্চদশ সংশোধনীর পূর্বে মোট সংসদ সদস্যের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে বিলটি গৃহীত হলে সংশোধনীসহ বা সংশোধনীব্যতীত সংসদ পুনরায় বিলটি গ্রহণ করলে রাষ্ট্রপতির সম্মতির জন্য

উপস্থাপিত হয়। তিনি সাত দিনের মধ্যে সম্মতি দিবেন কিংবা তিনি সম্মতিদানে অসমর্থ হলে উক্ত সাতদিন মেয়াদ শেষে তিনি বিলটিতে সম্মতি দিয়েছেন বলে গণ্য হবে। সংসদ সচিবালয় বিলটিকে সংসদের আইন হিসেবে বাংলাদেশ গেজেটে প্রকাশের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে।

বিশেষাধিকার (Prerogative)

এক ধরনের বিশেষ অধিকার। মূলত রাষ্ট্রপতি, রাজা বা রানি তথা রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষ অধিকার। রাষ্ট্রপ্রধান এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন পার্লামেন্টের পূর্বানুমতি ছাড়াই। জরুরি অবস্থা মোকাবিলা, বিশেষ ক্ষমা প্রদর্শন, যুদ্ধ ঘোষণা ইত্যাদি ক্ষেত্রে বিশেষাধিকার প্রয়োগ হয়। বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতিকে ক্ষমা প্রদর্শনের অধিকার দেয়া হয়েছে। রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষাধিকারকে (Prerogative) দু'ভাগে ভাগ করা যায়। যথা: ১. ব্যক্তিগত ও ২. রাজনৈতিক। রাষ্ট্রপ্রধানকে ব্যক্তিগত বিশেষাধিকার দেয়া হয় কারণ প্রায় সবদেশেই এটা বিশ্বাস করা হয় যে, তিনি কোনো ভুল করতে পারেন না এবং যতদিন রাষ্ট্রপ্রধান ক্ষমতায় থাকেন ততদিন বিশেষ দায়মুক্তি (Immunity) ভোট করেন। রাজনৈতিক বিশেষাধিকার দু'রকম। ক. অভ্যন্তরীণ ও খ. বৈদেশিক। অভ্যন্তরীণ বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে : মন্ত্রীদের নিয়োগ দান, পার্লামেন্ট আহ্বান ও স্থগিত করা, অধ্যাদেশ জারি ইত্যাদি। বৈদেশিক বিষয়গুলো হলো : যুদ্ধ ঘোষণা, সম্পর্ক স্থাপন করা, সন্ধি করা, বিদেশি দূতদের গ্রহণ ও বিদেশে নিজ দেশের দূত প্রেরণ।

রাষ্ট্রপ্রধানের বিশেষাধিকার নিয়ে বিভিন্ন বিতর্ক আছে। অনেকে মনে করেন এ অধিকার স্বৈরতান্ত্রিকতা, সংবিধানহীনতার কারণ হতে পারে। আবার কেউ কেউ মনে করেন, যেহেতু রাষ্ট্রপ্রধান অনেক ক্ষেত্রে সংবিধান রক্ষণ, সমর্থন এবং সংবিধানের নিরাপত্তা বিধানের শপথ নেন তাই তাঁকে বিশেষাধিকার দেয়া জনগণের জন্যই কল্যাণকর। মার্কিন প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম লিংকন মনে করতেন, বিশেষাধিকার might not only exceed constitutional bounds but act against the constitution. ১৮৯০ সালে মার্কিন সুপ্রিম কোর্ট এক মোকদ্দমার রায়ে বলে প্রেসিডেন্ট আইনসভার অনুমোদন ছাড়াও কাজ করতে পারেন কারণ তার শপথ হলো : Preserve protect and defend the Constitution of the United States. ব্রিটিশ রানির বিশেষাধিকার সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের উক্তি উল্লেখযোগ্য : The prerogatives of the Crown have become the privileges of the people.

বিশ্ব খাদ্য পুরস্কার (World Food Prize)

'ওয়ার্ল্ড ফুড প্রাইজ ফাউন্ডেশন' কর্তৃক বিশ্বখাদ্য পুরস্কার প্রদান করা হয়। গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর উন্নয়নে যারা অবদান রাখেন তাদেরকে এ পুরস্কার দেয়া হয়। এ পুরস্কারের মান ২ লক্ষ ডলার। এটি প্রায় নোবেল পুরস্কারের সমতুল্য। এ পুরস্কার

প্রাপ্তদের মধ্যে রয়েছে বিশ্বব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারা, নোবেল বিজয়ী ও সবুজ বিপ্লবের জনক ড. নরম্যান বোরলক (১৯৭০) এবং বাংলাদেশের গ্রামীণ ব্যাংকের প্রতিষ্ঠাতা ড. মুহাম্মদ ইউনূস (১৯৯৪)।

বিশ্ব মানবাধিকার দিবস (World Human Rights Day)

১০ ডিসেম্বর বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। ১৯৪৮ সালের ১ ডিসেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সর্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণা গৃহীত হয়। এতে ৪৮টি রাষ্ট্র পক্ষে ভোট প্রদান করে এবং ৮টি রাষ্ট্র ভোটদানে বিরত থাকে। বিশ্বের সকল জনগোষ্ঠী এবং সকল জাতির জন্য অর্জিত সাফল্যের এক অসাধারণ মর্যাদা হিসেবে সাধারণ পরিষদ এটি ঘোষণা করে। এতে উল্লিখিত ধারাসমূহ মানুষের সকল প্রকার অধিকার ও স্বাধীনতার কার্যকর স্বীকৃতি এবং এগুলো প্রতিপালনে অগ্রগতি অর্জন ও নিশ্চয়তা বিধানের জন্য সাধারণ পরিষদ সকল রাষ্ট্র ও জনগণের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানায়। অধিকাংশ রাষ্ট্র এ চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সাড়া প্রদান করে এবং মানবাধিকার বাস্তব রূপ লাভ করতে সমর্থ হয়। সেই থেকে প্রতিবছর ১০ ডিসেম্বর সর্বজনীন 'মানবাধিকার দিবস' হিসেবে পালিত হচ্ছে।

বিশ্ব শান্তি আন্দোলন (World Peace Movement)

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে বার্লিনকে কেন্দ্র করে বিশ্বে নতুন উত্তেজনা সৃষ্টি হয়। এই সময় তৃতীয় মহাযুদ্ধের আশঙ্কা দেখা দিলে মূলত সোভিয়েত ইউনিয়নের উদ্যোগে বিশ্ব শান্তি আন্দোলন শুরু হয়। বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কা দূরীভূত করে বিশ্বব্যাপী শান্তি অব্যাহত রাখা ও সকল দেশের শান্তিপূর্ণ অগ্রগতি সুনিশ্চত করার উদ্দেশে এই আন্দোলন গড়ে ওঠে। এতে বিশ্বের শান্তিকামী নর-নারী ব্যাপক সমর্থন নিয়ে বিশ্ব জনমত সৃষ্টি হয়। ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে প্যারিসে বিশ্বের শান্তিকামী জনগণের প্রতিনিধিদের এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশ্ব শান্তি পরিষদ নামে একটি কেন্দ্রীয় পরিষদ এবং পরিষদের দুই অধিবেশনের অন্তর্বর্তী সময়ে কাজ চালানোর জন্য একটি ক্ষুদ্র কমিটি বা ব্যুরো গঠন করা হয়। ফ্রান্সের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিক জুলি ও কুরি বিশ্ব শান্তি পরিষদ ও তার ব্যুরোর সম্পাদক নির্বাচিত হন। পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এর শাখা রয়েছে এবং এসব শাখা স্ব স্ব দেশের বুদ্ধিজীবী, শিল্পী, বৈজ্ঞানিক, শ্রমিক, কৃষক প্রমুখকে শান্তির সপক্ষে আনার জন্য কাজ করছে। বিশ্ব শান্তি আন্দোলনের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা হলো : "আমরা জাতিসংঘ কর্তৃক গৃহীত সনদের সঙ্গে সামঞ্জস্যহীন সকল প্রকার সামরিক জোটের বিরোধী। আমরা মনে করি বিপুল সামরিক ব্যয়ের বোঝাই জনসাধারণের দারিদ্র্যের কারণ। সুতরাং, যুদ্ধ বাবদ ব্যয় হ্রাস করা, আণবিক ও অন্যান্য গণহত্যার উদ্দেশে অস্ত্র নিষিদ্ধ করা এবং বৃহৎশক্তিসমূহের সামরিক বাহিনীসমূহ সীমাবদ্ধ করা প্রয়োজন।"

বিশ্ব সরকার (World Government)

বিশ্বসরকার ধারণাটি অনেক দিন ধরে প্রচলিত। বিশ্ব সরকারের ধারণা অনুযায়ী, বিশ্ব সরকারই হবে ফেডারেল সরকারের অনুরূপ কেন্দ্রীয় সরকার এবং বর্তমান রাষ্ট্রসমূহ রাজ্য সরকারের অনুরূপ আঞ্চলিক সরকার থাকবে। ফলে, উভয়ের ক্ষমতা ও এখতিয়ারও সুনির্দিষ্ট করে দেওয়া থাকবে। তবে উভয় সরকার একটা কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত হবে। অ্যালবার্ট আইনস্টাইন, কিংসলি মার্কিন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক ও চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, বিশ্বব্যাপী উত্তেজনা, দ্বন্দ্ব ও সংঘর্ষের নিরসন করে স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার একমাত্র উপায় হল বিশ্বের সকল রাষ্ট্রের সমন্বয়ে একটি একক সুস্থ রাষ্ট্র গঠন করা, যা জাতিসংঘের মতো সমিতিমাত্র হবে না; বরং সকল সদস্যরাষ্ট্রের ওপর যার চূড়ান্ত ও কার্যকর কর্তৃত্ব থাকবে।

বিশ্বব্যাংক (World Bank)

বিশ্বব্যাংক বা আন্তর্জাতিক পুনর্গঠন ও উন্নয়ন ব্যাংক। ইংরেজিতে International Bank for Reconstruction and Development (IRDB) যা World Bank নামেও পরিচিত। ১৯৪৬ সালে ২৫ জুন এই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। এর প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটনে অবস্থিত। বিশ্বব্যাংকে উদ্দেশ্য হলো যুদ্ধ বিধ্বস্ত ইউরোপীয় অর্থনীতির পুনর্গঠনে অর্থ প্রদান করা এবং বিশ্বের অনুন্নত এলাকাসমূহের উন্নয়নে সাহায্য করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নে বিশ্বব্যাংকের ভূমিকা হলো উৎপাদনমুখী উদ্দেশে পুঁজি বিনিয়োগ করা, আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের দীর্ঘমেয়াদী ও ভারসাম্যপূর্ণ সুষম উন্নয়ন এবং জরুরি প্রয়োজনীয় প্রকল্পগুলোকে অগ্রাধিকারমূলকভাবে ঋণ প্রদান করা। ব্যাংকের সমস্ত ক্ষমতা প্রতিটি সদস্য রাষ্ট্রের একজন করে গভর্ণর সমন্বয়ে গঠিত বোর্ড অব গভর্ণরদের হাতে ন্যস্ত।

বিশ্বায়ন (Globalisation)

বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্যামিতিক অগ্রগতি; সড়ক, বিমান ও ম্যারিটাইম যোগাযোগ-ব্যবস্থার উন্নয়নের ফলে পণ্যের বিপুলতর লেনদেন এবং সর্বোপরি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট, ফ্যাক্স, ইন্টারনেট, ই-মেইল ইত্যাদির বিস্ময়কর উন্নয়নের ফলে সারা বিশ্বের মানুষ এখন দেশ, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে পরস্পরের নিবিড় থেকে নিবিড়তর সান্নিধ্যে এসে যাচ্ছে। মানুষের জীবনধারণের উপকরণ, সংস্কৃতি ও চিন্তাচেতনার মধ্যেও স্থাপিত হচ্ছে গভীরতর সাযুজ্য। রাজনীতি-অর্থনীতির ক্ষেত্রেও শুরু হয়েছে একাত্মীকরণের প্রক্রিয়া। দেশ, ধর্ম, বর্ণ-নির্বিশেষে পৃথিবীর মানুষের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, প্রযুক্তিক ও সাংস্কৃতিক নৈকট্য ও একাত্মতার এই ধারাকেই বলা হয় বিশ্বায়ন বা গ্লোবালাইজেশন।

বিসমার্ক, অটো ভন (Auto Van Bismark)

অটো ভন বিসমার্ক, (১৮১৫-৯৮) ব্র্যাডেনবুর্গে জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি কয়েকটি দেশে কূটনৈতিক দায়িত্ব পালন করেন। ১৮৪৮ সালে তাঁকে প্রতিক্রিয়াশীল

ব্যক্তি হিসাবে চিহ্নিত করা হলে তিনি কিছুদিনের জন্য দেশত্যাগ করেন। তিনি ফ্রাঙ্কফুর্টস্থ অ্যাসেম্বলি অব জার্মান ফেডারেশন-এ প্রতিনিধি নির্বাচিত হন এবং পরবর্তিতে সেন্ট পিটার্সবার্গ ও প্যারিসে রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁকে ১৮৬২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে প্রুশিয়ার মুখ্যমন্ত্রী নিয়োগ এবং সেনাবাহিনী সংস্কার করার দায়িত্ব প্রদান করা হয়। তিনি পার্লামেন্ট অনুমোদিত কোনো বাজেট ছাড়া এ কাজ সম্পন্ন করতে সক্ষম হন।। তিনি একজন বাস্তববাদী বলে জাঙ্কার শ্রেণির নেতৃত্বে সমগ্র জার্মান জাতির পুনঃ একত্রীকরণে বিশ্বাস করতেন। তিনি রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী স্থাপন করে ডেনমার্ক (১৮৬৪) ও অস্ট্রিয়া (১৮৬৬)-সহ অন্যান্য দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত হন। ১৮৭০ সালে তিনি ফ্রাঙ্কো প্রুশিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ১৮৭১ সালের জানুয়ারি মাসে ভার্সাইতে জার্মান সাম্রাজ্যের ঘোষণার প্রাক্কালে রাজকীয় চ্যান্সেলরের পদ গ্রহণ করেন এবং পরবর্তী ১৯ বছর যাবত ইউরোপের রাজনীতির প্রধান নায়ক হিসেবে পরিগণিত হন। এ সময় জার্মান সম্ভাব্য বৃহত্তম রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এমতাবস্থায় তিনি অন্যান্য ইউরোপের রাষ্ট্রের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে উদ্যোগী হন। তিনি রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তুলে ফ্রান্সকে মিত্রহীন করে তোলেন যাতে ফ্রান্স প্রতিশোধমূলক যুদ্ধে নামতে সাহস না পায়। ১৮৭৮-৭৯ সাল ব্যতীত তাঁর সঙ্গে রাশিয়ারও সুসম্পর্ক বজায় ছিল। তিনি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে ততটা সুবিধা করতে পারেননি। ১৮৭১ সালে তিনি লিবারেলদের পক্ষ নেন; কিন্তু ১৮৭৯ সালেই তিনি তাঁদের সাথে সম্পর্ক ছেদ করেন। কারণ তিনি মনে করেন যে, এখন অবাধ বাণিজ্যের পরিবর্তে জার্মানির জন্য আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থাই অধিক প্রয়োজন। তিনি আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আন্দোলন ও সংগঠনকে সন্দেহের চোখে দেখতেন বিধায় রোমান ক্যাথলিক (১৮৭০) ও সমাজতন্ত্রীদের (১৮৮০) সঙ্গে বিরোধে জড়িয়ে পড়েন। তিনি ধীরে ধীরে প্যান জার্মান মনোভাবাপন্ন তরুণ সমাজের সহানুভূতি হারিয়েও ফেলেন এবং ১৮৯০ সালের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্র বিষয়ে মতভেদের পরিপ্রেক্ষিক্ষতে ৩২ বছর যাবৎ রাজ্যশাসনের পর রাজা দ্বিতীয় উইলিয়ার তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেন।

বুকার পুরস্কার (Booker Prize)

ইংরেজি সাহিত্যে বিশেষ আবদানের ক্ষেত্রে সবচেয়ে মূল্যবান পুরস্কার হচ্ছে বুকার পুরস্কার। গণ-মানুষের কাছে লেখকের মর্যাদাকে তুলে ধরা, সৃজনশীল প্রতিভার মূল্যায়ন করা এবং বইয়ের বিক্রি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ১৯৬৮ সালে এ পুরস্কার চালু করা হয়। এ পুরস্কারের আর্থিক মূল্য প্রায় ২০ হাজার পাউন্ড।

বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় (Intelligentsia)

বুদ্ধিবৃত্তি অর্থাৎ বিদ্যা, অধ্যায়ন, মেধা ইত্যাদিভিত্তিক পেশার মাধ্যমে যারা জীবিকানির্বাহ করেন তাদেরকেই বলা হয় বুদ্ধিজীবী। সাধারণত শিক্ষক, গবেষক, সাহিত্যিক, প্রাবন্ধিক, সাংবাদিক, আইনজীবী, বিশেষজ্ঞ প্রমুখকেই বুদ্ধিজীবী বলে ধরা হয়।

প্রকৃতপক্ষে মানসিক শ্রমে অভ্যস্ত এবং প্রয়োজনীয় বিশেষ জ্ঞানসম্পন্ন একটি বৃত্তিকুশল সামাজিক গোষ্ঠী। বুদ্ধিজীবীরা স্বতন্ত্র কোনো সামাজিক শ্রেণি নয়। তারা বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে যুক্ত থেকে তাদের বুদ্ধিগত প্রয়োজন মেটায়। সেই নিরিখে তাদের সামাজিক ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একটি দেশের জনমত গঠন ও তা পরিচালনার ক্ষেত্রে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। ধনতন্ত্রী সমাজে তারা অনেকাংশেই বিত্তবান শ্রেণির অন্তর্গত। প্রশাসনের উচ্চ স্তরে, রাষ্ট্রায়ত্ত কিংবা বেসরকারি ব্যবসা-বাণিজ্যে এবং বুর্জোয়া প্রচারযন্ত্রের মোটা বেতনভুক্ত বিজ্ঞানী প্রভৃতি যারা নিজেরাই উৎপাদনের এক অংশের অধিকারী তারা সকলেই মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রমজীবী মানুষদের শোষণে সহায়তা করে। বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের বৃহদাংশ পুঁজিপতিদের এক ধরনের চুক্তিবদ্ধ কর্মচারী বিশেষ; তারা নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য শ্রমজীবীদের সংগ্রামী রীতিনীতি ও কৌশলসমূহ ব্যবহার করে।

উন্নয়নশীল দেশে বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে। বিশেষ করে যে দেশে সর্বহারা শ্রেণি নেতৃত্ব গ্রহণের পক্ষে উপযোগী হয়ে ওঠেনি। বুদ্ধিজীবীদের কণ্ঠেই ওইসব দেশে কৃষক, শ্রমিক, কারিগর প্রভৃতি মেহনতি মানুষের কথা ধ্বনিত হয়। পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রের অভিমুখে পরিবর্তনশীল পর্বে বুদ্ধিজীবীরা শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষা করে। সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হলে শ্রমিক, কৃষক, বুদ্ধিজীবী প্রভৃতি শ্রেণির স্বার্থ অভিন্ন হয়ে দাঁড়ায়।

বুর্জোয়া গণতন্ত্র (Bourgeois Democracy)

পশ্চিম ইউরোপ এবং বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্বমূলক রাষ্ট্রব্যবস্থার আলোচনা প্রসঙ্গে মার্কসীয় লেখকদের নিন্দাসূচক ব্যবহৃত শব্দ। বুর্জোয়া শব্দে 'বুর্জোয়া' মার্কা দিয়ে বোঝানো হয় যে ওইসব রাষ্ট্রব্যবস্থায় বহুল ও ভোটদানের প্রথা যাই থাকুক, শাসনক্ষমতা বুর্জোয়া শ্রেণি বা তার অনুগতদের ওপর সদাই বর্তায় ; বুর্জোয়া সংবিধান ও প্রশাসনের কায়দাকানুন এমনভাবে কাজ করে যে সম্পত্তির ব্যক্তিগত মালিকানা ও পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্ক অক্ষুণ্ণ থাকে ; সংসদীয় প্রতিনিধিরা বুর্জোয়া রীতিনীতি দ্বারা চালিত হয়। এর ঠিক বিপরীত রাষ্ট্রব্যবস্থা হলো জনগণতন্ত্র যেখানে নির্বাচন নাও হতে পারে, কিন্তু সেখানে সমগ্র জনস্বার্থে কর্তৃত্ব নির্বাহ হয়, নির্দিষ্ট কোনো শ্রেণির স্বার্থে নয়; কোনো শ্রেণিরই আধিপত্যের ক্ষমতা থাকে না। ব্যক্তি-স্বাধীনতা সম্পর্কেও মার্কসীয় লেখকেরা অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন।

বুর্জোয়া, জাতীয় (National Bourgeoise)

জাতীয় বুর্জোয়া সমাজের সে সকল শ্রেণি, যারা জাতীয় চরিত্রসম্পন্ন। অর্থাৎ কোনো বিদেশি স্বার্থের এজেন্ট হিসাবে কাজ না করে, বরং বিদেশি স্বার্থ ও বাজারের বিরুদ্ধে নিজ দেশের শিল্পোৎপাদনের বিকাশে তৎপর হয়, সে সকল পুঁজিপতি বা বুর্জোয়াকে জাতীয় বুর্জোয়া বলে। জাতীয় বুর্জোয়ারা দেশের শিল্পবিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বুর্জোয়া, একনায়কত্ব (Dictatorship of the Bourgeoise)

বুর্জোয়া গণতন্ত্রেরই অপর নাম বুর্জোয়া একনায়কতন্ত্র। বুর্জোয়া গণতন্ত্র যদিও কাগজে কলমে বলে মনে করা হয়। তবে এই ব্যবস্থায় যে কেউ পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়ে সদস্য, মন্ত্রী, এমনকি সরকারপ্রধান বা রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত হতে পারে। কিন্তু কার্যত এখানে সমস্ত ব্যবস্থা এমনভাবে বিন্যাস করা থাকে যে, তাতে পুঁজিপতি শ্রেণি বা তাদের প্রতিভূ ছাড়া অপর কেউ কখনোই নির্বাচিত হতে পারে না। জনগণের নামে, জনগণের ভোটে নির্বাচিত হয়ে পুঁজিপতি ও তাদের প্রতিভূরা স্বশ্রেণীরই একচ্ছত্র স্বার্থে কাজ করে এবং শোষণ অব্যাহত রাখে। এই ব্যবস্থায় কাগজে-কলমে বলা হয় আইনের দৃষ্টিতে সকলে সমান। কিন্তু বাস্তবে ব্যবস্থাটি এমনই যে, একজন ধনী প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে একজন দরিদ্রের সুবিচার পাওয়া কোনোক্রমেই সম্ভবপর হয় না। সুতরাং, বুর্জোয়া গণতন্ত্রের বাহ্যিক চেহারা গণতন্ত্র হলেও আসলে তা ধনিকতন্ত্র বা বুর্জোয়াদেরই একনায়কত্ব।

বুর্জোয়াজি (Bourgeosie)

বুর্জোয়া কথাটি একটি ফরাসি শব্দ। এর শাব্দিক অর্থ মধ্যবিত্ত। ব্যুৎপত্তিগত অর্থ নগরবাসী। পূর্বে নগরকে বলা হত 'বুর' (bourg)। বুর-এর অধিবাসীরা বুর্জোয়া বলে অভিহিত। পুঁজিবাদী অর্থনীতির উদ্ভব হয় ওইসব নগরগুলোতে। শিল্পোন্নয়নে সেগুলো সমৃদ্ধি লাভ করে। যান্ত্রিক অগ্রগতির ফলে ইউরোপে উৎপাদন ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন দেখা দেয়। মানুষের পরিবর্তে উৎপাদন যন্ত্রই ক্রমশ বেশি ব্যবহৃত হতে থাকে। মানুষের চাহিদার পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে উৎপাদন ব্যবস্থারও দ্রুত সম্প্রসারণ হয়। নানাবিধ পেশারও উদ্ভব ঘটে। নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বিকশিত হতে থাকে। এই নতুন উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত নগরবাসীরাই বুর্জোয়া নামে পরিচিত। নগরে জীবিকান্বেষণে আগত সাধারণ লোক যারা কারিগরি, দোকানদারি, কেরানিগিরি ও অন্যান্য নানান বুদ্ধিজীবীর কাকে জড়িত হয় তারা পেটি বুর্জোয়া বলে অভিহিত। তারা প্রলেটারিয়েট ও বুর্জোয়া শ্রেণিদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থান করে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণিগতভাবে বুর্জোয়াজির অন্তর্গত হলো পুঁজিবাদী, মিলমালিক, বণিক প্রভৃতি যারা ব্যবসাবাণিজ্যের মালিক (কৃষি ব্যতিরেকে)। এই বিভাজন অনুযায়ী বুর্জোয়াজি শ্রেণির একদিকে থাকে শিল্পপতি ও অর্থলগ্নিকারী, অন্যদিকে পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি যাদের জীবনযাত্রার মান সর্বহারা শ্রেণি থেকে খুব বেশি উন্নত নয়। এই বিশ্লেষণ অনুযায়ী শিল্পোন্নয়ন তথা আধুনিক কলকারখানার উন্নতির সঙ্গে বুর্জোয়াজি শাসকশ্রেণীতে পরিণত হয়, সামন্ততান্ত্রিক শ্রেণি ও তার সাবেকি উৎপাদন ব্যবস্থা নিক্ষিপ্ত হয়। সমাজে সামন্ততন্ত্রের যোগসূত্র ছিন্ন করতে বুর্জোয়াজির উত্থানের সঙ্গে উদারতন্ত্র প্রাধান্য পায়। মার্কসীয় চিন্তানুসারে বুর্জোয়াজি শ্রেণি সংগ্রামের সর্বহারা শ্রেণি দ্বারা পর্যুদস্ত হয়। মধ্যবর্তী পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি (কৃষিজীবীসহ) সর্বহারা শ্রেণির সঙ্গে

যুক্ত হয়। শ্রেণি হিসাবে বুর্জোয়াজি আরও ছোট আকারে পরিণত হয়ে দেশকে নিয়ন্ত্রণ করে।

বৃহত্তম পরিষদ (Magnum Concilium)

উইলিয়ামের সময় থেকেই নর্মান রাজারা 'বৃহত্তর পরিষদ' (Magnum Concilium) নামক একটি সংস্থার মাধ্যমে তাঁদের কর্তৃত্ব প্রয়োগ করতেন। এটাকে 'মহাপরিষদও' বলা হত। অ্যাংলো-স্যাক্সন যুগের উইটান এর পরিবর্তে বৃহত্তর পরিষদ বা মহাপরিষদ এর উদ্ভব হয়। এটা কোনো নির্বাচিত সংস্থা ছিল না। রাজ পরিবারের প্রধান কর্মচারী, আর্চবিশপ, বিশপ, আর্ল, অ্যাবট এবং নাইটদের নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হত। ওয়েস্টমিনিস্টারে এই পরিষদের অধিবেশন বসত। তবে অধিবেশন কতদিন অন্তর বসত তা সঠিক ছিল না, প্রয়োজানে রাজা অধিবেশন আহ্বান করত। এই পরিষদ দেশের সর্বোচ্চ আদালত, আইন প্রণয়ন এবং কর ধার্য, সাধারণ নীতি প্রণয়ন প্রভৃতির মন্ত্রণালয় সভায় পর্যবসিত হয়।

বৃহদায়তন উৎপাদন (Large Scale Production)

কোন উৎপাদন ক্ষেত্রে যখন অসংখ্য শ্রমিক, বিপুল পরিমাণ কাঁচামাল, প্রচুর মূলধন ও বিভিন্ন প্রকার যন্ত্রপাতির সাহায্যে বিপুল পরিমাণ দ্রব্য উৎপাদন করা হয় তখন তাকে বৃহদায়তন উৎপাদন (Large Scale Production) বলা হয়। যেমন– পাটকল, কাপড়ের কল, চিনির কল প্রভৃতি কারখানায় প্রচুর মূলধন, কাঁচামাল ও অসংখ্য শ্রমিকের সাহায্যে বিপুল পরিমাণ পণ্য উৎপাদন করা হয়। এটাই হলো বৃহদায়তন উৎপাদন। বর্তমানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বৃহদায়তন উৎপাদন ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

বেলফুর ঘোষণা (Balfour Declaration)

ব্রিটেনের তৎকালীন পররাষ্ট্র সচিব স্যার বেলফুর প্রখ্যাত ব্রিটিশ ইহুদি লর্ড রথচাইল্ডের কাছে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ১৯১৭ সালের ২ নভেম্বর যে চিঠি লেখেন, সেটাই ইতিহাসে বেলফুর ঘোষণা নামে খ্যাত। এই চিঠিতে ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে স্যার বেলফুর রথচাইল্ডকে জানান যে, ব্রিটিশ সরকার ইহুদিদের নিজ আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাকে সমর্থন করে এবং ঘোষণা ব্রিটিশ মন্ত্রিসভা কর্তৃক অনুমোদিত হয়। তিনি আরও উল্লেখ করেন যে, প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ব্রিটেন পূর্ণ সমর্থন প্রদান করবে। তবে এই শর্তে যে, এই রাষ্ট্রে ইহুদিদের নাগরিক ও ধর্মীয় অধিকারকে খর্ব করা হবে না। এই ঘোষণা বিশ্ব ইহুদি কংগ্রেসের কাছে পৌঁছে দেয়ার জন্যও বেলফুর রথচাইল্ডের কছে অনুরোধ জানান। এই ঘোষণা প্রকাশিত হওয়ার পূর্বেই তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্টের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়। ফ্রান্স ও ইতালি যথাক্রমে ১৯১৮ সালের ফেব্রুয়ারি ও মে মাসে সরকারিভাবে এই ঘোষণা প্রতি অনুমোদন প্রদান করে।

বেসরকারি বিল (Private Bill)

মন্ত্রী নন এমন কোনো সদস্য বিল উত্থাপনের নোটিশ দিলে ওই বিলটি বেসরকারি সদস্যের বিল নামে পরিচিতি লাভ করে। বেসরকারি সদস্য বলতে মন্ত্রী ব্যতীত সরকার দলীয় ও বিরোধী দলীয় সংসদ সদস্যকে বোঝায়। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী মন্ত্রী ব্যতীত অন্যসব সদস্য বেসরকারি সদস্য। বেসরকারি সদস্যের বিল উত্থাপন করতে চাইলে তাকে সংসদ সচিবের নিকট ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হবে এবং উক্ত নোটিশের সাথে বিলের প্রতিলিপি প্রেরণ করতে হয়। তবে যে তারিখে নোটিশ দেন সে তারিখ থেকে ১৫ দিনের মধ্যে বিলটি দিনের কার্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। কার্যপ্রণালী বিধি অনুযায়ী বেসরকারি সদস্যদের বিল উত্থাপনের জন্য তা আলাপ-আলোচনা ও বিবেচনার জন্য নির্ধারিত সময় বৃহস্পতিবার বরাদ্দ থাকে। সপ্তাহে ১টি মাত্র দিন ব্যতীত অন্য কোনো দিনে বেসরকারি বিল দিনের কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনা। ফলে একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে মাত্র কয়েকটি দিন বেসরকারি কাজের জন্য পাওয়া যায়। অথচ সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত যে কোন বিল পাশের বিভিন্ন পর্যায় যেমন, ১ম, ২য়, ৩য় পাঠ ইত্যাদি অনেক দিনের প্রয়োজন। তাছাড়া বেসরকারি বিলের ক্ষেত্রে সময় কম বরাদ্দ থাকার কারণে কে কে বিল উত্থাপনের সুযোগ পাবে তা লটারীর মাধ্যমে নির্ধারণ করা হয়। আবার সংসদের কার্যক্রম সংখ্যাগরিষ্ঠ সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে থাকে বিধায় বেসরকারি সদস্যের বিল সরকারি নীতি বিরুদ্ধ হলে ক্ষমতাসীন দল ওই বিল উত্থাপনের ও আলোচনার বিষয়ে বাধা বিপত্তি গড়ে তুলতে পারে। এসব কারণে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদে বেসরকারি বিল উত্থাপিত হলেও বিল পাসের হার অত্যন্ত নগণ্য। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রথম জাতীয় সংসদ থেকে অষ্টম জাতীয় সংসদ পর্যন্ত মোট ৫টি বেসরকারি বিল পাস হয়েছে। সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিল বেসরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় না। শুধুমাত্র বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত কোনো বিল বেসরকারি সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয়। সরকারি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে মন্ত্রিদেরকে ৭ দিনের নোটিশ দিতে হয়। অন্যদিকে কোনো বেসরকারি বিল উত্থাপনের ক্ষেত্রে সদস্যদেরকে ১৫ দিনের নোটিশ দিতে হয়। কারণ একটিমাত্র দিন (স্পিকার কর্তৃক পূর্বে ধার্যকৃত বৃহস্পতিবার বরাদ্ধ থাকে) বেসরকারি বিল আলোচনার জন্য নির্দিষ্ট থাকে।

বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র (Scientific Socialism)

মার্কস ও এঙ্গেলসই হলেন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের প্রবর্তক। এর ভিত্তি হল বিজ্ঞান, তথা ঐতিহাসিক বিকাশের বৈজ্ঞানিক নিয়ামাবলী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা বিজ্ঞান, দর্শন ও অর্থনীতিকে পরস্পর অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ বলে বিবেচনা করেন। তাঁরা বিশ্বাস করেন যে, বস্তু থেকেই চিন্তা-চেতনার উদ্ভব। বিশ্বের সকল কর্মকাণ্ডের বস্তুগত কারণ আছে এবং বস্তুগত নিয়ামাবলী প্রকৃতি বিজ্ঞান উভয়ের ক্ষেত্রেই সমভাবে প্রযোজ্য। দ্বন্দ্বতত্ত্ব ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদে বিশ্বাসী বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা আরও মনে

করেন যে, সমাজের বস্তুগত নিয়মগুলোকে অনুধাবন করার মাধ্যমেই বিপ্লব সম্পন্ন করা সম্ভবপর। তাঁরা আরও মনে করেন যে, ধনী-দরিদ্র, শহর-গ্রাম, কৃষক, শ্রমিক, চাকুরিজীবী প্রমুখদের মধ্যে যে মত পার্থক্য তা সম্পূর্ণ নিরসন করে সাম্যবাদী সমাজে উত্তরণ ঘটানোর জন্য একটি অন্তবর্তীকালীন পর্যায় অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক পর্যায় অবশ্যম্ভাবী। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রীরা এটাও মনে করেন যে, 'বাস্তব অবস্থায় বাস্তব বিশ্লেষণ'ই হল বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের মূলকথা এবং 'মার্কসবাদ-লেনিনবাদ' কোনো অন্ধ অনড় বিশ্বাস নয়, বরং একটি 'গতিশীল বিজ্ঞান'। অর্থাৎ বাস্তব অবস্থায় পরিবর্তনের সাথে সাথে বিপ্লবের কৌশল, কায়দা ও রূপেরও পরিবর্তন ঘটতে বাধ্য।

বৈধতা (Legitimacy)

ম্যাক্স ওয়েবারের মতে, রাষ্ট্রব্যবস্থায় ক্ষমতাবান ও সুবিধাভোগীরা নিজেদের প্রতাপ ও অধিকারের বৈধতা প্রমাণের জন্য সর্বসাধারণের কাছে নিজেরা যে নীতিগতভাবে গ্রহণযোগ্য সেটা প্রতিনিয়ত প্রমাণের চেষ্টা করেন। জনগণের সেই বিশ্বাসের জোরে শাসকেরা ক্ষমতা বজায় রাখার সঙ্গে ন্যূনতম বলপ্রয়োগে নিজেদের স্থায়িত্ব সুদৃঢ় করেন। আদর্শের কতকগুলো নির্দিষ্ট ছক থাকে যেগুলোর সাহায্যে তাঁদের নিজেদের ন্যায্যতা প্রতিপন্নের চেষ্টা করা হয়। জনগণকে প্রভাবিত করার উপযোগী প্রচার মাধ্যম তাঁদেই হাতে থাকায় ক্ষমতাবানেরা নিজেদের ভাবনাচিন্তা জনগণের কাছে সহজেই প্রচার করতে পারেন। সেই আলোকে মার্কসীয় বক্তব্য হলো যে শাসকশ্রেণির চিন্তাভাবনাই সমাজে প্রাধান্য পায়। অনেক দেশে কিছু বিরোধী অভিমত থাকে, যেটা শাসকদের রীতিনীতি মানে না। তবে প্রকৃত কিংবা সম্ভাব্য উৎপীড়নের ভয়ে সাধারণভাবে আনুগত্য বিরাজ করে।

বৈধতার বিষয়ে রাষ্ট্রতাত্ত্বিকদের মধ্যে মতদ্বৈততা আছে। কারও মতে সেটা প্রয়োজনীয়, আবার কারো মতে সর্বক্ষেত্রে অপরিহার্য হয়। যাঁরা মনে করেন সেটা প্রয়োজনীয় তাঁরা চান মতাদর্শের ভিত্তিতে রাজনৈতিক শিক্ষার ব্যবস্থা। রক্ষণশীল মতানুসারে বৈধতা অবশ্যই প্রয়োজন, তবে রাজনৈতিক মতবাদের পরিবর্তে সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সেটি কার্যকর হওয়া আবশ্যক। অবিচারের মতো অবৈধতা সহজেই চোখে পড়ে। সঠিক বিবেচিত সরকারের প্রতি জনগণের সন্তোষ অপেক্ষা অবৈধ হিসেবে বিবেচিত সরকারের বিরুদ্ধে লোকের নিন্দার মনোভঙ্গী অনেক বড় আকারে দেখা দেয়।

বোগোটা সম্মেলন (Bougota Conference)

আমেরিকার রাষ্ট্রসমূহের নবম আন্তর্জাতিক সম্মেলনে আমেরিকান রাষ্ট্রসংস্থা গঠনের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে ১৯৪৮ সালের এপ্রিল-মে-তে কলম্বিয়ার রাজধানী বোগোটায় বৈঠকে মিলিত হয়। এই সম্মেলন বোগোটা সম্মেলন নামে খ্যাত। এটা ছিল প্যান-অ্যামেরিকান ইউনিয়নেরই এক দৃঢ়তর সংস্করণ। এ-সময় প্রচণ্ড দাঙ্গার ফলে

সম্মেলনের কাজ কয়েকদিনের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এই দাঙ্গার জন্য ওখানকার কমিউনিস্টদের দায়ী করা হয়।

ব্যক্তি মালিকানা (Private Ownership)

ব্যক্তি মালিকানা এমন এক ব্যবস্থা যেখানে উৎপাদনের উপায়সমূহ (জমি, মেশিন ও অন্যান্য যন্ত্রপাতি) ও উৎপাদনের অন্যান্য হাতিয়ার, পণ্যের বণ্টনপ্রক্রিয়া (ব্যবসা-বাণিজ্য) এবং এসব থেকে উদ্ভূত যাবতীয় প্রক্রিয়া ও প্রতিষ্ঠানের ওপর ব্যক্তির বংশানুক্রমিক অধিকারই বা মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। সম্পদের ব্যক্তি মালিকানা দাসসমাজ, সামন্তসমাজ ও পুঁজিবাদী সমাজের বৈশিষ্ট্য। আদি সাম্যবাদী সমাজে এর কোনো অস্তিত্ব থাকার ছিল না। ব্যক্তি মালিকানার দরুনই সমাজে শ্রেণিবিভক্তি ও শ্রেণিদ্বন্দ্ব দেখা দেয়। আর উৎপাদনের উপায়সমূহের মালিকরা শ্রমিকদের শোষণ করে, উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ করে এবং এই প্রক্রিয়ায় জাতীয় সম্পদ ক্রমশ কতিপয় ব্যক্তির একচেটিয়া অধিকারে পরিণত হয়। সমাজ ও রাষ্ট্রেরও কর্তাব্যক্তিরা সম্পদের মালিক শ্রেণিতে পরিণত হয়। মালিকরা স্বেচ্ছায় তাদের মালিকানা ত্যাগ করে না বলেই তারা তাদের স্বার্থরক্ষায় রাষ্ট্রযন্ত্রকে ব্যবহার করে। ফলেই ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা কায়েম করতে গেলে বলপ্রয়োগের প্রয়োজন হয়। মার্কসবাদীরা ব্যক্তি মালিকানার ঘোর বিরোধী। তবে, আবার অনেকের মতে, ব্যক্তি মালিকানাই উন্নয়ন ও প্রগতির মূলসূত্র।

ব্যক্তি সংক্রান্ত আইন (Law of Person)

যে আইন ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নির্ধারণ করে তথা নাগরিকদের পারস্পরিক অধিকার সংজ্ঞায়িত করে এবং অধিকারগুলো রক্ষা করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে তাকে ব্যক্তি সংক্রান্ত আইন বলে। উদাহরণস্বরূপ, Law of person, Law of property, Law of contract, Law of tort ইত্যাদি ব্যক্তি সম্পর্কিত আইন।

ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা (Private Responsibility)

প্রত্যেক মন্ত্রীই সরকারের কোন না কোন বিভাগের প্রধান (Head) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। মন্ত্রীদের ব্যক্তিগত দায়িত্ব বলতে বোঝায় যে প্রত্যেক মন্ত্রী তার নিজস্ব বিভাগের যাবতীয় কাজকর্মের জন্য সমস্ত দায়-দায়িত্ব বহন করবে এবং আইন পরিষদের নিকট তার বিভাগের সকল কাজকর্মের জন্য জবাবদিহি করবে। প্রত্যেক বিভাগের কাজকর্ম সাধারণত স্থায়ী কর্মচারীগণ কর্তৃক সম্পাদিত হয়। তবুও বিভাগীয় মন্ত্রী তার বিভাগের সম্পাদিত কার্যাবলীর ভুল ক্রুটির দায়-দায়িত্ব সরকারি কর্মচারীদের ঘাড়ে চাপিয়ে অব্যাহতি পেতে পারে না। যেকোনো দপ্তর বা বিভাগীয় কাজকর্ম সম্পর্কে আইন সভায় প্রশ্ন উত্থাপিত হলে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই প্রশ্নের জবাব দিতে হয়; বিভাগীয় দুর্নীতির জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীকেই পদত্যাগ করতে হয়।

ব্যক্তিগত সম্পত্তি (Private Property)

প্রাকৃতিক সম্পত্তির সাথে নিজের শ্রম যুক্ত করে যে সম্পদ অর্জিত হয় তাই ব্যক্তিগত সম্পত্তি। যেমন- নদীর পানি সবার জন্য অবারিত। ব্যক্তি যখন কলস ভরে বাড়িতে নিয়ে আসে তখন তা ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এতে অন্যের অধিকার থাকে না। ব্যক্তিগত সম্পত্তি ব্যক্তির নিজস্ব মালিকানাধীন সম্পত্তি। সে সম্পত্তি নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার বা ভোগ করতে পারে। ব্যক্তিগত সম্পত্তি বংশানুক্রমে উত্তরাধিকারসূত্রে হস্তান্তরিত হয়। সমাজতন্ত্রীরা ব্যক্তিগত সম্পত্তি ও তজ্জনিত চিন্তাচেতনাকে শোষণ বৈষম্যের মৌল কারণ বলে মনে করেন।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ (Individualism)

প্রত্যয়টির মর্মার্থ হলো হস্তক্ষেপ থেকে মুক্ত অবাধ ব্যক্তিসত্তা। অ্যাডাম স্মিথ, জন স্টুয়ার্ট মিল, হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ চিন্তাবিদগণ মনে করেন যে, সরকারি কর্তৃপক্ষের নিয়ন্ত্রণক্ষমতা যথাসম্ভব হ্রাস করে ব্যক্তিগত পর্যায়ে ব্যক্তিগত আকাঙ্ক্ষা অনুযায়ী উদ্যোগ গ্রহণ ও তা কার্যকর করার স্বাধীনতার মধ্যেই ব্যক্তি ও সমাজের কল্যাণ নিহিত। তাদের এই মতবাদকেই বলা হয় ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদ। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যে রাষ্ট্র ব্যক্তিমানুষকে স্বাধীনভাবে চলতে দেয়। এই মতবাদে সমাজজীবনের কেন্দ্রবিন্দু হলো মানুষ। যাবতীয় বিষয়ের ঊর্ধ্বে মানুষের স্থান। ব্যক্তিমানুষকে হিংসা ও বঞ্চনা থেকে রক্ষা করা রাষ্ট্রের কাজ; তার জীবনকে কোনোভাবে নিয়ন্ত্রণ না করা। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদীদের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের ভূমিকা হলো যাবতীয় বিপদ-আপদ, পারস্পরিক বিরোধ, সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি এবং চুক্তির লঙ্ঘন থেকে নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। তার বাইরে মানুষের সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক কোনো ব্যাপারেই রাষ্ট্রের অনুপ্রবেশ কাম্য নয়।

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের উৎপত্তি ঘটে সামাজিক চুক্তি সত্ত্বগুলো থেকে। তবে সেটা ছিল অনেকাংশে বিমূর্ত। অষ্টাদশ শতকে স্বৈরাচারতন্ত্রী ও পরমবাদী রাজতন্ত্রী সরকারের নিরন্তর নিপীড়নদৃষ্টে রাষ্ট্রদার্শনিকেরা ব্যক্তিমানুষের স্বাধীন সত্তার ওপর গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ফ্রান্সে অবাধ বাণিজ্য নীতির প্রবক্তা ফিজিওক্র্যাট নামে অভিহিত অর্থনীতিবিদরা ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকে তার আদিপর্বে অর্থনৈতিক ব্যঞ্জনা প্রদান করেন।

ব্যক্তিমানুষের জীবন ও মননের স্বাধীন বিকাশের প্রসঙ্গ রাষ্ট্রদর্শনে ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের এক বিরাট অবদান। উল্লেখ্য যে, চরম ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের ফলে মানুষ স্বার্থপর, আত্মকেন্দ্রিক, অসামাজিক ও সংকীর্ণচিত্ত হয়ে জীব হিসেবে মানুষের স্বাধীন বিকাশের প্রয়োজন যেমন থাকে, তেমনি সামাজিক জীব হিসেবে মানুষের সঙ্গে সমাজের পারস্পরিক দায়দায়িত্ব অপরিহার্য। অধিকার সৃষ্টি এবং উপযোগী পরিবেশে সমাজই তার বিকাশ ঘটায়। রাষ্ট্র সমাজের একটি কার্যনির্বাহী অঙ্গ। ব্যক্তিমানুষের স্বার্থ, উদ্যম ও নিরঙ্কুশ বিকাশের স্বাধীনতা অব্যাহত রেখে সমষ্টিগত স্বার্থ, চাহিদা, প্রয়োজন ও

সমস্যাদির ভারসাম্য বিধিবিধানের ও প্রশাসনিক কার্যনির্বাহের সঙ্গে রাষ্ট্রের সুসমঞ্জস ভূমিকা থাকা বাঞ্ছনীয়।

ব্যবসায়িক লেনদেন (Deal)

ব্যবসায়িক লেনদেন সাধারণত প্রভাব, সমর্থন, সরকারি পদে নিয়োগ ও অন্যান্য সুবিধা যা জনসাধারণের স্বার্থের পরিপন্থী-পরস্পরের মধ্যে এই সব বিনিময়ের জন্য রাজনীতিবিদদের মধ্যে যে গোপনীয় চুক্তি বা বোঝাপড়া হয় তাকে 'গোপনীয় চুক্তি' বলা হয়।

ব্যাংক (Bank)

যে প্রতিষ্ঠানের মাধমে আর্থিক লেনদেন ও মুদ্রাবিনিময় করা হয় সে প্রতিষ্ঠানকে ব্যাংক বলা হয়।

যে অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানে টাকা গচ্ছিত রাখা হয়, বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন শ্রেণির লোকদেরকে ঋণ দেওয়া হয় এবং যে স্থান হতে টাকার আদান প্রদান হয় তাকে ব্যাংক বলা হয়। ব্যাংকের প্রধান কাজ টাকা গচ্ছিত রাখা ও ঋণ দেওয়া। মানুষ তার সঞ্চিত অর্থ নিরাপদে গচ্ছিত রাখতে পারবে এবং আবার প্রয়োজন মত তা উত্তোলন করতে পারবে। আবার ব্যাংকও অন্য লোককে টাকা ঋণ দিয়ে সুদ বাবদ আয় করতে পারবে, এইসব উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই আধুনিক ব্যাংকের সৃষ্টি। সাধারণত ব্যাংক অল্প সুদে টাকা ঋণ গ্রহণ করে এবং বেশী সুদে টাকা ঋণ দেয়। ব্যাংক এই মূল কাজের সাথে পরে ব্যবসায় বাণিজ্যের লেনদেনের সুবিধার জন্য 'হুন্ডি' বা 'বিল' (Bill of Exchange) ক্রয় বিক্রয়ের কাজও গ্রহণ করে।

ব্যাংকে দুইভাবে টাকা রাখা যায়-যেমন চলতি হিসাব (Current Account) ও স্থায়ী আমানত (Fixed Deposit)। চলতি হিসাবে টাকা রাখলে তা যেকোনো সময়ে চেকের মাধ্যমে উত্তোলন করা যায়। সেক্ষেত্রে কোন প্রকার লাভ দেওয়া হয় না। স্থায়ী আমানতে টাকা জমা রাখলে তা তোলার জন্য পূর্বে নোটিশ দিতে হয়। ব্যাংকের সমস্ত টাকা সকল সময় ব্যাংকে মজুদ থাকে না, সেসব টাকার একটা ক্ষুদ্র অংশ প্রাত্যহিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য ব্যাংকে রাখা হয় ; একটা অংশ, সাধারণত শতকরা ২৫ ভাগ, জমা থাকে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকে এবং বেশীর ভাগ টাকা উপযুক্ত জামিন রেখে অন্যকে (সাধারণত ব্যবসায়ী বা শিল্প সংস্থাকে) একটা অনুমোদিত শতকরা সুদের হারে ঋণ দেওয়া হয়। বর্তমান সময়ে নানা প্রকারের ব্যাংক দেখা যায়, যেমন (১) আন্তর্জাতিক ব্যাংক (International Bank) বা বিশ্ব ব্যাংক (World Bank)-এই ব্যাংক আন্তর্জাতিক লেনদেন সম্পন্ন করে ; (২) রাষ্ট্রীয় ব্যাংক (State Bank) এই ব্যাঙ্কের মাধ্যমে কোন রাষ্ট্র নিজ দেশের আর্থিক ও মুদ্রা-ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে ; (৩) অংশীদারী ব্যাংক (Joint Stock Company)- অনেক লোক শেয়ার ক্রয় করে এই ধরনের ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করে ; (৪) সেভিংস ব্যাংক (Savings Bank)-সাধারণত পোস্ট অফিসেই 'সেভিংস

ব্যাংক' থাকে। এই ব্যাংক কেবল টাকা গচ্ছিত রাখা হয় কিন্তু সাধারণ ব্যাংক অন্যান্য কাজ এখানে হয় না ; (৫) শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক (Industrial Development Bank of Pakistan)- ১৯৬১ খ্রীষ্টাব্দে পাকিস্তানে এই শিল্পোন্নয়ন ব্যাংক স্থাপন করা হয় ; পূর্বেকার শিল্পোন্নয়ন সংক্রান্ত অর্থনৈতিক সংস্থাকে (Industrial Finance Forporation) পুনগঠিত করে এই ব্যাংক রূপান্তরিত করা হয় এবং ব্যাংক কার্যের পরিধিও বর্ধিত করা হয়। এই ব্যাংক শতকরা ৫১ ভাগ শেয়ার পাকিস্তান সরকার ক্রয় করে এবং বাকী শেয়ার জনসাধারণ ক্রয় করে। ছোট ও মাঝারি ধরনের শিল্প প্রতিষ্ঠানকে এই ব্যাংক দীর্ঘমেয়াদী ঋণ দেয়। গভর্নমেন্টের পক্ষ হতে এই ব্যাংক অনেকগুলো বিদেশি ঋণসংস্থা পরিচালনা করে। তা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে দীর্ঘমেয়াদী ঋণের সরাসরি আলোচনা চালায়। নতুন শিল্পকারখানা স্থাপনে অর্থসরবরাহ করাও এর অন্যতম কাজ ; (৬) কৃষি-উন্নয়ন ব্যাংক (Agricultural Development Bank)-১৯৬১ সালে পূর্বেকার কৃষি-উন্নয়ন সম্বন্ধীয় অর্থনৈতিক সংস্থা (Agricultural Development Corporation) এবং কৃষি- ব্যাংক (Agricultural Bank) এই দুই প্রতিষ্ঠানকে একত্রিত করে এই ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এই ব্যাংক এর সম্পদের ভিত্তিতে ঋণগ্রহণ করতে পারে এবং জনসাধারণের টাকাও জমা রাখে। এই ব্যাংক স্থায়ী আমানত হিসাবে টাকা জমা রাখা হয় এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীদের সেভিংস ব্যাঙ্কের সুবিধা দান করা হয়। কৃষি ও কুটিরশিল্পের উন্নতি ও সম্প্রসারণের জন্য এই ব্যাংক টাকা ও জিনিসের মারফতে ঋণ দেয়। স্বল্প, মাঝারী ও দীর্ঘমেয়াদে এই ঋণ ব্যাংক দেয়।

ব্যাংক-নোট (Bank Note)

ব্যাংক-নোট হলো ব্যাংক কর্তৃক অর্থপ্রদানের প্রতিজ্ঞা-পত্র। আইন অনুযায়ী নিশ্চয়তার ব্যবস্থা করে ব্যাংক কর্তৃক অর্থ প্রদানের নোট বা প্রতিজ্ঞাপত্র প্রবর্তন করা হয়। এই নোটের বাহক দাবি করলে টাকা দিতে হয়। এটা দেশের প্রচলিত মুদ্রা হিসেবে কাজ করে। পাকিস্তানে একমাত্র রাষ্ট্রীয় ব্যাংকই (State Bank of Pakistan) এই ধরনের অর্থ প্রদানের প্রতিজ্ঞাপত্র প্রবর্তন করতে পারে।

ব্যাকবেঞ্চার (Backbencher)

সাধারণভাবে 'ব্যাকবেঞ্চার' বলতে পার্লামেন্টের সেসব সদস্যকে বোঝানো হয় যাঁরা কোনো মন্ত্রিত্ব করেন না বা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পালন করেন না। 'প্রাইভেট মেম্বার'দের বুঝাতে 'ব্যাকবেঞ্চার' শব্দটি ব্যবহৃত হয়। এঁরা পার্লামেন্ট কক্ষের ভেতরে বসার আসনের যে ব্যবস্থা তাতে পেছনের সারিগুলোতে বসেন। সামনের দিকের আসনগুলোতে সরকারি দলের ক্ষেত্রে মন্ত্রী ও অন্য গুরুত্বপূর্ণ নেতারা এবং বিরোধী দলের ক্ষেত্রে বিরোধী দলের নেতা, উপনেতা, বিরোধী দলীয় হুইপ ও অন্য নেতৃবৃন্দ বসেন। পেছনের সারিতে যেসব 'প্রাইভেট সদস্য' বসেন তাদেরই ব্যাকবেঞ্চার বলা হয়। ব্যাকবেঞ্চার সরকারি ও বিরোধী উভয় দলেরই হতে পারেন।

ব্যাবিলনীয় সভ্যতা (*Babylonian* Civilization)

বিশ্বসভ্যতার ইতিহাসে ব্যাবিলনের অবদান অনেক। এই সভ্যতা প্রাচীন মিশরীয় সভ্যতার সমসাময়িক এবং সমান গুরুত্বপূর্ণ। কিউনিফর্ম অর্থাৎ কীলক-আকারের পদ্ধতি প্রচলিত ছিল প্রাচীন ব্যাবিলনে। এই পদ্ধতি প্রাচীন মিশরের চিত্রলিখন পদ্ধতি অপেক্ষা উন্নতর। পাথরে খোদাই করে বা মাটির তক্তির ওপর তিন কোণা কাঠি দিয়ে লেখা হতো। পরে তা রোদে শুকিয়ে কিংবা আগুনে পুড়িয়ে টেকসই করে সংরক্ষণ করা হতো। ব্যাবিলনের অধিবাসিরা প্রায় পাঁচশ অক্ষর ব্যবহার ক্ষমতা। ব্যাবিলনীয়রা অসংখ্য দেব-দেবীর পূজা ক্ষমতা। তাদের সর্বশ্রেষ্ঠ দেবতা ছিল সূর্যদেব মার্দুক। এছাড়া অশরীরী প্রেতাত্মার শক্তিতে তারা বিশ্বাস করতো। ভবিষ্যৎ গণনার ব্যাপারেও তারা অতীব পারদর্শী ছিল। পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের অন্যতম ছিল ব্যাবিলনের বিখ্যাত শূন্য উদ্যান। শিল্প-বাণিজ্যের ক্ষেত্রেও ব্যাবিলনীয়রা উন্নত ছিল। কাঁচ শিল্পের উন্নতি সাধন ও প্রসারে তাদের যথেষ্ট অবদান রয়েছে। চিত্রাঙ্কনবিদ্যা, ভাস্কর্য, জ্যোতিষশাস্ত্র, অঙ্কশাস্ত্র এবং আয়ুর্বেদশাস্ত্রে তাদের অতুলনীয় পারদর্শিতা ছিল। গ্রহ্-নক্ষত্রাদি সম্পর্কে তাদের সীমা বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছিল। সূর্য ও জলঘড়ির সাহায্যে তারা সময় নিরূপণ ক্ষমতা। বারো মাসে বছর গণনা, চার সপ্তাহে মাস, বারো ঘণ্টায় দিন এবং এক ঘণ্টাকে ষাট মিনিটে ভাগ করার প্রথম কৃতিত্ব ব্যাবিলনীয়দেরই। চন্দ্রগ্রহণ ও সূর্যগ্রহণ সম্পর্কেও তাদের ধারণা ছিল যথাযথ। দশমিক সংখ্যা পদ্ধতির গণনা ব্যাবিলন থেকেই প্রসার লাভ করে সেই প্রাচীনকালে।

ব্যালট (Ballot)

সাধারণভাবে ব্যালট বলতে নির্বাচন বুঝায়। নির্বাচনের মাধ্যমে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে ব্যালট বলে। ব্যালট পেপার (Ballot Paper) হলো একটি তালিকা যাতে ভোটাররা তাদের পছন্দের প্রার্থীর নামের পাশে বা চিহ্নে সিল প্রদান করেন। পার্লামেন্টারি পরিভাষায় ব্যালট এমন একটি পদ্ধতি যা দ্বারা বেসরকারি সদস্যদের বিলের, বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত প্রস্তাবের এবং একই প্রকারে একাধিক বিলের প্রাধান্য নির্নিত হয়।

ব্যালট আইন (Ballot Act)

বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম ব্যালট আইন বিদ্যমান রয়েছে। ১৮৭২ সালে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ব্যালট আইন পাস হয়। এ আইনে গোপনে ভোটাধিকার প্রয়োগ করার বিধান রাখা হয়। এর আগে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য নির্বাচন করার জন্য ভোটারদের প্রকাশ্যে (open) ভোট দিতে হতো। তখনও সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত হয় নি। সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে ভোটার হবার যোগ্যতা নির্ধারিত হতো। বড়লোক ও ভূস্বামীরাই ভোটার হতেন। প্রকাশ্য ভোট দিতে হতো বলে নির্বাচনের সময় ব্যাপক দুর্নীতি ও ভয়ভীতি প্রদর্শনের ঘটনা ঘটতো। গোপন ভোট ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দাবি

ইংল্যান্ডে অনেকদিন থেকে উত্থাপিত হতে থাকে। দুবার দুটি বিল পার্লামেন্টে আনা হয়। কিন্তু দুটিই লর্ডসভা কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়। শেষে ১৮৭০ সালে ব্যালট আইন প্রণীত হয়।

ব্যালট আইন ইংল্যান্ডে তখন র‍্যাডিক্যাল রাজনীতির পক্ষে সহায়ক ভূমিকা পালন করে। বিশেষ করে এ আইনের প্রভাব পড়ে আয়ারল্যান্ডের রাজনীতির ওপর। নির্বাচনের সময় ঘুষ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের মাত্রা কমতে থাকে। নির্বাচনী ব্যবস্থা এবং ভোটাধিকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে ব্যালট আইন একটি ঐতিহাসিক ঘটনা বলে স্বীকৃত।

নির্বাচনী আইন নির্বাচন সংক্রান্ত আইনবিধান। সুষ্ঠুভাবে নির্বাচন সম্পন্ন করা, প্রার্থী এবং প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচন কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীদের আচরণ ব্যাখ্যা এবং এ সম্পর্কিত বিধিবিধান লঙ্ঘন করলে লঙ্ঘনকারীদের শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা নির্বাচনী আইনের লক্ষ্য।

বাংলাদেশের সংবিধানেও নির্বাচন সংক্রান্ত আইন কানুন যুক্ত আছে। বাংলাদেশে ১৯৭২ সালে প্রণীত সংবিধানে নির্বাচন কমিশন গঠনের বিধান রাখা হয়। রাষ্ট্রপতি সংবিধানের ১১৮ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী প্রধান নির্বাচন কমিশনার ও অন্যান্য নির্বাচন কমিশনারদের নিয়োগ দান করেন। নির্বাচন কমিশন সংবিধান ও আইনের আওতায় দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে স্বাধীন। সংবিধানের ১১৯ অনুচ্ছেদের বিধান অনুযায়ী সংসদ নির্বাচনের জন্য ভোটার তালিকা প্রস্তুত ও তত্ত্বাবধান, নির্দেশ ও নিয়ন্ত্রণ এবং নির্বাচন পরিচালনার দায়িত্ব নির্বাচন কমিশনের ওপর ন্যস্ত। নির্বাচন কমিশনের নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ এবং কার্যক্রম পরিচালনার স্বার্থে গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২, নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা ১৯৭২ এবং আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণীত হয়। এসব আদেশ ও বিধিমালার সমন্বয়েই নির্বাচনী আইনবিধান গঠিত।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ এ আদেশের ৩ ধারায় উল্লিখিত বিধান সাপেক্ষে নির্বাচন কমিশন তার নিজস্ব পদ্ধতি নির্ধারণ করবেন। আদেশের ৫ ধারাবলে নির্বাচন কমিশন যেকোন ব্যক্তি অথবা কর্তৃপক্ষকে তার যেরূপ দায়িত্ব পালন এবং যেরূপ সহায়তা প্রদানের প্রয়োজন সেরূপ দায়িত্ব বা সহায়তা প্রদানে নির্দেশ দিতে পারেন। নির্বাচনের সঙ্গে জড়িত কোনো কর্মকর্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনে বাধা দান বা নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করার মতো কোনো কাজ করলে, নির্বাচন কমিশন যেকোনো সময় নির্বাচনের দায়িত্ব থেকে তাকে বা তাদের অব্যাহতি দিতে পারবেন এবং প্রয়োজনে শৃঙ্খলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দিতে পারবেন।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ, ১৯৭২-এর ৭ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন এক বা একাধিক নির্বাচনী এলাকার সংসদ-সদস্য নির্বাচনের জন্য একজন রিটার্নিং অফিসার ও প্রয়োজনীয় সংখ্যক সহকারি রিটার্নিং অফিসার নিয়োগ করতে পারবেন। বিধিবিধান অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের দায়িত্ব রিটার্নিং অফিসারের ওপর ন্যস্ত। সহকারি রিটার্নিং অফিসারগণও রিটার্নিং অফিসারের তত্ত্বাবধানে

রিটার্নিং অফিসারের কার্যক্রম সম্পাদনের দায়িত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। ৯ ধারায় রিটার্নিং অফিসারকে ভোটগ্রহণকারী কর্মকর্তা নিয়োগের উদ্দেশে একটি প্যানেল তৈরির কথা বলা হয়েছে।

গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশের ১১ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিল ও বাছাইয়ের তারিখ নির্ধারণ ও প্রচারে নির্বাচন কমিশনকে প্রজ্ঞাপন জারির ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে। ১২(১) ধারায় জাতীয় সংসদের সদস্যপদে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা বা সদস্য হওয়ার যোগ্যতা বর্ণিত হয়েছে। ১৩ ধারায় মনোনয়নপত্র দাখিলের সময় প্রার্থী স্বয়ং কিংবা বিধিতে বর্ণিত ব্যক্তিদের মাধ্যমে নির্দিষ্ট অঙ্কের জামানত প্রদানের কথা বর্ণিত হয়েছে। ১৪ ধারায় মনোনয়নপত্র বাছাই করার ক্ষমতা রিটার্নিং অফিসারের ওপর অর্পিত হয়েছে। ১৪(৫) ধারায় রিটার্নিং অফিসারগণ কর্তৃক মনোনয়ন বাতিলের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের নিকট নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে আপিল দায়েরের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। ১৫ ধারায় বৈধ মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের কথা বলা হয়েছে। ১৬(১) ও ১৬(২) ধারা অনুসারে বৈধভাবে মনোনীত যেকোনো প্রার্থী তার নিজ স্বাক্ষরে লিখিত নোটিশের মাধ্যমে নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে প্রার্থীতা প্রত্যাহার করতে পারবেন।

আদেশের ১৭ (১) ধারায় বৈধভাবে মনোনীত প্রার্থীর মৃত্যুজনিত কারণে সংশ্লিষ্ট এলাকার নির্বাচন বাতিলের কথা বলা হয়েছে। ১৯ ধারায় বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হওয়ার শর্ত বর্ণিত হয়েছে। ২০ ধারায় নির্বাচনী এলাকায় একাধিক প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর ক্ষেত্রে প্রার্থীদের পছন্দ অনুসারে প্রতীক বরাদ্দের বিধান রয়েছে। ২০ (২) ধারা অনুসারে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের নাম ও প্রতীক সম্পর্কিত পোস্টার প্রত্যেক ভোটকেন্দ্রে প্রদর্শন করতে হবে। ২১ (১) ধারায় প্রার্থীর পক্ষে নির্বাচনী এজেন্ট এবং ২১ (২) ধারায় পোলিং এজেন্ট নিয়োগের বিধান রাখা হয়েছে। ২৭ (২) ধারা অনুসারে ভোটার তালিকা অধ্যাদেশ ১৯৮২-এর ৮ ধারার (২), (৩) অথবা (৪) উপধারায় বর্ণিত ভোটারদের জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে পোস্টাল ব্যালটে ভোটদানের অধিকার দেয়া হয়েছে।

আদেশের ৩৭ ধারায় প্রত্যেক নির্বাচনী এলাকার ফলাফল একত্র করা এবং ৩৭ (৫) ধারায় প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর বা তার প্রতিনিধির অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে ভোট পুনঃগণনার বিধান রয়েছে। ৩৯ (১) ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার গণবিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে নির্বাচিত প্রার্থীর নাম ঘোষণা করবেন। ৪৪-ক ধারার (১) উপধারা অনুসারে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের শেষ দিন অতিক্রান্ত হওয়ার পরবর্তী ৭ দিনের মধ্যে রিটার্নিং অফিসার প্রার্থীদের নির্বাচনী ব্যয়ের উৎস-বিবরণী দাখিলের নির্দেশ দেবেন। ৪৪-খ ধারার (৩) উপধারায় প্রার্থীর নির্বাচনী ব্যয়ের সীমা (সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা) নির্ধারিত হয়েছে। ৪৪-গ ধারা অনুসারে রিটার্নিং অফিসার নির্বাচনী ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরমে নির্বাচনী ব্যয়ের রিটার্ন দাখিলের জন্য সংশ্লিষ্ট প্রার্থী এবং নির্বাচনী এজেন্টদের নির্দেশ দেবেন। ৪৯(১) ধারা অনুসারে নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী যেকোনো প্রার্থী নির্বাচনের বৈধতা সম্পর্কে আপত্তি উত্থাপন করে অভিযোগ দাখিল করতে পারেন।

আদেশের ৭৩ ধারায় ৪৪-ক ও ৪৪-খ এর বিধান লঙ্ঘন, ঘুষ গ্রহণ, ছদ্মবেশ ধারণ, নির্বাচনে অসঙ্গত প্রভাব খাটানো, কোনো প্রার্থীর নির্বাচনী সাফল্যে বিঘ্ন সৃষ্টি বা তার নিজস্ব বা আত্মীয়স্বজনের ব্যক্তিগত চরিত্র সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর প্রতীক বা প্রার্থিতা প্রত্যাহার সম্পর্কে মিথ্যা বিবৃতিদান, কোনো প্রার্থীর বিশেষ সামাজিক বা ধর্মীয় অবস্থানের পক্ষে বা বিপক্ষে ভোটদানের আহ্বান বা প্ররোচিতকরণ, ভোটার উপস্থিতিতে বা ভোটদানে বাধা দান এবং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ঘুষ গ্রহণকে দুর্নীতিমূলক অপরাধ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। ৭৪ ধারায় বেআইনি আচরণের ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে এবং এর জন্য জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর ও সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে। ৭৮ ধারায় ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠানের দিবাগত মধ্যরাত থেকে পূর্ববর্তী ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে নির্বাচনী এলাকাভুক্ত সকল স্থানে জনসভা আহ্বান, অনুষ্ঠান ও তাতে যোগদান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। এ বিধান লঙ্ঘিত হলে ৭৮(২) ধারা অনুসারে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর কারাদ-হতে পারে। ৮০ ধারায় ভোটকেন্দ্রের কাছে উচ্ছৃঙ্খল আচরণের জন্য জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৩ বছর, নিম্নে ৬ মাস কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)। ৮১(১) ধারায় ব্যালট চুরি, জালভোট দান, সীলমোহর ভেঙে ফেলা, নির্বাচন পরিচালনায় বাধা দান প্রভৃতি অবৈধ হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ১০ বছর ও সর্বনিম্ন ৩ বছর সশ্রম কারাদণ্ডের বিধান রাখা হয়েছে (কগনিজিবল অফেন্স)।

আদেশের ৮৪ ধারায় বলা হয়েছে, নির্বাচন পরিচালনায় নিয়োজিত কর্মকর্তা বা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কোনো সদস্য কোনো প্রার্থীর পক্ষে বা বিপক্ষে কাজ করলে জরিমানাসহ সর্বোচ্চ ৫ বছর এবং সর্বনিম্ন ১ বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন (কগনিজিবল অফেন্স)। ৮৬ ধারায় বলা হয়েছে, প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত থেকে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনের ফলাফল প্রভাবিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে সরকারি পদমর্যাদার অপব্যবহার করলে তিনি জরিমানাসহ ঊর্ধ্বে ৫ বছর, নিম্নে ১ বছর কারাদণ্ডে দন্ডি হতে পারেন। ৯১ ধারা অনুসারে বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন এবং চাপসহ অন্যায় আচরণমূলক কার্যকলাপ চালু থাকার কারণে সুষ্ঠু ও আইনসম্মতভাবে নির্বাচন অনুষ্ঠান নিশ্চিত করা সম্ভব হয় নি বলে মনে হলে নির্বাচন কমিশন সে পর্যায়ে যেকোনো ভোটকেন্দ্রের ভোটগ্রহণ বন্ধ ঘোষণা করতে পারেন। ৯১-খ ধারা অনুসারে নির্বাচন কমিশন ভোটগ্রহণের প্রাক্কালে অনিয়ম রোধ ও নিয়ন্ত্রণের জন্য ইলেক্টোরাল ইনকোয়ারী কমিটি গঠন করতে পারবেন। বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে গঠিত এ কমিটি নির্বাচন অনুষ্ঠান শেষ হওয়ার পূর্বেই তদন্ত পরিচালনা করবে এবং নির্বাচন কমিশনের কাছে রিপোর্ট পেশ করবে।

এ আইনের ৪ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার চাকুরি ও তার নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত বিধি জারি রয়েছে। এ আইনের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে: কোনো ব্যক্তি নির্বাচন কর্মকর্তা নিযুক্ত হলে, তিনি কমিশন বা ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের কাছে গ্রহণযোগ্য কারণ ছাড়া তার দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করতে পারবেন না। নিয়োগের তারিখ হতে

নির্বাচনী দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি না পাওয়া পর্যন্ত তার চাকুরির অতিরিক্ত দায়িত্ব হিসাবে কমিশনের অধীনে প্রেষণে চাকুরিরত আছেন বলে গণ্য হবেন।

এ আইনের ৫ ধারায় নির্বাচন কর্মকর্তার শৃঙ্খলামূলক শাস্তির বিধান রাখা হয়েছে। কোনো নির্বাচন কর্মকর্তা নির্বাচন সংক্রান্ত ব্যাপারে নির্বাচন কমিশন বা ক্ষেত্রবিশেষে রিটার্নিং অফিসারের প্রদত্ত কোনো আদেশ বা নির্দেশ পালনে ইচ্ছাকৃতভাবে ব্যর্থ হলে বা নির্বাচন সংক্রান্ত কোনো আইনের বিধান ইচ্ছাকৃতভাবে লঙ্ঘন করলে তা অসদাচরণ বলে গণ্য হবে এবং ওই অসদাচরণ তার চাকুরিবিধি অনুযায়ী শাস্তিযোগ্য অপরাধ বলে বিবেচিত হবে।

নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ১৯৭২ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯৪ ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতাবলে নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সরকার নির্বাচনী বিধিমালা ১৯৭২ প্রণয়ন করে। এই বিধিমালার ৫ বিধিতে মনোনয়নপত্র বাতিলের বিরুদ্ধে প্রার্থীকে আপিল করার সুযোগ দেয়া হয়েছে। ৬ বিধিতে মনোনীত প্রার্থীর তালিকা প্রকাশের প্রক্রিয়া বিবৃত হয়েছে। ৭ বিধিতে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতীক বরাদ্দসহ চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশের পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। ৮ বিধিতে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ঘোষণার প্রক্রিয়া এবং ৯ বিধিতে প্রতীক তালিকা উল্লিখিত হয়েছে। ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪ ও ১৫ বিধিতে ব্যালট পেপার তৈরির পদ্ধতি, পোস্টাল ব্যালট ইস্যু ও তার ভোট রেকর্ড, নিরক্ষরদের ভোট রেকর্ডের প্রক্রিয়া, পোস্টাল ব্যালটের রিটার্ন এবং রি-ইস্যু করার পন্থা বিবৃত হয়েছে। ১৫-ক বিধিতে ব্যালট বাক্স রেকর্ড, ১৬ ও ১৭ বিধিতে ব্যালট পেপার মার্কিং এবং ১৮ বিধিতে তা বাক্সে ঢোকানোর পদ্ধতি বলা হয়েছে। ২০ বিধিতে প্রার্থী কর্তৃক ভোট চ্যালেঞ্জ প্রক্রিয়া, ২১ বিধিতে পরিত্যক্ত ব্যালট বাতিলের প্রক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছে। ২২, ২৩, ২৪, ২৫ বিধিতে বর্ণিত হয়েছে ভোট গণনা, প্রিসাইডিং অফিসার কর্তৃক বিবরণ তৈরি, ফলাফল একত্রীকরণের পদ্ধতি। ২৬ বিধিতে ভোট গ্রহণ সংক্রান্ত কাগজপত্রের পাবলিক ইন্সপেকশন পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে।

আচরণ বিধিমালা, ১৯৯৬ গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২-এর ৯১-খ ধারার ক্ষমতা বলে নির্বাচন কমিশন আচরণ বিধিমালা ১৯৯৬ প্রণয়ন করে। এ বিধিমালার ৩ ধারায় চাঁদা, অনুদান ইত্যাদির ওপর বিধিনিষেধ আরোপ করতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের সার্বিক উন্নয়ন পরিকল্পনা জনসমক্ষে পেশ করা যাবে। তবে নির্বাচনী তফসিল ঘোষণার পর থেকে ভোট গ্রহণের দিন পর্যন্ত কোনো প্রার্থী কিংবা তার পক্ষ হতে সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকার কোনো প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো প্রতিষ্ঠানে প্রকাশ্যে বা গোপনে কোনো প্রকার চাঁদা বা অনুদান প্রদান বা প্রদানের অঙ্গীকার করা যাবে না, অথবা সংশ্লিষ্ট নির্বাচনী এলাকায় কোনো প্রকার উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণের অঙ্গীকার করা যাবে না। ৫ বিধিতে বলা হয়েছে, রাজনৈতিক দল ও প্রার্থী নির্বিশেষে প্রচারণার ক্ষেত্রে সমান অধিকার থাকবে; কোনো প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারভিযান পন্ড করা বা তাতে বাধা প্রদান করা যাবে না। নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পর কোনো

প্রার্থী বা রাজনৈতিক দল বা তার পক্ষে কেউ নির্বাচনী কাজে সরকারি প্রচারযন্ত্রের ব্যবহার, সরকারি কর্মকর্তা বা কর্মচারীগণকে ব্যবহার বা সরকারি যানবাহন ব্যবহার করতে পারবেন না এবং রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধা ব্যবহার হতে বিরত থাকবেন। নির্বাচনী প্রচারণা হিসেবে সকল প্রকার দেয়াল লিখন থেকে সকলকে বিরত থাকতে হবে।

আচরণ বিধিমালার ৬ বিধিতে বর্ণিত হয়েছে যে অর্থ, অস্ত্র, পেশীশক্তি কিংবা স্থানীয় ক্ষমতা দ্বারা নির্বাচনকে প্রভাবিত করা যাবে না। ৭ বিধিতে বলা হয়েছে, ভোটকেন্দ্রে নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, নির্বাচনী এজেন্ট এবং কেবল ভোটারদেরই প্রবেশাধিকার থাকবে। কেবল পোলিং এজেন্টগণ তাদের জন্য নির্ধারিত স্থানে উপবিষ্ট থেকে তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব পালন করে যাবেন। ৮ বিধিতে বলা হয়েছে, এ বিধিমালার যেকোন বিধান লঙ্ঘন নির্বাচন-পূর্ব অনিয়ম হিসেবে গণ্য হবে এবং ওই অনিয়মের দ্বারা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি বা রাজনৈতিক দল প্রতিকার চেয়ে ইলেক্টোরাল এনকোয়ারি কমিটি বা নির্বাচন কমিশন বরাবরে আর্জি পেশ করতে পারবেন। নির্বাচন কমিশন বরাবরে পেশকৃত আর্জি কমিশনের বিবেচনায় বস্তুনিষ্ঠ হলে কমিশন তদন্তের জন্য সংশ্লিষ্ট বা যেকোন ইলেক্টোরাল ইনকুয়ারি কমিটির নিকট প্রেরণ করবেন। উভয় ক্ষেত্রে ইলেক্টোরাল ইনকুয়ারি কমিটি গণপ্রতিনিধিত্ব আদেশ ১৯৭২ (১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ১৫৫)-এর বিধান মোতাবেক তদন্তকার্য পরিচালনা করে কমিশন বরাবরে সুপারিশ পেশ করবে।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য (British Empire)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্য হলো ব্রিটিনের রাজা বা রানির অধীনস্থ দেশ ও অঞ্চলসমূহ। এমন এক সময় (দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত) এই সাম্রাজ্য পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তৃত ছিল। তখন ব্রিটিশ সাম্রাজের আয়তন ছিল ১ কোটি ৩২ লক্ষ ৯০ হাজার বর্গমাইল; অর্থাৎ সমগ্র পৃথিবীর এক-পঞ্চমাংশ। লোকসংখ্যাও ছিল প্রায় অনুরূপ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়: ১. ব্রিটিশ যুক্তরাজ্য অর্থাৎ গ্রেট ব্রিটেন; ২. স্বায়ত্তশাসনপ্রাপ্ত দেশ বা ডোমিনিয়নসমূহ যথা : কানাডা, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা ইউনিয়ন, দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড ও নিউজিল্যান্ড (১৯৩৩ সালে এর স্বায়ত্তশাসন প্রত্যাহার করা হয়); ৩. ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশ; ৪. বিভিন্ন ধরনের উপনিবেশ, যেমন ব্রিটেনের রাজার সরাসরি শাসিত দেশ বা Crown Colonies. আশ্রিত দেশ বা Protectorates ও জাতিসংঘ হতে শাসনাধিকার প্রাপ্ত দেশ বা Mandated Territories. ডোমিনিয়নসমূহ প্রথমে ব্রিটিশরাজেরই আশ্রিত উপনিবেশ ছিল, পরে এগুলো স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদা লাভ করে। প্রথম মহাযুদ্ধের পর থেকেই ডোমিনিয়নসমূহে স্বাধীনতার দাবি ওঠে। ১৯২৬ সালে অনুষ্ঠিত সাম্রাজ্য সম্মেলন (Imperial Conference)-এ ডোমিনিয়নসমূহকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতাভূক্ত (অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যাপারে স্বাধীনতাসম্পন্ন) স্বায়ত্তশাসিত দেশ বলে স্বীকার করে নেয়া হয়। ১৯৩১ সালের সাম্রাজ্য সম্মেলনে এসব দেশ ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সকল কর্তৃত্ব থেকেও মুক্তি লাভ করে। এই সম্পর্কিত আইন

১৯৩১ সালের ওয়েস্টমিনিস্টার আইন (Statute of Westminster, 1931) নামে খ্যাত। ডোমিনিয়নসমূহ ব্রিটিশরাজকে নিজেদের রাজা বলে স্বীকার করলেও প্রকৃতপক্ষে এগুলো ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র। ১৯৪৭ সালে ভারত উপমহাদেশ ও বার্মাও স্বাধীনতা লাভ করে। পরবর্তী কয়েক দশকে আরও বেশ কয়েকটি উপনিবেশ স্বাধীন হয়ে যায়।

ব্রিটেন উডস (Bretton Woods Agreement)

'ব্রিটেন উডস' একটি অর্থনৈতিক সহযোগিতা বিষয়ক চুক্তি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর সময়ে যুদ্ধবিধ্বস্ত ইউরোপীয় দেশগলোর পনুর্গঠন, আর্থিক সহযোগিতা এবং বিশ্ব অর্থনীতি পরিচালনার নীতি নির্ধারণের জন্য একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন বাণিজ্য সচিব হেনরি মর্গেন-এর আহ্বানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউহ্যাম্পশায়ারের 'ব্রিটেন উডস'-এর মাউন্ট ওয়াশিংটন গোটেলে অনুষ্ঠিত এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনে বিশ্বযুদ্ধের মিত্রশক্তি দেশগুলো যোগ দিয়ে চুক্তি স্বাক্ষর করেন। সম্মেলনের স্থানের নাম অনুসারে চুক্তিটি 'ব্রিটেন উডস চুক্তি' নামে পরিচিত লাভ করে। বিশ্বের ৪৪টি দেশের প্রায় ৭০০ জন প্রতিনিধির ওই সম্মেলনের নামকরণ করা হয় জাতিসংঘ আয়োতি মুদ্রা ও অর্থনীতি বিষয়ক সম্মেলন। এ সম্মেলনের গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক IBRD (বিশ্বব্যাংক) এবং IMF (আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল)। নামক দুটি প্রতিষ্ঠান গঠনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় এবং ১৯৪৬ সালে ২৫ জুন থেকে ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু করে। এ ব্যাংকের কার্যক্রমের সাথে সাথে বিশ্বের শক্তিশালী মুদ্রার সাথে স্বর্ণের বিনিময় হারের পুনঃস্থাপন হয় এবং ১৯৭১ সাল পর্যন্ত এ ব্যবস্থা চালু ছিল। পরবর্তীতে মার্কিন প্রেসিডেন্টের নির্দেশে বিদেশের সরকারগুলোকে সোনা প্রদান বন্ধ করে দিলে তখন থেকে সরকারি রিজার্ভ বৈদেশিক মুদ্রায় হিসাব শুরু হয়।

ব্লক ভোটিং (Block Voting)

একতরফা ভোট দেয়ার প্রবণতাকে ব্লক ভোটিং বলা যায়। বিশেষ করে কোনো জনগোষ্ঠীর একই ধারায় ভোট দেয়ার প্রবণতাকে ব্লক ভোটিং বলে। একজন প্রার্থীকে নির্বিচারে কোনো বিশেষ শ্রেণি, ধর্মীয় সম্প্রদায়, এথনিক গ্রুপ বা অন্য কোনো স্বার্থগোষ্ঠী যখন একটি বিল বা এলাকা বিশেষ ভোট দেয়, তখন তাকে ব্লক ভোটিং বলা যেতে পারে। আইনসভার সদস্যরা কখনো কখনো কোনো ইস্যুর ওপর দলীয় চিন্তা নির্বিশেষে এক সঙ্গে ভোট দেন।

ব্লু-বুক (Blue-Book)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ধারা বিবরণী যে বইতে লিপিবদ্ধ করা হয়, তার মলাট নীল রঙের হওয়ায় এই বইকে বলা হয় ব্লু-বুক। অনুরূপভাবে ইতালির আইনসভার ধারা বিবরণীর পুস্তককে বলা হয় 'গ্রীন বুক'। ফ্রান্স ও চীনে এই পুস্তককে বলা হয় হোয়াইট বুক এবং

জাপানের ডায়েটের ধারা বিবরণীকে বলা হয় গ্রে বুক। বাংলাদেশের জাতীয় সংসদের ধারা বিবরণী সংসদ বুলেটিনে লিপিবদ্ধ থাকে।

ব্ল্যাকমেইল (Blackmail)

ব্ল্যাকমেইল অন্যের ওপর এক ধরনের মানসিক চাপ সৃষ্টি করা। কারও কোনো দুর্বলতা বা অপকর্ম প্রকাশ করে দেওয়া হবে, এরূপ হুমকি দিয়ে ভয়-ভীতি দেখিয়ে উক্ত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সুবিধা অন্যায়ভাবে আদায় করাকেই ব্ল্যাকমেইল করা বলে।

ব্ল্যাকলিস্ট (Black List)

ব্ল্যাকলিস্ট অর্থ হলো কালো তালিকা। এই তালিকা কোনো জাতীয় বা আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রণীত হয়। কোনো অপরাধ বা অপরাধের সাথে জড়িত ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের নাম এই তালিকাভূক্ত করা হয়। ৯/১১ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এই অপরাধের সাথে জড়িত ও সন্দেহজনক কিছু ব্যক্তির ব্ল্যাকলিস্ট তৈরী করে। এই তালিকাভুক্ত ব্যক্তি ও সংগঠনকে দেশ বা পণ্যের ব্যাপারে অবস্থিত সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার প্রদান করা হয় না। এরা সব সময় তালিকাভুক্ত সংশ্লিষ্ট দেশের নজরদারিতে থাকে।

ভয়েস অব আমেরিকা (VOA)

মার্কিন সমরতথ্য বিভাগের সম্প্রচার কেন্দ্র হিসেবে ১৯৪২ সালে এই বেতারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫৩ সাল থেকে এটি ইউএস ইন্টারন্যাশনাল কমিউনিকেশন এজেন্সির (সাবেক মার্কিন ইনফরমেশন এজেন্সি) আন্তর্জাতিক বেতার নেটওয়ার্কের অংশ হিসেবে কর্মরত ছিল। বিদেশে, বিশেষত সাবেক কমিউস্টি দেশগুলোতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জীবনযাত্রা, এর অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির পক্ষে প্রচার চালানোই এর প্রাথমিক লক্ষ্য ও দায়িত্ব ছিল। পরে এর কাজ বা প্রচারের আওতা আরো সম্প্রসারিত হয়। এবং অনুষ্ঠান প্রকৃতিরও পরিবর্তন ঘটে।
১৯৭৯ সালে ভোয়া (VOA) বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বা এলাকায় ১০৯টি ট্রান্সমিটার স্থাপন করে। সপ্তাহে ৩৮টি ভাসায় প্রায় ৪২০ ঘণ্টা এখান থেকে প্রচার করা হয় সংবাদ, কথিকা, সংবাদ বিশ্লেষণ ও সঙ্গীত। এর মধ্যে ২২১ ঘণ্টার ইংরেজি, ৯৮ ঘণ্টা রুশ ও ৬৩ ঘণ্টার চীনা ভাষার অনুষ্ঠান অন্তর্ভুক্ত। 'ভয়েস অব আমেরিক'ার সদর দপ্তর ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

ভলতেয়ার (Francois Marie Arovet de Voltaire)

ভলতেয়ার (১৬৯৪-১৭৭৮) একজন ফরাসি লেখক, দার্শনিক ও ঐতিহাসিক ছিলেন। তিনি ১৭১৭ ও ১৭২৫ সালে সামন্তবাদ বিরোধী ব্যাঙ্গরচনার অপরাধে দুবার গ্রেফতার

হন। তিনি দ্বৈতবাদী বা Diest ছিলেন। তিনি একদিকে নিউটনীয় মেকানিক্স ও পদার্থবিদ্যার সমর্থক ছিলেন এবং অন্যদিকে, মূল কারণস্বরূপ ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে ঈশ্বরকে এক করে দেখতে চাইতেন। তাঁর আত্মার আলাদা সত্তায় বিশ্বাস ছিল না। তিনি চেতনাকে জীবন্ত বস্তুর অন্তর্নিহিত গুণ হিসেবে চিহ্নিত করতেন। তিনি প্রকৃতি সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানে বিশ্বাস, নিরীক্ষা ও অভিজ্ঞতাকে জ্ঞানের উৎস বলে বিবেচনা করতেন এবং লক-এর বস্তুবাদের অনুসরণ করতেন। একই সঙ্গে তিনি 'চূড়ান্ত কারণ' ও 'মহাবিশ্বের স্থপতি'তেও বিশ্বাস করতেন। তিনি সামাজিক রাজনীতিক দিক থেকে সামন্তবাদবিরোধী ছিলেন। তিনি আইনের চোখে সাম্য সম্পত্তির ট্যাক্স, বক্তব্যের স্বাধীনতা ইত্যাদির বলিষ্ঠ প্রবক্তা ছিলেন। তিনি ব্যক্তিগত সম্পত্তির সমর্থক ছিলেন এবং বিশ্বাস করতেন যে, সমাজ অবশ্যম্ভাবীরূপেই ধনী ও দরিদ্রে বিভক্ত হতে বাধ্য। তাঁর মতে সবচেয়ে যুক্তিসঙ্গত রাষ্ট্র হল শাসনতান্ত্রিক রাজতন্ত্র যার প্রধান হবেন একজন বিচক্ষণ রাজা। তিনি জীবন সায়াহ্নে প্রজাতন্ত্রের সমর্থক হয়ে পড়েন। তিনি মনে করতেন যে, 'ইতিহাসের দর্শন' (এই কথাটিও তিনিই প্রথম ব্যবহার করেন)-এর ভিত্তি হল এই যে, ঈশ্বরের ইচ্ছা-নিরপেক্ষভাবে সমাজপ্রগতি এগিয়ে যাবে। কিন্তু, সমাজপ্রগতি বা পরিবর্তনের কারণ হিসাবে তিনি বস্তুগত কারণের বদলে 'চিন্তার পরিবর্তন'-এর ওপরই গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর ব্যঙ্গ রচনার মূল প্রতিপাদ্য ছিল খ্রিস্টান ধর্ম ও ক্যাথলিক গির্জা, কারণ এগুলোকেই তিনি সমাজপ্রগতির প্রধান অন্তরায় বলে গণ্য করতেন। ভলতেয়ার ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন। কিন্তু তাঁর কোনো প্রেরিত পুরুষের ওপর তাঁর (ভলতেয়ারের) বিশ্বাস ছিল না। মোটকথা, ভলতেয়ার ছিলেন পুঁজিবাদ ও পুঁজিবাদী গণতান্ত্রিক দর্শনের অন্যতম স্থপতি।

ভাববাদ (Idealism)

ভাববাদ বস্তুবাদের বিপরীত। ভাববাদ অনুযায়ী, বস্তুর অন্তর্নিহিত ও পারস্পরিক কারণে নয় বরং সর্বশক্তির একজন সৃষ্টিকর্তার ইচ্ছা অনুযায়ীই বিশ্বচরাচরের সৃষ্টি ও বিকাশ সাধিত হয়ে চলেছে। ভাববাদ অনুযায়ী বাহ্য বস্তুসমূহ প্রকৃত নয়, এসব বস্তু ভাবেরই প্রতিচ্ছবিমাত্র। অর্থাৎ প্রকৃতি বা বস্তুর ওপর ভাব বা আত্মাকে স্থাপন করে বলে এবং ভাব বা আত্মাকে বস্তুর সৃষ্টির মূল হিসাবে গ্রহণ করে বলেই এই মতবাদকে বলা হয় ভাববাদ। ভাববাদ অনুযায়ী ১. বিশ্ব আসলে পরমভাবে (Absolute Idea). সর্বজনীন আত্মা বা পরমাত্মা (Universal Spitit), প্রাণশক্তি (Elan Vital) বা সৃজনশীল শক্তি (Creative Force) ইত্যাদিরই প্রতিবিম্ব (Reflection) মাত্র; ২. মনই হল একমাত্র মৌলিক বাস্তব সত্য; আর বাস্তব জগৎ বা প্রকৃতি বা বস্তুর অস্তিত্ব কেবল মনে, ধারণায় বা ভাবে এবং ৩. সৃষ্টি, প্রকৃতি ও তার নিয়মাবলী সম্পর্কে প্রকৃত জ্ঞানলাভ সম্ভব নয়; আর বিজ্ঞান কোনোদিনই প্রকৃতির মূল রহস্য উদ্‌ঘাটন করতে সক্ষম হবে না। মার্কসবাদ অনুযায়ী ভাববাদ শোষক-শাসকেরই আদর্শ; ভাববাদের মাধ্যমেই ধর্মযাজকরা সবকিছুকে ধোঁয়াচ্ছন্ন করে রাখতে সমর্থ হয়। ইমানুয়েল কান্ট (Imanuel Kant), হেগেল (Friedrich Hegel), ফিকটে (Johann Fichte) প্রমূখ ভাববাদী দার্শনিক।

ভাববাদ, পরম (Absolute Idealism)

হেগেল পরম ভাববাদের অন্যতম প্রবক্তা। দার্শনিক হেগেলের মতে, আত্মা ও অনাত্মার (বাহ্যজগতের) পেছনে এক পরমতত্ত্ব (Absolute Idea) রয়েছে এবং তা আত্মা পরমাত্মা বহির্ভূত তৃতীয় পদার্থরূপে নয়, বরং আত্মা পরমাত্মার অন্তর্নিহিত সত্তার মধ্যেই তার অস্তিত্ব। পরম ভাববাদ অনুযায়ী চৈতন্য ও বস্তু পরমভাব বা পরমাত্মারই ক্রমবিকাশ।

ভারত ছাড় আন্দোলন (Quit India Movement)

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস কর্তৃক ইংরেজ সরকারের আশু ভারত পরিত্যাগ ও দেশের পূর্ণ স্বাধীনতার দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলন। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ অধিবেশনের সময় থেকেই কংগ্রেস দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আশঙ্কায় সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে যুদ্ধে ভারতের জড়িয়ে পড়ার বিরোধী ছিল। কিন্তু ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর জনমত এবং বিশেষ করে কেন্দ্রীয় আইনসভার অভিমত না নিয়েই বড়লাট যুদ্ধে ভারতের যোগদানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। সরকারের যুদ্ধনীতির ব্যাখ্যা এবং ভারতকে স্বাধীনতাদানের আশু সম্ভাবনার বিষয়ে ইংরেজ সরকারের সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি না পাওয়ায় এগারোটি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রিসভাসমূহ পদত্যাগ করে। সরকারের সঙ্গে দীর্ঘ বাদানুবাদ ও আপসমূলক আলোচনা নিষ্ফল হয়ে যাওয়ায় গান্ধীজির নেতৃত্বে কংগ্রেস ব্যাপক আইন অমান্যের পথে না গিয়ে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ শুরু করে ১৯৪০ সালের ১৭ অক্টোবর। নেতৃবৃন্দসহ কয়েক সহস্র কংগ্রেস কর্মী পর্যায়ক্রমে কারাবরণ করেন। সত্যাগ্রহফলপ্রসূ না হওয়ায় বছরখানেক পরে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়।

ইত্যবসরে বিভিন্ন দল ও নেতার মধ্যে দেশের পরিবর্তন সম্পর্কে মর্তভেদ প্রবল হয়ে ওঠে। যুদ্ধের পরিস্থিতিও সংকটজনক হয়ে পড়ছিল। বেসামরিক প্রশাসনে অচলাবস্থার দূরীকরণের উদ্দেশে ১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ মন্ত্রিসভার সদস্য সার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ভারতে পাঠানো হয়। ক্রিপসের সঙ্গে ভারতের বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দের আলোচনা-বৈঠক পক্ষকাল পরে নিষ্ফল হয়ে ভেঙে যায়। যুদ্ধোত্তর শাসন সংস্কার সম্পর্কে ক্রপস প্রস্বাত কোনো দলই মেনে নিতে পারেনি, অবশ্য নিজ নিজ কারণে। অবিলম্বে কংগ্রেসের হাতে বেসামরিক ক্ষমতার হস্তান্তরই ছিল কংগ্রেসের প্রধান দাবি; নইলে ব্যাপক আকারে আইন অমান্য আন্দোলন তথা প্রকাশ্য বিদ্রোহ শুরু করা হবে বলে জানানো হয়।

১৪ জুলাই ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গান্ধীজির প্রস্তাবক্রমে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু আন্দোলনের রূপ ও কৌশল সম্পর্কে তাঁর সুস্পষ্ট কোনো ভাবনা-চিন্তা ছিল না। কমিটির অন্যান্য সদস্যরা ছিলেন গান্ধীজির ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। বড়লাট এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষাপটে কংগ্রেস প্রতিনিধিদের সঙ্গে আপস আলোচনার অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর ৭ ও ৮ আগস্ট বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত এ আইসিসি অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির খসড়া প্রস্তাব অনুমোদিত হয়। স্বাধীন

ভারতের শাসনব্যবস্থার প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনার সঙ্গে অহিংসা পথে ভারত ছাড় আন্দোলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

এদিকে ৮ আগস্ট বড়লাটের কার্যনির্বাহী সংসদে গৃহীত এক প্রস্তাবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে যুদ্ধপ্রচেষ্টায় বিপজ্জনক ব্যাঘাত সৃষ্টি ও দেশবাসীর মনোবল বিনষ্ট করে দেবার অভিযোগ করা হয়। ৯ আগস্ট কংগ্রেস দল বে-আইনী ঘোষিত হয়। নেতৃবৃন্দ গ্রেপ্তার হন। ফলে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রবল বিক্ষোভ ও হিংসাত্মক আন্দোলন দেখা দেয়। দেশের পূর্ব সীমান্তে তখন জাপানি ফৌজ হানা দিয়েছে।

আন্দোলনের নামে যা শুরু হয় সেটা ছিল মূলত জনরোষ। অসংগঠিত, পরিকল্পনাবিহীন ও নেতৃত্ব ছাড়াই আন্দোলন নানাভাবে ছড়িয়ে পড়ে। উগ্রপন্থী ও বিপ্লবী বিভিন্ন গোষ্ঠী এবং কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টিসহ বিভিন্ন বামপন্থী দল অহিংসা নীতি পরিহার করে। একদিকে সরকারি দমননীতি ও ব্যাপক ধরপাকড়, অন্যদিকে প্রবল জনবিক্ষোভ। দেশের প্রায় সর্বত্র প্রাকাশ্য বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। মহারাষ্ট্রের কয়েকটি অঞ্চল, উত্তরপ্রদেশের পূর্বাংশ, উত্তর বিহার, বঙ্গদেশের তমলুক মহকুমায় জাতীয় সরকার গঠিত হয়। মাদ্রাজ, বোম্বাই ও মধ্যপ্রদেশে যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও কলকারখানায় দীর্ঘদিন ধরে ধর্মঘট চলে। স্বাধীন সরকার ও তার বেতারকেন্দ্র কোনো কোনো স্থানে গড়ে ওঠে। পুলিশ ও সামরিক বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষে সহস্রাধিক ব্যক্তি নিহত ও তিন সহস্রাধিক ব্যক্তি আহত হন।

সংগঠনের অভাবে ভারত ছাড় আন্দোলন কয়েক মাস মাসের মধ্যেই স্তিমিত হয়ে যায়। প্রথমদিকে আন্দোলনের পেছনে কার্যত বামপন্থীরাই ছিলেন সক্রিয়। আন্দোলনের অভীষ্ট লক্ষ্যে সিদ্ধিলাভ হয়নি বলে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির নেতা আচার্য নরেন্দ্র দেব মন্তব্য করেন। তার কারণ হিসেবে আন্দোলনের বিশিষ্ট নেতা জয়প্রকাশ নারায়ণ জেল থেকে মুক্তির পর বলেন যে কুশল সংগঠন ও জনসমক্ষে কর্মসূচি তুলে ধরার অভাবে আন্দোলন ব্যর্থ হয়ে যায়।

ভারত মহাসাগর (*Indian* Oceam)

পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম মহাসাগর সমগ্র বিশ্বের ২০ শতাংশ জলরাশি এই মহাসগার ধারণ করে আছে। এর আয়তন ৭,৩৫,৫৬,০০০ বর্গ কিলোমিটার বা ২,৪৮,০০,০০০ বর্গমাইল। গড় গভীরতা ৪,০০০ মিটার বা ১৩,১২৩ ফুট। গভীরতম অংশ জাভা পরিখার (trench) গভীরতা হলো ৭,২২৭ মিটার বা ২৫,৩৫১ ফুট। এই মহাসাগরের পানির সর্বোচ্চ উষ্ণতা ৩০ সেলসিয়াস। ভারত মহাসাগরের উত্তরে এশিয়ার দক্ষিণ অংশ পশ্চিমে আরব উপদ্বীপ ও আফ্রিকা, পূর্বে মালয় উপদ্বীপ, সুন্দা দ্বীপ আর অস্ট্রেলিয়া এবং দক্ষিণে অ্যান্টার্কটিকা বা কুমেরু মহাদেশ। এই মহাসাগরের উত্তরাংশ দক্ষিণ ভারতের স্থলভাগ দিয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে পশ্চিমে আরব সাগর ও পূর্বে বঙ্গোপসাগর সৃষ্টি করেছে। এছাড়াও এডন উপসাগর, পারস্য উপাসগর, আন্দামান সাগর ও গ্রেট অস্ট্রোলিয়ান ব্রাইট এই মহাসাগরের অংশ। ভারত মহাসাগরের বৃহত্তম দ্বীপ হলো

মাদাগাস্কার ও শ্রীলংকা। অন্যান্য প্রধান দ্বীপের মধ্যে মালদ্বীপ, সিচেলিস, মরিশাস, আন্দামানসা- নিকোবর, চাগোস, সকোত্রা, লাক্ষাদ্বীপ, সেন্ট পল উল্লেখযোগ্য। মৌসুমী বায়ুপ্রবাহ এই মহাসাগরের বৈশিষ্ট্য। এর সাগর-উপসাগরের মধ্যে বঙ্গোপসাগর ও আন্দামান সাগর সবেচেয়ে বেশি উত্তাল ও ঝঞ্ঝাবিক্ষুদ্ধ। মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে বছরের প্রায় যেকোনো সময় এখানে ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাসের সৃষ্টি হয়। ভারত মহাসাগরের প্রায় সর্বত্রই প্রচুর মাছ পাওয়া যায়। আরব সাগর ও দক্ষিণ-পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার নিকটবর্তী অঞ্চলে এ লবণাক্ততা সবচেয়ে বেশি অর্থাৎ ৩.৬ শতাংশের ও অধিক। ১৪০০ সালের আগ পর্যন্ত ইউরোপ থেকে ভারত মহাসাগরে জাহাজ আসত আফ্রিকা হয়ে। ১৮৬৯ সালে সুয়েজখাল চালু হবার পর ভূমধ্যসাগর ও ভারত মহাসাগরের মধ্যে সরাসরি সামুদ্রিক পথ স্থাপিত হয়।

ভারত-চীন যুদ্ধ (India-China War)

১৯৬২ সালে ভারত-চীন যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে নেহেরুর নেতৃত্বাধীন ভারত সমাজতান্ত্রিক চীনের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয়। ১৯৬২ সালের ২০ অক্টোবর ভোর চারটায় এ যুদ্ধ আরম্ভ হয়। যুদ্ধ চীন পূর্ব ও পশ্চিম উভয় সীমান্তে ২৪,০০০ বর্গ কিমি এলাকা দখল করে নেয়।

ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) (Bharatiya Janata Party)

১৯৮০ সালের সপ্তম লোকসভা নির্বাচনের পর জনতা পার্টি থেকে বেরিয়ে আসা প্রাক্তন জনসঙ্ঘীদের নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি গঠিত হয়। ভারতীয় জনতা দলের পরিচালন ব্যবস্থার সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব হলো দলের জাতীয় সম্মেলন। এই সম্মেলন থেকে কার্যকরী সমিতি বা কমিটি গঠিত হয়। পার্টির সর্বোচ্চ পদাধিকারী সভাপতি। তাকে সাহায্য করেন একাধিক সহ-সভাপতি। তাছাড়া আছেন সাধারণ সম্পাদক। তিনি পার্টির প্রধান কার্যনির্বাহী। দলের রাজ্য শাখার প্রধান হলেন সভাপতি এবং কার্যনির্বাহী প্রধান হলেন সাধারণ সম্পাদক। ভারতীয় রাজনীতিতে বিজেপির উত্থান একটি নাটকীয় ঘটনা। ১৯৮৪ সালে প্রথমবারের মতো নির্বাচনে অংশ বিজেপি লোকসভায় আসন লাভ করে মাত্র ২টি। কিন্তু ১৯৯৯ সালে অনুষ্ঠিত ত্রয়োদশ লোকসভায় তাদের আসন ১৮৩টিতে জয়লাভ করে সর্বভারতীয় দলে পরিণত হয়। বর্তমানে বিজেপি ভারতের ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত আছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস (Indian National Congress)

প্রথম ও প্রধান সর্বভারতীয় রাজনৈতিক দল। ১৮৮৫ সালের ২৮ ডিসেম্বর বোম্বাইতে প্রধানত অ্যালান অকটেভিয়ান হিউম (১৮২৯-১৯২১) নামে একজন অবসরপ্রাপ্ত সিভিলিয়ানের উদ্যোগে আহুত প্রথম সম্মেলনে কংগ্রেস (সংক্ষেপে) প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সভাপতিত্ব করেন ব্যারিস্টার উমেশচন্দ্র ব্যানার্জী। কংগ্রেসের চারটি উদ্দেশ্যের কথা

তিনি বলেন : ১. বিভিন্ন প্রদেশে দেশোন্নয়নে যুক্ত ব্যক্তিদের পারস্পরিক সংযোগ ; ২. জাতিধর্মবর্ণের উর্ধ্বে ঐক্যসাধান ; ৩. আলোচনার মাধ্যমে দেশের নানাবিধ সমস্যার সমাধানের পথ নিরূপণ ও ৪. রাজনৈতিক উন্নয়নে পরবর্তী বছরের নীতিনির্ধারণ। ৭২ জন প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পশ্চাৎপট সম্পর্কে বিভিন্ন অভিমতআছে তার অন্যতম হলো যে প্রারম্ভিক প্রয়াস হিসেবে বোম্বাই, মাদ্রাজ ও বঙ্গদেশে যেসব আঞ্চলিক দল গঠিত হয়েছিল সেগুলোর সমন্বয়ে একটি সর্বভারতীয় দল গঠনের চিন্তা অনেকের মনে দেখা দেয় ; বাস্তবে সেটাই রূপায়িত করেন হিউম। তিনি চেয়েছিলেন নিয়মতান্ত্রিক পথে সরকারের সমর্থনে লোকের রাজনৈতিক চেতনা ও সংঘবদ্ধতা গড়ে তুলতে। হিউমকে পরোক্ষ উৎসাহ দেন ভাইসরয় লর্ড ডাফরিন। কংগ্রেসের প্রথম বাইশ বছর (১৮৮৫-১৯০৮) হিউম তার জেনার‍্যাল সেক্রেটারি ছিলেন। পুরোমাত্রায় রাজভক্তি থাকা সত্ত্বেও কংগ্রেস প্রতিষ্ঠা ইংল্যান্ডের অনেকের মনে একটি বিদ্রোহের সংকেত বলে মনে হয়েছিল। কংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পূর্ব ইতিহাসসূত্রে একথাও বলা হয় যে সুরেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে কলকাতায় ১৮৮৩ খ্রি. ভারত সভা (ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন)-এর আমন্ত্রণে যে জাতীয় সমিতির (ন্যাশনাল কনফারেন্স) অধিবেশন হয় সেটি বঙ্গের বিভিন্ন রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের বিবর্তনধারায় উদ্ভূত হয়। তাতে অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিরাও যোগদান করেন। ১৮৮৫ খ্রি. বোম্বাইতে প্রথম কংগ্রেস অধিবেশনের একদিন পূর্বে কলকাতায় জাতীয় সমিতির দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। জাতীয় সমিতি ছিল কংগ্রেসের আদর্শ। অচিরেই জাতীয় সমিতি কংগ্রেসের সঙ্গে মিশে যায়।

জাতীয় আন্দোলনের ধারক ও বাহক কংগ্রেসের প্রাক-স্বাধীনতা আমলের ইতিহাস মোটামুটি চারটি পর্যায়ে বিভক্ত:

১. ১৮৮৫-১৯০৪। নরমপন্থী (মডারেট) ও নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পর্ব।
২. ১৯০৫-১৯২০। চরমপন্থীদের উত্থান, স্বদেশী ও হোম রুল আন্দোলন। রৌলটি আইন ও সত্যাগ্রহ। জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড। মন্টফোর্ড শাসন সংস্কারের মাধ্যমে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকারের আংশিক স্বীকৃতি।
৩. ১৯২০-১৯২৯। গান্ধী প্রদর্শিত খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন। স্বরাজ্য দলের উত্থান। পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ।
৪. ১৯৩০-১৯৪৭। আইন অমান্য আন্দোলনল লবণ সত্যাগ্রহ। ভারত ছাড় আন্দোলন।

কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সরকারের কাছে দাখিলের জন্য নয়টি সুপারিশ গৃহীত হয়। তন্মধ্যে নিম্নলিখিত পাঁচটি উল্লেখযোগ্য :

১. ভারতের শাসনব্যবস্থার উন্নয়নকল্পে তদন্তের জন্য একটি রয়াল কমিশন নিয়োগ ; ২. সেক্রেটারি অব স্টেটের পরামর্শ সভার অবলুপ্তি ; ৩. কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভাগুলোর ক্ষমতাবৃদ্ধি ও অধিকতর ভারতীয় সদস্য নিয়োগ ; ৪. ভারতের সামরিক ব্যয় হ্রাস ও ইংল্যান্ডের সঙ্গে সমহারে ব্যয়বণ্টন ; ৫. উচ্চপদে কর্মচারী

নিয়োগকালে ভারত ও ইংল্যান্ডে একযোগে পরীক্ষা গ্রহণ ও প্রার্থীর ন্যূনতম বয়স বৃদ্ধি করা।

সরকারের কংগ্রেসের সুপারিশগুলো অগ্রাহ্য করেন। তা হলেও দেশের ক্রমবর্ধিষ্ণু রাজনৈতিক চিন্তা ও চেতনায় সেগুলো সাড়া জাগা। কংগ্রেসের কলকাতায় অনুষ্ঠিত দ্বিতীয় অধিবেশন যথার্থ প্রতিনিধিত্বমূলক হয়; উপস্থিতির সংখ্যা ছিল ৪৩৪ জন। সভাপতিত্ব করেন দাদাভাই নওরোজি। এবারও কয়েটি আবেদনমূলক সুপারিশ গৃহীত হয়। দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি বিশেষ করে দারিদ্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। মাদ্রাজে ১৮৮৭ খ্রি কংগ্রেসের তৃতীয় অধিবেশন হয়। সভাপতি ছিলেন বদরুদ্দীন তৈয়বজি। এই অধিবেশনে স্থির হয় যে কংগ্রেসের কর্মসূচি ও আলোচ্য বিষয়সমূহের খসড়া প্রস্তুতির জন্য একটি ছোট সমিতি গঠিত হবে। উত্তরকালে সেটাই বিষয় নির্বাচনী সমিতিতে পরিণত হয়। দলের একটি নিয়মাবলি প্রস্তুতিরও সিদ্ধান্ত হয়েছিল, কিন্তু সেটা পরবর্তী দু,দশক কালেও সম্পন্ন হয়নি। বদরুদ্দিন তৈয়বজি দেশের মুসলমান সম্প্রদায়কে কংগ্রেসে যোগদানের আহ্বান জানানা। কিন্তু সৈয়দ আহমদ, কলকাতার আমির আলি প্রমুখ প্রভাবশালী ব্যক্তির প্রতিবন্ধকতায় সে-আহ্বান বিশেষ ফলপ্রসূ হয়নি।

আবেদন-নিবেদনের মধ্যে দিয়েই বার্ষিক অধিবেশন সাঙ্গ হত। সারা বছর কংগ্রেসের আর কোনো কাজ থাকত না। যে কারণে বঙ্কিমচন্দ্র, বিবেকানন্দ, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ অনেকেই কংগ্রেসের সমালোচনা করেন। পশ্চিমা শিক্ষিত উচ্চবিত্ত, কিছু মানুষের মধ্যে কংগ্রেস আবদ্ধ থাকায় হিউম প্রস্তাব করেন যে অতঃপর জন-আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে জনসাধারণকে উৎসাহিত করে তুলতে হবে। ফলে ইংরেজ আমলাবর্গ আরও রুষ্ট হয়ে পড়েন। কারণ সরকার কংগ্রেসকে ইংরেজ-শাসনের বিরোধী বলে মনে ক্ষমতা। অবশ্য কংগ্রেসের বিভিন্ন প্রস্তাবের আংশিক স্বীকৃতি ১৮৯২ খ্রি. কাউন্সিল সংস্কারের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়।

কংগ্রেসের অনুসৃত এতদিনকার নিরুত্তাপ কর্মপন্থায় লোকে ক্রমেই অধৈর্য হয়ে পড়েছিল-নবীনপন্থীদের মধ্যে একটা উগ্র জাতীয়তাবাদী মনোভাব গড়ে উঠতে শুরু করেছেল, যার পেছনে ছিল স্বামী বিবেকানন্দের আধ্যাত্মিক পুনর্জাগরণের আদর্শ এবং মহারাষ্ট্রে টিলকের নেতৃত্বে মুক্তি-আন্দোলনের অনুরূপ কর্মপন্থা। বিপ্লবী চিন্তার পরিচয় অলবিন্দু ঘোষের 'ইন্দুপ্রকাশ' পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাগুলোতে (১৮৯৩-৯৪) ফুটে ওঠে। উনিশ শতকের শেষ দশক থেকে চরমপন্থী চিন্তার বিস্তার ঘটে। মহারাষ্ট্র ও বঙ্গের 'জাতীয়তাবাদী' নামে পরিচিত কর্মীরা মডারেট (নরমপন্থী) নীতির বিপরীত সংগ্রামী কর্মসূচির ভিত্তিতে কংগ্রেসেরই ভেতর থেকে ১৯০৬ সালে প্রকাশ্যে একটি গোষ্ঠী গঠন করেন।

নরমপন্থীরা আবেদন-নিবেদনের মধ্য দিয়ে ইংরেজেরই পক্ষপুটে ঔপনিবেশিক স্বায়ত্তশাসনের প্রবর্তন চাইতেন। তাঁদের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শ উদারনৈতিক মনোভাব, তথ্যনির্ভর চিন্তা ও বাস্তববোধের প্রাধান্য ছিল। নওরোজি, সুরেন্দ্রনাথ

ব্যানার্জী, ফিরোজশাহ, মেটা, গোপালকৃষ্ণ গোখলে প্রমুখ নেতৃবৃন্দ তাদের পুরোভাগে ছিলেন। পক্ষান্তরে লাজপত রায়, বাল গঙ্গাধর টিলক, বিপিনচন্দ্র পাল (লাল-বাল-পাল) ও অরবিন্দ প্রমুখ চরমপন্থীরা ছিলেন খাঁটি স্বাদেশিকতায় অনুপ্রাণিত; তাঁরা হিন্দু পুনর্জাগরণে পরিমিশ্রিত করেন।

বোম্বাই কংগ্রেসে (১৯০৪) চরমপন্থীদের অস্তিত্ব প্রথম অনুভূত হয় ; তাঁরা চেয়েছিলেন জাতীয় আবেগের ভিত্তিতে আরও প্রত্যক্ষ ও সংগ্রামী কর্মপন্থা ; কিন্তু তখন তাঁরা সংখ্যায় নগণ্য, শক্তিতে ক্ষীণ। কলকাতা কংগ্রেসে (১৯০৬) চরমপন্থীরা অধিবেশন ছেড়ে বেরিয়ে এলেও তাঁদের চাপে চারটি বিষয়ের অনুমোদনে নরমপন্থীরা সম্মত হন, যথা স্বরাজ, জাতীয় শিক্ষা, স্বদেশি পণ্যের ব্যবহার ও বিদেশি বস্ত্র বয়কট। সুরাট কংগ্রেসে (১৯০৭) নরম ও চরমপন্থীদের বিরোধ চরম আকার ধারন করে। বঙ্গভঙ্গ (১৯০৫) বিরোধী আন্দোলনের ফলে দেশের যুবশক্তি সন্ত্রাসবাদ ও বিপ্লবী কর্মনীতি গ্রহণ করে। সরকারি দমননীতি ও নিপীড়নও বৃদ্ধি পায়। অরবিন্দ কারারুদ্ধ হন। টিলক বর্মায় কারারুদ্ধ, লাজপৎ ও বিপিনচন্দ্র পাল দেশ থেকে নির্বাসিত হন। সরকার ফৌজদারি আইন সংস্কার ও চরমপন্থী রাজনৈতিক নেতাদের গ্রেপ্তার করে (১৯০৮)। এরপর মর্লে-মিন্টো শাসনব্যবস্থা (১৯০৯) প্রবর্তিত হয়।

সুরাট অধিবেশনের (১৯০৭) পর কংগ্রেসে ভাঙন ধরেছিল। চরমপন্থী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যেমন নষ্ট হয়ে গিয়েছিল, তেমনই নরমপন্থী চালিত কংগ্রেস হীনবল হয়ে পড়েছিল। কিন্তু ১৯১৬ খ্রি লখনৌ কংগ্রেসে আবার ঐক্য দেখা দেয়। নরম ও চরমপন্থীদের মধ্যে সৌহার্দ ফিরে আসে। এই সময় টিলক ও অ্যানি বেসান্ত প্রবর্তিত হোম রুল আন্দোলন-এর ফরে বেসান্তের ওপর অন্তরীণ আদেশ জারি হয়। তখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) চলছিল, দেশের জাতীয় চেতনাও ক্রমশ উন্মোচিত হচ্ছিল। নরমপন্থী নেতৃত্বের শক্তিও ক্ষীণ হয়ে এসেছিল। জাতীয় আন্দোলনের মতো ও পথও নতুনতর রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯১৯ সালে রৌলাট আইন, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যা ও মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কারের ত্রিবিধ অভিঘাতে জাতীয়তাবাদী শক্তি নবোদ্যমে দানা বাঁধে।

১৯২০ খ্রি মহাত্মা গান্ধী খিলাফত ও অসহযোগ আন্দোলন শুরু করেন। 'সহযোগিতা বর্জন নীতি'র অন্যতম বিষয় জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন, সালিশি আদালত প্রতিষ্ঠা ও কাউন্সিল বর্জন নীতি চিত্তরঞ্জন দাশ, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ অনেকে প্রথমে মেনে নিতে পারেননি। কংগ্রেসের ওই বছরে নাগপুর অধিবেশনের পর অসহযোগ আন্দোলন ব্যাপক হয়ে ওঠে। স্কুলকারেজ বর্জন, বিদেশি পণ্য বয়কট প্রভৃতি বিষয়ে রবীন্দ্রনাঠ সমালোচনা করেন। চৌকিচৌরা হত্যাকাণ্ড (১৯২২) ও বিপথগামিতার জন্য গান্ধী অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন। গয়া কংগ্রেসে (১৯২২) সভাপতি চিত্তরঞ্জন দাশ কাউন্সিল প্রবেশের প্রস্তাব করেন। সে প্রস্তাব নাকচ হয়ে যায় ও কংগ্রেসের ভেতর অসহযোগ নীতির পক্ষে ও বিপক্ষে দুটি প্রবল গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। বিপক্ষ গোষ্ঠীর প্রধান নেতা চিত্তরঞ্জন, মোতিলাল নেহরু, লাজপত রায় কংগ্রেসেরই ভেতর স্বরাজ পার্টি গঠন করেন। ১৯২৪ সালে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় স্বরাজ পার্টি সংখ্যাগরিষ্ঠতা

অর্জন করে। কোকোনাদ কংগ্রেসে (১৯২৩) স্থির হয় যে স্বরাজ পার্টি কংগ্রেসের অঙ্গ হিসেবে কাউন্সিলে তার কর্মসূচি অনুসরণ করে চলবে। কুড়ির দশকের মাঝামাঝি সময়ে কংগ্রেস তথা জাতীয় আন্দোলনে ভাটা পড়ে। তবে এই দশকে বামপন্থী শক্তির প্রসার ঘটে। ট্রেড ইউনিয়নের ক্রমবিস্তার ও কৃষক আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। মানবেন্দ্রনাথ রায় বার্লিন থেকে পত্রপত্রিকা ও চিঠিপত্রের মাধ্যমে এবং দূত মারফৎ ভারতে কমিউনিস্ট আন্দোলন সংগঠিত করেন।

১৯২৭ সালে ব্রিটিশ সরকার প্রেরিত সাইমন কমিশন বিরোধী আন্দোলনের ফলে কংগ্রেস আবার প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ওই বছরে কংগ্রেসের মাদ্রাজ অধিবেশনে জওহরলাল-এর প্রস্তাবে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সময়ের কিছু আগে জওহরলাল ইউরোপে সমাজতন্ত্রীদের সম্মেলনে যোগদান ও সোভিয়েত দেশ ভ্রমণ করে নতুন উদ্যম নিয়ে স্বদেশে ফিরে আসেন, পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাবে গান্ধীজির সায় ছিল না। তাই পরবর্তী কলকাতা অধিবেশনে (১৯২৮) কংগ্রেস ডোমিনিয়ন স্টেটার্স অর্জনের সিদ্ধান্ত নেয়। ব্রিটিশ সরকারের অনমনীয়তা ও যুবকর্মীদের অসন্তোষের ফলে লাহোর অধিবেশনে (১৯২৯) পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়। গান্ধীজি বড়লাট আরউইনের কাছে ১১ দফার একটি দাবি সনদ প্রেরণ করেন (৩০ জানুয়ারি ১৯৩০)। সেগুলো ছিল মাদকবস্তু নিষিদ্ধকরণ, ১৬ পেন্সে ১ টাকার বিনিময় হার প্রবর্তন, ভূমি রাজস্বের ৫০ শতাংশ হ্রাস, লবণ শুল্ক রদ, ৫০ শতাংশ সামরিক ব্যয় হ্রাস, সরকারি ব্যয় ও আমলাদের বেতন হ্রাস, বিদেশি বস্ত্রের ওপর আমদানি শুল্ক আরোপ, উপকূলবর্তী পরিবহণে কেবল ভারতীয় জাহাজ ব্যবহার, রাজবন্দিদের মুক্তি ও ইন্ডিয়ান পেনাল কোডের সংশোধন, গোয়েন্দা বিভাগের অবলুপ্তি ও আগ্নেয়াস্ত্র রাখার অধিকার প্রদান।

সরকার উল্লিখিত দাবিসমূহ মানতে অস্বীকার করেন। ১৯৩০ সালের ২ মার্চ তারিখের এক চিঠিতে গান্ধীজি সত্যাগ্রহ ও আইন অমান্য আন্দোলন শুরু করবেন বলে জানান। ১২ মার্চ তিনি ৭৮ জন সঙ্গীকে নিয়ে লবণ আইন ভাঙার জন্য ডান্ডি অভিমুখে পদযাত্রা শুরু করেন। অতঃপর সারা দেশে লবণ আইন ভঙ্গ শুরু হয়ে যায়। গান্ধী গ্রেপ্তার হন। মধ্যস্থদের প্রয়াসে গান্ধী এবং ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা ১৯৩১ সালের ২৫ জানুয়ারি জেল থেকে মুক্তি পান। বড়লাট আরউইনের সঙ্গে কংগ্রেস নেতাদের আলোচনার পর ৫ মার্চ গান্ধি-আরউইন চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। তাতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে ছিল সাত দফা চুক্তিতে সমস্ত রাজবন্দির মুক্তি, অর্ডন্যান্সগুলোর প্রত্যাহার, বাজেয়াপ্ত সম্পত্তি মালিকদের প্রত্যার্পণ এবং কিছু কিছু অঞ্চলে লবণ আইন শিথিল হবে। কংগ্রেস সত্যাগ্রহ প্রত্যাহার করে।

২৩ মার্চ ১৯৩১ বিপ্লবী ভগৎ সিং, শুকদেব ও রাজগুরুর ফাঁসি হয়। ২৯ মার্চ করাচিতে অস্বস্তিকর পরিবেশে কংগ্রেসের অধিবেশন বসে। মৌলিক রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থা সংক্রান্ত প্রস্তাবাবলি গৃহীত হয়। এরপর গান্ধীজি লন্ডনে দ্বিতীয় রাউন্ড টেবল কনফারেন্সে যোগদান করেন। গান্ধীজির বক্তব্য বিশেষ করে পূর্ণ

স্বাধীনতার দাবি ফলপ্রসূ হয়নি। ১৯৩২ সালের ১০ জানুয়ারি ওয়ার্কিং কমিটি আইন অমান্য আন্দোলনের ১২ দফা কর্মসূচি গ্রহণ করে। সরকার সত্যাগ্রহীদের গ্রেপ্তার করে দমননীতি চালায়। ১৯৩২ সালে এপ্রিল পর্যন্ত ৮০,০০০ সত্যাগ্রহী গ্রেপ্তার হন। তার মধ্যে ৫০০০ জন ছিলেন নারী সত্যাগ্রহী।

ইতিমধ্যে ৪ অগস্ট ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী র‍্যামসে ম্যাকডোনাল্ড পুরানো সম্প্রদায়ভিত্তিক পৃথক নির্বাচক মণ্ডলীর নীতি বজায় রেখে হরিজনদের জন্যও ওই একই প্রথা প্রসারের সরকারি সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। গান্ধীজির তখন পুনরায় কারারুদ্ধ। নব্যনীতির প্রতিবাদে ২০ সেপ্টেম্বর থেকে আমরণ অনশন শুরু করেন। ২৫ সেপ্টেম্বর জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও তফসলিদের মুখপাত্র বি আর অম্বেডকরের সমবেত প্রচেষ্টায় মিটমাট হয়। হরিজনদের জন্য প্রস্তাবিত আসনসংখ্যা দ্বিগুণ নির্ধারিত হয়, কিন্তু যৌথ নির্বাচকমণ্ডলীর ভিত্তিতে। এদিকে আইন অমান্য আন্দোলনও চলছিল। সরকারি দমনমূলক ব্যবস্থা তীব্র হয়ে ওঠে। গান্ধীজি ১৯৩৩ সালের ৮ মে তারিখ থেকে আত্মশুদ্ধিকল্পে অনশন শুরু করেন। ওই দিনই সরকার তাঁকে জেল থেকে মুক্তি দেয়। জেলের বাইরে তিনি আমরণ অনশন চালিয়ে যান। ১৪ জুলাই আইন অমান্যের গণ-আন্দোলন মূলতুবি রেখে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহ চালানোর সিদ্ধান্ত হয়। সে অধিকার কেবল গান্ধীকেই দেওয়া হয়। তাতে কংগ্রেসের যুবকর্মীরা রুষ্ট হন। ১৯৩৪ সালের মে মাসে পাটনায় অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে নিয়মতান্ত্রিক পথ অনুসরণ ও নির্বাচনে অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত হয়।

১৯৩৪ সালের শেষদিকে গান্ধীজি কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করে হরিজনদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে ব্রত হন। ভারত শাসন আইন (১৯৩৫) অনুযায়ী ১৯৩৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়ে মন্ত্রিসভা গঠন করে। নির্বাচন অংশগ্রহণ ও মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট জওহরলাল ও বামপন্থী গোষ্ঠীসমুহের আপত্তি ছিল। ব্যতিক্রম মানবেন্দ্রনাথ, তিনি চাইতেন আইনসভার ভেতরে থেকে অচলাবস্থার সৃষ্টি। গান্ধীজির প্রভাব ও বড়লাটের হস্তক্ষেপ না করার প্রতিশ্রুতি দেবার ফলে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়। ১৯৩৪ সালের মে মাস থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের কোনো সংগ্রামী ভূমিকা ছিল না। বামপন্থীরা চাইতেন আন্দোলন অবিলম্বে শুরু হোক, কিন্তু সংগ্রামবিমুখ গান্ধীজির নেতৃত্বে। মানবেন্দ্রনাথ চাইতেন গান্ধী ও দক্ষিণপন্থীদের বিকল্প বাম নেতৃত্ব গড়ে তুলতে। ১৯৩৯ সালে দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচিত হয়ে সুভাষচন্দ্র যখন গান্ধীজির মতামত অনুসারে ওয়ার্কিং কমিটি গঠনে ব্যর্থ হন, তখন মানবেন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্রকে নিজ ক্ষমতা ও পরিস্থিতি অনুযায়ী অগ্রসর হবার পরামর্শ দেন। সুভাষচন্দ্র তার পরিবর্তে পদত্যাগ করে ফরওয়ার্ড ব্লক গড়লেন। রায় গুলিগ অব র‍্যাডিক্যাল কংগ্রেসমেন গড়লেন। ১৯৩৯ সালে অক্টোবরে কংগ্রেস সাতটি প্রদেশ থেকে মন্ত্রিসভা প্রত্যাহার করে নেয় সরকারের যুদ্ধনীতির প্রতিবাদে। এ ব্যাপারেও মানবেন্দ্রনাথ বলেছিলেন যে প্রাদেশিক শাসকের ক্ষমতায় থেকে ইংরেজদের সঙ্গে সংগ্রাম বেশি কার্যকর হবে। মন্ত্রিসভা ছাড়ার ফলে

ইংরেজ সরকার মুসলিম লিগের ওপর যুদ্ধের প্রয়োজনে নির্ভর করতে বাধ্য হয়। লিগের তখন শক্তি ও সমর্থন ছিল নগণ্য।

দ্বিতীয় বিশ্ব মহাযুদ্ধে কংগ্রেস প্রথম দিকে দ্বিধাগ্রস্ত ছিল। জওহরলাল, আজাদ প্রমুখ কিছু নেতা নিঃশর্তে ফ্যাসিবিরোধী মিত্রশক্তির পক্ষ গ্রহণের সমর্থক ছিলেন। গান্ধী দোলাচল চিন্তায় আশু স্বাধীনতার দাবিতে ব্যক্তিগত সত্যাগ্রহের নির্দেশ দিলেন। অনেক নেতাই গ্রেপ্তার হলেন। কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, কমিউনিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল দ্বিতীয় বিশ্ববিশ্বযুদ্ধকে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ হিসেবে বিচার করে মুক্তি সংগ্রামের পক্ষপাতী ছিলেন। যুদ্ধের সুযোগে ও বৈদেশিক সাহায্যের আশায় সুভাষচন্দ্র জার্মানি চলে যান এবং পরে জাপানের সাহায্যে আজাদ হিন্দ ফৌজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। যুদ্ধের ফ্যাসিবিরোধী চরিত্রে বিশ্বাসী মানবেন্দ্রনাথ মিত্রপক্ষকে সমর্থন করেন। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের পরাজয় বিশ্বে গণতন্ত্রের সমাধি রচনা করবে এবং জয় হলে যুদ্ধের শেষে ভারতের জাতীয় স্বাধীনতা অনিবার্য বলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন। মিত্রপক্ষকে অনুরূপ সমর্থনের পক্ষপাতী ছিরেন রবীন্দ্রনাথ, শ্রীঅরবিন্দ, রাজাগোপালাচারি, অম্বেডকর প্রমুখ ব্যক্তি।

১৯৪২ সালের মার্চ মাসে ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধে কংগ্রেসের সহযোগিতার আশায় স্ট্যাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতে পাঠান। শাসনব্যবস্থায় অধিকতর সুযোগ-সুবিধা সংবলিত যেসব প্রস্তাব ক্রিপস উপস্থাপিত করেন সেগুলো নিয়ে কংগ্রেস মুসলিম লিগ, হিন্দু মহাসভা প্রভৃতি দল পৃথকভাবে ক্রিপসের সঙ্গে সবিস্তারে আলোচনা করেন। কিন্তু যুদ্ধ সমাপ্তির পূর্বে যথার্থ ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা না থাকায় ক্রিপসের সঙ্গে কংগ্রেসের আলোচনা ভেঙে যায়। ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নেওয়ার জন্য মানবেন্দ্রনাথ জওহরলালকে অনুরোধ করেছিলেন। সে অনুরোধ রক্ষিত হয়ে যুদ্ধোত্তর ভারত বিভাগ হয়তো এড়ানো যেত। ১৯৪২ সালের ৮ আগস্ট বোম্বাইতে নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনে অবিলম্বে দেশব্যাপী অহিংসা সংগ্রাম শুরু করার সিদ্ধান্ত এবং গান্ধীকে সেই 'ভারত ছাড়' আন্দোলন পরিচালনের নেতৃত্ব দেওয়া হয়। এদিকে জাপানি বাহিনী তখন পূর্ব সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করছে। ইংরেজ সরকার কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ সমেত ষাট হাজার ব্যক্তিকে কারারুদ্ধ করেন। মাস তিনেক পরে আন্দোলন স্তিমিত হয়ে পড়ে। জয়প্রকাশ নারায়ণের উক্তি অনুযায়ী প্রস্তুতি, পরিকল্পনা ও নেতৃত্বের অভাবে ভারত ছাড় কার্যত ব্যর্থ হয়ে যায়। ১৯৪৪ সালের মে মাসে গান্ধীজি মুক্তি পান। অন্যরা যুদ্ধ শেষ হবার পর মুক্ত হন। তার অনতিকাল পরে আজাদ হিন্দ ফৌজের সেনানীদের বিচার ও নৌবিদ্রোহ সূত্রে দেশে প্রবল আন্দোলন দেখা দেয়। ১৯৪৬ সালের গোড়ায় সাধারণ নির্বাচনে কংগ্রেস সফল হয়, কিন্তু মুসলিমদের সংরক্ষিত আসনে লিগ সাফল্য লাভ করে।

যুদ্ধের পর ব্রিটেনের নির্বাচনে শ্রমিক দল ক্ষমতাসীন হয়। ১৯৪৫ সালের জুন মাসে নতুন ভাইসরয় লর্ড ওয়াভেল সিমলায় এক সর্বদলীয় বৈঠকে বড়লাটের একজিকিউটিভ কাউন্সিলের পুনর্গঠনের প্রস্তাব দেন। কংগ্রেস ও লিগের ঐক্যমত্যের অভাবে ওয়াভেল প্রস্তাব ভেস্তে যায়। ১৯৪৬ সারের ২৩ মার্চ ব্রিটেন সদস্যের এক ক্যাবিনেট মিশন

ভারতে আসে এবং দীর্ঘমেয়াদী একটি ফেডারেশন গঠন ও অন্তর্বর্তীকালীন সরকার-এই দুই ধরনের শাসন ব্যবস্থার প্রস্তাব করে, মিশনের প্রস্তাবানুসারে ১৯৪৬ সালের জুলাই মাসে গণপরিষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়। ক্যাবিনেট মিশনের মূল প্রস্তাবে লিগের খুব বেশি আপত্তি ছিল না। কিন্তু জওহরলাল এক সাংবাদিক সম্মেলনে মূল প্রস্তাবের দীর্ঘমেয়াদী ফেডারেশনের বিষয় গণপরিষদে নিষ্পত্তি হবে বলে মন্তব্য করায় লিগ রুষ্ট হয়ে অন্তর্বর্তীকালীন সরকারে যোগদান থেকে বিরত থাকে এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি গ্রহণ করে। ফলে দেশব্যাপী তীব্র সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। অবশেষে অক্টোবরে লিগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়, কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী প্রস্তাব অনুসারে গণপরিষদের ব্যাপার প্রদত্ত সম্মতি প্রত্যাহার করে। ডিসেম্বর মাস থেকে গণপরিষদ বসে, লিগ তাতে যোগ দেয়নি। ওয়াভেল, নেহরু, জিন্না ও বলদেব সিং সেক্রেটারি অব স্টেটের আমন্ত্রণে লণ্ডনে যান। লিগ দেশবিভাগের দাবি তোলে। কংগ্রেস আপত্তি জানায়।

১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী অ্যাটলি ভারতে পরবর্তী বছরের মধ্যে শাসক্ষমতা হস্তান্তরের কথা ঘোষণা করেন। মার্চ মাসে ওয়াভেলের জায়গায় ভাইসরয় পদে মাউন্টব্যাটে যোগ দেন এবং জুন মাসে ঘোষণা করেন যে ১৫ আগস্ট তারিখে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রে দেশ বিভক্ত হবে। কংগ্রেস সে প্রস্তাব মেনে নেয়। স্বাধীন গান্ধীজি প্রস্তাব করেন যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক আদর্শ চরিতার্থ হয়ে যাবার পর দলের অস্তিত্ব বজায় রাখা নিষ্প্রয়োজন, কংগ্রেস তুলে দিয়ে তার সদস্যদের গঠনমূলক কাজে আত্মনিয়োগ করা বাঞ্ছনীয়। গান্ধীর সে নির্দেশ নিষ্ফল হয়।

কংগ্রেস এযাবতকাল একটি প্ল্যাটফর্ম হিসেবে কাজ ক্ষমতা। অতঃপর তার মতাদর্শ ও সাংগঠনিক শৃঙ্খলা নষ্ট হতে শুরু কবে। কমিউনিস্ট ও কংগ্রেস সোসালিস্ট ও অন্যান্য বামপন্থী দল কংগ্রেস থেকে পৃথক হয়ে যায়। প্রায় একই সময়ে কংগ্রেসে ব্যক্তিত্বের লড়াই, গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব ও আদর্শগত সংঘাত মাথা চাড়া দেয়। আচার্য কৃপালনী, প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ, রফি আহমেদ কিদোয়াই প্রমুখ প্রবীণ নেতারা সর্দার প্যাটেলের একাধিপত্যে পর্যুদস্ত হয়ে কংগ্রেস ছেড়ে কৃষক-প্রজা মজদুর পার্টি গঠন করেন। প্যাটেলের মৃত্যুর (১৯৫১) পর জওহরলালের একাধিপত্যের অধ্যায় শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের কংগ্রেসের আবাদি অধিবেশনে সমাজতান্ত্রিক ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার কর্মসূচি গৃহীত হয়। জওহরলাল তাঁর পথকে নিষ্কণ্টক করার জন্য কামরাজ প্ল্যান নাম দিয়ে কিছু সংখ্যক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীকে গতিচ্যুত করেন।

১৯৬৬ সালে শুরু হয় ইন্দিরা যুগ। মোরারজি দেশাইকে প্রতিহত করর জন্য কামরাজ্যের নেতৃত্বে সিন্ডিকেট নামে অভিহিত কিছু সংখ্যক নেতার এক গোষ্ঠী ইন্দরাকে প্রধানমন্ত্রী ও মোরারজিকে উপপ্রধানমন্ত্রী করেন। মোরারজির অর্থদপ্তর সরিয়ে নিয়ে ইন্দিরা ১৯৬৯ সালের জুলাই মাসে ১৪টি ব্যাঙ্ক জাতীয়করণ করেন। অতঃপর কংগ্রেস প্রেসিডেন্ট নিজলিঙ্গাপ্পা তথা সিন্ডকেটের সঙ্গে ইন্দিরার বিরোধ শুরু হয়। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। ইন্দিরা বিরোধী সিন্ডিকেট

নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস থেকে তাকে রাষ্ট্রপতি পদে কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী সঞ্জীব রেড্ডির পরাজয়ের জন্য ১৯৬৯ সালের ১২ নভেম্বর বহিষ্কৃত করে। কিন্তু দুই তৃতীয়াংশ সমর্থনের অভাবে লোকসভায় তাঁর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা যায়নি। অচিরে কংগ্রেস দল বন্ধনীতে সংগঠন ও ইন্দিরা সমর্থকেরা বন্ধনীতে শাসকদল হিসেবে দু টুকরো হয়ে যয। লোকসভা ভেঙে দিয়ে ১৯৭১ সালের নির্বাচনে গাইবাছুর প্রতীক চিহ্নে ইন্দিরা নিরঙ্কুশ ক্ষমতা লাভ করেন। সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে ইন্দিরা বিরোধী পরিবেশ প্রবল হয়ে ওঠে। শ্রীমত্তী গান্ধী ১৯৭৫ সালের ২৬ জুন দেশে এমার্জেন্সি ঘোষণা করেন এবং ১৬ জুলাই তেকে বিশ দফা এক কর্মসূচি গ্রহণ করেন। ১৯৭৭ সালের নির্বাচনে দিল্লীর মসনদ থেকে কংগ্রেস প্রথম ক্ষমতাচ্যুত হয়। ইন্দিরাবিরোধী কংগ্রেসের যে অংশ বন্ধনীতে সংগঠন শব্দটি ব্যবহার ক্ষমতা অর্থাৎ কংগ্রেস (স) সেটি নবগঠিত জনতা পার্টিতে মিশে গিয়েছিল। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে ক্ষমতাচ্যুত ইন্দিরা পক্ষীয় কংগ্রেসের (শাসক) সভাপতি ব্রহ্মানন্দ রেড্ডি লোকসভায় দলের সাংসদেরা ছিরেন ইন্দিরার পক্ষে। প্রধানত তাদের নিয়ে দিল্লিতে ১৯৭৮ খ্রি ২ জানুয়ারি এক জাতীয় কনভেনশনে অপর একটি কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। ইন্দিরা তার সভাপতি পদে নির্বাচিত হন। ইন্দিরার নাম বন্ধনীতে যুক্ত হয়ে দলের নামকরণ হয় কংগ্রেস (ই)। নির্বাচন কমিশন থেকে স্বীকৃতি ও নির্বাচনী প্রতীক পাঞ্জা চিহ্ন প্রদত্ত হয়। ১৯৮০ সালের জানুয়ারি ৩৩ মাস পরে কংগ্রেস (ই) লোকসভায় দু-তৃতীয়াংশ গরিষ্ঠতা পেয়ে ইন্দিরার নেতৃত্বে সরকার গঠন করে।

১৯৪৮ সালের ৩১ অক্টোবর দেহরক্ষীদের হাতে ইন্দিরা নিহত হবার পর তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী হন। তাঁর প্রধানমন্ত্রিত্বে কংগ্রেস (ই) ১৯৮৯ খ্রি. নভেম্বর মাস অবধি কেন্দ্রীয় শাসনক্ষমতায় থাকে। তারপর ১৯৯১ খ্রি. জুন অবধি প্রায় উনিশ মাস ছেদ পড়ে। জুলাই মসে ক্ষমতাচ্যুত হয়ে কংগ্রেস দ্বিতীয়বার ক্ষমতায় ফিরে এল, এবারে অবশ্য সংখ্যাগষ্ঠিতা ছাড়াই। সর্বস্মমতিক্রমে প্রধানমন্ত্রী পদে নির্বাচিত হয়েছে দক্ষিণ ভারতীয় পি. ভি. নরসিমা রাও। কংগ্রেস যে শুধু একটি পারিবারিক কুক্ষি থেকে বেরিয়ে এসেছে তাই নয়, দেশের ভগ্নপ্রায় অর্থনৈতিক জীবনের পুনরুজ্জীবনের জন্য নেহরুপন্থী সমাজতন্ত্রী পথ কার্যত পরিত্যাগের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

জাতীয় স্বাধীনতার পর কংগ্রেস থেকে অনেক গোষ্ঠী ও প্রবীণ ব্যক্তি দল ত্যাগ করে নতুন দল তৈরি করেন। অথবা ভিন্ন দলে যোগ দেন। কিন্তু ১৯৬৯ সালের ইন্দিরা গান্ধী যখন কংগ্রেসে ভাঙন ধরান, তখন তাঁর গোষ্ঠী ছিল শাসক গোষ্ঠী এবং সেটাই ক্রমে জাতীয় কংগ্রেসে পরিণত হয়। এরপর যাঁরা ভাঙন ধরান তাঁরা কংগ্রেসের পরিচিতি হারান। ১৯৭৭ সালে জগজীবন রামের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস ফর ডেমোক্রেসি গঠিত হয় সেটি পরে জনতা পার্টির মিশে যায়। ১৯৭৮ সালে দেবরাজ আরসের নেতৃত্বে যে কংগ্রেস গটিত হয় সেটি পরে কংগ্রেস (স) নামে অস্তিত্ব রাক্ষ করে। ১৯৮৮ সালে ভি পি সিং, অরুণ নেহরু, আরিফ মহম্মদ প্রমুখ নেতারা কংগ্রেস ছেড়ে জনমোর্চা গঠন করেন ও জনতা দরে যোগ দেন। ১৯৯৫ সালের বিভিন্ন রাজ্যে কংগ্রেসের বিক্ষুব্ধ বহু

গোষ্ঠীর উদ্ভব হয়। অর্জুন সিঙ ও নারায়ণ দত্ত তেওয়ারির নেতৃত্বে পালটা এক গোষ্ঠী নিজেদের আসল কংগ্রেস হিসেবে দাবি করছে। তাতেও কিছু অনৈক্যের লক্ষণ ফুটে উঠছে। তবে দল ও শাসনক্ষমতা নিজেদের হাতে না থাকায় তাদের পাল্লা বেশি ভারী নয়।

ভারতীয় পার্লামেন্ট (Indian Parliament)

ভারতের কেন্দ্রীয় আইনসভা সংসদ বা পার্লামেন্ট নামে পরিচিত। ভারতীয় সংসদ একটি দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভা। লোকসভা হলো নিম্নকক্ষ। ভারতের জনগণের প্রতিনিধিত্বমূলক কক্ষ। উচ্চকক্ষ বা পরিষদ হলো ভারতের পার্লামেন্টের নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা বা The House of the People. স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ভারতের পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। উচ্চকবের নাম রাজ্যসভা আর নিম্নকক্ষ লোকসভা। লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৫। এর মধ্যে ৫৪৩টি আসল নির্বাচিত এবং ২টি মনোনীত। রাষ্ট্রপতির কাছে যদি মনে হয় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের প্রতিনিধিত্ব সংসদে হয়নি তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে দুজনকে মনোনীত করেন। ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৪২৩টি সাধারণ শ্রেণিভুক্ত। ৭৯টি সিডিউল কাস্ট এবং ৪১টি সিডিউল ট্রাইবেদের জন্য সংরক্ষিত। সিডিউল কাস্ট ও ট্রাইবেদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে কেবল সংশ্লিষ্ট কাষ্ট ও ট্রাইবের সস্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে নির্বাচনী এলাকার সকল ভোটার ভোট দিতে পারেন। রাজ্যগুলোর মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাতে আসন বণ্টন করা হয়েছে। লোকসভার মেয়াদ ৫ বছর। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে লোকসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন। ১৮ বছর বয়স্ক লোক ভোটার হন। ২৫ বছর বয়স্ক যে কোনো ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তবে নির্বাচনী এলাকায় তাকে কমপক্ষে ১৮০ দিন বসবাস করতে হয়। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে লোকসভা ও রাজ্যসভা বা রাজ্যবিধান সভার সদস্য থাকতে পারেন না। ভারতের রাজনীতির মূল প্রবাহ লোকসভাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। লোকসভা আইন প্রণয়নে ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল লোকসভায় উত্থাপিত হয়। লোকসভার আস্থাভাজন নেতা প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী ও তার মন্ত্রিসভা সরকার পরিচালনা করে। লোকসভার আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। রাষ্ট্রপতি লোকসভা আহবান করেন। স্পিকার এতে সভাপতিত্ব করেন।

ভারতের দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট আইনসভার উচ্চকক্ষ হলো রাজ্যসভা। এর সদস্য সংখ্যা ২৫০। ২৩৮টি আসন ২৮টি রাজ্য ও ৭টি ইউনিয়ন অঞ্চলের জন্য। বাকি ১২টি আসন রাষ্ট্রপতি কর্তৃক মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা পূরণ করা হয়। রাষ্ট্রপতি শিল্পকলা ও বিজ্ঞান বিশেষ অবদান রেখেছেন এমন ব্যক্তিদের মধ্য থেকে এবং আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব হচ্ছে না এমন জনগোষ্ঠী থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এ ১২টি আসনে মনোনয়ন দান করেন। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ। এর সদস্যরা ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি দুই

বছর পর এক-তৃতীয়াংশ আসনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য বিধানসভার সদস্যরা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। রাজ্যসভার সভাপতিত্ব করেন উপ-রাষ্ট্রপতি। রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচনী কলেজে রাজ্যসভার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি (Communist Party of India-CPI)

১৯১৭ সালের রাশিয়া বিপ্লব ভারতের বিপ্লবীদের মধ্যেও এক নবজাগরণের উন্মেষ ঘটায়। ১৯২০ সালের ১৭ অক্টোবর মস্কো প্রবাসী শ্রীমানবেন্দ্রনাথ রায় (এম.এন. রায়) রাশিয়ার তাসখন্দে কতিপয় ভারতীয় বিপ্লবীদের এক সমাবেশে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ৭ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করেন। এই কমিটির চেয়ারম্যান এম.এন. রায়, সম্পাদক মোহাম্মদ শফিক সদস্যরা হলেন। অন্যান্য সদস্যবৃন্দঃ এম. এন. রায়ের আমেরিকান পত্নী ইভেলিন রায়, অবনী মুখার্জী, তদীয় রুশ স্ত্রী রোজা ফিটিংগাস, মোহাম্মদ আলী ও এম.পি.বি.টি. আচার্য্য। এ ব্যাপারে সমসাময়িক কালে দ্বিতীয় উদ্যোগটি গ্রহণ করেন প্যান-ইসলামিক খিলাফত আন্দোলনের নেতা মোহাম্মদ আলি, রহমত আলি খান, ফিরোজউদ্দিন মনসুর, আবদুল মজিদ ও সন্তোষ সিং প্রমুখ। এই উদ্যোগই ভারতের বাইরে ছিল। যাঁরা ভারতের ভেতরে এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ করেন, তাঁরা হলেন বোম্বেতে এস.এ. ডাঙ্গে, মাদ্রাজে সিঙ্গারভেলু চেট্টিয়ার এবং বাংলায় মুজাফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ। এম.এন. রায় এ সকল উদ্যোগের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। ১৯২৫ সালের ডিসেম্বর মাসে কানপুরে নতুনভাবে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি গঠিত হয় এবং এই কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক যথাক্রমে এস.ভি. ঘাটে ও কে.এন. যোগলেকার নির্বাচিত হন। আর. এস. নিম্বকর ও মুজাফ্‌ফর আহমদ প্রমুখ সদস্য ছিলেন। ১৯২৯ সালে এম.এন. রায় যুগপৎ ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও কমিউনিস্ট ইন্টারন্যাশনাল (কমিনটার্ন) থেকে বহিস্কৃত হন। অবনী মুখার্জী একজন আন্তর্জাতিক প্রতারক (Imposter) হিসাবে চিহ্নিত হন। বলাবাহুল্য প্রথম উদ্যোক্তাদের কেউই শেষ পর্যন্ত পার্টির সঙ্গে যুক্ত থাকেননি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে কমিউনিস্ট পার্টি দত্ত ব্রাডলি থিসিসের দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং ফলে ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে যথার্থ ভূমিকা পালন করতে ব্যর্থ হয়। ভারতবর্ষ বিভক্ত হওয়ার পর এক পর্যায়ে কমিউনিস্ট পার্টিও বিভক্ত হয়ে যায়। পরবর্তীকালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি, সি.পি.আই., সি.পি.আই. (এম.), সি.পি.আই (এম.এল) ও বহুসংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রুপে বিভক্ত হয়ে পড়ে। অবশ্য সিপিআই (এম) ভারতের কয়েকটি রাজ্যে প্রভাব বজায় রাখতে ও রাজ্য সরকারে অধিষ্ঠিত হতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানে এই আন্দোলন প্রায় বিলুপ্তই হয়ে যায়। বাংলাদেশেও ভারতের অনুরূপ অসংখ্য কমিউনিস্ট দলে উপদলের সৃষ্টি হয় এবং অনেকটা তাৎপর্যহীন হয়ে পড়ে।

ভারসাম্য (Equilibrium)

'ভারসাম্য' বা 'ইকুইলিব্রিয়াম' শব্দটি ল্যাটিন 'ইকুয়াস' ও 'লিব্রা' এই দু'টি শব্দ থেকে উদ্ভূত হয়েছে। 'ইকুয়াস' শব্দের অর্থ হল 'সমান' এবং 'লিব্রা' শব্দের অর্থ হল 'সম-

ভার'। সুতরাং 'ইকুইলিব্রিয়াম' শব্দটির দ্বারা দুই পরস্পরবিরোধী বস্তু বা শক্তির সাম্যাবস্থা বা স্থিতাবস্থাকে বোঝায়। 'ভারসাম্য' বলতে এমন একটি অবস্থাকে বোঝায় যেখানে পৌঁছলে অর্থনৈতিক কার্যাবলীর পরিবর্তনের কোন প্রবণতা থাকে না। কোন ব্যক্তি, উৎপাদনকারী বা শিল্প-প্রতিষ্ঠান যখন এমন একটি অবস্থায় উপনীত হয় যখন তাদের মধ্যে পরিবর্তনের কোন উৎসাহ বা প্রবণতা থাকে না সেই অবস্থাকেই 'ভারসাম্য' বলা হয়।

ভারসাম্যের তত্ত্ব (Theory of Balance)

ভারসাম্যেও তত্ত্বানুযায়ী সমাজ প্রগতির মূলকথা শ্রেণিসংগ্রাম নয়, বরং সমাজের বাহ্যিক দ্বন্দ্ব ও পরিবেশগত কারণসমূহ। কোঁতে, কাউটস্কি, বোগদানভ, বুখারিন প্রমুখ ছিলেন এই তত্ত্বের প্রবক্তা। এই তত্ত্ববিদদের মতে বিভিন্ন শ্রেণিস্বার্থের মধ্যে সমন্বয়সাধন এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণ সম্ভবপর।

ভার্সাই চুক্তি (Versaille Pact)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে ফ্রান্সের ভার্সাই নগরীতে ১৯১৯ সালের ২৮ জুন বিজয়ী রাষ্ট্রসমূহ এবং পরাজিত রাষ্ট্র জার্মানির মধ্যে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যা ভার্সাই চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির প্রথম অংশ লীগ অব নেশনস-এর ভিত্তি স্থাপন করে। আর চুক্তির দ্বিতীয় অংশ অনুযায়ী জার্মানি বিপুল এলাকা অন্য রাষ্ট্রকে ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। আলসাস-লোরেইন ফ্রান্সের হস্তগত হয়; ইউক্রেন, মালমেডি, বেলজিয়ামের হাতে; আপার সাইলেশিয়ার অংশবিশেষ, পোসেন এবং পশ্চিম প্রুশিয়া পোল্যান্ডের হাতে; মেসেল বন্দর ও তার পশ্চাদভূমি লিথুনিয়ার কাছে; হালচিন চেকোস্লোভাকিয়ার হাতে; এবং সেলজউইনের অংশ ডেনমার্কের অন্তর্ভূক্ত হয়। এই চুক্তিতে আরও স্থির হয় যে, ডানজিগের ওপর থেকে জার্মান সার্বভৌমত্ব বিলুপ্ত হবে। জার্মান-অস্ট্রিয়া সংযুক্তির পরিকল্পনা আপাতত বাতিল হবে, জার্মানি এক লক্ষের বেশি সৈন্য রাখতে পারবে না, জার্মান নৌবহরে ছয়টি যুদ্ধজাহাজ এবং সে-অনুযায়ী ক্রুজার ও ড্রেস্ট্রয়ার ছাড়া সাবমেরিন বা আর কোনো যুদ্ধজাহাজ ব্যাবহার করবে না। তাছাড়া জার্মানি কোনো জঙ্গিবিমান বা ভারী কামানও রাখতে পারবে না এবং কোনো দূর্গাদিও নির্মাণ করতে পারবে না। এছাড়াও রাইনল্যান্ড ১৫ বছর যাবত বিজয়ীদের দখলে থাকবে, সার আন্তর্জাতিক এলাকা হবে, জার্মান নদীসমূহ আন্তর্জাতিকীকৃত হবে, এবং জার্মান উপনিবেশসমূহ বিজয়ীদের মধ্যে বাঁটোয়ারা হবে বলেও চুক্তিতে সাব্যস্ত হয়। এভাবে, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ক্ষয় ক্ষতির যাবতীয় দায়দায়িত্ব জার্মানির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়া হয়। সর্বোপরি, ১৯২১ সালে এই চুক্তি মোতাবেক সাব্যস্ত হয় যে, জার্মানি ৬৬০ কোটি পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দেবে। স্বভাবতই এই চুক্তি জার্মানির জন্য শুধু চরম অবমাননাকরই ছিল না, জার্মান অর্থনীতির জন্যও এটা ছিল দূর্বিসহ। ১৯৩২ সালে জার্মানি ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। ১৯৩৩ সালে হিটলার ক্ষমতায় আসেন এবং ১৯৩৫ সালেই ভার্সাই

চুক্তিকে বাতিল ঘোষণা করেন। ১৯৩৯ সালের মধ্যেই জার্মানি তার হাতছাড়া হওয়ার প্রায় সকল এলাকাই পুনঃদখল করে নেয়। অনেকে মনে করেন যে, ভার্সাই চুক্তির শর্তাবলীর দরুনই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ অনেকটা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছিল।

ভার্সাই (Varsie)

ভার্সাই হল উত্তর ফ্রান্সের একটি অন্যতম শহর। এই শহরটি ফ্রান্সের রাজধানী পেরিসের নিকটে অবস্থিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯১৯ সালের ২৮ জুলাই এই স্থানে মিত্র শক্তি ও জার্মানির মধ্যে শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মূলত এই চুক্তিটির মাধ্যমে জার্মানিকে বিভক্ত করা হয়েছিল এবং এই চুক্তিটি বিজিত রাষ্ট্রের ওপর বিজয়ী রাষ্ট্রের চাপিয়ে দেয়া চুক্তি ছিল।

ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন (Vladimir Putin)

রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক দল নামে ১৮৮১ সালে একটি বিপ্লবী দল গড়ে উঠেছিল। এই দলের উদ্দেশ্য ছিল পৃথিবীর সব দেশের ধনীদের হাত থেকে দেশ শাসনের ক্ষমতা কেড়ে নিয়ে কৃষক ও শ্রমিকদের প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠা করা। দেশের কোনো লোক খুব ধনী হতে পারবে না, একজন লোকও গরিব থাকবে না, সকলেই উপার্জন করার, লেখাপড়া শেখার ও সুখে-শান্তিতে বাস করার সুযোগ পাবে। সমাজের সব লোকের মঙ্গলের জন্য এই দল কাজ করবে বলেই এর নাম হয়েছিল সমাজতান্ত্রিক দল। এই সমাজতান্ত্রিক দলের সবচেয়ে বড় নেতা ছিলেন কমরেড লেনিন। লেনিনের প্রকৃত নাম ভ্লাদিমির ইলিচ উলিয়ানভ (Vladimir Ilyich Ulyanov)। কমরেড লেনিনের নেতৃত্বেই রাশিয়ায় সংঘটিত ঐতিহাসিক বিপ্লব এবং সেখানে অত্যাচারী জার শাসনকে উৎখাত করে প্রতিষ্ঠিত হয় সমাজতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা।

কমরেড লেনিনের জন্ম হয়েছিল ১৮৭০ সালের ২২ এপ্রিল তারিখে, ভলগা (Volga) নদীর তীরে অবস্থিত সিমবির্স্ক (Simbirsk) শহরে। পরে লেনিনের সম্মানে এই শহরটির নতুন নাম দেয়া হয় উইলিয়াম ভস্ক। এক সাধারণ ঘরে জন্ম হয়েছিল লেনিনের। লেনিনের বাবা উলিয়া নিকোলায়েভিচ ছিলেন সিমবির্স্ক শহরের একজন স্কুল-পরিদর্শক। লেনিন ছিলেন বাড়ির তৃতীয় সন্তান। হইহুল্লোড়ে ওস্তাদ এক দুরন্ত ছেলে। সদাচঞ্চল হালকা পাতলা গড়নের বাদামি রঙের চোখদুটো নিয়ে সারাদিন ঘুরে বেড়াতেন বাড়ির সর্বত্র।

তাঁর মায়ের জবানি থেকে জানা যায়—শিশুকালে কোনো খেলনা পেলেই তা ভেঙে ফেলার ব্যতিক ছিল তাঁর। পাঁচ বছর বয়সে মায়ের তত্ত্বাবধানেই লেখাপড়া শুরু হয় লেনিনের। তাঁর মেধা ছিল অত্যন্ত প্রখর। একেবারে শিশুকালে অনেক বড় বড় কবিতাও মুখস্থ করে ফেলতেন। এছাড়া বাল্যকাল থেকে তিনি মিথ্যা কথাকে অত্যন্ত ঘৃণা করতেন। তাঁর এই মিথ্যার প্রতি বিতৃষ্ণা নিয়ে একটি চমৎকার গল্প প্রচলিত আছে। একবার তিনি মায়ের সঙ্গে গিয়েছিলেন তাঁদেরই এক আত্মীয়ের বাড়িতে

বেড়াতে। সেই বাড়িতে গিয়ে তিনি নিজের অনিচ্ছায় একটি দামি কাচের কুঁজো ভেঙে ফেলেছিলেন। কেউ দেখেনি ওটা কে ভেঙেছে। তারপর বড়রা এসে যখন জিজ্ঞেস করলেন সবাইকে, ওটা কে ভেঙেছে, তখন সব ছেলেমেয়েই 'আমি না' 'আমি না' বলে চিৎকার দিয়ে উঠল। তখন লেনিনও তাদের সাথে 'আমি না' বলতে বাধ্য হলেন। কিন্তু বাড়িতে ফিরে এসে এই মিথ্যে কথা বলার যন্ত্রণা তিনি ভুলতে পারলেন না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলেন। মা জিজ্ঞেস করলে তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেনঃ 'আমি তখন সত্যিকথা বলতে পারিনি মা। কাচের কুঁজোটা আসলে আমিই ভেঙেছি।' মা ছেলেকে বুঝিয়ে শান্ত করলেন। কিন্তু এ থেকেই প্রমাণিত হয়, তিন মিথ্যেকে কতখানি ঘৃণা করতেন। নয় বছর বয়সে লেনিন প্রথম স্কুলে ভর্তি হন। আগেই বলেছি, তিনি ছিলেন খুবই মেধাবী। সবচেয়ে বড় কথা হলো, বাল্যকাল থেকেই তিনি যা-কিছু করতেন, অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে করতেন। কাজ করার ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার ব্যাপারেও ছিল তার প্রচণ্ড আগ্রহ। তারপর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যখন স্নাতক ডিগ্রি নিয়ে বেরিয়ে আসেন, তখন তাঁর মধ্যে এই অধ্যবসায় গুণটি চরিত্রের এক বিশেষ লক্ষণ হিসেবে দেখা দেয়। লেনিন যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, তখন দ্বিতীয় আলেকজান্ডারকে হত্যা করার ষড়যন্ত্রে লেনিনের বড়ভাই জড়িত থাকার অভিযোগে গ্রেফতার হন এবং তাঁর ফাঁসি হয়। তাছাড়া আরও অনেকে এই অভিযোগে নানাভাবে দণ্ডিত ও নিগৃহীত হন। এই ঘটনা লেনিনের মনে প্রচণ্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করে। তাঁর মন থেকে জার-সরকারের প্রতি বিষিয়ে ওঠে। তিনি বিপ্লবী দলে যোগদান করেন। লেনিনের বড়ভাইকে যখন ফাঁসি দেওয়া হয় তখন লেনিন কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে (University of Kazan) আইনশাস্ত্র নিয়ে পড়াশোনা করছিলেন।

কিন্তু ভাইয়ের মৃত্যুতে তাঁর মন প্রচণ্ডরকম ভেঙে পড়ে। তিনি কাজান বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা ছেড়ে দেন। পরে ১৮৯০ সালে সেন্ট পিটার্সবার্গ বিশ্ববিদ্যালয় (St Peterburg University) থেকে বহিরাগত ছাত্র হিসেবে ল (Law) পরীক্ষা দিয়ে পাস করেন। আইন পড়ার সময় থেকে তিনি মার্কসবাদ পড়তে শুরু করেন। কার্ল মার্কসের সমস্ত রচনা পড়তে থাকেন এবং বিপ্লবীদের দলে যোগদান করেন। আইন পাস করে এসে ২৩ বছর বয়সে তিনি বারে যোগদান করেছিলেন। কিন্তু ওকালতি ব্যবসা তাঁর হলো না। সব ছেড়ে দিয়ে সার্বিকভাবে জড়িয়ে পড়লেন বিপ্লবী সংগঠনের সঙ্গে। নাম লেখালেন মার্কসবাদী গোপন সংগঠন সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটিস (Social Democrats) দলের সঙ্গে। শুধু দলে যোগ দেওয়া নয়, অচিরেই তিনি দলের একজন শীর্ষস্থানীয় নেতা হয়ে ওঠেন। লেনিনদের পরিবারের প্রতি আগে থেকেই পুলিশের নজর ছিল। তাঁর বড়ভাই ছিলেন জারবিরোধী সংগঠনের সদস্য। এরপর লেনিন নামের এই তুখোড় ছেলেটি কী করছে, কোথায় কোথায় যায়, তার জন্যও পুলিশ লেগে ছিল তাঁর পেছনে। এই গোপন সংগঠন থেকে মেমোরিস (Memories) নামে একটি পুস্তিকা বিতরণ করা হত। পুস্তিকা বিতরণের সার্বিক দায়িত্ব ছিল লেনিনের ওপর। তাঁদের সংগঠনের নিয়মত বৈঠক হত কোনো গোপন আড্ডায়। এখানে সমাজতান্ত্রিক আদর্শ সম্পর্কে তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা,

কার্যক্রম এবং দেশে একটি সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটানোর বিষয়ে আলোচনা হত। এই গোপন বৈঠকের নাম ছিল প্যানকেক টিস (Pancake Teas)।

পুলিশের চোখকে ফাঁকি দেওয়ার জন্য এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হত একেক সময় একেক স্থানে অত্যন্ত সংগোপনে। এইসব গোপন বৈঠকে লেনিন তাঁর দলের সদস্যদেরকে সমাজতন্ত্র সম্পর্কে শিক্ষা দিতেন। তাঁদের কী করণীয় তা বুঝিয়ে দিতেন। কিন্তু পুলিশের চোখ এড়িয়ে থাকা তাঁর পক্ষে বেশিদিন সম্ভব হলো না। পুলিশের হাত থেকে আত্মরক্ষা করার জন্য তিনি দেশ থেকে পালিয়ে প্রথমে ১৮৯৫ সালে গেলেন বার্লিনে। সেখানে মূলত গিয়েছিলেন চিকিৎসার জন্য। অসুখ ভালো হয়ে যাওয়ার পর বার্লিনেই শুরু করেন তাঁর সমাজতান্ত্রিক কর্মতৎপরতা। গড়ে তোলেন সংগঠন। সেখান থেকে গমন করেন জেনেভায়। জেনেভায় গিয়েও তিনি গঠন করেন একটি সংগঠন রাশিয়ান সোশ্যাল ডেমোক্র্যাসি (Russain Social Democracy)। এর কিছুদিন পরে তিনি আবার ফিরে আসেন রাশিয়াতে। তখনও পুলিশ তাঁর পেছনে লেগে ছিল। দেশে আসার পর পরই ধরা পড়েন পুলিশের হাতে। ফলে সাতাশ বছর বয়সে তিনি তিন বছরের জন্য সাইবেরিয়ায়া নির্বাসিত হলেন। সাইবেরিয়াতে নির্বাসিত থাকার সময়ে তিনি একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন— *দি ডেভেলপমেন্ট অব ক্যাপিটালিজম ইন রাশিয়া* (The Development of Capitalism in Russia) এরপর ১৮৯৭ সালে তিনি আরেকটি গ্রন্থ রচনা করেন— *দি হিস্টোরি অব ট্রেড ইউনিয়জম* (The History of TRade Unionism)। তিন বছর পরে সাইবেরিয়া থেকে মুক্তিলাভের পর তিনি আবার চলে গেলেন সুইজারল্যান্ডে। ১৯১৭ সালের মার্চ মাসের ঐতিহাসিক ঘটনা। এই সময় সেন্ট পিটার্সবার্গে এক বিরাট ধর্মঘট হয়। সারাদেশ জার-সরকারের বিরুদ্ধে নেমে যায় আন্দোলনে। এই ধর্মঘট ও বিপ্লবের নেতৃত্ব দিচ্ছিল সমাজতান্ত্রিক দল। কিন্তু রাশিয়ার ভেতরে যাঁরা নেতা ছিলেন তাঁদের পক্ষে এত বড় বিপ্লব সামাল দেওয়া সম্ভব ছিল না। লেনিন তখন সুইজারল্যান্ডের জুরিখে নির্বাসিত জীবন যাপন করেছিলেন। খবর পেয়ে তিনি তাড়াতাড়ি চলে এলেন রাশিয়ায়। সমাজতন্ত্রীরাও উপযুক্ত নেতা পেয়ে এবার আরও শক্তিশালী হয়ে উঠল। লেনিন রাশিয়ায় এসে সব অবস্থা ভালো করে আগে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর গুছিয়ে নিলেন নিজের দল। সংগ্রহ করা হলো গোলাবারুদ। তার পরই ১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বিপ্লবীরা রাজধানী সেন্ট পিটারবার্গ দখল করে ফেলল। সৈন্যরাও বিপ্লবীদের সাথে যোগ দিল। এই বিপ্লব শুধু রাজধানী নয়, ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশময়। লেনিন ইতোমধ্যেই ঘোষণা করে দিলেন— দেশের সমস্ত জমি হচ্ছে কৃষকদের। কৃষকরা সব জমিদারবাড়ি লুট করে নিজেরাই সব ভাগ করে নিল। লেনিন এবার যুদ্ধ বন্ধ করার দিকে মনোযোগ দিলেন। তিনি তাঁর প্রধান সহকারী ট্রটস্কিকে পাঠিয়ে দিলেন জার্মানির সাথে বন্ধু করতে। কিন্তু গণতান্ত্রিক দেশ ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স তবু ষড়যন্ত্র করে দেশে গোলযোগ সৃষ্টি করল।

ট্রটস্কি চার লাখ লালফৌজকে নিয়ে গিয়ে বিদ্রোহ দমন করেন। ১৯১৭ সালের নভেম্বর মাসে বিপ্লব আরম্ভ হওয়ার পর তার অবসান হয় ১৯২০ সালে। বিপ্লবীরা রাশিয়ায়

সর্বশেষ জার দ্বিতীয় নিকোলাসকে ১৯১৮ সালের ১৮ জুলাই সপরিবারে হত্যা করে। জার বংশ হয় সমূলে উচ্ছেদ। বিপ্লবের অবসান হওয়ার পর ১৯২২ সালে রাশিয়ায় এক নতুন ধরনের সরকার গঠিত হয়। লেনিন হলেন এই সরকারের প্রধান। নিয়ম হয়, এখন থেকে আর কেউ পৈর্তৃক সম্পত্তির ওপর বসে খেতে পারবে না— সবাইকে খেটে খেতে হবে। এই বিপ্লব চলাকালীনই ১৯১৮ সালে লেনিনের ঘাড়ে একটি গুলি লাগে। তিনি তখন প্রাণে বেঁচে যান বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ সেরে উঠেন না। অসুস্থ শরীর নিয়ে তিনি আরও ছয় বছর কাজ করে যান। ১৯২১ সাল থেকে তিনি পুরোপুরি দেশগঠনমূলক কাজে হাত দেন। কিন্তু কাজ শেষ করে যেতে পারেননি। ১৯১৩ সালে তাঁর শরীরের ডানদিকে পক্ষাঘাত হয়ে কথা বলার শক্তি লোপ পেয়ে যায়। অবশেষে ১৯২৪ সালের ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি মৃত্যুবরণ করেন। পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত যত বিপ্লবী নেতা জন্মগ্রহণ করেছেন, তাঁদের সাথে লেনিনের নামও চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে। (সূত্রঃ অস্ট্রিক আর্য্য, বিশ্বশ্রেষ্ঠ আলোকিত মানুষ, ঢাকাঃ অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১১)।

ভাষা আন্দোলন (Language Movement)

ভাষা আন্দোলন পৃথিবীর ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। নিখিল পাকিস্তানের শতকরা ৫৬ ভাগ জনগণের মাতৃভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও সম্পূর্ণ অগণতান্ত্রিক উপায়ে পূর্ব পাকিস্তানের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ১৯৪৭ সালের শিক্ষা সম্মেলনে উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হলে পূর্ব বাংলার এ প্রস্তাবের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে উর্দু ও ইংরেজির পাশাপাশি বাংলাকে গণপরিষদের ভাষা হিসেবে প্রস্তাব করলে মুসলিম লীগ এর তীব্র বিরোধিতা করে। ফলে ঢাকায় ছাত্র বুদ্ধিজীবী মহলে চরম অসন্তোষ দেখা দেয় এবং ২৬ ফেব্রুয়ারি ধর্মঘট পালিত হয়। এভাবে সংগ্রাম পরিষদ ১৫ মার্চ পর্যন্ত ধর্মঘট ও হরতাল পালনের মধ্য দিয়ে দেশব্যাপী আন্দোলন অব্যাহত রাখে। অবশেষে তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বাংলা ভাষার দাবি সমর্থনের আশ্বাস দিলে আন্দোলন প্রশমিত হয় কিন্তু ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় এবং কার্জন হলের এক সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা ঘোষণা দিলে পুনরায় আন্দোলন চাঙ্গা হয়ে উঠে এবং দেশব্যাপী তীব্র প্রতিবাদ শুরু হয়।

১৯৫০ সালে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং ১৯৫২ সালের ২৬ জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দিন পুনরায় একই ঘোষণা দেন যে, উর্দূই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ফলে ছাত্র-বুদ্ধিজীবী মহলে দারুণ ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয় এবং আন্দোলন তীব্রতর আকার লক্ষ্যে ৩০ জানুয়ারি এক জনসভায় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠন করা হয়। এতে ২১ ফেব্রুয়ারিকে ভাষা দিবস হিসেবে পালন ও দেশব্যাপী হরতাল পালনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারির উক্ত কর্মসূচিকে বানচাল করার জন্য তৎকালীন গভর্নর নূরুল আমিন ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করে। কিন্তু সংগ্রাম পরিষদ এ

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে মিছিল বের করলে পুলিশের সাথে ছাত্র-জনতার এক মারাত্মক সংঘর্ষ বাধে। এক পর্যায়ে পুলিশ মিছিলের ওপর গুলি চালালে জব্বার, বরকত, সালামসহ অনেকে প্রাণ হারান এবং আহত হন বহুসংখ্যক। এর ফলে সারা বাংলায় আন্দোলন ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। ঢাকায় এ ঘটনার প্রতিবাদে দেশব্যাপী ও বিক্ষোভ অব্যাহত থাকে। অবশেষে সরকার নতি স্বীকার করতে বাধ্য হয় এবং সাময়িকভাবে প্রাদেশিক মুখ্যমন্ত্রী বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। অতঃপর ১৯৫৬ সালের পাকিস্তানের সংবিধানে বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষাা হিসেবে মর্যাদা লাভ করে। ভাষা আন্দোলনে এক নতুন জাতীয় চেতনার উন্মেষ ঘটে এবং এ চেতনাই ক্রমে ক্রমে বাঙালির জাতীয়তাবাদের জন্ম দেয়। তাই ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল বাংলাদেশের গণচেতনার প্রথম বহিঃপ্রকাশ এবং স্বাধিকার আন্দোলনে এক বলিষ্ঠ পদক্ষেপ।

ভাসমান মুদ্রা (Floating Exchange Rate)

ভাসমান মুদ্রা বা ফ্লোটিং এক্সচেঞ্জ রেট হলো টাকার অবাধ বিনিময় হার। এ নীতিতে বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময় হার নির্ধারণের এখতিয়ার কেন্দ্রীয় ব্যাংকের পরিবর্তে বাজারে মুদ্রার যোগান ও চাহিদার ভিত্তিতেই নির্ধারিত হবে। অন্যদিকে বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো নিজেরাই বৈদেশিক মুদ্রার দরদাম ঠিক করতে পারবে। বাংলাদেশ ব্যাংক ২৯ মে ২০০৩ এক সার্কুলারের মাধ্যমে টাকাকে ভাসমান মুদ্রা করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে। অবশেষে ৩১ মে ২০০৩ আন্তর্জাতিক দাতা সংস্থা তথা আইএমএফের চাপের মুখে সরকার এ ফ্লোটিং রেট চালুর বিষয়টি কার্যকর করে। এদিন টাকার বিনিময়ে মার্কিন ডলারের দাম ছিল ৫৭.৪০ থেকে ৫৮.৪০ টাকা। ১৯৮৫ সাল থেকে বাংলাদেশ ব্যাংক টাকার বিপরীতে বৈদেশিক মুদ্রার মূল্যমান নির্ধারণ করে আসছিল। বর্তমানে অবশ্য কেবল চলতি হিসাবের ক্ষেত্রেই টাকার মুদ্রামান অবাধ করা হয়েছে। মূলধনী হিসাবে বৈদেশিক মুদ্রা লেনদেনের ক্ষেত্রে আগের বেঁধে দেয়া নিয়মনীতি বহাল রয়েছে। এ নতুন ব্যবস্থায় আমদানি ও অন্যান্য চলতি ব্যয়ের জন্য বৈদেশিক মুদ্রা ক্রয়ের ক্ষেত্রে কোনো বিধি নিষেধ নেই।

ভাসানি নভোথিয়েটার

ভাসানি নভোথিয়েটার রাজধানী ঢাকার বিজয় সরণিতে সাড়ে ৫ একর জমির ওপর নির্মিত। এটিই হচ্ছে দেশের প্রথম বিশ্বমানের প্লানেটোরিয়াম। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া ২৫ সেপ্টেম্বর, ২০০৪ আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করেন দেশের প্রথম নভোথিয়েটার। নভোথিয়েটারের সার্বিক সংরক্ষণের দায়িত্ব গণপূর্ত বিভাগের হাতে ন্যস্ত। ২০০০ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। আলী ইমাম অত্যাধুনিক এ নভোথিয়েটারের নকশাকার হলেন গণপূর্ত বিভাগের স্থপতি। মূল নভোথিয়েটারের দর্শক সংখ্যা ৩৫০। দর্শকরা

স্লিপিং চেয়ারে আয়েশ করে বসে ৩২ মিটার ব্যাসার্ধের মেটালিক ডোমে ভেসে ওঠা অনন্ত নক্ষত্রবীথি খচিত মহাকাশ, চিররহস্যময় নীহারিকা, ছায়াপথ, গ্রহ-উপগ্রহ, উল্কা, ধূমকেতুর মতো মহাজাগতিক বস্তুপুঞ্জের বিস্ময়কর দৃশ্যাবলী অবলোকন করবেন। এছাড়াও এখানে তৈরি করা হয়েছে তিনটি প্রদর্শনী কক্ষ। এ কক্ষগুলোতে বিবর্তনের ধারাবাহিকতায় প্রাণিজগতের বিভিন্ন পর্যায় (ডাইনোসর থেকে মানুষ পর্যন্ত) তুলে ধরা হয়েছে মডেল তৈরির মাধ্যমে। তাছাড়া আছে সৌরমণ্ডল ও মহাকাশ সংক্রান্ত বিভিন্ন নিদর্শন, তথ্য-উপাত্ত ইত্যাদি। দর্শকরা ভেতরে প্রবেশ করেই দেখবেন দুদিকে সাতটি করে ১৪টি ৪০ ফুট উঁচু স্তম্ভ। একে বলে ফ্রি হাইট রোমান কলাম। এই কলামগুলোর প্রতিবিম্ব পড়বে সামনে তিনটি ফোয়ারায়। সবমিলিয়ে দৃশ্যপট চমৎকার। নভোথিয়েটারের ভেতরের বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম সরবরাহ ও সংযোজন করেছে জাপানি গোটো কোম্পানি এবং এর বাহিরের অ্যালুমিনিয়ামের মেটালিক ডোম তৈরি করেছে টেমকো নামের মার্কিন প্রতিষ্ঠান।

ভিত্তি ও উপরিকাঠামো (Base and Superstructure)

১৮৫৯ সালে মার্কস 'প্রিফেস টু এ ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকনমি' গ্রন্থে সামাজিক ব্যবস্থার অর্থনৈতিক ভিত্তির সঙ্গে রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও আইনগত যে উপরিকাঠামো সেটির ওপর নির্মিত হয়েছে তার পার্থক্য দেখিয়েছেন। ভিত্তির অন্তর্গত হলো বিভিন্ন মানুষ বা শ্রেণির সম্পর্ক যেটা উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময় ব্যবস্থার ওপর নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নির্ধারণ করে। সেটা হলো উৎপাদন সম্পর্ক যার মাধ্যমে উৎপাদিকা শক্তি কাজ করে। উপরিকাঠামোর মধ্যে পড়ে আইন, রাজনীতি ও সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেগুলো অর্থনৈতিক ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে সেটিকে প্রতিফলিত এবং পাকাপোক্ত করে তোলে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মনে করা হয় যে, ভিত্তির পরিবর্তন হলে তবেই উপরিকাঠামোর পরিবর্তন ঘটে। উল্টোটা কিন্তু নয়। সেই নিরিখে ইতিহাসের মৌল গতিপ্রকৃতি হলো অর্থনৈতিক। আইন ও রাজনীতির পরিবর্তন তথা ভিত্তির ওপর নির্মিত উপরিকাঠামোর পরিবর্তন সেই মৌল পরিবর্তনকে অনুসরণ করে, প্রভাবিত করে না।

ভিয়েতনাম বিপ্লব (Vietnam Revolution)

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ভাগ থেকে ভিয়েতনাম ফরাসি উপনিবেশ বিস্তারের প্রক্রিয়া শুরু হয় এবং কালক্রমে ভিয়েতনাম, লাওস ও কাম্পুচিয়া নিয়ে গঠিত হয় ফরাসি ইন্দোচীন। বিদেশি শাসকদের পদানত হয়ে ভিয়েতনাম মুক্তির জন্য বারবার লাড়াই চালিয়েছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় (১৯৪০ সালে) ফরাসি ইন্দোচীনে প্রতিষ্ঠিত হয় জাপানি আধিপত্য। জাপানিদের বিরুদ্ধে ভিয়েতনামী জনগণের সশস্ত্র মুক্তিসংগ্রাম পরিচালিত হয়েছিল স্বাধীন ভিয়েতনাম লীগ বা 'ভিয়েতমিন' নামে পরিচিত ঐক্যবদ্ধ ফ্রন্ট দ্বারা। জাতীয়তাবাদী থেকে বামপন্থী বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর স্বাধীনতাকামীদের নিয়ে গঠিত এই ফ্রন্টের নেতা ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির প্রধান নগুয়েন আই কুয়োক, যিনি

বিশ্বব্যাপী হো চি মিন ছদ্মনামে সুপরিচিত। ১৯৪৫ সালের আগস্ট মাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে ভিয়েতমিনেরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানে সিদ্ধান্ত নেয়। বিশ্বযুদ্ধে পরাজিত দখলদার জাপানিরা ভিয়েতনামে তাঁবেদার গোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে চাইলেও ভিয়েতনামের জনগণের বৈপ্লবিক অভ্যুত্থান ও সশস্ত্র অভিযানের মুখে তাদের সব ষড়যন্ত্র বানচাল হয়ে যায়। ২ সেপ্টেম্বর ভিয়েতমিন বাহিনী হ্যানয়ে প্রবেশ করে এবং বাদিন স্কোয়ারে সমবেত লক্ষ জনতার সামনে হো চি মিন ভিয়েতনাম গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা ঘোষণা করেন।

তবে অচিরেই পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ফরাসিরা নতুন প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধভিযান শুরু করে। আট বছরব্যাপী লড়াই শেষে ১৯৫৪ সালে দিয়েন বিয়েন ফুতে ফরাসি বাহিনী চরম পরাজয় বরণ করে। তা সত্ত্বেও সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলোর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত জেনেভা সম্মেলনে ১৭ অক্ষাংশ বরাবর সাময়িক সীমারেখা টেনে দেশটিকে বিভক্ত করা হয় এবং দেশের উত্তরাংশে ভিয়েতমিন শাসনকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। কিন্তু জেনেভা সম্মেলন গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ঐক্যবদ্ধ ভিয়েতনাম প্রতিষ্ঠা নির্বাচন আর অনুষ্ঠিত হয়নি। ফলে দক্ষিণাংশে প্রতিষ্ঠিত তাঁবেদার সরকারের বিরুদ্ধে জোরদার মুক্তি আন্দোলন গড়ে উঠতে থাকে। ১৯৬১ সালে আমেরিকা তার সেনাদল পাঠিয়ে সরাসরি দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পক্ষ অবলম্বন করে। কিন্তু সর্বশক্তি নিয়ে ঝাঁপ দিয়েও আমেরিকা ভিয়েতনামের মুক্তিসংগ্রাম দমন করতে ব্যর্থ হয়। অবশেষে ৫০,০০০ মার্কিন সৈনিকের মৃত্যু ও বিশ্বব্যাপি প্রবল জনমতের চাপে ১৯৭৩ সালে আমেরিকা দক্ষিণ ভিয়েতনাম ত্যাগ করে চলে যেতে বাধ্য হয়। এর দুই বছরের ভেতর তাবেদার সরকারের পতন ঘটে এবং ভিয়েতনাম আবার এক দেশে পরিণত হয়।

ভূমি (Land)

সাধারণ অর্থে পৃথিবীর উপরিভাগকে বা ভূ-পৃষ্ঠকে ভূমি বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে ভূমি বলতে কেবল পৃথিবীর উপরিভাগ অর্থাৎ জমিকে বোঝায় না; বরং প্রাকৃতিক সকল সম্পদকে ভূমি বলা হয়। মাটির উর্বরা শক্তি, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত, তাপ, জল, বাতাস, সূর্যের আলো, খনিজ সম্পদ, বন, মৎস্যক্ষেত্র, নদ-নদী প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রাকৃতিক সম্পদ ভূমির অন্তর্গত। এটা উৎপাদনের একটি আদিম উপাদান।

ভূমিহীন ((Landless)

যে লোকের বা তার পরিবারের কোনো ভূমি নেই তাদের ভূমিহীন বলে। কৃষি ব্যবস্থার অগ্রসরহীনতার প্রধান কারণ হিসেবে ভূমিহীনতাকে চিহ্নিত করা হয়। বাংলাদেশে কৃষি ব্যবস্থার সাথে গ্রামীণ এলাকার প্রায় প্রতিটি পরিবারই জড়িত। আমাদের দেশে কম জমিসম্পন্ন পরিবারগুলোর প্রতি জোতদার-মহাজনদের অত্যাচারের জন্য গ্রামীণ রাজনৈতিক প্রক্রিয়াই দায়ী। কম জমির মালিক জোতদারের অত্যাচারে নিপীড়িত হতে হতে এক পর্যায়ে 'ভূমিহীন' হয়ে পড়ে।

ভেটো (Veto)

Veto শব্দের অর্থ হল প্রত্যাখ্যান বা সমর্থন না করার ক্ষমতা। সাধারণত জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী ৫ সদস্যের বিশেষ ক্ষমতাই (Veto) ভেটো ক্ষমতা নামে পরিচিত। পরবর্তীতে রাশিয়া সংশোধনী প্রদান করে যে মূল পাঁচশক্তির ঐকমত্য ব্যতীত নিরাপত্তা পরিষদের কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণই সঠিক হবে না। যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, রাশিয়া, ফ্রান্স ও চীন-এই পাঁচটি দেশ ভেটো ক্ষমতাসম্পন্ন। ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সত্তর দশকের শেষার্ধ নাগাদ নয়াচীনকে স্বীকৃতি দেয়া হয় না এবং তৎপরিবর্তে চিয়াং কাইশেকের নেতৃত্বাধীন তাইওয়ানই ভেটো ক্ষমতা ভোগ করে। উল্লেখ্য যে, জাতিসংঘ সনদ অনুযায়ী সকল সদস্য রাষ্ট্রের মর্যাদা সমান হলেও ভেটো ক্ষমতা সম্পন্ন হওয়ায় উক্ত পাঁচটি দেশ অন্য সদস্যের তুলনায় বেশি সুবিধা ভোগ করে আসছে।

ভোগ (Consumption)

মানুষের অভাব মেটানোর জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগের ব্যবহারকে সাধারণত ভোগ বলা হয়। যেমন– খাদ্যদ্রব্য খেয়ে ক্ষুধা নিবারণ করা যায় এবং কাপড় পরিধান করে শীত ও তাপ হতে দেহকে রক্ষা করা যায়। সুতরাং খাদ্য খাওয়া এবং কাপড় পরিধান করাকে ভোগ বলা হয়। যথা– খাদ্যদ্রব্য, পোশাক-পরিচ্ছদ, গৃহাদি প্রভৃতি ভোগ করা হয়, তেমনি অ-বস্তুগত দ্রব্যাদি; যথা– গায়কের গান, শিক্ষকের শিক্ষা ইত্যাদি ভোগ করা যায়। যদি কোনো লোক গায়কের গান, শুনে তুষ্ট হয় ও মানসিক আনন্দ উপলব্ধি করে বা শিক্ষকের শিক্ষা দ্বারা উপকৃত হয়। তবে বলা যায় যে, সে এই সমস্ত অ-বস্তুগত দ্রব্যাদির উপযোগ ভোগ করল। যখন কোন দ্রব্যের উপযোগ মানুষের অভাব মেটানোর জন্য ব্যবহৃত হয় তখন সে দ্রব্যকে ভোগ করা বোঝায়। আর যখন কোনো দ্রব্য মানুষের কোনো কাজে না এসে আগুনে পুঁড়ে বা পানিতে ভিজে বা অন্য কোনো কারণে নষ্ট হয়ে যায় তখন তাকে ভোগ করা বলা হয় না। প্রকৃতপক্ষে ভোগ বলতে কোনো দ্রব্যের উপযোগ ব্যবহারকেই বোঝায়। বাস্তবক্ষেত্রে, মানুষ যেমন কোনো দ্রব্য সৃষ্টি করতে পারে না তেমনি কোন দ্রব্য বিনাশ করতেও পারে না। পরিশ্রমের দ্বারা মানুষ দ্রব্যের উপযোগ সৃষ্টি করতে পারে, ভোগের দ্বারাই সেই উপযোগ ধবংস করা হয়। সুতরাং, মানুষের অভাব মেটানোর জন্য কোনো দ্রব্যের উপযোগের ব্যবহারকে 'ভোগ' বলা হয়।

ভোগবাদ (Epicurism)

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক এপিকিউরাস (খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) প্রথম ভোগবাদ বা Epicurism প্রচার করেন। তিনি এই মতবাদের প্রয়োগ করতে চেয়েছেন ব্যক্তির ক্ষেত্রে, সমাজের ক্ষেত্রে নয়। এই মতবাদ অনুসারে, যেহেতু সুখ মানুষের মৌল আকাঙ্ক্ষা এবং দুঃখ অবাঞ্ছিত, সেহেতু দর্শনের প্রধান কাজই হলো মানুষের সর্বাধিক সুখলাভ ও দুঃখ

পরিহারের উপায় দেখিয়ে দেওয়া। এপিকিউরাসের মতে সকলপ্রকার সুখ ভোগ্য নয়; ব্যক্তিগত বা ইন্দ্রিয়গত সুখ পরিহার করে প্রকৃত সুখ বা পূর্ণ মানসিক শান্তি লাভ করাই মানজীবনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। আর এই মানসিক শান্তিলাভের জন্য চাই বিভিন্ন সদ্‌গুণ। এপিকিউরাসের কতিপয় শিষ্য তাঁর মতবাদের স্থূল ব্যাখ্যা করে দুর্নীতিমূলক ও পাপমূলক সুখে নিমগ্ন হলে, তিনি তাঁদের শিষ্য বলে অস্বীকার করেন। পরবর্তীতে এটা সমগ্র মানব-সমাজজীবনে প্রয়োগ করা হয়। জেরেমী বেন্থাম সর্বপ্রধান মানব-হিতবাদী বা ভোগবাদী। তাঁর মতবাদ অনুসারে সমাজের অধিকতম সুখসাধনই Epicurism দর্শন শাস্ত্রের মূল কথা। এই মতবাদকে ভোগবাদ বলা হয়।

ভোট কারচুপি (Ballot-Rigging)

নির্বাচনে অন্যায়ভাবে ভোটগ্রহণ কিংবা ভোট প্রদানের সাথে সম্পর্কিত বিষয়। মূলত নির্বাচনের ওপর প্রভাব বিস্তার প্রক্রিয়া। বিভিন্ন উপায়ে ভোট কারচুপি করে নির্বাচনী ফলাফলকে প্রভাবিত করা হয়ে থাকে। বিভিন্ন গণতান্ত্রিক দেশেই ভোট কারচুপি হয়। ভোট কেন্দ্রে সন্ত্রাস করে, ভোটারদের ভোট কেন্দ্রে যেতে বাধা দিয়ে, ভোট গণনার সময় কারচুপি করে, সরকার ও সরকারি দলের পক্ষ থেকে প্রশাসনের ওপর প্রয়োগ প্রদান করে, ভোটা তালিকা প্রণয়নে হস্তক্ষেপ ইত্যাদি উপায়ে ভোট কারচুপি হতে পারে। এমনকি ভোট গ্রহণ না করে ফলাফল ঘোষণার মাধ্যমেও ভোট কারচুপির আশ্রয় নেয়া হয়। ভোট কারচুপি রোধে বিভিন্ন দেশে অনেক রকম পদক্ষেপও নেয়া হয়েছে। বাংলাদেশে ভোট কারচুপিতে সরকারি প্রভাব কমানোর জন্য সংবিধানে ত্রয়োদশ সংশোধনী এনে তত্ত্বাবধায়ক সরকার প্রতিষ্ঠার বিধান করা হয়েছিল। পরবর্তীতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিয়ে নানা বিতর্ক তৈরি হলে পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে ওই বধিানকে বাতিল করা হয়।

ভোট, কৌশলগত (Tactical Vote)

ভোট হলো প্রার্থী নির্বাচনের একটি উপায়। ভোট দাতাদেরকে ভোটার বলা হয়। সাধারণভাবে ভোটার তার পছন্দের দল বা প্রার্থীকে বিজয়ী করার জন্য ভোট দেয়। কিন্তু অনেক সময় এমন পরিস্থিতি দেখা দেয় যে পরিস্থিতিতে একজন ভোটার তার ভোটক্ষমতা প্রয়োগ করে যে-দল বা প্রার্থীকে সে ঘৃণা করে তাকে ঠেকানোর উদ্দেশে। এরূপ ক্ষেত্রে সে নিজের পছন্দের প্রার্থী বা দলকে ভোট না দিয়ে তার ঘৃণিত প্রার্থী বা দলকে ঠেকানোর জন্য তৃতীয় কোনো প্রার্থী বা দলকেই বা স্বতন্ত্র প্রার্থীকে ভোট দিয়ে দিতে পারে। ধরা যাক, বাংলাদেশের কোনো এলাকার জাতীয় পার্টির সমর্থকরা দেখল যে তারা যদি তাদের দলের প্রার্থীকে ভোট দেয়, তা হলে বিএনপি-র প্রার্থীই জিতে যায়; তাই তারা বিএনপি-র প্রার্থীকে হারানোর জন্য আওয়ামী লীগের প্রার্থীকে ভোট দিয়ে জিতিয়ে দিল। এরূপ ভোটই হল কৌশলগত ভোট। বর্তমানে রাজনীতির ক্ষেত্রে এই প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

ভোট, স্ট্র (Straw Vote)

স্ট্র-ভোট হলো পূর্ব আনুমানিক ভোট। সাধারণত আসন্ন কোনো নির্বাচনে ফলাফল কী হতে পারে, সে-সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠান বা সংবাদপত্রের উদ্যোগে যে বেসরকারি ভোটগ্রহণ করা হয়, সেই ভোটকেই বলা হয় স্ট্র-ভোট। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচনের পূর্বে এই ধরনের ভোট লক্ষ্য করা যায়।

ভোটাধিকার (Franchise)

নারী-পুরুষ-জাতি-ধর্ম-বর্ণ-পেশা-নির্বিশেষে ভোটদানের এবং ভোট প্রার্থী হওয়ার অধিকারকে ভোটাধিকার বলে। সাধারণ নির্বাচনে ভোটদানের আইনসঙ্গত অধিকার। আঠারো শতকের শেষ থেকে পশ্চিমা অনেক দেশে ভোটদানের অধিকার ক্রমে সম্প্রসারিত হয়। বিশ শতকের শেষ দশকে বিশ্বের প্রায় সব দেশেই নর-নারী নির্বিশেষে বয়স্ক ব্যক্তিদের ভোটাধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে। উল্লেখ্য যে, নারীদের ভোটাধিকার এক সময় ছিল না। নারীদের ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে দেশ ও কালভেদে নানা রকম শর্ত দেখা যায়। যুক্তরাজ্যে উনিশ শতকে ভোটাধিকারের ন্যূনতম শর্ত ছিল স্থাবর সম্পত্তির মালিকানা।

ইতিহাস থেকেই জানা যায় যে বিভিন্ন সময়েই জনসমষ্টির অনেক গোষ্ঠীকেই ভোটদানের অধিকারের বাইরে রাখা হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে উল্লেখ করা যায়, প্রাচীন এথেন্সের গণতন্ত্রে মহিলা, বিদেশি ও ক্রীতদাসদের ভোট দেওয়ার অধিকার ছিল না। এমনকি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধানও ভোটাধিকারের বিষয়টি প্রদেশগুলোর উপরেই ছেড়ে দেয়। সাধারণত সেখানে সম্পত্তির মালিক শ্বেতাঙ্গ পুরুষরাই কেবল ভোট দিতে পারত। ভোটাধিকারের বাইরে থাকা অংশকেও ভোটাধিকার দেওয়ার প্রচেষ্টা নিয়ে নির্বাচনের অনেক ইতিহাস রয়েছে। মহিলাদের ভোটাধিকার আন্দোলন বহু দেশেই মহিলাদের ভোটাধিকার প্রদানে সহায়তা করেছে এবং মার্কিন নাগরিক অধিকার আন্দোলনের সবচেয়ে বড় উদ্দেশ্য ছিল অবাধ ভোটদান সুনিশ্চিত করা। দণ্ডিত অপরাধী, নির্দিষ্ট সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর সদস্য এবং অর্থনৈতিকভাবে প্রতিকূলতার মধ্যে থাকা মানুষ যারা এখনও কোথাও কোথাও ভোটাধিকার পায়নি তাঁদের মধ্যে ভোটাধিকার সম্প্রসারণ করাই হলো ভোটাধিকারের পক্ষে যাঁরা সওয়াল জবাব করেন তাদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ লক্ষ্য।

ভোটাধিকার সচরাচর কেবল সেদেশের নাগরিকদেরই থাকে। এর বাইরেও আরো কিছু সীমারেখা আরোপ করা যেতে পারে। যদিও সেদেশের বাসিন্দাদের সিংহভাগই এই শর্তটি পূরণ করতে পারে না। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নে যদিও কোনো একজন পৌরভোটে ভোট দিতে পারেন যদি সেই পৌর এলাকার তিনি বাসিন্দা হন এবং ইউরোপীয়ান ইউনিয়নেরই একজন নাগরিক হন। এক্ষেত্রে তিনি এখন যে দেশে বাস করছেন সেই দেশেরই নাগরিকত্বেরই প্রায়োজনীয়তা নেই।

কিছু দেশে আবার ভোটাদান আইনগতভাবে বাধ্যতামূলক, যদি কোনো যোগ্য ভোটার ভোট না দেন তবে তাঁর বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হতে পারে। হতে পারে সামান্য জরিমানাও।

বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সেখানে সকলেই ভোটাধিকার পায়। নারীদের যে সীমত অধিকার তখন প্রদত্ত হয়েছিল সেটাও ১৯২৮ সালের মধ্যে সর্বাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। একমাত্র সুইজারল্যান্ডে নারীদের খুব কাছাকাছি অতীতেও ভোটাধিকার ছিল না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যে ভোটদাতার বয়স অন্যূন আঠারো বছর। ভারতে ১৯৩৫ সালে ভারত শাসন আইন অনুযায়ী সাক্ষরতা, কর প্রদান ও সম্পত্তির মালিকানার ভিত্তিতে শতকরা ১৩ জন ভোটাধিকার পায়। স্বাধীন ভারতে সর্বজনীন বয়স্ক ভোটাধিকার অন্যূন ২১ বছর বয়স্ক ব্যক্তিদের দেওয়া হয়। ১৯৮৯ সাল থেকে ভোটদাতার ন্যূনতম বয়স ১৮ বছরে নামানো হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের বেশিরভাগ রাষ্ট্রে ভোটাধিকারের ন্যূনতম বয়সসীমা ১৮ বছর।

ভোটাধিকার, সর্বজনীন (Universal Adult Franchise)

কোনো দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিক নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে সকলের ভোটদানের এবং ভোটপ্রার্থী হওয়ার অবাধ অধিকারকে সর্বজনীন ভোটাধিকার বলে। এই অধিকার সংবিধান প্রদত্ত। সার্বজনীন প্রাপ্ত বয়স্ক (Universal Adult Franchise) সামাজিক অবস্থান, জাতি ধর্ম বর্ণ ও নরনারী-নির্বিশেষে দেশের সকল প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকের স্বাধীনভাবে ভোটদানের অধিকারকেই বলে সর্বজনীন ভোটাধিকার। এরূপ ক্ষেত্রে সাধারণত আঠারো বছরের ঊর্ধ্ববয়স্ক সকল নরনারীই ভোটদানের অধিকার লাভ করে। ফরাসি বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে ১৭৯১ সালে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তিত হয়। অতঃপর ১৮৭১ সালে জার্মানিতে এবং ১৮৯০ সালে স্পেনেও এ-অধিকার প্রদান করা হয়। ইংল্যান্ডে চার্টিস্ট আন্দোলনে (১৮৪৮) এ-দাবি উত্থাপিত হলেও এ-অধিকার কার্যত স্বীকৃতি লাভ করে ১৯২৮ সালে।

মগজ ধোলাই (Brainwashing)

কোনো ব্যক্তির আদর্শগত বিশ্বাস বা মতবাদকে পরিবর্তন করে দেওয়ার প্রক্রিয়া। শারিরীক ও মানসিক চাপ, অত্যন্ত ভালো ব্যবহার, মনস্তাত্তিক ওরিয়েন্টশন, অর্থনৈতিক সুবিধাদান, ভোগবিলাসের সুবিধাদান, বিশেষ মর্যাদাদান, প্রশিক্ষণ প্রোপাগাণ্ডা ইত্যাদিই হলো মগজ ধোলাইয়ের মূল উপায়। চিন্তাভাবনা ও দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন ও তার মনে ভিন্ন মানসিকতা সঞ্চারকল্পে অনুসৃত প্রক্রিয়া। প্রত্যয়টি একসময়ে কমিউনিস্ট দেশে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের পশ্চিমা দুনিয়া সম্পর্কে মনোভঙ্গীর পরিবর্তনসূত্রে প্রয়োগ করা হত। বর্তমানে শব্দটি শিথিলভাবে সব দেশেই বন্দিদের কাছে বিজেতাদের প্রতি সহানুভূতি সৃষ্টি ও স্বীকারোক্তি অর্জনের ব্যাপারে প্রযুক্ত হয়। যুক্তরাষ্ট্রের একটি সরকারি কমিটি কোরীয় যুদ্ধের (১৯৫০-৫৩) পর প্রত্যক্ষ করে যে যুক্তরাষ্ট্রের মুক্ত যুদ্ধবন্দিদের মনোবল

ভেঙে যাওয়া ছাড়াও তাদের ওপর মগজ ধোলাইয়ের ফলে তারা কমিউনিস্ট আদর্শে অনেকাংশে প্রভাবিত হয়ে পড়ে।

মুজিব বাহিনী (Mujib Force)

ভারতীয় সেনাবাহিনীর গেরিলাযুদ্ধে বিশেষজ্ঞ অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল ওবানের নেতৃত্বে এবং ভারতীয় সরকারের কেবিনেট ডিভিশনের অধীনস্ত রিসার্স অ্যান্ড অ্যানালাইসি উইং-র- এর অনুমোদনক্রমে মুজিব বাহিনী সংগঠিত করা হয়। মুজিব বাহিনী রাজনৈতিক আদর্শে দীক্ষিত দেশপ্রেমিক ও শিক্ষিত বাঙালি তরুণ সমন্বয়ে গড়ে ওঠে। ভারতের দেরাদুনে প্রশিক্ষণ ক্যাম্পে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। শেখ ফজলুল হক মনি, তোফায়েল আহমেদ, আবদুর রাজ্জাক ও সিরাজুল আলম খান এ বাহিনীর নেতৃত্ব দান করেন।

মজুরি (Wages)

সাধারণ অর্থে শ্রমিকের শ্রমের বিনিময়ে প্রদত্ত মূল্যই হল মজুরি। মজুরি সাধারণত দুই প্রকার: আপাত মজুরি (National Wage) এবং প্রকৃত মজুরি (Real Wage)। শ্রমিক তার শ্রমের বিনিময়ে টাকার হিসাবে যে মূল্য পায়, সেটাই হল আপাত-মজুরি। আর ওই মজুরি দিয়ে শ্রমিক যে-পরিমাণ খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয় ইত্যাদির সংস্থান করতে পারে, সেটাই হল প্রকৃত আয়। প্রায়শই দেখা যায় যে, শ্রমিকের আপাত আয় বাড়ছে; কিন্তু মুদ্রাস্ফীতি ও দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির দরুন আপত বর্ধিত মজুরি দিয়ে শ্রমিক পূর্ববর্তী সময়ের পরিমাণ সামগ্রীও কিনতে পারছে না। এর অর্থ হল, 'শ্রমের দাম নয়'। কেননা মালিক শ্রমিককে যে-মজুরি দেয়, তা তার সমগ্র শ্রমের মূল্য নয়; বরং তার শ্রমশক্তিকে ক্রয় করার মূল্য। মার্কসীয় মতে এই মূল্যের পার্থক্য থেকেই উদ্বৃত্ত মূল্যের উদ্ভব।

মতবাদ (Doctrine)

ইংরেজি doctrine কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ মতবাদ। শব্দটি ধর্মীয় পরিভাষা থেকে রাজনৈতিক ব্যবস্থারে স্থান পেয়েছে। এছাড়াও শব্দটির অর্থ হলো রাজনৈতিক আদর্শ ও ক্রিয়াকলাপের মধ্যে সুসংবদ্ধ সামঞ্জস্য বিধান। সর্বোপরি এর লক্ষ্য হলো কিছু যুক্তিগ্রাহ্য বিশ্বাস ও আচরণ গড়ে তুলতে সহায়তা করা, যা নিজগুণেই জনমনে সঞ্চারিত হয়, অন্য কারও স্বার্থে তাঁর চিন্তা ও আচরণকে অনুসরণ করা নয়। প্রত্যয়টি বিতর্কমূলক, বিশেষ কোনো ঐতিহাসিক ঘটনায় উদ্ভূত হলেও তা থেকে এটিকে বিচ্ছিন্নভাবে বিচার না করে প্রকৃত সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে উদ্ভূত ও প্রযুক্ত নীতি ও কর্মপন্থাসমূহকে বাস্তব অবস্থা অনুযায়ী গড়ে উঠতে দেওয়া ভাল। নিছক বিমূর্ত তত্ত্ব হিসেবে সর্বত্র সব মানুষের ক্ষেত্রে সেগুলোকে প্রয়োগ করা অর্থহীন। মতবাদের সংজ্ঞা ও ব্যাখ্যা সংক্রান্ত বিরোধিতার মধ্যে দিয়ে একটি মতবাদই পরিশেষে গড়ে ওঠে; যেটা মানুষ সম্পর্কে পরম সত্য হিসেবে সর্বজনের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হয়ে দাঁড়ায়। ফলে কী

উদারনীতি, কী সমাজতন্ত্র সর্বদাই একটা মতবাদের সন্ধান করে, যেটা মানবিক আদর্শ ও সর্বজনীন চাহিদাগুলোকে পূরণ করতে সহায়তা করে।

মতাদর্শ (Ideology)

ইংরেজি ideology-র বাংলা প্রতিশব্দ মতাদর্শ। রাজনৈতিক আলাপ-আলোচনায় শব্দটি বহুল ব্যবহৃত। তবে প্রকৃতভাবে এর সুস্পষ্ট কোনো অর্থ নেই। সাধারণভাবে মতাদর্শ বলতে কিছু সামাজিক আদর্শের ভঙ্গি বোঝায় এবং তার মূল কথা হলো এমন এক কার্যক্রম যার সাহায্যে জনগণের রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপকে প্রভাবিত করা যায়। ফরাসি বিপ্লবের সময়ে একটি দার্শনিকগোষ্ঠীর মধ্যে শব্দটির উদ্ভব ঘটে। ওই সময়ে সামাজিক পরিবর্তনের কর্মসূচি প্রসঙ্গে শব্দটি ব্যবহৃত হত, যার পেছনে ছিল সেই দার্শনিকদের সমর্থন। কালক্রমে 'আইডিওলজি' শব্দটি নানা অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। বিভিন্ন রাজনৈতিক মতবাদে মানুষ ও সমাজ সম্পর্কে সবার জন্য প্রযোজ্য এক তত্ত্ব পাওয়া যায়। যা থেকে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি গড়ে উঠতে পারে। নির্দিষ্ট কিছু সমাজব্যবস্থায়, যেমন সামন্ততন্ত্র ও ধনতন্ত্রে, মতাদর্শের প্রয়োজন থাকে। কমিউনিজম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর সমাজ ও মানবচরিত্র সঠিক নিয়মে চলবে, পরিবর্তনকামী মতাদর্শের পরিবর্তন ঘটবে না। তাই কারও কারও মতে উদারনৈতিক গণতন্ত্রী সরকারের বিপরীত ধারায় মানুষের ব্যক্তিগত বিষয়ে নিয়তই হস্তক্ষেপের সমর্থনে সর্বনিয়ন্ত্রণবাদী সরকারের একটি মতাদর্শ থাকে। মতাদর্শ সম্পর্কে এই মন্তব্য বিতর্কমূলক। কেউ কেউ মনে করেন যে, রাজনৈতিক মতবাদকে তার উৎপত্তিস্থল তথা স্থান-কাল পাত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না ; মতাদর্শকে সর্বমুখী ও সর্বজনীন করে তোলা কঠিন।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে মতাদর্শ হলো রাজনীতি, আইন, বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম, নৈতিকতা, নন্দনতত্ত্ব ইত্যাদি যাবতীয় বিষয়ের সুসংবদ্ধ ও প্রণালীবদ্ধ এক চিন্তাভাবনা। মতাদর্শের শ্রেণিচরিত্র থাকে। কোনো এক সমাজের বিশেষ এক সময়ের মতাদর্শ হলো সেই শ্রেণির, যে-শ্রেণির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য তখন কায়েম থাকে। সমাজতন্ত্রী সমাজের মতাদর্শ হলো শ্রমিক শ্রেণির, আর পুঁজিবাদী সমাজের মতাদর্শ হলো বুর্জোয়া শ্রেণির। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মতাদর্শের পেছনে থাকে বিশেষ কিছু ভাবনা যার কাজ হলো নির্দিষ্ট কোনো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার পরিপুষ্টি সাধন ; অন্তর্নিহিত অন্য কোনো সত্য অথবা যুক্তিবত্তা কাজ করে না। নানাবিধ মতবাদ যেমন ফ্যাসিবাদ, সমাজতন্ত্র, সর্ব-আরববাদ, জাতীয়তাবাত, জিওনবাদ ইত্যাদিকে অনেকে মতাদর্শ হিসেবে দেখেন।

মতানৈক্য (Disenting Opinion)

মতানৈক্য বা ভিন্নমত; অনৈক্যমূলক মত বা রায়; আন্তর্জাতিক আদালতের বিচারকদের মতানৈক্য। যেকোনো মামলায় অধিকাংশ বিচারপতির সঙ্গে একমত হতে না পারায় বা

মতভেদ হওয়ায় একজন বা একজনের অধিক বিচারপতি মতভেদের কারণ দর্শাইয়া যে লিখিত বিবৃতি দেন তাকে অনৈক্যমূলক মত বা রায় বলা হয়।

মতান্ধতা (Dogmatism)

ইংরেজি dogmatism কথাটির বাংলা প্রতিশব্দ মতান্ধতা। রাজনীতির ক্ষেত্রে অনেক তত্ত্ব থাকে যা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে গৃহীত ও বর্জিত হয়। কারও দৃষ্টিতে সমাজতন্ত্র যেমন অকাট্য সত্য, কেউ মনে করেন অবাধ বাণিজ্যই চূড়ান্ত কল্যাণকর। মতান্ধতা প্রত্যয়টির মধ্যে শেষ কথা বলে দেওয়া হয়। পক্ষান্তরে মতবাদ হলো কাজ ও আদর্শের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস। মতান্ধতায় কারও কোনো বিশ্বাসের উদ্ভব ও প্রকৃতি যাই হোক না কেন সেই বিশ্বাসকে যুক্তিহীনভাবে আঁকড়ে ধরা হয়ে থাকে। সেই বিশ্বাস বা ধারণার বিপরীত যুক্তি বা প্রমাণ গ্রহণ না করে নিজের মতে মতান্ধ মানুষ অবিচল থাকে। মতান্ধ ব্যক্তিও আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে বিজ্ঞান ও নানা যুক্তির সাহায্যে নেয়।

মধ্যবিত্ত শ্রেণি (Middle Class)

মধ্যবিত্ত শ্রেণির সুনির্দিষ্ট কোনো সংজ্ঞা নেই। সামন্তযুগে সামন্তপ্রভু ও ভূমিদাসদের মধ্যবর্তী শ্রেণি ছিল তৎকালীনন বুর্জোয়ারা। তাঁরাই তখন মধ্যবিত্ত সম্পদের অধিকারী বলে গণ্য হত। মধ্যবিত্ত শেণির দ্বারা সমাজের এমন এক শ্রেণিকে বোঝাত যার অন্তর্গত লোকেদের অভিজাত ও রাজন্যবর্গের মধ্যে অথবা শ্রমজীবী ও কৃষকদের কোনোটির অধীনেই ফেলা যেত না। তারা ধনী পুঁজিপতিও ছিল না, তাদের কায়িক শ্রমও দিতে হত না। পুঁজিবাদের যুগে পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণির মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী, পেশাদার, বুদ্ধিজীবী, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, আইনজীবী প্রভৃতিই মধ্যবিত্ত শ্রেণি হিসেবে পরিচিত। ভূমিহীন ও প্রান্তিক কৃষক এবং বৃহৎ ভূস্বামী ছাড়া অন্যান্য কৃষকদেরও মধ্যবিত্ত বলে গণ্য করা হয়। মধ্যবিত্তরা একদিকে সমাজ সচেতন অন্যদিকে ঝুঁকি নেওয়ার ব্যাপারে দোদুল্যমান। ইউরোপীয় ভূখণ্ডে ব্যাপক অর্থে তাদের বুর্জোয়া বলা হত। সঠিক অর্থে এই গোষ্ঠীকে সামাজিক শ্রেণি বলা যায় না; এটিকে নানা পেশার ব্যক্তিদের একটি অসংঘবদ্ধ বৃহৎ গোষ্ঠী বলাই ন্যায়সঙ্গত। তার মধ্যে সরকারি ও সওদাগরি অফিস-আদলতের কর্মী, কারিগর, কারুশিল্পী ছোট ব্যবসায়ী, মধ্যবর্তী কৃষক, বুদ্ধিজীবী, ব্যবহারজীবী ইত্যাদি থাকে যারা সরকার অথবা পুঁজিপতিদের অধীনে কাজ করে এবং যাদের কোনো পুঁজি থাকে না। শিক্ষায় উন্নত এই স্তরের ব্যক্তিদের মধ্যে অবিরাম বৃত্তিগত পরিবর্তন ও প্রসার ঘটে এবং মার্কসীয় দৃষ্টিতে তারা স্থিতিশীলতাবিহীন।

মধ্যযুগ (Middle Age)

রাষ্ট্রচিন্তার ইতিহাসে কোন সময়কে মধ্যযুগ বলা হয় তা নিয়ে চিন্তাবিদদের মধ্যে মতভেদ থাকলেও সাধারণত ইউরোপীয় ইতিহাসে ৬ষ্ঠ খ্রিস্টাব্দ থেকে পঞ্চদশ খ্রিস্টাব্দ

পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ বলা হয়ে থাকে। মোটামুটি মধ্যযুগের বিস্তৃতি ৫২৯ সাল থেকে প্রায় ১৪০০ সাল পর্যন্ত। এখানে ৪০০-৯০০ পর্যন্ত সময়কে রাজকীয় যুগ বলা হয়। এসময় পোপের মাথায় ছিল রাজমুকুট, গির্জা ছিল দিগ্বিজয়ী এবং খ্রিস্টাননীতি ছিল সর্বাত্মক। সেন্ট এমব্রোস, সেন্ট অগাস্টিন, ও পোপ গ্রেগরি এই যুগের রাষ্ট্রচিন্তাবিদ। আবার ৯০০-১৪০০ সাল পর্যন্ত সময়কে স্কলাস্টিক যুগ বলা হয়। এই যুগের প্রধান ছিল ধর্মতত্ত্ব অর্থাৎ খ্রিস্ট ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা ও যৌক্তিকতা প্রমাণ করা। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে গীর্জার প্রভাব অনেক কমে গেছে এবং এর স্থলে উপস্থিত হয়েছে ধর্মপেক্ষতা ও জাতীয় রাষ্ট্র। দাঁন্তে, মারসিলিও অব পাদুয়া, উইলিয়াম অব ওকহাম প্রমুখ এ সময়ের চিন্তাবিদ। ইউরোপীয় ইতিহাসের ৬ষ্ঠ শতকের টিউটনিক উপজাতির হাতে পাশ্চাত্যের রোম সাম্রাজ্যের পতনের সময় থেকে ষোড়শ শতকে জাতীয় রাষ্ট্রের আবির্ভাব হওয়া পর্যন্ত (ম্যাকিয়াভেলীর পূর্ব) পর্যন্ত তা বিস্তৃত ছিল। এই যুগ হেলেনবাদ, রোমান রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ, ক্রিশ্চিয়ান গির্জা এবং বারবারিয়ান প্রভাব এই চারটি প্রধান চিন্তাধারার ফসল।

মধ্যস্বত্বভোগী (Middleman)

উৎপাদক এবং ভোক্তা বা ভোগকারীর মাঝখানে যেসব ব্যবসায়ী থাকে তাদেরকেই বলে মধ্যস্বত্বভোগী। যেমন পাইকার, এজেন্ট, পরিবেশক, দালাল, প্রভৃতি। উৎপাদক ও ভোক্তার মাঝখানে মধ্যস্বত্বভোগীর স্তর যত বাড়ে, পণ্যের মূল্যও ততই বাড়ে। অর্থাৎ ভোক্তা মধ্যস্বত্বভোগীদের মুনাফার স্বার্থেই অধিক মূল্য দিতে বাধ্য হয়। মধ্যস্বত্বভোগীরা তাদের মুনাফার প্রয়োজনে বাজারে কৃত্রিম সঙ্কটও সৃষ্টি করে। মধ্যস্বত্বভোগীরা পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বণ্টনব্যবস্থার অপরিহার্য অঙ্গ।

মনরো-নীতি (Monroe Doctrine)

১৮২৩ সালের ২ ডিসেম্বর তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মনরো ইউরোপ এবং উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ সম্পর্কে যে নীতি ঘোষণা করেন, সে নীতিই ইতিহাসে মনরো ডকট্রিন বা মনরো-নীতি নামে প্রসিদ্ধ। এই নীতির তিনটি প্রধান দিক হল: ক. উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকাকে কোনো ইউরোপীয় শক্তির উপনিবেশ স্থাপেনের ক্ষেত্র হিসেবে বিবেচনা করা চলবে না; খ. ইউরোপীয় শক্তিসমূহ তাদের ব্যাপার নিয়ে যে যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত হয়, যুক্তরাষ্ট্র তাতে কখনোই অংশ নিই না এবং নেব না, কারণ তা যুক্তরাষ্ট্রের নীতির পরিপন্থী এবং গ. এই দুই মহাদেশের কোথাও কোনো ইউরোপীয় শক্তি তাদের প্রভাব বিস্তার করার চেষ্টা করলে, আমরা সেটাকে আমাদের শান্তি ও নিরাপত্তার প্রতি বিপজ্জনক বলে বিবেচনা করব। ১৮২৩ সালে রাশিয়া (আলাস্কা তখনও রাশিয়ার দখলে) আমেরিকার উত্তর-পশ্চিম উপকূলকে রুশ ছাড়া অন্য সকল দেশের জাহাজের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণার উদ্যোগ নিলে এবং প্রুশিয়া, অস্ট্রিয়া, ও

রাশিয়ার তথাকথিত 'হলি এলায়েন্স' বা পবিত্র সংঘবদ্ধতার ফলশ্রুতিতে দক্ষিণ আমেরিকার নবগঠিত প্রজাতন্ত্রগুলোতে হামলার আশঙ্কা দেখা দিলেই প্রেসিডেন্ট মনরো এই নীতি ঘোষণা করেন। দীর্ঘদিন যাবৎ এই নীতিকে মার্কিন পররাষ্ট্রনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। প্রকৃত প্রস্তাবে, দুই আমেরিকা মহাদেশ থেকে ইউরোপীয় শক্তির উচ্ছেদ ঘটিয়ে সেস্থলে যুক্তরাষ্ট্রের আধিপত্য কায়েমই ছিল মনরো-নীতির মূখ্য উদ্দেশ্য।

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ (Psychological Warfare)

মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ একটি আধুনিক যুদ্ধের কায়দা। এই যুদ্ধেরও লক্ষ্য হচ্ছে শত্রুকে পরাজিত করা। তবে, এই যুদ্ধে অস্ত্র ও গোলাগুলির পরিবর্তে প্রচারণা ও কৌশলের আশ্রয় নেওয়া হয়। যে প্রচারের ফলে শত্রুর মনোবল ভেঙে যায় এবং শত্রু আত্মসমর্পণ করে অথবা এমন দোদুল্যমান অবস্থায় যুদ্ধে লিপ্ত হয় যে, ওই অবস্থায় শত্রু পক্ষের পরাজয় অনিবার্য। মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ কোনো পরিপূর্ণ যুদ্ধ নয়, এটা অস্ত্রশস্ত্রের যুদ্ধের পরিপূরক একটি যুদ্ধ মাত্র। যুদ্ধের সময় তো বটেই, প্রকৃত যুদ্ধের আগে-পরেও মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ পরিচালিত হতে পারে। এই যুদ্ধের মাধ্যম হলো রেডিও, টেলিভিশন, লাউড স্পিকার, মুখে-মুখে প্রচার, সংবাদপত্র, প্রচারপত্র, পুস্তিকা, পোস্টার, গুজব ছড়ানো, শত্রুমহলে এজেন্ট ও গুপ্তচর নিয়োগ ইত্যাদি। শত্রু যাতে আত্মসমর্পণ করে, সেজন্য অনেক সময় এরূপ যুদ্ধে যুদ্ধবন্দিদের চিঠি বা ছবি শত্রুদের মধ্যে বিমান বা মর্টারজাতীয় অস্ত্র ইত্যাদির মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়া হয়, যাতে শত্রু সৈন্যেরা মনে করে যে, যারা ধরা পড়েছে বা আত্মসমর্পণ করেছে, তারা খুব আরাম-আয়েশে আছে। এরূপ যুদ্ধের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হল শত্রু সৈন্যের মধ্যে ভীতি সৃষ্টি করা, যাতে তারা তাদের ওপরস্থ কর্মকর্তা বা সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে।

মন্টেস্কু (Montesquieu)

মন্টেস্কুকে (১৬৮৯-১৭৫৫) আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অন্যতম জনক বলে বিবেচনা করা হয়। এই ফরাসি রাষ্ট্রবিজ্ঞানীর সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ The Spirit of the Laws (১৭৪৮)। তিনি এই গ্রন্থে এমন মতবাদ পোষণ করেন যে, জলবায়ু, ভৌগোলিক অবস্থান এবং ইতিহাসই একটা জাতির সামাজিক সম্পর্ক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের ওপর সর্বাধিক প্রভাব ফেলে। মন্টেস্কু ও লক (Locke)-এর সমন্বয়ে 'ক্ষমতার পৃথকীকরণ' তত্ত্বের বিকাশ ঘটানোর প্রয়াস পান এবং বলেন যে, রাষ্ট্রের প্রশাসন, পার্লামেন্ট ও বিচার বিভাগ একে অপরের সম্পূর্ণ প্রভাবমুক্ত ও স্বাধীন থাকলেই ক্ষমতার ভারসাম্য (Check and balance) ঠিকমতো বজায় থাকবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্র প্রণেতারা মন্টেস্কু-এর চিন্তাধারার দ্বারা খুবই প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে করা হয়।

মন্ট্রিল কনভেনশন (Montreal Convention)

১৯৭১ সালে মন্ট্রিলে বিমান ছিনতাই ঘটনার মোকাবিলার লক্ষ্যে এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিমান ছিনতাই রোধ ও ছিনতাই-ঘটনার মোকাবিলার জন্য বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২৮টি রাষ্ট্র এতে স্বাক্ষরদান করে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, একই উদ্দেশে ইতঃপূর্বে ১২৯টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে ১৯৭০ সালে হেগ কনভেনশন এবং তারও পূর্বে ১৯৬৩ সালে ১২১টি রাষ্ট্রের সমন্বয়ে টোকিও কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়।

মন্ত্রিপরিষদ (Ministry)

সাধারণ সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় সাধারণ নির্বাচনের পর যে দল আইনসভা বা কমন্সসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনে সক্ষম হয় সেই দলের সদস্যদের নিয়ে মন্ত্রিপরিষদ বা শাসন বিভাগ গঠিত হয়। প্রধানমন্ত্রী রাজা রানী কিংবা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবার পর তাঁর পরামর্শে মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের নিয়োগ দান করেন, মন্ত্রী পরিষদ হলো একটি সমষ্টিগত সংস্থা। তারা তাদের কাজের জন্য ব্যক্তিগতভাবে ও যৌথভাবে পার্লামেন্টের নিকট দায়ী থাকেন। মন্ত্রিপরিষদের সদস্যদের স্থায়িত্বকাল প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছার ওপর নির্ভরশীল।

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার (Caninet Government)

এমন এক ধরনের সংসদীয় ব্যবস্থা যেখানে প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা সকল নির্বাহী ক্ষমতা প্রয়োগ করে। পার্লামেন্ট সংবিধান অনুযায়ী সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যত মন্ত্রিসভার সদস্যরাই সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। অবশ্য এরকম অবস্থায়ও সংসদের সদস্যদের মধ্য থেকেই প্রধানত মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ দেয়া হয় এবং সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে।

মন্ত্রিপরিষদ সচিব (Cabinet Secretary)

সচিবদের মধ্যে সর্বোচ্চ পদ। বিশেষ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সচিব আমলাতন্ত্রের প্রধান কর্মকর্তা। সাধারণত সিনিয়র সচিব এ পদে অধিষ্ঠিত হন। যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট সেক্রেটারি পদবিটি দু'জন কর্মকর্তাকে বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। এক. হোয়াইট হাউজের একজন কর্মকর্তা এবং দুই. মন্ত্রিসভার সদস্য। বাংলাদেশ মন্ত্রিপরিষদ সচিব পদমর্যাদায় সংসদ সদস্যদের ওপরে অবস্থান করেন। অবশ্য অন্যান্য সচিবদের ক্ষেত্রে তা নয়।

মন্ত্রিসভা (Cabinet)

মন্ত্রিপরিষদ শাসিত সরকার (সংসদীয়) ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এবং বা রাষ্ট্রপতি শাসিত ব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি কর্তৃক পছন্দকৃত ব্যক্তিদের নিয়ে মন্ত্রিসভা গঠিত হয়।

মন্ত্রিসভার সদস্যরা সরকারের বিভিন্ন বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেন। পার্লামেন্টারি বা সংসদীয় ব্যবস্থায় প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা সংসদের কাছে তাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী থাকে। সংসদের আস্থা হারালে মন্ত্রিসভার পতন ঘটে। প্রধানমন্ত্রী মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়োগ দান করেন।

মন্ত্রী (Minister)

মন্ত্রী বা Minister ইংরেজি শব্দটি উৎপত্তিগত অর্থে নিম্নস্তরের লোক (Person of Lower Status), ভৃত্যকে (Servant) বোঝাত। আবার ফরাসিশব্দ Ministre বলতে Servant বা attendent বোঝাত। ১৬ শতকে এর অর্থের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। তখন elergyman বোঝাতে শব্দটি ব্যবহৃত লক্ষ্য করা যায়। তবে ১৭ শতকে Minister শব্দটি বর্তমান রাজনৈতিক রূপ লাভ করে। (Servant of the Crown) থেকে মন্ত্রী, মন্ত্রিসভার সদস্য। মন্ত্রী বলতে প্রধানমন্ত্রী, প্রতিমন্ত্রী, উপমন্ত্রী সকলকেই বোঝায়, যারা সরকারি বিভাগ বা মন্ত্রণালয়ের প্রধান হিসেবে কাজ করেন। তবে কোনো কোনো দেশের মন্ত্রণালয়ের প্রধানকে মন্ত্রী বলা হয় না। যুক্তরাষ্ট্রে বলা হয় Secretary, যুক্তরাজ্যের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রীকে বলা হয় Foreign Secretary of State।

মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা (Ministrial Responsibility)

সংসদীয় সরকার ব্যবস্থায় 'মন্ত্রীদের দায়িত্বশীলতা' বলতে পার্লামেন্টের নিকট মন্ত্রীদের জবাবদিহিতা অর্থাৎ রাজনৈতিক দায়িত্বশীলতাকে বোঝায়; এটা কোনো আইনগত দায়িত্বশীলতা নয়। ব্যাপক দৃষ্টিকোণ থেকে একজন ব্রিটিশ মন্ত্রী তিনটি পর্যায়ে দায়িত্বশীল থাকে- প্রত্যক্ষভাবে পার্লামেন্টের নিকটে দায়িত্বশীল; পরোক্ষভাবে জনগণের নিকট দায়িত্বশীল এবং সাংবিধানিক বা আইনগতভাবে রাজা ও রানির নিকট দায়িত্বশীল। সরকারি সকল সাধারণ নীতি ও সিদ্ধান্তের ব্যাপারে মন্ত্রীগণ যৌথভাবে এবং প্রত্যেক মন্ত্রী তার ব্যক্তিগত এবং বিভাগীয় কাজ কর্মের জন্য এককভাবে পার্লামেন্টের নিকট প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল। প্রত্যক্ষভাবে দায়িত্বশীল এ কারণে যে, সরাসরি পার্লামেন্টে মন্ত্রীদেরকে সংশ্লিষ্ট বিষয় ব্যাখ্যা করতে হয়; প্রশ্নোত্তর দিতে হয় এবং নিন্দা প্রস্তাব বা অনাস্থা প্রস্তাব পাশ হলে সাথে সাথে পদত্যাগ করতে হয়। মন্ত্রীগণ জনগণের নিকট পরোক্ষভাবে দায়িত্বশীল। কারণ জনগণের নিকট সরাসরিভাবে তারা জবাবদিহি করতে বাধ্য নন; কিন্তু যে পার্লামেন্টের নিকট সরাসরি জবাবদিহি করতে বাধ্য সেই পার্লামেন্ট তো জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত। সুতরাং জনপ্রতিনিধিদের কাছে দায়িত্বশীল থাকার পরোক্ষ অর্থ হোল জনগণের কাছে জবাবদিহি করা। আবার, মন্ত্রীগণ সাংবিধানিক বা আইনগতভাবে রাজা ও রানির নিকট দায়িত্বশীল। এ দায়িত্বশীলতা রাজনৈতিক নয়; বরং আইনগত। কারণ ব্রিটেনে স্মরণাতীত কাল থেকে রাজতন্ত্র চলে আসছে; আইনগতভাবে রাজা ও রানিই রাজ্যের সকল ক্ষমতার মালিক; মন্ত্রীরা তার অধীনস্থ কর্মচারী মাত্র; আইনগতভাবে তিনি যেকোনো মন্ত্রীকে যখন ইচ্ছা বরখাস্ত করতে পারেন। কিন্তু আইনগতভাবে রাজার

নিকট মন্ত্রীদের এই দায়িত্বশীলতা একটি তত্ত্বগত ধারণা মাত্র (a theory only); কার্যতঃ ইহা আইনগত অবাস্তবতা (legal fiction) ব্যতীত কিছুই নয়।

মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্বশীলতা (Collective Responsibility of Minister)

মন্ত্রীপরিষদ শাসিত সরকার ব্যবস্থায় সরকারের মূল শক্তি হলো মন্ত্রীদের যৌথ দায়িত্ব। যৌথ দায়িত্বশীলতা বলতে পার্লামেন্টের কাছে সামগ্রিকভাবে ক্যাবিনেটের বা মন্ত্রিসভার দায়িত্বকে বোঝায়। প্রত্যেক মন্ত্রীকেই মন্ত্রিসভার সমষ্টিগত দায়িত্ব বহন করতে হয়। সরকারের নীতি নির্ধারণ বা সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মন্ত্রিসভার সদস্যদের মধ্যে মতপার্থক্য থাকতে পারে, কোনো একটি বিষয়ে আলোচনার সময়ে কোনো মন্ত্রী অনুপস্থিত থাকতে পারেন, উপস্থিত থেকে বিরুদ্ধমত পোষণ করতে পারেন। কিন্তু সভায় একবার কোনো নীতি নির্ধারিত হলে বা কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে সকল মন্ত্রীকেই সামগ্রিকভাবে তার জন্য দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হবে। কোনো মন্ত্রী কোনো অজুহাতে এ দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে পারে না। তবে কোনো মন্ত্রী ব্যক্তিগতভাবে বা নীতিগতভাবে মন্ত্রীসভার সিদ্ধান্তের প্রতি সমর্থন জানাতে না পারলে উক্ত মন্ত্রীর পদত্যাগ করা ছাড়া কোনো উপায় থাকে না এবং এরূপ পদত্যাগ করলে মন্ত্রিসভার ঐক্য শিথিল হতে বাধ্য।

মস্কো-ঘোষণা (Moscow Declearation)

১৯৯৯ সালে চীনের প্রেসিডেন্ট জিয়াং জে মিন মস্কো সফর করেন এবং রুশ প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলিৎসিন-এর সঙ্গে আলাপ-আলোচনার ভিত্তিতে উভয় নেতা যে যৌথ ঘোষণা দেন। সেটাই মস্কো-ঘোষণা নামে পরিচিত। এই ঘোষণার মাধ্যমে দীর্ঘদিনের রুশ ও চীন ঠাণ্ডাযুদ্ধের অবসান ঘটে এবং উভয় পক্ষ সাবেক চীন সোভিয়েত সীমান্ত থেকে সৈন্য সংখ্যা হ্রাস করতে সম্মত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত রাষ্ট্রের সঙ্গে চীনের সীমান্ত রয়েছে, সেইসব রাষ্ট্রের নেতারাও মস্কো ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণায় উভয় নেতাই এককেন্দ্রিক (Unipolar) বিশ্ব ও একটি দেশ কর্তৃক সমস্ত আন্তর্জাতিক ব্যাপারে কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার তৎপরতাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মত প্রকাশ করেন এবং বহুকেন্দ্রিক (Multipolar) বিশ্বের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এই যৌথ ঘোষণার পরপরই রাশিয়া চীনের নিকট সাবমেরিনসহ অত্যাধুনিক সমরাস্ত্র বিক্রয় করবে বলে চুক্তিবদ্ধ হয়। মস্কো-ঘোষণার মধ্য দিয়ে রুশ-চীন স্বাভাবিক সম্পর্কের সূচনা ঘটে।

বিশ্বযুদ্ধ, দ্বিতীয় (Second World War)

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সম্পাদিত ভার্সাই চুক্তিতে পরাজিত জার্মানির ওপর যে সমস্ত অপমানজনক, ভারসাম্যহীন ও নির্যাতনমূলক শর্তাদি চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল, সেগুলো মেনে চলা কোনো দেশপ্রেমিক ও আত্মসম্মান বোধসম্পন্ন জার্মানির পক্ষেই সম্ভব ছিল না। মিত্রপক্ষের এই অদূরদর্শী ও প্রতিহিংসামূলক শর্তাবলীই ছিল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের

প্রধান কারণ। এই কারণের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী প্রতিযোগিতা, অস্ত্র প্রতিযোগিতা এবং জার্মানদের উগ্র দেশপ্রেম ও আর্য ও আভিজাত্যবোধ। ১৯৩৩ সালে ক্ষমতায় আসীন হয়েই হিটলার ভার্সাই চুক্তিকে উপেক্ষা করে শক্তি সঞ্চয় শুরু করেন এবং খণ্ডিত জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ করা ও জার্মান সাম্রাজ্য স্থাপনের লক্ষ্যে ১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত ঘটে। ৩ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ড আক্রমণের মাধ্যমে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সূচনা করেন। ৩ সেপ্টেম্বর ব্রিটেন ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ২৮ সেপ্টেম্বর জার্মানি ও রাশিয়া পোল্যান্ডকে ভাগ করে নেয়। ১৯৪০ সালের এপ্রিল মাসে হিটলার ডেনমার্ক ও নরওয়ে দখল করেন। অচিরেই নেদারল্যান্ড ও লুক্সেমবার্গের পতন ঘটে। মে মাসে বেলজিয়ামেরও পতন ঘটে। ১৪ জুন নাৎসিবাহিনী প্যারিস দখল করে। অগাস্ট মাসে ১৫০০ জার্মান বোমারু বিমান ইংল্যান্ড আক্রমণ করে, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী চার্চিলের বলিষ্ঠতার মুখে এই আক্রমণ ব্যর্থ হয়। ক্রমশ হিটলার যুগোস্লোভিয়া ও মুসোলিনি গ্রিস দখল করেন। বুলগেরিয়া, ইতালি, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়া হিটলারের পক্ষ অবলম্বন করে। এতদিন যাবৎ সমাজতন্ত্রবিরোধী হিটলার ও সমাজতন্ত্রী স্ট্যালিন ছিলেন অন্তরঙ্গ মিত্র। কিন্তু বলদর্পী হিটলার ১৯৪১ সালের ২২ জুন অতর্কিতে রাশিয়া আক্রমণ করে বসেন। পূর্বাঞ্চলে জাপান ১৯৪০ সালের জুন মাসের মধ্যেই ইন্দোচীন দখল করে নেয়। ১৯৪১ সালের ৭ ডিসেম্বর ৪২৩টি জাপানি বিমান হাওয়াইয়ের পার্লহারবারস্থ মার্কিন ঘাঁটি আক্রমণ করে বসে। পরদিন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রও জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ১৯৪২ সালের মধ্যেই জাপান হংকং, ফরমোজা, মালয় ও বার্মা দখল করে নেয়। সিঙ্গাপুরেরও পতন ঘটে। এমতাবস্থায় ব্রিটেন, যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে আত্মরক্ষার প্রয়োজনে স্বাভাবিকভাবেই মিত্রজোট গড়ে ওঠে। ধীরে ধীরে অবস্থার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। ১৯৪৩ সালে লেনিনগ্রাডের যুদ্ধে জার্মানবাহিনী পরাজয় বরণ করে। ১৯৪৩ সালের মে মাসে উত্তর আফ্রিকা থেকেও নাৎসিবাহিনীকে উৎখাত করা হয়। মিত্রশক্তির প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে সেপ্টেম্বরে (১৯৪৩) মুসোলিনির পতন ঘটে এবং ইতালি আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যেই জার্মানি ইতোপূর্বে দখলকৃত প্রায় সব এলাকাই হারিয়ে ফেলে। ৩০ এপ্রিল হিটলার আত্মহত্যা করেন এবং ২ মে জার্মানি আত্মসমর্পণ করে। ১৯৪৫ সালের ৬ অগাস্ট জাপানের হিরোশিমা এবং ৯ আগস্ট নাগাসকির ওপর আণবিক বোমা বিস্ফোরণের ফলশ্রুতিতে ২ সেপ্টেম্বর জাপানও আত্মসর্পণ করে এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে আনুমানিক ২.২০ কোটি মানুষ প্রাণ হারায়, ৩.৪০ কোটি মানুষ আহত হয়, ১০০০ মিলিয়ন ডলারের ওপর খরচ হয়, আরও ১০০০ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পদাদি ধ্বংস হয় এবং পরোক্ষভাবে ক্ষতি হয় আরও কোটি কোটি মানুষের। এই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে পূর্ব ইউরোপের দেশসমূহ সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয় এবং জাতিসংঘের উদ্ভব ঘটে।

বিশ্বযুদ্ধ, প্রথম (First World War)

অস্ট্রিয়ার যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ডের হত্যার মধ্য দিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত হয়। তাছাড়া উগ্র জাতীয়বাদ, সাম্রাজ্যবাদী দ্বন্দ্ব, অস্ত্র প্রতিযোগিতা, আন্তর্জাতিক নৈরাজ্য

ইত্যাদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মৌলিক কারণ। ১৯১৪ সালের ২৮ জুন সার্বিয়া সফরকালে যুবরাজ ফার্ডিন্যান্ড ও তৎপত্নী সোফিয়া আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে তারই সূত্র ধরে ২৮ জুলাই অস্ট্রিয়া সার্বিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। যথাশীঘ্রই এ-যুদ্ধ সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ে। এই যুদ্ধে দুইটি পক্ষ সৃষ্টি হয়, যথা- মিত্রপক্ষ ও শত্রুপক্ষ। গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া, ইতালি, রুমানিয়া, গ্রিস, সার্বিয়া, মন্টেনিগ্রো, বেলজিয়াম, পর্তুগাল, চীন, জাপান প্রমুখকে নিয়ে গঠিত হয় মিত্রপক্ষ। আর জার্মানি, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি, অটোম্যান সম্রাজ্য, বুলগেরিয়া প্রমূখকে নিয়ে গঠিত হয় চক্রীপক্ষ। যুক্তরাজ্যও মিত্রপক্ষে যোগদান করে। প্রথম দিকে শত্রুপক্ষ একের পর এক বিজয় অর্জন করে। কিন্তু, যুক্তরাষ্ট্র ১৯১৭ সালের ৬ এপ্রিল জার্মানির বিরুদ্ধে এবং ডিসেম্বর মাসে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটে। এই সময়ে শ্যাম (বর্তমান থাইল্যান্ড), লাইবেরিয়া, চীন, ব্রাজিল, গুয়াটেমালা, কোস্টারিকা, নিকারাগুয়া, হাইতি, হন্ডুরাস প্রমুখও মিত্রপক্ষে যোগ দেয়। ১৯১৮ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর বুলগেরিয়া আত্মসমর্পণ করে। এক মাসের মধ্যে তুরস্ক এবং অস্ট্রিয়া হাঙ্গেরিও আত্মসমর্পণ করে। জার্মানির অভ্যন্তরেও দেখা দেয় বিশৃঙ্খলা। ১৯১৮ সালের ২৮ অক্টোবর কীল-এ নৌবাহিনী বিদ্রোহ করে; ৮ নভেম্বর মিউনিখে শুরু হয় বিদ্রোহ। এমতাবস্থায়, ৯ নভেম্বর কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়াম পদত্যাগ করেন এবং নেদারল্যান্ডে পালিয়ে যান। অন্যন্যোপায় চ্যান্সেলর প্রিন্স ম্যাক্সিমিলিয়ান ১১ নভেম্বর সকাল ১১ টায় মিত্রপক্ষের সর্বাধিনায়ক মার্শাল ফক-এর নিকট আত্মসমর্পণ করলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটে। এই যুদ্ধে সর্বপ্রথম বিমান, সাবমেরিন ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়। যুদ্ধ সমাপ্তির পর মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর ১৪ দফা প্রস্তাবের ভিত্তিতে ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে প্যারিসের নিকটবর্তী ভার্সাইতে এক শান্তি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এবং এর ফলশ্রুতিতে ২৮ জুন একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই যুদ্ধে মিত্রপক্ষে ৪.২ কোটি সৈন্য এবং চক্রীপক্ষে ২.৩ কোটি সৈন্য অংশগ্রহণ করে; তৎকালীন মূল্যে ১৮৬ বিলিয়ন ডলার মূল্যের সম্পত্তি বিনষ্ট হয়, একমাত্র ব্রিটেনেরই ৬০০০ হাজার ধ্বংস হয়, জার্মানি একাই হারায় ২০০টি সাবমেরিন। এই যুদ্ধে মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়ায় প্রায় এক কোটিতে এবং আহত হয় প্রায় দুই কোটি মানুষ। ভার্সাই চুক্তির শর্তানুসারে জার্মানি তার বিপুল এলাকা ও সাম্রাজ্য ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়, জার্মানির ওপর অস্বাভাবিক অঙ্কের ক্ষতিপূরণ ধার্য করা হয়, জার্মান সেনাবাহিনীর জন্য বিমান, ট্যাঙ্ক, সাবমেরিন ইত্যাদির ব্যবহার প্রায় নিষিদ্ধ করা হয় এবং বাস্তবত জার্মানির সার্বভৌমত্বই খর্বিত করে দেওয়া হয়। এই যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতেই জাতিপুঞ্জ (League of Nations)-এর জন্ম হয়।

মহাসনদ (The Great Charter)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে রাজা দ্বিতীয় হেনরীর পুত্র জন (John) ছিলেন অত্যন্ত খামখেয়ালী ও স্বৈরাচারী শাসক। তাঁর এই ধরনের স্বেচ্ছাচারমূলক কার্যকলাপে অভিজাত ও ভূ-

স্বামীগণ অতিষ্ঠ হয়ে রাজার ক্ষমতার ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের ব্যাপারে উদ্যোগী হন। ১২১৩ সালে রাজা জন প্রত্যেক কাউন্টি থেকে চারজন নাইট এবং ছোট ছোট ভূ-স্বামীদের বৃহত্তর পরিষদে পাঠাবার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। ফলে এই পরিষদের সদস্য সংখ্যা ও আয়তন যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। তারপর ১২১৫ সালে ১৫ জন রুনীমিড প্রান্তরে রাজা জন তৎকালীন অভিজাত শ্রেণি ও ব্যারণদেরকে কিছু রাজকীয় ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংক্রান্ত একটি ঐতিহাসিক দলিলে স্বাক্ষর করেন, যা মহাসনদ (Magna Carta) নামে পরিচিত। এতে একটি প্রস্তাবনাসহ মোট ৬৩টি ধারা সম্বলিত ছিল। এই দলিলে রাজা জন ব্যারণদের বহু দাবি এবং জনগণের চাপে কতগুলো গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা করতে বাধ্য হন। তিনি অঙ্গীকার করেন যে, বৃহত্তর পরিষদের সম্মতি ছাড়া কোনো ব্যক্তির ব্যক্তিগত সম্পত্তির ওপর অবাধ হস্তক্ষেপ কিংবা বিশেষ কর আদায় করবে না, রাজা কোনো স্বাধীন ব্যক্তিকে বিনা বিচারে বা বে-আইনীভাবে গ্রেপ্তার করতে, নির্বাসন দিতে বা সম্পত্তিচ্যুত না করার প্রতিশ্রুতি দেন। রাজার ক্ষমতা সীমাহীন নয়, বরং প্রচলিত আইনের দ্বারা সীমাবদ্ধ। ক্ষমতার অপব্যবহার করলে রাজাকে বাধা দেওয়া যাবে– এসব ঘোষণার ফলে স্বৈরাচারী ব্যবস্থার পরিবর্তে নিয়মতান্ত্রিক রাজনৈতিক ব্যবস্থার পথ প্রশস্ত হয়। এটি শাসনতান্ত্রিক বিবর্তন ধারায় একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা (Mountbatten Plan)

ব্রিটিশ-ভারতের তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ১৯৪৭ সালের ৩ জুন তারিখে ভারত উপমহাদেশের বিভক্তি এবং নবগঠিত ভারত ও পাকিস্তানের জনগণের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে ভিত্তি ও পদ্ধতি ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে প্রদান করেন, সেটাই ইতিহাসে মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা বলে খ্যাত। ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত গণভোটের ফলাফল অনুযায়ী পাঞ্জাব ও বঙ্গ প্রদেশের মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চল এবং সিন্ধ, বেলুচিস্তান ও উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ নিয়ে পাকিস্তান এবং উপমহাদেশের অন্য এলাকা নিয়ে ভারত রাষ্ট্র গঠিত হবে বলে এই পরিকল্পনায় উল্লেখ করা হয়। কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ উভয়েই এই পরিকল্পনাটি শেষ পর্যন্ত গ্রহণ করে।

মাও সে তুঙ (Mao Tse Tung)

১৯২০ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই সংগঠনের সঙ্গে মাও সে তুঙ (Mao Zhe Dong) (১৮৯৩-১৯৭৬) জড়িত ছিলেন। ত্রিশের দশকে চেন তু সিউ প্রমুখ সুবিধাবাদীরা ভ্রান্ত লাইন গ্রহণ করলে পার্টি বিভক্ত হয়ে যায় এবং মাও সে তুঙ মূল পার্টির নেতৃত্বে চলে আসেন। ত্রিশের দশকের বিখ্যাত লং মার্চও তাঁরই নেতৃত্বেই অনুষ্ঠিত হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জাতীয় প্রশ্ন প্রধান হয়ে দেখা দিলে তিনি অনুপ্রবেশকারী সাম্রাজ্যবাদী শক্তির বিরুদ্ধে সরকারের সঙ্গে যুক্তফ্রন্ট গঠন করে রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দেন। যুদ্ধের পর ১৯৪৯ সালে চিয়াং কাইশেককে বিতাড়িত করে কমিউনিস্ট চীনের প্রতিষ্ঠা করেন এবং আমৃত্যু চীনের অবিসংবাদিত

নেতা হিসেবে বহাল থাকেন। 'শতফুল ফোটা', 'গ্রেট লীফ ফরওয়ার্ড', 'সাংস্কৃতিক বিপ্লব' প্রভৃতি পদক্ষেপ বস্তুত তাঁরই উদ্যোগে গৃহীত হয়। সর্বহারা শ্রেণির বিপ্লবী তত্ত্বের সঙ্গে 'আধা-ঔপনিবেশিক আধা-সামন্তবাদী' সমাজব্যবস্থায় 'জনগণতান্ত্রিক' বিপ্লবের তত্ত্ব দিয়ে তিনি মার্কসবাদ লেনিনবাদ এর সঙ্গে নতুন মাত্রার সংযোজন করেন। ১৯৫৬ সালের পর নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হলে, মাও রুশবিরোধী ভূমিকায় অবতীর্ণ হন এবং সোভিয়েত ইউনিয়নকে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী বলে চিহ্নিত করেন। তাঁর লেখাসমূহ পার্টি সংগঠন ও শৃঙ্খলা, ক্যাডার ও নেতাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য, গ্রামীণ এলাকায় কাজ করার পদ্ধতি, কৃষক শ্রমিকের মৈত্রী ইত্যাদি বিষয়ের ওপর লিখিত। তাঁর 'দ্বন্দ্ব প্রসঙ্গে' (On Contradiction) সর্বাধিক পঠিত ও আলোচিত রচনা। ১৯৭৬ সালে তাঁর মৃত্যুর পরপরই তাঁর অনুসারীরা ক্ষমতাচ্যুত হন এবং সাংস্কৃতিক বিপ্লবসহ মাও সে তুঙ-এর বিভিন্ন পদক্ষেপ কঠোর সমালোচনার সম্মুখীন হয়। পক্ষান্তরে একসময় বহিস্কৃত লিউ শাও চি, তেং শিয়াও পিং (দেং জিয়াও পিং) প্রমুখ পুনরায় সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত হন। অচিরেই চীন থেকে মাওবাদের কার্যত অবলুপ্তি ঘটে।

মাওবাদ (Maoism)

চীনের কমিউনিস্ট নেতা মাও জে-দং (১৮৯৩-১৯৭৬) এর রাজনৈতিক তত্ত্ব ও প্রয়োগ, যাতে জনগণের কমিউনিস্ট বিপ্লবের আকৃতি এবং তাদের উন্মুক্ত প্রভাবকে সমন্বিত করার প্রয়াস দেখা যায়। ১৯২০ সালে চীনের কমিউনিস্ট পার্টির সৃষ্টিলগ্ন থেকেই এই সংগঠনের সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন। মুনাফা অর্জনের প্রবণতাকে রদ করার জন্য নৈতিক উদ্দীপনাকে উৎসাহিত করা হয় এই মতবাদে। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী দর্শনের নিরিখে মান্য করা হয় মাওবাদে বিরোধিতাকে; অবশ্য সেই বিরোধিতা কমিউনিস্ট পার্টির বিরুদ্ধে ছিল না। লোকসমাজ ও কমিউনকে সঠিকভাবে কেন্দ্র করে বৈপ্লবিক রূপান্তরের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়, যাতে কৃষক আন্দোলনের পটভূমিকায় সমগ্র সমাজ উৎপাদন শক্তির উন্নয়ন ব্যতিরেকেই বৈপ্লবিক রূপান্তরের অভিমুখে অগ্রসর হতে পারে। মাওবাদ অনগ্রসর কৃষিপ্রধান তৃতীয় বিশ্বের কাছে একটি আদর্শ ছিল আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে। অনেকের মতে মাওবাদ ট্রটস্কি প্রদর্শিত স্থায়ী বিপ্লব চিন্তার সমান। মাওবাদের প্রসারের ফলে চীন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপরীতমুখী দুটি শিবিরে বিভক্ত হয় বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলন। ষাট ও সত্তরের দশকে যাঁরা সোভিয়েত কমিউনিস্টদের আমলাতান্ত্রিক একনায়কত্বে বীতশ্রদ্ধ হয়ে নব বাম আন্দোলন গড়ে তোলেন তাঁরা মাওবাদকে অনেকাংশে গ্রহণ করেন।

মাতৃতান্ত্রিক মতবাদ (Matriarchal Theory)

মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে মাতৃতান্ত্রিক মতবাদের সৃষ্টি। এর বৈশিষ্ট্য হলো যে, পরিচালনার ক্ষমতা পুরুষ সদস্যের পরিবর্তে মাতা, স্ত্রী বা বয়স্কা নারীর ওপর অর্পিত থাকে। পুরুষের অনুরূপ তারাই মূল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর

অভিমতে, মানব সমাজে প্রথমে মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের আবির্ভাব ঘটে। প্রাথমিক স্তরে সুগঠিত এবং সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে যৌন মিলন স্থাপিত হয়নি, সে কারণে সন্তানের জনক নির্ধারণ সম্ভব ছিল না। নারী সন্তানদের লালন-পালনের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারত না বলে মাতাকে চেনার কোনো অসুবিধা হত না। মাতা সন্তানের সকল দায়িত্ব পালন ক্ষমতা এবং সার্বিক দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে পরিবারের কর্তায় পরিণত হয়। অবাধ যৌনাচার থাকায় কন্যা সন্তানদের প্রতি অধিক সহানুভূতি দেখান হত, ফলে সম্পত্তির অধিকার কন্যা সন্তানদের ওপর অর্পিত হয়। এমনিভাবে নারী পারিবারিক প্রাধান্য দখল করে। উত্তরাধিকার মনোনয়ন, অধিকার এবং পরিচয়ের সূত্র মাতার নিকট থেকে আসে। পুরুষগণ সমাদর লাভকারী মেহমানের মতো বাড়িতে থাকত। নারী এভাবে পরিবারের কর্তা ব্যক্তিতে পরিণত হয় এবং কালক্রমে পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে রাষ্ট্র গঠিত হলে কর্তৃত্ব তাদের ওপরই অর্পিত থাকে। মতবাদানুসারে পিতৃতান্ত্রিক না হয়ে মাতৃতান্ত্রিক ধারাতে রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে। এর প্রবক্তা হলেন ম্যাকলিনান, মরগ্যান, জেংকস, পিডিংটন প্রমুখ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী। অবাধ যৌন মিলনে এমনিভাবে নারী কর্তৃত্ব লাভ করে। পরিবারের বৃদ্ধি সাধনের ফলে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হলেও এ মতবাদে বিশ্বাসীদের কথায়, প্রাথমিক অবস্থায় পরিবারের কোনো ধারণা ছিল না। সে সময়ে ছিল যাযাবর প্রকৃতির জীবনপদ্ধতি। কিছু সংখ্যক লোক দলবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে বসবাস ক্ষমতা এবং অবাধ যৌন মিলনে সন্তান জন্ম দিত। ওই সব সন্তানের পিতৃ পরিচয় পাওয়া যেত না। মাতাকে ঘিরেই পরিচয় নির্ধারিত হত। কৃষি-কর্মের আর্বিভাবে স্থায়ী বসবাস শুরু হয় এবং নারী-পুরুষ মিলিত হয়ে সংসার আরম্ভ করে। এর কারণে জন্ম লাভ করে পরিবার। সুতরাং তাদের ভাষায়, পরিবার সম্প্রসারিত হয়ে গোষ্ঠী নয় বরং গোষ্ঠী ভেঙে পারিবারিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। মানুষ স্থায়ী বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হতে থাকে। এমনিতে পরিবার মিলিত হয়ে উপজাতি এবং সকল উপজাতি মিলিত হয়ে রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে।

প্রাথমিক অবস্থায় যেহেতু নারীর প্রাধান্য ছিল তা পরবর্তীতে নানা কারণে অব্যাহত থাকে। মাতৃতান্ত্রিক পরিবার থেকে রাষ্ট্র জন্মলাভ করে বলে এ শ্রেণির চিন্তাবিদগণ মনে করেন। ম্যাকলিন Primitive Society (1865), জেংকস History of Politics (1890) এবং মরগান তার Studies in Ancient Society নামক গ্রন্থে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। এ মতবাদের অনেক সমালোচনা আছে। প্রাচীনকালে থাকলেও এখন এর অস্তিত্ব খুব একটা নেই। আমেরিকার ইন্ডিয়ানদের ইরোকুয়া ও খাসি উপজাতির মহিলারা সম্পত্তি নিয়ন্ত্রণে বেশ ভূমিকা পালন করতে পারে। অনেক সমাজবিজ্ঞানীর মতে, আদিকাল থেকে পারিবারিক নেতৃত্ব পুরুষের ওপর অর্পিত আছে। কোনো স্থানে থাকলেও মাতৃতান্ত্রিক সূত্র অনুসারে রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়েছে বলে যে মতামত প্রদান করা হয় তা যথার্থ নয়। পরিবার পিতৃতান্ত্রিক বা মাতৃতান্ত্রিক যাই হোক না কেন, উভয় উভয়ের দ্বারা ভয়ানকরূপে যে প্রভাবিত হয়েছে সে বিষয়ে কোনো দিক নির্দেশনা অত্র বিষয়ে প্রবক্তাগণ উপস্থাপন করতে ব্যর্থ হয়েছেন। সকল তত্ত্বেরই দোষ-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, তবে পরিবার যে রাষ্ট্রের প্রাথমিক স্তর সে প্রমাণ এক্ষেত্রে পাওয়া যায়। তাছাড়া কর্তৃত্ব

যার হাতে থাক না কেন, নারীকে কেন্দ্র করে পরিবার আবর্তিত হয়েছে তা মিথ্যা নয়। তত্ত্বে স্থায়ী বিবাহের দিক নির্দেশনা দিয়ে নারীর মর্যাদা প্রদান করা হয়েছে। (সূত্র: ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

মাদার তেরেসা (Mother Terasa)

মাদার তেরেসা যুগোশ্লাভিয়ার বংশোদ্ভূত ভারতীয় নাগরিক। তিনি দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত এক মহান ব্যক্তিত্ব। ১৯১০ সালে তিনি যুগোশ্লাভিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। ১৯২৮ সালে তিনি কলিকাতায় আগমন করেন এবং সেখানে মিশনারী প্রতিষ্ঠা করে আত্ম-মানবতার সেবায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন। ১৯৯৭ সালের আগস্ট মাসে তিনি কলকাতায় ইন্তেকাল করেন।

মানবকল্যাণবাদ (Utilitarianism)

মানব কল্যাণবাদ অনুযায়ী প্রত্যেক ব্যক্তি নিজের সুখ ও সুবিধা সম্পর্কে ভালই জানে। সুখের সন্ধানে ব্যক্তি যখন নিজেকে নিয়োজিত করে তখন ব্যক্তির কাছে রাষ্ট্র বা তার আইন যেন কখনই বাধা হয়ে না দাঁড়ায়। রাষ্ট্র লক্ষ্য নয়, মানুষের জীবনকে সুখী করার একমাত্র পন্থা। অর্থাৎ যে ব্যবস্থার মাধ্যমে সর্বাধিক মানুষের সর্বাধিক সুখ বিধান করা যায়, সেই ব্যবস্থা বা ব্যবস্থার দর্শনকেই বলা হয় মানকল্যাণবাদ। এই মতবাদ অনুযায়ী সকল সামাজিক, রাজনৈতিক প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের উপরোক্ত লক্ষ্যে কাজ করা উচিত। প্রচীন দার্শনিকদের মধ্যে এপিকিউরাস (Epicurus, খ্রিস্টপূর্ব ৩৪১ অব্দ) প্রথম এই মতবাদ প্রচার করেন। কিন্তু তিনি এর প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন ব্যক্তিগত পর্যায়ে, সামাজিক পর্যায়ে নয়। আধুনিক দার্শনিকদের মধ্যে জেরেমি বেন্থাম সামাজিক পর্যায়ে মানবকল্যাণবাদ প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি 'সর্বাধিক মানুষের জন্য সর্বাধিক সুখ' স্লোগানটিকে জনপ্রিয় করার প্রয়াস পান। পরবর্তীকালে জন স্টুয়ার্ট মিল এই মতবাদের বিকাশসাধন করেন।

মানবতাবাদ (Humanism)

এটি মানবজাতির স্বার্থ ও কল্যাণসংক্রান্ত মতবাদ। ইউরোপের নবজাগরণ বা রেনেসাঁর সময়ই মানবতাবাদের উৎপত্তি হয় শব্দটি। নানা অর্থে ব্যবহৃত হলেও, প্রধানত পুরনো গ্রিক প্রবচন যে 'মানুষই সব কিছুর মাপকাঠি' সেই নিরিখে ঐশী সত্তার বিপরীত বা বহির্ভূত মানুষকেই সবকিছুর কেন্দ্রবিন্দু, আধার, শক্তি ও মূল্যবোধের উৎস এবং শিল্প, সংস্কৃতি, রাজনীতি প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ের মূল হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এর প্রধান লক্ষণ ছিল ধর্মীয় অনুশাসন থেকে জনজীবনের মুক্তি, বুদ্ধির স্বাধীনতা, বিজ্ঞানের চর্চা এবং অতিপ্রাকৃত শক্তির সাহায্যে ছাড়াই মানুষ নিজেই যে তার ভাগ্য ও ভবিষ্যতের নিয়তি সেই চেতনার বিস্তার এবং নিজ অবস্থান উন্নয়নে নিজস্ব কর্তব্যের বোধ ও

বিশ্বাস। বুদ্ধি ও মননশীলতার সাহায্যে প্রকৃতিকে জানা ও জয় করা ছাড়াও জ্ঞানের যথোচিত ব্যবহার এবং সমাজজীবনের নৈতিক সমস্যাসমূহ যুক্তিবোধের সাহায্যে সমাধানও মানবতাবাদীর কর্তব্য। জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা নির্বিশেষে মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদা প্রদর্শন মানবতাবাদীর একটি মৌল আদর্শ। ব্যক্তিস্বাধীনতা, যুক্তিবোধ, নৈতিকতা ও বিশ্বজনীন মনোভঙ্গী হলো তার অন্যান্য নীতি। মানবতাবাদ জঙ্গি নাস্তিকতার পরিবর্তে মানুষের সাধারণ ও স্বাভাবিক দুর্বলতার প্রতি অসহিষ্ণুতা প্রকাশ পায়। যাঁরা মনে করেন ঈশ্বরের করুণা ছাড়া মানুষের সকল প্রয়াসই বৃথা, তারাই মানবতাবাদের বিরোধী এবং অন্ধবিশ্বাসপ্রবণ মানুষ।

মানবপ্রকৃতি (Human Nature)

প্রতিটি মানুষের মধ্যে একটি স্বভাবজাত প্রবৃত্তি থাকে, সেই বিশ্বাসের ওপর ভিত্তি করেই মানবপ্রকৃতি প্রত্যয়টির উদ্ভব ঘটে। মানুষের প্রকৃতি সম্পর্কে একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি রচনার প্রয়াস দেখা যায় সকল রাষ্ট্রদর্শনের শুরুতে। প্রাচীন গ্রিক রাষ্ট্রচিন্তার সময় থেকে অদ্যাবধি রাষ্ট্রদার্শনিকেরা তাত্ত্বিক আলোচনা সময় সমাজ, রাষ্ট্র ইত্যাদি ভাবনার প্রথমেই মানুষের সাধারণ প্রকৃতি বিশ্লেষণ ও তত্ত্বগত ভাবভূমি প্রস্তুত করেছেন। সেগুলোর মধ্যে অমিল আছে ব্যাপক। পিথাগোরাস ও তৎসূত্রে দার্শনিক প্লেটোর দৃষ্টিতে মানবপ্রকৃতি ত্রিবিধঃ যুক্তি, সাহসিকতা ও ক্ষুধা, যার ভিত্তিতে প্লেটো সামাজিক শ্রেণিবিভাগ করেন। আইনের প্রয়োগ ছাড়াও জবরদস্ত শাসনের পক্ষপাতী ছিলেন ম্যাকিয়াভেলি। কারণ তিনি মনে করতেন যে মানুষ হলো অকৃতজ্ঞ, চপলমতি, মিথ্যাচারী, কাপুরুষ ও লোভী। সামাজিক চুক্তি তত্ত্বের তিন প্রধান দার্শনিকের মধ্যে হবস মনে করতেন যে, মানুষ আত্মকেন্দ্রিক, লকের দৃষ্টিতে মানুষের মধ্যে পারস্পরিক শুভেচ্ছা, সহযোগিতা, শান্তি ও সমন্বয়ের ভাব বিরাজ করে। অন্যদিকে রুশো মনে করতেন, মানুষ ভাবপ্রবণ, যুক্তিশীল নয়, প্রকৃতির রাজ্যেই মানুষ সুখ ও সাম্য উপভোগ ক্ষমতা।

মানব-চরিত্রের মধ্যে সুখের অনুসন্ধান ও দুঃখ পরিহারের প্রবণতা লক্ষ করেন হিতবাদ দর্শনের পুরোধারা। ওইসব উদারতন্ত্রীরা মানবপ্রকৃতির মধ্যে মুক্তির বাসনা এবং তার মধ্য দিয়ে সুখের সন্ধান চরিতার্থের প্রবণতা দেখতে পান। ভাববাদী দার্শনিকদের মধ্যে ইমানুয়েল কান্ট মনুষ্যপ্রকৃতির প্রত্যক্ষবাদী এবং অতীন্দ্রিয় দুটি প্রবণতার মধ্যে প্রথমটিতে বাহ্য জগৎ সম্পৃক্ত প্রবৃত্তি ও বাসনা এবং দ্বিতীয়টিতে যুক্তি ও নীতিসম্মত আন্তরাত্মার পরিচয় উপলব্ধি করেন। হেগেলের দৃষ্টিতে নিয়ত প্রসারমাণ ও দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ায় যুক্তিশীল রাষ্ট্রের মাধ্যমে মানবপ্রকৃতির নির্ধারক ও উৎস হলো পরম ব্রহ্ম। মার্কসের দৃষ্টিতে জৈব বিবর্তন ধারায় সৃষ্ট মানুষ হলো মননশীল এবং স্বাধীনভাবে জগৎপ্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণের প্রয়াসী, এবং ইতিহাসের ধারায় মানুষের সৃজনশীল প্রকৃতি সমাবব্যবস্থায় প্রয়োগের মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায়। মার্কসের দৃষ্টিতে বিভিন্ন পূর্বে ঐতিহাসিক বস্তুবাদ মানুষের প্রকৃতিকে প্রভাবিত করে। গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ

প্রমুখের অভিমতহলো মানবপ্রকৃতি নৈতিকতা, নান্দনিকতা, মুক্তিকামতা ইতাদি যেসব চিরন্তন মূল্যবোধে মণ্ডিত সেগুলোর উৎস আধ্যাত্মিকতা। বস্তুবাদী দৃষ্টিতে মানবেন্দ্রনাথ মানবপ্রকৃতির স্বরূপ হিসেবে দেখিয়েছেন যে জৈব বিবর্তন ধারায় মানুষের উদ্ভব ঘটে এবং ক্রমে তার যে যুক্তিবোধ গড়ে ওঠে সেটাই হলো নৈতিকতার উৎস; সর্ববিধ বাধাবিপত্তি থেকে উত্তরণের জন্য নিরঙ্কুশ মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ও সত্যসন্ধানী প্রয়াস মানবপ্রকৃতির লক্ষণ।

মানবাধিকার (Human Rights)

এই অধিকার মানুষের নাগরিক অধিকারের সমগোত্রীয়। সাধারণভাবে, কথা বলার স্বাধীনতা, ধর্মের স্বাধীনতা, পারিবারিক জীবনের অধিকার, ফৌজদারি মামলারও সুবিচার পাওয়ার অধিকার, অমানবিক শাস্তি থেকে নিষ্কৃতির নিশ্চয়তা, রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের স্বাধীনতা ইত্যাদিই মানবাধিকারের পর্যায়ভুক্ত। পৃথিবীর নানা দেশে প্রায় নয় শতকের পথ পরিক্রমার পর ও নানা ব্যঞ্জনায় প্রত্যয়টি বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডে ম্যাগনাকার্টার সময় থেকে মানবাধিকার প্রত্যয়টি ক্রমে বিকাশ লাভ করে। বিবর্তনের ধারায় বিভিন্ন ঐতিহাসিক দলিল থেকে এটি উপযুক্ততা লাভ করে। যেমন ১৭৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে, ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবে মানবাধিকার সনদে এবং ১৯১৭ সালে বলশেভিক বিপ্লবের বাণীতে। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ মানবাধিকার সনদ গৃহীত হবার পর এ বিষয়টি সারা বিশ্বে ব্যাপকতা লাভ করে।

দার্শনিক জন লক প্রত্যয়টিকে জীবন, স্বাধীনতা ও ধনসম্পত্তির অধিকার হিসেবে দেখতেন। পূর্বোক্ত আমেরিকার ও ফরাসি ঘোষণায় সুখ সন্ধানকে একটি অধিকার হিসেবে দেখা হয়। ওইসব ঘোষণা দিতে মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির দ্রুত ও নিরপেক্ষ বিচারের অধিকারের কথাও বলা হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে মানবাধিকার বিষয়টি এক একটি দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয় ছিল। এর পরেই বিভিন্ন সংস্থা বিভিন্ন মানবাধিকারে তালিকা তৈরি করেছে। বিশেষ করে জাতিসংঘ মানবাধিকারের বিষয়টিকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে রূপ দিয়েছে। আন্তর্জাতিক আইনের বিষয় ও বৈশিষ্ট্যেও একটা নতুন মাত্রা হিসেবে মানবাধিকার যুক্ত হয়। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের বিষয়গুলো যথাযথভাবে মান্য করা হচ্ছে কি না সে বিষয়ে নজর রাখা ও রিপোর্ট দেবার জন্য জাতিসংঘের একটি স্থায়ী কমিশন আছে। ১৯৭৫ সালে হেলসিঙ্কিতে অনুষ্ঠিত মানবাধিকার সম্মেলনে অধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শাস্তিদানের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনে বিনা বাধায় আন্তর্জাতিক মানবাধিকার ঘোষণা পত্রটি গৃহীত হলেও, সেটি মান্য করা সম্পর্কে বাধ্যবাধকতা নেই। মানবাধিকারের উল্লিখিত ঘোষণাবলির সঙ্গে আইনগত অধিকারের মৌলিক প্রভেদ আছে। আইনগত অধিকার সব মানুষের ওপর বর্তায়, তাতে সংশয় থাকলে আইনজীবীর কাছে কিংবা আদালতে তা জানা যায়।

যদি কেউ কোনো অধিকার দাবি করে এবং সেটা দেশের সর্বোচ্চ আদালতে নাকচ হয়ে যায় তা হলে কিছু করার থাকে না। মানবাধিকার কিন্তু সেগোত্রে পড়ে না।

মানবাধিকার চুক্তি (Human Rights Treaty)

মানবাধিকার চুক্তি বিশ্বের প্রতিটি মানুষের অধিকার সংরক্ষণের একটি দলিল। ১৯৪৮ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এ চুক্তি গৃহীত হয়। নোবেল পুরস্কারজয়ী ওরেন ক্যাসিনের করা খসড়া সনদের মাধ্যমে মানুষের সহজাত মর্যাদা সততা এবং সমান অধিকার এ চুক্তিতে স্বীকৃত হয়।

মানবিক-সম্পর্কের তত্ত্ব

মানবিক-সম্পর্কের তত্ত্ব বিশ্বাস করে যে আধুনিক পুঁজিবাদ মানবিক। কেননা, এক্ষেত্রে শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক খ্রিস্টীয় অনুশাসনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। 'জনগণের পুঁজিবাদ'-এর যে আওয়াজ যে উঠেছে, এই তত্ত্ব তারই অংশবিশেষ। এই তত্ত্বে এমন সব ব্যবস্থার কথা রয়েছে, যেখানে পুঁজিবাদী শোষণকে আড়াল করে রাখতে পারে। যেমন– শ্রমিকদের বহুজাতিক কর্পোরেশনের শেয়ার ক্রয়ের ও বিক্রয়ের অধিকার, মুনাফার অংশলাভ, গ্রুপ ইন্স্যুরেন্স শিল্প-মালিক কর্তৃক শ্রমিকদের আবাসস্থল পরিদর্শন, বিভিন্নপর্ব উপলক্ষে শ্রমিকদের উপহার প্রদান, মালিক ও শ্রমিকদের যৌথ আলোচনা ইত্যাদি সম্পর্কের বিকাশে সহায়ক (সূত্র: হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

মানিব্যাগ গণতন্ত্র (Moneybag Democracy)

ম্যানিব্যাগ গণতন্ত্র কথাটি চীন ব্যবহার করেছে। ম্যানিব্যাগ গণতন্ত্র বলতে ধনীদের গণতন্ত্র বুঝিয়েছেন। ১৯৯৭ সালের শুরুতে মার্কিন পররাষ্ট্র বিভাগ চীনে ভিন্নতম পোষণকারীদের ওপর ব্যাপক জেলজুলুম চাপিয়ে দেওয়ার কারণে কঠোর সমালোচনা করে এবং তাদের এই আচরণকে স্বেচ্ছাচারী বা কর্তৃত্ববাদী (Authoritarian) বলে আখ্যায়িত করে। এর জবাবে চীন বলে যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেকে গণতন্ত্রের মডেল বলে দম্ভ করলে কী হবে, মার্কিন গণতন্ত্র আসলে মানিব্যাগ গণতন্ত্র মাত্র। অর্থাৎ এটা ধনীদেরই গণতন্ত্র। ২০০ বছর যাবৎ মার্কিনিরা গণতন্ত্রের নামে আসলে ধনিকতন্ত্র বা মানিব্যাগ গণতন্ত্রই চর্চা করে এসেছে বলে চীন অভিযোগ করে। অবশ্য ১৯৯৮ সালের জুন মাসে প্রেসিডেন্ট ক্লিনটনের ব্যাপক চীনসফরের পর উভয় দেশের পারস্পরিক সম্পর্কের আরও উন্নয়ন ঘটে।

মায়া সভ্যতা (*Mayan* Civilization)

আধুনিক গুয়াতেমালা রাষ্ট্রের এর পেটেন নামক স্থান ছিল 'মায়া' (Maya) সভ্যতার উৎসস্থল। আড়াই হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে কৃষিজীবী একদল মানুষ উর্বর ভূমির খোঁজে

এখানে এসে বসতি গড়ে তোলে। আটশ সালের দিকে তাদের পশ্চিম পাশে বসবাসরত ওলমেক মানবগোষ্ঠীর শিল্পচর্চা, লিখন এবং সংক্রান্তগণরা পদ্ধতি দ্বারা তারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়। তাদের মতো মায়ারও ধাপ পিরামিডি এবং পাথরের স্থাপত্য রীতি গড়ে তোলে। মায়া সভ্যতা গুয়াতেমালা, হন্ডুরাস, বেলিজ ও দক্ষিণ-পূর্ব মেক্সিকো অঞ্চল ঘিরে গড়ে উঠেছিল।

২০৫ থেকে ৯০০ সালের মধ্যে মায়া সভ্যতা উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করে। ওই সময় তারা বড় বড় নগর স্থাপন করে এবং শিল্প ও বিজ্ঞানেই উন্নতি ঘটায়। প্রথমদিকে পাশের নগরী তিওতিহুয়ানকানের প্রভাব পড়ে মায়া সভ্যতায়, বিশেষ করে শিল্প ও স্থাপত্যকলায়। নগরে নগরে তারা চারকোণা পাথরের স্তম্ভ তৈরি করতে থাকে। এর ওপর তারা ননা বিবরণ ও সন-তারিখ খোদাই করে রাখতো। খ্রিস্টীয় আট শতকের দিকে মায়া সভ্যতার অধোগতি শুরু হয়। দক্ষিণাঞ্চল থেকে এরা সনের আসে, স্থাপত্যকলায় চর্চা ও বন্ধ হয়ে যায়। তবে উত্তর দিকের মায়া সভ্যতার কেন্দ্র ইউকাতানে তা আরো শতবর্ষ টিকে ছিল। পনেরো শতকের দিকে মায়া নগরগুলো পরস্পর বিবাদে জড়িয়ে পড়ে। ১৫৫৯ সালের সেপ্নীয়দের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে এই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটে ১৬৯৭ সালে।

মায়ার যুদ্ধের চেয়ে প্রধানত শিক্ষা-সংস্কৃতি ও ধর্মের দিকে বেশি আকৃষ্ট ছিল। তারা ৩৬৫ দিনে বছর গণনা ক্ষমতা। প্রথম তারা পাথরের ফলক ও মাটির পাত্রের লিখতো। পরে হাতে লেখার পদ্ধতি আবিষ্কার করে। মেক্সিকো এবং মধ্য আমেরিকার প্রায় কুড়িটি ভাষা মায়া ভাষা থেকে উদ্ভূত এই সভ্যতার স্মৃতিচিহ্ন চাষাবাদের ধরনের কিংবা ধর্মীয় আচার-আচরণের আজও দেখা যায়।

মার্কস, কার্ল (Karl Marx)

কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) একজন বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র, দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ এবং বিজ্ঞানভিত্তিক রাজনৈতিক অর্থনীতির প্রবর্তক ও বিশ্ব-সর্বহারার নেতা ছিলেন। তিনি ছাত্রজীবনেই তরুণ হেগেলীয়দের সঙ্গে যোগ দেন এবং এদের মধ্যে উগ্র বামপন্থি অংশের সঙ্গেই একাত্ম হন। তিনি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের পর ১৮৪২ সালে 'রাইনীষ জেয়তুঙ' পত্রিকায় যোগ দেন এবং অচিরেই এর প্রধান সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি বাস্তব কাজ ও তাত্ত্বিক গভীরতায় প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গেই হেগেলীয় দর্শনের আপোসমূলক দিক ও স্ববিরোধিতার দরুণ এর সঙ্গে সরাসরি দ্বন্দ্বে চলে আসেন। তিনি বস্তুবাদের অনুসারী হয়ে পড়েন এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রের বদলে সর্বহারার সাম্যবাদকে বিশ্বদৃষ্টিভঙ্গী হিসেবে গ্রহণ করেন (১৮৪৪)। তিনি প্যারিস চলে আসেন এবং তখনকার বিপ্লবী আন্দোলনের সঙ্গে জড়িয়ে পড়েন। সাইলেশিয়ার বিদ্রোহ (১৮৪৪)-ও তাঁকে প্রভাবিত করে। তিনি ওই বছরই সর্বহারা শ্রেণির ঐতিহাসিক ভূমিকা এবং সমাজবিপ্লবের অবশ্যম্ভাবিতা প্রমাণ করে প্রবন্ধ লেখেন। এ সময় তিনি এঙ্গেলসের সংস্পর্শে আসেন এবং শুরু হয় দর্শনের ক্ষেত্রে অংশীদারিত্বের এক অভিনব অধ্যায়।

এরই ফলশ্রুতিতে তিনি ১৮৪৫ সালে 'হোলি ফ্যামিলি' এবং ১৮৪৫-৪৬ সালে 'জার্মান আইডিওলোজি' রচনা করেন। ১৯৪৫ সালেই রচিত হয় 'ফয়েরবাখের ওপর থিসিস' এবং ১৮৪৭ সালে রচিত হয় 'দর্শনের দারিদ্র্য'। ১৮৪৭ সালে তিনি ব্রাসেলসে এসে 'কমিউনিস্ট লীগ'-এর সাথে জড়িয়ে পড়েন এবং কংগ্রেসের অনুরোধক্রমে তিনি ও এঙ্গেলস যৌথভাবে যুগান্তরী 'কমিউনিস্ট' পার্টির ইশতেহার' (১৮৪৮) রচনা করেন। তিনি জার্মানির ১৮৪৮-৪৯ সালের বিপ্লবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ১৮৪৯ সালে জার্মানি থেকে বহিস্কৃত হলে চিরতরে লন্ডন চলে আসেন। ১৮৬৪ সালে কমিইনিস্টদের প্রথম আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। এতে মার্কসের অবদান ছিল অসামান্য। ১৮৪৮-৪৯ সালে অনুষ্ঠিত ইউরোপের বুর্জোয়া বিপ্লবসমহের অভিজ্ঞতা মার্কসকে তাঁর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব, শ্রেণিসংগ্রাম ও সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বের তত্ত্ব প্রণয়নে বিপুলভাবে সহায়তা করে। তিনি এ সময়েই বুর্জোয়া-বিপ্লবে সর্বহারা শ্রেণির কর্তব্য এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করেন (ফ্রান্সের শ্রেণিসংগ্রাম, ১৮৫০-এর প্রকাশিত)। ১৮৫৯ সালে প্রকাশিত 'লুই বোনাপার্টের অষ্টাদশ ব্রুমেয়ার'-এ তিনি বুর্জোয়া রাষ্ট্রযন্ত্রের অনিবার্য ধ্বংস এবং ১৮৭১ সালে প্রকাশিত 'ফ্রান্সের গৃহযুদ্ধ' শীর্ষক গ্রন্থে (প্যারি কমিউনের অভিজ্ঞতা থেকে) সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বাধীন রাষ্ট্রযন্ত্রের স্বরূপ তুলে ধরেন। 'গোথা কর্মসূচির সমালোচনা' (১৮৭৫)-য় তিনি বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন। তাঁর রাজনৈতিক অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ 'ক্যাপিটেল'-এ প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ড যথাক্রমে ১৮৬৭, ১৮৮৫ ও ১৮৯৪ সালে প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থে তাঁর অর্থনীতি ও সমাজ-পর্যালোচনার দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি এবং ইতিহাসের বস্তুবাদী বিশ্লেষণ পদ্ধতি পূর্ণতা লাভ করে। এই গ্রন্থেরই চতুর্থ খণ্ডে 'উদ্বৃত্ত মূল্যের তত্ত্ব' বা থিওরি অব সারপ্লাস ভেল্যু পরিশিষ্ট আকারে প্রকাশিত হয়। পরবর্তীকালে লেনিন মার্কসীয় তত্ত্বের আরও বিকাশসাধন করেন। বলাবাহুল্য, মার্কসবাদের অন্যতম মূলকথাই হল, সৃষ্টির মধ্যে কোনোকিছুই ধ্রুব নয়, সবকিছুই আপেক্ষিক, পরিবর্তনশীল। সুতরাং কোনো বস্তু, কাঠামো বা প্রক্রিয়াকে চিরস্থায়ী বা অপরিবর্তনীয় বিবেচনা করা অমার্কসবাদী।

মার্কসবাদ (Marxiam)

মার্কসবাদ কার্ল মার্কসের নামে পরিচিত হলেও মার্কসবাদ মার্কস ও এঙ্গেলসের যৌথ সৃষ্টি। ডারউইন আবিষ্কার করেছিলেন জীব জগৎ কোনো অলৌকিক খামখেয়ালের দাস নয়, বাস্তব প্রকৃতির নিয়মে তা চলে। মার্কস ও এঙ্গেলস দেখালেন সমাজ রূপান্তরের নিয়ম, পত্তন করলেন সমাজবিজ্ঞানের এক নব ধারা। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ও শেষভাগে ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থার খুঁটিনাটি বিচার করে মার্কস ও এঙ্গেলস একযোগে সমাজ সম্বন্ধে যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন সেটিই হলো মার্কসবাদ। ফ্রান্সের শ্রমিক সংগ্রাম, ইংল্যান্ডের চার্টিস্ট আন্দোলন, জার্মানির শ্রমিক অভ্যুত্থান-বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের এইসব শ্রেণি সংগ্রামের মধ্যেই ছিল মার্কসবাদ উদ্ভবের সামাজিক ও

অর্থনৈতিক পূর্বশর্ত। মার্কসবাদের মূল উৎস তিনটি, যথা– ১. জার্মান দর্শন (বিশেষত হেগেলের) ২. ব্রিটিশ অর্থনীতি (বিশেষত রিকার্ডোর) এবং ৩. ফরাসি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা। দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদ মার্কসবাদের মূলভিত্তি। মার্কসবাদ অনুযায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো বা উৎপাদন পদ্ধতি অনুযায়ীই সমাজকাঠামো গড়ে ওঠে। মার্কস ও এঙ্গেলস আরও দেখান যে, আদি সাম্যবাদী সমাজের পর থেকে একের পর এক শ্রেণিবিভক্ত ও শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাই প্রচলিত হয়ে এসেছে এবং প্রচলিত ইতিহাস হচ্ছে বস্তুর শ্রেণি সংগ্রামেরই ইতিহাস। তাঁরা প্রমাণ করেন যে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের ফলে উৎপাদিকাশক্তির বিকাশ ঘটে এবং এই বিকশিত উৎপাদিকাশক্তির সঙ্গে উৎপাদন-সম্পর্কের বিরোধ বাধে। এই বিরোধেরই ফলশ্রুতিতে পুরানা সমাজ ভেঙে নতুন সমাজ জন্ম নেয়। তাঁরা আরও দেখান যে, পুঁজিবাদী সমাজই শোষণমূলক সমাজের শেষ রূপ। পুঁজিবাদী সমাজের দ্বন্দ্ব অর্থাৎ পুঁজিপতি ও সর্বহারা শ্রেণির দ্বন্দ্বের ফলে সমাজতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা কায়েম হতে বাধ্য। কিন্তু তা আপোসে বা স্বতঃস্ফূর্তভাবে হবে না। এজন্য সর্বহারাশ্রেণিকে সমাজতান্ত্রিক দলের পতাকাতলে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে এবং বিপ্লব ঘটাতে হবে, অর্থাৎ বলপ্রয়োগের পথ গ্রহণ করতে হবে। সফল বিপ্লবের পর কায়েম করতে হবে সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব, যাতে সকল শোষণমূলক ব্যবস্থা ও তার ধারক-বাহকদের নিঃশেষ করা যায়। এই পর্যায়ের পরই সাম্যবাদী সমাজ কায়েম হবে। সমাজতান্ত্রিক সমাজের প্রত্যেক সদস্য তার সাধ্যানুযায়ী উৎপাদনে অবদান রাখবে এবং উপযুক্ততানুযায়ী প্রাপ্য পাবে। আর সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজনানুযায়ী। বস্তুত মার্কসবাদ সমাজকে সামাজিক অগ্রগতির বাস্তবতা সম্বন্ধে বলে, বিচ্ছিন্নতার সমস্যা কাটিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে তার ভূমিকা ও সংগঠন সম্পর্কে সচেতন করে, মানবতার মৌলিক নীতি প্রচার কওে, নিপীড়িত মানুষকে হতাশা কাটিয়ে উজ্জীবনের মন্ত্র যোগায় এবং বোঝাতে চায় কেমন করে কর্মের দ্বারা, জগৎ পরিবর্তনের দ্বারা মানুষ নিজ প্রকৃতিকে বদলাতে পারবে, নিজেকে নতুনভাবে তৈরি করতে পারবে। শ্রমিক শ্রেণির সংগ্রামকে অর্থনৈতিক রূপ থেকে রাজনৈতিক চরিত্রদানে, মোদ্দাকথায় শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনকে উচ্চতর মান অর্জনে সাহায্য করেছে মার্কসবাদ। লেনিন, স্ট্যালিন, মাও সে তুঙ প্রমুখ মার্কসবাদের আরও বিকাশসাধন করেন।

মার্কসবাদ-লেনিনবাদ (Marxism-Leninism)

উনবিংশ শতাব্দীর রাষ্ট্র ও সমাজ চিন্তার ইতিহাসে দইটি উল্লেখযোগ্য নাম কার্ল মার্কস (১৮১৮-১৮৮৩) ও ফ্রেডেরিখ এঙ্গেলস (১৮২০-১৮৯৫)। তাঁরা জগৎকে নতুন করে গড়ে তোলার যে বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রণয়ন করেন, মানব ইতিহাসের বিকাশের যে নিয়ম আবিষ্কার করেন, সমাজের নিপীড়িত শ্রেণির আর্থিক, রাজনৈতিক দাবির স্বপক্ষে তীব্র ও আপোষহীন সংগ্রামের যে কর্মসূচি পেশ করেন রাষ্ট্রচিন্তা ও সমাজচিন্তার ক্ষেত্রে তার আবেদন অসামান্য। আর লেনিন ছিলেন বিংশ শতকের সবচেয়ে প্রভাবশালী

রাজনৈতিক নেতা, মার্কসীয় তাত্ত্বিক ও সংগঠক এবং সফল রাষ্ট্রনেতা। মার্কস-এঙ্গেলস ও লেনিনের দার্শনিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারার সমন্বিত নাম হল মার্কসবাদ-লেনিনবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর চল্লিশ-এর দশকের শ্রমিকশ্রেণীর মুক্তি আন্দোলনের প্রেক্ষিতে উদ্ভূত মার্কসবাদ মানুষের দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনৈতিক জ্ঞানের ক্ষেত্রে এক অভূতপূর্ব বৈপ্লবিক অধ্যায়ের সূচনা করে। মার্কসবাদের অন্যতম প্রধান দিক হল এই যে, এতে শোষণমুক্ত সাম্যবাদী সমাজের নির্মাণে শ্রমিকশ্রেণীর ঐতিহাসিক ভূমিকা চিহ্নিত করা হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদের ভিত্তি হল দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদ। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের যুগে আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী আন্দোলন নয়া তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক সমস্যার সম্মুখীন হয়। মার্কসবাদের ধারাকে অব্যাহত রেখে লেনিন এ-যুগের মার্কসবাদী দ্বান্দ্বিক বিশ্লেষণ করেন এবং পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ স্তর সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রূপরেখা অঙ্কন করেন। লেনিন এই তত্ত্ব প্রদান করেন যে, প্রাথমিকভাবে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব একটি দেশেও বিজয় লাভ করতে পারে। তাঁর তত্ত্বের যথার্থতা রুশবিপ্লবের মাধ্যমে সম্প্রসারিত হয়। মার্কসবাদ-লেনিনবাদ সংশোধনবাদ, গোঁড়ামিবাদ ও গোষ্ঠীবাদের বিরোধিত করে। লেলিন নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে মার্কস ও এঙ্গেসের উত্তরাধিকার বহন করার, বিকশিত ও সমৃদ্ধ করার এমন নজির আর নেই। মার্কসবাদের সবকটি অঙ্গই-দর্শন, অর্থনীতি, বৈজ্ঞানিক সাম্যবাদ লেলিনের সৃষ্টি ও কর্মের মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে। তিনি শুধু জারতন্ত্রের হাত থেকে রাশয়াকে উদ্ধার করেন নি, সামাজিক গণতন্ত্রীদের বিকৃতি ও বিচ্যুতির হাত থেকে মার্কসবাদকে রক্ষা করেছেন। তিনি তাঁর কর্মকুশলতা, সাহস, পরিচালন ও সাংগঠনিক বুদ্ধি ও কৌশল, জনসংযোগ ও প্রচার, কঠিন বিপ্লবী সংকল্প, স্বদেশিকতা ও আন্তর্জাতিকতার সুমহান দৃষ্টি নিয়ে মার্কস-এঙ্গেলসের মতবাদকে যে স্তরে উন্নীত করেছেন তা অভূতপূর্ব। মার্কসবাদে লেলিনের অবদানের কথা স্মরণ করেই পরবর্তীকালে নামকরণ করা হয়েছে মার্কসবাদ-লেলিনবাদ।

মার্কিন কংগ্রেস (Congress)

যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল সরকারের আইনসভা যুক্তরাষ্ট্রীয় কংগ্রেস। এটি যুক্তরাষ্ট্রের শাসনতন্ত্রের ১ নম্বর অনুচ্ছেদ মোতাবেক ১৭৮৯ সালে গঠিত হয়। উক্ত অনুচ্ছেদেই এর সদস্যদের যোগ্যতা ও ক্ষমতাবলী বর্ণিত আছে। কংগ্রেস-দ্বি-কক্ষবিশিষ্ট। সিনেট ও হাউস অব রিপ্রেজেনটেটিভ বা প্রতিনিধি সভা। প্রতিটি অঙ্গরাষ্ট্র থেকে দু'জন করে সিনেটর ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। ১৯১৩ সাল পর্যন্ত অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর আইনসভা সিনেটর নির্বাচন করতেন। অতঃপর সপ্তম সংশোধনী অনুযায়ী তাদেরকে সরাসরি জনগণের ভোটে নির্বাচিত করার পদ্ধতি চালু হয়। মোট সিনেটরদের এক-তৃতীয়াংশ কার্যকাল প্রতি দু'বছর অন্তর শেষ হয়। প্রত্যেক সিনেটরকে কমপক্ষে ৩০ বছর বয়স্ক, যুক্তরাষ্ট্রের অন্যূন নয় বছরের নাগরিক এবং যে অঙ্গরাজ্য থেকে তারা নির্বাচিত হবেন

সেখানকার অধিবাসী হতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেটের সভাপতিত্ব করেন এবং কোনো বিষয়ে উভয় পক্ষের ভোট সংখ্যা সমান হলে একমাত্র তখনই সভাপতি নিজের ভোট দেন। প্রতিনিধি সভার সদস্যগণ নিজস্ব অঙ্গরাষ্ট্রের জনসংখ্যানুপাতে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। তবে প্রত্যেকটি অঙ্গরাষ্ট্রের একজন করে প্রতিনিধিকে পরিষদে অবশ্যই থাকতে হবে। তারা দুই বছর পর সবাইকে পুনরায় নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হয়। প্রতিনিধি সভার সদস্যের বয়স অবশ্যই ২৫ বা ততোধিক হবে। কমপক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের সাত বছরের নাগরিক ও যে অঙ্গরাষ্ট্র থেকে নির্বাচিত হবেন তার অধিবাসী হতে হবে। স্পিকার নামে অভিহিত প্রতিনিধি সভার সভাপতি ওই সভার সদস্যবৃন্দ কর্তৃক নির্বাচিত হয়ে থাকেন। রাজস্ব বিলসমূহ অবশ্যই প্রতিনিধি সভা থেকে উত্থাপিত হয় সত্য বটে কিন্তু আইন প্রণয়নের ব্যাপারে সিনেট ও প্রতিনিধি সভা উভয়ে সমান অধিকার বিদ্যমান। তথাপি সিনেট অধিকতর ক্ষমতাশালী প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হয়। কারণ সকল প্রকার সন্ধি বাস্তবায়নের জন্য সিনেটের অনুমোদন অত্যাবশ্যক এবং মন্ত্রিসভার সদস্য, ফেডারেল আদালতের বিচারপতি এবং সৈন্য ও নৌবাহিনীর অফিসার ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ পদে যেসব নিয়োগ দেয়া হয় তাতেও সিনেটের অনুমোদন নিতে হয়।

দুটি কক্ষের সমন্বয়ে মার্কিন কংগ্রেস গঠিত। প্রথম কক্ষের নাম হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ (House of Representatives) এবং দ্বিতীয় কক্ষের নাম সিনেট (Senate)। সংবিধান মোতাবেক কংগ্রেস আইন প্রণয়ন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা প্রয়োগ করেন। সংবিধানে বলা হয়েছে, 'যুক্তরাষ্ট্রের সকল আইন সংক্রান্ত সকল ক্ষমতা কংগ্রেসে' ('All legislative powers here in granted shall be vested in the Congress of the United States') দুই কক্ষের সদস্যবৃন্দ জনসাধারণের ভোটের দ্বারা নভেম্বর মাসে প্রথম সোমবারের পর প্রথম মঙ্গলবারে নির্বাচিত হন। ৩ জানুয়ারি থেকে প্রতিনিধি পরিষদের অধিবেশন শুরু হয়। কংগ্রেসে সকল সদস্যকে সংবিধানের মর্যাদা রক্ষার ব্যাপারে এবং আপন কার্য বিশ্বস্তভাবে পরিচালনার জন্য শপথ গ্রহণ করতে হয়।

হাউস অব রিপ্রেজেন্টেটিভস বা প্রতিনিধি পরিষদ : দুই বছরের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন হয়। প্রতি সত্তর হাজার জনসংখ্যার জন্য একজন প্রতিনিধি নির্বাচিত হন। বিভিন্ন সংশোধনী প্রস্তাবগুলোর মাধ্যমে জাতি-ধর্ম-স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সর্বজনীন ভোটাধিকার স্বীকৃত। সর্বপ্রথম প্রতিনিধি সভা ৬৫ জন সদস্য সমন্বয়ে সংগঠিত হয়। ১৯১৯ সালের আইনে প্রতিনিধি সভার সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত হয় ৪৩৫ জন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা ৪৩৫ জন। ভোট গ্রহণের ব্যাপারে সকল অঙ্গরাজ্যে একই রীতি-নীতি অনুসরণ করা হয় না। ২০টি রাজ্যে এ নিয়ম প্রচলিত রয়েছে যে, যারা লিখতে পড়তে জানে না, বিশেষ করে সংবিধান পড়তে ও তার অর্থ বুঝতে পারে না, তাদের ভোটাধিকার দেয়া হয় না।

এ পরিষদের সদস্য হতে মহলে প্রার্থীকে ন্যূনতম ২৫ বছর বয়স্ক হতে হবে এবং নির্বাচনের পূর্বে অন্তত সাত বছর ওই অঙ্গরাজ্যে বাস করতে হবে। ১৯৭১ সালে গৃহীত

সংবিধানের ২৬তম সংশোধনী আইনে স্থির হয়েছে যে, ১৮ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সের প্রত্যেক নাগরিক ভোটাধিকার লাভ করবে। এ সকল ভোটার প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচিত করবেন। সভার কার্য পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় সদস্য সংখ্যা ২১৮ জন। **সিনেট :** যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় কক্ষের নাম সিনেট। সিনেটের সদস্য সংখ্যা বর্তমানে ১০০ জন। প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য থেকে দুজন করে সিনেটর জনসাধারণের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে নির্বাচিত হন। সিনেটকে অত্যন্ত শক্তিশালী করার জন্য রক্ষণশীল ব্যক্তিগণ খুব সচেষ্ট ছিলেন। ক্ষুদ্র এ কক্ষকে কেবল আইনসভায় রূপান্তরিত না করে প্রেসিডেন্টের উপদেষ্টা পরিষদ হিসেবেও নিযুক্ত করার প্রয়াস লক্ষণীয়। সদস্যগণের কার্যকাল ৬ বছর এবং প্রতি দু বছর পর এর অন্তত এক-তৃতীয়াংশ সদস্য পদত্যাগ করেন। সিনেটর সদস্যপদ লাভ করতে হলে প্রার্থীকে অন্যূন ৩০ বছর বয়স্ক হতে হবে, ৯ বছরকাল যুক্তরাষ্টে বসবাস করতে হবে ও যে রাজ্য থেকে তিনি নির্বাচিত হবেন তা র নাগরিক অধিকার লাভ করতে হবে। যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট সিনেট সভাপতিত্ব করেন।

মার্কিন গৃহযুদ্ধ (American Civil War)

সাধারণত গৃহযুদ্ধ বলতে দেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন জাতি, রাজনৈতিক দল, গোষ্ঠী, সম্প্রদায় ও সংঘের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব সংগঠিত হয়, তাই গৃহযুদ্ধ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কৃষিজীবী ও ক্রীতদাস-মালিকদের দ্বন্দ্বই অবশেষে গৃহযুদ্ধে রূপ নেয়। ক্রীতদাস বিরোধী দল থেকে নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট লিংকনকে গ্রহণ করার পরিবর্তে, আমেরিকান ইউনিয়ন থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে বলে দক্ষিণ ক্যারোলিনাসহ সাতটি রাজ্য সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু, তা সত্ত্বেও লিংকন দক্ষিণ ক্যারোলিনার সামটার দুর্গে একটি ফেডারেল গ্যারিসন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিলে গৃহযুদ্ধ সূত্রপাত ঘটে। ফেডারেল সেনারা ১৮৬১ সালের ১২ এপ্রিল দুর্গের ওপর গোলাবর্ষণ শুরু করে এবং লিংকন বিদ্রোহ দমন করার নির্দেশ দেন। ফলে, সীমান্তবর্তী আরও চারটি রাজ্য বিচ্ছিন্নতা ঘোষণা করে। জুন মাস থেকে শুরু হয় পুরোপুরি সামরিক অভিযান। ফেডারেল ইউনিয়নের সুবিধা ছিল নানাবিধ, তাদের ছিল একটি সুসংগঠিত সরকার, দক্ষিণের তুলনায় দ্বিগুণ জনসংখ্যা, সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব এবং শিল্প-কারখানা। কিন্তু, তা সত্ত্বেও ভিকসসবার্গ ও গ্যাটিসবার্গে ফেডারেল ইউনিয়ন পরাজয় বরণ করে। ১৮৬১-৬২ সাল জুড়ে দক্ষিণের জ্যাকসন এবং লী প্রমাণ করেন যে তাঁরাই দক্ষতর সেনাপতি। ১৮৬৩ সালে পর্যুদস্ত ইউনিয়নের পক্ষে নামের জেনারেল গ্রান্ট ও শেরম্যান। তাঁদের ভূমিকা এবং নৌবাহিনীর ব্লকেডের ফলে বিদ্রোহী শিবিরে ভাঙনের সৃষ্টি হয়। ব্যাপক জনগণের পক্ষত্যাগ এবং দক্ষিণের বিদ্রোহী সনোদের মধ্যে বিভক্তির পরিপ্রেক্ষিতে ১৮৬৫ সালের ৬ এপ্রিল লী এপ্রোমেটক্স নামক স্থানে জেনারেল গ্রান্টের কাছে আত্মসমর্পণ করেন। বিক্ষিপ্তভাবে আরও সাত সপ্তাহব্যাপী বিদ্রোহীরা প্রতিরোধ গড়ার চেষ্টা করে। এই গৃহযুদ্ধে উভয়পক্ষের প্রায় ৬,২০,০০০ মানুষ নিহত হন। যেহেতু ১৮৬৩ সালের পয়লা

জানুয়ারি লিংকন দাসপ্রথা রহিত করেছিলেন, সেহেতু এই বিজয়ের ফলে দক্ষিণাঞ্চলেও দাসপ্রথার অবলুপ্তির মাধ্যমে এক সামাজিক বিপ্লবের সূচনা ঘটে। লিংকনকে হত্যা (১৪ এপ্রিল, ১৮৬৫) করার পর রেডিক্যাল রিপাবলিকান বলে কথিত একটি গ্রুপ দক্ষিণাঞ্চলকে বিজিত এলাকা হিসেবে চিহ্নিত করে রাজনৈতিক ফায়দা লোটার চেষ্টা করে। অবিবেচনাপ্রসূতভাবে তারা দক্ষিণের ওপর একদলীয় শাসন চাপিয়ে দেয় এবং সামরিক বাহিনীর মাধ্যমে তা কার্যকর করার প্রয়াস পায়। ফলে, উত্তর-দক্ষিণ তিক্ততা আরও বেড়ে যায়। ১৮৭৭ সালের এপ্রিল মাসে লুইসিয়ানা ও দক্ষিণ ক্যারোলিনা থেকে ফেডারেল সৈন্য তুলে না নেওয়া পর্যন্ত 'কৃষ্ণ পুনর্গঠন' (Black Reconstruction) বলে কথিত এই দমনমূলক প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে।

মার্শাল পরিকল্পনা (Marshall Plan)

১৯৪৭ সালের ৫ জুন হার্ভার্ডে প্রদত্ত এক বক্তৃতায় তৎকালীন মার্কিন পররাষ্ট্র সেক্রেটারি জর্জ মার্শাল বিশ্বঅর্থনীতি সংক্রান্ত এক পরিকল্পনার রূপরেখা তুলে ধরেন। এই পরিকল্পনা মার্শাল পরিকল্পনা পরিচিত। তিনি বলেন যে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্তব্য হলো বিশ্ব অর্থনীতিকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালিয়ে যাওয়া। কারণ বিশ্বঅর্থনীতি দুর্বল হলে শান্তি ও স্থিতিশীলতা কোনোক্রমেই সম্ভব হবে না। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতি কোনো দেশ বা মতবাদের বিরুদ্ধে হবে না। বরং তা ক্ষুধা, দারিদ্র, হতাশা এবং নৈরাজ্যের বিরুদ্ধে হবে। ইউরোপের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য একতরফাভাবে পরিকল্পনা-প্রণয়ন মার্কিন সরকারের উচিত হবে না, বরং তা ইউরোপীয় দেশসমূহেরই ওপর প্রণয়নের দায়িত্ব ছেড়ে দিতে হবে। যুক্তরাষ্ট্র এই পরিকল্পনা প্রণয়নে শুধু সহযোগিতা দিতে পারে। তবে, পরিকল্পনা প্রণীত হলে সেটাকে বাস্তবায়িত করার জন্য সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করাই হবে যুক্তরাষ্ট্রের মূখ্য দায়িত্ব। ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী আর্নেস্ট ভেবিন এই পরিকল্পনাকে স্বাগত জানান। উক্ত বছরের ২৭ জুন ফ্রান্স, যুক্তরাজ্য ও সোভিয়েত ইউনিয়ন এই পরিকল্পনা প্রত্যাখান করে। কোনো কমিউনিস্ট দেশই এই পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি। ফিনল্যান্ড এবং স্পেন এই আলোচনায় অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকে। ১৬টি দেশ (অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, ডেনমার্ক, ফ্রান্স, গ্রিস, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, ইতালি, লুক্সেমবার্গ, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, পর্তুগাল, সুইডেন, সুইজারল্যান্ড, তুরস্ক এবং যুক্তরাজ্য) ১৯৪৭ সালের ১২ জুলাই প্যারিসে এক সম্মেলনে মিলিত হয় এবং একটি রিপোর্ট তৈরি করে। এই রিপোর্টে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধজনিত ক্ষতির বিবরণ, যুদ্ধের ফলে পশ্চিম গোলার্ধের সঙ্গে ইউরোপের বাণিজ্যিক ভারসাম্যহীনতার চিত্র এবং এই অবস্থা থেকে ইউরোপের পুনরুদ্ধারের জন্য চার বছরের (১৯৪৭-৫১) পরিকল্পনা (যা ইউরোপীয় পুনরুদ্ধোর পরিকল্পনা নামে পরিচিত) সংযোজিত হয়। এই রিপোর্ট জর্জ মার্শালের নিকট হস্তান্তর করা হয় এবং তা কার্যকর করার জন্য ইউরোপীয় অর্থনৈতিক সহযোগিতা (ইইসি) ব্যবস্থা গঠন করা হয়।

মিউনিখ চুক্তি (Munich Agreement)

১৯৩৮ সালের ১৯-৩০ সেপ্টেম্বর জার্মানির মিউনিখ শহরে সম্পাদিত চুক্তি। এতে অংশ নেন ইংল্যাণ্ডের চেম্বারলেন, ফ্রান্সের দেলাদিয়ের, ইতালির মুসোলিনি এবং জার্মানির হিটলার। এই চুক্তির মাধ্যমে জার্মানিকে চেকোশ্লোভাকিয়ার সুডিটেনল্যান্ড অঞ্চল দখলের অনুমতি দেয়া হয়। যুক্তি ছিল, সেখানে মোট জনসংখ্যার মধ্যে রয়েছে ২৮ লক্ষ জার্মান এবং চেক মাত্র ৮ লক্ষ। আসলে সুডিটেনল্যান্ড ছিল শিল্পকারখানায় সমৃদ্ধ অঞ্চল। যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিলা চমৎকার। প্রাকৃতিক কারণে প্রতিরক্ষার দিক থেকেও এর অবস্থান ছিল গুরুত্বপূর্ণ। এই চুক্তি সম্পাদনের ব্যাপারে চেকোশ্লোভাকিয়া, হাঙ্গেরি ও রাশিয়াকে ডাকা হয়নি। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স ভেবেছিল এতে করে জার্মানির আধিপত্যবাদী তৃষ্ণার অবসান ঘটবে। কিন্তু এই সমঝোতার অল্পকালের মধ্যেই ১৯৩৯ সালের মার্চে হিটলার এই চুক্তি ভঙ্গ করেন। তিনি দাবি করেন, সুডিটেনল্যান্ডে জার্মানরা নিগৃহীত হচ্ছে, তাই এই অঞ্চল হবে পুরোপুরি জার্মানির অন্তর্ভুক্ত। এভাবে এই অঞ্চলে হিটলারের সামরিক অভিযানের মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা হয়।

মিন্দানাও (Mindhanou)

মিন্দানাও হচ্ছে ফিলিপাইনের একটি দ্বীপ। এই দ্বীপটির অধিকাংশ জনসংখ্যাই মুসলমান। এই মুসলিম জনগণ দীর্ঘকাল ধরে স্বাধীনতার জন্য লড়াই করে যাচ্ছে। এই লড়াইয়ে নেতৃত্ব দিচ্ছে Moro National Liberation Fron (MNLF)। মিন্দানাও দ্বীপটির ফিলিপাইনের সাথে একই সময় স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীকার ছিলো। কিন্তু এই দ্বীপটিকে জনগণের ইচ্ছার বিরুদ্ধে স্বাধীনতা না দিয়ে ফিলিপাইনের সাথে একীভূত করা হয়। ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট মার্কোসের দীর্ঘ শাসনামলে মুসলমানদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে যায়। ফলে বিদ্রোহীরাও ব্যাপক পাল্টা ব্যবস্থা গ্রহণ করে। বর্তমানে এটি স্বায়ত্বশাসন ভোগ করছে এবং সরকার ও MNLF-এর মধ্যে স্থায়ী শান্তি আলোচনা চলছে।

মিশরীয় সভ্যতা (*Egyptian* Civilization)

নব্যপ্রস্তর যুগে-খ্রিস্টপূর্ব দশ হাজার থেকে পাঁচ হাজার অব্দ সময়সীমার মধ্যে নীল নদের তীরে কৃষিভিত্তিক মিশরীয় সভ্যতার পত্তন ঘটে। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে উদ্ভব ঘটে মিশর রাষ্ট্রের। প্রথম দিকে মিশর প্রায় ৪০টি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রে বিভিক্ত ছিল। রাজা মেনেম প্রথম পত্তন ঘটান একটি একক রাষ্ট্রের। নীল নদের প্রপাত এলাক থেকে তা বিস্তৃত ছিল ভূমধ্যসার পর্যন্ত। মেম্ফিস ছিল রাজধানী। পর্যায়ক্রমে একাদিক রাজবংশ মিশরে রাজত্ব করেছে। এ জাতীয় রাজবংশের সংখ্যা ৩০টির মতো। মিশরীয় সম্রাটদের বলা হতো ফারাওন বা ফারাও। মিশর প্রথমে গ্রিজ, পরে রোমক, তারও পরে আরব শাসনের অন্তর্গত হয়। মিশরীয়রা খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দের মধ্যে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধন করে। জমিতে জলসেচ, বাঁধনির্মাণ জলনিস্কাশন

কাজে সফল হওয়ার ফলেই এর উন্নতি সাধিত হয়। এক্ষেত্রে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে বাস শ্রমিকরা সভ্যতার দেশের সঙ্গে বাণিজ্যসম্পর্ক ছিল মিশরের বিদেশ থেকে আমদানিকৃত টিন ও তামা একত্রে মিশিয়ে তারা ব্রোঞ্জ তৈরির কলাকৌশলও আয়ত্ত করেছিল। প্রাচীন মিশরীয়দের ধর্মভাব ছিল প্রবল। নানা দেবদেবীর উপাসনা ক্ষমতা তারা। তাদের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন এইসব দেবদেবী। খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যে মিশরে এক উন্নত লিখনপদ্ধতি উদ্ভব হয়। এই লিপিকে ইংরেজিতে বলা হয় 'হায়ারোগ্লিফ বা চিত্রলিপি। শর বা নলখাড়া জাতীয় গাছের মজ্জা থেকে তৈরি প্যাপিরাস নামের এক ধরনের কাগজের ওপরে লেখার কাজ সম্পন্ন করা হতো। পাথর খোদাই করেও তারা লিখত। ফসলের পরিমাণ নিরুপণ করতে গিয়ে প্রাচীন মিশরে জন্ম হয় গণিতশাস্ত্রের এবং খাল খনন, ভূমির দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের পরিমাণ, পিরামিডের পাথরের আয়তন ও কোনের পরিমাণ করতে পিরামিডের পাথরের আয়তন ও কোণের পরিমান করতে গিয়ে উদ্ভব ঘটে জ্যামিতির। প্রতি বছর নীল নদের কোনার পূর্ব আকাশে গ্রহ-নক্ষত্রের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করতে গিয়ে মিশরেই প্রথম জন্ম হয় জ্যোতির্বিদ্যার। ক্যালেন্ডার তৈরির করার প্রথম কৃতিত্বও তাদেরই। ৩৬৫ দিনে বছরের হিসাব তারাই প্রথম বের করে।

মৃতদেহকে মমিরূপে সংরক্ষণ করার পদ্ধতি আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে রসায়নশাস্ত্রের উদ্ভব হয় এবং এটি সূত্রেই তারা মানবদেহের অভ্যন্তরীণ গঠনপ্রণালী সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করে। গাছগাছড়ার ভেষজ গুণাগুণ শনাক্ত করার মাধ্যমে ভেষজবিদ্যার পাশাপাশি। শল্যবিদ্যার বিকাশে মিশরীয় সভ্যতার অবদান অনস্বীকার্য। প্রাচীন মিশরে শিক্ষাও ব্যাপক প্রচলন ঘটেছিল। মিশরীয় ভাস্করেরা মানুষের মুখ খোধাইয়ে ছিলেন অত্যন্ত পারদর্শী। তঁদের নির্মিত বহু ধর্মমন্দির, পিরামিড ও স্পিংক স্থাপত্য ও ভাস্কর্যশিল্পে অনুপম নিদর্শন হিসেবে আজও পৃথিবীর মানুষের মনে অপরিসীম বিস্ময়ের উদ্রেক করে।

মিশরের পিরামিড (Egyptian Pyramids)

প্রাচীন মিশরের ফারাও সম্রাট ও ধনবান ব্যক্তিদের সমাধিতে পাথরের নির্মিত বিশালাকার স্মৃতিসৌধ হলো পিরামিড। এর ভিত্তি সমচতুর্ভুজ, কিন্তু ওপরের দিকে চারপাশ ক্রমশছোট হতে হতে ত্রিভুজ আকারের হয়ে এক বিন্দুতে গিয়ে মিশেছে। তামার বাটালি ও হাতুড়ি দিয়ে পাহাড় থেকে বড় বড় পাথরের টুকরো কেটে গ্রানাইট ও চুনাপাথর সহযোগে বিশাল একদল শ্রমিক আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে পিরামিড নির্মাণ ক্ষমতা। খ্রিস্টপূর্ব ২৭০০-২৩০০ সালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পিরামিড নির্মিত হয়েছিল। পিরামিড প্রাচীন পৃথিবীর সপ্তাশ্চর্যের এক আশ্চর্য।

মিশরীয়রা বিশ্বাস ক্ষমতা, মৃত্যুর পরও আরেকটি জীবন আছে এবং মৃত্যুর পর তারা আবার রাজা হবেন। তাই তাদের মৃতদেহ ওষুধ দিয়ে এমনভাবে কবরস্থ করার ব্যবস্থা চালু করেন, যাতে সেটা নষ্ট হয়ে না যায়। এই বিশেষ পদ্ধতিতে সংরক্ষিত মৃতদেহকে

'মমি' বলা হতো। প্রথম দিকে রাজার মমি সাধারণভাবেই সমাহিত করা হতো। সঙ্গে দেয়া হতো নানা রকম ধনরত্ন, স্বার্ণালঙ্কার ও ভোগবিলাসের সকল সরঞ্জাম। কিন্তু রাতের অন্ধকারে কবর খুঁড়ে দস্যুরা এসব সামগ্রী রুট ক্ষমতা। ফলে কবর আরো সুরক্ষা করার প্রয়োজন দেখা দিলে পিরামিড নির্মাণ শুরু হয়। রাজারা জীবিত অবস্থায় পিরামিড নির্মাণ করাতেন এবং মৃত্যুর পর তাঁদের মৃতদেহ পিরামিডের ভেতরে নির্দিষ্ট জায়গায় সমাহিত করা হতো।

বর্তমানে মিশরে প্রায় ৭০টি পিরামিড আছে। তার মধ্যে সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত তিনটি কায়রোর নিকটবর্তী গিজে অবস্থিত। এর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ পিরামিড হলো ফারাও চিওপসের পিরামিড। পিরামিডগুলো সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ২৬৯০ থেকে ২৫৬০ অব্দের মধ্যে নির্মিত হয়েছিল। পিরামিডগুলো নির্মাণ করার কৌশল আয়ত্ত করতে প্রাচীন মিশরবাসীর দীর্ঘকাল প্রয়োজন হয়েছিল। নীলনদের পূর্বতীরে অবস্থিত পাথরের খনি থেকে নীল নদ অতিক্রম করে পাথর বহন করে আনতে হয়েছিল। পিরামডিগুলোর ভিত্তি প্রায় সম্পূর্ণ চতুর্ভুজাকার। বিশাল সংখ্যক ক্রীতদাস পিরামিডের নির্মাণ কাজে অংশ নেয়। পাথর কাটার শ্রমজীবী এবং রাজমিস্ত্রিরা নয় ফিট পর্যন্ত দীর্ঘ করাত ব্যবহার ক্ষমতা। মিশরের তিনটি বিখ্যাত পিরামিড হলো মাইসেরিনাস, চিওপস এবং চেফ্রেনের পিরামিড। এগুলোর উচ্চতা যথাক্রমে ২১৫ ফুট, ৪৮১ ফুট এবং ৪৭১ ফুট। চিওপসের পিরামিড সবচেয়ে উঁচু। এর পার্শ্বগুলোর উচ্চতা ৭৫৬ ফুট এবং ভিত্তিভূমির জমির পরিমাণ ১৩ একর। এর আনুমানিক ওজন ৫৫,০০,০০০ টন। প্রায় ২৩,০০,০০০ প্রস্তর খণ্ড এর নির্মাণে প্রয়োজন হয়। প্রায় ১ লক্ষ শ্রমিক এর নির্মাণে নিযুক্ত ছিল। প্রতি তিন মাস অন্তর তাদের স্থলে নতুন শ্রমিক নিযুক্ত করা হতো। এই শ্রমিকদের দ্বারা প্রায় ৩০ বছরে এর নির্মাণ সম্পন্ন হয়।

মিশ্র বিল (Hybrid Bill)

কোনো বিলে বিশেষ ও সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত বৈশিষ্ট্য থাকলে একে মিশ্র বা দ্বি-জাতীয় বিল বলে। যেমন জনস্বার্থে একটি হাসপাতাল বা পোস্ট অফিস স্থাপন করার জন্য জমি অীধগ্রহণ করার বিল আনা হলো; এ বিল যেমন সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত তেমনি জমি অধিগ্রহণের ফলে বিশেষ এক বা একাধিক ব্যক্তির স্বার্থের সঙ্গে জড়িয়ে গেল। কারণ যার বা যাদের জমি অধিগ্রহণ করা হবে তাদের ব্যক্তিস্বার্থ এখানে আঘাত পাবে।

এ ধরনের বিল পরীক্ষার জন্য বাছাই কমিটিতে পাঠানো হয়। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যক্তি এ ধরনের বিলের বিরুদ্ধে সংসদে পিটিশন করতে পারেন। পিটিশন সংসদের পিটিশন কমিটিতে পাঠানো হয়। কমিটির রিপোর্ট সংসদে আলোচিত হয়। মিশ্র বিলে যদিও প্রাইভেট ও পাবলিক উভয় ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে তবু সংসদে আলোচনার সময় এ ধরনের বিলকে পাবলিক বিল বলে গণ্য করা হয়।

মুক্ত বিশ্ব (Free World)

উনবিংশ শতাব্দীতে বিশ্ব মোটামোটি দু'টি ব্লকে বিভক্ত ছিল। একটা সমাজতান্ত্রিক ব্লক ও অপরটি পুঁজিবাদী ব্লক। তবে পুঁজিবাদী ব্লককে গণতান্ত্রিক প্রকৃতির বলে ধরা হত। বিশ্বে সমাজতান্ত্রিক ব্লকের বিপরীতে পুঁজিবাদী বা গণতান্ত্রিক ব্লককে মুক্ত বিশ্ব বলা হত। তখন একথাই বোঝানো হত যে, গণতান্ত্রিক বিশ্বের জনগণের মতামত প্রকাশের, সংগঠন করার, ইচ্ছামতো পেশা নির্ধারণের, স্থান পরিবর্তনের, মিডিয়ার, সরকার নির্বাচনের ও ব্যক্তিগত ইচ্ছা অনিচ্ছার এমন মুক্ত বা অবারিত সুযোগ রয়েছে, যা কমিউনিস্ট বিশ্বের প্রায় সম্পূর্ণরূপেই নিষিদ্ধ।

মুক্তবাজার অর্থনীতি (Free Market Economy)

বর্তমান বিশ্ব যেহেতু আন্তর্জাতিক বিশ্ব, সেহেতু পুঁজি ও পণ্যপ্রবাহের ক্ষেত্র কোনো দেশ কর্তৃক কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা সঙ্গত হবে না এটাই মুক্তবাজার অর্থনীতি তত্ত্বের মূল কথা। পণ্যপ্রবাহের ভিত্তি ভোক্তার চাহিদা (Consumers Need) বা বাজারের চাহিদা অনুযায়ী হতে হবে। একটা দেশের জনগণের কাছে বা বাজারে যে দেশের যে পণ্যেরই চাহিদা থাকুক না কেন, তা অবাধে আমদানি করতে দিতে হবে এবং এ ব্যাপারে কোনো শুল্ক সৃষ্টি বা অন্য কোনোরূপ বিধিনিষেধ আরোপ করা যাবে না। একইভাবে পুঁজির প্রবাহ, বিনিয়োগ ও সঞ্চালনকেও অবারিত করতে হবে। বর্তমানে সাবেক কমিউনিস্ট দেশসমূহও ক্রমবর্ধমান হারে মুক্তবাজার অর্থনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ছে এবং অনেকে প্রতিযোগিতামূলকভাবে সে সমস্ত দেশের পুঁজিকে সাদরে গ্রহণ করেছে। একসময় যে সমস্ত দেশকে 'সাম্রাজ্যবাদ' বলে গালাগাল দেওয়া হত। তবে, অনেক অর্থনীতিবিদ মনে করেন যে, বেপরোয়া মুক্তবাজার অর্থনীতি কার্যত অনুন্নত বিশ্বের শিল্পের বিকাশকে শেষ করে দেবে এবং গোটা বিশ্বকে উন্নত বিশ্বের কতিপয় দেশের একচ্ছত্র বাজারে পরিণত করবে।

মুজিবনগর সরকার (Mujibngar Governemnt)

১৯৭০ সালের নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রহসণ, ২৫ মার্চ রাতে বাঙালিদের ওপর নিষ্ঠুর গণহত্যাযজ্ঞ ইত্যাদির পরিপ্রেক্ষিতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামের ডাকা দেন। এ সংগ্রামে ছাত্র-যুবক-জনতা, সেনা পুলিশ ও আনসার বাহিনীরা একযোগে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং গঠিত হয় মুক্তিবাহিনী। এ মুক্তিবাহিনী ও মুক্তিযুদ্ধকে পরিচালনা করার জন্যই মুজিবনগরে গঠিত হয় একটি বিপ্লবী সরকার ও উপদেষ্টা পরিষদ। ১৯৭১ সালের ১৭ এপ্রিল মেহেরপুরের বৈদ্যনাথতলায়' গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশর অস্থায়ী সরকার গঠিত হয়। এ সময় এ স্থানের নুতন নামকরণ হয় মুজিবনগর। তাই এ বিপ্লবী সরকাকে 'মুজিবনগর সরকার' আখ্যায়িত করা হয়। এ সরকারে সর্বসম্মতিক্রম শেখ মুজিবুর রহমানকে রাষ্ট্রপ্রধন নির্বাচিত কর

াহয় এবং তার অনুপস্থিতিতে সরকারপ্রধানের দায়িত্বভার অর্জিত হয় সৈয়দ নজরুল ইসলামের ওপর। তার নেতৃত্বে বিপ্লবী সরকারের অন্যান্য দপ্তরগুলো নিম্নরূপ: প্রধানমন্ত্রী: তাজউদ্দীন আহমদ, পররাষ্ট্র দফতর: খোন্দকার মোশতাক আহমদ, অর্থ দফতর: ক্যাপ্টেন এম. মনসুর আলী, স্বরাষ্ট্র দফতর: এ এইচ এম কামারুজ্জামান। পরে এম এ জি ওসামানীকে করা হয় দেশের সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান এবং গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র পাঠ করেন অধ্যাপক ইউসুফ আলী। এছাড়া এই বিপ্লবী সরকারকে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও পরামর্শ দেয়ার জন্যই গঠিত হয় একটি উপদেষ্টা পরিষদ। এতে ন্যাপ (ভাষানী), ন্যাপ (মোজাফফর), বাংলাদেশর কমিউনিস্ট পার্টি ও কংগ্রেসের একজন করে যথাক্রমে আবদুল হামিদ খান ভাসানী, অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ, কমরেড মণি সিং, শ্রী মনোরঞ্জন ধর এবং আওয়ামী লীগের ৫ জন সদস্য নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হয়। উপদেষ্টা পরিষদ মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিপ্লবী সরকারকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিতেন এবং নীতি নির্ধারণে সহায়তা করতেন।

মুদ্রা ব্যবস্থা (Monetary System)

যে পদ্ধতিতে কোন দেশে অর্থ প্রচলন করা হয় এবং তার পরিমাণ ও মূল্য নিয়ন্ত্রণ করা হয় তাকে মুদ্রা ব্যবস্থা বলা হয়। একটি দেশের সুষ্ঠু অর্থনৈতিক পরিবেশ, দ্রব্যমূল্যের স্থিতিশীলতা, বেকার সমস্যার সমাধান ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের সফলতা বহুলাংশে নির্ভর করে দেশের প্রচলিত মুদ্রা ব্যবস্থার ওপর।

মুদ্রাস্ফীতি (Inflation)

কোনো দেশের মোট পণ্যের মূল্যের থেকে ধাতু ও কাগজের মুদ্রার পরিমাণ বেশি হয়ে যাওয়াকে মুদ্রাস্ফীতি বলে। মুদ্রাস্ফীতির ফলে দেশের মোট উৎপাদিত পণ্য বা প্রচলিত মুদ্রার পরিমাণের ভারসাম্য নষ্ট হয় এবং এর অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হিসেবে পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি পায়। যুদ্ধাবস্থার মোকাবিলায় বা সরকারি কর্মচারীদের মাত্রাতিরিক্ত বেতন দান, মাত্রাতিরিক্ত প্রশাসন খরচ মেটানো ইত্যাদির প্রয়োজনে বা অন্য কোনো কারণে যখন অবস্থিত পণ্যের সঙ্গে সংগতিহীনভাবে মুদ্রা ছাপা ও বাজারে ছাড়া হয়, তখনই মুদ্রাস্ফীতি দেখা দেয়। এ ছাড়া পণ্যের উৎপাদিত ও সরবরাহ হ্রাস, অনুৎপাদনমূলক খাতে ব্যয়বৃদ্ধি ইত্যাদিও মুদ্রাস্ফীতির কারণ হতে পারে।

মুনাফার প্রকৃতি (Nature of Profit)

কোন উদ্যোক্তা তার কাজের জন্য যে পারিশ্রমিক পেয়ে থাকে তাকে মুনাফা বলে। উদ্যোক্তা তার উৎপন্ন দ্রব্য হতে যে মোট বিক্রয়লব্ধ আয় পায় তা থেকে অন্যান্য উপাদানের প্রাপ্য খাজনা, মজুরী এবং সুদ প্রদান করার পর যা অবশিষ্ট থাকে তাই উদ্যোক্তার মুনাফা। এজন্য মুনাফাকে অবশিষ্ট আয় বলা হয়। অন্য কথায়, যাবতীয় ব্যয় বাদ দেওয়ার পর যা অবশিষ্ট থাকে তা হলো মুনাফা।

মুর সভ্যতা (*Moors* Civilization)

ল্যাটিন ভাষায় 'মাউরি' থেকে 'মুল' শব্দটির উৎপত্তি। প্রাচীন রোমান অধিকৃত প্রদেশ মাউরিতানিয়ার অধিবাসীদের বলা হতো মউরি। পরবর্তীকালে স্পেনের মুসলমানদের মুর বলা হতো। স্প্যানিশ শব্দ 'মোরো' থেকে এসে 'মু'। কালক্রমে যেকোনো মুসলমানকেই ইউরোপীয়রা মুর বলতে শুরু করে। মরক্কো অধিবাসীরা মুর নামে পরিচিত। শ্রীলংকা কিংবা ফিলিপাইন রাষ্ট্রের মাসুলমানরাও কখনো এই নামে চিহ্নিত হয়। বাংলার অঞ্চলে আগত ইউরোপীয় পরিব্রাজকেরা পনেরো-ষোল শতকের মুসলমানদের 'মুল নাম অভিহিত করেছেন। তবে মুর বলতে মুলত উত্তর আফ্রিকার বার্বার এবং স্পেনের মুসলমানদেরই বোঝায়। স্পেনের মুসলমানরা খ্রিস্টীয় আট থেকে দশ শতকের মধ্যে এক অতি উন্নত সভ্যতা গড়ে তোলে। আরব-আন্দালুসিয়া সভ্যতা নামেও এটি পরিচিত। তৎকালীন স্পেনের রাজধানী কর্দোভা ছিল এই সভ্যতার পীঠস্থান। বিশাল 'আলকাজার' নামক প্রসাদভবন ও মসজিদ শোভিত কসোভর অধিবাসীরাও ছিল যথেষ্ট উন্নত। অঙ্ক, চিকিৎসাশাস্ত্র, সাহিত্য ইত্যাদি চর্চায় এই সভ্যতা বিশেষভাবে খ্যাত।

মুলতবী (Adjournmen)

মুলতবী হলো একদিন বা কয়েকদিন বা অনির্দিষ্ঠ কালের জন্য কাজকর্ম মুলতবী বা স্থগিত রাখা। ইহা আইন সভার ক্রিয়া কলাপের সাথেই বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট।

মুলতবী প্রস্তাব (Adjournment Motion)

প্রশ্ন জিজ্ঞাসার মাধ্যমে মন্ত্রীদেরকে দায়িত্বশীল করার চেষ্টা করা হয়। মন্ত্রীগণ বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য। কিন্তু এই প্রশ্নোত্তর পর্বে কোন আলোচনা (debate) বা ভোটাভুটির বিধান নেই। মন্ত্রী কর্তৃক প্রদত্ত প্রশ্নকারী সদস্য যদি সন্তুষ্ট না হন তাহলে তিনি সংসদে মুলতবী প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারেন।

মুসোলিনি, বেনিটো (Benito Mussolini)

বেনিটো মুসোলিনি (১৮৮৩-১৯৪৫) একজন কর্মকার ও স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর সন্তান ছিলেন। প্রথম জীবনে বেনিটো মুসোলিনি নিজেও একজন শিক্ষক ছিলেন। তিনি ১৯০২ সালে সামরিক বাহিনীতে ভর্তি হওয়ার ভয়ে সুইজ্যারল্যান্ড পালিয়ে যান। এখানে একজন সাধারণ শ্রমিক হিসাবে কাজ করার সময় তিনি সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা, বিশেষত সিন্ডিক্যালিজমের সংস্পর্শে আসেন। তিনি ১৯০৪ সালে ইতালিতে ফিরে আসেন এবং ১১ বছর যাবৎ সমাজতন্ত্রী ও সাংবাদিক হিসাবে কাজ করেন। তিনি ১৯১৫ সালে সমালোচনার পরিপ্রেক্ষিতে স্যেশ্যালিস্ট ফ্রন্ট ত্যাগ করেন। অতঃপর তিনি 'ইল পোপোলো দ্যা ইতালিয়া' পত্রিকার সম্পাদক নিযুক্ত হন। তিনি ১৯১৯ সালের মার্চ

মাসে ফ্যাসিস্ট পার্টি গঠন করেন। ফ্যাসিস্টরা তখন কমিউনিস্টদের সভা ভেঙে দিত। ১৯২১ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে ইতালি জুড়ে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। কমিউনিস্ট অভ্যুত্থানের ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত রাজা তৃতীয় ইমানুয়েল ১৯২২ সালের অক্টোবরে মুসোলিনীকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ করেন। তিনি নভেম্বর মাসে একনায়কত্ব গ্রহণ করলেও, ১৯২৪ সাল পর্যন্ত পার্লামেন্টের বিরোধী দলের অস্তিত্ব বজায় রাখেন। ১৯২৮-২৯ সালে পুরোপুরি ফ্যাসিবাদী সরকার কায়েম করা হয়। মুসোলিনি মালিক ও শ্রমিকের বিবাদ মেটানোর জন্য কর্পোরেশনসমূহের জাতীয় কাউন্সিল গঠন করেন এবং ১৯২৯ সালে সম্পাদিত লেটোরান চুক্তির মাধ্যমে চার্চ ও রাষ্ট্রের বিবাদ-এর অবসান ঘটান। তিনি অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে এ-সময় ব্যাপক জনহিতকর কাজ করেন এবং পররাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে (১৯২৪-৩৫) আক্রমণাত্মক পররাষ্ট্রনীতি গ্রহণ করেন। অস্ট্রিয়ার প্রতি হিটলারের লালসার দরুন তিনি প্রথম দিকে হিটলারবিরোধী হলেও ১৯৩৫ সালে আবিসিনিয়ার যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার দারুন ১৯৩৬ সালে হিটলারের নৈকট্যে এসে শক্রপক্ষ গড়ে তোলেন। ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদের সাযুজ্যও তাঁদের দুজনকে কাছাকাছি নিয়ে আসে। ১৯৩৯ সালে তিনি আলবেনিয়া দখল করেন এবং ১৯৪০ সালের ১০ জুন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। ২৮ অক্টোবর ইতালি গ্রিস আক্রমণ করলে গ্রিকরা তা প্রতিহত করে। লিবিয়া ও পূর্ব আফ্রিকার পরাজয় মুসোলিনির ভাবমূর্তি অনেক কমিয়ে দেয়। ১৯৪১ সাল নাগাদ তিনি জার্মানির ওপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। ১৯৪৩ সালের ২৫ জুলাই রাজা ইমানুয়েল ও মার্শাল বাদোগলিও ক্যু করে তাঁকে পদত্যাগে বাধ্য করেন। তাঁকে বন্দি করা হলে জার্মান প্যারাট্রুপাররা তাঁকে নাটকীয়ভাবে উদ্ধার করে (১২.৯.১৯৪৩) এবং জার্মান দখলাধীন এলাকায় 'প্রজাতন্ত্রী ফ্যাসিবাদী সরকার' গঠন করতে দেয়। ১৯৪৫ সালের ২৮ এপ্রিল তিনি ইতালীয়দের হাতেই ধরা পড়েন এবং পালানোর চেষ্টা করলে তাঁকে কোমো হ্রদের তীরে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁর লাশ মিলানে আনা হলে, জনসাধারণ তা দেখার জন্য পিয়াজালে লরেটোতে লাশ টাঙিয়ে রাখা হয়। মুসোলিনি প্রথম জীবনে "কার্ডিন্যালের প্রণয়িনী" নামে একটি উপন্যাসও রচনা করেন।

মুসলিম লীগ (Muslim League)

১৯০৬ সালের ৩০ ডিসেম্বর ঢাকায় নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা হয়। স্যার সৈয়দ আহমদ খাঁন প্রতিষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম শিক্ষা সম্মেলনের ২০তম অধিবেশন উপলক্ষে ভারতের বিভিন্ন অংশ থেকে বিশিষ্ট মুসলিম ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতিতে এ সংক্রান্ত প্রস্তাব উপস্থাপন করেন ঢাকায় নবাব সলিমুল্লাহ। প্রতিষ্ঠাকালে মুসলিম লীগের লক্ষ্যে ও উদ্দেশ্য হিসেবে গৃহীত হয়: ভারতের মুসলমানদের মধ্যে ব্রিটিশ সরকারের প্রতি আনুগত্য সৃষ্টি এবং সরকারি পদক্ষেপ সম্পর্কে মুসলমানদের ভুল ধারণা অপসারণ করা। ভারতের মুসলমানদের অধিকার এবং স্বার্থ সংরক্ষণ ও স্বার্থ বৃদ্ধিকল্পে সরকারের কাছে তাদের প্রয়োজন ও প্রত্যাশা পেশ করা। মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে অন্য

সম্প্রদায়ের প্রতি কোনোরূপ বিদ্বেষ বা শত্রুতার জন্ম রোধ করা। অতঃপর ১৯১৩ সালের ২২-২৩ মার্চ লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পরিবর্তন আনা হয়। এ সময় কংগ্রেসের সক্রিয় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মুসলিম লীগে যোগদান করেন। তারপর ১৯১৬ সালে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে লক্ষ্ণৌও চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এবং ক্রমে দল দুটি ঘনিষ্ট হতে থাকে তবে প্রতিষ্ঠার পর প্রথম তিন দশক দলটি তেমন কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি। ১৯৩৩ সালে লন্ডনে স্বেচ্ছায় নির্বাসনে যাওয়ার পর ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পূর্বে জিন্নাহ ভারতে ফিরে। সে দলকে পুনর্গঠনে প্রয়াসী হন। বিভিন্ন প্রদেশ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে ১৯৩৬ সালের ২১ মে তিনি ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট কেন্দ্রীয় পার্লামেন্টারি বোর্ড গঠন করেন। তবে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে ১১টি প্রদেশের মধ্যে ৫টি মুসলিম লীগ কোনো প্রার্থী দিতে পারেনি। সর্বমোট ৪৮২ টি মুসলিম আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১০৪ টি আসন লাভ করে এবং একমাত্র বাংলায় ফজলুল হকের নেতৃত্বাধীন কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার হন তারপর ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পর মুসলিম লীগ ব্যাপক গণভিত্তি পেতে থাকে এবং সর্বশেষ মুসলিম লীগের দাবিকে প্রাধান্য দিয়েই ব্রিটিশ সরকার মুসলামনাদের জন্য আলাদা স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে ভারত বিভাগের চূড়ান্ত ঘোষণা দিয়ে এবং ভারতীয় উপমহাদেশেও স্বাধীনতা অর্জিত হয় জিন্নাহর নেতৃত্বে পাকিস্তান রাষ্টের জন্ম মুসলিম লীগের সবচেয়ে বড় সাফল্য।

মূলধন (Capital)

মূলধন বলতে সাধারণত ব্যবসায়ে নিয়োজিত অর্থকে বুঝায়; কিন্তু অর্থনীতিতে 'মূলধন' কথাটি সেই অর্থে ব্যবহৃত হয় না। উৎপন্ন দ্রব্যের যে অংশ উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধন বলা হয়। যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল, কল-কারখানা প্রভৃতি মানুষের উৎপাদিত দ্রব্য যা উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত হয় সেগুলোকে মূলধন বলা হয়।

মূল্য ও দাম (Value and Price)

'মূল্য' শব্দটি প্রধানত, দুইটি অর্থে ব্যবহৃত হয়। যথা– ব্যবহার মূল্য এবং বিনিময় মূল্য। কোন দ্রব্যের উপযোগকেই ব্যবহার মূল্য (Value and use) বলা হয়। কোন দ্রব্যে মানুষের অভাব মেটানোর শক্তিকে ওই দ্রব্যের উপযোগ বলা হয়। এই উপযোগই ব্যবহার মূল্যের পরিমাপক; যেমন– খাদ্য খেলে ক্ষুধাজনিত অভাব দূর হয়। মানুষের মধ্যে মেটানোরমত খাদ্যের যে শক্তি আছে তাই খাদ্যের ব্যবহার মূল্য। দ্রব্যের ক্রয়ক্ষমতাকেই তার বিনিময় মূল্য (Value-in-exchange) বলা হয়। কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অপর কোন দ্রব্য যে পরিমাণ পাওয়া যায় তাই তার বিনিময় মূল্য। যখন কোন দ্রব্যের মূল্য অন্য কোন দ্রব্যের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে দ্রব্যমূল্য বলা যায়; যথা-১ মণ চাউলের পরিবর্তে ১ জোড়া জুতা পাওয়া গেলে বলা যায় ১ মণ চালের মূল্য সমান ১ জোড়া জুতা। আর যখন দ্রব্যের মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয় তখন তাকে দাম (price) বলা হয়।

মূল্যবোধ (Values)

মূল্যবোধ হলো সমাজের কোনো বস্তু বা বিষয়ের মূল্যসম্পর্কিত ধারণা। প্রতিটি বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন মূল্য থাকতে পারে, যেমন সামাজিক, আদর্শিক, আধ্যাত্মিক বা নন্দনতাত্ত্বিক। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে যে, মানুষের শ্রমে তৈরি একটি বাতির ঝাড়ের আর্থিক মূল্য আছে; আবার সেটার একটা শৈল্পিক বা নন্দনতাত্ত্বিক মূল্যও রয়েছে। সব মিলিয়ে তার একটা সামাজিক মূল্য রয়েছে। তেমনি প্রত্যেকটি সামাজিক ঘটনারও বিভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। বলা যায়, শ্রমিকের উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎ পুঁজিপতির দৃষ্টিতে বৈধ, অথচ সচেতন শ্রমিকের দৃষ্টিতে তা শোষণ, অচেতন মানুষের দৃষ্টিতে শ্রমিকের কম মজুরি 'ভাগ্যের' ওপর নির্ভরশীল। অনুরূপভাবে, একজন সনাতনী মানুষের বিচারে হয়তো প্রাচীন ধ্যান-ধারণা, ঐতিহ্য ও ব্যবস্থাসমূহকে ধরে রাখাই বিধেয়, একজন নীতিহীন উঠতি ধনীর চোখে প্রাচীন ধ্যান-ধারণার স্থলে অত্যাধুনিক ভোগবাদী ধ্যান-ধারণার প্রতিষ্ঠাই উপভোগ্য। আবার একজন সমাজবিপ্লবীর দৃষ্টিতে এই উভয়টিকেই নাকচ করে শোষণমুক্ত সমাজব্যবস্থা কায়েম করাই সঠিক। ধর্ম, নৈতিকতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, সমাজব্যবস্থা, উৎপাদন-সম্পর্ক, রাজনীতি ইত্যাদির ব্যাপারে বিভিন্নজনের বিভিন্ন মূল্যবোধ রয়েছে। বলাবাহুল্য, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গের শ্রেণি-অবস্থান, শ্রেণি-সচেতনতা, ধর্মবিশ্বাস, পারিবারিক ঐতিহ্য, সোসাইটি, পেশা ও অন্যান্য কার্যকরণ ইত্যাদির ভিত্তিতে এক-একটি মূল্যবোধ গড়ে ওঠে।

মেইন কাম্ফ (Mein Kampf)

মেইন কাম্ফ এডলফ হিটলারের একটি আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ। জার্মান 'মেইন কাম্ফ' (Mein Kampf) শব্দের অর্থ হলো 'আমার সংগ্রাম'। মূলত এই বইয়ের ওপর ভিত্তি করেই উগ্র জাতীয়তাবাদী নাৎসিবাদ (Nazi) গড়ে ওঠে। নাৎসিবাদীদের কাছে মেইন কাম্ফকে বাইবেলের সমতুল্য। হেগেল এবং হাউসটন, ও চেম্বারলেন ছিলেন হিটলারের অনুপ্রেরণার প্রধান উৎস।

মে-দিবস (May Day)

বর্তমানে 'মে দিবস' আন্তর্জাতিক শ্রমিক দিবস হিসেবে স্বীকৃত। তবে এর পেছনে সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। ১৮৭৭ সাল থেকে শ্রমিকদের ন্যায্য মজুরি, কাজের সময় ৮ ঘণ্টা করাসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবিতে বামপন্থিদের নেতৃত্বে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক ব্যাপক শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয়। ১৮৭৭ থেকে ১৮৮৪ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩০০ শ্রমিক দাবি আদায়ের আন্দোলনে প্রাণ হারায়। অভূতপূর্ব এক ধর্মঘটে অংশ নেয় ১১,৫৬২টি শিল্প-কারখানা ও সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের শ্রমিকরা। ৩ মে রিপার কারখানার ধর্মঘটি শ্রমিকদের ওপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে ৬ জন শ্রমিক নিহত ও অনেকেই আহত হয়। এর প্রতিবাদে ৪মে শিকাগোর হে মার্কেটস্কোয়ারে আহ্বান করা হয় এক বিশাল শ্রমিক সমাবেশ। সমাবেশের ওপর পুলিশ পুনরায় হামলা চালালে শ্রমিকরাও রুখে দাঁড়ায়।

এই সংঘর্ষে ৪ জন শ্রমিক ও ৭ জন পুলিশ নিহত হয়। আহত এবং অনেকে গ্রেফতার হয়। এ আন্দোলনের নেতা অ্যালবার্ট পার্সনস, জর্জ এনজেল, অগাস্ট সায়েজ, স্যামুয়েল ফিল্টন প্রমুখ গ্রেফতার হন। আদালতে আত্মপক্ষ সমর্থন করতে গিয়ে নেতারা অপরিসীম বলিষ্ঠতার পরিচয় দেন। পার্সনস ঘোষণা করেন, "যে-সমাজব্যবস্থা একজনকে করে কোটিপতি, অন্যদের করে নিঃস্ব, সমাজতন্ত্র তাকেই ধ্বংস করতে চায়।" সায়েজ ঘোষণা করেন, "আমাদের কণ্ঠ নিস্তব্ধ হতে চলেছে। কিন্তু সেদিন আর দূরে নয়, যেদিন আমাদের নিস্তব্ধতা আমাদের বাগ্মিতার চেয়েও সোচ্চার হয়ে দিগ্‌দিগন্তে অনুরণিত হবে এবং শোষিত শ্রমিকশ্রেণিকে মুক্তির সংগ্রামে অনুপ্রাণিত করবে।" মামলার রায় অনুযায়ী পার্সনস, এনজেল, সায়েজ, ফিল্টন প্রমুখের ফাঁসি হয়। এই আন্দোলন যখন গড়ে উঠছিল, তখন মার্কিন পুঁজিপতিদের পত্রিকা 'শিকাগো ট্রিবিউন' লিখেছিল, "ধর্মঘটিদের ওপর হাতবোমা ছুঁড়ে মারো, শ্রমিকরা রুটি চাইলে তাদের আর্সেনিকের বিষ দাও" ইত্যাদি। কেউ-কেউ লিখেছিল, "বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীদের গুলি করো, নেতাদের ফাঁসি দাও।" কার্যত তা করাও হয়েছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত শ্রমিকদের দাবি না মেনে পারা যায়নি। শ্রমিকদের ৮ ঘণ্টা কাজের দাবিও মেনে নিতে হয়েছিল। সেই থেকে বিশ্বের শ্রমিকরা পয়লা মে উদ্‌যাপন করে মে দিবস। আরও উল্লেখযোগ্য যে, হে মার্কেটের মৃত্যুঞ্জয়ী শ্রমিকদের রক্তরঞ্জিত জামা থেকেই বিপ্লবের পতাকা, লাল পাতাকার উদ্ভব। এই প্রেক্ষিতে ১৮৮৪ সালের ৭ অক্টোবর আমেরিকার 'ফেডারেশন অব লেবার' ঘোষণা করে যে, ১৮৮৬ সালের ১মে ৮ ঘণ্টা কাজের দিন বলে গণ্য হবে। এই ঘোষণাই ১৮৮৬ সালের ঐতিহাসিক ১মে দিবস।

মেনশেভিক (Menshevik)

মেনশেভিক কথাটি রুশ ভাষার যার অর্থ সংখ্যালঘু। ১৯০৩ সালে বিপ্লবের প্রশ্নে রাশিয়ার সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক লেবার পার্টি (আর.এস.ডি.এল.পি) দুভাগে বিভক্ত হয়ে যায়, যথা— একটি মেনশেভিক ও অপরটা বলশেভিক। লেনিনের নেতৃত্বাধীন সংখ্যালঘিষ্ঠ অংশ 'মেনশেভিক' নামে পরিচিত হয়। ১৯১২ সালে মেনশেভিকরা পার্টি থেকে বিতাড়িত হয়।

মেসোপটোমীয় সভ্যতা (*Mesopotamian* Civilization)

মধ্যপ্রাচ্যের ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রিস নদীবিধৌত উর্বর উপত্যাকায় এই দুটি নদীর মধ্যবর্তী দোয়াব অঞ্চলের নাম মেসোপটেমিয়া (বর্তমান ইরাক)। এখানে খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ এবং ৩০০০ অব্দের মধ্যে এক উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটেছিল। সুমরেীয়, ব্যাবিলনীয় ও আসেরীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতির ও অপরিমেয় অবদান রয়েছে এ বিকাশ ও পরিপুষ্ট সাধনে। মেসোপটেমিয়ায় বসতি স্থাপনকারী আদি আধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ছিল গম। খেজুর গাছকে তারা অভিহিত ক্ষমতা 'জীবনদায়িনী বৃক্ষ' বলে। খেজুর খেতে তারা তৈরি ক্ষমতা ময়দা ও মধু প্রথম দিকে জলাভূমির আগাছা দিয়ে তৈরি করা

হতো কুঁড়েঘর। পরবর্তীতে এ কাজে ব্যবহার হতো এটেল মাটির ইট। এই সভ্যতার শুরুতে খাল খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ, পানি সেচ ও পানি সঞ্চয়সহ সুবিন্যস্ত পয়প্রাণালী ব্যবস্থার প্রসার ঘটে এবং জমিকর্ষণ কাজে কোদালের ব্যবহার শুরু হয়। প্রাথমিকভাবে এই সভ্যতা ছিল কৃষি ও পশুচারণভিত্তিক।

শহর এলাকায় বসবাস ক্ষমতা কারিগর শ্রেণির লোকজন। তারা তামা, সোনা, ব্রোঞ্জ ওপরে লোহার ব্যবহার আয়ত্ত কারতে সক্ষম হয় খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের মধ্যে। ফলে কৃষিকাজ ও হস্তশিল্পের ব্যাপক বিকাশ ঘটে। ঐতিহাসিকদের মতে, মেসোপটোমিয়াই মানবসভ্যতার আদি লীলাভূমি।

মোর্চা (Coalition)

বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কিংবা সংগঠন নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে নির্দিষ্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে যে সাময়িক মিলন বা মোর্চা গঠন করে। মোর্চা গঠনের উদ্দেশ্য স্থায়ী শক্তিশালী সরকার গড়ার জন্য মিলিতভাবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করা অথবা শাসনক্ষমতা থেকে কোনো দলকে সরানোর জন্য মোর্চার সহায্যে সমবেতভাবে সচেষ্ট হওয়া। মোর্চার সদস্য-দলগুলোর এককভাবে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকে; অর্থাৎ মোর্চাভুক্ত কোনো দলের কর্মপন্থা অগ্রাহ্য হলে সে দল মোর্চা থেকে বেরিয়ে আসতে পারে। তাই মোর্চা ভেঙে যাবার আশঙ্কায় তার সদস্যদের সদাই তুষ্ট রাখতে হয়।

মোসাদ (MOSAD)

ইহুদিরা নিজেদের রাষ্ট্র পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসরাইলের প্রথম প্রধানমন্ত্রী বেন গুরিয়ন ১৯৪৮ সালের জুন মাসে ইসরাইলি সিক্রেট সার্ভিস স্থাপন করার আদেশ দেন। এই এজেন্সিকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগকে ব্যুরো অফ মিলিটারি ইনটেলিজেন্স বলা হয়। এর সঙ্গে প্রতি গোয়েন্দা কাজের বিভাগও জুড়ে দেওয়া হয়। দ্বিতীয় বিভাগটি বিদেশ দপ্তরের রাজনৈতিক বিভাগের সঙ্গে সম্পর্কিত। এদের কাজ ছিল বিদেশি গোয়েন্দাগিরি সম্পর্কিত খবর একত্র করা। তৃতীয় ভাগটিকে রাজনৈতিক বিভাগকে নিরাপত্তা রক্ষার কাজ দেওয়া হয়েছে এবং একে হিব্রু ভাষায় 'শিন বেট' বলা হয়। এ সিক্রেট সার্ভিস খুব ভালো কাজ না করায় আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার ও প্রয়োগ করে ১৯৫১ সালের সেপ্টেম্বরে ইসরাইলি সিক্রেট সার্ভিসকে পুনর্গঠন করা হয এর নাম দেওয়া হয় 'মোসাদ'।

মৌলবাদ (Fundamentalism)

কোনো ধর্মের অন্তর্গত আন্দোলন। যার লক্ষ্য হলো সেইসব মূল নীতি ও নির্দেশসমূহের আপসহীন সংরক্ষণ, যেগুলোর ভিত্তিতে ধর্ম গড়ে উঠেছে এবং বাইরে থেকে অন্য কোনো সামাজিক ও নৈতিক রীতিনীতি সঞ্চারের বিরোধিতা করা। মৌলবাদ প্রত্যয়টি

রাজনৈতিক মতবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য, যাতে বাইরের চিন্তাভাবনার প্রভাবে দলীয় মতাদর্শে কারও বিচ্যুতি না ঘটে।

মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)

মৌলিক অধিকার বলতে সে সকল অধিকারগুলোকে বোঝায় যেগুলো কোন দেশের সংবিধানে সন্নিবেশিত করা হয় এবং সাংবিধানিক নিশ্চয়তা দ্বারা সংরক্ষণ করা হয়। কেউ মৌলিক অধিকার হরণ করলে আদালতের শরণাপন্ন হওয়া যায়। একটি রাষ্ট্রের প্রতিটি নাগরিকের বাঁচার অধিকার, জীবিকার অধিকার, ধর্মের অধিকার, সংস্কৃতির অধিকার, মতামত ও সংগঠনের অধিকার, সরকার নির্বাচনের ও সরকারের নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, চুক্তির অধিকার, বিবাহের অধিকার ইত্যাদিকে বলা হয় মৌলিক অধিকার (Fundamental Rights)। কারণ মানুষের যথার্থ জীবনযাত্রা ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও স্ফূর্তির জন্য এই অধিকারসমূহকে অপরিহার্য বলে বিবেচনা করা হয়। তবে এগুলোকে মৌলিক অধিকার বলার কারণ হলো, যেহেতু সংবিধান দেশের সর্বোচ্চ আইন বা মৌলিক আইন এবং ওই সংবিধানে সংযোজিত অধিকারগুলোও মৌলিক আইনের অংশ এবং এগুলোকে বিশেষ সাংবিধানিক প্রক্রিয়ায় রক্ষা করা হয়; এগুলোকে পরিবর্তন ও সংশোধন করতে হলে স্বয়ং সংবিধানকে সংশোধন করতে হয়। মৌলিক অধিকারকে প্রধানত দুভাগে ভাগ করা যায়, যথা– পৌর অধিকার (Civil Rights) এবং রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)।

মৌলিক গণতন্ত্র (Basic Democracy)

জেনারেল আইয়ুব খান উদ্ভাবিত একটি বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ক্ষমতা দখলের এক বছর পর তিনি তার ক্ষমতা সুসংহত করার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে আইয়ুব তার 'মৌলিক গণতন্ত্র'কে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করেন। 'তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে তিনি জনসাধারণকে এ বলে বিভ্রান্ত মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে সেরা গণতন্ত্র।' অবশ্য পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলগুলোর অধিকাংশ এ সম্পর্কে ভিন্ন ধারণা পোষণ করত তারা একে জেনারেল আইযয়ুব খান এবং তাঁর সহযোগী কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠীর ক্ষমতা কুক্ষিগত করার একটি সুনিপূণ কৌশল হিসেবেই গণ্য করত।

প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌলিক গণতন্ত্র ছিল একটি পাঁচ স্তরবিশিষ্ট ব্যবস্থা। নিম্ন থেকে শুরু করে এ স্তরগুলো ছিল (১) ইউনিয়ন পরিষদ (পল্লি এলাকায়) এবং শহর ও ইউনিয়ন কমিটি (পৌর এলাকায়), (২) থানা পরিষদ (পূর্ব পাকিস্তানে), তহশিল পরিষদ (পশ্চিম পাকিস্তানে), (৩) জেলা পরিষদ, (৪) বিভাগীয় পরিষদ এবং (৫) প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ।

একজন চেয়ারম্যান এবং প্রায়শ ১৫ জন সদস্য নিয়ে একেকটি ইউনিয়ন পরিষদ গঠিত হতো। এতে নির্বাচিত এবং মনোনীত উভয় ধরনের সদস্যই থাকতেন। পরিষদের সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশ ছিলেন নির্বাচিত এবং এক-তৃতীয়াংশ ছিলেন মনোনীত বেসরকারি সদস্য, যারা সরকার কর্তৃক নিয়োজিত হতেন। তবে, ১৯৬২ সালের এক সংশোধনী দ্বারা মনোনয়ন প্রথা বিলোপ করা হয়। ফলে পরিষদের সদস্যবৃন্দ প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকারের ভিত্তিতে স্ব-স্ব ইউনিয়নের জনগণের ভোটে নির্বাচিত হতেন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে সদস্যদের দ্বারা তাদের মধ্য থেকেই নির্বাচিত হতেন। এক দিক দিয়ে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল পূর্বেকার ইউনিয়ন বোর্ডেরই অনুরূপ, তবে ইউনিয়ন পরিষদে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের বলা হতো মৌলিক গণতন্ত্রী। সারা দেশে সর্বমোট পরিষদের সংখ্যা ছিল ৭৩০০।

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের প্রতিনিধি নিয়ে দ্বিতীয় স্তরের থানা পরিষদ গঠিত হতো। এসব প্রতিনিধি নিজেরা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটির চেয়ারম্যান। সরকারি সদস্যবৃন্দ দেশ গঠনমূলক কাজে থানার বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিত্ব করতেন এবং এদের সংখ্যা নির্ধারণ করতেন সংশ্লিষ্ট জেলার ম্যাজিস্ট্রেট। তবে, সরকারি সদস্যদের সর্বমোট সংখ্যা কোনো ক্রমেই বেসরকারি সদস্যদের সংখ্যার চেয়ে বেশি হতে পারত না। থানা পরিষদের প্রধান থাকতেন মহকুমা অফিসার (এসডিও), যিনি পদাধিকারবলে থানা পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন। মহকুমা অফিসারের অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (উন্নয়ন) পদাধিকারবলে থানা পরিষদের সদস্য হিসেবে পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করতেন। পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষেত্রে থানাকে তহসিল বলে অভিহিত করা হতো এবং তহশিলের সভায় সভাপতিত্ব করতেন তহশিলদার। তখন পাকিস্তানে মোট ৬৫৫টি থানা ও তহশিল ছিল।

তৃতীয় স্তরে ছিল জেলা পরিষদ। একজন চেয়ারম্যান এবং সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের নিয়ে এ পরিষদ গঠিত হতো। সদস্যদের সংখ্যা ৪০-এর বেশি হতো না। সকল থানা পরিষদের চেয়ারম্যানই সংশ্লিষ্ট জেলা পরিষদের সদস্য থাকতেন এবং উন্নয়ন বিভাগের জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্য থেকে অন্যান্য সরকারি সদস্য মনোনীত হতেন এবং সমান সংখ্যক সদস্য মনোনীত হতেন বেসরকারি সদস্যদের মধ্য থেকে। বেসরকারি সদস্যদের অন্তত অর্ধাংশ মনোনীত হতেন ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট পদাধিকারবলে এ পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন এবং পরিষদের ভাইস-চেয়ারম্যান নির্বাচিত হতেন নির্বাচিত সদস্যদের দ্বারা। চেয়ারম্যানের অনুপস্থিতিতে চেয়ারম্যান কর্তৃক তাঁর অর্পিত দায়িত্ব পালন করতেন ভাইস-চেয়ারম্যান। পাকিস্তানে ৭৪টি জেলা পরিষদ ছিল। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ স্তর ছিল জেলা পরিষদ। এটি ছিল জেলা বোর্ডের উত্তরসূরী প্রতিষ্ঠান। সদস্যসংখ্যার দিক দিয়ে এ পরিষদ ১৮৮৫ সালের অবস্থান থেকে অনেকখানি সরে এসেছে, কেননা তখন শতকরা ২৫ ভাগ সদস্য মনোনীত হতো।

চতুর্থ ও শীর্ষ স্তর ছিল বিভাগীয় পরিষদ। বিভাগীয় কমিশনার পদাধিকারবলে এ পরিষদের চেয়ারম্যান থাকতেন। এতে সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের সদস্য ছিলেন। সর্বোচ্চ সংখ্যক সদস্য ছিলেন ৪৫ জন। সরকারি সদস্য ছিলেন বিভাগের অন্তর্গত সকল জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান এবং সরকারি উন্নয়ন বিভাগের প্রতিনিধিবর্গ। সর্বমোট বিভাগীয় পরিষদের সংখ্যা ছিল ১৬।

মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থায় পাকিস্তানের দুই অংশে একটি করে প্রাদেশিক উন্নয়ন উপদেষ্টা পরিষদ গঠনের ব্যবস্থা ছিল। গঠনবিন্যাসের দিক দিয়ে এটি ছিল বিভাগীয় পরিষদের অনুরূপ। ব্যতিক্রম এই যে, নিয়োজিত সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানদের মধ্য থেকে বেছে নেওয়া হতো। এ পরিষদের বলতে গেলে কোনো ক্ষমতাই ছিল না। তবে পূর্ব পাকিস্তান এবং পশ্চিম পাকিস্তানে প্রাদেশিক পরিষদ গঠিত হওয়ার পর এ পরিষদ বাতিল হয়ে যায়।

মৌলিক গণতন্ত্র আদেশবলে যে পাঁচটি পরিষদ সৃষ্টি করা হয় তাদের মধ্যে শুধু দুটি পরিষদ অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদ ও জেলা পরিষদকে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব প্রদান করা হয়। বিভাগীয় পরিষদ এবং থানা পরিষদ প্রধানত সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন ক্ষমতা। ইউনিয়ন পরিষদ বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োজিত থাকত, যেমন ইউনিয়নের কৃষি, ক্ষুদ্র শিল্প, সমাজ উন্নয়ন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি সংক্রান্ত কার্যক্রম। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদ গ্রাম পুলিশবাহিনীর দ্বারা আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা ক্ষমতা এবং তদীয় সালিসি কোর্টের মাধ্যমে ছোটখাটো দেওয়ানি ও ফৌজদারি মামলা নিষ্পত্তি ক্ষমতা। গ্রামের রাস্তা-ঘাট, ব্রিজ ও কালভার্ট নির্মাণ, জমিতে জলসেচ ব্যবস্থা, বাঁধ নির্মাণ প্রভৃতি কাজের পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের দায়িত্বভারও ন্যস্ত ছিল ইউনিয়ন পরিষদের ওপর। এছাড়া ইউনিয়ন পরিষদকে কর ধার্য ও আদায় এবং মূল্য, টোল ও ফি আদায়ের ক্ষমতা প্রদান করা হয়। মৌলিক গণতন্ত্র ব্যবস্থার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এই যে, এটি রাষ্ট্রপতি, জাতীয় পরিষদ এবং দুটি প্রাদেশিক পরিষদের সদস্য নির্বাচনের জন্য পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে ৮০,০০০ সদস্য সমন্বয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করে।

থানা পরিষদ, তহশিল পরিষদ মূলত একটি সমন্বয় ও তত্ত্বাবধানমূলক সংগঠন। থানা পরিষদ তার আওতাধীন সকল ইউনিয়ন পরিষদ ও শহর কমিটির কার্যক্রমের সমন্বয় বিধান ক্ষমতা। থানা পরিষদই চলতি প্রকল্পসমূহ তত্ত্বসাধনসহ ইউনিয়ন পরিষদ এবং শহর কমিটির প্রণীত সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সমন্বয় বিধান ক্ষমতা। থানা/তহশিল পরিষদ জেলা পরিষদের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ ক্ষমতা এবং ওই পরিষদের নিকট দায়ী থাকত। জেলা পরিষদ মূলত তিন ধরনের দায়িত্ব পালন ক্ষমতা : বাধ্যতামূলক দায়িত্ব, ঐচ্ছিক দায়িত্ব এবং সমন্বয়মূলক দায়িত্ব। বাধ্যতামূলক দায়িত্বগুলোর মধ্যে ছিল সরকারি রাস্তা-ঘাট, কালভার্ট ও ব্রীজ নির্মাণ, প্রাথমিক বিদ্যালয় রক্ষণাবেক্ষণ, বৃক্ষরোপণ ও সংরক্ষণ, সরকারি ফেরী নিয়ন্ত্রণ এবং জনস্বাস্থ্যের উন্নয়ন। ঐচ্ছিক দায়িত্বগুলোর বিষয় ছিল শিক্ষা, সংস্কৃতি, আর্থ-সামাজিক কল্যাণ এবং গণপূর্ত।

এছাড়াও জেলা পরিষদের ওপর কৃষি, শিল্প, সমাজ উন্নয়ন, জাতীয় পুনর্গঠনের প্রসার এবং সমবায় উন্নয়নের মতো বিশাল কর্মকাণ্ডের দায়িত্বও অর্পিত হয়। জেলার মধ্যে স্থানীয় পরিষদসমূহের সকল কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনও ছিল জেলা পরিষদের অন্যতম দায়িত্ব। এছাড়া জেলা পরিষদ জাতি গঠনমূলক বিভাগসমূহের গৃহীত পরিকল্পনা এবং এগুলোর আরও উৎকর্ষ ও উন্নয়ন সাধনের প্রস্তাব দান এবং বিভাগীয় পরিষদ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট এ প্রস্তাব সম্বলিত সুপারিশ পেশ করবে। চতুর্থ স্তরের সংগঠন বিভাগীয় পরিষদ কার্যত একটি অত্যন্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিভাগ। এটি ছিল ওই স্তরের একটি উপদেষ্টা পরিষদ বিশেষ।

মৌলিক গণতন্ত্র স্থানীয় সরকারের ভিত্তি হিসেবে বলবৎ থাকা ছাড়াও জনগণের সমর্থন ও অংশগ্রহণের মাধ্যমে সরকারকে বৈধতা দানের জন্য রাজনৈতিক ও নির্বাচনী দায়িত্ব পালন ক্ষমতা। ১৯৬০ সালের ১৪ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য যে রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠিত হয়, তাতে মৌলিক গণতন্ত্রীরা আইয়ুব খানের সপক্ষে রায় দেয়। গ্রাম ও শহরাঞ্চলের বিপুল সংখ্যক জনগণ মৌলিক গণতন্ত্রী কর্তৃক একচেটিয়া নির্বাচনী অধিকার প্রয়োগের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে ওঠে, যার ফলে ১৯৬৯ সালে আইয়ুব খানের বিরুদ্ধে গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। মৌলিক গণতন্ত্র একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুধু যে আইয়ুব সরকারকে বৈধতা দিতে ব্যর্থ হয়েছে তাই নয়, বরং ১৯৬৯ সালে জেনারেল আইয়ুব খানের পতনের পর এর নিজস্ব বৈধতাও হারিয়ে ফেলে।

জেনারেল আইয়ুব খান উদ্ভাবিত একটি বিশেষ ধরনের শাসন ব্যবস্থা। পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর দেশে সামরিক শাসন জারি করেন। ক্ষমতা দখলের এক বছর পর তিনি তার ক্ষমতা সুসংহত করার লক্ষ্যে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে একটি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। ১৯৬২ সালের সংবিধানের মাধ্যমে আইয়ুব তার 'মৌলিক গণতন্ত্র'কে সাংবিধানিক বৈধতা প্রদান করেন। 'তাঁর প্রবর্তিত ব্যবস্থাকে 'মৌলিক গণতন্ত্র' নাম দিয়ে তিনি জনসাধারণকে এ বলে বিভ্রান্ত মৌলিক গণতন্ত্র। এবং মৌলিক গণতন্ত্র হচ্ছে সেরা গণতন্ত্র।' (দেখুন: সরদার ফজলুল করিম, দর্শনকোষ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৫)।

মৌলিক গণতন্ত্রের সাংগঠনিক কাঠামো ছিল নিম্নরূপ: সারাদেশে প্রথম নির্বাচকমণ্ডলী বা ইলেক্টরাল কলেজ গঠন করা হয়। পাকিস্তানের ২টি অঞ্চল থেকে মোট ৮০ হাজার (৪০ হাজার + ৪০ হাজার) সদস্য নিয়ে এ নির্বাচকমণ্ডল গঠিত হয়। সাধারণভাবে প্রতি হাজার অধিবাসীর পক্ষ থেকে একজন প্রতিনিধি নিয়ে নির্বাচকমণ্ডলী গঠন করা হয়। এরা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হতেন। নির্বাচকমণ্ডলী প্রেসিডেন্ট, জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যদের নির্বাচন ক্ষমতা। একটি ইউনিয়ন অঞ্চল থেকে নির্বাচিত নির্বাচকমণ্ডলীর সদস্যরা ইউনিয়ন পরিষদ গঠন করতেন। ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যরা তাদের মধ্য থেকে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচিত করতেন। একটি থানার সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান থানা পরিষদের সদস্য হতেন। থানা পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন সাবডিভিশনাল অফিসার (এসডিও) এসডিও-র

অনুপস্থিতিতে সার্কেল অফিসার (সিও) চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করতেন। থানা পরিষদের অর্ধেক সদস্য নির্বাচিত (সকল ইউনিয়ন চেয়ারম্যান) এবং বাকি অর্ধেক সদস্য হতেন সরকারি কর্মকর্তা। ডেপুটি কমিশনার এদের নিয়োগ করতেন। থানা পরিষদের পরবর্তী উচ্চ স্তর জেলা পরিষদ। জেলা পরিষদের অর্ধেক সদস্য হকেন সরকারি কর্মকর্তা। বাকি অর্ধেক বেসরকারি সদস্য। এদের ডেপুটি কমিশনার নিয়োগ করতেন। জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ছিলেন ডেপুটি কমিশনার। জেলা পরিষদের উচ্চতর স্তর ছিল বিভাগীয় পরিষদ। বিভাগীয় পরিষদের চেয়ারম্যান হতেন বিভাগীয় কমিশনার। বিভাগীয় পরিষদের চেয়ারম্যান জেলা পরিষদের মতোই এবং একই হারে সরকারি ও বেসরকারি সদস্যদের বিভাগীয় পরিষদে নিয়োগ করতেন।

আইয়ুব খান মৌলিখ গণতন্ত্র প্রবর্তন করে বিশেষ ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের কৃতিত্ব দাবি করলেও প্রকৃতপক্ষে তার এ চেষ্টা ক্ষমতা কুক্ষিগতকরণের দুরভিসন্ধিমূলক উদ্যোগ বরেই বিবেচিত হয়। মৌলিক গণতন্ত্র জনগণের প্রত্যক্ষ গণতান্ত্রিক অধিকার হরণ করে। মৌলিক গণতন্ত্রের মাধ্যমে আইয়ুব সিভিল সমাজে তার একটি সমর্থনের ভিত্তি তৈরির উদ্যোগ নেন। কিন্তু সিভিল সমাজে আইয়ুব গ্রহণযোগ্য হন নি।

মৌলিক চাহিদা (Basic Requirements)

যে সমস্ত চাহিদা বা প্রয়োজন পূরণ ব্যতীত কোন মানুষের পক্ষে ন্যূনতমভাবে বেঁচে থাকা সম্ভব নয় সে সমস্ত চাহিদাকে মৌলিক বলা হয়। সাধারণত মানুষের মৌলিক ছয়টি চাহিদার কথা বলা হয়। এই চাহিদাগুলো হল; যথাক্রমে খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও চিত্তবিনোদন। এই ছয়টি ন্যূনতম বা মৌলিক প্রয়োজনকেই বলা হয় মৌলিক চাহিদা (Basic Requirements)।

ম্যাকনামারা লাইন Macnamara Line)।

ভিয়েতনাম যুদ্ধ চলাকালীন যুক্তরাষ্ট্র তৎকালীন উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মাঝখানে বিদ্যুতায়িত তার দিয়ে ম্যাকনামারা লাইন বা বেষ্টনি নির্মাণ করে। এর উদ্দেশ্য ছিল উত্তর ভিয়েতনামের বিদ্রোহীরা যেন দক্ষিণ ভিয়েতনামে প্রবেশ করতে না পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তৎকালীন প্রতিরক্ষা সচিব রবার্ট ম্যাকনামারার নামানুসারে এই বেষ্টনির নাম রাখা হয় ম্যাকনামারা লাইন (Macnamara Line)।

ম্যাকমোহন লাইন (Macmohon Line)

স্যার ম্যাকমোহন কর্তৃক চিহ্নিত ভারতের ৭০০ মাইল ব্যাপী অরুনাচল প্রদেশ এবং তিব্বতের স্মরণ সিঁড়ি সিয়াং ও লোহিত সীমান্ত জুড়ে সীমারেখা। ১৯১৪ সালে ভারত-তিব্বত চুক্তির আওতায় এই সীমা চিহ্নিত করা হয়। ভারত ম্যাকমোহন সীমানাকে পূর্বাঞ্চলে চীন-ভারত সীমানা বলে গণ্য করে। কিন্তু চীন এই আন্তঃসীমারেখা স্বীকার করে না। অরুনাচল প্রদেশ ভারতের রাজ্য হিসেবে চীন সরকার সহজে মেনে নিতে

চায়নি দীর্ঘদিন। ১৯১৩-১৪ সালে তৎকালীন ভারতীয় ব্রিটিশ সরকার এবং চীন ও তিব্বত সরকারের মধ্যে সীমান্ত নির্ধারণ প্রশ্নে এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয় এবং হিমালয়ের সর্বোচ্চ অংশ বরাবর সীমারেখা নির্ধারণ করা হয়। আলোচনায় ব্রিটিশপক্ষের প্রতিনিধির নামানুসারে এই সীমারেখার নাম রাখা হয় ম্যাকমোহন (Macmohon Line)। পরবর্তীকালে চীন এই সীমারেখা মেনে নিতে অস্বীকার করে।

ম্যাকিয়াভেলী, নিকোলো ডি বার্নাডো (Niccolo di Bernardo Machiavelli)

নবজাগরণের আন্দোলনে ইউরোপ যখন উত্তাল, রাজনৈতিক চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা প্রতিটি অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছে ঠিক সে সময় ইতালির ফ্লোরেন্স শহরে এক সম্ভ্রান্ত পরিবারে নিকোলো ম্যাকিয়াভেলী (১৪৬৯-১৫২৭) জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শিক্ষা জীবন সমাপনের পর ফ্লোরেন্সের বৈদেশিক সম্পর্ক বিভাগের প্রশাসনিক প্রধান নিযুক্ত হন এবং স্বীয় পদমর্যাদায় রোম, ফ্রান্স. স্পেন, জার্মান প্রভৃতি রাষ্ট্র ভ্রমণ করেন। ফলে তিনি বিভিন্ন রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ও পররাষ্ট্রনীতি সর্ম্পকে অবহিত হন। তিনি ইতালীয় চিন্তাবিদ এবং উঠতি বুর্জোয়াদের তাত্ত্বিক। তাঁর মতে সমাজের বিকাশ ঈশ্বরের ইচ্ছায় ঘটে না, বরং প্রাকৃতিক কারণে ঘটে। ইতিহাসের পরিচালিকা শক্তি 'বস্তুগত স্বার্থ' এবং 'ক্ষমতা'। তিনি আপামর জনগণ ও শাসকগোষ্ঠীর মধ্যে স্বার্থের দ্বন্দ্ব অবলোকন করেন। তিনি ছিলেন এমন এক শক্তিশালী জাতীয় রাষ্ট্রের পক্ষপাতী, যে-রাষ্ট্র হবে সামন্তবাদী স্বার্থমুক্ত এবং যে-রাষ্ট্র গণবিদ্রোহ দমন করতে সমর্থ। রাষ্ট্রক্ষমতা রক্ষার জন্য সকল প্রকার ধূর্ততা, হিংস্রতা, অপকৌশল ও বিশ্বাসঘাতকতাকে তিনি যুক্তিযুক্ত বলে বিবেচনা করতেন। তিনিই শাসককে শিয়ালের মতো ধূর্ত হওয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর প্রধান রচনা 'প্রিন্স'।

ম্যাকিয়াভেলীবাদ (Machiavellism)

ম্যাকিয়াভেলীর রাষ্ট্রদর্শন পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, যাবতীয় তত্ত্ব ও সিদ্ধান্ত ধর্ম ও নৈতিকতাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। তিনি মনে করেন, রাষ্ট্রে বসবাসকারী জনগণের মধ্যে ঐক্য ও সংহতি বজায় না থাকলে শাসক স্বীয় লক্ষ্য অর্জনে ব্যর্থ হতে বাধ্য। তাই রাষ্ট্রীয় ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখার স্বার্থেই শাসককে মানুষের সংস্কার, ধর্ম, নীতিবোধ ইত্যাদি বিষয়গুলোকে গোপনভাবে দেখা উচিত। কেননা এসব বিষয় মানুষের নিত্যন্তই ব্যক্তিগত। তিনি মনে করেন, ধর্ম ও নৈতিকতা শাসকের রাষ্ট্রীয় প্রশাসন যন্ত্র ·পরিচালনা পথে একটি বড় ধরনের অন্তরায়। এর ফলে উন্নত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা সম্পন্ন লক্ষ্য অর্জিত নাও হতে পারে। এ কারণে ম্যাকিয়াভেলী শাসককে দুধরনের নীতি অবলম্বনের কথা বলেছেন। তিনি শাসককে ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি, দয়া দাক্ষিণ্য সবকিছু জলাঞ্জলি দিয়ে প্রতারণা, কপটতা ও নিষ্ঠুরতার মাধ্যমে মানুষের অন্তরে ভীতি উদ্রেক করার সে নীতি শিক্ষা দিয়েছেন এবং ধর্ম ও নৈতিকতাকে নির্মমভাবে পদদলিত করার রাষ্ট্রের শাসন কার্য পরিচালনার যে কৌশল তত্ত্ব দিয়েছেন

ইতিহাসে তা ম্যাকিয়াভেলীবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের "নির্গলিত অর্থ হচ্ছে শঠতা, কপটতা, প্রতারণা, ধোকাবাজী ও দ্বিমুখী নীতি।" কারো আচরণে যখন এই দোষ দেখা যায় তখন তাকে "ম্যাকিয়াভেলীয়ান" বা ম্যাকিয়াভেলীবাদী বলে আখ্যায়িত করে থাকে। তার এই মতবাদ বর্তমান বিশ্বে আন্তর্জাতিক কূটনীতির ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায়।

ম্যাক্সিম গোর্কি (Maxim Gorky)

ম্যক্সিম গোর্কি নামেই সারা বিশ্বজুড়ে তাঁর পরিচয়। কিন্তু এটা তাঁর আসল নাম নয়। আসল নাম অ্যালেক্সি ম্যাক্সিমভিচ পেসকভ। ১৮৬৮ সালে রাশিয়ার ভলগা নদীর তীরের নিঝনি নভগরদ শহরে জন্ম। জন্মের পর মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই তিনি পিতৃহীন হন। দুঃখ-কষ্ট নিয়েই গোর্কি অবাঞ্ছিতের মতো মাববেতরভাবে বড় হন। যে সময় পিতার স্নেহ আর মায়ের মমতায় হাত ধরে স্কুলে যাওয়ার কথা, সেই সময়েই বাঁচার তাগিদে তাঁকে করতে হয়েছে শারীরিক পরিশ্রম। বিদ্যালয়ের শিক্ষা তিনি পাননি। কিন্তু পৃথিবীরূপ বাস্তবজীবনকে খুব কাছে থেকে নিবিড় করে দেখার এবং শেখার সুযোগ তাঁর হয়েছিল। আর এই বাস্তব শিক্ষা তাঁকে শেষ পর্যন্ত ম্যাক্সিমভিচ থেকে ম্যাক্সিম গোর্কি করে গড়ে তুলেছিল—মা (Mother)-এর মতো অবিস্মরণীয় ও কালজয়ী সাহিত্য সৃষ্টি করতে সাহায্য করেছে। ম্যাক্সিম গোর্কি প্রথমজীবনের জীবিকার তাগিদে অনেক কিছুই করেন। গোর্কির যখন মাত্র আট বছর বয়স তখন তাঁর দাদুর স্কুলে যাওয়া বন্ধ করে কাজে লাগিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর মুচির দোকানে, ছবি আঁকার দোকানে, বয়গিরি, জাহাজের বাবুর্জির সহকারী—এমন সব কাজও করতে হয়েছে পেটের তাগিদে। কিন্তু কোথাও মালিকের কাছে ভালো ব্যবহার পাননি গোর্কি। সবখানেই তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে অমানুষিক নির্যাতন আর অত্যাচার। এত খাটুনি খেটেও তাঁকে প্রায়ই অনাহারে থাকতে হত, শীতের রাত্রে জুটতনা গরম কাপড়। তিনি বাস্তব জীবনকে অবলোকন করেছেন নিতান্ত শৈশব থেকে। পরবর্তী জীবনেরও তাই তাঁর লেখার মধ্যদিয়ে এই জীবনের বাস্তব ছবি ফুটে উঠেছে চমৎকারভাবে। গোর্কি যখন ভলগা নদীতে চলাচলকরী এক জাহাজের বাবুর্জির সহকারী ছিলেন তখন যে-বই পড়ার সুযোগ থেকে তিনি বঞ্চিত ছিলেন, সেই সুযোগ তাঁর এল নতুন করে। এখান থেকে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরে গেল। তারপর জাহাজের কাজ ছেড়ে দিয়ে তিনি কাজ নেন জানা শহরে এক রুটির দোকানে। সেখানে তিনি নিজের হাতে রুটি বানাতেন আর সারদিন পরিশ্রমের পরে ঘরে ফিরে শুরু হতো বইপড়া। ম্যাক্সিম গোর্কির সময়ে রাশিয়ায় ছিল জারের রাজত্বকাল। চারদিকে রাজতন্ত্রের অত্যাচার ও কঠোর শাসন। কিন্তু এর মধ্যে গোপনে সমাজ সচেতন কিছু কিছু মানুষ জার-শাসনের অবসানের জন্য চেষ্টা করছিলেন। ম্যাক্সিক গোর্কিও এসব সমাজসচেতন লোকদের সাথে মেশার সুযোগ পান। তিনিও ভাবতে শুরু করেন সমাজকে বদলে দেবার কথা। তাঁর বয়স যখন একুশ বছর, তখন কাজান শহরের চাকরি ছেড়ে দিয়ে শুরু করেন ভবঘুরের জীবনযাপন। ঘুরে বেড়েতে শুরু করেন দক্ষিণ রাশিয়ার নানা অঞ্চলে। সেখানে যে কাজ জুটত সযোগ

পেলে করতেন, আর ঘুরে বেড়াতেন মনের খুশিতে। দুচোখ ভরে দেখতেন চারপাশে জীবনকে।

ঠিক সেই সময় তিনি লিখতে শুরু করলেন। ১৮৯৫ পিটার্সবার্গ (বর্তমানে লেনিনগ্রাদ) থেকে একটি কাগজে সর্বপ্রথম 'চেলকাশ' নামে তাঁর একটি গল্প প্রকাশিত হয়। এই একটি গল্পে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে চারদিকে। বহু বই ইংরেজিতে অনূদিত হয়ে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত উপন্যাস হলো মাদার (মা)। এই উপন্যাসে তিনি দেখিয়েছে কেমন করে একজন অশিক্ষিত মা সত্যকে ভালোবাসে, মানুষ ভালোবেসে। ধীরে ধীরে অলক্ষে নিজেও বিপ্লবী হয়ে উঠনে। এই কালজয়ী উপন্যাসটি বিশ্বে বহুভাষায় অনূদিত হয়েছে। ১৯০৫ সালে গোর্কি আবারও কারারুদ্ধ হন। কিন্তু প্রতিবাদের মুখে সরকার আবারও তাঁকে মুক্তি দিতে বাধ্য হন।

কিন্তু জেল থেকে মুক্তি দিলেও পরের বছর অর্থাৎ ১৯০৬ সালেত তাঁকে সরকার দেশ ত্যাগে বাধ্য করে। তারপর ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে রাশিয়ার বিপ্লব সফলতা লাভ করলে, জার-শাসনের অবসান ঘটলে তিনি স্বদেশে ফিরে আসেন। ১৯৩৬ সালে এই মহান বিপ্লবী সাহিত্যাসাধকের জীবনাবসান ঘটে। কিন্তু তিনি মৃত্যুর আগেই রাশিয়ার শ্রেষ্ঠ লেখকের সম্মান অর্জন করেন। শুধু জীবিতকালেই নয়, ১৯৩২ সালে মৃত্যুর পরেও আজও তিনি সারাবিশ্বে সমানভাবে জনপ্রিয়।

ম্যাগনাকার্টা (Magna Carta)

ম্যাগনা কার্টা ইংল্যান্ডের একটি চুক্তি যা ১২১৫ সালে স্বাক্ষরিত হয়। ঐতিহাসিকভাবে ম্যাগনা কার্টা এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে একে বর্তমান সাংবিধানিক শাসনের সূচনা বলা যেতে পারে। ১২১৫ সালে ইংল্যান্ডের রাজা জন সামন্তদের চাপে পড়ে রাজার অধিকার সংক্রান্ত এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এই চুক্তির কারণে রাজাকেও হতে হয়েছিলো নিয়মের অধীন। ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক ইতিহাসে ম্যাগনা কার্টা প্রতিষ্ঠা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। এর শর্তগুলোর মধ্যে প্রধান হচ্ছে, রাজা প্রতিনিধি স্থানীয় লোকদের অনুমোদন ছাড়া কারো স্বাধীনতায় বা সম্পত্তিতে হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না। এই চুক্তির সুপ্রভাব শুধু ইংল্যান্ডেই নয়, অন্যান্য দেশেও ছড়িয়ে পড়ে। ক্ষমতা লিপ্সু রাজা সহজেই এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে চাননি। কিন্তু সকল সামন্ত মিলে রাজা জন কে লন্ডনের কাছে এক দ্বীপে বন্দি করে এই চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। এই চুক্তি বিচার বিভাগকেও অনেকটা নিরপেক্ষ করছিলো। ইংল্যান্ডের সংবিধান বলতে নির্দিষ্ট কোনো দলিল নেই। এই দলিলটি সে দেশের অন্যতম সাংবিধানিক দলিল। প্রজাদের অধিকার ও রাজার ক্ষমতা হ্রাসের যৌক্তিক এ দলিল পরবর্তীতে যুক্তরাষ্ট্রসহ বহুদেশে মানবাধিকার ও জনগণের ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ পথনির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে।

আধুনিককালে আইন ও মানবাধিকারের যে ধারণা বিকশিত হয়েছে সে তুলনায় ম্যাগনাকার্টা ততটা র‍্যাডিক্যাল সনদ নয়। কিন্তু পার্লামেন্ট ও আইনে শাসনের বিবর্তনের পটভূমিতে এর গুরুত্ব অপরিসীম। ১২১৫ সালে যখন ম্যাগনাকার্টা প্রণীত ও

স্বাক্ষরিত হয় তখন এটি এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দলিলে পরিণত হবে তা ভাবা হয় নি। ১৭ শতকে ম্যাগনাকার্টার গুরুত্ব ইংল্যান্ডের রাজনীতিতে বিশেষভাবে স্বীকৃত হয়। এটিকে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগঠিত আন্দোলনের একটি সফল উদাহরণ হিসেবে এখন গণ্য করা হয়। সাংবিধানিক বিকাশ ও গণতন্ত্র, মুক্তি ও স্বাধীনতার আন্দোলনের এক 'মাইলস্টোন' ম্যাগনাকার্টা। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে স্বৈরতন্ত্র ও একনায়কতান্ত্রিকতা অর্জিত হয়েছে ; যতসব সনদ, চুক্তি, দলিল, সংবিধান প্রণীত হয়েছে সেগুলোকে ম্যাগনাকার্টার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

ম্যাগসেসে পুরস্কার (Magsaysay Prize)

ফিলিপাইনের সাবেক প্রেসিডেন্ট রামেন ম্যাগসেসের (Ramon Magsaysay : ১৯০৭-৫৭) স্মরণে এই পুরস্কার প্রদান করা হয়। তিনি ১৯৫৭ সালে বিমান দুর্ঘটনায় নিহত হন এবং ১৯৫৮ সাল থেকে ফিলিপাইন সরকার এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। মানবকল্যাণে বিশেষ অবদান রাখার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হয়। ম্যাগসেসে পুরস্কার প্রদান করে র‍্যামন ম্যাগসেসে পুরস্কার ফাউন্ডেশন। এই পুরস্কারের মান একটি স্বর্ণপদক ও ২০ হাজার মার্কিন ডলার। বাংলাদেশের ড. মুহম্মদ ইউনূস, ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরী ও বেগম তাহরুন্নেসা আব্দুল্লাহ এই পুরস্কার পেয়েছেন।

ম্যানগ্রোভ বন (Rhitophoramangle)

লোনা পানি বা কাদার মধ্যে জেগে থাকা খুঁটির মতো এক ধরনের শ্বাস গ্রহণকারী শিকড়বিশিষ্ট উদ্ভিদকে ম্যানগ্রোভ বলে। আর যে বনে প্রচুর পরিমাণে এ ধরনের গাছ জন্মে সে বনকে ম্যানগ্রোভ বলে। ম্যানগ্রোভ বন বিশ্বের গ্রীষ্মমণ্ডলীয় উপকূলে জন্মায়। শান্ত সাগর, খাড়ি ও নদীর মোহনাও উপযুক্ত স্থান। ম্যানগ্রোভ বনে গাছপালা-লতাগুল্ম লবণাক্ত সাগরের তীরে আপনা আপনিই গড়ে ওঠে। এবং গাছপালা-লতাগুল্মের রয়েছে বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ম্যানগ্রোভ এভাবে ভূখণ্ড তৈরি করে। গাছের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কিছু শিকড় মাটির তলায়, কিছু ওপর দিকে থাকে। একে বলে 'শূল'। এটি খুব ধারালো বিশ্বের সেরা প্রজাতির গাছপালাসমৃদ্ধ ম্যানগ্রোভ জঙ্গলকে বলা হয় ম্যানগ্রোভ (Rhitophoramangle)। এই বন আছে ফ্লোরিডা থেকে শুরু করে দক্ষিণ আমেরিকা ও পশ্চিম আফ্রিকা উপকূলে। এই বনে গুল্ম ও ফার্ন জাতীয় ছোট গাছ জন্মে। কিছু প্রজাতির গাছ ২৫ মিটার লম্বা হয়। গাছের বাকলে ট্যানিক এসিড থাকে। এটি চামড়া ট্যান করতে ব্যবহৃত হয়। সুন্দরবন পৃথিবীর বৃহত্তম ম্যানগ্রোভ বন (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, রাজনীতিকোষ, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

ম্যারাথনের যুদ্ধ (War of *Marathon*)

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম-ষষ্ঠ শতাব্দীতে পারস্যের বাদশাহের খুবই প্রভাব ছিল। এজিয়ান সাগরের নিকট প্রায় সকল ক্ষেত্রেই তাদের আধিপত্য ছিল। এই ক্ষেত্রগুলোতে বিদ্রোহ

ঘটে এবং কর দেওয়া বন্ধ হয়ে যায়। তখন এক বিশাল সৈন্য নিয়ে রাজা ডেরিয়াস তাদের শিক্ষা দেয়ার জন্য এথেন্সের উত্তরে অবস্থিত ম্যারাথন নাম স্থানে পৌঁছান। ৪৯০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এ যুদ্ধ শুরু হয়। মিলিটাইডেজ ১১০০০ এথেন্সের সৈন্যদের নেতৃত্ব দেন ২০,০০০ পারস্য সৈন্যের বিরুদ্ধে। গ্রিক সেনাপতি মিলিটাইডেজ যুদ্ধ করে পারস্যের সৈন্যদের ম্যারাথনের যুদ্ধে পরাজিত করেন। পারস্যের বাদশাহ ডেরিয়াস এ যুদ্ধে পরাজয়ে এত দুঃখ পান যে, কিছুদিন পরই তার মৃত্যু ঘটে। ডেরিয়াস মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত গ্রিস জয় করার চেষ্টা করেও অসফল হন। এ যুদ্ধের ফলে গ্রিসের ছোট ছোট রাজ্যগুলো পরস্পর পরস্পরের মতোভেদ ভুলে এক মিত্রসংঘ স্থাপন করে এবং নিজেদের দাসত্ব থেকে মুক্ত করে।

ম্যাসট্রিখট চুক্তি (Treaty Pact of *Maastricht*)

ম্যাসট্রিখ হচ্ছে নেদারল্যান্ডের একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর। ১৯৯২ সালের ৭ ফেব্রুয়ারি এই শহরে ইউরোপীয় অর্থনৈতিক গোষ্ঠী (EEC)-এর ১২টি দেশ মিলিত হয়ে অভিন্ন ইউরোপ গঠনের উদ্দেশে একটি ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করে, যা ম্যাসট্রিখট চুক্তি নামে পরিচিত। এই চুক্তির ফলে:

১. ১৯৯৯ সালের মধ্যে একটি কেন্দ্রীয় ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করা হবে যার সদর দপ্তর থাকবে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরে।
২. ১৯৯৯ সালের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে ইকু (European Currency Unit-ECU) নামক একক মুদ্রা ব্যবস্থা চালু করার ব্যবস্থা করা হয়।
৩. ১৯৯৬ সাল থেকে সদস্য রাষ্ট্রগুলো একক প্রতিরক্ষা নীতি অবলম্বন করবে— এই মর্মে ব্যবস্থা রাখা হয়।
৪. ১৯৯৩ সাল থেকে এই চুক্তি কার্যকর হওয়ার ফলে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে সীমান্তরেখা উঠে যায়।

ম্যাসট্রিখট চুক্তিতে স্বাক্ষরিত রাষ্ট্রগুলো ইতিমধ্যে এই চুক্তি অনুমোদন সম্পন্ন করেছে। ফলে অভিন্ন ইউরোপ গঠনের প্রচেষ্টা বাস্তব এগিয়ে চলেছে।

যথাযথ কার্যপ্রণালী (Due Process)

উপযুক্ত বা যথাযথ কার্যপ্রণালী ; বৈধ কর্মপদ্ধতি। যে স্বাধীনতা ও ন্যায়পরত সম্পকীয় মৌলিক নীতিসমূহের ওপর দেশের সর্বপ্রকার পৌর ও রাজনৈতিক সংস্থা এবং প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিষ্ঠিত, বৈধ বিধি নিষেধ দ্বারা তাহাদের আওতায় সরকারকে সীমাবদ্ধ করার পদ্ধতকে 'যথাযথ কর্মপদ্ধতি' বলা হয়। দেশের অলিখিত প্রচলিত আইন হতে ব্রিটেনে এর উৎপত্তি হয় এবং শাসকগণ যাতে স্বেচ্ছাচারী শাসন দ্বারা ব্যক্তিকে তার জীবন, স্বাধীনতা ও সম্পত্তি হতে অবৈধ এবং অন্যায়ভাবে বঞ্চিত করতে না পারে সেজন্য তাদেরকে সংযত করা হয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এই ধরনের নিয়ম সকল সরকারি বিভাগে প্রযোজ্য এবং বর্তমানে ইহা দ্বারা কর্ম পদ্ধতি সম্পর্কীয় বিধি-নিষেধ এবং মূল

আইনসমূহের সারাংশের ওপর আরোপিত বিধিনিষেধ বোঝায়। প্রখ্যাত রাজপুরুষ ড্যানিয়েল ওয়েবস্টার এই 'যথাযথ কর্মপদ্ধতির নিম্নলিখিত ব্যাখ্যা প্রদান করেন : 'কোন ব্যক্তিকে দোষী সাব্যস্ত করার পূর্বে তার বক্তব্য শ্রবণ করা, বৈধ উপায়ে অভিযুক্ত করার আগে তদন্ত করা, এবং বিচারের পরে রায় ঘোষণা করা।' যে সকল বিধি দ্বারা কোন ব্যক্তির বিচার করা হয়, তাহাতে কোন প্রকার স্বেচ্ছাচারমূলক বা অন্যায় শর্ত থাকিবে না। স্বাধীনতা ও ন্যায়পরতা সংক্রান্ত যে সকল মৌলিক নীতি নিয়ে এই ধরনের 'যথাযথ পদ্ধতি' গঠিত হয় তাহা অংশত মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকাতে পাওয়া যায় এবং মৌলিক অধিকারসমূহের তালিকার বিশেষ বিশেষ শর্তসমূহকে সাধারণ যথাযথ কার্যপ্রণালীর দফার আওতাভুক্ত বলে গণ্য করা হয়। তাহা ছাড়া, দেশের প্রচলিত প্রথা, ঐতিহ্য, ব্যবস্থাপক সভা কর্তৃক আইন, বিচারের নজির, এবং ন্যায় অ্যায় সম্বন্ধে প্রচলিত মতবাদ যা দেশের সুপ্রতিষ্ঠিত সংবিধানের অংশ হিসাবে স্বীকৃত ও গৃহীত হয়েছে, তাদের মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় যথাযথ কর্মপদ্ধতির অর্থ ও তাৎপর্য। মার্কিন রাজ্যসমূহ (States) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গঠনতন্ত্রসমূহের যথাযথ কর্মপদ্ধতি সংক্রান্ত দফা বা ধারাসমূহে সরকারের ক্ষমতর ওপর আরোপিত বিধিনিষেধের সুস্পষ্ট ইঙ্গিত রহিয়াছে এবং আদালতে নির্ধারিত বিভিন্ন মামলার রায় হতে এর বিষয়বস্তু নির্ণীত হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মুদ্রাব্যবস্থা (Federal Reserve System)

যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় মুদ্রানিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন সম্পন্ন রাষ্ট্রে কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সমগ্র দেশের জন্য কেন্দ্রীয় ভাবে মুদ্রার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি। এ পদ্ধতি অনুসারে সাধারণত সমগ্র যুক্তরাষ্ট্রের জন্য একটি কেন্দ্রীয় রিজার্ভ (বা সংরক্ষণ) ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার সেই ব্যাঙ্কের মারফত যুক্তরাষ্ট্রের সমগ্র মুদ্রার প্রচলন কেন্দ্রীভূত করে শিল্প ব্যবসায়ের লগ্নি, ঋণ, সরবরাহ প্রভৃতি নিয়ন্ত্রিত করে। এই 'রিজার্ভ ব্যাঙ্কের' হাতে মুদ্রা সম্পর্কে প্রভূত ক্ষমতা ন্যস্ত করা হয় ; ইহা দেশের সকল ব্যাঙ্কের ক্রিয়াকলাপ, লেনদেন

লগ্নি প্রভৃতিও তদারক করতে এবং বিভিন্ন ব্যাঙ্ককে এর নির্দেশ পালনে বাধ্য করতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে প্রথম এই রিজার্ভ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। পাকিস্তানে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক বা স্টেট ব্যাঙ্ক মুদ্রা নিয়ন্ত্রিত করে থাকে।

যুগপৎ আন্দোলন (Simultaneous Movement)

বিভিন্ন দল বা জোট কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন অবস্থান থেকে একই দাবিতে পরিচালিত আন্দোলন। একটি 'সাধারণ শত্রু'র বিরুদ্ধে বিভিন্ন দল বা রাজনৈতিক দলগুলোর জোট এ ধরনের আন্দোলন পরিচালনা করে। শাকগোষ্ঠী বা সরকারি দলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলো আন্দোলন করে কিন্তু তারা নিজের ঐক্যবদ্ধ হয় না। ভিন্ন ভিন্ন 'প্ল্যাটফর্ম' থেকে একটি কর্তৃপক্ষের (authority) বিরুদ্ধে একই কর্মসূচি দেয় এবং একই

সঙ্গে পালন করে। ঐক্যবদ্ধ না হলেও দরগুলোর মধ্যে একটি যোগাযোগ ও সমঝোতা হয়। এ সমঝোতার মধ্যদিয়ে যুগপৎ বা একই সঙ্গে শাসকগোষ্ঠীর ওপর চাপ প্রয়োগ করে। বাংলাদেশে ১৯৮২ থেকে ১৯৯০ সাল পর্যন্ত স্বৈরশাসন বিরোধী আন্দোলনে যুগপৎ কৌশল ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হওয়ার ফলে এটি পরিচিতি লাভ করে। আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে ৮ দলীয় জোট, বিএনপি'র নেতৃত্বে ৭ দলীয় জোট এবং বামপন্থী ৫ দলীয় জোট জাতীয় পার্টির সরকারের বিরুদ্ধে যুগপৎ আন্দোলন পরিচালনা করে। যুগপৎ আন্দোলন ঐক্যবদ্ধ আন্দোলনে পরিণত হতে পারে, আবার না-ও হতে পারে।

যুদ্ধ (War)

যুদ্ধ হলো দুই বা ততোধিক দেশের সশস্ত্র সংঘর্ষ। বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে নির্দিষ্ট কিছু অধিকার কিংবা সশস্ত্র বলপ্রয়োগের মাধ্যমে অর্জনের নীতি। সশস্ত্র বলপ্রয়োগ স্বভাবতই অল্পবিস্তর হিংসাত্মক হয়ে থাকে। তবে যুদ্ধের সঙ্গে কোনো রাষ্টের অভ্যন্তরীণ গৃহযুদ্ধ অথবা বিদ্রোহের মিল নেই। কোনো আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক সংকট যখন আর শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধান করা যায় না, তখনই শুরু হয় যুদ্ধ বা সংঘাত। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী বিভিন্ন রাষ্টের মধ্যে যুদ্ধ স্বীকৃতি পায় ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। যুদ্ধসংক্রান্ত রীতিনীতি ও নিয়মকানুন আছে। তবে যুদ্ধ কখনও নিয়ম-নির্ধারিত পথে ঘটে না। বিবদমান শক্তিসমূহের হিংসা ও প্রতিহিংসা উত্তরোত্তর বেড়ে যাবার ফলে রীতিনীতি লঙ্ঘিত হয়। যুদ্ধের আইন মেনে চলার প্রশ্ন ওঠে শান্তি ফিরে এলে এবং যুদ্ধের দায় ও অপরাধের বিচারের তাগিদে। বিভিন্ন ধরনের যুদ্ধ হতে পারে। যেমন: গেরিলা যুদ্ধ, হত্যাকাণ্ড লড়াই, বিদ্রোহ, সীমিত যুদ্ধ ইত্যাদি। মার্কসবাদ-লেনিনবাদে বলা হয় যে, যুদ্ধ মূলত দুই প্রকারের ১. ন্যায় ও ২. অন্যায়। যে যুদ্ধের পরিণাম হয় শোষক শ্রেণির শক্তিবৃদ্ধি এবং ধনবৃদ্ধি সে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত নয়। কিন্তু যে যুদ্ধের পর শ্রেণিশোষণ ও জাতীয় নিপীড়ন থেকে মানুষ মুক্তি পায় সে যুদ্ধ ন্যায়সঙ্গত। ওই দৃষ্টিতে একথাও মনে করা হতো যে বিশ্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মতো একটি সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্র গঠিত হবার ফলে শান্তির পক্ষে শক্তিসম্পন্ন প্রতিরোধচিন্তা যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রবল হয়েছে। বিরোধ নিস্পত্তির একটি প্রক্রিয়া হিসেবে যুদ্ধের এক ধরনের স্বীকৃতি ছিল বহুদিন আগে থেকে। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে যুদ্ধের পক্ষে নানাবিধ বিধান গড়ে উঠেছিল।

যুদ্ধ-ঘোষণা (Declaration of War)

কোন এক রাষ্ট্র কর্তৃক অন্য রাষ্ট্রের নিকট নিজেদের মধ্যে যুদ্ধ বিরাজমান বলে যে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণাপত্র প্রেরণ করা হয়, তাকে 'যুদ্ধ ঘোষণা' বলে। পূর্বে আন্তর্জাতিক নিয়ম অনুসারে যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ হবার পূর্বে এই ধরনের ঘোষণাপত্রের বিনিময় হত। অধুনা অনেক রাষ্ট্রই অতর্কিত আক্রমণের সুযোগ নেওয়ার জন্য জন্য যুদ্ধবিগ্রহ আরম্ভ করে পরে আনুষ্ঠানিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

যুদ্ধবিরতি (Armistice)

শান্তি স্থাপনের লক্ষ্যে যুদ্ধের নিষ্পত্তি কিংবা অবসানই যুদ্ধবিরতি। সাধারণত সেটা যুদ্ধমান বিভিন্ন পক্ষের মধ্যে অস্থায়ী চুক্তি অথবা বর্তমান অনুরূপ কোনো চুক্তির শর্তবিশেষের প্রয়োগ বোঝায়। যুদ্ধবিরতির অর্থ বিধিসম্মত যুদ্ধের পরিসমাপ্তি নয়; কিংবা শান্তি বা আত্মসমর্পণও নয়। দুই পক্ষের মধ্যে নিছক কিছু পারস্পরিক আদানপ্রদান ও সাময়িক নিবৃত্তি হলো যুদ্ধবিরতির চরিত্র। যুধ্যমান বিভিন্ন দেশের উচ্চপর্যায়ে যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলেও সেনাধক্ষরা সেটা প্রয়োজনে অমান্য করেন। যুদ্ধবিরতি ঘোষিত হলে পরাজিত পক্ষের অসুবিধা প্রকট হয় না। অন্যদিকে জয়ী দেশের লাভ হয়তো সীমাবদ্ধই থাকে।

যোগান (Supply)

সাধারণত কোন বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের যে পরিমাণ বাজারে বর্তমান থাকে তাকে যোগান বলা হয়। কিন্তু অর্থনীতিতে 'যোগান' শব্দটি একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। একটি নির্দিষ্ট সময়ে এবং একটি নির্দিষ্ট মূল্যে বিক্রেতাগণ কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ বিক্রয় করতে রাজি থাকে তাকেই যোগান বলা হয়। অর্থনীতিতে যোগান (supply) এবং মজুত (stock) এর মধ্যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে। কোন বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যের মোট পরিমাণকে 'মজুত' বলা হয় এবং একটি বিশেষ মূল্যে যে পরিমাণ দ্রব্য বিক্রেতাগণ বিক্রয় করতে রাজি থাকে তাকে যোগান বলা হয়। যেমন— ধরা যাক, বাজারে মোট ৫০ মণ পাট রয়েছে কিন্তু পাটের দাম মণ প্রতি ৫০০ টাকা। এই মূল্যে পাট বিক্রেতাগণ মাত্র ৩০ মণ পাট বিক্রয় করতে রাজি আছে। এমতাবস্থায় পাটের মজুতের পরিমাণ হল ৫০ মণ, কিন্তু যোগানের পরিমাণ হল মাত্র ৩০ মণ। সুতরাং মজুতের একটি অংশ হলো যোগান। মোট মজুতের যে অংশ নির্দিষ্ট দামে বাজারে বিক্রয়ের জন্য উপস্থাপিত করা হয় তাকেই যোগান বলা হয়।

যৌথ অধিবেশন (Joint Session)

সাধারণত দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইনসভার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। মূলত উভয় কক্ষের মিলিত অধিবেশন। দুটি কক্ষের মধ্যে মতভিন্নতা দেখা দিলে, তা নিরসনে এ ধরনের মিলিত অধিবেশন বসে। কোনো কোনো দেশে সংবিধান সংশোধন বা নির্দিষ্ট কিছু আইন পাস করতে যৌথ অধিবেশনের প্রয়োজন পড়ে। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উভয় পক্ষ যৌথ অধিবেশনে বসে না। মার্কিন কংগ্রেস যৌথ অধিবেশন হয় তবে এ ধরনের অধিবেশনে কোনো বিল নিয়ে আলোচনা হয় না। যৌথ অধিবেশন সরাসরি টেলিভিশনে সম্প্রচারিত হয়। এ অধিবেশনে নির্বাহী প্রধান রিপোর্ট বা বাণী দেন। জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ চলমান ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে অবহিত হতে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন হয়। প্রেসিডেন্ট কোনো বিদেশি সম্মানিত অতিথির উদ্দেশে ভাষণ দিলে কংগ্রেসের যৌথ অধিবেশন বসে। যুক্তরাষ্ট্রের অধিকাংশ রাজ্য আইনসভা যৌথ অধিবেশন করে।

যৌথ নিরাপত্তা (Belligerency)

এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে এক রাষ্ট্রের নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক অখণ্ডতার নিশ্চয়তা চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য রাষ্ট্রকে দিতে হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদ মূলত যৌথ নিরাপত্তা রক্ষার উদ্দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পদ্ধতিতে যৌথ সিদ্ধান্ত প্রত্যেক রাষ্ট্র মানতে বাধ্য। নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান পাঁচটি সদস্য-রাষ্ট্রের পরিষদে যেকোনো সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে **প্রতিষেধ** (veto) প্রদানের ক্ষমা থাকায় যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা গৃহীত হতে পারে, যদি উক্ত পাঁচটি রাষ্ট্রের তাতে ঐকমত্যে থাকে। তা না হলে এ নীতির প্রয়োগ সম্ভব নয়, কার্যকরও হয় না।

রক্ষণশীল দল (Conservative Party)

ব্রিটেনের রাজনৈতিক দলের নাম। ঐতিহ্যগতভাবে এই দলটি ডানপন্থি এবং ব্রিটিশ টোরি দলের উত্তরসূরি। রক্ষণশীল রাজনৈতিক ভাবধারার লক্ষণ হলো প্রচলিত ও বর্তমান বিধিব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার প্রবণতা। তাদের দৃষ্টিতে সেইসব বিধিব্যবস্থা হলো নিজগুণে সুন্দর, অন্তত সম্ভাব্য বিকল্প থেকে ভাল, নিরাপদ, সুপরিজ্ঞাত, বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী। ১৮৩৪ সালে রাজনৈতিক দল হিসেবে রক্ষণশীল দলের উদ্ভব হয়। আগে এর নাম ছিল টোরি। সপ্তদশ শতকে আইরিশ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত শব্দটি পরবর্তীকালে সম্প্রসারিত করে খ্রিস্টান ক্যাথলিকদের বিরুদ্ধে শ্লেষার্থে টোরি শব্দটি প্রযুক্ত হতো; বিশেষ করে যারা দ্বিতীয় চার্লসের জায়গায় ইংল্যান্ডের সিংহাসনে ক্যাথলিকদের দাবি ছাড়তে চায়নি। সেসময়ে প্রধান দুটি দলের একটি ছিল টোরি দল। অবশ্য রক্ষণশীল সামাজিক সংস্কার কর্মপন্থা এখনও টোরি গণতন্ত্র নামে অভিহিত। পূর্বে অভিজাত ও ভূস্বামী বনেদি বংশীয়দের নিয়ে টোরি দল গঠিত ছিল। উনিশ শতকের শেষদিকে বৃহৎ ব্যবসায়ী গোষ্ঠী এবং হালফিল আমলে যুক্তরাজ্যের নিম্নবিত্তবর্গের মানুষও এই দলকে সমর্থন করে। বার্ক ও ডিজেরলি ছিলেন রক্ষণশীলদের তাত্ত্বিক নেতা। দলের মতাদর্শ ১৯৪৫ সাল থেকে পরিবর্তিত হয়। তার শিল্পোন্নয়নের নীতির লক্ষ্য হলো কেন্দ্রীয় নির্দেশক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যমের সমন্বয়, যেটাকে কল্যাণকর পুঁজিবাদ বলা হয়। দলের আধুনিক নীতির লক্ষ্য হলো কেন্দ্রীয় নির্দেশক্রমে ব্যক্তিগত উদ্যমের সমন্বয়, যেটাকে কল্যাণকর পুঁজিবাদ বলা হয়। দলের আধুনিক নীতি, যথা সার্বজনীন ভোটাধিকার, জাতীয় একতা, অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণির সমন্বয়, আধুনিক শিল্পোন্নয়নে ক্ষতিকর বিষয়ে চেতনা ইত্যাদি বিষয়ে ডেজরেলির প্রভাব বর্তমান। দল এখন উদারনীতি ও অবাধ বাণিজ্যের পরিপোষক। ব্রিটেনে এই দলের নামকরা নেতাদের মধ্যে রয়েছেন, উইনস্টন চার্চিল, হ্যারল্ড ম্যাকমিলান, এডওয়ার্ড হিথ প্রমুখ।

রক্ষণশীলতা (Conservatism)

রক্ষণশীলতা বলতে কোনো ধরনের পরিবর্তনের প্রতি বিরোধীতাকে বোঝায়। সাধারণত প্রচলিত সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সমাজকাঠামো ও

ব্যবস্থাসমূহ পরিবর্তন, বিশেষত বিপ্লবী পরিবর্তন না করার নীতি বা মনোবৃত্তিকেই রক্ষণশীলতা বলে। তবে পরিবর্তনের গতি বা ধারাকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে হবে যাতে অতীতের শ্রেষ্ঠ উপাদান বা তত্ত্বকে চির পরিবর্তনশীল সমাজের নতুন উপাদান বা তত্ত্বের সাথে একসূত্রে বেঁধে রক্ষা করা যায়।

রয়টার্স (Ruiters)

'রয়টার্স' সংবাদ সংস্থার নামকরণ করা হয় পল জুলিয়াস রয়টারের নামানুসারে। তিনি ছিলেন এ সংবাদ সংস্থার জনক। জুলিয়াস রয়টার জন্মেছিলেন জার্মানির ক্যাসল শহরে। প্রথম কর্মজীবনে তিনি ছিলেন একজন ব্যাংক কর্মচারী। চাকরির পাশাপাশি বার্লিন শহরে একটি বইয়ের দোকানও চালাতেন তিনি। কিন্তু চাকরি কিংবা ব্যবসা কোনোটাইতে তার মন বসলো না। দুটোই ছেড়ে দিয়ে পাড়ি জমালেন ফ্রান্সে। সেখানে পরিচয় হলো চার্লস হভাস নামক এক ব্যক্তির সাথে। হভাসের ছিল 'করেসপন্ডেন্টস গ্যারানিয়ের' নামক একটি নিউজ ব্যুরো। তিনি এ নিউজ ব্যুরোর মাধ্যমে ইউরোপের সংবাদপত্রের খবরাখবর ফরাসি ভাষায় রূপান্তরিত করে স্থানীয় পত্র-পত্রিকায় সরবরাহ করতেন। সংবাদ সরবরাহ করে হভাস যথেষ্ট আর্থিক সাফল্য লাভ করেন। যুবক রয়টার হভাসের সাথে পরিচয় সূত্রে পেয়ে গেলেন তার নিউজ ব্যুরোতে শিক্ষানবিস হিসেবে কাজ। রয়টারের খুব ভালো লাগলো এ পেশা। উচ্চাকাঙ্ক্ষী রয়টার স্বপ্ন দেখলেন নিজ উদ্যোগে একটি সংবাদ সংস্থা খোলার। ১৮৪৫ সালে জুলিয়াস রয়টারের সংবাদ সংস্থার যাত্রা শুরু হলো। তার বাসভবনে সংবাদ সংস্থার অফিস। রয়টার ফরাসি সংবাদপত্রের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করে ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সংবাদপত্রে প্রেরণের ব্যবস্থা করলেন। সরকার কর্তৃক ফ্রান্সের সংবাদপত্রগুলোর স্বাধীনতা কেড়ে নেওয়া হলে রয়টারের সংবাদ ব্যবসাতে কিছুটা অসুবিধার সৃষ্টি হয়। পরে তিনি জার্মানিতে এসে নতুন উদ্যোগে তার সংবাদ সংস্থার তৎপরতা শুরু করেন। তখন ১৮৪৯ সালে জার্মানির বার্লিন থেকে আকেন পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়। সংবাদ সরবরাহে সুবিধার কথা বিবেচনা করে রয়টার আকেন শহরে অফিস স্থাপন করেন। একই সাথে বেলজিয়ামের ব্রাসেলস থেকে ফ্রান্সের প্যারিস পর্যন্ত টেলিগ্রাফ লাইন চালু হয়। সেই সুবাদে রয়টার সুযোগ পেয়ে গেলেন প্যারিস-বার্লিন আকেন লাইনে সংবাদ সরবরাহ করার। তবে ব্রাসেলস থেকে আকেন টেলিগ্রাফ লাইন চালু না হওয়াতে রয়টার এল লাইনে সংবাদ সরবরাহ করতে একটু অসুবিধায় পড়লেন। দুটো শহরের দূরত্ব প্রায় ১০০ মাইল। এ দুটো শহরের মধ্যে যোগাযোগের জন্য রয়টার সংবাদ বাহনের প্রাচীন মাধ্যম পায়রার সাহায্য নিলেন। ব্রাসেলসের রয়টার্স প্রতিনিধি ফ্রান্সের প্যারিস থেকে সংগৃহীত সংবাদগুলো এক বিশেষ ধরনের কাগজে লিখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত পায়রাগুলোর পায়ে বেঁধে নিতেন। এরা উড়ে সোজা চলে আসতো আকেনের রয়টার্স অফিসে। রয়টার নিজ হাতে পায়রার পা থেকে সংবাদ লেখা কাগজগুলো খুলে নিতেন এবং এগুলো কপি করে সরবরাহ করতেন স্থানীয়

সংবাদপত্রে। ইতিমধ্যে চালু হয়ে যায় ব্রাসেলস-আকেন টেলিগ্রাফ লাইন। এ সাথে ফুরিয়ে যায় পায়রার প্রয়োজনও। সংবাদ সরবরাহ ব্যবসাতো স্বর্ণালী সাফল্য দেখে রয়টার আর ছোট্ট শহর আকেনে থাকতে চাইলেন না। ১৮৫১ সালে লন্ডনে পাড়ি জমালেন তার সংবাদ সংস্থা রয়টার্সের অফিস স্থাপনের জন্য। বর্তমানে ২০০টি দেশের হাজার হাজার সংবাদপত্রে রয়টার্স সংবাদ সরবরাহ করে। রয়টার্সের সদর দপ্তর থেকে প্রতিদিন প্রায় পাঁচ লক্ষ শব্দ সম্বলিত সংবাদ বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। রেডিও, টেলিভিশনও তাদের সংবাদ বুলেটিন তৈরি করতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে রয়টার্সের সাহায্য নেয়। দুই হাজারের অধিক কর্মী রয়টার্স সংবাদ সংস্থা চব্বিশ ঘণ্টা সংবাদ সরবরাহ, সংগ্রহ, সম্পাদনা, পরিবেশনা, বন্টন ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত রয়েছে। বর্তমানে সংবাদ সরবরাহের জন্য রয়টার্স অত্যাধুনিক যোগাযোগ মাধ্যমকে কাজে লাগাচ্ছে। জুলিয়াস রয়টারের এ নীতি ছিল যে, তার এজেন্টগণ যে সংবাদ পাঠাবেন তা অবশ্যই বস্তুনিষ্ঠ ও সন্দেহাতীত হতে হবে। তার এ নীতিতে রয়টার্স এখনো অটল। সংবাদ সংস্থার পথিকৃৎ পল জুলিয়াস রয়টার ১৮৯৯ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি মারা যান।

রাজকীয় প্রজাতন্ত্র (Crowned Republic)

সাধারণত রাজতন্ত্র বলতে এক ধরনের বংশানুক্রমিক শাসনব্যবস্থাকে বোঝায়। আবার প্রজাতন্ত্র রাজতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীত শাসনব্যবস্থা যেখানে কোন বংশানুক্রমিক বা উত্তরাধিকারমূলক পদ থাকে না; রাষ্ট্রপ্রধান প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে নির্বাচিত হন। এদিক থেকে রাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্র প্রজাতন্ত্রের সমাহার একটি দেশের শাসন ব্যবস্থায় অসম্ভব। কিন্তু ব্রিটেনে এই উভয় ব্যবস্থার এক অভিনব সমাবেশ ঘটেছে। এখানে রাজা বা রানি হলেন নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক প্রধান। প্রকৃত ক্ষমতার মালিক হল মন্ত্রিসভা বা ক্যাবিনেট। ব্রিটিশ প্রতিনিধিদের নিয়ে কমন্সসভা গঠিত হয় এবং ৫ বছরের জন্য নির্বাচিত মন্ত্রিসভা তার কৃতকার্যের জন্য যৌথভাবে কমন্সসভার কাছে দায়ী থাকতে হয়। এই দায়িত্বশীলতা আসলে জনগণের কাছে সরকারের দায়িত্বশীলতা বলে প্রতিপন্ন হয়। অর্থাৎ জনগণই হল সর্বোচ্চ রাজনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী, জনগণই সার্বভৌম। তবে ব্রিটেনের এই রাজতন্ত্রের সাথে প্রজাতন্ত্রের তেমন কোন বিরোধ নেই। বরং বহু শতাব্দী ধরে ব্রিটিশ রাজতন্ত্রের গণতন্ত্রীকরণ ঘটেছে এবং চরম রাজতন্ত্র 'মুকুটহীন প্রজাতন্ত্রে, (Crowned Republic) পরিণত হয়েছে।

রাজকীয় বিশেষাধিকার (Prerogatives of the Crown)

পার্লামেন্ট কর্তৃক প্রণীত আইনের কর্তৃত্ব ছাড়াই শাসন বিভাগ কর্তৃক প্রযুক্ত স্বেচ্ছাধীন যে সকল ক্ষমতা রাজা ও রানি প্রয়োগ করতে পারেন সেই ক্ষমতাকে রাজকীয় বিশেষাধিকার (Prerogatives of the Crown) বলা হয়। এগুলো কোনো দলিলে উল্লেখ নেই। ব্রিটেনের রাজা ও রানির বিশেষাধিকারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি হলো: পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করা, পার্লামেন্ট বাতিল করা, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য

মন্ত্রী নিয়োগ করা, যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন করা, দণ্ড হ্রাস বা ক্ষমা প্রদর্শন করা, চুক্তি সম্পাদন করা, বিল অনুমোদন করা, বৈদেশিক ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণ করা, সম্মান বিতরণ করা ইত্যাদি। বছরের প্রথম অধিবেশনে রাজা বা রানি বাণী প্রেরণ করতে পারেন।

রাজক্ষমা (Amnesty)

অ্যামনেস্টি অর্থ হলো বিস্মৃতি বা ভুলে যাওয়া। অপরাধীদের দোষ লাঘব অথবা মার্জনার মাধ্যমে ক্ষমা করা কিংবা চাপাচাপি না করার নিশ্চয়তা দান। শত্রুপক্ষীয়দের সঙ্গে মৈত্রীর সম্পর্ক স্থাপনের এটি একটি উপায়। যুক্তরাষ্ট্রে আব্রাহাম লিঙ্কন প্রেসিডেন্ট হবার পর দাক্ষিণাঞ্চলের এগারোটি রাজ্যের কনফেডারেসি গঠনসূত্রে যে গৃহযুদ্ধ ঘটে (১৮৬১-৬৫) তার ব্যর্থতার পর তাতে লিপ্ত সকলের প্রতি ক্ষমা প্রদর্শিত হয়।

রাজনৈতিক কারণে বিভিন্ন দেশে কারারুদ্ধ ব্যক্তিদের কিংবা যুদ্ধবন্দিদের মুক্তির দাবিতে আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশে লন্ডনে ১৯৬১ সালে পিটার বেনেনসন নামে ব্রিটেনের এক আইনজীবী অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল নামে একটি সংস্থা গঠন করেন। ওই সংস্থা বন্দি ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে সাহায্য এবং কারাগারে বন্দি ও আটক অন্যান্যদের প্রতি আন্তর্জাতিক মান অনুসারে সরকারি আচরণ প্রদর্শনের জন্য আন্দোলন করে। রাষ্ট্র ও অভিযুক্ত ব্যক্তির আদর্শগত মতপার্থক্যের জন্য মানুষকে অযথা কারারুদ্ধ করা, তার ওপর অত্যাচার ও তাকে হত্যা করার বিরুদ্ধে ওই সংস্থা সারা বিশ্বে তুমুল সাড়া ফেলেছে। ৫৭টি দেশে পরিব্যাপ্ত বিভিন্ন কেন্দ্রে মোট পঞ্চাশ হাজার সদস্য আছেন। ব্যক্তিগত অর্থসাহায্যে ওই সংস্থার ব্যয়নির্বাহ হয়। বিশেষ কোনো ধর্ম বা রাজনৈতিক মতাদর্শের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই। যে কোনো মতাদর্শ গ্রহণ এবং বিবেকের স্বাধীনতা হলো তার মূল দাবি। ১৯৭২ সালে এটি নোবেল প্রাইজ পায়।

রাজতন্ত্র (Monarchy)

সাধারণভাবে যে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় রাজাই রাষ্ট্রের প্রধান এবং রাজা হওয়ার ব্যাপারটা উত্তরাধিকারমূলক সে রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থাকেই বলা হয় রাজতন্ত্র। এটি মূলত এক ব্যক্তির এক ব্যক্তির দ্বারা শাসিত রাজত্ব। প্রচলিত ধারণায় যে রাষ্ট্রব্যবস্থার শীর্ষে রাজা কিংবা রানির পদাধিকার বলে কোনো একজন অধিষ্ঠিত থাকেন। তিনি সারা জীবন ওই পদে থাকতে পারেন। রাজতন্ত্র সেই ধরনের সরকারকে বুঝান হয় যেখানে সকল রাজনৈতিক ক্ষমতা একজন সর্বময় শক্তিধর শাসকের ওপর অর্পিত থাকে। রাজতন্ত্রের বিধান অনুসারে উত্তরাধিকারী ক্ষমতায় আরোহন করেন। যখন রাজতন্ত্রকে এক প্রকার সরকার হিসেবে বিবেচনা করা হয়-যেখানে রাষ্ট্রের প্রধান ক্ষমতায় আরোহণ করেন উত্তরাধিকার নিয়মে। সেখানে সর্বময় ক্ষমতা থাকে একক শাসকের ওপর। রাজতন্ত্র দুপ্রকার যথা; চরম রাজতন্ত্র (Absolute Monarchy) এবং সীমিত রাজতন্ত্র (Limited Monarchy)। চরম রাজতন্ত্রে রাজার ক্ষমতা হয় লাগামহীন। শাসনকার্য পরিচালনার ক্ষেত্রে কারও কাছে দায়ী থাকেন না। বরঞ্চ সকল ব্যক্তিই তার নির্দেশ মতো কাজ করতে বাধ্য

থাকবে। ব্রিটেনে ১৬৮৮ সালের পূর্বে এ রকম রাজতন্ত্র প্রবর্তিত ছিল। ফ্রান্সের রাজা চতুর্দশ লুই একজন অসীম ক্ষমতার রাজা ছিলেন। ক্ষমতার দর্পে তিনি বলতেন, "আমিই রাষ্ট্র"। কারণ তিনি রাষ্ট্রের সকল বিষয় নিজ হাতে নিয়ন্ত্রণ করতেন। এসব চরম ক্ষমতাধর রাজাকে মান্য করা যেন কর্তব্য ছিল। রাজার প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ছিল ঐশ্বরিক বিষয়। বিশেষ ক্ষেত্রে চরম রাজতন্ত্র ভয়ানক উপকারী হয়। অসভ্য জাতি বা সমাজকে সভ্যতার আলোকে আনয়নে চরম রাজতন্ত্র উপকারী ও সহায়ক। পাক-ভারত উপমহাদেশে চরম রাজতন্ত্র প্রচলিত ছিল, হব্স চরম রাজতন্ত্রকে সমর্থন করেছেন। রাষ্ট্রের সার্বিক উন্নয়ন একচ্ছত্র রাজার দ্বারা সম্ভব। তাকে হতে হবে রাষ্ট্রের জনগণের জনক। এমন রাজতন্ত্রের দ্বারা জনগণের বহু কল্যাণ সাধিত হতে পারে। একজন ব্যক্তি খুব দ্রুত সিদ্ধান্ত নিয়ে তার সমাধান করতে পারেন। যুদ্ধকালীন সময়ে একক শাসকের প্রভাব খুব ভাল ফল বহন করে আনে। যেহেতু সারাজীবন ক্ষমতায় থাকে সেজন্য তার অভিজ্ঞতা হয় অধিক বেশি—যা রাষ্ট্রের উন্নয়নের জন্য সহায়ক। ইংল্যান্ড ও ভারতবর্ষের কতিপয় রাজতন্ত্রের মধ্যে এমন লক্ষণ দেখা গিয়েছে। দীর্ঘকাল ক্ষমতায় থাকার ফলে সুদীর্ঘ পরিকল্পনা গ্রহণ করে তা বাস্তবায়ন করতে পারেন। দলের প্রতি যেহেতু কোনো সমর্থন থাকে না সেজন্য দল নিরপেক্ষ হয়ে শাসন করতে পারেন। রাজা যদি জনকল্যাণ করতে চান তার সে সুযোগ থাকে প্রচুর পরিমাণে এমনিভাবে রাজতন্ত্রের নানা গুণগান করা যায়। কিন্তু শাসন ব্যবস্থার যতই গুণাবলি থাক না কেন এর দোষ সব চাইতে প্রবল। সমগ্র রাষ্ট্রের জনসাধারণের ভালমন্দ এক ব্যক্তির সিদ্ধান্ত অনুসারে গৃহীত ও স্থির হতে পারে না। যত ভালই হোক না কেন ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা থাকা বাঞ্ছনীয়। সীমাহীন রাজতন্ত্র যে দেশে প্রচলিত ছিল সেখানেই রচিত হয়েছে তার কলংকময় ইতিহাস এবং সংঘটিত হয়েছে বিপ্লব। ক্ষমতা থাকে এক ব্যক্তির হাতে এবং তিনি মৃত্যু পর্যন্ত বহাল থাকেন। তাই তার ভুল সিদ্ধান্ত হলেও বহুকাল ধরে সেটা মান্য করতে হয়। উত্তরাধিকারভাবে রাষ্ট্রনায়কের ক্ষমতায় আবির্ভাব অযৌক্তিক। এতে অযোগ্য, বিকলাঙ্গ প্রভৃতি অপ্রকৃতস্থ ব্যক্তিও চরম ক্ষমতায় বসতে পারেন। চরম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার থাকায় এক সময়ে স্বৈরতন্ত্রের দিকে ধাবিত যে হয় তার বহু নজির স্থাপিত হয়েছে। জনগণের মন-মানসিকতা দুর্বল হয়ে যায়, গণতন্ত্রের পথ রোধ হয়। ক্ষমতা যাদের হাতে থাকে তারা সম্পদের পাহাড় গড়ে। এমনিভাবে এর দোষ-ত্রুটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। তাই চরম রাজতন্ত্র কোনো সময়ের জন্য সমর্থন করা যায় না।

সীমিত রাজতন্ত্রের প্রধান কথা হলো, রাজার হাতে শাসনতান্ত্রিক তেমন কোনো ক্ষমতা থাকে না। সকল ক্ষমতা পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেটের হাতে থাকে। তারাই দেশের শাসন কর্মের সকল কিছু পরিচালনা করেন। রাজার হাতে কিছু আনুষ্ঠানিক ক্ষমতা দেওয়া থাকে মাত্র, তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত দিতে পারেন না। এই প্রকার রাজা আছেন ইংল্যান্ড, জাপান, বেলজিয়াম, হল্যান্ড, নরওয়ে, সুইডেন, ডেনমার্ক, স্পেন, থাইল্যান্ড প্রভৃতি দেশে। এ ধরনের রাজতন্ত্রকে অবশ্য অনেকে রাজতন্ত্রই বলেননি।

নামমাত্র রাজতন্ত্রে থাকে না। বর্তমানে ব্রিটেন ও জাপানে এই প্রকার রাজতন্ত্র বলবৎ আছে। ক্ষমতা পার্লামেন্ট ও ক্যাবিনেট পরিচালনা করে। রাজার ক্ষমতা এতই সীমিত যে, একেবারে নেই বললেই চলে। রাজার পর কে রাজা হবেন সে নীতিও ঘোষণা করার অধিকার পার্লামেন্টের হাতে। এ রাজতন্ত্র গণতান্ত্রিক শাসনের প্রতি হুমকি নয়। এজন্য বলা হয়, ব্রিটেনের রাজা রাজত্ব করেন কিন্তু শাসন করেন না। শাসন করার ক্ষমতা তার নেই। তিনি নামমাত্র প্রধান, আসল ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রীর হাতে। ব্রিটেনে রাজার নামে দেশ শাসিত হলেও প্রকৃত ক্ষমতা থাকে প্রধানমন্ত্রী ও তার ক্যাবিনেটের ওপর। K.C. Wheare তাকে সাক্ষিগোপাল বা পুতুল রাজা (Puppet Monarch) বলে অভিহিত করেছেন। তাছাড়া শাসনকার্য পরিচালনার ব্যাপারে রাজা সবার সাথে পরামর্শ করেন। প্রবাদ আছে যে, রাজা ভুল করেন না। এর প্রধান কারণ হলো, তিনি ভুল করতে পারেন না, কেননা কোনো সিদ্ধান্ত নেবার পূর্বেই তিনি নির্দিষ্ট ব্যক্তির সাথে কথা বলেন নেন। তিনি হলেন সাংবিধানিক প্রধান, তাই সংবিধানের বাইরে কোনো কিছু করা তার পক্ষে সম্ভব নয়। জেনিংস বলেছেন, সাংবিধানিক প্রধান হিসেবে এই রাজতন্ত্রের বিশেষ সুবিধা হলো যে, তিনি সকল প্রকার দলীয় কার্যক্রমের উর্ধ্বে থাকেন। পার্লামেন্টারী শাসনের উৎকর্ষতা বিধানের জন্য সীমিত রাজতন্ত্র ভাল ফলদায়ক হয়েছে। ব্রিটেন ও জাপানে রাজা নামমাত্র শাসক প্রধানের ভূমিকা পালন করেন। তারা সাধারণত রাষ্ট্র প্রধান নামে সুপরিচিত। সংসদীয় সরকারের একজন নামমাত্র শাসক প্রধান আবশ্যক। তাছাড়া তাদের ব্যক্তিগত প্রভাব, দান ও অন্যবিধ কার্যাদি জনহিতকর হয়। সীমিত রাজতন্ত্রের দোষ হলো এটি একটি অপ্রয়োজনীয় ব্যবস্থা। শুধু মাত্র সামান্য কারণে এ পদ রেখে প্রচুর অর্থ ব্যয় করার কোনো মানেই হয় না। এজন্য এক সময়ে ব্রিটেনে প্রস্তাব উঠেছিল রাজতন্ত্র সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করার। কোনো কোনো সময়ে শাসনব্যবস্থা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমান কালে রাজতন্ত্র থাকার আর কোনো প্রশ্নই আসে না। নেপালে রাজতন্ত্র বাতিল হয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সংসদীয় সরকার। ভুটানের রাজা জিগমে উয়াংচুং দেশে সংসদীয় সরকার চালু করতে আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। তিনি চরম ক্ষমতাসম্পন্ন রাজা থাকবে চান না। (সূত্র: ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

রাজনীতি (Politics)

ইংরেজি পলিটিক্স শব্দের বাংলা প্রতিরূপ রাজনীতি। আমরা যদি রাজনীতি বুঝতে চাই তাহলে কীভাবে রাজনীতির সৃষ্টি হয়, তা বোঝা দরকার। সাধারণত দুটি উপায়ে রাজনীতির সৃষ্টি হয়; যথা: ক. স্ক্যায়ার্সিটি বা বস্তু-অবস্তুর অপর্যাপ্ততার প্রেক্ষাপটে এবং খ. ডিজএগ্রিমেন্ট-কনফ্লিক্ট-ক্যাওয়াস বা মতভিন্নতা-দ্বন্দ্ব-বিতন্ডার প্রেক্ষাপটে।

মানুষ যা কিছু পেতে চায়, তা যদি চাহিদার চাইতে কম পরিমাণ-মাত্রা-সংখ্যায় বিদ্যমান থাকে, তবে তা অর্জন বা পাওয়ার জন্য রাজনীতির সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অপর্যাপ্ততার প্রেক্ষাপটে রাজনীতি। প্রেসিডেন্ট-প্রধানমন্ত্রী-মন্ত্রী-এমপি-চেয়ারম্যান-

মেম্বার প্রভৃতি পদ-পদবি ও মর্যাদা, টাকা-বাড়ি-গাড়ি-প্লট প্রভৃতি বিত্ত-বৈভবের উপাদান যদি প্রার্থীত পরিমাণের চাইতে বেশি থাকতো, তাহলে এসব নিয়ে রাজনীতি হতো না, অপর্যাপ্ত বলেই এ সবের জন্য রাজনীতি হয়। বস্তুগত দিক থেকে অগ্রসর অনেক দেশে বিদ্যুৎ-গ্যাস পর্যাপ্ত বলে সে সব দেশের নাগরিকেরা-রাজনীতিকেরা বিদ্যুৎ-গ্যাস নিয়ে রাজনীতি করে না। বাংলাদেশে এ দুটি সেবাখাত রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। খাবার পানিও বাংলাদেশে রাজনীতির প্রসঙ্গে পরিণত হয়, প্রধানত রাজধানী ঢাকায়। আবার যেকোনো বিষয়ে যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে কোনো ভিন্নমত-দ্বন্দ্ব-বিতন্ডা না থাকে, সে বিষয়ে কখনো রাজনীতি হয় না। কোনো কোনো সমবায় সমিতি, অন্যান্য সমিতি ও প্রতিষ্ঠানের নেতৃত্ব বিষয়ে সদস্যদের মাঝে সাধারণ অনীহা দেখা যায়। সেসব ঘটনায় নেতৃত্ব রাজনীতির বিষয় হয় না। কিন্তু সাধারণত 'নেতৃত্ব' সকল ক্ষেত্রেই রাজনীতির বিষয়ে পরিণত হয়ে থাকে। কারণ কে এবং কারা শীর্ষ ও পরবর্তী ধাপের নেতা হবেন, এ নিয়ে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের মধ্যে মতভিন্নতা-দ্বন্দ্ব-বিতন্ডা থাকে বলেই নেতৃত্ব রাজনীতির অনিবার্য বিষয়।

'মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ' দানের আইনানুগ অধিকার লাভের জন্যই মানুষ রাজনীতি করে বলে ডেভিড ইস্টনের মতো কোনো কোনো রাষ্ট্রবিজ্ঞানী দাবি করেছেন। এখানে মূল্য বলতে কাঙ্ক্ষিত কিন্তু অপর্যাপ্ত যাবতীয় পদ-পদবি, সম্মান, মর্যাদা, বিত্ত ও বস্তুকেই বোঝানো হয়েছে। কর্তৃত্ব হলো আইনানুগ বা বৈধ 'ক্ষমতা'। নির্দিষ্ট করে বলা যায়, কেউ একজন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী হতে পারলে তিনি অনেককে মন্ত্রী-প্রতিমন্ত্রী-উপমন্ত্রী বানাতে পারেন, অনেককে রাষ্ট্রদূত-ভাইস চ্যান্সেলর-পিএসসি-ইউজিসির চেয়ারম্যান-মেম্বার বানাতে পারেন, একুশে পদক-স্বাধীনতা দিবস পদক-রোকেয়া পদক দিতে পারেন, পছন্দের ব্যক্তিদের মাধ্যমে বাছাইকৃত এলাকাসমূহ বেশি উন্নয়ন বরাদ্দ দিতে পারেন, ব্রিজ-ভবনের গায়ের নামফলক লাগাতে পারেন ইত্যাদি ইত্যাদি। এতোসব কাজ একজন বাংলাদেশি প্রধানমন্ত্রী করতে পারেন যথাযথ বৈধ উপায়েই। তাই প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য (এবং অতঃপর অন্য সব পদ-পদবির জন্য) লোকেরা দিনের পর দিন-কখনো আজীবন রাজনীতি করেন।

সর্বত্রই এমনকি রান্না ঘরেও রাজনীতি আছে বলে যে কথা প্রচলিত, সেটি ধ্রুপদী বা ক্লাসিক্যাল রাজনীতি নয়—সামাজিক সম্পর্কের নানামাত্রিক জটিলতার বহি:প্রকাশ-ধ্রুপদী রাজনীতির লক্ষ্য মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরাদ্দ প্রদানের স্বীকৃত ও বৈধ যোগ্যতা অর্জন। মূল্যের কর্তৃত্বসম্পন্ন বরান্দের অধিকার পেয়ে রাজনীতিকগণ নিজেদের/দলীয় নীতি-আদর্শ অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় কার্যক্রমে নেতৃত্ব দিতে পারেন— এটিই কার্যত রাজনীতির সর্বোচ্চ লক্ষ্য। (বিস্তারিত দেখুন: তারেক শামসুর রেহমান, বাংলাদেশ রাজনীতির চারদশক, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১০)।

রাজনীতি নিস্পৃহতা (Apolitical)

রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক দল সম্পর্কে উদাসীন মনোভাব। মার্কসীয় মতানুসারে রাজনৈতিক চেতনায় সর্বাধিক অনগ্রসর শ্রমজীবী জনসাধারণের মধ্যে এই মানসিকতা বিরাজ করে

এবং সেই সুযোগে বুর্জোয়া মতাদর্শের প্রচারকেরা ন্যায্য সুবিধাদি অর্জনের জন্য শ্রেণি সংগ্রাম থেকে শ্রমজীবীদের নিবৃত্ত করে। ভিন্ন দৃষ্টিতে যে মানসিক অবস্থানে রাজনৈতিক বিধিব্যবস্থা তথা যেসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতা প্রযুক্ত হয় সেই সব ব্যাপারে নিরাসক্ত মনোভঙ্গী। যেহেতু যাবতীয় সামাজিক পরিবর্তনের অভিঘাত ওই সকল প্রতিষ্ঠানের ওপর প্রতিফলিত হয় এবং সেগুলোর সংশোধন ঘটায়, সেহেতু রাজনীতি নিরপেক্ষ হলেও সেগুলোকে রাজনৈতিক ব্যঞ্জনা দেওয়া হয়। কারও কারও মতে সব ধরনের সামাজিক ক্রিয়াকলাপের পেছনে রাজনৈতিক তাৎপর্য থাকে। সেই সব ক্রিয়াকলাপের কোনোটির রাজনৈতিক উদ্দেশ্য না থাকলেও রাজনৈতিক পরিণতি দেখা দিলে উভয়ের মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। যে ব্যবস্থায় সরকারের বিরোধিতা অবৈধ, সেখানে রাজনীতি নিস্পৃহ সংস্থার অবকাশ নেই।

রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন (Criminalization of Politics)

পলিটিক্যাল ক্রিমিনালাইজেশন অর্থে রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়ন রাজনীতির পন্থায় দুর্বৃত্তপনা বা অপরাধ করার বিষয়াদিকে চিহ্নিত করে। ধারণার দিক থেকে এটি ক্ষুদ্রতর। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন-এর ধারণাটি সেদিক থেকে বৃহত্তর। এ নিবন্ধে বৃহত্তর আওতা থেকে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন ধারণাটি ব্যাখ্যা করা হবে। 'ক্রিমিনালাইজেশন অব পলিটিক্স' যদি হয় 'রাজনীতির দুর্বৃত্তায়ন'-এর ইংরেজি রূপ, তবে এর দ্বারা রাজনীতিতে দুর্বৃত্ত বা অপরাধীদের অংশীদার করার প্রবণতাকে বোঝানো হয়। রাজনীতিকে অপরাধী দুর্বৃত্তদের অংশীদার করার প্রধান দুটি রূপ দেখা যায়; ক. রাজনীতির নেতা-কর্মীরা নিজেরাই ব্যাপকমাত্রায় বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক দুর্নীতিপূর্ণ কার্যক্রমে লিপ্ত হওয়া ও খ. রাজনীতির বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্বে (দলীয় ও রাষ্ট্রীয়) দুর্বৃত্ত-অপরাধী ব্যক্তিবর্গকে আসীন করা বা যুক্ত করা।

অপরাধীন বা দুর্বৃত্ত ব্যক্তিরা যখন রাজনীতিতে নেতৃত্ব পায়, রাজনীতির ক্ষমতা ও প্রাধান্য ব্যবহার করে তারা ব্যক্তিগত-পারিবারিক-গোষ্ঠীগত স্বার্থ উদ্ধার করে, যা অনিবার্যভাবেই দেশ-জাতি-জনগণের জন্য নানামাত্রার ক্ষতি ও বিপর্যয় ডেকে আনে। প্রবণতা হিসেবে দুর্বৃত্তায়ন প্রতিরোধ করা এবং অপরাধী-দুর্বৃত্তদের রাজনীতি থেকে উৎখাত করা তাই একটি তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক উদ্যোগে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নে উল্লিখিত দুই প্রধান রূপকেই কার্যকর দেখা যায়। এ দেশের রাজনীতিতে দীর্ঘ সময় থেকে বা নিয়মিত প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণকারী নেতা-কর্মীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ, যদিও অধিকাংশ নয় কমবেশি অপরাধমূলক কার্যক্রমে যুক্ত হচ্ছিল। বাংলাদেশি শীর্ষ বা নাম জানা রাজনীতিকদের একটি অংশ পরিচিত শিল্পপতি-ব্যবসায়ী হিসেবে। নেতৃত্বের পরবর্তী স্তরগুলোতেও ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ব্যক্তিবর্গ রয়েছেন বাংলাদেশের প্রধান দলগুলোতে। পেশাদার ব্যবসায়ী এসব ব্যক্তি দলগুলোর নিয়মিত নেতা-কর্মী হওয়ায় ও দলগুলোর কোনোটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় বা সিটি কর্পোরেশনের মতো অন্য কোনো কর্তৃপক্ষের ক্ষমায় আসীন হলে

তাদের কেউ কেউ বেআইনী প্রক্রিয়ায় অর্থ-বিত্ত অর্জনের দৃষ্টিগ্রাহ্য চেষ্টা করেছেন। নিয়মিত রাজনীতিক এসব ব্যবসায়ীর অপরাধ বা দুর্নীতি প্রবণতা বাংলাদেশে খাঁটি অর্থে নিকট অতীতের কিছু সময়েই কেবল সীমা লংঘন করেছে বলে মনে করা হয়। কিন্তু রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের অন্য রূপটি বাংলাদেশে অপরাধ ও দুর্নীতির এক ভয়াবহ পরিস্থিতির সৃষ্টি করে চলছিল। রাজনৈতিক নেতৃত্বের বিভিন্ন স্তরে হঠাৎ করে ব্যবসায়ী-পুঁজিপতিদের অসীন করার প্রবণতা বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে দেখা গেছে। অরাজনৈতিক ব্যক্তিবর্গ বিশেষত 'বাণিজ্যপ্রবণ ব্যক্তিদের' অনেককে বাংলাদেশের প্রধান রাজনৈতিক দলগুলো রাজনৈতিক পদ-পদবি প্রদান করেছে। দলগুলো নিজেদের দীর্ঘদিনের নেতাকর্মীদের বাদ দিয়ে বা বঞ্চিত করে ব্যবসায়ীদের মাঝে 'নেতৃত্ব বিতরণ' করার ফলে দুর্বৃত্তায়নের ধারণাটি নাগরিক সমাজে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছিল। এ পর্যায়ে রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের বাস্তব প্রয়োগগত কয়েকটি উদাহরণ বিবেচনা করা যেতে পারে। জাতীয় সংসদসহ বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদানের সময় মোটা অংকের অর্থের বিনিময়ে 'অরাজনৈতিক ব্যবসায়ী-বিত্তবানদের' মনোনয়ন প্রদানের ঘটনা ঘটেছে বেশ কিছু। সপ্তম ও অষ্টম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে এরকম মনোনয়ন প্রদানের ঘটনা নাগরিক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এ বিষয়টি এক পর্যায়ে 'মনোনয়ন বাণিজ্য' বলে নিন্দিত হতে থাকে। স্থগিত হয়ে যাওয়া নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত কয়েকটি বড় দলের পাশাপাশি নবগঠিত ২/৩টি দলের বিরুদ্ধেও এই মনোনয়ন বাণিজ্যের অভিযোগ এসেছে। এটি রাজনীতি ও রাজনীতিকদের বিরুদ্ধে জনমনে ক্ষোভ ও ক্রোধ সৃষ্টি করে। রাজনীতির দুর্বৃত্তায়নের আরেক নমুনা দলের গুরুত্বপূর্ণ পদে বাণিজ্যপ্রবণ ব্যক্তিদের আসীন করা। প্রধানত ক্ষমতাসীন দলের গুরুত্বপূর্ণ দলীয় পদ বহুল আলোচিত চাঁদাবাজি কার্যক্রমে সহায়ক হয়ে থাকে। কিছু ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতারা প্রধান বিরোধী দলের নেতাদের সাথে সমঝোতার ভিত্তিতে চাঁদাবাজি করেছেন বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। নিয়মিত বা পরিচিত রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ চাঁদাবাজি ও প্রতারণাসহ নানান উপায়ে বিপুল পরিমাণ অর্থবিত্তের মালিক হওয়ায় বাংলাদেশে রাজনীতিকদের 'মহত্তম জনসেবকের' ভাবমূর্তি গুরুতরভাবে ক্ষুণ্ন ও অবনমিত হয়েছে। (বিস্তারিত দেখুন: তারেক শামসুর রেহমান, *বাংলাদেশ রাজনীতির চার দশক*, ঢাকা: শোভা প্রকাশ, ২০১০)।

রাজনৈতিক অধিকার (Political Rights)

রাজনৈতিক অধিকার বলতে জনগণের এমন এক ধরনের অধিকারকে বোঝায় যা দ্বারা জনগণ স্ব-স্ব পছন্দমতো রাজনৈতিক দলে বা রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় (দলের সদস্য হওয়া, প্রার্থী, সভা সমিতিতে ও নির্বাচনে অংশগ্রহণ করাসহ অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সম্পৃক্ততা) অংশগ্রহণ করতে পারে। জনগণের রাজনৈতিক বা আনুষাঙ্গিক অধিকারগুলো হলো, যেমন; ১. শ্রমিক, কৃষক, ছাত্র, যুবক সংগঠন করার অধিকার; ২. নিজ নিজ আদর্শ ও মতবাদ প্রচার করার অধিকার; ৩. সরকারি অন্যায়-অবিচারের

প্রতিবাদ করার অধিকার; ৪. সংবাদপত্র-পুস্তকাদি প্রকাশ করার অধিকার; ৫. নির্বাচনের মাধ্যমে বিভিন্ন স্তরের সরকার নির্বাচিত করার এবং সরকারে নির্বাচিত হওয়ার অধিকার; ৬. পার্লামেন্টে অবাধে কথা বলার অধিকার ইত্যাদি।

রাজনৈতিক আশ্রয় (Political Asylum)

কোনো রাষ্ট্রের কোনো নাগরিক নিজ দেশে অপরাধ করে অথবা সরকারের রোষ বা শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য পালিয়ে গিয়ে অপর কোনো রাষ্ট্রে বা তার দূতাবাসে আশ্রয় গ্রহণ করলে এবং উক্ত রাষ্ট্র ও দূতাবাস ও সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আশ্রয় ও নিরাপত্তা প্রদান করলে এবং উক্ত ব্যক্তির মূল রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষের নিকট তাকে প্রত্যার্পণ করতে অস্বীকার করলে, এরূপ আশ্রয়কে রাজনৈতিক আশ্রয় বলে।

রাজনৈতিক তত্ত্ব (Political Theory)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের অবিচ্ছেদ্য অংশ রাজনৈতিক তত্ত্ব। রাজনৈতিক তত্ত্বের ভূমিকা ও অর্থের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রবিজ্ঞানিগণ বিভিন্ন তত্ত্বের কথা বলেছেন। তারা নিজ নিজ অভিজ্ঞতার আলোকে মতামত দিয়েছেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সেই অংশ হলো রাজনৈতিক তত্ত্ব যা বিশেষত রাজনৈতিক বিষয়ের কিছু সাধারণ নীতিকে সূত্রের দ্বারা আবদ্ধ করে। কেবল রাষ্ট্রের উৎপত্তি, বিকাশ, প্রকৃতি, লক্ষ্য প্রভৃতিকে না করে সমগ্র রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে সামগ্রিক আলোচনা করে। ফ্রান্সিস কোকাকের মতে, যখন সরকারের সংগঠন ও কার্যাদিকে ফলাফল অর্জনের জন্য শুধুমাত্র বর্ণনা, তুলনা ও বিচার্য বিষয়রূপে গণ্য না করে মানুষের স্বতঃসিদ্ধ প্রয়োজন, মতামত, আকাঙ্খা প্রভৃতিকে মূল্যায়নের বিষয় হিসেবে পরিগণিত করে, তখন রাজনৈতিক তত্ত্বের বিকাশ লাভ ঘটে। এটি এক সাথে আদর্শ স্থাপনকারী (Normative) এবং অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব হিসেবে কাজ করে। আদর্শ স্থাপনকারী তত্ত্ব এজন্য বলা হয় যে, এতে এমন কিছু করার প্রয়াস চালান হয় যা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় আদর্শস্থানীয় হয়ে থাকে। প্রয়োজনে অভিজ্ঞতার আলোকে তা পর্যালোচনা করা হয়। অভিজ্ঞতাবাদী তত্ত্ব হিসেবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার বাস্তব কার্যক্রমের দিক নির্দেশনা করে। এসব পর্যালোচনায় বলা যায়, রাজনৈতিক তত্ত্ব হলো রাজনীতির মৌলিক ধারণা এবং প্রধান আলোচ্য বিষয়সমূহের পাঠ মাত্র। দেখুন: ড. মো. মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা)।

রাজনৈতিক দর্শন (Political Philosophy)

রাষ্ট্রবিজ্ঞান আলোচনায় রাজনৈতিক দর্শন একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। রাজনৈতিক দর্শন ভিন্ন কোনো আলোচনা পরিপূর্ণতা লাভ করতে পারে না। রাজনীতি এবং দর্শন উভয়ই একে অপরের সঙ্গে ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। কোনোটিকে আলাদাভাবে দেখা যায় না। প্রাচীনকালের দার্শনিকদের চিন্তা-চেতনার মধ্য দিয়ে ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে রাষ্ট্রচিন্তা। পরবর্তীতে তাদের চিন্তা-ধারাকে বিশ্লেষণে আরও সমৃদ্ধশালী করা হয়েছে।

সমাজ পরিবর্তনশীল, তাই পুরাকালে যে চিন্তা প্রচলিত ছিল তা অচল প্রমাণিত হয়ে নতুনের সাথে তাল মিলিয়ে চলেছে। অবশ্য পুরাতনের ওপর ভিত্তি করেই নতুন ধারা জন্ম লাভ করে। দর্শনের ইংরেজি philosophy শব্দ Phile এবং Sophia থেকে এসেছে। Phile-এর অর্থ ভালবাসা বা Loving Ges Sophia-এর অর্থ জ্ঞান বা প্রজ্ঞা (Wisdom)। সুতরাং দর্শনের মূল কথা হলো প্রজ্ঞার প্রতি ভালবাসা (Love of Wisdo)। রাষ্ট্রবিজ্ঞান কিংবা রাজনীতি প্রজ্ঞার বাইরে নয় বরং দুটি পাশাপাশি জড়িত। নতুনের আগমন, পুরাতনের পরিবর্তন, দুটির সংমিশ্রণ প্রভৃতির মাধ্যমে রাজনৈতিক চিন্তা নতুন তত্ত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে, আর এর পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখছে দর্শন। দর্শনের সাথে রাষ্ট্রবিজ্ঞান জড়িত হয়ে সৃষ্টি করেছে রাজনৈতিক দর্শন।

যে বিষয় রাষ্ট্রের প্রকৃতি, নাগরিকতা, অধিকার ও কর্তব্য, রাজনৈতিক আদর্শ ইত্যাদির মূল সমস্যা সঠিক বা উদ্দেশ্যমূলক আলোচনা করে তাকে রাজনৈতিক দর্শন বলে অভিহিত করা যায়। রাজনৈতিক দর্শনকে বুঝতে হলে এর বৈশিষ্ট্য আলোচনা বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বলা যায় যথা; অবরোহ পদ্ধতি (Deductive), আদর্শ স্থাপনকারী (Normative) এবং রাজনীতির প্রকৃতি (Nature of Politics)। রাজনৈতিক দর্শন বিশেষত অবরোহ পদ্ধতি অনুসারে বিশেষ কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছে। এটা আদর্শ স্থাপনকারী দৃষ্টির ভিত্তিতে অগ্রসর হয় এবং সে অনুসারে রাষ্ট্র ও রাজনৈতিক জীবনের আলোচনা করে থাকে। এটা সামান্যতম হলেও রাজনীতির প্রকৃতি ও মানব জীবনে তার স্থান নিয়ে আলোচনা করে। এসব কারণে রাজনৈতিক ধ্যান-ধারণা ও মূল্যবোধের বেলায় এর ভূমিকা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলে পর্যবসিত হয়। রাজনৈতিক দর্শনকে রাজনৈতিক জীবনের লক্ষ্য, উদ্দেশ্য এবং যুক্তির জ্ঞানরূপে উল্লেখ করা হয়। ডেভিড অ্যাপটারের কথায়, মানবিক ঘটনাবলিতে প্রয়োগযোগ্য যুক্তি হলো রাজনৈতিক দর্শন।

রাজনৈতিক পুনর্বাসন (Political)

রাজনৈতিক পুনর্বাসন হলো কোনো ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা দল যদি কোনো কারণে রাজনৈতিক অধিকার হারায় এবং পরবর্তীতে তা পুনরায় লাভ করে, সেক্ষেত্রে পুনরায় রাজনৈতিক অধিকার লাভ বা তার প্রক্রিয়া।

রাজনৈতিক সংস্কৃতি (Political Culture)

রাজনৈতিক সংস্কৃতি বলতে একটি রাজনৈতিক দলের শৃঙ্খলার ধরন, নেতা ও কর্মীদের আচার-আচরণ ও চরিত্র প্রতিপক্ষের প্রতি আচরণ, নেতাদের সঙ্গে কর্মীদের সম্পর্ক ও আচরণের ধরন, জনগণের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী, নেতানেত্রীদের শিক্ষাগত ও সাংস্কৃতিক মান, আদর্শের প্রতি নিষ্ঠা, দলের স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার স্তর, ক্ষমতায় যাওয়ার পর আচরণ ইত্যাদিকে সমষ্টিগতভাবে বোঝায়। প্রত্যয়টি যদিও নতুন, তার অন্তর্নিহিত বিষয় বা মনোভাব পুরানো। মানুষের যেসব মানসিকতা, ভাবোদ্দীপনা, তেজস্ক্রিতা,

মেজাজ ও মূল্যবোধের সমষ্টি কোনো জাতি বা জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিক আচার-বিচার, বিশ্বাস প্রবণতাকে একত্র সমন্বিত করে সেটাই হলো রাজনৈতিক সংস্কৃতি। অ্যারিস্টটল যে মনোজগতের কথা বলেছিলেন তার প্রতিফলন ঘটে রাষ্ট্রীয় স্থিতাবস্থায় কিংবা বিপ্লবে। বিভিন্ন মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাস; মূল্যবোধ ও আবেগসম্পন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর যোগফলে রাজনৈতিক সংস্কৃতি দানা বাঁধে। ব্যক্তিগত দৃষ্টিতে কোনোটা ঠিক কিংবা কোনোটা ভুল, রাজনৈতিক ক্ষেত্রে কোনোটা ভাল অথবা মন্দ সেগুলো একত্রে মূল্যবোধের ধরন তথা পালনীয় রীতিনীতির বা ঔচিত্যের মান নির্ধারণ করে। সমাজের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো রাষ্ট্রের সামগ্রিক বিধিব্যবস্থার সঙ্গে জড়িত থাকে। রাজনৈতিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, কর্মপন্থা ও সিদ্ধান্ত এবং যাবতীয় প্রক্রিয়ার মধ্যে বক্তি মানুষের অবস্থান তাতে চিহ্নিত হয়। রাজনৈতিক মূল্যবোধের মধ্যে নানা কিছুর সঙ্গে সরকারের কাছ থেকে ব্যক্তিস্বাধীনতার প্রত্যাশা থাকে। বিভিন্ন দেশে লোকের বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধ ও বিশ্বাসের মধ্যে থাকে আইনের শাসন ও সরকারের জনহিতকর ক্রিয়াকর্মের প্রত্যাশা। রাজনৈতিক সংস্কৃতি একটি নিশ্চল মানসিকতা নয়। নবাগত চিন্তাভাবনা আদর্শ, শিল্পোন্নয়, প্রভাবশালী নতুন নেতৃত্বের উদয়, জনসংখ্যার পরিবর্তন ইত্যাদি রাজনৈতিক সংস্কৃতির পরিবর্তন সূচিত করে।
রাজনৈতিক অন্তর্গত বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা ও সংস্কৃতিগত জনসমষ্টি বা জাতির মধ্যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি সমান নাও হতে পারে। দেশে যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি আধিপত্য করে সেটা রাজনৈতিক বা সমাজিক নেতাদের দ্বারা সৃষ্ট থেকে পারে এবং সেটা হয়তো সংখ্যাগরিষ্ঠ জনসাধারণের সংস্কৃতি থেকে ভিন্ন। দুটিই আবার দেশের রাজনৈতিক দৃঢ়মূল স্থিতিশীলতাকে সুরক্ষা অথবা বিনষ্ট করে।

রাজনৈতিকীকরণ (Politicisation)

রাজনৈতিকরণ হলো একটি গতিশীল প্রক্রিয়া। যে প্রক্রিয়ায় কোনো ঘটনা বা প্রতিষ্ঠানকে রাজনৈতিক রূপ বা চরিত্র দান করা কিংবা বিশেষ রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করার প্রয়াস পাওয়াই হলো রাজনৈতিকীকরণ। কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী বিশেষকে কোনো রাজনৈতিক মতবাদ বা উদ্দেশে উদ্বুদ্ধ করার কাজকেও রাজনৈতিকীকরণ বলা যায়। অনেক সময় সামরিক বাহিনীকে সরকার বা রাজনৈতিক দল নিজের রাজনৈতিক স্বার্থে ব্যবহার করে বলে বিশেষ সুযোগ সুবিধা (পদোন্নতি) দিয়ে থাকে। ফলে তারা নিজ পেশার চেয়ে রাজনীতির প্রতি অধিক আগ্রহী হয়ে ওঠে।

রাজবন্দি (Political Prisoner)

রাজনৈতিক কারণে বন্দিদের রাজবন্দি বলা হয়। সাধারণ বন্দি বা কয়েদিদের তুলনায় রাজবন্দিদের কারাগারে উচ্চতর মর্যাদা প্রদান করা হয়ে থাকে। মন্ত্রী, এম.পি. ও অন্যান্য উর্ধ্বতন সরকারি কর্মকর্তাদের এই সুবিধা দেওয়া হয়।

রাজ্যসভা (Rajya Sabha)

রাজ্যসভা হলো ভারতীয় সংসদের উচ্চকক্ষ। এই সভার সদস্যসংখ্যা ২৪৫। ভারতের রাষ্ট্রপতি শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ও সমাজসেবার ক্ষেত্র থেকে ১২ জন সদস্যকে রাজ্যসভায় নির্বাচিত করেন; এঁরা মনোনীত সদস্য নামে পরিচিত। অন্যান্য সদস্যরা রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলোর বিধানসভা কর্তৃক নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার সাংসদদের কার্যকালের মেয়াদ ছয় বছর এবং প্রতি দুই বছর অন্তর সদস্যদের এক-তৃতীয়াংশ অবসর নেন। রাজ্যসভা স্থায়ী কক্ষ। নির্দিষ্ট সময় অন্তর লোকসভার অবলুপ্তি ও পুনর্নির্বাচন ঘটে। কিন্তু রাজ্যসভা ভেঙে দেওয়া যায় না। সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয় ছাড়া অন্য সব বিষয়ে রাজ্যসভা লোকসভার সমান মর্যাদা ভোগ করে। সরবরাহ-সংক্রান্ত বিষয়ে লোকসভার ক্ষমতা রাজ্যসভার চেয়ে বেশি। কোনো বিষয় নিয়ে দুই কক্ষের মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিলে সংসদের দুই কক্ষের যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে তা সমাধান করা হয়। তবে লোকসভার আকার রাজ্যসভার প্রায় দ্বিগুণ হওয়ায়, যৌথ অধিবেশনে লোকসভারই শক্তি বেশি থাকে। আজ পর্যন্ত সংসদে মাত্র তিনটি যৌথ অধিবেশন বসেছে। শেষ যৌথ অধিবেশনটি বসেছিল ২০০২ সালে সন্ত্রাস-বিরোধী আইন পোটা পাস করানোর জন্য।

ভারতের উপ-রাষ্ট্রপতি পদাধিকারবলে রাজ্যসভার চেয়ারম্যান। তাঁর অনুপস্থিতিতে রাজ্যসভার ডেপুটি চেয়ারম্যান সভার দৈনন্দিন কাজ পরিচালনা করেন। ডেপুটি চেয়ারম্যান সদস্যদের মধ্যে থেকে নির্বাচিত হন। রাজ্যসভার প্রথম অধিবেশন বসেছিল ১৩ মে, ১৯৫২। রাজ্যসভা একটি স্থায়ী পরিষদ। এর সদস্যরা ছয় বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রতি ২ বছর পর এক-তৃতীয়াংশ আসনে নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। রাজ্য বিধান সভার সদস্যরা রাজ্যসভার সদস্যদের নির্বাচিত করেন। রাজ্যসভায় সভাপতিত্ব করেন উপ-রাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচনী কলেজে রাজ্যসভার সদস্যরা অন্তর্ভুক্ত থাকেন।

রায় (Adjudication)

রায় (Adjudication) কথাটি বিচার, বিচারপূর্বক রায়দান, ন্যায়নির্ণয়ন, বিচার নিষ্পত্তি প্রভৃতি অর্থে ব্যবহার করা হয়। আদালত-বহির্ভূত ক্ষেত্রে শব্দটি প্রয়োগ খুবই সীমিত ; তবে ন্যায়নীতির প্রসঙ্গ ভিত্তিতে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এর বহুল প্রয়োগ দেখা যায়।

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি (Fundamental Principles of State)

রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি বলতে সেই সকল নীতিকে বোঝায় যেগুলো রাষ্ট্রের সামাজিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও বৈদেশিক নীতি নির্ধারণে সহায়তা করে। এগুলো একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি (Programme) হিসেবে কাজ করে। এ কারণে এদেরকে programme rightsও বলা হয়। সর্বপ্রথম ১৯৩৭ সালে আয়ারল্যান্ডের সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি সংযোজিত

হয়। এরপর ১৯৪৮ সালে বার্মার সংবিধান, ১৯৫০ সালে ভারতের সংবিধানে, ১৯৫৬ সালে ও ১৯৬২ সালে পাকিস্তান সংবিধানে এ সব নীতি গৃহীত হয়। এ ধারাকে অনুসরণ করে আমাদের ১৯৭২ সালের বাংলাদেশের সংবিধানেও কতগুলো রাষ্ট্র পরিচালনার মৌলিক নীতি গৃহীত হয়েছে।

রাষ্ট্রচিন্তা, অ-ইউরোপীয় (Political Thought, Non-western)

আধুনিককালে রাষ্ট্রচিন্তা বলতে যা বোঝায় তা আসলে প্রাচীন গ্রিক ব্যতীত অন্য কোথায় দেখা যায়নি। প্রাচীন যুগে ভারতীয়, মিশরীয়, ব্যবিলনীয়, পারস্য ও চৈনিক চিন্তাধারা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু এসব দেশে সরকার ছিল স্বৈরতান্ত্রিক। ব্যক্তি স্বাধীনতা, ব্যক্তি ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক প্রভৃতি বিষয়গুলো এসব দেশের রাষ্ট্রচিন্তায় তেমন উল্লেখযোগ্য ছিল না। তাছাড়া গ্রিসীয় চিন্তাধারার ন্যায় আধুনিককালের চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করতে না পারায় সুধী সমাজে সেগুলো অপেক্ষাকৃত কম সমাদৃত। তাই এই সকল চিন্তাধারার জন্য অ-ইউরোপীয় রাষ্ট্রচিন্তা বলা হয়। তদুপরি গ্রিক দার্শনিকরা কেবল রাষ্ট্রনীতিতে স্বতন্ত্রভাবে বিশ্লেষণ করেননি। এর ফলে তর্কবিদ্যা, নীতিশাস্ত্র, অধিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়গুলোকে ও সংযুক্ত করেন এবং ফলে রাষ্ট্রনীতি বিষয়টি অনেকখানি সমৃদ্ধ হয়ে ওঠে।

রাষ্ট্রতত্ত্ব (Political Theory)

রাষ্ট্রের ইতিহাস মানব সভ্যতার ন্যায় সুপ্রাচীন। মানুষ যুগ যুগ ধরে যে সকল সামাজিক প্রতিষ্ঠান বা আচার অনুষ্ঠান সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করে আসছে তন্মধ্যে রাষ্ট্রই সর্বাপেক্ষা সার্বজনীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। তাই বিভিন্ন সময় রাষ্ট্রচিন্তাবিদ বা রাষ্ট্র দার্শনিক রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে যে সকল সুচিন্তিত এবং সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা, তথ্য ও তত্ত্ব প্রদান করেছেন সেই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণকে রাষ্ট্রতত্ত্ব বলা হয়। রাষ্ট্রতত্ত্ব রাষ্ট্রের স্থিতিশীল পর্যায় সম্পর্কে আলোচনা করে।

রাষ্ট্রদূত (Ambassador)

কোনো একটি সার্বভৌম দেশে অপর একটি সার্বভৌম দেশের কূটনৈতিক প্রতিনিধিদের রাষ্ট্রদূত বলা হয়। রাষ্ট্রদূতরা স্বদেশের প্রতিনিধি হিসেবে বিশেষ সুবিধাদি ভোগ করে থাকেন। তবে অপরাধ যাই হোক না কেন, ভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূতকে হত্যা বা গ্রেফতার করা যায় না, বড় জোর তাকে বহিষ্কার ও অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা যায়। রাষ্ট্রদূত তার নিজ দেশে যেসব সংবাদ প্রেরণ করেন বা নিজ দেশ থেকে যেসব সংবাদ প্রাপ্ত হন তা সেন্সর করা বিধেয় নয়। বস্তুত রাষ্ট্রদূতের কাজ হলো নিযুক্তিপ্রাপ্ত দেশে তার স্বদেশের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সার্বভৌমত্ব বিষয়ক, নিরাপত্তাবিষয়ক ও সাংস্কৃতিক স্বার্থসহ সর্বপ্রকার স্বার্থ রক্ষা করা। কমনওয়েলথভুক্ত দেশসমূহের পারস্পরিক রাষ্ট্রদূতকে হাই কমিশনার (High Commissioner) বলা হয়।

রাষ্ট্রদ্রোহ (Sedison)

রাষ্ট্রের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের পরে ক্ষতিকর কাজকেই বলা হয় রাষ্ট্রদোহিতা। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায় যে, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী তাদের প্রতিপক্ষের সকল কর্মকাণ্ডকে ঢালাওভাবে রাষ্ট্রদোহিতা হিসেবে আখ্যায়িত করে শ্বেতসন্ত্রাসের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে অবদমন করার প্রয়াস পায়।

রাষ্ট্রপতি পদের মেয়াদ (Term of Office of President)

বাংলাদেশ সংবিধানের বিধানাবলি সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণের তারিখ থেকে ৫ বছর মেয়াদ পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বে তার উত্তরাধিকারী কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত রাষ্ট্রপতি অধিষ্ঠিত থাকবেন। একাধিকক্রমে হোক বা না হোক দুই মেয়াদের অধিক রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত থাকবেন না। স্পীকারের উদ্দেশে স্বাক্ষরযুক্ত পত্রযোগে রাষ্ট্রপতি স্বীয় পদ ত্যাগ করতে পারবেন। তবে সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগে অভিশংসিত (Impeachment) করা যেতে পারে। এজন্য সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশের স্বাক্ষরে অনুরূপ অভিযোগের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে একটি প্রস্তাবের নোটিশ স্পীকারের নিকট প্রদান করতে হবে। সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের ক্ষেত্রে স্পীকারের নিকট অনুরূপ নোটিশ প্রদানের দিন থেকে চৌদ্দ দিনের পূর্বে বা ত্রিশ দিনের পর এই প্রস্তাব আলোচিত হতে পারবেনা; এবং সংসদ অধিবেশনে না থাকলে স্পিকার অবিলম্বে সংসদ অধিবেশন আহ্বান করবেন। আবার শারীরিক বা মানসিক অসামর্থ্যের কারণে আনীত অভিযোগ তদন্তের জন্য সংসদ দ্বারা নিযুক্ত কোনো আদালত, ট্রাইব্যুনাল বা কর্তৃপক্ষের নিকট সংসদ রাষ্ট্রপতির আচরণ গোচর করতে পারবেন। সংসদের মোট সদস্য-সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ ভোটে সংসদ প্রস্তাব গ্রহণ করলে গৃহীত হবার তারিখে রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হবে। রাষ্ট্রপতির পদ শূন্য হলে কিংবা অনুপস্থিতি, অসুস্থতা বা অন্য কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হলে ক্ষেত্রমত রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত না হওয়া পর্যন্ত কিংবা পুনরায় স্বীয় কার্যভার গ্রহণ না করা পর্যন্ত স্পিকার রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করবেন।

রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট (President's Cabinet)

রাষ্ট্রপতি শাসিত শাসনব্যবস্থায় রাষ্ট্রপতি একাধারে রাষ্ট্রপ্রধান এবং দেশের শাসন বিভাগের প্রকৃত কর্ণধার। মার্কিন সংবিধানে ক্যাবিনেটের কোন আইনগত স্বীকৃতি না থাকলেও ১৭৯৩ সাল থেকে ক্যাবিনেটের অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। তখন থেকে বিভাগীয় প্রধানদের ক্যাবিনেট সদস্য বলা হয়, রাষ্ট্রপতি জর্জ ওয়াশিংটন, টমাস জেফারসন এবং আলেকজান্ডার হ্যামিলটনকে ক্যাবিনেটের সদস্য নিযুক্ত করেছিলেন। বর্তমানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন শাসন বিভাগীয় দপ্তর এবং এজেন্সীসমূহের কর্মকর্তা ও কর্মসচিবদের (Secretary) নিয়ে সাধারণত মার্কিন ক্যাবিনেট গঠিত হয়। মার্কিন

যুক্তরাষ্ট্রের বিভাগীয় মন্ত্রীরা সচিব নামে পরিচিত। সাধারণত মার্কিন প্রশাসনের ১৩টি বিভাগের সচিবরা ছাড়াও বিশিষ্ট পাঁচ পদাধিকারীদেরকে ক্যাবিনেটের সদস্য করা হয়। তাঁরা হলেন: উপরাষ্ট্রপতি, জাতীয় নিরাপত্তা সংক্রান্ত উপদেষ্টা, হোয়াইট হাউজের কর্মচারীদের প্রধান, সি.আই.এ-র ডিরেক্টর এবং সম্মিলিত জাতিসংঘের মার্কিন রাষ্ট্রদূত। ক্যাবিনেটের সদস্যগণ কংগ্রেসের সদস্য নন এবং কংগ্রেসের কাছে তাদের দায়িত্ব থাকে না। রাষ্ট্রপতি নিজ দলের সদস্যদের মধ্য থেকেই ক্যাবিনেট সদস্যদের নিয়োগ করেন। তবে এই নিয়োগ কার্যকর করার জন্য সিনেটের আনুষ্ঠানিক অনুমোদন আবশ্যক। তাই রাষ্ট্রপতির ক্যাবিনেট হন একটি রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান এবং এর কোনো সাংবিধানিক স্বীকৃতি নেই।

রাষ্ট্রপতির নির্বাহী ক্ষমতা (Executive Power of President)

সরকারের সকল নির্বাহী ব্যবস্থা রাষ্ট্রপতির নামে গৃহীত ও প্রকাশিত হবে তত্ত্বগতভাবে রাষ্ট্রপতি শাসন বিভাগের প্রধান হলেও বাস্তবে এই ক্ষমতা প্রয়োগ করেন প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে গঠিত ও পরিচালিত মন্ত্রিসভা। রাষ্ট্রপতি কেবল প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতি নিয়োগ ব্যতীত অন্য সকল দায়িত্ব প্রধানমন্ত্রীর পরামর্শক্রমে পালন করবেন। সংবিধান কর্তৃক অর্পিত ক্ষমতা বলে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করতে পারবেন। রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশের নির্বাহী ক্ষমতার অধিকারী হলেও বাস্তবে তিনি প্রতিকী ভূমিকা পালন করে। এ কারণে বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে ব্রিটেনের রাজা বা রানির ন্যায় "নিয়মতান্ত্রিক বা নামসর্বস্ব শাসক" (Titular Executive) বলা হয় এবং মন্ত্রিসভাকে বলা হয় 'প্রকৃত শাসক' (Real Executive)। তবুও রাষ্ট্রপতি সর্বোচ্চ মর্যাদার অধিকারী এবং রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে কতগুলো বিশেষ অধিকার, যেমন -১. রাষ্ট্রপতি তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে কিংবা অনুরূপ বিবেচনায় কোন কার্য করে থাকলে বা না করে থাকলে সেজন্য তাকে কোন আদালতে জবাবদিহি করতে হবে না; ২. কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারলেও রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে কোন মামলা করা যায় না; ৩. রাষ্ট্রপতির কার্যভার থাকাকালে তার বিরুদ্ধে ফৌজদারী কার্যধারা দায়ের করা বা চালু রাখা যাবে না; ৪. রাষ্ট্রপতিকে গ্রেফতার বা কারাবাসের জন্য আদালত থেকে পরওয়ানা জারি করা যাবে না; এবং ৫. রাষ্ট্রপতির বিরুদ্ধে সংবিধান লংঘন বা গুরুতর অসদাচরণের অভিযোগ বিবেচনাকালে তাঁর উপস্থিত থাকা এবং প্রতিনিধি প্রেরণের অধিকার রয়েছে।

রাষ্ট্রপতির পদমর্যাদা (Position of President)

বাংলাদেশে সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা বিদ্যমান। সংসদীয় সরকার ব্যবস্থার রীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রপ্রধান হবেন রাষ্ট্রপতি এবং তিনি নির্বাহী বিভাগেরও প্রধান। বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী ও মন্ত্রিসভা নিয়ে নির্বাহী বিভাগ গঠিত হয়। তাই বাংলাদেশে রাষ্ট্রপতি দেশের শাসনব্যবস্থায় এক বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রয়েছেন। বাংলাদেশের

সংবিধানে রাষ্ট্রপতি রাষ্ট্রপ্রধান রূপে (As a Head of the State) অন্য সকল ব্যক্তির উর্ধ্বে স্থান লাভ করবেন। রাষ্ট্রপতি প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বচিত হতেন। কিন্তু দ্বাদশ সংশোধনীতে বিধান করা হয় যে, রাষ্ট্রপতি আইনানুযায়ী সংসদ সদস্য কর্তৃক নির্বাচিত হবেন। রাষ্ট্রপতি পদে নির্বাচিত হবার জন্য কোনো ব্যক্তির নিম্নবর্ণিত যোগ্যতা থাকতে হবে; **ক.** অন্যূন ৩৫ বছর বয়স্ক হতে হবে; **খ.** বাংলাদেশের নাগরিক হতে হবে; **গ.** জাতীয় সংসদে নির্বাচিত হওয়ার যোগ্যতা থাকতে হবে; **ঘ.** পূর্বে কখনো রাষ্ট্রপতির পদ থেকে অভিশংসনের মাধ্যমে অপসারিত হননি; **ঙ.** কোনো রাজনৈতিক দল অথবা কোনো রাজনৈতিক দলের সাথে যুক্ত বা অংগীভূত কোনো সংগঠনের সদস্য হবেন না; **চ.** সংসদ-সদস্যদের আসন্ন নির্বাচনে প্রার্থী নন এবং প্রার্থী হবেন না মর্মে লিখিতভাবে সম্মত হয়েছেন; এবং **ছ.** বাহাত্তর বছরের অনধিক বয়স্ক হবেন না।

রাষ্ট্রযন্ত্র (State Machinery)

রাষ্ট্র একটি বিমূর্ত ধারণা। রাষ্ট্রকে ধরা ছোঁয়া যায় না। সাধারণত নির্দিষ্ট ভূ-খণ্ড, জনসমষ্টি, সরকার ও সার্বভৌমত্ব —এ চারটি উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই হলো রাষ্ট্র। আর রাষ্ট্র যেসব প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর মাধ্যমে কর্তৃত্ব ও কার্যাবলি বাস্তবায়িত করে, সেসব প্রতিষ্ঠান ও কাঠামোর সমষ্টিকেই বলে রাষ্ট্রযন্ত্র। আইনসভা বা পার্লামেন্ট ও তার মন্ত্রিসভা, বিচার বিভাগ, আমলাতন্ত্র, প্রতিরক্ষাবাহিনী ইত্যাদির সমষ্টিই হলো রাষ্ট্রযন্ত্র। সাধারণত যাঁরা রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকেন তাঁদের স্বার্থ ও নীতি মোতাবেকই রাষ্ট্রযন্ত্র পরিচালিত হয়। কখনো কখনো রাষ্ট্রযন্ত্রের একাংশের সঙ্গে অন্য অংশের স্বার্থের বা নীতির দ্বন্দ্বও বেঁধে যেতে পারে। যেমন, ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীর কোনো বিপ্লবী চিন্তাধারা আমলাতন্ত্র বা অপর কারও পছন্দনীয় না হলে সংঘাতের সৃষ্টি হতে পারে। এজন্য যাঁরা কোনো বিপ্লবী পরিবর্তন ঘটাতে চান তাঁরা সাধারণত গোটা রাষ্ট্রযন্ত্রকেও তাঁদের সুবিধানুযায়ী ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হন।

রাষ্ট্রসমবায় (Confederation)

যুক্তরাষ্ট্র জানার সুবিধার জন্য রাষ্টসমবায় আলোচনা করা উচিত। কতগুলো স্বাধীন রাষ্ট্র নিজেদের আর্থিক অগ্রগতি ও প্রতিরক্ষামূলক কার্যক্রম সুদৃঢ়করণ বা অন্য কোনো স্বার্থ সংরক্ষণে কিছু নিয়ম-নীতির ভিত্তিতে শান্তিপূর্ণ প্রক্রিয়ায় সহাবস্থানের জন্য যদি চুক্তিবদ্ধ হয়, তখন রাষ্ট্রসমবায় গঠিত হয়। কে.সি. হুয়ারের মতে, রাষ্ট্রসমবায় হলো সার্বভৌম রাষ্ট্রসমূহের সংস্থা (League of sovereign states)। এ প্রসঙ্গে হলো বলেন, "এটা হচ্ছে এমন কতিপয় রাষ্ট্রের সমবায় যারা স্বেচ্ছায় কিছু বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য নিজেদের স্বাধীনতার কিছু অংশ চিরকালের জন্য ত্যাগ করে।" হ্যামিলটন বলেন, "দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের গঠিত সমিতিকে রাষ্ট্রসমবায় বলেন।" রাষ্ট্রসমবায় হলো রাষ্ট্রসমূহের বন্ধুত্বের জন্য একটি গভীর বন্ধন (Firm league of friendship)।[৬৩] তবে এ বন্ধুত্বের জন্য পরস্পরের মাঝে যে সংগঠন তা শুধু নেহায়েত আন্তরিকতার বৃদ্ধি

নয়—তার সাথে সাথে অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষা ও অন্যবিধ সুযোগ-সুবিধারও নিশ্চয়তা দান করে। হলো (Hall) আবার বলেন, "পুরোপুরি স্বাধীন কতকগুলো রাষ্ট্রের মিলন হচ্ছে রাষ্ট্রসমবায়" (A confederation is a union strictly of independent states....)। ওপেনহেইম বলেন, যুক্তরাষ্ট্র গঠিত হয় কতিপয় সার্বভৌম রাষ্ট্রের সহযোগে—যারা কতকগুলো আন্তর্জাতিক চুক্তির আওতায় নিজেদের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সহায়তার নিমিত্তে একত্রে বসবাস করে। স্বাধীন রাষ্ট্র নিজেদের মধ্যে নানাবিধ সুবিধার জন্য রাষ্ট্রসমবায় গঠন করে। একে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহের একটি সংগঠন বা সংস্থা (Association) হিসেবে অভিহিত করা যায়। ম্যাকাইভার মডার্ন স্টেট গ্রন্থে (পৃ. ৩৫৭) বলেছেন, যুক্তরাষ্ট্রকে রাষ্ট্রসমবায় থেকে এভাবে পৃথক করা যায় যে, রাষ্ট্রসমবায়ে চুক্তিবদ্ধ রাষ্ট্রসমূহের ওপর এর কর্তৃত্ব থাকে—সরাসরি জনগণের ওপর থাকে না (Confederation differs from federation in that this common government deals only with the constituent states and not directly with their individuals)। সার্ক (SAARC) রাষ্ট্রসমবায়ের একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ। ন্যাটো (NATO) ও সিয়াটো (SEATO) রাষ্ট্রসমবায়। অনেকে যুক্তরাষ্ট্র ও রাষ্ট্রসমবায়কে একই অর্থে ব্যবহার করেছেন কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা নয়।

কিছু সংখ্যক রাষ্ট্রকে নিয়ে একটি রাষ্ট্রসমবায় গড়ে ওঠে। তার পেছনে পরস্পরসম্মত বিশেষ মাধমে রূপায়ণকল্পে নির্দিষ্ট কিছু উদ্দেশ্য থাকে। যেমন, পারস্পরিক সহযোগিতা ও প্রতিরক্ষা ; উদ্দেশের সঙ্গে অঙ্গরাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের প্রত্যক্ষ কোনো সম্পর্ক থাকে না। বিভিন্ন অঙ্গরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতি স্বতন্ত্র হয়ে থাকে। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে এর পার্থক্য হলো যে যুক্তরাষ্ট্র আরও বেশি সুসংবদ্ধ হয় এবং তার অঙ্গরাজ্য অথবা প্রদেশগুলোর ওপর এবং সেগুলোর অধিবাসীদের ওপর যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা সরাসরিভাবে প্রযোজ্য। রাষ্ট্রসমবায় থেকে তার কোনো সদস্যরাষ্ট্র বিচ্ছিন্ন হতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একসময়ে (১৭৭৮-১৭৮৯) একটি রাষ্ট্রসমবায় ছিল। রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে ওঠবার আগে ১৮১৫ সাল থেকে ১৮৬৬ সাল পর্যন্ত জার্মানি একটি রাষ্ট্রসমবায়ের মধ্য দিয়ে সংঘবদ্ধ হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নও এক অর্থে রাষ্ট্রসমবায় ছিল। সোভিয়েত রাষ্ট্র বিলুপ্ত (১৯৯১) হবার পর তার জায়গায় পূর্বতন অঙ্গরাজ্যগুলোর কয়েকটিকে নিয়ে যে কমনওয়েলথ অব ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্টেটস গঠিত হয়েছে সেটি রাষ্ট্রসমবায়ের একটি নতুন নিদর্শন।

রাষ্ট্রিক বাধ্যতা (Political Obligation)

রাষ্ট্রদর্শনের কোনো কোনো ধারায় বলা হয় যে মানুষ প্রকৃতিভাবে একটি সামাজিক জীব এবং সমাজের অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান ও দায়দায়িত্ব তার জীবনের একটি অঙ্গ, কারণ সেগুলো তার আত্ম-উপলব্ধি ও আত্ম-বিকাশের সহায়ক। সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য ও দায়িত্ব পালনের মধ্য দিয়ে মানুষ তার অধিকার দাবি করতে পারে। অধিকার ও কর্তব্য হলো নাগরিকতার লক্ষণ, সমাজ সৃষ্টির পূর্বে কিংবা সমাজের বাইরে লক্ষণ দুটির

কোনো তাৎপর্য নেই। সমাজে থাকা ও সুশৃঙ্খল বিধিব্যবস্থার জন্য সকল ব্যক্তিরই সামাজিক দায়দায়িত্ব পালনে বাধ্যবাধকতা থাকে; সমাজের নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সকলে সাধারণভাবে সমান সুযোগের অধিকার পায়, গণমঙ্গল সাধিত হয়।

সামাজিক চুক্তি তত্ত্বে মনে করা হয় যে সমাজের সঙ্গে প্রাথমিক চুক্তিসূত্রে বাধ্যতার প্রশ্ন ওঠে এ সেটার অন্যতম লক্ষণ হলো গণ অভীপ্সা ; দ্বিতীয় মতে সমাজ বা রাষ্ট্র নয়, বাধ্যতার বন্ধন হলো ব্যক্তিসমূহের পারস্পরিক সম্পর্কে (লক) ; তৃতীয় মতানুসারে বাধ্যতা থাকে কেবল সার্বভৌমের প্রতি (বদ্যাঁ)। চুক্তির সূত্র ধরে সম্মতি তত্ত্বে বলা হয় যে অকথিত সম্মতির মাধ্যমে নাগরিকেরা নিরাপত্তার তাগিতে রাষ্ট্রিক বাধ্যতার বন্ধনকে মেনে নেয় (লক)।

বার্ক, হেগেল প্রমুখ রাষ্ট্রদার্শনিকদের মতে রাষ্ট্রিক বাধ্যতার উদ্ভব স্বাধীনভাবেই ঘটে। তার পেছনে নাগরিকদের ধর্মীয় কর্তব্যনিষ্টার মনোভাব ক্রিয়াশীল হতে পারে, অথবা সার্বভৌম শক্তির কাছে নাগরিকদের বাধ্য থাকার বিধান আছে। তেমনি দিব্য অধিকার সম্পন্ন নৃপতিরা প্রজাদের বাধ্যতার অধিকারী। টমাস হিল গ্রিন মনে করতেন যে রাষ্ট্রীয় বাধ্যতা দাসত্বের সমান নয়; আইনকানুন ও রাষ্ট্রীয় বিধিব্যবস্থার পেছনে নৈতিকতামণ্ডিত পটভূমি থাকা চাই। নেতিবাচক তত্ত্বে বলা হয় যে রাষ্ট্রের কাছে জনগণের বাধ্যবাধকতা থাকে সেই অবধি যতক্ষণ লোকে স্বাধীনতা ও সুবিচার পায়। বৈধতা তত্ত্বেও সেই একই কথা প্রযোজ্য। অ্যারিস্টটলও এই মতো পোষণ করতেন যে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত হলে রাষ্ট্র বৈধতার অধিকার হারায়।

রাষ্ট্রীয় মালিকানা (Public Ownership)

প্রত্যয়টি নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়। সাধারণ দৃষ্টিতে জমি, রাস্তাঘাট, পরিবহণ, ব্যবসাবাণিজ্য ইত্যাদির সরকারি মালিকানা; কারও দৃষ্টিতে সামাজিক ও সমাজতন্ত্রী মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ; কারও মতে সরাসরি সরকারের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ; এবং কারও মতে সরকারের আংশিক মালিকানা অর্থাৎ মিশ্র অর্থনীতির বিধিব্যবস্থা রাষ্ট্রীয় মালিকানা হিসেবে বিবেচ্য।

সামাজিক মালিকানা সমাজতন্ত্রের গোড়ার কথা। সেটা থেকে ব্যক্তিগত মালিকানা ও সরকারি মালিকানার দূরত্ব সমান। সামাজিক মালিকানা বহুলাংশে সমবায় অর্থনীতির সমগোত্রীয়। মার্কসীয় দৃষ্টিতে উৎপাদন, বণ্টন ও বিনিময়ে যাবতীয় ব্যক্তিগত স্বত্ব, অধিকার সহিংসা সর্বহারা বিপ্লবের মাধ্যমেই সেটা সম্ভব। কার্যত সেটা হয়ে দাঁড়ায় অর্থনৈতিক বিধিব্যবস্থায় সরকার তথা রাষ্ট্রীয় মালিকানার পত্তন। তবে তার নিয়ন্ত্রণ থাকে এক শ্রেণির পরিচালকের হতে অথবা শাসকদলের নির্দেশে যৌথ নিয়ন্ত্রণাধীনে। কালক্রমে তাতে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের লক্ষণগুলো ফুটে ওঠে। অনেকে বলেন যে যথার্থ সামাজিক মালিকানা নয়, রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদের মধ্য দিয়ে সমাজতন্ত্রের অস্তিত্ব বিরাজ করে।

মিশ্র অর্থনীতিতে ব্যক্তিগত ও রাষ্ট্রীয় মালিকানার সহাবস্থান চোখে পড়ে। যুক্তরাজ্যের অর্থনীতি হলো তার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। উভয় স্তরেই সেখানে বৃহৎ অনেক শিল্প-বাণিজ্য দেখা যায়।কার্যত সব দেশেই এখন প্রবণতা হলো মিশ্র অর্থনীতির। বৃহৎ লগ্নি, দেশব্যাপী সুসংবদ্ধ পরিচালনা ও শোষণমুক্ত জনকল্যাণ কার্যনির্বাহের তাগিতে ভারী শিল্প, বিদ্যুৎ উৎপাদন, রেলপথ, বিমান, জলপথ ও অন্যান্য পরিবহন ইত্যাদি ক্ষেত্রে হিংসাত্মক বিপ্লব ব্যতিরেকেই রাষ্ট্রীয়করণ হয়ে থাকে এবং মালিকদের সেজন্য ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। ক্ষেত্র বিশেষে অনেক সময়ে ব্যক্তিগত মালিকানার সঙ্গে অংশীদারি শর্তে যৌথ ব্যবসা-বাণিজ্যে রাষ্ট্র অর্থলগ্নি করে। তেল ব্যবসায়ে পূর্বতন ইঙ্গ-ইরানীয় যৌথ উদ্যম তার এক দৃষ্টান্ত। রাষ্ট্রীয় মালিকানায় নৈপুণ্যের অভাব, চুরি, দুর্নীতি, অপচয়, লোকসান ও নিরন্তর ভর্তুকি-নির্ভরতার ফলে বিশ শতকের শেষ দশকে সারা বিশ্বে উদারনীতি অনুযায়ী রাষ্ট্রীয় মালিকানার পরিবর্তে ব্যক্তিগত মালিকানার ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে।

রাষ্ট্রীয়করণ (Nationalisation)

রাষ্ট্রের শিল্প-কারখানা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, ব্যাংক-বিমা, জমি-জমা প্রভৃতির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা থেকে রাষ্ট্রীয় মালিকানায় অধিগ্রহণকে রাষ্ট্রীয়করণ বলে। বস্তুত যে শ্রেণি রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে, রাষ্ট্রীয়করণের চরিত্রও ঠিক সেই রকমই হয়ে থাকে। যেমন, কোনো বুর্জোয়া সরকার কর্তৃক রাষ্ট্রীয়কৃত শিল্প কারখানাদির চরিত্রও হয় বুর্জোয়া। মুৎসুদ্দিশ্রেণির দ্বারা রাষ্ট্রীয়কৃত সম্পত্তির চরিত্র হয় মুৎসুদ্দি; আর সমাজতন্ত্রীদের শাসনাধীনে তা হলে তার চরিত্র হয় সমাজতান্ত্রিক। অনেকে রাষ্ট্রীয়করণ মাত্রকেই সমাজতান্ত্রিক পদক্ষেপ বলে ভুল করে থাকেন।

রাসেল, বার্ট্রান্ড (Bertrand Russel)

বার্ট্রান্ড রাসেল, (১৮৭২-১৯৭০) একজন ইংরেজ দার্শনিক ছিলেন। তিনি ১৯৫০ সালে আধুনিক গাণিতিক যুক্তিবিদ্যার বিকাশসাধন তত্ত্বের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। রাসেলের মতে, মানুষ তার ইন্দ্রিয়লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয়। ইন্দ্রিয়লব্ধ তথ্যসমূহ নৈর্ব্যক্তিক। এগুলোকে বস্তুগত, মনস্তত্ত্বগত বা অপর কোনো শ্রেণিতে বিন্যাস করা ঠিক নয়। রাসেল ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাসী না হলেও ঠিক মার্কসীয় বস্তুবাদীও ছিলেন না। তিনি ছিলেন অনেকটা সন্দেহবাদী (Sceptic) দর্শনে বিশ্বাসী। তবে, তিনি যুদ্ধের বিরুদ্ধে এবং শান্তির সপক্ষে চিরকাল আপোসহীন সংগ্রাম চালিয়ে গেছেন। মানবতাবাদী রাসেলের 'দি প্রিন্সিপাল্স অব ম্যাথাম্যাটিক্স্', 'হিউম্যান নলেজ' ইত্যাদি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ।

রিগিং (Rigging)

সাধারণ নির্বাচনে ইদানীং বহুল প্রচলিত রিগিং কথাটি ইংরেজিতে একটি চলিত শব্দ। অক্সফোর্ড অভিধানে বলা হয়েছে যে ১. কোনো কিছু গোপনে অথবা প্রতারণা কিংবা

জুয়াচুরির মাধ্যমে কৌশলে হাসিল করা ; ২. ব্যালট রিগিং : Fraudulent manipulation of a ballot। শব্দটি এখনও সরকারের নির্বাচনী আইনকানুন ও ক্রিয়াকর্মের পরিভাষায় অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় এর সংজ্ঞা নিরূপিত হয়নি। তবে সংবাদপত্র, বক্তৃতা, বিবৃতি ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে যে অর্থ ফুটে ওঠে তা হলো বিশেষ কোনো প্রার্থীর সমর্থকেরা ভোটকেন্দ্র অবরোধ করে, কর্মীদের কাছ থেকে সমুদয় ব্যালট কেড়ে নিয়ে সেই প্রার্থীর নামে ছাপ মেরে ব্যালট বাক্সে সেগুলো ফেলে দেয়। এছাড়া ব্যালট বাক্স পরিবর্তন ইত্যাদির ধরনের জালিয়াতির কথাও শোনা যায়।

রিট (Writ)

'রিট' শব্দটির অর্থ হলো আদালত বা যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ঘোষিত বিধান বা আদেশ। রিটের উৎপত্তি ইংল্যান্ডে। প্রথমে রিট ছিল রাজকীয় বিশেষাধিকার (Royal prerogative)। রাজা বা রানি বিচারের নির্ধারক (fountain of justice) হিসেবে রিট জারী করতে পারত। একমাত্র রাজা বা রানির রিট জারী করার অধিকার ছিল বলে একে প্রথমে বিশেষাধিকার (prerogative) রিট বলা হতো।

রিপাবলিকান পার্টি (Republican Party)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দুটি প্রধান রাজনৈতিক দলের অন্যতম একটি। ১৭৯২ সালে এ দল প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮২৮ সালে কুইনসি অ্যাডামস ও হেনরি ক্লে-র নেতৃত্বে ডেমোক্রাটিক পার্টির একটি অংশ বেরিয়ে এসে এই দল গঠন করেন। আদিপর্বে দলটি তৃতীয় প্রেসিডেন্ট টমাস জেফারসনের দল নামে পরিচিতি ছিল। কৃষক ও অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলোর স্বার্থরক্ষাই ছিল তখন প্রধান কাজ। বিবর্তনের ধারায় কখনও ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান দল, কখনও কেবল ডের্মোক্রেটিক দল নামে অভিহিত হত। ১৮৫৪ সালে দাসপ্রথা উঠিয়ে দেওয়ার দাবিতে ডেমোক্রাটিক পার্টির একটি অংশ বেরিয়ে এসে এই দল গঠন করেন। ১৮৬০ সালে ষোড়শ প্রেসিডেন্ট পদে দলের প্রার্থী আব্রাহাম লিঙ্কনের জয়যুক্ত হবার পর দেশের দক্ষিণাঞ্চলের অঙ্গ-রাষ্ট্রগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। অতঃপর দলের উগ্র বনাম নরমপন্থীদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ শুরু হয়। গড়ে ওঠে লিবারেল রিপাবলিকান পাটি। উনিশ শতকের শেষদিকে রিপাবলিকান পার্টি স্পষ্টই একটি দক্ষিণপন্থী রক্ষণশীল দল হিসেবে দেখা দেয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে এবং তার পরে ডেমোক্র্যাট দলের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসনের শান্তি-প্রয়াসে রিপাবলিকানরা বাধাসৃষ্টি করে। তবে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরে পার্টি ডেমোক্র্যাটদের সঙ্গে একযোগে কাজ করে। দেশের শিল্পসমৃদ্ধ উত্তরাঞ্চল এই পার্টিকে সমর্থন করে। ফলে, উত্তরাঞ্চলের এদের দাঁড়ায় শক্ত ঘাঁটি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় পর্যন্ত রিপাবলিকানরা ইউরোপের ব্যাপারে জড়িত না হওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। অবশ্য, বর্তমানে রিপাবলিকান ও ডেমোক্রাটদের মধ্যে আদর্শগত বা দৃষ্টিভঙ্গীগত কোনো পার্থক্য নেই।

রিপাবলিকান পার্টি জোরদার হয় ১৮৬১ সালে, এর মনোনয়ন পেয়ে আব্রাহাম লিঙ্কনের ক্ষমতাসীন হওয়ার মধ্য দিয়ে। দলটি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ডানপন্থী রক্ষণশীল দল

হিসেবেও পরিচিত। তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত দেশসমূহে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থনির্ভর সাম্রাজ্যবাদী নীতির অনুসরণ ও তা বাস্তবায়নই দলটির অন্যতম প্রধান নীতি ও লক্ষ্য। এ উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে রয়েছেন রিচার্ড এম. আইসেনহাওয়ার, রোনাল্ড রিগান, জর্জ বুশ প্রমুখ। এই পার্টির প্রতীক হচ্ছে 'হাতি'।

রিয়্যাল পলিটিক (Real politic)

রিয়্যাল পলিটিক শব্দটি জার্মান শব্দ যার অর্থ বাস্তবতাভিত্তিক রাজনীতি। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানির শাসক Otto Von Bismarck-এর অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক নীতিকে রিয়্যাল পলিটিক নামে অভিহিত করা হত। কাল্পনিক বা আবেগের রাজনীতির বিপরীতে বাস্তবতার রাজনীতিকে বোঝানোর জন্য এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অনেকে মনে করেন যে, মার্কিন রাজনীতিকেই বর্তমান যুগে সবচেয়ে বাস্তবতাভিত্তিক রাজনীতি বলা যায়। কারণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ বা বৈদেশিক নীতি কোনো অন্ধবিশ্বাস (dogma), অন্ধ আবেগ (whim) বা পূর্বনির্ধারিত ধারণা (pre-conceived notion)-এর দ্বারা পরিচালিত হয় না; বরং তা পরিচারিত হয় বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে।

রিসার্চ অ্যান্ড এনালাইসিস উইং (RAW)

ব্রিটিশ আমলে প্রতিষ্ঠিত আইবি (Inteligence Burenu) কর্মচ্যুত পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নিয়ে আইবি পুনর্গঠিত হয়। জানা যায়, জুলফিকার আলী ভুট্টো প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর ওপর কর্তৃত্ব বাড়ানোর উদ্দেশে আইএসআই বা ইন্টার সার্ভিসেস এজেন্সি (Inter Services Agency) প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ভুট্টোর সে আশা পূরণ হয়নি।

'র'-এর বিশেষ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এসএসবি (SSB-Special Service Bureau), এভিয়েশন রিসার্চ সেন্টার (ARC) ও সিবিআই (CBI-Central Bureau of Investigation) নামের শাখা রয়েছে। জানা যায়, প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নেতৃত্বে 'র' প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে আইবি থেকে ২৫০ গুপ্তচর কর্মকর্তাকে বদলি করে নিয়োগ করা হয় 'র'-তে। মাত্র এক দশকে এর কর্মকর্তা-কর্মচারীর সংখ্যা দাঁড়ায় সাত হাজারে। পত্রিকান্তরে প্রকাশ, 'র'-এর মধ্যে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনার জন্য সব ধরনের বিশেষজ্ঞ রয়েছেন, মুচি থেকে পারমাণবিক বিশেষজ্ঞ পর্যন্ত। 'র'-এর সদর দপ্তর দিল্লিতে অবস্থিত।

অন্য এক তথ্য মতে, 'র'-এর প্রতিষ্ঠার সময় এর প্রধান আর এন কাও-এর তত্ত্বাবধানে সচিবালয়ের পরিচালক কে-শঙ্কর নারায়ণের হাতে গঠিত হয় আর একটি বিভাগ 'থার্ড এজেন্সি'।' সংস্থাটি 'র'-এর পাশাপাশি বিভিন্ন দেশে নিজেদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে।

নিয়মানুসারে সংস্থার প্রধান পরিচালক ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অধীনে দায়িত্ব পালন করেন। বিভিন্ন দেশ থেকে সংগৃহীত গোপন তথ্য সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রীকে অবহিত করার

দায়িত্ব তার ওপর ন্যস্ত। বিভিন্ন স্থানে সোর্সদের সংগৃহীত তথ্যাদি সংরক্ষণ করে পাবলিক সার্ভিসের ইনটেলিজেন্স বিভাগ 'আরএসএস' (রিসার্চ অ্যান্ড অ্যানালাইসিস সার্ভিস)।

রুজভেল্ট, ফ্রাঙ্কলিন ডি. (Franklin D. Roosevelt)

ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট, (১৮৮২-১৯৪৫) মার্কিন প্রেসিডেন্ট থিওডোর রুজভেল্ট (১৮৫৮-১৯১৯)-এর পুত্র। ফ্রাঙ্কলিন ডি. রুজভেল্ট নিউইয়র্কে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি হার্ভার্ড ও কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছিলেন। ১৯১১ সালে ডেমোক্রেটিক পার্টি থেকে সিনেটর নির্বাচিত হন। ১৯১৩-২০ সাল উইলসন প্রশাসনে নৌবাহিনীর সহকারী সেক্রেটারির দায়িত্ব পালন করেন। ১৯২১ সালে তিনি প্যারালাইসিস রোগে আক্রান্ত হন। তিনি একটু সুস্থ হয়েই রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং ১৯২৮ সালে নিউইয়র্ক রাজ্যের গভর্নর নির্বাচিত হন। ১৯৩২ সালে তিনি প্রেসিডেন্ট হুভারের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে বিপুল ভোটাধিক্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। তিনি ৪৮টি রাজ্যের মধ্যে ৪২টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন। তিনি নির্বাচনের সময় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, নির্বাচিত হলে তিনি ব্যাপক জনকল্যাণমূলক কাজের মাধ্যমে মহামন্দার মোকাবিলা করবেন। তিনি জাতির উদ্দেশে প্রদত্ত প্রথম ভাষণে বলেন, "একমাত্র ভয়কে ছাড়া আর কোনোকিছুকেই আমাদের ভয় করার নেই।" তিনি নিউ ডীল নীতি গ্রহণ করেন এবং ফলে সমগ্র যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে শুরু হয় ব্যাপক অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও নির্মাণচাঞ্চল্য। ১৯৩৬ সালের নির্বাচনে মেইন ও ভারমন্ট ছাড়া প্রতিটি রাজ্যে জয়লাভ করে তিনি মার্কিন ইতিহাসে এক রেকর্ড স্থাপন করেন। পররাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে তিনি ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী গড়ে তোলেন এবং কমিউনিস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নকে স্বীকৃতি প্রদান করেন (১৯৩৩)। ১৯৪১ সালের মার্চ মাসে তিনি আইন পাস করান, যাতে প্রেসিডেন্ট মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থে প্রয়োজনবোধ করলে যে কোনো রাষ্ট্রের কাছে বিক্রয়, বিনিময় বা মেয়াদি ঋণের বিপরীতে অস্ত্রশস্ত্র প্রদান করতে পারেন। তিনি ১৯৪১ সালের ১৪ আগস্ট চার্চিলের সঙ্গে আটলান্টিক চুক্তি সম্পাদন করেন। জাপানিরা পার্ল হারবার আক্রমণ করলে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তিনি মিত্রশক্তির অন্যান্য নেতার সঙ্গে কাসাব্লাঙ্কা, কুয়েবেক, কায়রো, তেহরান ও ইয়াল্টা সম্মেলনে মিলিত হন। তিনি স্ট্যালিনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্পর্কের ওপর আস্থাশীল ছিলেন বলে এবং চিয়াং কাইশেককে অতি মূল্যায়ন করতেন বলে অনেকেই তাঁর সমালোচনা করত। মূলত তাঁর অনুপ্রেরণাতেই গড়ে উঠেছিল জাতিসংঘ। কিন্তু এ ব্যাপারে অনুষ্ঠিত সান ফ্রান্সিসকো সম্মেলনের ঠিক এক পক্ষকাল আগে হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া বন্ধ হয়ে রুজভেল্ট মৃত্যুবরণ করেন (১২ই এপ্রিল, ১৯৪৫)। তিনি চারবার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েও মার্কিন ইতিহাসে এক রেকর্ড সৃষ্টি করেন। তিনি ১৯৪০ সালে ওয়েনডেল উইলকি এবং ১৯৪৪ সালে টমাস ডিয়ুয়ীকে নির্বাচনে পরাজিত করেন। তাঁর মৃত্যুর পর ভাইস প্রেসিডেন্ট হ্যারি এস. ট্রুম্যান স্থলাভিষিক্ত হন।

রুদ্ধদ্বার বৈঠক (Caucus)

আভিধানিক অর্থে ককাস বলতে মতোলব আঁটবার জন্য রাজনৈতিক দলের ক্ষুদ্র সমিতিকে বুঝায়। স্বল্প সংখ্যক সদস্যদের সমন্বয়ে গঠিত একটি কমিটি। এক্ষেত্রে রাজনৈতিক নেতাদের রুদ্ধদ্বার কিংবা গোপন বৈঠককেও ককাস বলা যেতে পারে। একই দলের বিভিন্ন নেতা দলের নীতি নির্ধারণের জন্য রুদ্ধদ্বার বৈঠকে (Caucus) মিলিত হন। দলের পরবর্তী রাজনৈতিক কর্মসূচি নির্ধারণ করে পরে জাতীয় পর্যায়ের কমিটি থেকে অনুমোদিত করা হয়। দলীয় গুরুত্বপূর্ণ সংসদ সদস্যরাও গোপন বৈঠক (ককাসে) মিলিত হন। দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট আইন সভার কক্ষের কিছু গুরুত্বপূর্ণ সদস্য গোপন বা রুদ্ধদ্বার বৈঠকে বসতে পারেন। 'ককাস' শব্দটি যুক্তরাষ্ট্রে দেখা যায়। প্রতিনিধি সভা ও সিনেটের সদস্যরা তাঁদের সকল নীতিনির্ধারনী সিদ্ধান্ত ককাসে নেন। মূলত নির্বাচনে জয়লাভ করার একটি যন্ত্রবিশেষ। এর সদস্যবৃন্দ হয় অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ। প্রথমদিকে প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর নাম দলীয় কনভেনশনে উপস্থাপন করার আগে ককাসে তোলা হতো। এখন জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের দলীয় কর্মকর্তা কে বা কারা হবেন তা ককাসেই ঠিক করা হয়। প্রতিনিধি সভা ও সিনেটের কার্য পরিচালনায় ককাসের ভূমিকা এখনও অনেক তাৎপর্যপূর্ণ। উভয় পক্ষে দলের নেতৃত্ব কারা দেবেন, দলের হুইপ কে হবেন, দলীয় সদস্যরা কীভাবে ভোট দেবেন—এসব ককাসেই ঠিক করা। ম্যাজরিটি দলের ককাসে প্রথম স্পিকার মনোনীত করা হয়।

বাংলাদেশের রাজনীতি ও পার্লামেন্টারি প্রক্রিয়ায় ককাস শব্দটি ব্যবহৃত ও পরিচিতি নয়। তবে অনুরূপ বৈঠক করে দলের ও পার্লামেন্টারি গ্রুপের সিদ্ধান্ত নিতে দেখা যায়। এসব সভাবে সাধারণ 'নীতি নির্ধারকদের সভা', 'প্রভাবশালী নেতাদের সভা' 'দলের শীর্ষ পর্যায়ে সভা' ইত্যাদি নামে চিহ্নিত করা হয়। এরকম সভায় যুক্তরাষ্ট্রের ককাসে যে ধরনের কাজ হয় অর্থাৎ দলের নীতি প্রণয়ন, বিভিন্ন পর্যায়ের নেতৃত্ব মনোনয়ন, পার্লামেন্টের হুইপ, গ্রুপ-নেতা মনোনয়ন, সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের ক্ষেত্রে সংসদ নেতা ও স্পিকার মনোনয়ন, পার্লামেন্টে ভোট দান ইত্যাদি কাজ সম্পাদিত হয়।

মার্কিন রাজনীতিতে প্রচলিত ককাস ব্যবস্থার সমালোচনা যেমন তেমনি তা প্রশংসিতও হয়। অনেকে বলেন, ককাসে বসে যারা সিদ্ধান্ত নেন তারা দলের যথার্থ প্রতিনিধি নন, ফলে অনেক সময় একপেশে সিদ্ধান্ত চলে আসে। এটা ক্ষমতার স্বতন্ত্রীকরণ নীতি-বিরুদ্ধ; ককাস-সদস্যদের কোনো কোনো সময় গোপনে 'ম্যানেজ' করে সিদ্ধান্ত অনুকূলে নেওয়ার জন্য তদবির হয়। আবার অনেকে বলেন, এ ব্যবস্থা দলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় গতিশীলতা আনয়ন করে, বিভিন্ন মতাদর্শিক গ্রুপের মধ্যে আপোস রফা সম্ভব হয়; যৌথ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

রুলিং (Ruling)

রুলিং হলো কোনো উচ্চতর কর্তৃপক্ষ বা আদালত কর্তৃক কোনো আইন, আইনের ধারা, আদেশ, বিধি বা পদ্ধতির প্রশ্নে প্রদত্ত ব্যাখ্যা, যা সাধারণভাবে চূড়ান্ত ও চ্যালেঞ্জের অতীত বলে গণ্য হয়। পার্লামেন্টের স্পীকারকেও প্রায়শই রুলিং দিতে দেখা যায়।

রুশ বিপ্লব (Russian Revolution)

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর রাশিয়ার পেত্রগ্রাদ শহরে শ্রমিক-সৈনিক-নাবিকের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল ইতিহাসে রুশ বিপ্লব বা অক্টোবর বিপ্লব নামে পরিচিত হয়ে আছে। তৎকালে রাশিয়ায় অনুসৃত ক্যালেন্ডারের বিপ্লবও বলা হয়ে থাকে। বিপ্লবের নেতৃত্বে ছিল লেনিনের নেতৃত্বাধীন রাশিয়ান কমিউনিস্ট পার্টির সংখ্যাগুরু 'বলশেভিক' অংশ। এই বিপ্লব বুর্জোয়া ধনিক শ্রেণি ও সামন্ত জমিদারদের শাসন উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে শ্রমিক-কৃষকের রাজ। সাম্যবাদের মতাদর্শে অনুপ্রাণিত এই বিপ্লব সমাজের দরিদ্র শ্রেণির রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক ক্ষমতা প্রসারে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে। ৭ ও ৮ নভেম্বর অনিষ্ঠিত সোভিয়েতসমূহের দ্বিতীয় কংগ্রেসে গৃহীত হয় শান্তির ডিক্রি ও জমির ডিক্রি। এতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার অংশগ্রহণ প্রত্যাহার করে নেওয়া হয় এবং খোদ কৃষকদের হাতে জমি তুলে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি ব্যক্ত করা হয়।

অক্টোবর বিপ্লব বিশ্বব্যাপী নিপীড়িত ও ঔপনিবেশিক শৃঙ্খলে বন্দি মানুষের মনে নতুন উদ্দীপনা সঞ্চার করে। জারশাসিত রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিদের স্বশাসনের অধিকার প্রদান, গোটা জনগোষ্ঠীকে সাক্ষর করে তোলার অভিযান, সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে সামাজিক বৈষম্যের অবসান ইত্যাদি মহৎ আদর্শের বাস্তবায়নে সোভিয়েত রাষ্ট্র সচেষ্ট হয়। বিশ্বব্যাপী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরাও এই নবীন রাষ্ট্রের সমর্থনে এগিয়ে আসেন দৃঢ়ভাবে। বিপ্লব-পরবর্তী সময়কাল ছিল নানা দিক দিয়ে জটিল। যে ব্যাপক সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন ঘটাবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল, তা দেশের ভেতর ও বাইর থেকে প্রবল বাধার সম্মুখীন হয়। গৃহযুদ্ধ বহিঃরাক্রমণ– এই দুই দিকে লড়াই করে নবীন সোভিয়েত রাষ্ট্র এগিয়ে যেতে থাকে। ১৯২০ সাল নাগাদ সশস্ত্র প্রতিরোধ ও আক্রমণের মাত্রা ক্রমশ স্তিমিত হয়ে আসে। ১৯২১ সালে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য লেনিন নয়া অর্থনৈতিক সর্মসূচি বা নেপ (NEP = New Economic Policy) প্রবর্তন করেন। ১৯২৯ সাল থেকে প্রবর্তিত হয় পঞ্চবার্ষিক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা রীতি।

কিন্তু সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার এসব পরিবর্তনের মধ্যে নানা অসঙ্গতিও ছিল। সোভিয়েত সমাজে গণতান্ত্রিক অধিকার ক্রমেই সঙ্কুচিত হয়ে আসে এবং শেষ পর্যন্ত তা একমাত্র কমিউনিস্ট পার্টির একনায়কত্বে পরিণত হয়। অর্থনীতি হয়ে পড়ে স্থবির, চিন্তার স্বাধীন বিকাশ হয় রুদ্ধ। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব যে মহৎ প্রতিশ্রুতি নিয়ে যাত্রা শুরু করেছিল নানা পুঞ্জীভূত ভ্রান্তি ও জটিলতার কারণে নব্বইয়ের দশকে এসে তা একবারেই ভেঙে পড়ে।

রুশো, জাঁ জ্যাক (Jean-Jacques Rousseau)

জাঁ জ্যাক রুশো, (১৭৭২-৭৮), একজন ফরাসি দার্শনিক, সমাজতত্ত্ববিদও ছিলেন। ঈশ্বরের অস্তিত্বের পাশাপাশি তিনি অবিনশ্বর আত্মার অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। তিনি বস্তু ও আত্মাকে দুই শাশ্বত সূত্র বলে বিবেচনা করতেন। তিনি জ্ঞানতত্ত্বের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়ানুভূতিবাদে বিশ্বাস করতেন। সমাজতত্ত্বের ক্ষেত্রে তিনি সামন্তবাদী শ্রেণি সম্পর্কে

ও স্বৈরাচারী শাসনের তীব্র সমালোচক ছিলেন এবং বুর্জোয়া গণতন্ত্র, গণঅধিকার এবং জন্মগত অবস্থান-নির্বিশেষে সকলের সমঅধিকারের ঘোরতর সমর্থক ছিলেন। তিনি সমাজে বৈষম্যের কারণ হিসেবে ব্যক্তিগত সম্পত্তিকে দায়ী করলেও ক্ষুদ্র মালিকানার ছিলেন আপোসহীন সমর্থক ছিলেন। তিনি ছিলেন 'সামাজিক চুক্তি' (Social contract) মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা। তাঁর মতে প্রাকৃতিক বা স্বাভাবিক রাষ্ট্রে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরস্পরের হানাহানি বিদ্যমান। তিনি শিক্ষাব্যবস্থার সমালোচনা করে বলেন যে, শিক্ষাব্যবস্থাটা এমন হওয়া চাই, যাতে শিক্ষিতদের মধ্যে শ্রমের প্রতি মর্যাদাবোধ জন্মায়। বস্তুত তিনি পেটি বুর্জোয়া মতবাদের অন্যতম উদ্যোক্তা এবং তাঁর আদর্শে 'সৎ হস্তশিল্পী'দের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত ছিল।

রেডক্রস (Red Cross)

বিশ্বের দুঃস্থ মানবতার সেবায় নিয়োজিত আন্তর্জাতিক সংস্থার নাম রেডক্রস। প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৪ সালে। প্রতিষ্ঠাতা হেনরি ডুনান্ট (সুইজারল্যান্ড)। বর্তমানে এ সংস্থাটি দুটি নামে বিভক্ত। মুসলিম বিশ্বে রেড ক্রিসেন্ট এবং অন্যান্য দেশে রেডক্রস নামে। প্রতীক সাদা পটভূমির ওপর লালক্রস (যোগ চিহ্ন)। মুসলিম বিশ্বে প্রতীক অর্ধাকৃতি চাঁদ। সদর দপ্তর সুইজারল্যান্ডের জেনেভায় অবস্থিত। সুইজারল্যান্ডের ২৫ জন নাগরিক নিয়ে এর আন্তর্জাতিক কমিটি গঠিত। যুদ্ধবন্দি, যুদ্ধাহত, বাস্তুহারা, রুগ্ন ও যে কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষকে উদ্ধার করাই এর মুখ্য উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য। এছাড়া ব্লাড ব্যাংকের রক্ষণাবেক্ষণসহ পানির বিশুদ্ধতা রক্ষা এবং প্রাথমিক চিকিৎসা সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দান। এ সেবা সংস্থাটি ১৯৬৩ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার পায়।

রেডিক্যাল (Radical)

রেডিক্যাল-এর অর্থ হলো মৌলিক সংস্কার বা পরিবর্তনবাদী। ১৯১৬ সালে ইংল্যান্ডে রেডিক্যাল পার্টি গঠিত হয়। এদের লক্ষ্য সরকার ও তার কর্মপন্থার মৌলিক পরিবর্তনই করা। পরে এ দল শ্রমিক দলের সঙ্গে মিশে যায়। ফ্রান্সেও একসময় রেডিক্যাল সোশ্যালিস্ট পার্টি গঠিত হয়েছিল। আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে রেডিক্যালিস্ট বা মৌলিক পরিবর্তনকামী রাজনীতিবিদ বা রাজনৈতিক গ্রুপের অস্তিত্ব দেখা যায়। মার্কসবাদীদের মতে এরা প্রচলিত শোষণমূলক সমাজব্যবস্থার কাঠামো ঠিক রেখে ওই কাঠামোরই স্বার্থে কিছু সংস্কার করতে চায় বিধায় এদেরকে বিপ্লবী বলা যায় না।

রেফর্মেশন (Reformation)

অবস্থিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বহাল রেখে তার কিছু কিছু দোষ-ত্রুটি সংশোধনের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডকে সংস্কার বলা হয়। যেমনঃ শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে বহাল রেখে প্রায়শই এই ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার উদ্দেশে সরকার স্বাস্থ্য, স্ব-

কর্মসংস্থান, কুটির শিল্প ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক ইস্যুতে যেসব পদক্ষেপ নেয় বা আইন পাস করে সেগুলোই সংস্কারের মধ্যে পড়ে। বিভিন্ন দেশে বিশেষত জার্মানিতে চার্চের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরোধ, বাণিজ্যের প্রসার এবং মধ্যবিত্ত তথা বুর্জোয়া শ্রেণির উত্থান ছিল সংস্কারের প্রধান উপাদান। এটি সূচিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের অবসানে। ইতিহাসে বুর্জোয়া বিপ্লবেরও বীজ অঙ্কুরিত হয় এই সময়ে এবং ক্রমে সেটা ইউরোপের অন্যত্র বিস্তারিত হয়। সংস্কার যেসব দেশে জয়যুক্ত হয়েছিল সেখানে রাষ্ট্র ও রাজনীতি চর্চা তথা ধর্মীয় নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পায়; বিজ্ঞানচর্চা ও সেকিউলার সংস্কৃতি বিকাশের পথে অগ্রসর হয়। প্রোটেস্ট্যান্ট মতবাদের প্রসারের সঙ্গে জাতীয়তাবাদী বুর্জোয়া নেশন গড়ে উঠতে থাকে। রাজন্যবর্গের পাশাপাশি খ্রিস্টান সাধারণ জনগোষ্ঠী দানা বাঁধে; সেসব গোষ্ঠী যাজকদের বিরোধিতার সঙ্গে রাজন্যবর্গের বিরোধিতা করে এবং সম্পত্তিতে সমতার দাবি জানায়। বিপ্লব বিরোধীরা মনে করেন যে, সংস্কারের মাধ্যমে সমাজের দোষত্রুটি দূর করে সমাজকে সুন্দর করা সম্ভব। অন্যদিকে বিপ্লববাদীরা মনে করেন, যে মলম লাগিয়ে যেমন সিফিলিসের চিকিৎসা সম্ভবপর নয়, তেমনি সংস্কারের মাধ্যমেও কোনো শোষণমূলক বা বৈষম্যমূলক সমাজ থেকে বৈষম্য বা শোষণের অবসান ঘটানো সম্ভব নয়।

রেফারেন্ডাম (Referendum)

রেফারেন্ডাম বা গণভোট হলো সরকার ও তার কর্মক্রমের বৈধতার প্রশ্নে জনগণের রায় সংগ্রহের একটি পদ্ধতি। অন্যকথায়, সরকার কোনো বিশেষ রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক বা শাসনতান্ত্রিক বিষয়ে সরাসরি সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য বিষয়টি জনগণ বা নির্বাচনমন্ডলীর কাছে উপস্থাপন করা এবং ভোটের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে জনগণের মতামত বা রায় সংগ্রহের পদ্ধতি। কোনো কোনো দেশে শাসনতন্ত্র সংশোধনের একমাত্র পদ্ধতিই হলো রেফারেন্ডাম বা গণভোট। যেমন, অস্ট্রেলিয়ায়, সুইজারল্যান্ডে শুধু শাসনতন্ত্র সংশোধনই নয়, ৩০ হাজার নাগরিক দাবি করলে যে কোনো আইনের ব্যাপারেও রেফারেন্ডাম অনুষ্ঠান করতে হয়। রেফারেন্ডাম শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন ছাড়াও বিভিন্ন ইস্যুর ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, ১৯৪৬ সালে রেফারেন্ডামের মাধ্যমেই নির্ধারিত হয়েছিল ভারত উপমহাদেশের কোন কোন অঞ্চলে নিয়ে ভারত ও কোন কোন অঞ্চল নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। আয়ারল্যান্ড কিছুদিন পূর্বে ব্রিটেনের সাথে থাকা বা না থাকার প্রশ্নে গণভোটের আয়োজন করে। কিন্তু ব্রিটেনের সাথে না থাকার পক্ষে কম ভোট পড়ায় আয়ারল্যান্ড পৃথক হতে পারেনি।

রেশ্যানালাইজেশন (Rationalisation)

রেশ্যানালাইজেশন বা যুক্তিযুক্তকরণ কোনো বিষয়ের অযৌক্তিক অংশগুলোকে বাদ দিয়ে যুক্তিসম্মত উপায়ে তার পুনর্বিন্যাস। শিল্পকারখানার ক্ষেত্রে এর অর্থ হলো নতুন যন্ত্রপাতি বসিয়ে, সুষ্ঠু শ্রমবিভাগ করে এবং অন্যান্য ব্যবস্থাদি নিয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি

উপায় বের করা; অন্য যে-কোনো উপায়ে অপচয় রোধ করা, উৎপাদন ব্যয় কমানো ও পণ্যকে অধিকতর প্রতিযোগিতামূলক করা ইত্যাদিকেই বলে রেশ্যানালাইজেশন। প্রথম মহাযুদ্ধের পর শিল্পক্ষেত্রে শব্দটি ব্যাপকতা লাভ করে। সমাজ ও মতাদর্শের ক্ষেত্রেও এই শব্দটিকে ব্যবহার করা হয় কোনো নীতি, আদর্শ, কৌশল বা কর্মসূচিকে স্থান ও কালের উপযোগী করে তোলার ক্ষেত্রে।

রোটারি ইন্টারন্যাশনাল (Rotery International)

মানবকল্যাণমুখী সমাজ-উন্নয়নমূলক আন্তর্জাতিক সংস্থা রোটারি ইন্টারন্যাশনাল। সংস্থাটির পূর্ববর্তী নাম রোটারি ক্লাব। যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগোতে ১৯০৫ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন আইনজীবী পল পর্সিভলি হ্যারিস। সংস্থাটির স্থানীয় নাম রোটারি ক্লাব। বিশ্বের ১৮৯ টি দেশে এর প্রায় ২৭ হাজার শাখা রয়েছে। বিশ্বের ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা ও সমঝোতা সৃষ্টি এবং তাদের স্বার্থ সংরক্ষণই সংগঠনটির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ সংস্থার সদস্যদের বলা হয় রোটারিয়ান। সদস্যদের সর্বোচ্চ খেতাব সার্ভিস এভাব সেলফ।

রোমান সভ্যতা (*Roman* Civilization)

রোমান সভ্যতা বিশ্বের অন্যতম সুমৃদ্ধ সভ্যতা। রোম, গ্রিস, কার্থেজ ও প্যালেস্টাইনসহ ভূমধ্যসাগর অঞ্চলজুড়ে বিদ্যমান সকল রাষ্ট্রকে এটি যেমন অধিকার করে, তেমনি অধিকৃত রাষ্ট্রসমূহের শিল্প-সংস্কৃতি ও ধ্যানধারণা আত্মস্থ করে নিজস্ব অবদানে তা সমৃদ্ধও করে। বিশ্বসভ্যতার ক্ষেত্রে রোমক সভ্যতার প্রধানতম অবদান রাজনৈতিক ও সরকার পরিচালন ব্যবস্থা সংক্রান্ত রীতিপদ্ধতি।

খ্রিস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে রোম শহরের পত্তন হয়। কালক্রমে টাইবার নদীর মোহনায় সাতটি পার্বত্য টিলাকে কেন্দ্র করে এই নগরীর বিস্তৃতি ঘটে। এই সাতটি নগরীকে নিয়ে পরে গড়ে তোলা হয় একটি একক 'নগরাষ্ট্র'। খ্রিস্টপূর্ব ২৮০ অব্দ নাগাদ রোমানরা বিভিন্ন জাতির সমন্বয়ে স্বাধীন মিত্রদের একটি শক্তিশালী সংগঠন করে। রোম সাম্রাজ্যকে সংহত করতে ও এর বিস্তৃত সাধনে যারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁরা হলেন পাম্পে দ্যা গ্রেট, জুলিয়াসন সিজার, আউগুস্তুস ও তাইবেরুস। রোমানদের পরে গ্রিস অধিকার করলে মোটে হেলেনীয় সংস্কৃতির প্রভাব জোরদার হয়। গ্রিক ন্যাট্যমঞ্চের অনুকরণে এর বিভিন্ন নগরীতে গড়ে ওঠে অ্যাম্পিথিয়েটর। প্রাচীন রোমের জনগণ বিভিন্ন দেবদেবীর আরাধনা করতেন। এসবের মধ্যে অল্পীয় দেব-দেবী অন্যতম। রোম সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কীর্তি ভার্জিলের মহাকাব্য ঈনিদ, রাগ্মী ও সমন্বয়বাদী দার্শনিক সিসেরোর (খ্রিস্টপূর্ব ১০৬-৪৩) রচনাকর্ম ও দান্তের 'ডিবাইন কমেডি' ইত্যাদি। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের শেষার্ধ থেকে খ্রিস্টীয় প্রথম শতককে বলা হয় রোমক সাহিত্যের স্বর্গযুগ।

রোমেই প্রথম আবিষ্কৃত হয় কংক্রিট। পরে বিশাল ও আড়ম্বরপূর্ণ দালান-কোঠা, খিলান ও গম্বুজ নির্মাণ করা সম্ভব হয়। রোমে সেই প্রাচীনকালে পানি সরবরাহ ব্যবস্থাপনাসহ যেমন গণ-স্নানাগার, খিলানকার, সেতু ও উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে, তা আজও বিষয় এর উদ্রেক করে। রোমক ভাস্কর্যশিল্পও এই সমৃদ্ধ সভ্যতার অন্যতম পরিচায়ক।

চিকিৎসকগণ এখানো ল্যাটিন ভাষায় ওষুধপত্রের যেসব নাম লিখে থাকেন, তার মূল্যে রয়েছে এই সভ্যতার অবদান। এছাড়া বছরের ১২ মাসের নাম এখানো রয়ে গেছে, ল্যাটিন ভাষাতেই। জুলাই সমানের নাকরণ হয়েছিল রোম সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামানুসারে এবং আগস্ট মাসের নামকরণ হয়েছিল সম্রাট আউগুস্তুসের সম্মানে। বর্তমাতে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত জর্জিয়ান ক্যালেন্ডারে জন্মও ইতালিতে। ইউরোপ মহাদেশের প্রধান ভূখণ্ডের দেশগুলোতে আইন ব্যবস্থার বিকাশে রোম আইনের অবদান অপরিসীম। এখানে বিশ্বের দেশে দেশে 'রোমান আইন' স্বতন্ত্র মর্যদায় অধিষ্ঠিত হতো। গোত্র, হুন ও ভাণ্ডালদের পৌনঃপুনিক আক্রমণে ৪৭৬ সালে রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটে।

লং পার্লামেন্ট (Long parliament)

একটি ঐতিহাসিক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট। এ পার্লামেন্ট সবচেয়ে বেশিদিন টিকে ছিল বলে পার্লামেন্টারি ইতিহাসে বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। আর কোনো পার্লামেন্ট এতদিন কার্যকর ছিল না। লং পার্লামেন্ট সম্পর্কে বলা হয়, 'It would never have a beginning and afterwords that it would never have an end.' এ পার্লামেন্ট টিকে ছিল ১৬৬০ সাল পর্যন্ত। সর্বশেষ অধিবেশন করে ১৬৬০ সালের ১৬ মার্চ।

শুধু দীর্ঘ সময় বিবেচনায় নয় পার্লামেন্টারি ঘটনাপ্রবাহ, রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের দ্বন্দ্ব এবং তাৎপর্যপূর্ণ অনেক সিদ্ধান্তের জন্যও এটি বিখ্যাত লং পার্লামেন্ট আহ্বান করেন রাজা প্রথম চার্লস। কিছুদিন পর রাজার সঙ্গে পার্লামেন্টের মতদ্বৈততা দেখা দেয়। পার্লামেন্ট রাজার মনোনীত মন্ত্রী থমাস স্ট্যাফোর্ড (Thomas Strafford) ও উইলিয়াম লডকে (William Laud) রাষ্ট্রদ্রোহিতার অভিযোগে অভিযুক্ত করে এবং পরে এঁদের শাস্তি কার্যকর করা হয়। লুং পার্লামেন্ট Triennial Act নামে একটি আইন পাস করে। রাজা পার্লামেন্টের অনুমতি না নিয়ে তিন বছরের অধিক সময় শাসন পরিচালনা করতে পারবেন না বলে এ আইনে বলা হয়। এ আইনে পার্লামেন্টের অনুমতি ছাড়া রাজার পার্লামেন্ট বাতিল করার ক্ষমতা রহিত করা হয়। ১৬৪১ সালে পার্লামেন্ট রাজার কাছে দাবিনামা সম্বলিত একটি মেনিফেস্টো উপস্থাপন করে। ইতিহাসে এটি 'Grand Remonstrance' নামে খ্যাত। এতে বলা হয়, রাজা তাঁর মন্ত্রিসভার সদস্য তাঁদের করবেন যাঁরা পার্লামেন্টের আস্থাভাজন। এ থেকে কেবিনেট ব্যবস্থার গোড়াপত্তন বলে মনে করা হয়। এ পার্লামেন্ট থেকেই রাজা প্রথম চার্লস তাঁর পাঁচজন প্রতিদ্বন্দ্বিকে গ্রেফতার (দেখুন Five Members) করতে চেয়েছিলেন (১৬৪২)। রাজা সৈন্য সামন্তসহ

সংসদ ঘেরাও করে স্পিকারের কাছে জানতে চান এ পাঁচজন কোথায়। স্পিকার William Lenthall তখন রাজাকে উদ্দেশে করে তাঁর বিখ্যাত উক্তিটি করেন : 'I have neither eyes to see, nor tongue to speak in this place, but as the house is pleased to direct me.' লং পার্লামেন্ট জেনারেল অলিভার ক্রমওয়েলের উত্থান ও পতনের অনেক ঘটনার সঙ্গে জড়িত। এ পার্লামেন্টে ধর্ম ও রাজনীতির সম্পর্ক বিষয়ক গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

লং মার্চ (Long March)

চীনের দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলের কিয়াংসি প্রদেশে ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত লালফৌজের মূলঘাঁটি ও মূলভিত্তি ছিল। এ সময়ে পার্টির অভ্যন্তরে অবস্থিত বাম হটকারীদের কার্যকলাপের ফলে চিয়াং কাইশেকের বাহিনী লালফৌজের ওপর ভয়াবহ চাপের সৃষ্টি করে। এমতাবস্থায়, লালফৌজের মাও ঝে ডংয়ের নেতৃত্বাধীন অংশ নিজেদের ধ্বংস এড়ানোর উদ্দেশে ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাসে কিয়াংসি ত্যাগ করে এবং সরকারি বাহিনীর সঙ্গে বহু সংঘর্ষের মোকাবিলা করে প্রায় ১২,৫০০ কিলোমিটার (প্রায় ৭০০০ মাইল) অতিক্রম করে ১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে চীনের উত্তর পশ্চিমের সেনশি এলাকায় এসে পৌঁছে। যুদ্ধ, বিপদ ও বিপদসঙ্কুল এই দীর্ঘ পথ পরিক্রমাই ইতিহাসে লং মার্চ নামে খ্যাত। মাও ঝে ডংয়ের নেতৃত্বাধীন লালফৌজের অংশ (যা প্রথম ফ্রন্ট আর্মি নামে পরিচিত)। এক বছরে ওই পথ অতিক্রম করলেও, হুনান, হুপে প্রভৃতি এলাকা থেকে রওনা হওয়া অন্যান্য বাহিনীর শেষ অংশ সেনশি এসে পৌঁছায় ১৯৩৬ সালের অক্টোবর মাসে। ফলে এই দুই বছরকেই লং মার্চের সময়কাল বলে ধরা হয়। লং মার্চ লালফৌজকে অকালে ধ্বংসের হাত থেকেই শুধু রক্ষা করে না, বরং চলার পথে বিজয়ের পর বিজয় অর্জনের মধ্য দিয়ে লালফৌজের শক্তি ও আত্মপ্রত্যয়ও বৃদ্ধি করে এবং কুয়োমিনতাং বাহিনীর মনোবল বহুল পরিমাণে ভেঙে দিতে সমর্থ হয়। লং মার্চ ব্যাপক এলাকার জনগণকে সমাজতান্ত্রিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ করে এবং মুক্তাঞ্চল সৃষ্টির মাধ্যমে জনগণ ও কমিউনিস্ট ক্যাডার উভয়কেই সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা সম্পর্কে হাতে কলমে জ্ঞানদান করে। লং মার্চকালীন অবর্ণনীয় দুঃখ-কষ্ট সত্যিকার কর্মীদের মধ্য থেকে সুবিধাবাদীদের চিহ্নিত করতে সহায়তা করে এবং ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৃঙ্খলার আদর্শ স্থাপন করে।

লক জন (John Locke)

জন লক (১৬৩২-১৭০৪) সপ্তদশ শতাব্দীর কিংবদন্তী ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব, গণতান্ত্রিক চিন্তা-চেতনায় উজ্জীবিত, বুর্জোয়া ও উদারনৈতিক রাষ্ট্রচিন্তার অকুণ্ঠ সমর্থক ও একজন বস্তুবাদী দার্শনিক ছিলেন। তাঁর রাষ্ট্রদর্শন যে সব মৌলিততত্ত্বের ওপর প্রতিষ্ঠিত তাহলো; সামাজিক চুক্তি মতবাদ, প্রাকৃতিক অধিকার তত্ত্ব, সম্পত্তি তত্ত্ব, সম্মতি তত্ত্ব, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি, নিয়মতান্ত্রিক সরকার, দায়িত্বশীল সরকার

ইত্যাদি। তাঁর প্রধান অবদান, 'মানবজ্ঞানসংক্রান্ত রচনা' (১৬৯০)। এতে তিনি বস্তুবাদী অভিজ্ঞতাভিত্তিক জ্ঞানতত্ত্বের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। লকের মতে, জগতের সবকিছু মানুষের জানার কোনো দরকার নেই; শুধু ততটুকুই জানা দরকার, যতটুকু তার আচরণ ও বাস্তব জীবনের জন্য প্রয়োজন। রাষ্ট্রক্ষমতা ও আইন সম্পর্কিত ব্যাপারে তিনি 'প্রাকৃতিক' স্তর থেকে 'সভ্য' স্তরের এবং অবস্থাভেদে বিভিন্ন ধরনের সরকারের তত্ত্ব হাজির করেন। তাঁর মতে, রাষ্ট্রের প্রয়োজন মূলত শ্রমের মাধ্যমে লব্ধ সম্পদ ও স্বাধীনতা রক্ষা করার জন্য। সুতরাং সরকারের স্বেচ্ছাচারী হওয়া উচিত নয়। তিনি সরকারের কাজকে তিন ভাগে ভাগ করেন, যথা (১) আইন প্রণয়ন-সংক্রান্ত (Legislative), (২) প্রশাসনসংক্রান্ত (Administrative) এবং (৩) ফেডারেল বিষয়ক-সংক্রান্ত (Federative)। তাঁর মতবাদ ১৬৮৮ সালের বুর্জোয়া বিপ্লবের পর ইংল্যান্ডে কার্যকর হয়। তাঁর চিন্তাধারা পরবর্তী কয়েক পুরুষ ধরে চিন্তাবিদদের প্রভাবিত করে। "অবস্থিত সামাজিক ব্যবস্থা যদি ব্যক্তিকে যথার্থ শিক্ষা ও বিকাশের সুযোগ না দেয়, তা হলে জনগণেরই উচিত সেই ব্যবস্থা পালটে দেওয়া"– তাঁর এই মতবাদকে বুর্জোয়ারা বুর্জোয়া বিপ্লবের যুক্তি হিসাবে হাজির করেছিল।

লকহীড কেলেঙ্কারি (Lockheed Scandal)

লকহীড হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিমান কোম্পানি। এই কোম্পানি মোটা অঙ্কের ঘুষের বিনিময়ে এর বিমান হল্যান্ড, জাপান, ইতালিসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিক্রয়ের চেষ্টা চালিয়ে থাকে। এ কোম্পানির অস্ত্র যাতে অন্যান্য দেশগুলো কিনে সেজন্য ক্রেতা দেশের সরকারপ্রধান, মন্ত্রী ও প্রথম শ্রেণির রাজনৈতিক নেতাদেরকে মোটা অঙ্কের ঘুষ প্রদান করা হয়ে থাকে। সত্তর দশকে এই লকহীড কোম্পানি কর্তৃক ঘুষ প্রদানের ঘটনা ফাঁস হয়ে যায়। ফলে কেলেঙ্কারির সাথে জড়িয়ে পড়ে জাপানের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এবং হল্যান্ডের রানীর স্বামীসহ পৃথিবীর অন্যান্য কয়েকটি দেশের ক্ষমতাসীন ব্যক্তিবর্গ। ১৯৮৩ সালের ১২ অক্টোবর কোর্টের রায়ে লকহীড কেলেঙ্কারিতে জড়িত থাকার দায়ে জাপানের সাবেক প্রধনমন্ত্রীকে ৪ বছরের জেলসহ ২০ লক্ষ ডলার জরিমানা করা হয়।

লকারবি দুর্ঘটনা (Lakaraki Accident)

স্কটল্যান্ডের লকারবির আকাশে প্যান অ্যাম-এর যাত্রীবাহী বিমানে বিস্ফোরণ ঘটানোর ঘটনাটি ঘটেছিল ১৯৮৮ সালের ডিসেম্বর মাসে। এ ঘটনার ব্যাপারে দু'জন লিবীয় নাগরিককে দায়ী করা হয়েছিল এবং এ ব্যাপারে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্র উক্ত দু'জনকে বিচারের ব্যাপারে হস্তান্তরের জন্য বলা হয়। জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদের প্রস্তাবও ছিল। কিন্তু লিবিয়া এ সিদ্ধান্ত মেনে নেয় নি। তবে তারা বলেছিল তাদের বিচার হেগ-এর আন্তর্জাতিক আদালতে সম্পন্ন হোক। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের একটাই কথা জাতিসংঘের প্রস্তাব মানতে হবে।

লবিং (Lobbying)

লবিং একটি প্রক্রিয়া বা প্রচেষ্টা। উত্থাপিত কোনো বিল পাস করার জন্য পার্লামেন্টের সদস্যদের প্রভাবিত করা। লবিং প্রশাসনিক কাজের ক্ষেত্রেও হয়। আবার কোনো সিদ্ধান্ত কার্যকর বা বাস্তবায়ন করার জন্যও লবিং করা হয়। আধুনিককালে যেকোনো তদবির সংক্রান্ত বিষয়ে লবিং করা হয়। সেটি চাকরি, বদলি, পদোন্নতি কিংবা কোনো কিছু ন্যায্য অথবা অন্যায্যতার ভিত্তিতে পাওয়ার লক্ষ্যে লবিং করা হয়।

লর্ডসভা (House of Lords)

ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চকক্ষ। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় ও পুরনো দ্বিতীয় কক্ষ। লর্ডসভাকে নরম্যান রাজাদের (১০৬৬ সাল থেকে শুরু) 'গ্রেট কাউন্সিল' বা 'কিং কাউন্সিল'-এর উত্তরাধিকারী প্রতিষ্ঠান বলে মনে করা হয়। এর সঙ্গে স্যাক্সনদের উইটেনিজিমট এর অভিজ্ঞতা যুক্ত হয়। লর্ডসভা আলাদা প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা পায় রাজা তৃতীয় এডওয়ার্ডের (১৩১২-১৩৭৭) আমলে। তখন 'হাউস অব লর্ডস' নামকরণ হয় নি। ১৬ শতক থেকে 'হাউস অব লর্ডস' নাম ব্যবহৃত হয়।

আইন প্রণয়ন ও করারোপে এক সময় লর্ডসভার অনেক ক্ষমতা ছিল। কমন্সসভার প্রভাব বৃদ্ধির ফলে আস্তে আস্তে লর্ডসভার ভূমিকা সংকুচিত হতে থাকে। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের পার্লামেন্ট অ্যাক্টের মাধ্যমে লর্ডসভার ক্ষমতা আরও সীমত হয়। লর্ডসভায় এখনও কিছু বিশেষ ধরনের বিল উত্থাপিত হয়। তবে লর্ডসভা কমন্সসভায় পাসকৃত বিলে ভেটো দিতে পারে না। অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য কোনো বিল ঠেকিয়ে রাখতে পারে না। সর্বোচ্চ এক বছর ঠেকাতে পারে। তবে কোর্ট হিসেবে লর্ডসভার ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। লর্ডসভার 'জুডিশিয়াল কমিটি'কে ইংল্যান্ডের চূড়ান্ত আপিল কোর্ট বলে গণ্য করা হয়। লর্ডসভার নির্দিষ্ট কোনো সদস্য সংখ্যা নেই। সময়ে সময়ে এর সদস্য সংখ্যা পরিবর্তিত হয়। ১৯৮৮ সালে ১২০০ জন সদস্য ছিলেন। এঁদের মধ্যে ৭৯০ জন হেরিডেটরি পিয়ার, ৩৭১ জন লাইফ পিয়ার, ৯ জন ল'লর্ডস ও ২৬ জন আর্চবিশপ ও বিশপ। লর্ড ন্যান্সেলর লর্ডসভায় সভাপতিত্ব করেন। আইন প্রণয়ন, করারোপ ও অর্থ সংক্রান্ত ক্ষমতা সংকুচিত হওয়ায় লর্ডসভার গুরুত্ব কমে যায় এবং ব্রিটিশ রাজনীতিতে এর প্রভাবও সীমিত হয়ে পড়ে। (সূত্র: জালাল ফিরোজ, ঢাকা: পার্লামন্টোরি শব্দকোষ বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

লাঠিচার্জ

কোনো মিছিলকারী, বিক্ষোভকারী, অবস্থান ধর্মঘট বা ঘেরাওকারীদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য পুলিশ কর্তৃক এলোপাতাড়ি লাঠিপেটা করাকেই বলে লাঠিচার্জ। এই শব্দটি বাংলা লাঠি থেকে উদ্ভূত হলেও বর্তমানে বিশ্বব্যাপী প্রচলিত।

লায়ন্স ক্লাব (Lions Club)

বিশ্বের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দ্বারা গঠিত একটি আন্তর্জাতিক সেবা সংস্থা। প্রতিষ্ঠিত হয় ৭ জুন, ১৯১৭। প্রতিষ্ঠাতা মেলভিন জোন্স নামে শিকাগোর এক ব্যবসায়ী। এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সমাজ কল্যাণমূলক কর্মকাণ্ড পরিচালনা করা।

লাল ফিতার দৌরাত্ম্য (Red Tapism)

লাল ফিতার দৌরাত্ম্য আনুষ্ঠানিক নিয়ম-কানুন, কর্মপদ্ধতি ও পূর্ব নজির অনুসরণ করাকে বোঝায়। এ কথাটি সরকারি ফাইল বাঁধার জন্য ব্যবহৃত লাল রঙের ফিতা থেকে এসেছে। কিন্তু যখন এই আনুষ্ঠানিকতা ও নিয়ম-কানুনের প্রতি অন্ধ আনুগত্য প্রদর্শন করা হয় এবং এই নিয়ম কানুন জনগণের উপকারের থেকে ক্ষতির সাধিত হয়, তবে ওই নিয়ম কানুন পরিত্যাগ করা বাঞ্ছনীয়। তাছাড়া লাল ফিতার দৌরাত্ম্য কথাটির প্রয়োগ আমলাতন্ত্রে বেশি দেখা যায়। এখানে আনুষ্ঠানিক নিয়ম কানুনের বাইরে এমন কিছু করার উপায় নাই। অফিস ফাইলের লাল ফিতার দৌরাত্ম্যে প্রকৃত জনকল্যাণ এক অফিস থেকে অন্য অফিসে এবং একই ঘরের এক টেবিল থেকে অন্য টেবিলে ঘুরপাক খেতে থাকে। এই দীর্ঘসূত্রিতার কারণে জনকল্যাণের কাজ বাধাগ্রস্থ হয় এবং অনেক সময় ফাইল নিম্ন সোপান থেকে উচ্চ সোপানে পৌঁছাতে এত বেশি সময় ব্যয় হয় যে সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর এর কোনো গুরুত্ব থাকে না।

লালফৌজ (Red Army)

লালফৌজ সমাজতান্ত্রিক বা জনগণতান্ত্রিক বিপ্লবের লক্ষ্যে কমিউনিস্ট পার্টির কর্তৃত্বাধীনে গঠিত সশস্ত্রবাহিনী। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লব এবং ১৯৪৯ সালের চীন কমিউনিস্ট বিপ্লবের প্রতিক্রিয়ার শক্তির বিরুদ্ধে প্রধান আঘাতকারী হাতিয়ারই ছিল এই লালফৌজ বাহিনী। ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়ার স্ব-স্ব দেশের লালফৌজ সাম্রাজ্যবাদ ও উপনিবেশবাদ বিরোধী সংগ্রামে বিশেষ অবদান রাখে।

লাহোর প্রস্তাব (Lahor Resolation)

১৯৪০ সালের ২৩ মার্চ নিখিল ভারত মুসলিম লীগের লাহোর অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব। এ প্রস্তাবে ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহকে নিয়ে ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে একটি এবং পূর্বাঞ্চলে অন্য একটি রাষ্ট্রগঠনের কথা বলা হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ দুই রাষ্ট্র গঠনের ব্যাপারটি পাশ কাটিয়ে যায় এবং পূর্বাঞ্চলে বাংলা ও আসাম প্রদেশের বদলে বঙ্গ প্রদেশের একাংশ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে। বস্তুত লাহোর প্রস্তাবের ফলশ্রুতিতেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়।

লিংকন, আব্রাহাম (Abraham Lincoln)

আব্রাহাম লিংকন (১৮০৯-৬৫) কেনটাকীয় এক অশিক্ষিত ও ভবঘুরে পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। এই পরিবার ইলিনয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। প্রথম জীবনে

লিংকন একটি ক্ষুদ্র দোকান চালাতেন। তিনি অল্পদিন পোস্টমাস্টার হিসেবেও কাজ করেন এবং পরে আইন অধ্যয়ন করেন। অতঃপর তিনি স্প্রিংফিল্ডে এসে আইনব্যবসা শুরু করেন। তিনি চারবার রাজ্য আইনসভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৮৫৪ সালে স্টিফেন ডগলাস কানসাস নেব্রাস্কা আদালতের মাধ্যমে দাসপ্রথার ব্যাপারটিকে বিতর্কে নিয়ে এলে ডগলাসের বিরোধিতা করে অব্রাহাম লিংকন জাতীয় রাজনীতির সামনে চলে আসেন। ১৮৫৬ সালে তিনি রিপাবলিকান দলে যোগদান করেন এবং ১৮৫৮ সালে ডগলাসের বিরুদ্ধে সিনেটের সদস্যপদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তিনি এ সময় দাসপ্রথাকে আক্রমণ করে প্রচারকার্য চালান এবং ডগলাসের সঙ্গে ৭টি প্রকাশ্য বিতর্কে অবতীর্ণ হন। তিনি এই নির্বাচনে পরাজিত হলেও ১৮৬০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়লাভ করেন। তাঁর বক্তব্যের ফলশ্রুতিতে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব গ্রহণ করার পূর্বেই দাস অধ্যুষিত সাতটি রাজ্য যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে। ফলে, আমেরিকায় এক গৃহযুদ্ধের সূচনা হয়। ১৮৬৩ সালের ১ জানুয়ারি দাসপ্রথা রহিত করা হয়। অনেকেই বিদ্রোহী দক্ষিণাঞ্চলের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়ার পক্ষপাতি হলেও লিংকন নমনীয় মনোভা ও দক্ষিণাঞ্চলের পুনর্গঠনের নীতি গ্রহণ করেন। ১৮৬৫ সালের গুড ফ্রাইডের রাত্রে ওয়াশিংটনের ফোর্ড থিয়েটারে একটি নাটক দেখে বেরুনোর সময় উইলকি বুথ নামক এক ব্যক্তি তাঁকে গুলি করে। পরদিন (১৫ এপ্রিল) লিংকন প্রাণত্যাগ করেন। দাস প্রথা রহিত করার পাশাপাশি গণতন্ত্রের মহান প্রবক্ত হিসেবেও লিংকন কালোত্তীর্ণ মহামানবে পরিণত হন। প্রসঙ্গত, তাঁর গেটিসবার্গের ভাষণ স্মরণযোগ্য।

লিখিত ও অলিখিত সংবিধান (Written & Unwritten Constitution)

যে সংবিধান শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিসমূহের অধিকাংশ লিখিত থাকে তাকে লিখিত সংবিধান বলা হয়। এটা বিশেষ দিনে বিশেষ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাস করা হয়ে থাকে। ইহাকে দলিলাকারে দেখানো যায়। যেমন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান বা বাংলাদেশের সংবিধান ইত্যাদি। যে সংবিধানে শাসনব্যবস্থা সম্পর্কিত মৌলিক নীতিগুলো এক বা একাধিক দলিলে লিখিত নেই বরং মৌলিক নীতিগুলো, বিভিন্ন আচার, প্রথা, রীতি-নীতি এবং বিচার বিভাগীয় সিদ্ধান্তের মধ্যে বিরাজমান থাকে তাকে অলিখিত সংবিধান বলে। ইহা কোন বিশেষ দিনে কোন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পাস করা হয় না। যেমন-ব্রিটিশ সংবিধান।

লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী প্রোটকল (Protocol Against Gender Dispairity)

লিঙ্গ বৈষম্য বিরোধী প্রোটকল ১৯৯৯ সালের ১০ ডিসেম্বর অস্ট্রিয়া, বেলজিয়াম, বলিভিয়া, চিলি, কলাম্বিয়া, কোস্টারিকা, চেকপ্রজাতন্ত্র, ডেনমার্ক, ইকুয়েডর, ফিনল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, গ্রিস, আইসল্যান্ড, ইতালি লিকটেনস্টেইন, লুক্সেমবুর্গ, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, নরওয়ে, সেনেগাল ও সুইডেন,-এই ২২টি দেশ এই প্রোটকলে

স্বাক্ষরদান করে। উল্লেখ্য, ৬ অক্টোবর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ এ প্রোটকলের খসড়া অনুমোদন করে। এই প্রোটকল মোতাবেক লিঙ্গ বৈষম্যের শিকার নারীরা নিজ নিজ দেশে অন্যায়ের প্রতিকার না পেলে সরাসরি জাতিসংঘে অভিযোগ দায়ের করতে সমর্থ হয়েছে।

লিবারেল পার্টি (Liberal Party)

ব্রিটেনের হুইগ দলের উত্তরাধিকারী হলো লিবারেল পার্টি। ১৮৭৭ সালে জাতীয় উদারনৈতিক ফেডারেশন-এর জন্ম হয়। ১৮৮৬ সালে আয়ারল্যান্ডের স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে এই দলে বিভক্তি আসে। বুয়ের যুদ্ধের ব্যাপারেও এ দলের মধ্যে মতদ্বৈধতা দেখা দেয়। ১৯০৬ সালের নির্বাচনে এ দল বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে। ক্যাম্পবেল ব্যানারম্যান ও এসকুইথ মন্ত্রিসভা সামাজিক সংস্কারের ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে। কিন্তু প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এসকুইথ ও লয়েড জর্জের দ্বন্দ্ব দলকে খুবই দুর্বল করে ফেলে। ১৯৩১ সালে গঠিত জাতীয় সরকারে এবং ১৯৪০-৪৫ সালে গঠিত চার্চিলের কোয়ালিশন সরকারে এ দলের কতিপয় সদস্য মন্ত্রিত্ব লাভ করেন।

লীগ অব নেশনস (League of Nations)

প্রথম মহাযুদ্ধের পর ভার্সাই চুক্তির শর্তানুযায়ী ১৯২০ সালে লীগ অব নেশনস্ নামে একটি আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালে জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠিত হলে লীগ অব নেশনস্ বিলুপ্ত হয়ে যায়। লীগ অব নেশনস্-এর মূল ভিত্তি ছিল মার্কিন প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন-এর ১৪ দফা। কিন্তু, মার্কিন কংগ্রেসই ভার্সাই চুক্তি অনুমোদন করতে এবং লীগের সদস্য হতে অস্বীকার করে। লীগের বিধান অনুযায়ী সাব্যস্ত হয় যে, কোনো দেশ লীগ অব নেশসন-এর কাছে নালিশ না জানিয়ে অন্য কোনো দেশ আক্রমণ করতে পারবে না। নালিশ জানানোর পর লীগ ছয় মাসের মধ্যে সিদ্ধান্ত দিতে না পারলে, সেই ছয় মাস অতিবাহিত হওয়ার তিন মাস পর সংশ্লিষ্ট দেশ ইচ্ছা করলে অন্য দেশটি আক্রমণ করতে পারবে। জাতিসংঘ ও লীগের উদ্দেশ্য মূলত একই হলেও এদের মৌল পার্থক্য ছিল শান্তির প্রতি হুমকিকে মোকাবিলার পদ্ধতিতে। লীগ এজন্য নিজের যোগ্যতা বা ক্ষমতার ওপর নির্ভর করত না, নির্ভর করত সদস্যগণ কর্তৃক স্বতঃস্ফূর্তভাবে লীগ বিধি মেনে চলার ওপর। কিন্তু, জাতিসংঘের ক্ষেত্রে নিরাপত্তা পরিষদের প্রাথমিক দায়িত্বই হলো সংঘের নিজ উদ্যোগে বিশ্বশান্তি রক্ষা করা। জাতিসংঘ আক্রমণকারী দেশের বিরুদ্ধে সিদ্ধান্ত নিতে সমর্থ (যদিনা কোনো স্থায়ী সদস্য তার ওপর ভেটো দিয়ে বসে)। কিন্তু লীগ অব নেশনস তা পারত না। তাছাড়া, একটি বৃহৎ শক্তি (মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) লীগ অব নেশনসে যোগদানই করেনি; অপর একটি বৃহৎ শক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন) ছিল বিপুলভাবে সমালোচিত; আরও দুটি শক্তি (ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য)-র সমর্থনও ছিল আধাকাঁচড়া। অপর তিনটি দেশ (জার্মানি, ইতালি ও জাপান) লীগ সনদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করেছিল। ফলে, লীগ কার্যত তাৎপর্যহীন হয়ে পড়েছিল।

লুক্সেমবার্গ, রোজা (Rosa Luxsenberg)

রোজা লুক্সেমবার্গ (১৮৭০-১৯১৯) পোল্যান্ডে জন্ম গ্রহণ করেন। কিন্তু ১৮৯৫ সালে তিনি জনৈক জার্মান শ্রমিককে বিয়ে করে জার্মান নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। সমকালীন সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে রোজা লুক্সেমবার্গ এক স্বকীয়তাসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি পোল্যান্ড এবং লিথুয়ানিয়ার সমাজতান্ত্রিক গ্রুপসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য প্রচেষ্টা চালান। তিনি ১৯০৫ সালে রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন। কার্ল লিবনেখট-এর সঙ্গে তিনি জার্মান স্পার্টাকাস লীগ প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে তাঁকে কারাবন্দি করে রাখা হয়। তিনি সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের ব্যাপারে তেমন একটা শ্রদ্ধাশীল ছিলেন না। আবার, চরমপন্থিদের ধ্বংসাত্মক কর্মকাণ্ডের ব্যাপারেও তাঁর ভূমিকা প্রতিরোধাত্মক ছিল। কিন্তু তা সত্ত্বেও জার্মান কর্তৃপক্ষ তাঁকে এবং লিবনেখটকে গ্রেফতার করে এবং ১৯১৯ সালের ১৫ জানুয়ারি অত্যন্ত বর্বরতার সঙ্গে হত্যা করে।

লুথার, মার্টিন (Martin Luther)

মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৪৬), খ্রিস্টীয় ধর্মসংস্কার (Reformation)-এর নেতা এবং প্রটেস্টান্ট (Protestant) ধারার প্রতিষ্ঠাতা। তাঁর মতবাদ ষোড়শ সপ্তদশ শতাব্দীতে জার্মানির আধ্যাত্মিক জগৎকে দারুণভাবে প্রভাবিত করে। তাঁর বাইবেলের অনুবাদ জার্মান ভাষার গঠনে বিরাট ভূমিকা পালন করে। চার্চ এবং ধর্মযাজকরাই হলো ঈশ্বর এবং মানুষের মধ্যে মধ্যস্থতাকারী। লুথার ক্যাথলিক পোপদের এই দাবির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। তিনি বলেন যে, মানুষের মুক্তি 'ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান' ও রহস্যবাদের মধ্যে নয়, বরং মুক্তি সরল বিশ্বাসের মধ্যে নিহিত। তিনি আরও বলেন যে, ধর্মীয় সত্য ও পোপ বা ধর্মযাকদের অনুশাসনের মধ্যে নয়, বরং গসপেলের মধ্যে নিহিত। মার্টিন লুথারের এই মতবাদ প্রাথমিক যুগের বুর্জোয়া বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে চার্চ এবং সামন্তবাদী আদর্শের সংঘাতকে প্রকট করে তোলে। তিনি জার্মান বার্গারদের অর্থসম্পদ সম্পর্কিত স্বার্থেরও বিরোধিতা করেন, প্রাকৃতিক আইনতত্ত্বের সমালোচনা করেন এবং বুর্জোয়া মানবতা ও অবাধ বাণিজ্যনীতির বিরুদ্ধেও মতপ্রকাশ করেন। ১৫২৫ সালের কৃষকযুদ্ধের সময় তিনি শাসকশ্রেণির পক্ষ অবলম্বন করেন।

লুমুম্বা, প্যাট্রিস (Patrics Lumunba)

প্যাট্রিস লুমুম্বা আফ্রিকার বেলজিয়াম কঙ্গোর জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রধান নেতা। আন্দোলনের ফলে ১৯৬০ সালের জুন মাসে বেলজিয়ানরা কঙ্গোর স্বাধীনতা দিতে বাধ্য হলে, প্যাট্রিস লুমুম্বা দেশের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেন। কিন্তু অচিরেই দেশে ভয়াবহ উপজাতীয় কোন্দল দেখা দেয়। কাতাঙ্গা প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী মোশে শোম্বে কাতাঙ্গার স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। উপজাতীয় কোন্দলের সুযোগে বেলজিয়ানরা পুনরায় কঙ্গোর অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে শুরু করে। এই গৃহযুদ্ধের

একপর্যায়ে মার্কিন সমর্থক সেনাবাহিনী প্রধান জোসেফ কাশাভুবু রুশপন্থি লুমুম্বাকে হত্যা করেন। ১৯৬১ সালে এ ঘটনা ঘটে।

লুম্পেন (Lumpen)

লুম্পেন বা ভবঘুরে বলতে সর্বহারাদের বোঝায়। কেননা, এরা কোনো উৎপাদন প্রক্রিয়ার সঙ্গে স্থায়ীভাবে যুক্ত নয়, আবার এদের কোনো নির্দিষ্ট পেশা, নির্দিষ্ট ঠিকানা নেই। এদের অনেকেই ভিক্ষুক, চোর, ডাকাত বা অন্যান্য সমাজবিরোধী ও অনৈতিক কার্যকলাপে লিপ্ত। উৎপাদনযন্ত্রের সঙ্গে যে-সম্পর্ক শ্রমিককে বিপ্লবীতে রূপান্তরিত করে, এদের ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য নয়। ফলে, এরা কখনোই বিপ্লবী নয়, এরা বড়জোর ভাড়াটে হিসেবে খাটতে পারে মাত্র। মার্কস ও এঙ্গেলস কমিউনিস্ট মেনিফেস্টোতে এদের অভিহিত করেছেন সমাজের আবর্জনা স্বরূপ, পুরানো সমাজ গহ্বরের নিম্নতম স্তর থেকে উৎক্ষিপ্ত অকর্মণ্য পূর্তিগন্ধময় এক বিরাট জঙ্গল হিসাবে। শ্রমিক বিপ্লবের স্রোত বেয়ে এরা এখানে ওখানে আন্দোলনে ঢুকে পড়তে পারে। এদের জীবনধারণের অবস্থা এমনই যে এরা অতি সহজেই প্রতিক্রিয়াশীল ষড়যন্ত্রকারীদের আজ্ঞাবহ দাসে পরিণত হতে পারে।' অথচ নৈরাজ্যবাদীরা লুম্পেনদেরকেই সবচেয়ে বেশি বিপ্লবী বলে বিবেচনা করে। বর্তমান যুগেও বস্তিবাসী, ভবঘুরে ও টোকাই জাতীয় লুম্পেনরা পয়সা পেলে যে কোনো রাজনৈতিক দল বা গ্রুপেরই ভাড়া খাটে।

লেনদেনের ভারসাম্য (Balance of Trade)

লেনদেনের ভারসাম্য হল কোনো একটি দেশের রফতানিবাবদ আয় এবং আমদানিবাবদ ব্যয়ের মধ্যকার ভারসাম্য। এই ভারসাম্যের প্রধান বিষয়গুলো প্রত্যক্ষ হলেও এর অনেকগুলো বিষয় পরোক্ষ। যেমন, একটি দেশ বিদেশি ঋণের যে-সুদ প্রদান করে এবং স্বদেশ থেকে বিদেশে যাওয়া ট্যুরিস্টরা বিদেশে গিয়ে যে অর্থ খরচ করেন এ সমস্ত ব্যয় এবং এ-জাতীয় আরও অন্যান্য খাতে ব্যয়িত বৈদেশিক মুদ্রাকে অদৃশ্য বা পরোক্ষ আমদানি বলে গণ্য করা হয়। অপরদিকে, একটি দেশ-বিদেশ থেকে আগত ট্যুরিস্টদের ব্যয়, অন্যান্য দেশে প্রদত্ত ঋণবাবদ আদায়কৃত সুদ, জাহাজ ভাড়াবাবদ আয় ইত্যাদির মাধ্যমে যে-বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়, সেটাকে পরোক্ষ রফতানি বলে গণ্য করা হয়। যখন রফতানির তুলনায় আমদানি বেড়ে যায়, অর্থাৎ বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের তুলনায় ব্যয় বৃদ্ধি পায়, তখন লেনদেনের ভারসাম্য প্রতিকূল বলে বিবেচনা করা হয়।

লেবার পার্টি (Labor Party)

লেবার পার্টি ব্রিটেনের একটি বিখ্যাত রাজনৈতিক দল। ১৮৯২ সালে প্রথম শ্রমিক দলীয় সদস্য জন বার্নস ও কিয়ের হার্ডি ১৩ জন লিবারেল শ্রমিক সদস্যসহ হাউস অব কমন্স সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯০০ সালে ট্রেডস ইউনিয়সন কংগ্রেস, দ্য

ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি, দ্য ফেবিয়ান সোসাইটি ও সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশন মিলে গঠন করে 'লেবার রিপ্রেজেনটেটিভ কমিটি'। এতে অন্তর্ভুক্ত হন সাতজন ট্রেড ইউনিয়ন নেতা-কর্মী, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টির দুই জন সদস্য, ফেবিয়ান সোসাইটির একজন সদস্য এবং সোশ্যাল ডেমোক্রেটিক ফেডারেশনের দুই জন সদস্য। এদের লক্ষ্য ছিল পার্লামেন্টে একটি লেবার গ্রুপ বা শ্রমিকদলীয় গোষ্ঠী গঠন করা। ১৯০৬ সালে এই লেবার রিপ্রেজেন্টেটিভ কমিটিই লেবার পার্টিতে পরিণত হয় এবং ১৯২২ সালের মধ্যে ব্রিটেনের দুটি প্রধান বড় দলের একটিতে পরিণত হয়। ১৯২৪ ও ১৯২৯ সালের নির্বাচনে জয়লাভ করে লেবার পার্টি সরকার গঠন করে। এই পার্টির কর্মকাণ্ড পরিচালনার স্বার্থে ব্যয়িত অর্থের শতকরা ৭৫ ভাগ যুগিয়ে থাকে ব্রিটেনের ট্রেড ইউনিয়নগুলো। ২০০১ সালের জুন মাসে ব্রিটেনের সর্বশেষ সাধারণ নির্বাচনে লেবার পার্টি ইতিহাসে সর্বাধিক আসন লাভ করে জয়ী হয়। যুক্তরাজ্যের ইতিহাসে এই প্রথম লেবার পার্টির কোনো নেতা হিসেবে টনি ব্লেয়ার পর পর দুবার পুরো সময়ের জন্য প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন।

লোকসভা (Lok Sabha)

লোকসভা ভারতীয় সংসদের নিম্নকক্ষ। এই কক্ষের প্রতিনিধিরা প্রত্যক্ষভাবে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত হন। ২০০৯ সাল অবধি ভারতে মোট পনেরোটি লোকসভা গঠিত হয়েছে। সংবিধান অনুসারে, এই কক্ষের প্রতিনিধিদের সর্বোচ্চ সংখ্যা ৫৫২। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলগুলো সর্বোচ্চ ২০ জন প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। রাষ্ট্রপতি যদি মনে করেন যে সভায় অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান সম্প্রদায়ের যথেষ্ট প্রতিনিধি নেই, তবে তিনি সর্বোচ্চ দুইজনকে মনোনীত করতে পারেন। বর্তমানে অধ্যক্ষ এবং দুইজন মনোনীত প্রতিনিধি (যদি থাকেন) সহ লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৫।

প্রত্যেক লোকসভার মেয়াদ পাঁচ বছরের। পাঁচ বছর অন্তর এই সভা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই বিলুপ্ত হয়। তবে জরুরি অবস্থা ঘোষণার মাধ্যমে এই সভার মেয়াদ আরও একবছর বাড়ানো যায়।

২০০১ সালের ভারতীয় জনগণনার পরিপ্রেক্ষিতে সাম্প্রতিককালে লোকসভা কেন্দ্রগুলোর সীমানা পুনর্নির্ধারণের জন্য গঠিত হয় সীমানা পুনর্নির্ধারণ কমিশন। সীমানা পুনর্নির্ধারণের কাজটি প্রকৃতপক্ষে প্রতি জনগণনার পর হওয়ার কথা। কিন্তু ১৯৭৬ সালে পরিবার পরিকল্পনা কর্মসূচির প্রভাব এড়াতে একটি বিশেষ সংবিধান সংশোধনীর দ্বারা এই কাজ স্থগিত করা হয়েছিল। বর্তমানে লোকসভা টিভি নামে লোকসভার একটি নিজস্ব টেলিভিশন চ্যানেল আছে, যার সদর সংসদ ভবন চত্বরেই অবস্থিত।

সংবিধানের ৮৩ নং অনুচ্ছেদে সংসদের দুই কক্ষের সদস্য হওয়ার যোগ্যতা উল্লেখ করা হয়েছে। লোকসভার সদস্যদের অবশ্যই ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের নাগরিক হতে হয় যার বয়স ২৫ বছরের কম নয়। অনাগরিক, আদালত কর্তৃক বিকৃত মস্তিষ্ক বা দেউলিয়া

ঘোষিত বা কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের লাভজনক কোনো পদে চাকরিরত ব্যক্তিরা লোকসভার সদস্যপদের প্রার্থী হতে পারেন না। সংরক্ষিত আসনের ক্ষেত্রে প্রার্থীকে অবশ্যই তফসিলি জাতি বা উপজাতি তালিকাভুক্ত হতে হবে।

সাধারণ দিনে লোকসভার কার্যকাল সকাল ১১টা থেকে দুপুর ১টা এবং দুপুর ২টো থেকে সন্ধ্যে ৬টা। প্রত্যেক বৈঠকের প্রথম ঘণ্টাটি প্রশ্নোত্তর কাল বা কোশ্চেন আওয়ার নামে পরিচিত। এই পর্বে সদস্যরা নির্দিষ্ট সরকারি মন্ত্রকের বিষয়ে প্রশ্ন উত্থাপন করেন এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীরা সেই সব প্রশ্নের উত্তর দেন।

অর্থ বিল ছাড়া অন্য সকল ক্ষেত্রে রাজ্যসভা ও লোকসভার আইনবিভাগীয় ক্ষমতা একই। অর্থ বিলের ক্ষেত্রে লোকসভাই সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ। আইনবিভাগের কোনো বিষয় নিয়ে উভয় কক্ষের মধ্যে বিরোধ দেখা গেলে যৌথ অধিবেশনের মাধ্যমে তার মীমাংসা করা হয়। তবে এই ধরনের অধিবেশনে সাধারণত লোকসভার সদস্যদেরই জয় হয়। কারণ, লোকসভার সদস্যসংখ্যা রাজ্যসভার প্রায় দ্বিগুণ। প্রতিবছর লোকসভার তিনটি অধিবেশন বসে।

স্বাধীনতার পর থেকে ভারতে ব্রিটিশ মডেলের সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা কার্যকর রয়েছে। ভারতের পার্লামেন্ট দ্বি-কক্ষ বিশিষ্ট। উচ্চকক্ষের নাম রাজ্যসভা আর নিম্নকক্ষ লোকসভা। লোকসভার মোট সদস্য সংখ্যা ৫৪৫। এর মধ্যে ৫৪৩টি আসন নির্বাচিত এবং ২টি মনোনীত। রাষ্ট্রপতির কাছে যদি মনে হয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ানের প্রতিনিধিত্ব সংসদে হয়নি তখন তিনি তাদের মধ্য থেকে দুজনকে মনোনীত করেন। নির্বাচিত ৫৪৩টি আসনের মধ্যে ৫৩০টি ২৫টি রাজ্যের এবং ১৩টি আসন ইউনিয়ন অঞ্চলের। ৫৪৩টি আসনের ৪২৩টি সাধারণ শ্রেণিভুক্ত, ৭৯টি সিডিউল কাস্ট এবং ৪১টি সিডিউল ট্রাইবদের জন্য সংরক্ষিত। সিডিউল কাস্ট ও ট্রাইবদের জন্য সংরক্ষিত আসনগুলোতে কেবল সংশ্লিষ্ট কাস্ট ও ট্রাইবের সদস্যরা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। তবে নির্বাচনী এলাকাল সকল ভোটার ভোট দিতে পারেন (দ্র. Kaul, M. N and Shakdher, *S.L, Practice and Procedure of Parliament*, Fourth Edition, New Delhi, 1997)।

রাজ্যগুলোর মধ্যে লোকসংখ্যার অনুপাত আসন বণ্টন করা হয়েছে। হরিয়ানা ৪০, হিমাচল প্রদেশ ৪, জন্মু ও কাশ্মীর ৬, পাঞ্জাব ১৩, উত্তর প্রদেশ ৮৫, চন্দ্রিগড় ১, দিল্লি ৭, অড়ুনাচল প্রদেশ ২, আসাম ১৪, বিহার ৫৪, মরিপুর ২, মেঘালয় ২, মিজোরাম ১, নাগাল্যান্ড ১, উরিষ্যা ২১, সিকিম ১, ত্রিপুরা ২, পশ্চিমবঙ্গ ৪২, অন্ধ্র প্রদেশ ৪২, কার্নাটক ২৮, কেরালা ২০, তামিলনাড়ু ৩৯, আন্দামান ও নিকোবার দ্বীপপুঞ্জ ১, লক্ষাদ্বীপ ১, পন্ডিচরি ১, দাদরা ও নাগার ১, গোয়া ২, দমন ১, গুজরাট ২৬, মধ্য প্রদেশ ৪০, মহারাষ্ট্র ৪৮ এবং রাজস্থান পেয়েছে ২৫টি আসন (দ্র. Ramesh Thakur, *The Government and Politics of India*, London, 1995)।

লোকসভার মেয়াদ ৫ বছর। প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে লোকসভার সদস্যরা নির্বাচিত হন। ১৮ বছর বয়স্ক লোক ভোটার হন। ২৫ বছর বয়স্ক যেকোনো ব্যক্তি নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন। তবে নির্বাচনী এলাকায় তাঁকে কমপক্ষে ১৮০ দিন বসবাস

করতে হয়। কোনো ব্যক্তি একই সঙ্গে লোকসভা ও রাজ্যসভা বা রাজ্য বিধান সভার সদস্য থাকতে পারেন না।

ভারতের রাজনীতির মূল প্রবাহ লোকসভাকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত। লোকসভা আইন প্রণয়ন ও নির্বাহী বিভাগের ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব নিয়ন্ত্রণ ও জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সকল গুরুত্বপূর্ণ বিল লোকসভায় উত্থাপিত হয়। লোকসভার আস্থাভাজন নেতা প্রধামন্ত্রী নিযুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর মন্ত্রিসভা সরকার পরিচালনা করে। লোকসভার আস্থা হারালে সরকারের পতন ঘটে। রাষ্ট্রপতি লোকসভা আহ্বান করেন। স্পিকার এতে সভাপতিত্ব করেন।

লোহিত সাগর (The Red Sea)

লোহিত সাগর সৌদি আরবের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগরের সাথে সুয়েজ খাল দ্বারা সংযোজিত। এ সাগরের তীরে সৌদি আরব, সুদান, ইয়েমেন, মিশরসহ কতিপয় রাষ্ট্র অবস্থিত। এই সমুদ্রের মাধ্যমে ভূমধ্যসাগর হতে বিভিন্ন নৌযান আরব সাগরে ও ভারত মহাসাগরে যাতায়াত করে থাকে। লোহিত সাগর সামরিক ও বাণিজ্যিক কারণে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ সুয়েজখালের মধ্য দিয়ে এগিয়ে এসে লোহিত সাগরের মাধ্যমে যুদ্ধজাহাজ ও বাণিজ্য জাহাজগুলো অতি সহজে এশিয়ার দেশসমূহে সহজে পৌঁছতে পারে।

ল্যাটিন আমেরিকা (Latin America)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডাসহ কতিপয় ইংরেজি ও ফরাসি ভাষী অঞ্চল ছাড়া দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অঞ্চলই সাধারণভাবে ল্যাটিন আমেরিকা বলে পরিচিত। ল্যাটিন আমেরিকাভুক্ত অঞ্চল একসময় স্পেন, ফ্রান্স বা পর্তুগালের উপনিবেশ ছিল। মেক্সিকো, কিউবা, হাইতি, ডোমিনিকান রিপাবলিক, হন্ডুরাস, ভেনিজুলো, গুয়াতেমালা, এল সালভাডর, নিকারাগুয়া, কোস্টারিকা, পানামা, কলম্বিয়া, ইকুয়েডর, পেরু, ব্রাজিল, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে, চিলি, উরুগুয়ে, আর্জেন্টিনা ইত্যাদি ল্যাটিন আমেরিকার অন্তর্ভুক্ত। ল্যাটিন আমেরিকাভুক্ত দেশসমূহের কাছে মার্কিন বিপ্লবের চাইতে ফরাসি বিপ্লবই অধিকতর প্রেরণাদায়ক। এসব অঞ্চলকে ল্যাটিন আমেরিকা বলার কারণ এই যে, এদের জনগণ মূলত ল্যাটিন ভাষাভাষী।

শক্তিতত্ত্ব (Theory of Force)

শক্তিতত্ত্ব তত্ত্বানুযায়ী অধিকতর শক্তিশালী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠী স্বীয় শক্তির বলে দুর্বল বা তুলনামূলকভাবে কম শক্তিশালী ব্যক্তি, ব্যক্তিবর্গ বা গোষ্ঠীর ওপর আধিপত্য কায়েম করেছে, তাদের দাবিয়ে রেখেছে, তাদের পোষণ করছে এবং নিপীড়ন চালাচ্ছে। এই তত্ত্বানুযায়ী শক্তিই ক্ষমতার নিয়ামক; আইনকানুন ইত্যাদিও আসলে শক্তিমানেরই স্বার্থের হাতিয়ার। এই তত্ত্ববাদীরা বিশ্বাস করেন যে, যে-কোনো শোষক,

ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী বা ব্যবস্থা টিকে থাকে শক্তির বলে; সুতরাং তাকে উৎখাত করাও অধিকতর শক্তিপ্রয়োগ ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে সম্ভবপর নয়। ড্যুরিং, কার্ল কাউটস্কি, কার্ল মার্ক্স প্রমুখ দার্শনিক এই তত্ত্বের প্রবক্তা ছিলেন।

শক্তিসাম্য (Balance of Power)

একটি রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠীর সমান ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য রাষ্ট্র অথবা রাষ্ট্রগোষ্ঠী থাকলে শক্তিসাম্য বিরাজ করে। ১৮৭১ সালে ব্রিটিশ পররাষ্ট্রনীতির অঙ্গ হিসেবে ইউরোপে শক্তির ভারসম্য নীতি গ্রহণ করা হয়। ১৮৭১ সাল থেকে ১৯১৪ সাল পর্যন্ত জার্মানি, অস্ট্রিয়া ইতালি ত্রয়ীজোটের বিরুদ্ধে ব্রিটিশ-ফরাসি-রুশ ত্রিপক্ষীয় আঁতাত গড়ে তোলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর শক্তির ভারসম্য বিশ্বরাজনীতি ও কূটনীতিতে বিশেষ গুরুত্ব লাভ করে। বস্তুত শক্তির ভারসম্যের তত্ত্বানুযায়ী শক্তি বলতে কোনো দেশর নিজস্ব সামরিক শক্তির সঙ্গে সঙ্গে তা প্রভাববলয়, মিত্রত্বের পরিধি এবং সমগ্র মিত্রজোটের সামরিক শক্তিকেও বোঝানো হয়। বর্তমান বিশ্বের দুই প্রধান শক্তি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং রাশিয়া। শক্তিসাম্যের তাগিদে একটি রাষ্ট্র অপর রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধির আশঙ্কায় নিজের সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করে। শক্তিসাম্য বজায় থাকলে বিভিন্ন রাষ্ট্রকে যুদ্ধের পথ পরিহার করতে বাধ্য করা যায়, ছোট রাষ্ট্রগুলো স্বাধীন সত্তা বজায় রাখতে পারে এবং কোনো শক্তিশালী রাষ্ট্র বা গোষ্ঠী সারা বিশ্বে নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হয় না। তবে কার্যত অনেক সময় উক্ত সুফলগুলো ফলেনি। সেজন্য স্থায়ী শান্তিস্থাপনে বিশ্বাসী অনেকে শক্তিসাম্য নীতির বিরোধী। তাঁদের মতে এই প্রথা ক্ষমতার দ্বন্দ্বকে বাঁচিয়ে রাখে, সামরিক প্রতিযোগিতায় রাষ্ট্রগুলো লিপ্ত থাকে এবং যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে পড়ে। যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট উড্রো উইলসন শক্তিসাম্যের পরিবর্তে শান্তিকামী সংগঠিত রাষ্ট্রসমবায় স্থাপনের যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। ওই মতের সমর্থক জওহরলাল নেহরু শক্তিসাম্য নীতির পথ অনুসরণ না করে নিরপেক্ষ বৈদেশিক নীতির পথ বেছে নেন। শক্তির এই ভারসম্যের প্রতিযোগিতায় বেধে যাচ্ছে আঞ্চলিক যুদ্ধ, সৃষ্টি হচ্ছে উত্তেজনা, দেশে দেশে ঘটছে অভ্যন্তরীণ যোগাযোগ, তীব্রতর হচ্ছে স্নায়ুযুদ্ধ। শক্তির মারসম্যের রাজনীতিই বর্তমান বিশ্বের যাবতীয় ঘটনাবলির প্রধান নিয়ামক।

শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ (Capitulation)

শর্তাধীনে আত্মসমর্পণ বা বিশেষ শর্তে আত্মসমর্পণ কথাটি বিদেশিদেরকে বিশেষ সুবিধা দেওয়ার শর্তে চুক্তিবদ্ধ হওয়া অহে হয়। যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কিংবা রাজনৈতিক চাপে পড়ে কোন বৈদেশিক রাষ্ট্রকে বিশেষ সুবিধাদানের শর্তে চুক্তি করা হয়। এই ধরনের চুক্তির প্রধান শর্ত হলো যে, পরাজিত দেশে বিজয়ী দেশের লোকদের অপরাধের বিচার কেবল বিজয়ী দেশের কর্তৃপক্ষই করবে। ঊনবিংশ শতাব্দীতে ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে চীনে বিদেশিরা ও ভারতে ইংরেজেরা এই ধরনের সুবিধা ভোগ করত। এরূপ চুক্তি অত্যন্ত হীনতামূলক বলে এখন প্রায় সর্বত্র এটার অবসান ঘটেছে।

শান্তি (Peace)

শান্তি (ইংরেজি: Peace) কোনো প্রকার সংঘর্ষ কিংবা যুদ্ধবিহীন সময়কাল। বৃহৎ পরিসরে শান্তি বলতে রাষ্ট্রের ঐক্য, শান্ত অবস্থা বিরাজমান যা অন্য কোনো কিছু বিঘ্নতা সৃষ্টিকারী পরিবেশ দ্বারা আক্রান্ত না হওয়াকে বুঝায়। জনগণ ও সংগঠনের অভ্যন্তরে শান্তির পরিবেশ সৃষ্টি করাই রাষ্ট্রের ইপ্সিত লক্ষ্য হওয়া উচিত। ১ম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীকালে দেশে দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায়ের স্বার্থে রাষ্ট্রপুঞ্জ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রসংঘ ২য় বিশ্বযুদ্ধ বন্ধ করতে পারেনি। ২য় বিশ্বযুদ্ধের পর রাষ্ট্রসংঘের স্থলাভিষিক্ত হয়ে জাতিসংঘের সৃষ্টি হয়। ফলে জাতিসংঘের সদস্যভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক নিরাপত্তা রক্ষা ও বিশ্ব শান্তিরক্ষার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। সদস্যভূক্ত কোনো দেশ যদি অন্য কোনো দেশ কর্তৃক আক্রান্ত কিংবা অধিগ্রহণের মুখোমুখি হয় তাহলে অন্যান্য সকল দেশ আক্রান্ত প্রথম দেশকে সাহায্যের জন্যে এগিয়ে আসে। এ ধরনের চিন্তা-ভাবনার ফসলরূপে শান্তি ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে দক্ষিণ কোরিয়া ও কুয়েতের ওপর প্রয়োগ করা হয়েছিল।

সাধারণত সামাজিক সমন্বয় ও ঐকতান, মানুষে মানুষে প্রীতির বন্ধন, ব্যক্তিজীবনে সন্তোষ এবং এক রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্য রাষ্ট্রের যুদ্ধহীন সহাবস্থানই হলো শান্তি। দর্শন ও আন্তর্জাতিক আইনের দিক থেকে শব্দটিকে নানাভাবে দেখা হয়। ইমানুয়েল কান্ট তাঁর 'চিরস্থায়ী শান্তি' তত্ত্বে বিভিন্ন বিবদমান রাষ্ট্রের সংবিধান পরিবর্তন করে পারস্পরিক সামঞ্জস্যপূর্ণ সম্পর্কের ভিত্তিতে পরিবর্তনের সুপারিশ করেন। সেজন্য তিনি চাইতেন বিভিন্ন স্বাধীন দেশ নিয়ে গঠিত রাষ্ট্রের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামো যার আইনকানুন হবে জনমুখী। তিনি নীতিশাস্ত্রে যে 'ক্যাটেগোরিক্যাল ইমপ্যারেটিভ' অর্থাৎ শর্তহীন নিয়ামকের বিধান প্রণয়ন করেন, তদনুযী আইনকানুন সর্বজনীন অনুজ্ঞামূলক যুক্তির ভিত্তিতে রচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়, যেটা যুক্তিবাদী মানুষ মাত্রেই মেনে নেবে এবং সেটা হবে যথার্থ স্বাধীনতার অভিব্যক্তি। তিনি মনে করতেন, সর্বসম্মত আইনের মাধ্যমে মানুষ স্বাধীনতার আস্বাদ পেলে বিবাদ-বিসংবাদের অবসান হবে। সেই নিরিখে মনে করা হয় যে বিশ্বে অধুনা যেসব আন্তর্জাতিক চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে, যেমন মানবাধিকার সনদ, সেগুলো অংশত কান্টের প্রভাবের ফল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর রাশিয়ায় নবগঠিত সোভিয়েত রাষ্ট্রের সঙ্গে প্রতিবেশী পুঁজিবাদী দেশের যুদ্ধ বিরতিসূত্রে শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান প্রত্যয়টি ট্রটস্কি উদ্ভাবন করেন। সে সময় আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনে এই মনোভাব বিরাজ ক্ষমতা যে বিবদমান দেশসমূহের সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ও একই ধরনের শোষণহীন সমাজ প্রবর্তিত হলে তবেই চিরস্থায়ী শান্তির প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

আন্তর্জাতিক আইনের নিরিখে শান্তির প্রকৃতি এই তিনটির যে কোনো একটি: ১. যুদ্ধের অবসান, ২. রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সংঘর্ষ বা যুদ্ধের পরিস্থিতি না থাকা, ৩. তৃতীয় কোনো পক্ষের প্রভাবাধীনে যুদ্ধের অবসান অথবা সহাবস্থান। আইনের দিক থেকে যুদ্ধের অবসান ঘটে শান্তি চুক্তি সম্পাদনের মাধ্যমে। শান্তিচুক্তি সম্পাদন করে বৈধভাবে

পরোক্ষে অন্যদেশের অভ্যন্তরীণ বিরুদ্ধ-শক্তির সাহায্যে বিপ্লব ঘটিয়ে প্রকারান্তরে যুদ্ধ চালানো যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সরাসরি যুদ্ধ না করে ঠাণ্ডা লড়াই চলে দীর্ঘকাল।

শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান (Peaceful Coexistence)

সাধারণত দুই বা ততোধিক রাষ্ট্রের দ্বন্দ্ব-সংঘাতমুক্ত ও শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি অবস্থান করার নীতিই শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এই নীতি অনুযায়ী এক রাষ্ট্র অন্য রাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করবে না এবং কোনো কৌশলেও স্বীয় মতবাদ অন্য রাষ্ট্রের জনগণের ওপর চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে না। সমাজতন্ত্রকে রক্ষা করার স্বার্থে লেনিন সর্বপ্রথম এই নীতির কথা বলেন। পরবর্তীকালে অনেকেই এই নীতির কথা বলতেন। পঞ্চশীলা নীতিও শান্তিপূর্ণ সহঅবস্থানের ভিত্তিতেই বিবেচিত হয়েছিল।

শাসনতান্ত্রিকতাবাদ (Constitutionalism)

শাসনতান্ত্রিকতাবাদ হলো এমন অবস্থা, যে অবস্থায় দেশের শাসনতন্ত্র আপামর জনগণের ইচ্ছার ভিত্তিতেই রচিত হয় এবং যে-অবস্থায় শাসনতন্ত্রের বিধিমালার বাইরে কোনো ক্ষমতাধর ব্যক্তি, গোষ্ঠী বা শ্রেণির কোনোকিছুই করার সুযোগ বা ঝোঁক থাকে না। এই ধরনের ব্যবস্থায় জনগণের মৌলিক অধিকারসমূহ সুরক্ষিত, স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারের ব্যবস্থা বিদ্যমান থাকে।

শিয়া (Shia)

শিয়া মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বৃহৎ সম্প্রদায়। হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর হযরত আলী (রা.) ন্যায়ত ও ঐশীভাবে তাঁর উত্তরাধিকারী ছিলেন– এটাই শিয়াদের অভিমত। মুসলিম উম্মা ও মুসলিম রাষ্ট্রের নেতৃত্বের প্রশ্নে সুন্নিদের মত ছিল এই যে, মত প্রকাশ করার মতো যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দ্বারা নির্বাচিত প্রতিনিধিই রাসুল (সা.)-এর উত্তরাধিকারী বা খলিফা হবেন এবং তিনি কুরাইশ বংশোদ্ভব হবেন। এই চিন্তা অনুযায়ী সুন্নিরা প্রথম চার খলিফাকে যথার্থ বলে বিবেচনা করেন। কিন্তু শিয়ারা গণসমর্থনের ভিত্তিতে নির্বাচিত খলিফার আনুগত্য স্বীকার করতে রাজি হন না। তাঁদের মত হল এই যে, শুধুমাত্র আহলুল বয়াত (নবীর পরিবার), অর্থাৎ হযরত আলী (রা.) ও ফতিমা (রা.)-এর বংশধরেরাই ইমামতের একমাত্র অধিকারী। এই মতানুযায়ী প্রত্যেক ইমাম তাঁর পরবর্তী উত্তরাধিকারী বা ইমাম মনোনীত করে যাবেন। শি' আতুল আলী বা আলীর দল থেকেই সংক্ষেপে "শি' আ" কথাটির প্রচলন। শিয়ারা ইমামের মধ্যে আল্লাহ্‌র নূরের অংশ আছে বলে বিশ্বাস করেন। শিয়াদের ধর্মবিশ্বাস এই ধরনের: ১. আল্লাহ্ তায়ালার ওপর বিশ্বাস, ২. অনাদি অসৃষ্ট কুরআনে বিশ্বাস এবং ৩. আল্লাহ্‌র বিশেষভাবে মনোনীত ও তাঁর সত্তার অংশীদার ইমামই রাসুল (সা.) মুক্তির একমাত্র পথপ্রদর্শক, পরবর্তীকালে এই বিশ্বাস। শিয়াদের মতে ইমাম দেহত্যাগ করেন, কিন্তু

তাঁর ইলাহি সত্তা পরবর্তী ইমামের দেহে সঞ্চালিত হয়। অবশ্য শিয়াদের মধ্যেও বিভিন্ন উপ-সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব রয়েছে।

শিল্পবিপ্লব (Industrial Revolution)

নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের প্রভাবে শিল্প-কারখানায় যে গুণগত পরিবর্তন দেশের আর্থ-সামাজিক সমৃদ্ধির পথ খুলে দেয় তার নাম শিল্প বিপ্লব। আঠারো শতকের শেষ দিকে ইংল্যান্ডে শিল্প বিপ্লবের সূচনা হয়। পরে তা ইউরোপের অন্যান্য দেশে এবং আমেরিকায় ছড়িয়ে পড়ে। বিজ্ঞানী জন কে উদ্ভাবিত মাকু, জেমস হারগ্রিভসের 'স্পিনিংজেনি' নামের চরকা, রিচার্ড আর্করাইটের ওয়াটার ফ্রেম, স্যামুয়ের ক্রম্পটমের মিউল, এডমান্ড কার্টরাইটের যন্ত্রচালিত তাঁত, হামফ্রি ডেভির সেফটি ল্যাম্প, জেমস ওয়াটের বাষ্পচালিত ইঞ্জিন এবং জর্জ স্টিফিনের রকেট নামের রেলগাড়ি এই বিপ্লবের ভিত্তি গড়ে তোলে। এর ফলে পণ্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে যেমন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল, তেমনি সমুদ্রপথের আবিষ্কারে বিশ্বজোড়া বাজার গড়ে উঠেছিল। অন্যদিকে এর প্রভাবে গ্রামীণ কুটিরশিল্প পিছু হটায় গ্রামের মানুষ দলে দলে শহরের কলকারখানায় এসে ভিড় করতে শুরু করে। শিল্প বিপ্লবেরর ফলে দেখা দেয় কারখানা-শ্রমিক, ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলন, শ্রমিক-মালিকের নতুন সম্পর্ক, জমিকে ঘিরে গড়ে ওঠা সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের ভাঙন। বিশ্বের অগ্রগতির ইতিহাসে এই বিপ্লবকে সবচেয়ে বড় মাইলফলক হিসেবে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ইংল্যান্ডের ইতিহাসে মোটামুটি ১৭৫০-১৮৫০ সাল এই সময়কালে কৃষি এবং বাণিজ্যিক ব্যবস্থা হতে আধুনিক শিল্পায়নের দিকে গতি শুরু হওয়ায় অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে বিস্ময়কর পরিবর্তন ঘটে। ১৫শ ও ১৬শ শতাব্দীর সমুদ্র যাত্রা বিশ্বব্যাপি বাণিজ্যের পথ খুলে দেয়। এরপর পুঁজিবাদের উদ্ভব, বাষ্পীয় ইঞ্জিনের আবিস্কার, কয়লার খনি আর ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহারের ফলে অনেক শিল্প শহর আর কারখানা গড়ে উঠে। ফ্রিডরিখ এঙ্গেলস, জন স্টুয়ার্ট মিল, কার্ল মার্কস প্রমুখের রচনায় এই অভিধার উল্লেখ দেখা যায়। শিল্পবিপ্লবের প্রধান অবদান হলো মানুষের উৎপাদন ক্ষমতার ওপর প্রকৃতির প্রভুত্ব থেকে মুক্তি। প্রাক-শিল্পবিপ্লব কালে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার অপরিণত অবস্থায় মানুষের উৎপাদন ক্ষমতা ছিল সীমিত। সে কারণে উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হলে দুর্ভিক্ষ, মহামারী প্রায়শই দেখা দিত। শিল্পবিপ্লব প্রকৃতির বন্ধন থেকে মানুষকে মুক্ত করে। শিল্পে প্রযুক্তিবিজ্ঞানের প্রয়োগের ফলে খনিজ দ্রব্য, লৌহ ও ইস্পাত ব্যবহারের মধ্য দিয়ে ভারীশিল্পের ফলে বুর্জোয়া শ্রেণির উদ্ভব ও আধিপত্য এবং সেইসঙ্গে পুঁজিবাদের শ্রীবৃদ্ধি সূচিত হয়। ভূমি, বাণিজ্য ও ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার সঙ্গে শিল্পজাত উৎপাদন পুঁজির অন্যতম প্রধান উৎস হয়ে দাঁড়ায়। শিল্প বিপ্লবের জন্য আদর্শ পূর্বশর্ত হলো: ১. পর্যাপ্ত পুঁজি ২. সামন্তবাদী ভূমি দাসত্বের কবলমুক্ত স্বাধীন শ্রমিক ৩. অভ্যন্তরীণ ও বিদেশি বাজার ৪. লোহা ও কযলা সম্পদ ৫. প্রয়োজনীয় প্রযুক্তি ও যন্ত্রপাতি এবং ৬. প্রয়োজনয়ি যানবহন ও যোগাযোগের সুবিধা।

শিল্পায়ন (Industrialisation)

শিল্পায়ন বলতে সামন্তব্যবস্থার উচ্ছেদসাধন করে সমগ্র দেশে শিল্পকারখানার বিস্তারসাধন এবং নতুন নতুন কলকারখানা গড়ে তুলে কৃষিপ্রধান দেশকে শিল্পপ্রধান দেশে পরিণত করাকে বোঝায়। বলাবাহুল্য শিল্পায়নই হল পুঁজিবাদ ও বুর্জোয়া বা পশ্চিমা গণতন্ত্রের মৌল নিয়ামক।

শীর্ষ বৈঠক (Summit Conference)

দুই বা ততোধিক দেশের কোনো বিরোধ ও দ্বন্দ্ব মীমাংসা বা কোনো যৌথ স্বার্থ সম্পর্কিত বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণের উদ্দেশে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের মধ্যে অনুষ্ঠিত বৈঠককেই বলা হয় শীর্ষবৈঠক বা শীর্ষ সম্মেলন। তাছাড়া আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক সংগঠনের কার্যক্রম পরিচালনা ও অগ্রগতি আলোচনার জন্য সদস্য দেশগুলো শীর্ষ বৈঠক করে থাকে, যেমন- জাতিসংঘ ও সার্ক শীর্ষ বৈঠক।

শুল্কমুক্ত বিশ্ব

২০০৫ সালে WTO চুক্তি বিশ্বব্যাপী কার্যকর হলে সমগ্র বিশ্ব পরিণত হবে 'শুল্কমুক্ত বিশ্বে'। 'শুল্কমুক্ত বিশ্ব' বলতে আমদানি-রপ্তানির ক্ষেত্রে কোনো শুল্কহার থাকবে না। আর থাকলেও তা শূন্যের কাছাকাছি একটি ন্যূনতম হারে নির্ধারণ করা হবে। বর্তমানে আমাদের রাজস্বের একটি বড় অংশ শুল্ক থেকে আসে। এমতাবস্থায় ২০০৫ সালকে সামনে রেখে অভ্যন্তরীণ সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে সরকারের পরোক্ষ করের ওপর থেকে নির্ভরশীলতা হ্রাস করে একটি দক্ষ ও কার্যকর প্রত্যক্ষ কর প্রশাসন গড়ে তোলা উচিত।

শেখ মুজিবুর রহমান (Sheikh Mujibur Rahman)

শেখ মুজিবুর রহমান (মার্চ ১৭, ১৯২০-আগস্ট ১৫, ১৯৭৫) বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান রাজনৈতিক নেতা, পূর্ব পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পুরো এবং বাংলাদেশের জাতির জনক হিসেবে বিবেচিত। তিনি মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী প্রতিষ্ঠিত আওয়ামী লীগের সভাপতি, বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি এবং পরবর্তীতে এদেশের প্রদানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। জনসাধারণের কাছে তিনি "শেখ মুজিব" নামে বেশি পরিচিত এবং তার উপাধি হচ্ছে বঙ্গবন্ধু। তার কন্যা শেখ হাসিনা আওয়ামী লীগের বর্তমান সভানেত্রী এবং বাংলাদেশের বর্তমান প্রধানমন্ত্রী।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তদানীন্তন ভারতীয় উপমহাদেশের বঙ্গ প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ মহকুমার পাটগাতি ইউনিয়নের টুঙ্গিপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবা শেখ লুৎফর রহমান গোপালগঞ্জ দায়রা আদালতের সেরেস্তাদার (যিনি আদালতের হিসাব সংরক্ষণ করেন) ছিলেন এবং মা'র নাম সায়েরা খাতুন। চার কন্যা এবং দুই পুত্রের সংসারে তিনি ছিলেন তৃতীয় সন্তান। তার বড় বোন ফাতেমা

বেগম, মেজ বোন আছিয়া বেগম, সেজ বোন হেলেন ও ছোট বোন লাইলী; তার ছোট ভাইয়ের নাম শেখ আবু নাসের। ১৯২৭ সালে শেখ মুজিব গিমাডাঙ্গা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়াশোনা শুরু করেন যখন তার বয়স সাত বছর। নয় বছর বয়সে তথা ১৯২৯ সালে গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুলে ভর্তি হন এবং এখানেই ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত পড়াশোনা করেন। ১৯৩৭ সালে গোপালগঞ্জ মাথুরানাথ ইনস্টিটিউট মিশন স্কুলে সপ্তম শ্রেণিতে ভর্তি হন। ১৯৩৪ থেকে চার বছর তিনি বিদ্যালয়ের পাঠ চালিয়ে যেতে পারেন নি। কারণ তার চোখে জটিল রোগের কারণে সার্জারি করাতে হয়েছিল এবং এ থেকে সম্পূর্ণ সেরে উঠতে বেশ সময় লেগেছিল। গোপালগঞ্জ মিশনারি স্কুল থেকে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন।

তাঁর রাজনৈতিক জীবন শুরু হয়েছিল ১৯৩৯ সালে মিশনারি স্কুলে পড়ার সময় থেকেই। এ বছর স্কুল পরিদর্শনে এসেছিলেন তদানীন্তন অবিভক্ত বাংলার মুখ্যমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক এবং পরবর্তিতে বাংলার প্রধানমন্ত্রী এবং এমনকি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালনকারী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। তিনি স্কুলের ছাদ সংস্কারের দাবির ওপর ভিত্তি করে একটি দল নিয়ে তাদের কাছে যান যার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন তিনি নিজেই। ১৯৪০ সালে নিখিল ভারত মুসলিম ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দেন। সেখানে তিনি এক বছর মেয়াদের জন্য নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৪২ সালে এন্ট্রান্স পাস করার পর কলকাতা ইসলামিয়া কলেজে (বর্তমান নাম মাওলানা আজাদ কলেজ) আইন পড়ার জন্য ভর্তি হন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এই কলেজটি তখন বেশ নামকরা ছিল। এই কলেজ থেকে সক্রিয়ভাবে ছাত্র রাজনীতি শুরু করেন। ১৯৪৩ সালে তিনি বেঙ্গল মুসলিম লীগে যোগ দেন এবং অগ্রণী কাশ্মিরী বংশদ্ভুত বাঙালি মুসলিম নেতা হুসেইন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর সান্নিধ্যে আসেন। এখানে তার ছাত্র আন্দোলনের মুখ্য বিষয় ছিল একটি পৃথক মুসলিম রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন। ১৯৪৩ সনে বঙ্গীয় মুসলিম লীগের কাউন্সিলর নির্বাচিত হন।

১৯৪৪ সালে বর্তমান বাংলাদেশের কুষ্টিয়ায় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র লীগের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে শেখ মুজিব বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তিনি কলকাতায় বসবাসকারী ফরিদপুরবাসীদের নিয়ে তৈরি "ফরিদপুর ডিস্ট্রিক্ট এসোসিয়েশনের" সেক্রেটারি মনোনীত হন। এর দুই বছর পর ইসলামিয়া কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের মহাসচিব নির্বাচিত হন। ১৯৪৭ সালে অর্থাৎ দেশবিভাগের বছর মুজিব কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ইসলামিয়া কলেজ থেকে বিএ ডিগ্রি লাভ করেন। ভারত ও পাকিস্তান পৃথক হওয়ার সময়ে কলকাতায় ভয়ানক হিন্দু-মুসলিম দাঙ্গা হয়। এসময় মুজিব মুসলিমদের রক্ষা এবং দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য সোহরাওয়ার্দীর সাথে বিভিন্ন রাজনৈতিক তৎপরতায় শরিক হন।

পাকিস্তান-ভারত পৃথক হয়ে যাওয়ার পর শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানে ফিরে এসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৪৮ সালের জানুয়ারি ৪তারিখে প্রতিষ্ঠা করেন পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ যার মাধ্যমে তিনি উক্ত প্রদেশের অন্যতম প্রধান

ছাত্রনেতায় পরিণত হন। এ সময় সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও জীবনযাত্রার নিম্নমানের উন্নয়নের জন্য এটিকেই একমাত্র সমাধান হিসেবে মনে করতে থাকেন।

পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির প্রাথমিক পর্যায়ে শেখ মুজিব ছিলেন ছাত্রনেতা এবং একই সাথে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে উচ্চপদে আসীন হয়েছিলেন। তার বড় গুণ ছিল তুখোড় বক্তৃতা প্রদানের ক্ষমতা। সমাজতন্ত্রের পক্ষসমর্থনকারী একজন অধিবক্তা হিসেবে তিনি তৎকালীন বঙ্গদেশ তথা পূর্ব পাকিস্তানের জনগোষ্ঠীর প্রতি সকল ধরনের বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেন। তার দাবিগুলোর মধ্যে প্রধান ছিল বর্ধিত প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন যার কারণে তিনি আইয়ুব খানের সামরিক শাসনের অন্যতম বিরোধী পক্ষে পরিণত হন। জনগণের স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে তিনি একসময় ছয় দফা স্বায়ত্তশাসন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন যাকে পশ্চিম পাকিস্তানে একটি বিচ্ছিন্নতাবাদী পরিকল্পনা হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছিল। ১৯৬৮ সালে ভারত সরকারের সাথে যোগসাজশ ও ষড়যন্ত্রের অভিযোগে তার বিচার হয় এবং পরবর্তীতে তিনি তিনি নির্দোষ প্রমাণিত হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে তার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ বিপুল বিজয় অর্জন করলেও তাকে সরকার গঠনের সুযোগ দেয়া হয়নি।

পাকিস্তানের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান এবং পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিবিদ জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে শেখ মুজিবের আলোচনা ভেঙে যাওয়ার পর ১৯৭১ সালের মার্চ ২৫ তারিখে পাকিস্তান সেনাবাহিনী পূর্ব পাকিস্তানের গণহত্যা পরিচালনা করে। একই রাতে তাকে গ্রেফতার করে পশ্চিম পাকিস্তানের নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরবর্তীতে রহিমুদ্দিন খান সামরিক আদালতে তাঁকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনী ও বাংলাদেশ-ভারত যৌথ বাহিনীর মধ্যে ৯ মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ শেষে বাংলাদেশ নামে একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। শেখ মুজিব বাংলাদেশের প্রথম রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব পালন শুরু করেন এবং পরবর্তীতে প্রধানমন্ত্রী হন। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাকে ভিত্তি করে সংবিধান প্রণয়ন এবং সে অনুযায়ী রাষ্ট্র চালনার চেষ্টা সত্ত্বেও তীব্র দারিদ্র্য এবং বেকারত্ব এবং সেই সাথে ব্যাপক দুর্নীতি মোকাবিলায় তিনি কঠিন সময় অতিবাহিত করেন। অচিরেই সৃষ্টি হওয়া রাজনৈতিক অস্থিরতা দমনের লক্ষ্যে ১৯৭৫ সালে তিনি সকল দলীয় রাজনীতি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকার ব্যবস্থায় ফিরে যান। এর সাত মাস পরে, ১৯৭১ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে একদল সামরিক কর্মকর্তার হাতে তিনি সপরিবারে নিহত হন।

শোষণ (Exploitation)

কোনো ব্যক্তি কর্তৃক অপর ব্যক্তির, কোনো শ্রেণি কর্তৃক অপর শ্রেণির অথবা কোনো জাতি কর্তৃক অপর জাতির শ্রমের ফল বা ধনসম্পদ আত্মসাৎ করাই হলো শোষণ। মার্কসীয় অর্থনীতি অনুযায়ী উৎপাদনের উপকরণসমূহের মালিক অর্থাৎ পুঁজিপতির দ্বারা শ্রমিকের উৎপন্ন উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত মূল্য আত্মসাৎই হলো। কেননা উদ্বৃত্ত শ্রম বা উদ্বৃত্ত

মূল্য পুঁজিপতি সৃষ্টি করে না, তা সৃষ্টি করে শ্রমিক। ব্যক্তিপর্যায়ে ছাড়াও শোষণমূলক রাষ্ট্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ কর আরোপসহ বিভিন্ন উপায়ে আপামর জনগণকে শোষণ করাতে পারে। এছাড়া শিল্পোন্নত ও ক্ষমতাবান জাতিও শোষণ করতে পারে দুর্বল ও পশ্চাৎপদ জাতিকে।

শ্বেতপত্র (White Papers)

সমকালীন অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সরকারি নীতির ওপর সরকার যে-লিখিত বিবৃতি প্রদান করে সেটাকেই মূলত শ্বেতপত্র বলা হয়। সাধারণত অর্থনৈতিক বা সামাজিক কোনো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আইন প্রয়নের পূর্বে জনমত যাচাইয়ের উদ্দেশে শ্বেতপত্র প্রকাশ করা হয়। সংসদে সরকার বিষয়বিশেষে যে মুদ্রিত বিবৃতি উপস্থাপন করে। ব্রিটেনে শ্বেতপত্রকে পার্লামেন্টারি পেপারস বলা হয় যা তিন ধরনের হতে পারে: কম্যান্ড পেপারস; . বিল-সংক্রান্ত বিবৃতি এবং হাউস অব কমনস কিংবা হাউস অব লর্ডস-এর নির্দেশক্রমে তাদের কারও কোনো কমিটির প্রকাশিত বিবৃতি। প্রথমটি, অর্থাৎ কম্যান্ড পেপারস রাজা অথবা রানির নির্দেশে ক্রমিক সংখ্যানুসারে প্রকাশিত হয়। তাতে সরকার-আনীত কোনো বিল সম্পর্কে সরকারি পন্থা ও নীতির ওপর বিবৃতি থাকে; এ ছাড়া কমিটি ও কমিশনের প্রতিবেদন 'ব্লু বুক' নামে কিংবা আলোচনার জন্য নানাবিধ সরকারি পরিকল্পনা 'গ্রীন পেপারস' নামে উপস্থাপিত হয়। ভারতে শ্বেতপত্রের মাধ্যমে কোনো বিল অথবা বিষয়ের ওপর সরকার-অনুসৃত পন্থা ও ব্যাখ্যা সহ অন্যান্য তথ্যাদি সংসদে উপন্যস্ত হয়। প্রায়ই সরকারের লেনদেনের ভারসম্য, জাতীয় আয়ব্যয়, অর্থনৈতিক জরিপ ইত্যাদির ওপর প্রয়োজনে এরূপ বিবৃতি বা শ্বেতপত্র প্রকাশিত হয়ে থাকে।

শ্রম (Labour)

সাধারণ অর্থে 'শ্রম' বলতে মানুষের শারীরিক পরিশ্রমকে বোঝায়। শ্রম বলতে উৎপাদন কার্যে নিয়োজিত মানুষের শারীরিক ও মানসিক সকল প্রচেষ্টাকেই বোঝায়। অর্থাৎ সকল প্রকার উৎপাদনশীল মানবিক প্রচেষ্টাকেই শ্রম বলা হয়। অবশ্য মানুষের সকল কার্যই শ্রম নয়। কোনরূপ অর্থ লাভের উদ্দেশ্য না করে কেবল আনন্দ লাভ বা অন্য কোন উদ্দেশে যে পরিশ্রম করা হয় তা শ্রম হিসেবে বিবেচিত হয় না। বস্তুত মানুষের যে পরিশ্রমের বিনিময়ে কোন কিছু অর্জন করা যায় তাকেই শ্রম বলা হয়। শ্রম উৎপাদনের একটি আদিম ও অপরিহার্য উপাদান। এটা ছাড়া কোন উৎপাদনই সম্ভবপর নয়। শারীরিক বা মানসিক যে-কোন প্রচেষ্টা যা দ্বারা অর্থ উপার্জন করা হয় তাকে শ্রম বলা হয়।

শ্রমবিভাগ (Division of Labour)

শ্রমবিভাগ হলো এক একটি দিকে এক-এক দল শ্রমিক নিয়োগ করার পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে একটি প্রক্রিয়ায় নিযুক্ত শ্রমিক অপর প্রক্রিয়া সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ থাকে এবং

শুধু নিজ প্রক্রিয়া সম্পর্কেই বিশেষ অভিজ্ঞতা অর্জন করে। যতই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে ততই শ্রমবিভাগ বৃদ্ধি পায়। যেমন, একটি মোটরগাড়ির সকল অংশই একই শ্রমিক তৈরি করে না। এক-একটি যন্ত্রাংশের জন্য এক-একটি বিভাগ থাকে, প্রত্যেক বিভাগের শ্রমিকরা শুধু তাদের বিভাগের যন্ত্রাংশ সম্পর্কেই দক্ষতা লাভ করে। পরে, বিভিন্ন বিভাগে উৎপাদিত যন্ত্রাংশকে অন্য বিভাগে সংযোজিত করা হয়, যে-বিভাগের শ্রমিকরা আবার সংযোজনপ্রক্রিয়া ছাড়া যন্ত্রাংশ নির্মাণপদ্ধতি সম্পর্কে তেমন কিছুই জানে না।

শ্রমিক দল (Labour Party)

১৯০০ সালে লেবার পার্টি নামে আনুষ্ঠানিকভাবে দলটি গঠিত হয়। তাতে যুক্তরাজ্যের সমস্ত গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী গোষ্ঠী, ট্রেড ইউনিয়ন, ফেবিয়ান সোসাইটি, ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি এবং বামপন্থী সমাজতন্ত্রী গণতান্ত্রিক ফেডারেশন যুক্ত হয়। তার অনুকরণে বা আদর্শে ব্রিটিশ সাম্রাজ্য পরে কমনওয়েলথভুক্ত দেশ এবং নরওয়ে, ইজরায়েল প্রভৃতি রাষ্ট্রে লেবার পার্টি গঠিত হয়। শ্রমিক দলগুলো সাধারণভাবে সমাজতন্ত্রী অর্থনীতি ও সংসদীয় গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে। তাদের কর্মসূচি মূলত নিয়মতান্ত্রিক, যুক্তরাজ্যে তারা রাজতন্ত্রের বিরোধী নয়। যুক্তরাজ্যে লেবার পার্টির জনপ্রিয়তা দুই বিশ্বযুদ্ধের মধ্যবর্তীকালে বৃদ্ধি পায়। শহরাঞ্চলের শ্রমিক শ্রেণি বিপুল সমর্থন অর্জন করে, শিল্পাঞ্চল সমূহে দল নির্বাচনে বেশি ভোট পায়। কুড়ির দশকে পার্টি দুবার (১৯২৪, ১৯২৯) মন্ত্রিসভা গঠন করে। ১৯৪৫ সালে বিরাট ভোটাধিক্যে দল ক্ষমতায় আসার পর নানাবিধ সমাজতন্ত্রী কর্মসূচি রূপায়ন লাভ করে। তার মধ্যে ছিল বিস্তর ভারীশিল্প ও জনপ্রতিষ্ঠানের রাষ্ট্রীয়করণ, জাতীয় স্বাস্থ্য প্রকল্প গ্রহণ, গৃহনির্মাণ কর্মসূচি এবং অসাম্য দূরীকরণের জন্য শুল্ক ও কর-ব্যবস্থার সংস্কার ইত্যাদি। এরপর দল ১৯৬৪ এবং ১৯৭৪ সালে পুনরায় ক্ষমতায় আসে। মূলত অর্থনৈতিক পরিস্থিতির অবনতির ফলে সমাজতন্ত্রী বিধিব্যবস্থারও অবসান সূচিত হয়। তাতে দলের ভেতরে চরমপন্থী গোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্যদের বিরোধ দেখা দেয়; ১৯৭৯ সালের নির্বাচনে দল পরাজিত হলে দলের গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন করা হয়, যাতে দলের সংসদীয় সদস্য সমিতির ওপর নির্বাচন কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থাকে।

ফলে দলের নরমপন্থী গোষ্ঠীর অনেকে নির্বাচনে অসুবিধা ঘটার আশঙ্কায় বামঘেঁষা (সমাজতন্ত্রী গণতন্ত্রী) নতুন একটি দল গঠন করেন। শ্রমিক দলের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হলো বিভিন্ন স্তরে সদস্য ট্রেড ইউনিয়ন সমূহের দলের মধ্যে অঙ্গীভূত হয়ে যাওয়া। তাতে দলের মোট আয় যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি একটি শক্তিশালী ও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্ধারণকারী গোষ্ঠী গড়ে উঠেছে যারা দলের বার্ষিক সম্মেলনে ভোট নিয়ন্ত্রণ ও নীতি স্থির করে।

শ্রমিকসংঘবাদ (Syndicalism)

এটি এক ধরনের সমাজতন্ত্র, যার লক্ষ্য হলো শিল্পবাণিজ্যের মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণে রাষ্ট্রের পরিবর্তে শ্রমিকদের অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা। অ্যানার্কিস্টদের (নৈরাজ্যবাদী) সঙ্গে সম্পর্ক থাকায় এই মতাদর্শ অনেক সময়ে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্ট নামেও অভিহিত। ১৯০৬ সালে আমিয়েন্স শহরে ফরাসি ট্রেড ইউনিয়ন ফেডারেশনের সম্মেলনে ইঞ্জিনিয়ারিং শ্রমিকদের প্রতিনিধি এম.লাতাপি সমাজতন্ত্র ও নৈরাজ্যবাদের মতাদর্শ ছেড়ে তৃতীয় বিকল্প হিসেবে ফরাসি এই শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন। কার্যত শব্দটি কেবল ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে আবদ্ধ নয়, তার পরিসর আরও বৃহত্তর।

সিন্ডিক্যালিজম বলতে শ্রমিক ফেডারেশনের সচিব ফার্নান্দ পেলুতিয়ের কর্তৃক প্রচারিত কিছু তত্ত্ব বোঝাত। সিন্ডিক্যালিস্ট মতবাদ কোনো সুস্পষ্ট রূপ নেয়নি; তত্ত্ব অপেক্ষা কাজের ওপর বেশি গুরুত্ব আরোপিত হতো।

সুসংবদ্ধ তাত্ত্বিক রূপ পরিগ্রহ না করলেও সিন্ডিক্যালিস্ট মতাদর্শে নিম্নলিখিত বিশ্বাসগুলো অল্পবিস্তর প্রাধান্য লাভ করেঃ ১. সুসংগঠিত ট্রেড ইউনিয়ন সমূহ ধর্মঘটি সংগ্রামের মাধ্যমে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির নিয়ন্ত্রণ ও রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন করে। নেতৃবর্গের কর্মকুশলতার ফলে রাষ্ট্রের প্রয়োজন থাকবে না এবং রাষ্ট্র অন্তর্হিত (wither) হবে। রাষ্ট্র পীড়নের যন্ত্র, তার সাহায্যে বুর্জোয়া আইন তৈরি হয়। ২. ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রকাঠামো, যেটা ক্রীতদাস ব্যবস্থার চেয়েও খারাপ, সেটা ভেঙে ফেলার জন্য জঙ্গি শ্রমিক সংগ্রাম ও ধর্মঘটের উপযোগী পুরাকথার (myth) সাহায্য গ্রহণ করে। ৩. প্রত্যক্ষ সংগ্রামে বিশ্বাস, যাতে ধর্মঘট ও অন্তর্ঘাত হবে প্রধান অস্ত্র।৪. উৎপাদন ও ভোক্তাদের সমবায় সংগঠনকে সমর্থন। ৫. কারও কারও মতে শ্রমিকদের স্বতন্ত্র সংস্কৃতি আছে- যেটা বুর্জোয়াদের সংস্কৃতি থেকে স্বতন্ত্র ও উন্নত। ৬. অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা ও রাজনৈতিক সমাজগঠনে একটা সমন্বয়কারী কেন্দ্রীয় সংস্থা (ফেডারেশন) থাকবে। ৭. জাতীয়তাবাদ ও এমন কী দেশভক্তির বর্জন; তার পরিবর্তে বৈশ্বিক ও আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাস। কর্মীদের সক্রিয় উদ্যম, জঙ্গি মনোভঙ্গী, নাশকতা এবং শিল্পসংগঠন ও সংগ্রামের মাধ্যমে রাষ্ট্র ও ধনতন্ত্রের উচ্ছেদ ছিল অগ্রগণ্য। সিন্ডিক্যালিস্টদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ও স্থায়ী সম্পর্ক না থাকলেও ইতালিতে জর্মেস সর্ল এই মতাদর্শের সাহায্যে সংখ্যালঘু ও সংগঠিত কর্মীদের কাছে বৈপ্লবিক সাধারণ ধর্মঘটের কল্পরূপ দেখিয়ে উদ্দীপিত করেন। ১৯১৪ সালের পূর্বাবধি বিভিন্ন দেশের শক্তিশালী ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনগুলোতে এই মতাদর্শ প্রভাব বিস্তার করে; বিশেষ করে যেসব দেশের রাজনৈতিক ধারায় নৈরাজ্যবাদী মতাদর্শ প্রবহমান ছিল। ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, আর্জেন্টিনা, মেক্সিকো প্রভৃতি দেশে সিন্ডিক্যালিস্টদের প্রভাব দেখা যেত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর আন্দোলনে ভাটা পড়ে, অনেকে কমিউনিস্ট হয়ে যায়। কালক্রমে উত্তর ইউরোপে সিন্ডিক্যালিজম-এর অর্থ হয়ে দাঁড়ায় সমাজতন্ত্রী কোনো দলের প্রয়োজনকে অস্বীকার করা। কারণ তাদের দৃষ্টিতে ওইসব দল আমলাতান্ত্রিক,

সংসদীয় রাজনীতিতে আবিল এবং বুর্জোয়া রাষ্ট্রের সঙ্গে আপসকামী। ধনতন্ত্রকে নাশ করতে হলে শ্রমিকশ্রেণিকে বরং শিল্পবাণিজ্যের সংগ্রামের ক্ষেত্রে মন দিতে হবে। এইসব যুক্তির সঙ্গে সিন্ডিক্যালিস্টরা অনেক সময় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের বিরোধিতা ক্ষমতা।

সিন্ডিক্যালিস্টদের সংকীর্ণ অর্থনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীর জন্য লেনিন তাদের সমালোচনা করতেন। বস্তুত বলশেভিজমের সঙ্গে বিশ্বমহাযুদ্ধের সময় লেনিনবাদী দলবিরোধী কার্যকলাপ ছেড়ে বলশেভিক বিপ্লবের দিকে ঝোঁকেন; যাঁরা বলশেভিকদের সঙ্গে কমিন্টার্ন রাজনীতিতে সায় দিতে পারেননি তাঁরা মস্কো-অনুসৃত শ্রমিক-রাষ্ট্র ও লেনিনবাদী দলনীতি নাকচ করেন। ভঙ্গ সিন্ডিক্যালিস্ট আন্দোলন ও সংগঠনের মধ্যে অ্যানার্কো-সিন্ডিক্যালিস্টদের প্রভাব বৃদ্ধি পায়। ১৯২২ সালে বিভিন্ন দেশের সিন্ডিক্যালিস্টরা কমিউনিস্ট ও সোসালিস্টদের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেছিয়ে পড়ে। ইদানীং কোনো কোনো দেশে শিল্প সংস্থায় শ্রমিকদের আধিপত্য ও বামপন্থী রাজনীতিতে পার্টি সদস্যদের বিকেন্দ্রিত আধিপত্য দেখা দিলেও সিন্ডিক্যালিজম কার্যত এক বর্জিত মতাদর্শে পর্যবসিত হয়েছে।

শ্রেণি (Class)

শ্রেণি হলো সমাজের সেই প্রধান অংশ, যারা ঐতিহাসিকভাবে নির্ধারিত একটি সামাজিক উৎপাদন ব্যবস্থায় স্ব-স্ব অবস্থান, উৎপাদননের উপায়সমূহের সাথে সম্পর্ক, সামাজিক সংগঠনে অবস্থান এবং সর্বোপরি সামাজিক সম্পদের মালিকানার বিচারে এক অন্যের থেকে পৃথক। জনসমাজে লোকের জন্মস্বত্ব, সুবিধাগত অসমতা ও অবস্থানের ভিত্তিতে বিভক্ত জনসমষ্টি, যেমন জাতি, গোষ্ঠী, পদ, সম্পত্তি, মানমর্যাদা, খেতাব। সমাজতত্ত্বেও দৃষ্টিতে দেশ অনুযায়ী লোকের আচরণ, কথাবার্তা, ভদ্রতা, শিক্ষা ও বিত্তগত শ্রেণিবিচার কিংবা ক্ষমতা, কর্তত্ব প্রভৃতি দ্বারা শ্রেণি নির্ণীত হয়ে থাকে।

উৎপাদন ব্যবস্থার মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের সঙ্গে শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সমাজে বিভিন্ন মানুষ নানান জীবিকায় যুক্ত থাকে। বিভিন্ন জনসমষ্টির মধ্যে জীবিকার সূত্রে পার্থক্য বিরাজ করে। এই জীবিকাগত পার্থক্য থের্কে অর্থনৈতিক শ্রেণিবিভাগ গড়ে ওঠে। শ্রেণি বলতে এক একটি বৃহৎ জনসমষ্টি বোঝায়, যাদের পার্থক্য ইতিহাস-নির্দিষ্ট সামাজিক উৎপাদন-ব্যবস্থায় তাদের উৎপাদন সম্পর্ক থেকে নির্ধারিত হয়, এবং সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থায় একটি জনসমষ্টি বা শ্রেণি অপর একটি শ্রেণিকে নিজেদের অবস্থানগত সুবিধার জোরে শোষণ করে (লেনিন)। তাই পরস্পরবিরোধী শ্রেণিভিত্তিক সমাজে শ্রেণিসংঘর্ষ অনিবার্য। সেজন্য মার্কসীয় দৃষ্টিতে সামন্ততন্ত্রী সমাজের মুখ্য যেসব শ্রেণি থাকে সেগুলো হলো দাস ও দাস মালিক, সম্ভ্রান্ত ও অন্ত্যজ, ভূস্বামী ও কৃষক এবং পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া বা পুঁজিপতি এবং সর্বহারা বা শ্রমিকশ্রেণি। এছাড়া পুঁজিবাদী সমাজে থাকে ক্ষুদে অর্থাৎ পেটি বুর্জোয়া শ্রেণি যাদের মধ্যে পড়ে কৃষক, মধ্যবিত্ত, কারিগর ইত্যাদি।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে অসাম্যের পেছনে একদিকে যেমন থাকে অর্থনৈতিক শ্রেণিবৈষম্য, অন্যদিকে পদমর্যাদা (ওয়েবার)। সামাজিক মান অনুযায়ী কোনো ও শ্রেণি ওঠানামা করে না, অর্থাৎ সেগুলোর অবস্থান অনড়। এ সম্পর্কে মতোভেদ আছে। তবে শ্রেণির অন্তর্গত কোনো ব্যক্তি তার নিজস্ব স্থান পরিবর্তনে সক্ষম। শ্রমদাতাদের যখন উৎপাদনের উপায়সমূহের ওপর মালিকানা বা কর্তৃত্ব থাকে না, তখনই শ্রেণির উদ্ভব ঘটে। স্বভাবতই উৎপাদননের উপায়সমূহের মালিকরা শ্রমের মালিকদের শোষণ করতে পারে এবং করেও। এজন্য প্রথমোক্ত দলকে বলা হয় শোষকশ্রেণি এবং শেষোক্ত দলকে বলা হয় শোষিত শ্রেণি। শ্রেণির স্বরূপ কি হবে তা, তা নির্ভর করে উৎপাদনের উপায়সমূহের ব্যক্তিমালিকানার ধরন এবং শ্রমের সামাজিক বিভাগের স্তরের ওপর। পুঁজিবাদী দার্শনিকরা অবশ্য শোষক ও শোষিত নামে দুই শ্রেণির অস্তিত্বের কথা স্বীকার করেন না।

শ্রেণি সংগ্রাম (Class struggle)

বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক সংগ্রামই হলো শ্রেণি সংগ্রাম। অন্য কথায় শোষক এবং শেষিতের স্বংগ্রামই শ্রেণিসংগ্রাম। বিভিন্ন শ্রেণির মধ্যে পরস্পরবিরোধী অর্থনৈতিক স্বার্থের সংঘাত থেকে নিরন্তর শ্রেণিসংগ্রাম উৎসারিত হয়। ওইসব স্বার্থের কোনো সমন্বয় সম্ভব নয়। শ্রেণি সংগ্রাম হলো ইতিহাসের চালিকাশক্তি যেটা সামাজিক অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান, আইন নৈতিকতা, ধর্ম ইত্যাদির আমূল পরিবর্তনের পেছনে কাজ করে। দাসসমাজ থেকে পুঁজিবাদী সমাজ পর্যন্ত প্রতিটি শোষণমূলক সমাজের ইতিহাসই মূলত শ্রেণিসংগ্রামের ইতিহাস। মার্কসীয় দৃষ্টিতে শ্রেণি সংগ্রাম একটি অচল অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ভাঙনের মুখে দাঁড় করিয়ে বিপ্লবের পথ প্রস্তুত করে, যার ফলেত সমগ্র সমাজব্যবস্থা পরিবর্তিত হয়ে উদীয়মান শ্রেণির আনুকূল্য করে। এই তত্ত্ব অনুযায়ী সামন্ততন্ত্রী ও বিশেষ করে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় শ্রেণিসংগ্রাম একটি বাস্তব অবস্থা বটে, কিন্তু অনেক সময়ে সেটা শ্রেণিচেতনার অভাবে প্রত্যক্ষগোচর হয় না; কারণ ক্ষমতাসীন বুর্জোয়া শ্রেণি প্রচলিত ব্যবস্থাকে চাতুরির সাহায্যে গ্রহণীয় করিয়ে নেয়। পুঁজিবাদী ও সর্বহারা শ্রেণি ট্রেড ইউনিয়নের মাধ্যমে স্থিতাবস্থা বজায় রাখে; কিন্তু প্রকৃত সংগ্রামী শ্রেণি-চেতনা না থাকায় তার বুদ্ধিজীবী শ্রেণির সহায়তার প্রয়োজন ঘটে। স্টালিনের মতে সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণিসংগ্রামকে বরং তীব্রতর করতে হয়। কিন্তু সংশোধনবাদীদের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আর শ্রেণিসংগ্রামের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই।

পুঁজিবাদী সমাজে উৎপাদন সম্পর্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সংগ্রামে বুর্জোয়া ও সর্বহারা, এই দুটির অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শ্রেণিস্বার্থ সদাই পরস্পরবিরোধী। পুঁজিবাদী বিভিন্ন দেশে সংগ্রামের মাধ্যমে শ্রমিক শ্রেণি বেতন বৃদ্ধি, কাজের সময় হ্রাস, সবেতন ছুটি, সংসদে প্রতিনিধিত্ব ইত্যাদির দাবি আদায়ে সমর্থ হয়েছে। শ্রেণি সংগ্রামের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্রী বিপ্লব সাধিত হবে।

শ্রেণিচ্যুতি (Class freed)

শ্রেণিচ্যুতি এর অর্থ হল উচ্চতর শ্রেণি থেকে নিম্নতর শ্রেণি নেমে আসা। কিন্তু মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে এর অর্থ ভিন্নতর। জন্মগতভাবে শোষকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত কোনো মানুষ যদি শোষকশ্রেণির স্বার্থ, মানসিকতা ও মূল্যবোধ ত্যাগ করে শোষিত মানুষের স্বার্থ, মানসিকতা ও মূল্যবোধের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে এবং শোষিত মানুষের স্বার্থে সমাজ ও রাষ্ট্র-পরিবর্তনের সংগ্রামে শামিল হয়, তখনই মানুষটি শ্রেণিচ্যুত হলো বলে বিবেচনা করা হয়। কোনো বুর্জোয়া বা পেটি বুর্জোয়া মামলায় বা অন্য কোনো উপায়ে সম্পদ হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে গেলেই তাকে শ্রেণিচ্যুত বলা যাবে না; কেননা মানুষটি সম্পদ হারালেও ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ ও শোষকের মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়নি। একজন ব্যক্তি তার সমস্ত আহরণ ও শোষকের মানসিকতা থেকে মুক্ত হয়ে যায়নি। একজন ব্যক্তি তার সমস্ত সম্পদ দরিদ্র মানুষের জন্য বিলিয়ে দিলেও তাকে শ্রেণিচ্যুত বলা যাবে না, যদি দেখা যায় যে অবস্থিত শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে তার কোনো ক্ষোভ বা আপত্তি নেই। বস্তুত শ্রেণিচ্যুত হওয়ার মূল কথা হচ্ছে মানসিকতার আমূল পরিবর্তন। এটি অত্যন্ত কঠিন ও দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ব্যাপার। দীর্ঘদিন সমাজ-পরিবর্তনের আন্দোলনে যুক্ত থেকেও, এমনকি বহু ত্যাগতিতিক্ষার পরও অনেকে মানসিকতার আমূল পরিবর্তন করতে পারে না বলেই দেখা যায় সুবিধাবাদ, সাংশোধনবাদ ইত্যাদি উপসর্গ (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

শ্রেণিদ্বন্দ্ব (Class Contradiction)

সমাজে বিভিন্ন ধরনের শ্রেণি বিদ্যমান থাকে। তাদের স্বার্থও বিভিন্ন ধরনের। বিরোধী স্বার্থসম্পন্ন শ্রেণিসমূহের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব হলো শ্রেণিদ্বন্দ্ব। তাছাড়া শ্রেণিবিভক্ত সমাজে শোষকশ্রেণি ও শোষিতশ্রেণির স্বার্থ থাকে পরস্পরবিরোধী। ফলে তাদের মধ্যে অবশ্যম্ভাবীরূপেই যে-স্বার্থের সংঘাত দেখা দেয়, তাকেই বলে শ্রেণিদ্বন্দ্ব (Class contradiction)। শ্রেণি বিভক্ত সমাজে দুই বিপরীত শ্রেণির সংঘাত বা দ্বন্দ্বের দিকটিই প্রধান, সমন্বয়ের দিকটি গৌণ। বস্তুবাদীরা বিশ্বাস করেন যে, এই শ্রেণিদ্বন্দ্বই বিপ্লব, তথা সমাজ পরিবর্তনের চালিকাশক্তি। দাসসমাজে দাস মালিক ও ক্রীতদাসদের দ্বন্দ্ব, সামন্তসমাজে সামন্ত প্রভু ও ভূমিদাসদের দ্বন্দ্ব এবং পুঁজিবাদী সমাজে বুর্জোয়া ও সর্বহারাদের দ্বন্দ্বই হল শ্রেণিদ্বন্দ্বের প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বস্তুত শোষণমূলক সমাজ পরিবর্তনের মূলেই হল শ্রেণি দ্বন্দ্ব। পুঁজিবাদী সমাজে সংগ্রাম মূলত বুর্জোয়াশ্রেণির সঙ্গে সর্বহারা শ্রেণির। রাষ্ট্রক্ষমতা থেকে বুর্জোয়াশ্রেণীকে উৎখাত করে সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের মাধ্যমেই পুঁজিবাদী সমাজ তথা শ্রেণিবিভক্ত সমাজব্যবস্থার অবসান ঘটতে পারে। সর্বহারা শ্রেণি তথা সর্বহারা শ্রেণির পার্টি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণিঅস্তিত্ব লোপ পাওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেলেও, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত শ্রেণির অস্তিত্ব টিকে থাকে বিধায় শ্রেণিদ্বন্দ্বও বলবৎ থাকে। তবে শোষকশ্রেণি ক্ষমতায়

না থাকায় এ-পর্যায়ে শ্রেণিদ্বন্দ্বের রূপও পালটায়। স্ট্যালিনের মতে সর্বহারা শ্রেণি কর্তৃক রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পর শ্রেণিদ্বন্দ্ব শ্রেণিসংগ্রামে রূপ নেয়। কিন্তু সংশোধনবাদীদের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর আর শ্রেণিসংগ্রামের কোনো প্রয়োজনীয়তা নেই। বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে শ্রেণিদ্বন্দ্বের রূপের ক্ষেত্রে নবতর বৈশিষ্ট্য সংযোজিত হয়েছে। কারণ উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহ শ্রেণিসংগ্রামকে ঠেকানোর অন্যতম পন্থা হিসাবে তাদের স্ব স্ব দেশের শ্রমিকশ্রেণীকে ন্যূনতম জীবনমানের নিশ্চয়তাতো দিচ্ছেই, অনেকক্ষেত্রে দিচ্ছে বিলাসের সুযোগও। ফলে, এই শ্রমিকদের আচরণের ক্ষেত্রে দেখা দিয়েছে ভিন্নতা। অন্যদিকে, অনুন্নত দেশসমূহে, যাদের প্রায় সকলেই কোনো-না-কোনো উপনিবেশবাদী শক্তির উপনিবেশ ছিল সেসব দেশেও পুঁজির বিকাশের কালে পুঁজির বিকাশ ঘটেনি বলে এবং বর্তমান বিশ্বপরিস্থিতিতে এ-সমস্ত দেশে একেবারে স্বাধীন পুঁজির বিকাশ ঘটা আর সম্ভবপর নয় বলে, এসব দেশে প্রায়শই শক্তিশালী জাতীয় বুর্জোয়াশ্রেণীর অস্তিত্ব তেমন একটা দেখা যায় না। দ্বিতীয়ত, সমাজ সুস্পষ্টরূপে দুটি চূড়ান্ত শ্রেণিতে বিভক্ত নয় বরং বিশাল ও শক্তিশালী মধ্যবর্তী স্তর বিদ্যমান বিধায় এখানে শ্রেণিদ্বন্দ্ব ধ্রুপদীভাবে তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে না। ফলে বর্তমানে বিশ্বে রুশ বা চীনা ধরনের শ্রেণিদ্বন্দ্ব ও বিপ্লব বলতে গেলে অসম্ভব।

সংক্ষিপ্ত পার্লামেন্ট (Short Parliament)

ইংল্যান্ডের একটি পার্লামেন্ট ইতিহাসে 'শর্ট পার্লামেন্ট' বলে পরিচিত। ১৬৪০ সালের ১৩ এপ্রিল থেকে ৫ মে পর্যন্ত, মাত্র তিন সপ্তাহ, এ পার্লামেন্টের বৈঠক চলে। রাজা প্রথম চার্লস (১৬০০-৪৯) এ পার্লামেন্ট আহ্বান করেন। পরে পার্লামেন্টের সঙ্গে রাজার মতবিরোধ দেখা দেয়। রাজা তখন স্কটল্যান্ডের সঙ্গে পরিচালিত যুদ্ধের (এ যুদ্ধ 'বিশপ-ওয়ার' নামে পরিচিত) জন্য তাৎক্ষণিকভাবে তহবিল অনুমোদন করতে পার্লামেন্টকে চাপ দেন। জন পিমের (John Pym, ১৫৮৩-১৬৪৩) নেতৃত্বে পার্লামেন্ট যুদ্ধ ব্যয়ের চেয়ে জনগণের অভাব-অভিযোগ মেটানোর কাজে অগ্রাধিকার দেয়ার পক্ষে মত দেয়। মতভিন্নতা চরমে উঠলে রাজা পার্লামেন্ট বাতিল করে দেন। (সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, পার্লামেন্টারি শব্দকোষ, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

সংক্ষিপ্ত ব্যালট (Short Ballot)

একটি নির্বাচন পদ্ধতি। আবার নির্বাচনে ব্যবহৃত এক ধরনের ব্যালট পেপারও। যে নির্বাচনে ভোটারদের কমসংখ্যক প্রার্থী নির্বাচন করতে হয় তাকে সংক্ষিপ্ত ব্যালট ব্যবস্থা বলে। সংক্ষিপ্ত ব্যালটের ধারণাটি দীর্ঘ ব্যালট ব্যবস্থার বিপরীত। যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিতে সংক্ষিপ্ত ব্যালট ও দীর্ঘ ব্যালট অনেক পরিচিত ও বহুল ব্যবহৃত ধারণা। যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় অনেক সরকারি পদাধিকারীকে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে নির্বাচন করতে হয়। কোনো কোনো রাজ্যে অনেক কর্তাব্যক্তিকে এক সঙ্গে নির্বাচন করতে হয়। এক্ষেত্রে ব্যালট পেপার অনেক বড় হয়। এর বিপরীতে কোনো

কোনো অঙ্গরাজ্যে স্থানীয় সরকারের কমসংখ্যাক পদাধিকারী নির্বাচিত করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে ব্যালট পেপার তুলনমূলকভাবে ছোট হয়। এ ছোট ব্যালট পেপারকে সংক্ষিপ্ত ব্যালট বা Short Ballot বলে। জাতীয় নির্বাচনের ব্যালট সংক্ষিপ্তই হয়। সংক্ষিপ্ত ব্যালট হলে ভোটারদের পক্ষে অধিকতর মনোযোগ দিয়ে কর্মকর্তা নির্বাচন করার সুযোগ থাকে। দক্ষ, যোগ্য ও অভিজ্ঞ লোক নির্বাচিত হন।

সংক্ষিপ্ততম পার্লামেন্ট (Shortest Parliament)

পার্লামেন্টারি ইতিহাসের সংক্ষিপ্ততম পার্লামেন্ট। ইংল্যান্ডে রাজা দ্বিতীয় রিচার্ডের (১৩৬৭-১৪০০) আমলের একটি পার্লামেন্ট সংক্ষিপ্ততম পার্লামেন্ট বলে ইতিহাস পরিচিত। ১৩৯৯ সালের ৩০ সেপ্টেম্বর এ পার্লামেন্টের অধিবেশন বসে। মাত্র একদিন ছিল এর স্থায়িত্বকাল। পার্লামেন্ট রাজাকে সিংহাসনচ্যুত করে। বাংলাদেশের সংক্ষিপ্ততম পার্লামেন্ট হলো ষষ্ঠ পার্লামেন্ট। এ পার্লামেন্টের কার্যদিবস ছিল মাত্র ৪ দিন। পার্লামেন্টের প্রথম বৈঠক বসে ১৯ মার্চ ১৯৯৬ এবং শেষ বৈঠক হয় ২৫ মার্চ ১৯৯৬।

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার (Tyranny of the Majority)

সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচার কথাটি জন স্টুয়ার্ট মিল তাঁর 'অন লিবার্টি' নামক প্রবন্ধে ব্যবহার করেন। তাঁর শঙ্কা ছিল যে অশিক্ষিত অথচ সংখ্যাগরিষ্ঠ মেহনতি মানুষের ইচ্ছা ধবংসাত্মক হতে পারে। কেননা তারা স্বভাবগতভাবেই অসহিষ্ণু। ফলে তিনি কিছুটা নিয়ন্ত্রিত গণতন্ত্রে (Restricted Democracy) বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে, কোনো দুর্নীতিবাজ মানুষ ক্ষেপানো প্রতিভাবান নেতা (talented but Corrupt demagoguc) অনায়াসেই গলাবাজির মাধ্যমে অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগণকে খেপিয়ে দিয়ে যেকোনো অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারেন। মিলের বিবেচনায় একজন উন্নত রুচি ও কৃষ্টিসম্মন্ন ব্যক্তি এই ধরনের ব্যক্তি থেকে নিরানব্বই জন ব্যক্তির চেয়ে শ্রেষ্ঠতর। এমন যদি দেখা যায় সমস্ত মানুষ একদিকে আর মাত্র একজন মানুষ তাঁর চিন্তা ও ভাবনার উৎকর্ষে অন্যদিকে অবস্থান করেছেন তবে এই একজন মানুষকে, তার স্বাধীন চিন্তা-ভাবনাকে স্তব্ধ করার কোনো অধিকার সমাজ বা সরকারের নেই। এই মতবাদে বিশ্বাসী কেউ-কেউ আধুনিক জ্ঞানসম্পন্ন একনায়ক (enlightened disport)-কে সংখ্যাগরিষ্ঠের স্বৈরাচারের চেয়ে কল্যাণকর বলে বিবেচনা করতেন।

সংখ্যালঘিষ্ঠ সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব (Representation of the Minority)

গণতান্ত্রিক শাসনের অর্থই হলো জনগণের শাসন। অ্যারিস্টটল বলেন, "একটি গণতান্ত্রিক শাসনে সার্বভৌম ক্ষমতা সমগ্র জনগণের হাতে ন্যস্ত থাকে।" জনগণকে বাদ দিয়ে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা আশা করা যায় না। জনমতই হলো গণতান্ত্রিক শাসনের মূল ভিত্তি। রাষ্ট্রে বহু ভাষাভাষী, ধর্ম, বর্ণ ও মতামতের লোক বাস করতে পারে। সমগ্র জনসমষ্টিকে প্রধানত দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যথা; সংখ্যাগরিষ্ঠ ও সংখ্যালঘিষ্ঠ।

রাষ্ট্রে বিভিন্ন ধরনের সংখ্যালঘু সম্প্রদায় থাকতে পারে। গণতন্ত্র যেহেতু জনগণের শাসন, সেহেতু তাদের বাদ দিয়ে সেটা পরিচালিত হতে পারে না। এদের মতামতেরও গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মানতে হবে কিন্তু সংখ্যালঘুদের মতামতকে শ্রদ্ধা প্রদর্শন আবশ্যক। গণতন্ত্রের মূল ভিত্তি সুদৃঢ় হয় সমঝোতামূলক মনমানসিকতার ওপর। জনমতের গুরুত্ব প্রদান করতে হলে এদের মতামতেরও তাৎপর্য অবশ্যই বিবেচনা করতে হবে। সংখ্যালঘুর মতামত গ্রহণীয় হলে সেটাই জাতীয় নীতি নির্ধারণে বাস্তবায়িত করতে হবে। দেশের আইনসভায় সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা বাঞ্ছনীয়। জে.এস.এস মিলের মতে, প্রকৃত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় প্রত্যেক গ্রুপের লোকের আনুপাতিক হারে প্রতিনিধিত্ব থাকতে হবে। আজকাল যেসব রাষ্ট্র আধুনিক গণতান্ত্রিক বলে বিবেচ্য, সেসব দেশেও এক সময় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর নির্মম অত্যাচার চালান হত। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে কিছুদিন পূর্বে নিগ্রোদের অনেক অধিকার থেকে বঞ্চিত রাখা হত। এসব কারণে দুঃখ প্রকাশ করে অ্যাডমান্ড বার্ক এক সময়ে বলেছিলেন, "এ বিষয়ে আমি নিশ্চিত যে, গণতান্ত্রিক শাসনে নাগরিকদের সংখ্যাগুরু সম্প্রদায় সংখ্যালঘুর ওপর চরমতম নিষ্ঠুর উৎপীড়ন চালাতে সক্ষম।" দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে সুসম্পর্ক বিধান করা আবশ্যক। টমাস রো বলেন, "গণতন্ত্র হলো স্বাধীনতা ও সাম্যের এবং ব্যক্তিমূল্য ও সমাজের চাহিদার সমন্বয়।" প্রতিনিধিত্ব না থাকলে তাদের কথা আইনসভায় উত্থাপিত হতে পারে না। তাই সকল শ্রেণির সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সুযোগ দিতে হবে, যেন তারা আইনসভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করতে পারে। অন্যথায় গণতান্ত্রিক শাসন কায়েম হতে পারে না। সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্বের বিধান করতে না পারলে ওইসব সম্প্রদায়ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠিত হবে ও জনগণের মধ্যে ক্রমশ অসন্তোষ পুঞ্জিভূত হতে থাকবে এবং তা একদিন বিপ্লবের আকারে প্রকাশিত হবে। এটা গণতন্ত্রের জন্য মারাত্মক হুমকি।

সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধি প্রেরণের কয়েকটি পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। তার মধ্যে (১) সমানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব (Proportional Representation), (২) সীমাবদ্ধ নির্বাচনাধিকার (Limited Voting System), (৩) পুঞ্জীভূত ভোটদান (Cumulative Vote), (৫) আসন সংরক্ষণ (Reservation of Seat), (৬) সাম্প্রদায়িক নির্বাচকমণ্ডলী এবং (৭)দ্বিতীয় ব্যালট পদ্ধতি (Second Ballot System) প্রধান।

সংখ্যালঘু (Minority)

সাধারণত সংখ্যার সল্পতাকে সংখ্যালঘু বলা যেতে পারে। মোট জনসংখ্যার দিক থেকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, ভোটদাতা ইত্যাদির ভিত্তিতে ক্ষুদ্রতর অংশ সংখ্যালঘু গোষ্ঠী বা সম্প্রদায় হিসেবে বিবেচিত হয়। সমাজতান্ত্রিক দৃষ্টিতে সংখ্যালঘুর সংজ্ঞা হলো দৈহিক, সাংস্কৃতিক বা ধর্মীয় লক্ষণ অনুযায়ী কোনো সংখ্যাল্প গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠদের বিভেদের আচরণ এবং সেইসব গোষ্ঠী ও সম্প্রদায়ভূক্ত ব্যক্তিদের মনে

সমাজে নিজেদের যৌথ বৈষম্যের শিকার হিসেবে হীনমন্যতা বোধ এবং সেই কারণে তাদের মধ্যে আত্মস্বাতন্ত্র্যের চেতনা ও বিচ্ছিন্নতার মতিগতি।

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অথবা নৃতাত্ত্বিক জাতি বিচারে সংখ্যালঘুরা একটি শ্রেণিও হতে পারে। রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণে সংখ্যালঘুরা স্বীকৃতি পায় যখন ১. তারা স্বতন্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বতন্ত্র সংগঠনের মাধ্যমে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য প্রকাশ করে এবং কালক্রমে সেটা সংখ্যাগরিষ্ঠরা মেনেও নেয়; ২. তারা নিজেদের স্বতন্ত্র সামাজিক একরূপতা (identity) পৃথক আচরণের মধ্য দিয়ে লোকচক্ষে তুলে ধরে। বস্তুত একটি অপরের পরিপূরক। এই সামাজিক বিভাজনের মূলে থাকে ভাষা, ধর্ম, জনজাতি, অনুন্নত আদিবাসী অথবা অনুরূপ কোনো উপাদান। বিভাজন স্পষ্ট হয়ে ওঠে স্বতন্ত্র জাতিগত আবেগে।

সংঘ (Association)

সামাজিক জীবনের সংগঠনকে সংঘ বলা যায়। এর কিছু সাধারণ স্বার্থ থাকে এবং সংঘের মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন করা হয়। ম্যাকাইভারের কথায়, An association is an organisation of social beings for the pursuit of some common interest or interests. অনেকে সংঘকে একটি গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন, যার সদস্যগণ বিশেষ স্বার্থের গ্রন্থিতে একত্রিত হয়। সংঘ হলো একদল জনসমষ্টি, যারা কিছু সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে একত্রিত এবং একমতে কিছু নিয়ম-কানুন অনুসারে পরিচালিত হয়ে একে অপরকে সহযোগিতা করে। ম্যাকাইভার বলেন, "সংঘ স্বেচ্ছায় গড়ে তোলা এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যা কোনো সমষ্টিগত উদ্দেশ্য সাধনে নিয়োজিত থাকে এবং যাতে সদস্যবৃন্দ অংশগ্রহণ করে" (Association is an organization, deliberately formed for the collective pursuit of some interests which the members of it share)।

সাধারণ কোনো লক্ষ্যকে সামনে রেখে একদল লোক সংঘবদ্ধ বা সংগঠিত হয়ে সাধারণ স্বার্থ সংরক্ষণে একত্রিত হলে তাকে সংঘ বলা যায়। মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে লক্ষ্য অর্জন করতে পারে। অগবান ও নিমকফের মতে, "সংঘ হলো সে সব সংগঠন যা অপেক্ষাকৃত বিশিষ্ট উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে গঠিত হয় এবং যা যাবতীয় সামাজিক ব্যাপারে সুপরিচালিত রীতি বা ব্যবস্থার অংশ।" জিসবার্ট বলেন, "সংঘ হলো একটি মানবিক গোষ্ঠী, যা কোনো বিশেষ বা কতগুলো নির্দিষ্ট বা সীমাবদ্ধ উদ্দেশ্য সাধনে একতাবদ্ধ হয়েছে।" সংঘের সদস্য সকলে সকলের কর্তব্য ও অধিকার সম্পর্কে সজাগ থাকে। সদস্যদের মধ্যে সাধারণ উদ্দেশ্য থাকতে হবে এবং তা বাস্তবায়নের জন্য ব্যবস্থা নিবে।

সংবিধান সংশোধন বিল (Constitutional Amendment Bill)

বাংলাদেশের সংবিধান সংশোধনের জন্য আনীত বিলকে প্রকৃত অর্থে সাধারণ বিলের পর্যায়ে ফেলা যাবে না। এটাকে বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা উচিত। কারণ একটি

সাধারণ বিল পাশ করতে উপস্থিত ও ভোটদানকারী সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের দরকার হয়। কিন্তু সংবিধান সংশোধনী বিল পাশ হতে সংসদের মোট সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ ভোটের প্রয়োজন হয়। এমনকি, কিছু ক্ষেত্রে আবার গণভোটেরও বিধান আছে। অন্যান্য দিক দিয়ে সাধারণ বিলের সাথে এর কোনো পার্থক্য নেই।

সংবিধান, ১৯৫৬ (Constitution, 1956)

সমগ্র পকিস্তানের শাসনতন্ত্র রচনার প্রথম পদক্ষেপ ছিল ১৯৫৬ সালের সংবিধান। ১৯৫৬ সালের ৯ জানুয়ারি তৎকালীন আইনমন্ত্রী আই আই চন্ডিগড় 'পাকিস্তান শাসনতন্ত্র বিল' উত্থাপন করেন। কয়েকটি সংশাধনীর পর বিলটি ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত হয়। অতঃপর একই সালের ২৩ মার্চ বিলটি পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান বা ১৯৫৬ সালের ইসলামী প্রজাতন্ত্র সংবিধান হিসেবে প্রবর্তিত হয়। কিন্তু মাত্র দুবছর পর ১৯৫৮ সালের ৮ অক্টোবর এই সংবিধান বাতিল করে পাকিস্তানের সামরিক শাসসন জারি করায়। সংবিধানটির বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হলো ঃ ১. প্রথম ইসলামী সংবিধান, ২. বৃহত্তম লিখিত সংবিধান, ৩. মৌলিক অধিকার সংরক্ষণ, ৪.যুক্তরাষ্ট্রীয় শাসন ব্যবস্থা, ৫. সংসদীয় সরকার ব্যবস্থা, ৬. গণতান্ত্রিক শাসন ৭. এক কক্ষবিশিষ্ট আইন পরিষদ, ৮, বিচার বিভাগের স্বতন্ত্রীকরণ, ৯ শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার ১০. প্রজাতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ইত্যাদি। অবশ্য ১৯৫৬ সালের সংবিধান শেষ পর্যন্ত কার্যকরী হয়নি। কারণ এই সংবিধান অনুযায়ী ১৯৫৯ সালে পাকিস্তানে জাতীয় পরিষদে নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। অথচ ১৯৫৮ সালেই সংবধানকে বাতিল ঘোষণা করে দেশব্যাপী সামরিক শাসন জারি করা হয়। পরবর্তীতে ১৯৬২ সালে পুনরায় সংবিধান রচিত হয় এবং এ সংবিধান অনুযায়ীই পাকিস্তান শাসিত হতে থাকে।

সংবিধি (Statute)

এক ধরনের বিধি বা আইন। বিশেষত আইনসভা কর্তৃক লিখিতভাবে নথিভূক্ত আইন। সংবিধি ও প্রচলিত আইন এক নয়। তবে প্রচলিত আইনের মধ্যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ও প্রয়োজনসূত্রে সংবিধি প্রবেশ করে এবং সংবিধির বিস্তার ঘটে। সংবিধি লিখিত হয়। তবে অ্যাংলো-স্যাক্সন আইনে কিছু কিছু কাব্যের আকারে অথবা মৌখিকভাবে প্রবাহমান রীতিনীতি লিপিবদ্ধ থাকে; এবং প্রয়োজনে সেগুলো পঠিত অথবা আবৃত্তি করা হয়। তবে বিরোধের সময়ে ইংলান্ডে মামলায় প্রচলিত কিংবা অলিখিত আইন অপেক্ষা লিখিত আইন বেশি প্রাধান্য পায়।

সংযুক্ত ভোট দান (Cumulative Voting)

সংযুক্ত ভোটদান প্রথা বা ভোটদানের প্রথা বিশেষ। বিধানসভায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নির্বাচনের জন্য ভোট দানের এক প্রকার পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অনুসারে, যত সংখ্যক

নির্বাচন-প্রার্থী থাকে ভোটদাতা তত সংখ্যক ভোট দিতে পারে এবং কোনো ভোট প্রার্থীকে ভোটদাতা তার প্রাপ্য সকল ভোট অথবা তার প্রাপ্য ভোটের যতটা ইচ্ছা দিতে পারে।

সংশোধনবাদ (Revisionism)

সংশোধনবাদ হল শ্রমিকশ্রেণির বিপ্লবী আন্দোলনের নামে মার্কসবাদবিরোধী একটি সুবিধাবাদী মতবাদ। সংশোধনবাদ মার্কসবাদের মূলতত্ত্বকে সংশোধন করে। সংশোধনবাদীরা 'বিপ্লব'-এর বদলে 'বিবর্তন' এবং 'শ্রেণিসংগ্রাম'-এর বদলে 'শ্রেণি সমন্বয়'-এর তত্ত্ব প্রদান করে। লেনিনের মতে, সংশোধনবাদীরা মার্কসবাদকে বুর্জোয়া স্বার্থে ব্যবহার করে এবং শ্রমিকশ্রেণির আন্দোলনে বুর্জোয়া দর্শনের অনুপ্রবেশ ঘটায়। সংশোধনবাদীরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির নামে মার্কসবাদ-লেনিনবাদের বিপ্লবী চরিত্রকে নিষ্প্রভ করে, আন্তর্জাতিকতার বদলে জাতীয়তাকে প্রাধান্য দেয় এবং দ্বান্দ্বিক ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদকেও ঢেলে সাজাতে চায়। তারা আরও মনে করে যে পুঁজিবাদ সমাজতন্ত্রে বিবর্তিত হওয়া সম্ভবপর। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এই সংশোধনবাদের উদ্ভব ঘটে। বিংশ শতাব্দীতে বার্নস্টাইন, কাউটস্কি প্রমুখকে সংশোধবাদের ধারক বলে গণ্য করা হয়। অধুনা অবস্থার বিচিত্র পরিবর্তন ঘটেছে। রুশবিরোধীরা স্ট্যালিন পরবর্তী রাশিয়া ও তার সমর্থকদেরও সংশোধনবাদী বলে গণ্য করত। চীনপন্থীরা বলত যে সোভিয়েত ইউনিয়ন সংশোধনবাদের চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে সামাজিক সাম্রাজ্যবাদে পরিণত করেছে। অপরপক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার সমর্থকদের মতে রাশিয়া নয়, বরং চীনই সংশোধনবাদের পথ গ্রহণ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদকে শক্তিশালী ও দীর্ঘায়ু করছিল এবং বিভিন্ন দেশে ফ্যাসিবাদী ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে মদদ দিয়ে শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলনকেই নস্যাৎ করে দিচ্ছিল। অনেকে মনে করেন যে, কিছু কিছু অতিশুদ্ধাচারী ব্যক্ত বা শিবির মার্কসবাদকে ধর্মীয় অনুশাসনের মতো অনড় শাশ্বত বরে ধরে নেন, মার্কসবাদ যে 'বাস্তব অবস্থার বাস্তব বিশ্লেষণ, তা বিস্মৃত হন, নবতর পরিস্থিতি ও সমীকরণকে ধর্তব্য বলে গণ্য করেন না এবং এভাবে কার্যত মার্কসবাদের নামে মার্কসবাদবিরোধী গোঁড়ামিবাদেরই শিকার হন। অবশ্য বর্তমান বিশ্বের মার্কস-এঙ্গেলস, লেনিন-স্ট্যালিন, মাও য়ের তত্ত্ব বা দর্শনের হুবহু অনুসারী প্রায় কেউই নেই, এমনকি রাশিয়া বা চীনের কমিউনিস্ট পার্টিও নয়।

সংশোধনী (Amendment)

কোনো আইন, বিধান বা সংবিধানের সংশোধন, পরিবর্তন কিংবা সংস্কারের সাথে সম্পর্কিত। সংশোধনী বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হবার পর আইনে পরিণত হওয়ার আগে বিভিন্ন পর্যায়ে তা সংশোধিত হতে পারে, আলোচিত, সমালোচিত হতে পারে। আইন সংশোধন করতে হলে সংশোধনীর চেয়ে পার্লামেন্টে বিল উপস্থাপন করতে হয়।

সংবিধান সংশোধনের নিয়ম বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন রকম। যেসব দেশের সংবিধান সুপরিবর্তনীয়, সেগুলো একধরনের উপায়ে সংশোধন হয়, আবার যেখানে দুস্পরিবর্তনীয়, সেখানে একভাবে হয়ে থাকে। তবে রাষ্ট্রভেদে সেটিও আলাদা আলাদা হয়ে থাকে। সাধারণত সংবিধান সংশোধনী প্রক্রিয়াটি অপেক্ষাকৃত জটিল। বাংলাদেশের সংবিধানে এখন পর্যন্ত ১৬টি সংশোধনী আনা হয়েছে।

আইনবিদ (Attorney)

অ্যাটর্নি বলতে এমন একজন ব্যক্তিকে বুঝায় যাঁকে কিছু করতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে, অন্যের পক্ষে কাজ করতে বলা হয়েছে। শেষ পর্যন্ত attorney-র অর্থ দাঁড়ায় legal agent- আইন উপদেষ্টা, যিনি আইন বিষয়ে অভিজ্ঞ। আইনবিদ (lawyer), মোক্তার। অ্যাটর্নি মানুষকে আইন বিষয়ে উপদেশ দেন। কোর্টে মক্কেলের প্রতিনিধিত্ব করেন। অ্যাটর্নি থেকে 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' (Power of Attorney) ধারণার উদ্ভব। 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' অর্থ মোক্তারনামা। এটি লিখিত দলিল, যা দ্বারা একজন ব্যক্তি অন্যকে তাঁর পক্ষে কাজ করার ক্ষমতা দেন। যাঁকে ক্ষমতা দেয়া হয় তাঁকে অ্যাটর্নি বলে। ক্ষমতা প্রদানকারী ব্যক্তি অ্যাটর্নিকে তাঁর সকল সম্পত্তি বা নির্দিষ্ট কোনো সম্পত্তি বা কোনো মামলা পরিচালনার ক্ষমতা দিতে পারেন। 'পাওয়ার অব অ্যাটর্নি' আদালত, জজ বা সরকারের কোনো প্রতিনিধি বা কর্তৃপক্ষের সামনে আইনানুযী সম্পাদন করতে হয়।

সংসদীয় দল (Parliamentary Party)

পার্লামেন্ট বা আইনসভায় কোনো রাজনৈতিক দলের নির্বাচিত সদস্যদের সমষ্টিগতভাবে বলা হয় সংসদীয় দল। সংসদীয় দলে সাধারণত একজনকে নেতা নির্বাচিত করা হয়। সরকারি সংসদীয় দলের নেতা থাকেন সাধারণত নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী। সংসদীয় দল মূল দলের নীতি ও সিদ্ধান্ত মোতাবেক পার্লামেন্টের বিভিন্ন ইস্যুতে অংশগ্রহণ করে। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে সংসদীয় দল দেশের শাসনকার্য পরিচালনা করে থাকে।

সংসদীয় বিতর্ক (Parliamentary Debate)

কোনো প্রশ্ন, প্রস্তাব বা বিলের পক্ষে বিপক্ষে সংসদের ভেতরে সংসদ সদস্যদের বিতর্ক। সংসদীয় রাজনীতিতে বিতর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। একটি পার্লামেন্ট কত সফল তার অনেকটা নির্ভর করে পার্লামেন্টারি বিতর্ক কত প্রাণবন্ত, সময়োপযোগী ও জীবনস্পর্শ তর ওপর। আধুনিক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও পার্লামেন্টের উদার মনোভাবের কারণে এখন সকলেই রেডিও-টেলিভিশনের মাধ্যমে সরাসরি পার্লামেন্টারি বিতর্ক শুনতে ও দেখতে পান। পার্লামেন্টারি বিতর্কের ধারা বিবরণী এখন নিয়মত প্রদর্শিত ও প্রচারিত হয়। অথচ এমন সময় ছিল যখন পার্লামেন্ট সদস্যরা বিতর্কের প্রচারকে তাঁদের বিশেষ অধিকার হরণের শামিল বলে মনে করতেন। ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ১৮

শতকে অন্তত দু'বার-১৭৩৮ ও ১৭৬২ সালে-পার্লামেন্টারি বিতর্কের প্রকাশনা সদস্যদের অধিকার হরণের শামিল, এরকম সিদ্ধান্ত নেয়। পরে পার্লামেন্টের মনোভাবে পরিবর্তন আসে এবং পাবলিক গ্যালারির অংশবিশেষ সাংবাদিকদের ব্যবহারের অনুমতি দেয়া হয়।

রাজনৈতিক গতিশীলতা ও রাজনৈতিক স্তর নির্ধারণ করার ক্ষেত্রে পার্লামেন্টারি বিতর্ক একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। পার্লামেন্টারি বিতর্কের বিষয়, মান ও ধরন থেকে প্রতিষ্ঠান হিসেবে পার্লামেন্টের বিকাশ এবং রাজনৈতিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণের মাত্রা নিরূপণ করা যায়।

সংসদের আইন (Act of Parliament)

আইন প্রণয়ন প্রক্রিয়ার সকল স্তর অতিক্রম করে পার্লামেন্ট কর্তৃক চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত আইন। সংসদের আইন প্রথম বিল আকারে সংসদে উপস্থাপিত হয়, তারপর সর্বশেষে রাষ্ট্রপ্রধানের অনুমোদন লাভ করে। সংসদের আইন পরিবর্তন করতে হলে আবার বিল আকারে তা সংসদে উপস্থাপন করতে হয়।

সংস্কার (Reform)

সাধারণত কোনো সমাজ বা রাষ্ট্রের মূল ভিত্তি বা কাঠামো ঠিক রেখে নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার জন্য নতুন সংযোজন ও পুরাতন অংশ বিয়োজন করাকে সংকার বলা হয়। অর্থাৎ অবস্থিত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে বহাল রেখে তার কিছু কিছু দোষত্রুটি সংশোধনের জন্য গৃহীত কর্মকাণ্ডকে বলে সংস্কার (Reform)। যেমন, শোষণমূলক সমাজব্যবস্থাকে বহাল রেখে প্রায়শ এই ব্যবস্থাকে আরও মজবুত করার উদ্দেশে সরকার স্বাস্থ্য, কর্মসংস্থান, কুটির শিল্প ইত্যাদি জনকল্যাণমূলক ইস্যুতে যেসব পদক্ষেপ নেয় বা আইন পাশ করে সেগুলোকেই বলে সংস্কার। বিপ্লববিরোধীরা মনে করেন যে, সংস্কারের মাধ্যমেই সমাজের দোষত্রুটিসমূহ দূর করে সমাজকে সুন্দর করা সম্ভবপর। এইরূপ মতবাদকে বলা হয় সংস্কারবাদ (Reformism)। অপরদিকে বিপ্লববাদীরা মনে করেন যে মলম লাগিয়ে যেমন সিফিলিসের চিকিৎসা সম্ভবপর নয়, তেমনি সংস্কারের মাধ্যমেও কোনো শোষণমূলক বা বৈষম্যমূলক সমাজ থেকে শোষণ বা বৈষম্যের অবসান ঘটানো সম্ভবপর নয়। তাঁরা আরও অভিযোগ করেন যে, দেশী বিদেশি শোষকশ্রেণী বস্তুত জনগণের দৃষ্টিকে অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখার জন্য, বিপ্লবী ধারাকে স্তিমিত করার জন্য এবং শোষণ ও বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থাটাকে পাকাপোক্ত করার জন্যই বিভিন্ন সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের কর্মসূচি গ্রহণ করে। বস্তুত সমাজ ও রাষ্ট্রীয় কাঠামোর উন্নতির জন্য যে সকল কর্মসূচি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাই সংস্কার।

সংস্কার আন্দোলন (Reformation Movement)

মধ্যযুগে খ্রিস্টধর্মের মূল আদর্শ নীতি ও সার্বিক নৈতিকতা থেকে পোপ ও যাজক সম্প্রদায়ের বিচ্যুতির বিরুদ্ধে আন্দোলন হল সংস্কার আন্দোলন। গির্জার বিপথগামীতা

রোধ করে সঠিক পথে পরিচালিত করা গির্জার ওপর জনগণের আস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করাই সংস্কার আন্দোলনের মূখ্য লক্ষ্য। তবে সংস্কার আন্দোলনকে কোনো বৈপ্লবিক বা রাজনীতিক আন্দোলন বলা যুক্তিযুক্ত নয়। রাজনীতিক উদ্দেশ্যও ছিল না; নিছক ধর্মীয় কর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। মধ্যযুগের শেষভাগে যাজক সম্প্রদায়ের বিলাসিতা, সম্পদের প্রতি অপরিসীম লিপ্সা ও খ্রিস্টধর্ম বিরোধী আচরণ জনগণের মনে গির্জা বিরোধী মনোভাব গড়ে তোলে। দীর্ঘদিন ধরে পোপ ও যাজক সম্পর্কে জনসাধারণ যে শ্রদ্ধা পোষণ করে আসছিল যাজকদের নৈতিক অধঃপতন সেই শ্রদ্ধার প্রাসাদকে ভেঙে দেয়। সবরকম দুর্নীতি ও স্বৈরাচারিতার পীঠস্থান ছিল এই গির্জা। পরকালের সুখের কথা বলে গির্জা জনগণকে বিভ্রান্ত করত। পার্থিব জগতে যে যা খুশি তাই করবে। তবে মৃত্যুর আগের গির্জাকে কিছু অর্থ দিলে বিনিময়ে একটি ইচ্ছাপূরণ পত্র (Indulgence) পাওয়া যাবে এবং এটি মানুষকে যাবতীয় পাপ থেকে মুক্তি দেবে। সাধারণ মানুষ এতে প্রলুব্ধ হত এবং এই উপায়ে গির্জা বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ও অর্থ অর্জন করত। অর্থাৎ যাজকদের নৈতিক অধঃপতন এমন পর্যায়ে নেমে আসে পাপ-পূণ্যকে তারা পণ্যদ্রব্যের কেনাবেচার স্তর নামিয়ে দিয়েছিল। গির্জা এমনভাবে প্রচার করত যে তার ভাণ্ডারে যেন অফুরন্ত পূণ্য জমা আছে এবং কিছু পরিমাণ অর্থ দিলেই সেই ভাণ্ডার থেকে পূণ্য পাওয়া যাবে। এসবের কারণে ধর্মীয় জগত থেকে পোপের আধিপত্যকে অপসারিত করাই ছিল আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য। পাপ পূণ্যের ব্যাপারটি ব্যক্তির নিজস্ব। জাগতিক পাপ করার পরে অর্থের বিনিময়ে ইচ্ছাপূরণ পত্র কিনে পাপ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় না। এই বিষয়ে পোপের কিছু করণীয় নেই। গির্জা পরিচালনার জন্য জনগণের স্বেচ্ছাদান যথেষ্ট। এই আন্দোলনের অন্যতম পথ প্রদর্শক জন ক্যালভিন ও মার্টিন লুথার কিং।

সক্রেটিস (Socrates)

প্রাচীন গ্রিসের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক, যিনি ভাববাদী দর্শনের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাঁর জীবন ছিল অতিশয় সহজ-সরল। তিনি মনে করতেন-মানুষের জ্ঞান সীমত, জগতের মূলসত্তা সম্পর্কে মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। সক্রেটিস জন্মের সঠিক তথ্য জানা যায় না। অনুমান করা হয়, খ্রিস্টপূর্ব ৪৬৯-৪৭০ সালে এথেন্স-এ তাঁর জন্ম। তাঁর বাবা ও মা'র নাম যথাক্রমে সোফ্রেনিকাস এবং ফ্যানারেট। পিতা পেশায় ছিলেন ভাস্কর, আর মা করতেন ধাত্রীর কাজ। সক্রেটিসের শৈশব সম্পর্কেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। তাঁর প্রাতিষ্ঠানিক পড়াশোনা সম্পর্কেও আমরা অজ্ঞাত। জানা যায় যে, যৌবনের প্রথমদিকে তিনি কিছুদিন পিতার পেশায় নিয়োজিত ছিলেন। এথেন্সে অ্যাক্রোপলিশে প্রদর্শিত কয়েকটি মূর্তি সক্রেটিসের তৈরি বলে জানা যায়। তবে ত্রিশ বছর বয়সের আগেই তিনি পৈতৃক পেশা ছেড়ে দিয়ে জীবন ও জগৎ সম্পর্কে জ্ঞান-অন্বেষণে আত্মনিয়োগ করেন। তাঁর এই প্রচেষ্টা সত্তর বছর বয়সে মৃত্যুও আগমুহূর্ত পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। সক্রেটিসের সংসারের আর্থিক অবস্থা বিশেষ ভালো ছিল না। তাঁর স্ত্রী জানথিপি কোনোমতে সংসার চালিয়ে নিতেন। ছেলেমেয়ে ছিল বেশ কয়েকজন। সক্রেটিস ছিলেন প্রাচীন গ্রিসের

শ্রেষ্ঠ দার্শনিক। গ্রিসের কেন্দ্রস্থান এথেন্সের নগররাষ্ট্র। সক্রেটিস দেখতে ছিলেন কুৎসিত আর বেঁটেখাটো। তাঁর মাথায় টাক, নাক মোটা আর চ্যাপ্টা। স্বাভাবিক ভঙ্গিতেও হাঁটতেন না। গায়ে থাকত তাঁর মলিন পোশাক। সক্রেটিসের কোনো রচনাবলি নেই। মানবজাতির জন্য তিনি নিজের হাতে কিছু লিখে রেখে যাননি। তাঁর সমস্ত শিক্ষাই ছিল মৌখিক। নিজের দার্শনিক শিক্ষা প্রচারের জন্য তিনি প্রতিদিন এথেন্সের জনবহুল বাজারে অথবা রাস্তার মোড়ে যেখানে জনসমাগম হয় তেমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াতেন এবং অসংখ্য শ্রোতার সঙ্গে তিনি কথা বলতেন, মতবিনিময় করতেন। সত্য ও সুন্দর, জীবন ও জগৎ আর মৃত্যু সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তিনি প্রশ্নোত্তর মাধ্যমে আলোচনা করতেন। সক্রেটিস মনে করতেন যে, এক অতিজাগতিক নির্দেশে তিনি পরিচালিত। জগতের ভালো আর মন্দ সম্পর্কে সেই অতিজাগতিক কণ্ঠস্বর তাঁকে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করছে। সেই কণ্ঠস্বর আর কারো নয়, ঈশ্বরের। সক্রেটিসের জীবন ও শিক্ষা সম্পর্কে তাঁর মৃত্যুও পর গ্রন্থ রচনা করেছেন তাঁর যোগ্য দুই শিষ্য: এক্সেনোফোন এবং প্লেটো। এক্সেনোফোন ছিলেন একজন সামরিক ব্যক্তিত্ব আর প্লেটো ছিলেন মহান দার্শনিক। সারাজীবন জ্ঞানের জগতে বিচরণ করলেও সক্রেটিসের নাগরিক কর্তব্যবোধও ছিল প্রখর। তাঁর শারীরিক শক্তি আর সাহসও ছিল অপরিমেয়। রাষ্ট্রের প্রয়োজনে যৌবনে কিছুকাল তিনি এথেন্সীয় সেনাবাহিনীতে কাজ করেছিলেন। পেলোপোনেশিয়ান যুদ্ধে তিনি অসামান্য কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। সক্রেটিসের জীবন ছিল অতিশয় সহজ সরল। কোনো ভোগবিলাসের স্থান ছিল না তাঁর সেখানে। জাগতিক আর বৈষয়িক সুখস্বাচ্ছন্দ্যকে তিনি অবহেলো করেছেন আমৃত্যু। সাধারণত তিনি মদ্যপান করতেন না, তবে কোনো কারনে কোনোদিন তা করলে সবার চেয়ে বেশিই করতেন, কিন্তু কখনো মাতাল হতেন না। কেউ তাঁকে কখনো মাতাল অবস্থায় দেখেনি। শীত সহ্য করবার ব্যাপাওে তাঁর ছিল বিস্ময়কর শক্তি। এই মহান ও নির্বিরোধ মানুষটির জীবনও শত্রুমুক্ত ছিল না। তাঁর যখন সত্তর বছর বয়স তখন তাঁর শত্রুরা তাঁকে শক্ত আঘাত হানবার ষড়যন্ত্র করে। সক্রেটিসের শিষ্য এক্সেনোফোনের মতে, তিনি বহু দেবদেবতাকে ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র স্রষ্টা সম্পর্কে পার্থক্য উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। দেবদেবীদের সঙ্গে সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে যে তিনি এক করে ফেলেননি তা-ই ছিল তাঁর অপরাধ। তিনি যে ঈশ্বরের ধারণা প্রচার করেছিলেন যে-ঈশ্বর একাধারে স্রষ্টা ও জীবনের পরিচালক।

এথেন্সের আদালতে আসামির কাঠগড়ায় সক্রেটিস ছিলেন আপসহীন আর কঠোর আত্মমর্যাদায় অটল। ধারণা করা হয়, বিচারালয়ে তিনি যদি কিছুটা নমনীয় আচরণ করতেন তাহলেই নির্দোষ ঘোষিত হয়ে নিশ্চিত ছাড়া পেয়ে যেতেন। কারারক্ষীদের ঘুষ দিয়ে সেকালে কারাগার থেকে পালানো কঠিন ছিল না। সক্রেটিসের ভক্তরা তাঁকে সে পরামর্শও দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি তাঁদের সেই পরামর্শ প্রত্যাখ্যান করে বলেন: মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে যাওয়া কাপুরুষতা। তা ছাড়া প্রত্যেক নাগরিকের উচিত রাষ্ট্রের আইন মেনে চলা। রাষ্ট্র তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছে, সুতরাং তিনি অবশ্যই তা মেনে নেবেন।

মৃত্যুদণ্ডাদেশের ত্রিশদিন পর সক্রেটিসকে ‘হেমলক’ নামের বিষ খেতে দেয়া হয়। প্রশান্তচিত্তে তিনি হেমলক পান করলেন। মৃত্যুর আগে তাঁর শেষ কথা ছিল : “ক্রিটো, এস্কুলাপিয়াস আমাদের কাছে একটি মোরগের দাম পাবে, সুতরাং তাকে তা দিয়ে দিও, অবহেলা কোরো না।” ক্রিটো ছিলেন একজন কারারক্ষী।

প্লেটো ‘অ্যাপলজি’ থেকে জানা যায়, সক্রেটিস বলেছেন : “মৃত্যু হলো দুটো ব্যাপারের একটি। হয় এটা ধ্বংস, এবং মৃতের কোনোকিছু সম্পর্কে কোনো চেতনা নেই; অথবা, যেমন আমরা শুনেছি, এটি একটি পরিবর্তন : এই জায়গা থেকে অন্য কোথাও আত্মার স্থানান্তরিত হওয়া।” সেই সময়ে এথেন্সে অনেকেই নিজেদেরকে বড় বড় জ্ঞানী বলে দাবি করতেন। এ-ব্যাপারে সক্রেটিস বলতেন : “এইসব ‘জ্ঞানী’র সঙ্গে আমার ব্যবধান হলো তাঁরা জানে না যে তাঁরা জানে না, কিন্তু আমি জানি যে আমি জানি না।” তিনি মনে করতেন, মানুষের জ্ঞান সীমত; জগতের মূলসত্তা সম্পর্কে মানুষের পক্ষে জানা সম্ভব নয়। প্রশ্নোত্তরের একধরনের দ্বান্দ্বিক পদ্ধতিতে সক্রেটিস জ্ঞান-আলোচনা করতেন। তাঁর পূর্ববর্তী গ্রিসের দর্শন ছিল প্রধানত পকৃতিবাদী ও বস্তুবাদী। কিন্তু সক্রেটিসের কাছে মানুষের ভাবই হচ্ছে সত্য। গ্রিকদর্শনের বিকাশে তথা পৃথিবীর দর্শনের ইতিহাসে তাঁর চিন্তাধারা অপরিমেয় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সোফিস্টদের মতো সক্রেটিসের শিক্ষাও ছিল মূলত নৈতিক। মানুষের সমস্যা ও কর্তব্যবিষয়ে তিনি তাঁর ভাবনাকে নিরন্তর সচল রেখেছেন। জগতের উৎপত্তি, পরম সত্তা- এইসব প্রশ্ন তাঁর কাছে ছিল গৌণ। তাঁর কাছে নীতিবিষয়ক জ্ঞানই ছিল মূখ্য। তিনি বলেছেন- ‘নিজেকে জানো’। নগরীর বাইরে তিনি কখনো যাননি, কারণ তিনি বলেছেন, জনমানবহীন প্রান্তর আর গাছপালার কাছে কিছুই শেখার নেই।

যখন আমরা কোনো বস্তু, যেমন মানুষ, কোনো প্রাণী, উদ্ভিদ, নক্ষত্র, ঘরবাড়ি সচেতনভাবে অবলোকন করি তাই প্রত্যক্ষণ। কিন্তু যখন চোখ বন্ধ করে এইসব বস্তুকে মনের মধ্যে দেখতে পাই, সেটিই হলো ‘ধারণা’ বা ‘কনসেপ্ট’। চিন্তার ইতিহাসে সক্রেটিসের স্থান অতি উঁচুতে। তাঁর শিক্ষার দুটি দিক রয়েছে। প্রথমত, জ্ঞানের স্বরূপ সম্পর্কে তাঁর মতবাদ অর্থাৎ সকল জ্ঞানেরই উৎস হলো ‘ধারণা’। এটি সক্রেটিসে দর্শনের বৈজ্ঞানিক দিক। দ্বিতীয়ত, তাঁর নৈতিক শিক্ষা। তিনি বলেছেন, মানুষ প্রজ্ঞা দ্বারা পরিচালিত। তাঁর এই মতবাদ নিয়ে একটু বিতর্ক রয়েছে। সক্রেটিসের জ্ঞানতত্ত্ব শুধু তত্ত্বের জন্য নয়, তার ব্যবহারিক মূল্যও অপরিসীম। তিনি জ্ঞানের ওপর জোর দিয়েছেন এবং জীবনে তার প্রয়োগ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর জ্ঞানতত্ত্বের সঙ্গে নৈতিক শিক্ষাও জড়িত। তিনি বলেছেন, সদ্‌গুণাবলির সঙ্গে রয়েছে জ্ঞানের সম্পর্ক। নৈতিকতা নির্ভর করে জ্ঞানের ওপর। অজ্ঞানতা থেকেই সকল অন্যায়ের উৎপত্তি। সক্রেটিসের মতে, গুণ অখণ্ড ও অবিভাজ্য। মানুষের সকল সদ্‌গুণ- যেমন দয়া, ধৈর্য, সততা, প্রজ্ঞা, দূরদর্শিতা, দানশীলতা, ন্যায়পরয়নতা, মিথ্যাচার- এক অভিন্ন উৎস তেকে উৎসারিত। প্রজ্ঞা বা জ্ঞান হলো সক্রেটিসের মতে প্রধান গুণ, যার থেকে অন্যান্য সদ্‌গুণের উৎপত্তি। (সূত্র: অস্ট্রিক আর্য, *বিশ্বশ্রেষ্ঠ আলোকিত মানুষ*, ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ, ২০১১)।

সঞ্চয় ও বিনিয়োগ (Savings and Investment)

আয়ের যে অংশ বর্তমান ভোগের জন্য ব্যয় করা হয় না তাই সঞ্চয় বলে গণ্য করা হয়। আর সঞ্চিত আয়ের যে অংশ শিল্পে,ব্যবসায়-বাণিজ্যে পুঁজি হিসেবে খাটানো হয় তাকে বিনিয়োগ বলা হয়। সঞ্চয় মূলধনের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। সাধারণত সঞ্চয়ের বৃদ্ধিতে বিনিয়োগের বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কিন্তু তাই বলে এটা বলা ঠিক হবে না যে, বিনিয়োগের পরিমাণ সকল সময় সঞ্চয়ের পরিমাণের সমান হবে। প্রকৃতপক্ষে দেখা যায় যে, সঞ্চয়ের কিছু অংশ কোন উৎপাদন কার্যে না লাগিয়ে, বাড়িতে গচ্ছিত রাখা হয়। সঞ্চয়ের এই অংশকে গচ্ছিত (Hoarding) বলা হয়। সঞ্চিত আয় যা বিনিয়োগ হিসেবে ব্যবহৃত হয় তাকে মূলধনও বলা যেতে পারে।

সত্যাগ্রহ

সত্যাগ্রহ হলো গান্ধীজির নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের রূপ বা ধরন। এর অর্থ সত্যের প্রতি আগ্রহ বা সত্যকে আঁকড়ে থাকা। গান্ধীবাদীদের মতে সত্যকে আঁকড়ে থাকলে মিথ্যা পরাভূত হতে বাধ্য। যেহেতু অত্যাচার-শোষণ হলো মিথ্যা, সেহেতু সত্যের প্রতি অপ্রতিহত নিষ্ঠার মাধ্যমে অত্যাচার ও শোষণকে নির্মূল করা সম্ভবপর। কেননা 'হিংসা' অসত্য, সত্যাগ্রহ 'হিংসাত্মক' সকল প্রক্রিয়ার বিরোধী। গান্ধীজির মতে, যা হিংসাত্মক বা রক্তাক্ত পথে অর্জিত, তা হিংসাত্মক বা রক্তাক্ত পথেই ধ্বংস হতে বাধ্য। উদাহরণ হিসাবে তিনি কমিউনিস্ট দেশে ক্রমাগত 'পার্জিং' বা তথাকথিত আদর্শবিরোধীদের নির্মূল করার নামে নরহত্যা ও নির্যাতনের কথাও উল্লেখ করতেন। সত্যাগ্রহীদের মতে 'লোকশিক্ষা' এবং 'লোকশক্তি' জাগিয়ে তোলাই হল আন্দোলনের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

সন্ত্রাসবাদ (Terrorism)

রাজনৈতিক কারণে বা উদ্দেশে হিংসাত্মক কাজ বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়াই হলো সন্ত্রাসবাদ। মূলত রাজনৈতিক লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য হিংসাত্মক পদ্ধতি অনুসরণ অথবা হিংসার মাধ্যমে জনগণের মনে ভীতি ও ত্রাস সঞ্চার করা। সাধারণত ক্ষমতাসীন দল যখন গণতান্ত্রিক বা আইনসংগত উপায়ে দাবি আদায়ের বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ বন্ধ করে দেয়, তখনই আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসের পথ বেছে নেয়। নির্বিচারে যত্রতত্র এবং ব্যাপকভাবে ভীতি ও ত্রাসসঞ্চারকারী হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপের দিকটি সন্ত্রাসবাদের সবচেয়ে ক্ষতিকর পরিণাম। সাম্প্রতিককালে বিশ্বের অনেক দেশে সরকারি কার্যকলাপে সন্ত্রাসবাদ প্রকাশ পায়। সন্ত্রাসবাদের পেছনেও অনেক যুক্তি থাকে বা দেখানো হয়। বলা হয়, কল্যাণের পথে পৌঁছতে যদি অকল্যাণ মাধ্যম অবলম্বনে আপত্তি না থাকে তা হলে সন্ত্রাসবাদ সমর্থনযোগ্য। তা না হলে গ্রহণযোগ্য নয় বরং নিন্দনীয়। সাম্য ও স্বাধীনতার নামে হিংসার মাধ্যমে শোষণ ও নিপীড়নকারীর হিংসা নিবারনের প্রয়াসী বলে সন্ত্রাসবাদীরা মনে করে।

সন্ত্রাসবাদী (Terrorist)

যারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপের জড়িত তাদেরকে সন্ত্রাসী বলে অভিহিত করা হয়। আর যারা রাজনৈতিক কারণে বা উদ্দেশে প্রণোধিত হয়ে হিংসাত্মক কাজ বা সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়, তাদেরকেই সন্ত্রাসবাদী বলে। সাধারণত ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী যখন গণতান্ত্রিক বা আইনসঙ্গত উপায়ে দাবি আদায়ের বা ক্ষমতা হস্তান্তরের পথ বন্ধ করে দেয়, তখনই আন্দোলনকারীরা সন্ত্রাসের দিকে ঝুঁকে পড়ে। দেশকে উপনিবেশবাদী বা সাম্রাজ্যবাদীদের কবল থেকে মুক্ত করার জন্যও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় গ্রহণ করা হয়। সমাজতান্ত্রিক বা জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লবীরাও এক ধরনের সন্ত্রাসবাদী। তবে, সাধারণভাবে বিপ্লবীদের সঙ্গে সন্ত্রাসবাদীদের পার্থক্য হল এই যে, সন্ত্রাসবাদীরা কার্যত জনগণের ভূমিকার ওপর গুরুত্ব আরোপ করে না। অথচ বিপ্লবীরা জনগণকেই ইতিহাস ও সমাজ বিকাশের নিয়ামক শক্তি হিসাবে বিবেচনা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, উভয়ে প্রয়োজনে অস্ত্রধারণ করা সত্ত্বেও, নৈরাজ্যবাদীরা ছিল শুধুই সন্ত্রাসবাদী, কিন্তু বলশেভিকরা ছিল বিপ্লবী। অনুরূপভাবে, ব্রিটিশ হটাও আন্দোলনে অস্ত্রধারণকারী অনুশীলন ও যুগান্তর দলকে বলা হয় সন্ত্রাসবাদী। কিন্তু বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে অস্ত্রধারণকারীদের বলা হয় মুক্তিযোদ্ধা।

সন্ন্যাসী বিদ্রোহ

উপনিবেশবাদী ইংরেজরা (১৭৬০-১৮৫৩) এদেশের ঐতিহ্যবাহী গ্রাম সমাজব্যবস্থাকে ভেঙে দেয় এবং জনগণের ওপর কর ও বিবিধ শোষণ চাপিয়ে দেয়। এতে বিপুলসংখ্যক কৃষক ও কারিগর জীবিকাহীন হয়ে পড়ে। একই সময়ে মুঘল সাম্রাজ্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সেনাবাহিনীর বেকার ও ক্ষুধার্ত সৈনিকরাও ধৈর্যহীন হয়ে পড়ে। সর্বোপরি, ইংরেজরা মুসলমান ফকির ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের দলবদ্ধ তীর্থ ভ্রমণে বাধা দিলে এবং তীর্থযাত্রীদের ওপর মাথাপিছু কর ধার্য করে দিলে সন্ন্যাসী ও ফকিররাও বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। ফলে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের নেতৃত্বে জীবিকাহীন কৃষক, কারিগর ও সৈন্যেরা ব্রিটিশ রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। বিদ্রোহীরা অনেক ক্ষেত্রে জমিদারদের খাদ্য ও সম্পত্তিও লুট করে। তৎকালীন গভর্নর ওয়ারেন হেস্টিংস এই বিদ্রোহকে পেশাদারদের দস্যুতা ও ডাকাতি বলে অভিহিত করেন। বিদ্রোহীরা প্রথম ঢাকার ইংরেজ কুঠির ওপর আঘাত হানে। তখন কলকাতার কুঠির পরই ছিল ঢাকার কুঠির স্থান। রাজশাহীর রামপুর, বোয়ালিয়া কুঠির ওপর দ্বিতীয় আঘাত হানা হয়। ১৭৬৭ সালে আক্রান্ত হয় পাটনার কুঠি। এই বিদ্রোহের প্রধান এবং সবচেয়ে শক্তিশালী নায়ক ছিলেন ফকির মজনু শাহ। অন্যান্য নেতাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন মুসা শাহ, চেরাগ আলি ভবানী পাঠক, দেবী চৌধুরাণী, কৃপানাথ, নূর মোহাম্মদ, পীতাম্বর, শ্রীনিবাস, অনুপ নারায়ণ প্রমুখ। একজন এই বিদ্রোহে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা ৫০ হাজারে উন্নীত হয়। এই বিদ্রোহকে ৭টি পর্বে ভাগ করা যেতে পারে। যেমন, প্রথম পর্ব (১৭৬৩-৬৯); দ্বিতীয় পর্ব (১৭৭০-৭২)–এই পর্বে দিনাজপুর-বগুড়া-জলপাইগুড়ি এলাকার

বিপুলসংখ্যক কৃষক অংশগ্রহণ করে; তৃতীয় পর্ব (১৭৭৫-৮০), এই পর্বে বিদ্রোহ খানিকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে এবং ফকির ও সন্ন্যাসীদের মধ্যে আত্মকলহ দেখা দেয়, মজনু শাহ ঐক্য আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করে অনেকটা সফল হন; পঞ্চম পর্ব (১৭৮১-৮৬), এই পর্বে ময়মনসিংহ, বগুড়া প্রভৃতি এলাকায় বিদ্রোহ জোরদার হয়, ১৭৮৬ সালের ২৯ ডিসেম্বর ইংরেজ বাহিনীর সঙ্গে সম্মুখ যুদ্ধে ফকির মজনু শাহ আহত হন এবং কয়েকদিন পরই তাঁর মৃত্যু ঘটে; ষষ্ঠ পর্ব (১৭৮৭-৯২) এই পর্বে নেতৃত্ব দেন ভবানী পাঠক, দেবীচৌধুরাণী, মুসা শাহ, চেরাগ আলি প্রমুখ; অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে মুসা শাহ নিহত হন; সপ্তম বা শেষ পর্ব (১৭৯৩-১৮০০) পূর্ণিয়া, দিনাজপুর, মালদহ, কুচবিহার প্রভৃতি বিদ্রোহের ব্যর্থতার অন্যতম কারণ ছিল অভিজ্ঞতার অভাব, বিক্ষিপ্ততা, অন্তর্কোন্দল, সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদি। তথাপি, এই বিদ্রোহই পরবর্তীকালের ব্যাপক কৃষকবিদ্রোহ সিপাহীবিদ্রোহের ভিত্তি প্রস্তুত করেছিল।

স-পরিষদ রাজাজ্ঞা (Grder-in-Council)

ব্রিটেনের রাজা বা রানী শাসন বিভাগের প্রধান হলেও তিনি পরোক্ষভাবে আইন প্রণয়ন কার্যে অংশগ্রহণ করতে পারেন। অর্থাৎ কোনো উপনিবেশ সম্পর্কে রাজা বা রানী সমেত প্রিভি কাউন্সিলের মাধ্যমে আইন প্রণয়ন বা আইন প্রণয়নের সুপারিশ করতে পারেন। তাঁর আইন প্রণয়নের এই ধরনের ক্ষমতাকে স-পরিষদ রাজাজ্ঞা (Grder-in-Council) বলা হয়। তাছাড়া যুদ্ধ ঘোষণা, শান্তি স্থাপন প্রভৃতি ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও কাজ করতে হয় সেসকল ক্ষেত্রে রাজা 'স-পরিষদ রাজাজ্ঞা' জারি করতে পারেন যা, আইনের মতই কার্যকরী হয়।

সপ্তদশ অক্ষরেখা (17th Parallel)

সপ্তদশ অক্ষরেখা সাবেক উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে চিহ্নিত সীমারেখা। ভিয়েতনামে দু'টি সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। যুক্তরাষ্ট্রের সমর্থনপুষ্ট ডানপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল দক্ষিণ ভিয়েতনামে এবং রাশিয়ার সমর্থনপুষ্ট বামপন্থী সরকার গঠিত হয়েছিল উত্তর ভিয়েতনামে। সমগ্র ভিয়েতনামের দখল গ্রহণের জন্য দুই ভিয়েতনামের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলে আসছিল। এ অবস্থায় দুই ভিয়েতনামের মাঝখানে এ অক্ষরেখা দিয়ে সীমান্ত নির্ধারণ করে দেয়া হয়। কিন্তু পরবর্তীতে সমগ্র যুদ্ধের মাধ্যমে দক্ষিণ ভিয়েতনাম সরকারের পতন ঘটে এবং সমগ্র ভিয়েতনামে বামপন্থী সরকার গঠিত হয়।

সবুজ বিপ্লব (Green Revolution)

প্রাচীন চাষাবাদ পদ্ধতির পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, সেচ ব্যবস্থা, উন্নত বীজ ইত্যাদি প্রচলনের মাধ্যমে ফসলের উৎপাদন ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করাকেই সবুজ বিপ্লব বলা হয়। এই বিপ্লবের মৌল উদ্দেশ্য হল খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করা।

সবুজপত্র (Green Paper)

সাধারণত সরকার কোনো প্রস্তাবিত বিল পার্লামেন্টে পাশ করার পূর্বে, তার যে খসড়া ও পটভূমি আলোচনার উদ্দেশে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় ও পচার মাধ্যমে প্রকাশ করে থাকেন, সেটাকেই সবুজপত্র বলা হয়।

সমবায় (Co-operative)

কয়েকজন লোক মিলে সাম্য, মৈত্রী, ঐক্য, পারস্পরিক সহানুভূতি ও সাহায্যের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাপ্রণোধিত সংঘ বা সমিতি গড়ে তোলাকে সমবায় বলে। এখানে মানুষ নিজেদের সার্বিক মঙ্গলের স্বার্থে স্বেচ্ছায় সমঅধিকারের ভিত্তিতে একে অপরের সহযোগিতা করে। এরা যৌথভাবে বিশেষ কোনো অর্থকরী কর্মকাণ্ডে শামিল হয়। সমবায় বিভিন্ন প্রকার হতে পারে; যেমন, ভূমিহীনদের সমবায়, কৃষকদের সমবায়, ব্যবসায়ীদের সমবায়, বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের সমবায় ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে মিশ্র সমবায়ও গড়ে উঠতে দেখা যায়। সমবায় ব্যবস্থায় সমবায়ীরা তাদের সম্পদ (যেমন, জমি বা অপর কোনো উৎপাদনযন্ত্র ও উপকরণ ও পুঁজি)-কে একত্র করে, একত্রে খাটায় এব লভ্যাংশকে যার যার বিনিয়োগিত পুঁজি, শ্রম ইত্যাদি অনুপাতে ভাগ করে নেয়। সমবায়ের ব্যবস্থাপনায় থাকে সমবায়ীদের নির্বাচিত কমিটি। ডেনমার্ক ও অন্যান্য স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসহ পৃথিবীর কিছু-কিছু দেশে ব্যাপক সমবায় আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক পরিবর্তন ঘটানো সম্ভবপর হয়েছে। 'একতাই বল' এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে সমবায় সমিতিগুলি গড়ে ওঠে।

সমবায় প্রতিষ্ঠান (Cooperative Organization)

সমবায় এক প্রকার ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হল অপচয়, শ্রমিক শোষণ এবং তাদের মুনাফার অধিকার অস্বীকার প্রভৃতি ধনতান্ত্রিক ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের অসুবিধা দূর করা। পুঁজিপতিদের শোষণ হতে রক্ষা পেতে হলে সমবায়ের ভিত্তিতে ব্যবসায়-বাণিজ্য সংগঠন করা অত্যাবশ্যক। কিছু সংখ্যক লোক যখন কোন অর্থনৈতিক স্বার্থ সাধনের উদ্দেশে সাম্যের ভিত্তিতে এবং স্বেচ্ছায় পরস্পরের সাথে মিলিত হয়ে কাজ করে তখন এরূপ উৎপাদন প্রতিষ্ঠানকে সমবায় প্রতিষ্ঠান বলা হয়।

সমরবাদ (Militarism)

সমরবাদ অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক যাবতীয় সমস্যার সমাধান সামরিক শক্তির দ্বারাই করা যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী সময়ে হিটলার ও মুসোলিনি এই মতবাদের ভিত্তিতে স্ব স্ব সামরিক ও উঠতি পরাশক্তিসমূহও কার্যত সমরবাদের শিকার হয়ে সভ্যতা বিধ্বংসী ভয়াবহ অস্ত্রনির্মাণ প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে।

সমাজ (Society)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আদিগুরু অ্যারিস্টিটল বলেছেন, মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক জীব। সমাজের সাথে মানুষের সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ ও ওতোপ্রতোভাবে জড়িত। সাধারণত কোনো সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্তে কিছু সংখ্যক ব্যক্তি একত্রে সংঘবদ্ধ হলে সমাজের উদ্ভব ঘটে। সংকীর্ণ অর্থে পারস্পরিক সহযোপগিতা, সহানুভূতি ও সংঘবদ্ধতাকে সমাজ বলে অভিহিত করা হয়। ব্যাপক অর্থে সমাজ বলতে মানুষের সকল সম্পর্ককে বোঝায়। ম্যাকাইভার বলেছেন, এটি গোটা সামাজিক সম্পর্কের ব্যবস্থা।

বিবর্তনধারার আদিপর্বে জৈব অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য মানুষ সংগ্রাম করেছে। ক্রমে বুদ্ধি, চেতনা , সৃজনীশক্তি প্রভৃতি মানবিক সত্তার বিকাশে সেই সংগ্রামের মান ও ধারা বিকশিত হতে থাকে। জৈব প্রয়োজন নিবৃত্তির সঙ্গে অপরের মানবিক সত্তার স্ফূরণ অব্যাহত রেখে ব্যক্তিমানুষ নিজ সত্তার পরিপূর্তির জন্য সমাজবন্ধনের তাগিদ অনুভব করে। মানুষের জৈব প্রয়োজন ও স্বার্থের তাগিদে এবং পারস্পরিক সহযোগিতার সুবিধার্থে সমাবজন্ধনের উদ্ভব হয়েছিল। পাস্পরিক আদান-প্রদানের নিয়মত সম্পর্কে আবদ্ধ জনসমষ্টিই হলো সমাজ। মানুষই হলো সমাজের স্রষ্টা।

সমাজকল্যাণ (Social Welfare)

সরকার ও বিভিন্ন সেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে জনগণের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গৃহ সংস্থার ইত্যাদির ব্যাপারে যে-সমস্ত কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয় সেগুলোকে বলা হয় সমাজসেবা বা সমাজকল্যাণমূলক কাজ। সমাজতন্ত্রীদের মতে এসব সেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণমূলক কাজ আসলে বৈষম্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার কোনো পরিবর্তন তো করেই না, বরং জনগণকে পঙ্গু ও করুণা নির্ভর করে তোলে, সমাজের বিপ্লবী পরিবর্তনকে পিছিয়ে দেয় এব বৈষম্যপূর্ণ সমাজটাকেই পাকাপোক্ত করার প্রয়াস পায়।

সমাজতন্ত্র (Socialism)

সমাজতন্ত্র হলো সাম্যবাদ বা Communism এর পূর্ববর্তী স্তর। এই স্তরে ধনিক বা বুর্জোয়াশ্রেণীকে ক্ষমতা থেকে উচ্ছেদ করে সর্বহারা শ্রেণি ও তাদের মিত্রেরা ক্ষমতা দখল করে। এই স্তরে কলকারখানা, জমি ইত্যাদি সম্পত্তির ওপর সমাজের তথা জনসাধারণের মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হয়। ষোড়শ শতাব্দী থেকে কাল্পনিক সমাজতন্ত্র (Utopian Socialism)-এর চিন্তা শুরু হয়। এই মতবাদীরা মনে করতেন যে বিপ্লব নয়, প্রচারের মাধ্যমেই আদর্শ সমাজ কায়েম করা সম্ভবপর। চার্লস ফ্যুরিয়ার (১৭৭২-১৮৩৭), সেন্ট সাইম (১৭৬০-১৮২৫), রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) প্রমুখ ছিলেন এই ঘরানার দার্শনিক। প্রুধোঁ (১৮০৯-৬৫) প্রমুখও সমাজতন্ত্রের নামে নৈরাজ্যবাদী দর্শন প্রদান করেন। ১৮৪৮ সালে মার্কস (১৮১৮-৮৩) ও এঙ্গেলস (১৮২০-৯৬) 'কমিউনিস্ট ইশতেহার' প্রকাশ করলে বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হয়। তাঁরা প্রমাণ করেন যে, একমাত্র শ্রেণিসংগ্রাম ও বিপ্লবের মাধ্যমেই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা ও

সর্বহারা শ্রেণির মুক্তি অর্জন সম্ভবপর। এর ফলশ্রুতিতে দেশে দেশে সমাজতান্ত্রিক দল গড়ে ওঠে এবং বিশ্বের সকল সমাজতন্ত্রীদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রয়োজনীয়তাও অনুভূত হয়। ১৮৬৫ সালে কার্ল মার্কস ও এঙ্গেলস-এর উদ্যোগে প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৭০ সালে ফরাসি বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয় এবং সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্বে 'প্যারি কমিউন' গঠিত হয়। কিন্তু অচিরেই কমিউনের পতন ঘটে এবং ১৮৭২ সালে প্রথম আন্তর্জাতিক সংগঠন ভেঙে যায়। ১৮৮৯ সালে এঙ্গেলসের উদ্যোগে এবং ১৯১৭ সালে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি রাশিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র কায়েম করে। ১৯১৮ সালে বিলনেস্ট (১৮৭১-১৯১৯) ও রোজা লুক্সেমবার্গ জার্মানিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস পেয়ে ব্যর্থ হন এবং তাঁদের গুলি করে হত্যা করা হয়। ১৯২০ সালে লেনিনের নেতৃত্বে তৃতীয় আন্তর্জাতিক গঠিত হয়। ইতিমধ্যে, পৃথিবীর বহুদেশেই সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারার বিকাশ ঘটে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পরপর ইউরোপের চেকোস্লোভাকিয়া, পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, বুলগেরিয়া, আলবেনিয়া ও যুগোস্লোভিয়ায় সমাজতন্ত্র কায়েম হয়। ১৯৪৯ সালে চীনে সামন্তবাদ ও উপনিবেশবাদের ধবংসাবশেষকে উচ্ছেদ করে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে নয়া গণতন্ত্র বা জাতীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। উত্তর কোরিয়াও একইভাবে সমাজতন্ত্রের দিকে অগ্রসর হয়। পরবর্তীতে কিউবা, মঙ্গোলিয়া, ভিয়েতনাম, লাওস, কম্বোডিয়া প্রভৃতি দেশেও সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইরাক, ইয়ামেন, তানজানিয়া, জিম্বাবি প্রভৃতি দেশে নতুন পদ্ধতিতে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার প্রয়াস চলে। ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশসমূহে নতুন ধররে সমাজতন্ত্র বা ইউরো-কমিউনিজমের তত্ত্ব উপস্থাপিত হয়। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর ৮০-র দশক থেকেই সমাজতন্ত্রের পতন শুরু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পূর্ব ইউরোপের সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে 'সমাজতন্ত্র'কে বর্জন করে। চীনসহ অন্যান্য কমিউনিস্ট দেশও মুক্তবাজার অর্থনীতি বা পুঁজিবাদের পথ গ্রহণ করে।

সমাজতন্ত্র, ইসলামি (Islamic Socialism)

ইসলামি সমাজতন্ত্রে ইসলাম ধর্মে যে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার রূপরেখা প্রদান করা হয়েছে ইসলামের প্রথম যুগের খলিফারা, বিশেষত দ্বিতীয় খলিফা হজরত উমর বিন খাত্তাব (রা.)-এর আমলে যে-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা কায়েম করার প্রয়াস পাওয়া হয়েছিল, বিশেষত মহানবী (সা.)-র অন্যতম সাহাবি হজরত আবু যব গিফ্ফারি (রা) কুরআন-সুন্নাহভিত্তিক যে অর্থনৈতিক দর্শনের রূপরেখা প্রদান করেছেন সেটাকেই বলা হয় ইসলামি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা। এই ব্যবস্থাকে সমাজতান্ত্রিক বলার কারণ এই যে, এই ব্যবস্থাও শোষণ ও স্বৈরাচারকে অস্বীকার করে। বর্তমানে কিছু কিছু রাষ্ট্রে ইসলামি সমাজতন্ত্র কায়েমের চেষ্টা চলছে। মার্কসীয় সমাজতন্ত্রের সঙ্গে ইসলামি সমাজতন্ত্রের মূল পার্থক্য এই যে, ইসলামি সমাজতন্ত্র সর্বশক্তিমান সৃষ্টিকর্তার ওপরও পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে, যা মার্কসবাদীরা করে না। বর্তমানে ইরান, লিবিয়া প্রভৃতি কতিপয় দেশে স্ব স্ব পন্থায় এরূপ সুষম বণ্টন সুনিশ্চিত করার প্রয়াস চলছে (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

সমাজতন্ত্র, জাতীয় (National Socialism)

জাতীয় সমাজতন্ত্র হল জার্মানির নাৎসি পার্টির মতাদর্শ। নাৎসিরা উগ্র জাতীয়তাবাদ ও সমাজতন্ত্রের কথা বললেও তারা আসলে শ্রেণির অস্তিত্বে ও শ্রেণিসংগ্রামে বিশ্বাস করত না। তারা বিশ্বাস করত জার্মান জাত্যাভিমানে এবং মনে করত যে অজার্মানরা জার্মান জাতির ঐক্যের পক্ষে হুমকিস্বরূপ। জাতীয় সমাজতন্ত্র ছিল কার্যত ফ্যাসিবাদ, বর্ণবাদ এবং ইহুদি বিরুদ্ধবাদ দ্বারাই প্রভাবিত।

সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র (Socialist Democracy)

সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রদত্ত জনতান্ত্রিক সুযোগকে বলে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্র। এরূপ গণতন্ত্রে জনগণ সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কাঠামো ইত্যাদির বিরুদ্ধাচারণ করতে পারে না বটে; কিন্তু এই ব্যবস্থা ও কাঠামোর আওতায় পর্যাপ্ত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে। সোভিয়েত নেতা মিখাইল সুসলভ প্রমুখ সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের প্রবক্তা ছিলেন।

সমান্তরালবাদ (Parallelism)

সমান্তরালবাদ স্পেনীয় দার্শনিক বেনেডিক্ট স্পিনোজা (১৬৩২-৭৭)-র মতবাদ। তাঁর মতে, জড়বস্তু বা দেহ এবং চেতনা বা মন উভয়ের মাধ্যমেই ঐশ্বরিক সত্তা স্পন্দিত। ফলে, মানবিক ঘটনাবলী ও শারীরিক বা বাস্তব ঘটনাবলী পরস্পরের সমান্তরালে চলে। সুতরাং, এদের মিলিত হওয়া অসম্ভব ও অপয়োজনীয়। বস্তুতে ও চৈতন্যে বা শরীরে ও মনে একই ঈশ্বরের সত্তার ঘটার তত্ত্বই সমান্তরালবাদ।

সম্পদ (Wealth)

সাধারণত 'সম্পদ' বলতে অর্থকেই বোঝায়। কিন্তু অর্থনীতিতে সম্পদ একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহৃত হয়। অর্থনীতিতে যাবতীয় অর্থনৈতিক দ্রব্যকেই সম্পদ বলা হয়। সম্পদ হলো এরূপ দ্রব্যসমূহ যার অর্থমূল্য ও যার বিনিময়মূল্য আছে। সে সমস্ত দ্রব্যের উপযোগ আছে ও যোগান সীমাবদ্ধ এবং যা হস্তান্তরযোগ্য ও বাহ্যিক তাকেই অর্থনীতিতে সম্পদ বলা হয়।

সম্পদ, জাতীয় (National Resource)

সম্পদ বলতে এমন বস্তু ও দ্রব্য সামগ্রীকে বোঝায় যে গুলোর বিনিময় মূল্য রয়েছে। জাতীয় সম্পদ হল কোনো জাতির সমগ্র সম্পদের সমষ্টি। ব্রিটিশ অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ (১৭২৩-৯০)-এর মতে সূর্যের আলো, বৃষ্টির পানি, নদী, জলপ্রপাত, খনি, জমি ইত্যাদি প্রকৃতির দানসমূহই হল জাতীয় সম্পদ। বলাবাহুল্য, এই মতানুযায়ী শিল্পজাত পণ্যাদি উপরোক্ত সম্পদসমূহেরই পরিবর্তিত রূপ মাত্র। একটি জাতির জাতীয়

সম্পদের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় চারটি উপায়ে যেমন; ১. আয় করের পরিমানের সাহায্যে, ২. মোট পুঁজির মাধ্যমে ৩. পুঁজির ওপর ধার্য করা করের হিসাবে এবং ৪. আদমশুমারির সময় জনগণের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান নেওয়ার মাধ্যমে। অনেকের মতে উপরোক্ত কোনো পদ্ধতিই পুরোপুরি ত্রুটিহীন নয় বিধায় জাতীয় সম্পদের পরিমাণ বাস্তবিকই নির্ধারণ করা অসম্ভব।

সরকার সম্পর্কিত আইন

যে আইন রাষ্ট্রের প্রকৃতি, সরকারের গঠন, কার্যাবলী, ক্ষমতা, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে দায়িত্ব বণ্টন, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের প্রশাসনিক দায়-দায়িত্ব ও কার্যাবলী এবং রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্ক নির্ধারণ করে তাকে সরকার সম্পর্কিত আইন বলে।

সরকার, গণপ্রতিনিধিত্বশীল (Representative Government)

বর্তমান গণতন্ত্র প্রতিনিধিত্বমূলক গণতন্ত্র। গণপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার বলতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত সরকারকে বোঝায়। সাধারণত এরূপ সরকারের ক্ষেত্রে পার্লামেন্ট বা আইনসভাই হয় সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী। এরূপ সরকারে আইনসভা বা পার্লামেন্ট হলো আইন প্রণয়নসহ জাতীয় ও রাজনৈতিক সকল সমস্যা সমাধানের কেন্দ্রবিন্দু।

সরকারি বিল (Government Bill)

জাতীয় সংসদে যে সকল বিল মন্ত্রিসভা বা মন্ত্রিসভার সদস্য কর্তৃক উত্থাপিত হয় সেগুলোকে সরকারি বিল বলা হয়। সরকারি বিল উত্থাপনের জন্য অনুমতির প্রস্তাব করতে চাইলে মন্ত্রীদেরকে ৭ দিনের নোটিশ দিতে হয়। অবশ্য স্পিকার পর্যাপ্ত কারণবশত এ বিধি স্থগিত করে নোটিশ প্রদানের সময় আরো কমিয়ে দিতে পারেন। যদি বিলটির ধরনে রাষ্ট্রপতির অগ্রিম সুপারিশের প্রয়োজন হয় তাহলে নোটিশের সাথে মন্ত্রীকর্তৃক এই মর্মে সার্টিফিকেট থাকে যে, বিলটি উত্থাপনের জন্য রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পাওয়া গেছে।

সরকারি প্রতিষ্ঠান (State Enterprise)

কোনো দেশের সরকার যে সকল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করে সে সকল প্রতিষ্ঠানগুলোকে সরকারি প্রতিষ্ঠান (State Enterprise) বলা হয়। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত কোনো সরকার দেশের অর্থনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করত না। কিন্তু বর্তমান শতাব্দীতে সমাজতান্ত্রিক চিন্তাধারা প্রসারের ফলে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ শুরু হয়। জনসাধারণ কর্তৃক পরিচালিত ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের

প্রধান উদ্দেশ্য হল মুনাফা অর্জন; কিন্তু সরকার কর্তৃক পরিচালিত প্রতিষ্ঠানের প্রধান উদ্দেশ্য হলো সাধারণ মানুষের কল্যাণ সাধন করা।

সরকারের কার্যকারিতা (Effectiveness of Government)

সরকারের কার্যকারিতা বলতে সরকার কতটুকু দক্ষতা ও সাফল্যের সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব ও জনকল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন কতে পারলো তা বুঝায়। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সরকারের কার্যকারিতা নিরূপণের ক্ষেত্রে 'প্রিন্সিপল অব ইফেকটিভনেস' (Principle of Effectiveness) নামে একটি তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে। পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় সরকারের কার্যকারিতা পার্লামেন্ট কত বিচক্ষণতা, দক্ষতা ও যোগ্যতার সঙ্গে কাজ করতে পারলো তার ওপর নির্ভর করে। উন্নয়নশীল ও দরিদ্র দেশগুলোতে সরকারের কার্যকারিতা দারিদ্র বিমোচন, বিভিন্ন শ্রেণি ও গোষ্ঠীর মধ্যে বিরাজমান অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস,নারী নির্যাতন রোধ এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে সরকারের গৃহীত পলিসি ও কার্যক্রমের ওপর নির্ভরশীল। এসব দেশে যে সরকার দারিদ্র বিমোচন সফল, বৈষম্য হ্রাসে তৎপর সে সরকার কার্যকর। সরকারের কার্যকারিতা আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির ওপরও নির্ভর করে। আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি সরকারের কার্যকারিতা শুধু নয় অস্তিত্বের জন্যও হুমকিস্বরূপ। সরকারের কার্যকারিতা সহিংসা তৎপরতা হ্রাস, সশস্ত্র গ্রুপ ও গোষ্ঠীগুলোর ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার ওপর নির্ভর করে। কার্যকর সরকার সামাজিক অস্থিরতা নিয়ন্ত্রণে রাখে। রাষ্ট্রের সমগ্র ভৌগোলিক অঞ্চলের ওপর সরকার কতটুকু ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে তার ওপরও কার্যকারিতা নির্ভর করে। সরকার কি বৈদিশিক নীতি প্রণয়নে স্বাধীন, প্রণীত নীতিতে অটল থাকতে সক্ষম এবং সরকারের গৃহীত নীতির প্রতি কি জনসমর্থন আছে-এসব প্রশ্নের সঙ্গে সরকারের কার্যকারিতা সম্পৃক্ত। (সূত্রঃ জালাল ফিরোজ, ঢাকা: *পার্লামন্টোরি শব্দকোষ*, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৮)।

সরকারের বৈধতা (Legitimacy of government)

সরকারের নানাবিধ দোষ-ত্রুটি থাকলেও আমরা উত্তম সরকারের প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে পারি। আলোচনা করার প্রথমেই ধরে নিতে হবে যে, আমরা কেবল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করছি। আধুনিক কালের সরকার মানেই গণতান্ত্রিক এবং এ ধারণাকে সামনে নিয়ে আলোচনা করব। একটি সরকার সুন্দরভাবে শাসন করলেই তাকে ভাল বলতে পারিনা। সরকারের বৈধতা না থাকলে সেটা কোনো সময়ে উত্তম হতে পারে না। অবৈধ সন্তান বা যে সন্তানের পিতা-মাতার কোনো পরিচয় নেই তাকে কোনো সময়ে সুসন্তান বলে অভিহিত করতে পারিনা। তেমনি কোনো সরকারের বৈধতা না থাকলেও তা যত ভাল শাসনই করুক না কেন, তাকে কোনো সময়ে উত্তম বলতে পারা যাবে না। উত্তম সরকারের শাসনই কেবল সুশাসনের মর্যাদা পেতে পারে। সরকারের বৈধতা না থাকলে সেটা জাতির জন্য মারাত্মক আত্মঘাতি ব্যাপার। টকভেলি মন্তব্য করেছেন যে, Loss of legitimacy is fatal for the nation। দক্ষতাসম্পন্ন

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চেয়ে কম দক্ষ স্বাধীন দেশের বৈধ সরকার উত্তম। বৈধ সরকার সেটাই যা ক্ষমতায় সমাসীন হয় আইনগতভাবে (A legitimate government is one which has come to office through a legally inviolable process of law)। বৈধ সরকারের ভিত্তি হবে যে, সরকারের পেছনে জনসমর্থন থাকবে। অর্থাৎ সরকার গঠিত হবে জনগণের দ্বারা এবং কাজও করবে জনগণের জন্য। জনসমর্থন হলো বৈধ সরকারের প্রকৃত কথা। লিপসনের কথায়, বৈধ সরকারের ভিত্তিই হলো শাসিতের সম্মতি (The consent of the governed is the foundation of all legitimate governments)। এখানে জোর-দখল করে ক্ষমতায় থাকার কোনো বিধান নেই। সেনা অভ্যুত্থান হলে সে সরকারের বৈধতা কোনো সময়ে থাকবে না। অবশ্য বিপ্লবের মাধ্যমে কেউ ক্ষমতায় এলে এবং তার দ্বারা ভাল কিছু অর্জিত হলে সে শাসনকে এ পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না। এসবের পেছনে জনসমর্থন থাকলে তা বৈধতা প্রাপ্ত হয়। সরকারের ক্ষমতা প্রয়োগের ধরনও হবে যুক্তিভিত্তিক। কোনো সময়ে জোর করে কিছু করা যাবে না। রবার্ট ঢালের মতে, সরকার ক্ষমতা প্রয়োগ করবে বৈধতার সাথে-শক্তি দিয়ে নয়।

সরকারের ঘোর বিরোধী দলও যেন ক্ষমতাসীনদের অবৈধ বলার সুযোগ না পায় সেরকম পদক্ষেপ নিয়ে চলতে হবে। একটি সরকার বৈধপথে ক্ষমতায় যেয়ে অবিরত অবৈধ কার্যকলাপ করলে তাকেও অবৈধ সরকারের পর্যায়ভুক্ত করা হয়। সাংবিধানিক সরকার বৈধতার দাবী করতে পারে। সংবিধান মোতাবেক যদি গঠিত ও পরিচালিত হয়, তবেই তাকে বৈধ সরকার বলে। বৈধ সরকার সর্বসাধারণের ভোটে নির্বাচিত হবে। অনেকের মতে, বৈধ সরকার যাচাইয়ের পদ্ধতি হলো জনসমর্থন বিচার করা (The criteria of legitimacy depend on the popular approval)। বৈধ সরকারের সংবিধান রচিত হবে আইনগত কর্তৃপক্ষের দ্বারা (Legal authority)। সংবিধান রচনার ভার অর্পিত হবে বৈধ কর্তৃপক্ষের দ্বারা। স্বৈরশাসক বা সামরিক জান্তার দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্রের আওতায় সরকার বৈধতা অর্জনে সমর্থ হবেনা। গণতান্ত্রিক সরকার একনায়কতন্ত্রের তুলনায় বৈধ। গণতন্ত্রে সর্বসাধারণের মতো প্রকাশের সুবিধা থাকে, একনায়কতন্ত্রে তা থাকে না। সেজন্য গণতান্ত্রিক শাসনে সরকারের ওপর সকলের আস্থা থাকে কিন্তু একনায়কতন্ত্রে তা থাকে না।

সরকারের বৈধতা ও অবৈধতা নিরূপণের মানদন্ড নির্ধারিত হবে স্বাধীন বিচার বিভাগের দ্বারা। কোনো ব্যক্তি বিশেষের দ্বারা তা না হয়ে আইনের শাসন কার্যকর হবে এবং তা বহালযোগ্য হবে নিরপেক্ষ বিচার বিভাগ কর্তৃক। রাজনৈতিক ব্যবস্থাকেও বৈধ হতে হবে। (সূত্র: ড. মো. মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

সর্বহারা (Proletariat)

যেসব মানুষের নিজেদের কোনো জমি বা উৎপাদননের উপকরণ নেই, যারা বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন মজুরির বিনিময়ে অন্যের সম্পত্তিতে কাজ করে, তারাই হলো

সর্বহারা শ্রেণি। মার্কসীয় দৃষ্টিতে মজুরির আয়ে জীবন কাটানো এই শ্রেণির মানুষের অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় সমইস্ত বলে কিছু থানে না। শ্রম বিক্রয়ের ওপর তা নির্ভরশীল। শ্রম মূলত কায়িক। বুর্জোয়া শ্রেণি দ্বারা শোষিত হয়। বুর্জোয়া শক্তির বিরুদ্ধে শ্রেণি সংগ্রাম ও সমাজতন্ত্রী বিপ্লবের সর্বাপেক্ষা বড় চালিকা শক্তি এবং কৃষক ও অন্যান্য শোষিত শ্রেণিকে সর্বহারাশ্রেণি নেতৃত্বদান করে। বর্তমানে বহু দেশে, বিশেষত সাবেক ঔপনিবেশিক দেশসমূহে এমন অনেক শিল্প শ্রমিক রয়েছে, যারা গ্রাম থেকে ছিন্নমূল নয় বরং যাদের গ্রামে নিজস্ব বাড়ি ও কমবেশি জোতজমিও রয়েছে। আবার উন্নত পুঁজিবাদী দেশসমূহে শমিকদের আজ শৃঙ্খল ছাড়াও হারানোর মতো রয়েছে মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা, ফ্রিজ টেলিভিশন, মোটর ইত্যাদি উপকরণ, ইন্স্যুরেন্সসহ বহুবিধ সুবিধা। ফলে এদের চরিত্র সাবেকি শিল্পশ্রমিকদের (সর্বহারাদের) তুলনায় অনেকখানি স্বতন্ত্র।

সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব (Dictatorship of the Proletariat)

সমাজের যে সকল লোক মানুষের নিজেদের কোনো জমি বা উৎপাদনের উপকরণ নেই, যারা বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন মজুরির বিনিময়ে অন্যের সম্পত্তিতে কাজ করে, তারাই হল সর্বহারা শ্রেণি বা শ্রমিকশ্রেণী বা প্রোলেটারিয়েট। প্রত্যেক সমাজ ব্যবস্থায় এই শ্রেণিটি শোষিত, বঞ্চিত ও নির্যাতিত। সর্বহারা শ্রেণির আন্দোলনের লক্ষ্য হলো বুর্জোয়া কুসংস্কার, বুর্জোয়া আইন, বুর্জোয়া দখলিস্বত্ত্বকে নির্মূল করা। শোষণের ওপর প্রতিষ্ঠিত আধুনিক বুর্জেয়া ব্যক্তিগত মালিকানা উচ্ছেদ করা। বুর্জোয়া রাষ্ট্রশক্তিকে হটিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত সর্বহারা শ্রেণির রাষ্ট্রশক্তি। একনায়কত্ব কথাটির দ্বারা একের ওপর অন্যশ্রেণীর আধিপত্য বোঝায়। যেহেতু সর্বহারা শ্রেণি রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের পরপরই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের হুমকিও অবসান ঘটে না, সেহেতু শ্রেণির অবসান না হওয়া পর্যন্ত শ্রমজীবী মানুষের শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য সর্বহারাশ্রেণির একনায়কত্ব অনিবার্য হয়ে পড়ে। সর্বহারা শ্রেণি তার একনায়কত্ব ব্যবহার করে শোষকগোষ্ঠীর বাধাকে প্রতিহত করার জন্য, বিপ্লবের বিজয়কে সুসংহত করার জন্য, বুর্জোয়াদের পুনরভ্যুত্থানের যাবতীয় প্রয়াসকে ব্যহত করার জন্য এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার চক্রান্তকে বানচাল করার জন্য। কিন্তু, সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের প্রধান কাজ সৃষ্টিশীল ও গঠনমূলক; আর সেটা হল ব্যাপক শ্রমজীবী জনগণের সমাজতান্ত্রিক আদর্শ ও মূল্যবোধে উদ্বুদ্ধ করা। সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্ব কোনো লক্ষ্য নয়, শ্রেণিহীন-শোষকহীন সমগ্র জনগণের সমাজ প্রতিষ্ঠান অপরিহার্য ধাপমাত্র। এর অন্যতম মৌল নীতি হলো সর্বহারাশ্রেণির নেতৃত্বে শ্রমজীবী জনগণ ও কৃষকদের মৈত্রী গড়ে তোলে। সর্বহারা শ্রেণির পার্ট, যা মেহনতি মানুলেরই অগ্রণী বাহিনী, এই একনায়কত্বের নেতৃত্বে থাকে ও প্রধান পরিচালিকা শক্তির দায়িত্ব পালন করে। সর্বহারা শ্রেণির একনায়কত্বের সহায়ক হিসেবে থাকে জনগণ, শ্রমিক, কৃষক, যুবক, মহিলা ও ছাত্রদের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান, বিভিন্ন সমবায়, ট্রেড ইউনিয়ন ইত্যাদি। এগুলোই জনগণের সঙ্গে সর্বহারাশ্রেণির সেতুবন্ধ হিসেবে কাজ করে।

সর্বাধিনায়ক (Commander-in-Chief)

কোনো দেশের সশস্ত্রবাহিনীর প্রধানকেই বলে সর্বাধিনায়ক। সাধারণত দেশের রাষ্ট্রপ্রধানই সর্বাধিনায়কের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁর অধীনে সশস্ত্রবাহিনী অর্থাৎ স্থলবাহিনী, নৌবাহিনী, বিমানবাহিনী, আধাসামরিক বাহিনী ইত্যাদির আলাদা আলাদা প্রধান বা চিফ অব স্টাফ (Chief of Staff) থাকতে পারেন।

সল্ট (Strategic Arms Limitation Talks) SALT

সল্ট চুক্তির সহজ নাম হলো সুপরিকল্পিত অস্ত্র সীমিতকরণ আলোচনা বা সংক্ষেপে SALT| দুই পরাশক্তি সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা ১৯৬৯ সালের ১৭ নভেম্বর হেলসিংকিতে মারাত্মক অস্ত্র সীমিতকরণের জন্য সর্বপ্রথম মিলিত হন। এরপর কয়েক দফায় তাঁদের মধ্যে এই আলোচনা অনুষ্ঠানের পর ১৯৭২ সালে মস্কোতে অআমেরিকা ও সোভিয়েত নেতৃবৃন্দের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। আন্ত মহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ভূগর্ভে পারমাণবিক বিস্ফোরণ, বিভিন্ন প্রকার পারমাণবিক ও রশ্মিবোমা সীমিতকরণ ইত্যাদিই ছিল এই আলোচনার বিষয়বস্তু। একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য অর্থাৎ পাঁচ বছরের জন্য আক্রমণাত্মক অস্ত্র নির্মাণ বন্ধ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কিন্তু এই চুক্তি সম্পূর্ণরূপে বাস্তবায়িত হয়নি। ১৯৭৯ সালে পুনরায় ভিয়েনাতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে দ্বিতীয় সল্ট চুক্তি সম্পাদিত হয়। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক আফগানিস্তান আক্রমণের ফলে এই চুক্তি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান (Insurrection)

অত্যাচারী ও শোষণমূলক শাসনগোষ্ঠীর হাত থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের উদ্দেশ্য বিপ্লবী নেতৃত্বে পরিচালিত ও সংঘটিত জনগনের সশস্ত্র অভ্যুত্থানই হলো সশস্ত্র গণঅভ্যুত্থান বা Insurrection নিয়মতান্ত্রিক বা শান্তিপূর্ণ উপায়ে যখন অত্যাচার শাসন-শোষন গোষ্ঠীকে সরানো আর সম্ভবপর হয় না, তখনই জনগণ বা গণসমর্থিত রাজনৈতিক দল এই পথ বেছে নেয়।

সাংবিধানিক আইন (Constitutional Law)

সাংবিধানিক আইন বলতে সংবিধানের শুধু ওই সকল বিধানকেই বোঝায় যা আদালতের মাধ্যমে বলবৎ যোগ্য (কারণ প্রকৃত অর্থে আইন বলতে বোঝায় ওই সকল নিয়ম-নীতিকে যা আদালত বলবৎ করতে পারে)। এই অর্থে সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অপরিহার্যভাবে সাংবিধানিক আইন নয়, কারণ আদালত এগুলোকে বলবৎ করতে পারে না। সাংবিধানিক আইন (Constitutional law in general) বলতে সংবিধানে যেসব বিধান আছে তা সব এবং সংবিধান অতিরিক্তও কিছু বোঝায়।

অর্থাৎ সাংবিধানিক আইনের যা কিছু আলোচ্য বিষয় তা সবই সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। এই অর্থে সংবিধানের প্রস্তাবনা, রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি যা আদালতে বলবৎযোগ্য নয় তাও সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত। আবার, যে সকল বিধান সংবিধানে লেখা নেই কিন্তু সরকার পরিচালনায় অপরিহার্য (যেমন-মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কেবিনেট, কংগ্রেসের কমিটি ইত্যাদি) তাও সাংবিধানিক আইনের অন্তর্ভুক্ত।

সাংবিধানিক রাজতন্ত্র (Constitutional Monarchy)

সাধারণত সাংবিধানিক রাজতন্ত্র বলতে নিয়মতান্ত্রিক রাজতান্ত্রিক রাজতন্ত্রকে বোঝায়। এই ধরনের শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি নিয়মতান্ত্রিক প্রধান। তাঁর নামে রাষ্ট্রের যাবতীয় নির্বাহী কার্যবলী সম্পাদিত হয়। তবে তিনি প্রকৃত শাসক নয়; প্রকৃত শাসন ক্ষমতা প্রয়োগ করেন পার্লামেন্ট। বস্তুত যে শাসনব্যবস্থায় রাজা বা রানি কতকগুলো নির্দিষ্ট সংবিধানের বিধির ও নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ এবং কার্যত যেখানে পার্লামেন্টই প্রকৃত ক্ষমতার অধিকারী সেইরূপ রাজতন্ত্রকে বলা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্র। ব্রিটেন, জাপান, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস, ডেনমার্ক, নেপালসহ পৃথিবীর কয়েকটি দেশে এরূপ রাজতন্ত্র চালু আছে।

সাংস্কৃতিক বিপ্লব (Cultural Revolution)

সাধারণত জনগণের অবস্থিত চিন্তা চেতনা ও ধ্যান-ধারণাকে দ্রুত পাল্টে দেওয়ার কার্যক্রমকেই বলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সমাজের অর্থনৈতিক ও সামাজিক ভিত্তির বৈপ্লবিক রূপান্তরের সহায়ক মার্কসীয় তত্ত্ব অনুসারী বৈপ্লবিক চেতনায় বস্তু ও আদর্শগত যেসব ভুলভ্রান্তি থাকে তার মানসিক তথা সাংস্কৃতিক পরিমার্জনের জন্য লেনিন কর্তৃক প্রবর্তিত একটি প্রত্যয়। তবে ইতিহাসে সাংস্কৃতিক বিপ্লব বলতে সাধারণত ষাটের দশকের চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লবকেই বোঝায়। বস্তুগত অবস্থা ও আত্মগত অবস্থা, উভয়েরই পূর্ণতাপ্রাপ্তির ওপর বিপ্লব নির্ভর করে; অর্থাৎ বাস্তব পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সুসামঞ্জস্য মনোগত ভাবভঙ্গীর যুগপৎ রূপান্তর চাই। উপযোগী মনোগত অবস্থা আত্তীকরণের একটি আবশ্যকীয় মাধ্যম হলো সাংস্কৃতিক বিপ্লব, যার ফলে বুর্জোয়া সংস্কৃতিগত রীতিনীতি ও অভ্যাসগুলো ভেঙে পড়ে; এবং তাতে পুরানো অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাংস্কৃতিক ভিত্তিভূমির মাটিও যেন পায়ের তলা থেকে সরে যায়।

আধুনিক পর্যায়ে প্রত্যয়টি অনেকটা বিস্তারিত হয়েছে গ্রামশির তত্ত্বে এই অর্থে যে সাংস্কৃতিক আধিপত্য (hegemony) নিশ্চিহ্ন না হলে বিপ্লব সফল হয় না। এ ছাড়া এ শতকের ষাটের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে চীনের সাংস্কৃতিক বিপ্লব বাস্তবক্ষেত্রে প্রত্যয়টির প্রয়োগের অভিজ্ঞতা অর্জনে সাহায্যে করে। চীনের আমলাতন্ত্র ও শিক্ষিত উচ্চবিত্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছিল; বলা বাহুল্য উদ্দেশ্য ছিল সমাজতান্ত্রিক উন্নয়নের অনুকলে মনোগত অবস্থা সৃষ্টি করা ; কিন্তু আন্দোলনের ধারা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়; উলটো পুরানো রীতিনীতির প্রতি লোকের আসক্তি সুদৃঢ় হয়। শিল্প,

সাহিত্য, সঙ্গীত ও শিক্ষাব্যবস্থায় পশ্চিমা সংস্কৃতি ও বুর্জোয়া প্রভাব থেকে মুক্তির সংগ্রামী প্রয়াসের সময় যাঁদের পশ্চিমা ধারার প্রতি প্রবণতা বেশি ছিল তাঁদের নিগ্রহ ও পদাবনতির ক্ষমতা দেওয়া হয় অর্বাচীন রেড গার্ডদের। এখানে মনে করা হয় যে, রেড গার্ডরা ব্যক্তিস্বার্থে ও ব্যক্তিগত আক্রোশ মেটানোর জন্যই সাংস্কৃতিক বিপ্লবকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে।

সাধারণ অধ্যাদেশ প্রণয়ন (Make General Ordinance)

সংবিধানের ৯৩ অনুচ্ছেদের (২) দফার অধীন প্রণীত কোনো অধ্যাদেশ রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারি হওয়ার পর অনুষ্ঠিত সংসদের প্রথম বৈঠকে তা উপস্থাপন করতে হয়। অন্যথায় ত্রিশ দিন অতবাহিত হলে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হয়ে যায়। ইতোপূর্বে বাতিল না হলে অধ্যাদেশটি অনুরূপভাবে উপস্থাপনের পর ত্রিশ দিন অতিবাহিত হলে কিংবা অনুরূপ মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পূর্বে অননুমোদন করে সংসদে গৃহীত হলে অধাদেশটির কার্যকারিতা লোপ পাবে। তবে এই দফার অধীন প্রণীত অধ্যাদেশ জারির পর যে কোনো সময় রাষ্ট্রপতি তা বাতিল করতে পারেন। কিন্তু কোনো অধ্যাদেশ সংসদে উপস্থাপনের পর রাষ্ট্রপতি কর্তৃক জারিকৃত অধ্যাদেশ রহিত বা বাতিল করার সুযোগ থাকে না। ভারতের রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে মন্ত্রীপরিষদের পরামর্শ অনুসারে এ ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারেন। সেখানে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা কেবল তখনই লাভ করে যখন সংসদের কোনো কক্ষের মেয়াদের অবসান ঘটেছে অথবা অন্য কোনো কারণে অধিবেশন স্থগিত বা মুলতবি থাকায় সংসদে আইন প্রণয়ন সম্ভব হচ্ছে না। সংসদের উভয় কক্ষের অধিবেশন যখন চলে তখন রাষ্ট্রপতির এই ক্ষমতা থাকে না। সংবিধান অনুসারে রাষ্ট্রপতি অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা আইনসভার আইন প্রণয়ন করার ক্ষমতার সমতুল্য ক্ষমতা বা সমান্তরাল ক্ষমতা। কেননা, যখন আইনসভা আইন প্রণয়ন করতে পারে রাষ্ট্রপতির তখন অধ্যাদেশ জারি করার ক্ষমতা থাকে না।

সাধারণ ক্ষমা (General Amnesty)

কোনো সরকার বা কর্তৃপক্ষ যখন কোনো ঘোষণা দ্বারা সকল রাজবন্দি বা যুদ্ধবন্দিকে মুক্ত করে দেয়, তাকে সাধারণ ক্ষমা বলা হয়। তাছাড়া এই ঘোষণা দ্বারা সকল সাজাপ্রাপ্ত, বিচারাধীন ও অভিযুক্ত নির্বিশেষে কোনো ধরনের অপরাধী সাজামুক্ত হয় তখন তাকেই সাধারণ ক্ষমা বলে।

সাধারণ নির্বাচন, ১৯৫৪ (General Election, 1954)

মুসলিম লীগের রাজনৈতিক নিপীড়ন এবং পূর্ব বাংলার প্রতি অর্থনৈতিক বৈষম্যের প্রেক্ষাপটে ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচন ছিল অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের মুসলিম লীগকে মোকাবিলা করার জন্য বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো একটি যুক্তফ্রন্ট গঠন করে। মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, এ কে

ফজলুল হক এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ, কৃষক-শ্রমিক পার্টি, নেজামে ইসলাম এবং গণতন্ত্রী দালের সমন্বয়ে ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর যুক্তফ্রন্ট গঠিত হয়। পূর্ববাংলার গণমানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষাকে প্রতিফলিত করে যুক্তফ্রন্ট ২১ দফাভিত্তিক নির্বাচনী ইশতেহার প্রণয় করে। বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দান, কৃষকদের অগ্রগতি সাধন, দেশে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান, দুর্ভিক্ষের অভিশাপ দূর করা, পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা ও অর্থ ব্যতীত পূর্ব বাংলাকে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন দানই ছিল ২১ দফার মুল বিষয়বস্তু। ২১ দফাকে সামনে রেখে ১৯৫৪ এর মার্চ মাসে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মুসিলম লীগ শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং যুক্তফন্ট বিপুল সংখ্যাধিক্যের জয়লাভ করে। এই নির্বাচনে মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট লাভ করে ২২৩টি আসন, মুসলিম লীগ লাভ করে ৯টি আসন, খেলাফতে রব্বানী ১টি আসন এবং অবশিষ্ট ৪টি আসন লাভ করে স্বতন্ত্র প্রার্থীরা। ৩০ টি আসনের মধ্যে ৭টি হিন্দু আসনের জন্য কংগ্রেস পায় ২৪টি, তফসিল ফেডারেশন ২১টি, যুক্তপ্রন্ট ১৩টি, ২টি বৌদ্ধ, ৪টি কম্যুনিস্ট পার্টি এবং স্বতন্ত্র প্রার্থীরা লাভ। করে ৪টি আসন। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, পূর্ব বাংলার জনগণ স্বায়ত্তশাসন ও স্বাধিকারের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ।

সাধারণ নির্বাচন, ১৯৭০ (General Election, 1970)

'৬৯ এর গণআন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সামরিক শাসক ইয়াহিয়া খান ১৯৭০ সালে সমগ্র পাকিস্তানের সাধারণ নির্বাচন দিতে বাধ্য হয়। এই নির্বাচনেই ছিল স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের প্রাথমিক পদক্ষেপ। '৭০-এর ৭ ডিসেম্বর জাতীয় পরিষদের এবং ১৭ ডিসেম্বর প্রাদেশিক পরিষদের নির্বাচন সমাপ্ত হয়। তবে বন্যা ও জলোচ্ছাসের কারণে কয়েকটি আসনের '৭১-এর ১৭ জানুয়ারি নির্বাচন হয়। ওই নির্বাচনে আওয়ামী লীগ অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করে। পূর্ব বাংলার ১৬৯ টি আসনের ১৬৭টি এবং প্রাদেশিক পরিষদের ৩০০টি আসনের ২৮২টি আসনে দখল করে আওয়ামী লীগ। আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব মুকুটহীন রাজায় পরিণত হন। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ পাকিস্তানের সংখ্যাগরিষ্ঠ দল হিসেবে জনসমর্থন লাভ করেন এবং বৈধতার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। বাংলাদেশের অভ্যুদয়ে এই নির্বাচন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এ নির্বাচনের জনগণ ৬ দফার প্রতি ম্যান্ডেট দান করে এবং বাঙালি জাতি প্রথমবারের মতো স্বশাসন ও আত্মপ্রতিষ্ঠার সুযোগ লাভ করে। এমনকি দেশের বাইরে বিশ্ব জনমত সংহত করার ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালের নির্বাচন হয়ে ওঠে এক সুস্পষ্ট মাইলফলক।

সাধারণ পরিষদ, জাতিসংঘের (United Nations' General Assembly)

জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ যেকোনো দেশের আইন সভা বা পার্লামেন্টের সাথে তুলনীয়। একে বিশ্বের আইনসভা বললেও অতুক্তি করা হয় না। জাতিসংঘের সকল

সদস্য নিয়ে এই পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৬ সালের ১০ জানুয়ারি থেকে সাধারণ সভার কাজ শুরু হয়। এর বার্ষিক অধিবেশন অন্তত একবার আহূত হবে। প্রত্যেক সদস্য রাষ্ট্র পাঁচজন প্রতিনিধি ও পাঁচজন বিকল্প প্রতিনিধি পাঠাতে পারে। প্রত্যেক সদস্যরাষ্ট্রের একটির বেশি ভোট প্রধান করবে না। তবে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য উপস্থিত এবং ভোটদানকী সদস্যেও দু-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়। প্রতি বছরের সেপ্টেম্বর মাসের তৃতীয় মঙ্গলবারে এই পরিষদের বার্ষিক অধিবেশন শুরু হয়। এটি এর নিয়মিত অধিবেশন। এছাড়াও অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের অনুরোধে বিশেষ অধিবেশন আহ্বান করতে পারে। নিরাপত্তা পরিষদ কিংবা মোট সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ চাইলে সেক্রেটারি জেনারেল জরুরি অধিবেশন আহ্বান করতে পারেন। জাতিসংঘে কোনো সদস্যের অন্তর্ভুক্তি বা বহিষ্কার, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা প্রশ্নে সুপারিশ প্রণয়ন, জাতিসংঘের অন্যান্য পরিষদ ও সংস্থায় সদস্য নির্বাচন, অছিসংক্রান্ত বিষয়ে সিদ্ধান্তগ্রহণ, বাজেট সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিরূপণ ইত্যাদিই সাধারণ পরিষদের কর্মপরিসরের অন্তর্ভুক্ত। কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতি এবং উপস্থিত সদস্যদের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থন প্রয়োজন হয়। সেক্রেটারি জেনারেল এবং নিরাপত্তা পরিষদসহ জাতিসংঘের সকল পরিষদ ও সংস্থা তাদের কার্যবিবরণী এই পরিষদে পেশ করে এবং পরিষদ তা আলোচনা করে সাধারণ নীতিমালা নির্ধারণ করে। সাধারণ পরিষদের কার্যাবলী মূলত এর চারটি কমিটি যথা, মূল কমিটি, পদ্ধতিগত কমিটি, স্ট্যান্ডিং কমিটি ও অ্যাডহক-হক কমিটির মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। এই পরিষদের প্রত্যেক অধিবেশনের জন্য একজন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সাধারণ সভায় তিনি সভাপতিত্ব করেন, আলোচনার পদ্ধতি নির্ধারণ, অধিবেশনের কার্যক্রম বিধিনুযায়ী চলছে কিনা সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখেন। তিনিই সদস্যদো বক্তৃতা ও বক্তব্য পেশের সুযোগ করে দেন। বিভিন্ন প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা করা ও সিদ্ধান্ত ঘোষণা, মুলতবি ঘোষণার ভার তাঁর ওপরই ন্যস্ত। বস্তুত সাধারণ সভা হচ্ছে। এমন একটি ফোরাম যেখানে জাতিসংঘের সকল সদস্য প্রতি এক বছর পূর্ণ অধিবেশনে মিলিত হয়ে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মৌলিক বিষয়াদি ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠান ও সেগুলো বিবেচনা করে। প্রতি বছর বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমস্যাদি ও ইস্যুসমূহ যা রাষ্ট্রের গণ্ডি ছাড়িয়ে যায় সেগুলো আলোচনাতে স্থান পায়। উক্ত বিষয়াদির ব্যাপারে তাঁদের স্ব স্ব রাষ্ট্রের অভিমত ব্যক্ত করে তার প্রতি বিশ্ব মতের সমর্থন আদায় করেন।

সাধারণ বিল (General Bill)

যে বিলে রাষ্ট্রের কোনো অর্থ ব্যয়ের বা করারোপের প্রশ্ন জড়িত থাকে না এবং যা দেশের আইন প্রণয়ন বা সংশোধনের জন্য আনীত হয় তাকে সাধারণ বিল বলে। একটি সাধারণ বিল সাধারণ স্বার্থ সম্পর্কিত, বিশেষ স্বার্থ সম্পর্কিত অথবা দ্বি-জাতীয় হতে পারে।

সাপটা (SAARC Preferential Trade Arrangements (SAPTA)

সাফটার পূর্ণ নাম হচ্ছে দক্ষিণ এশিয় বাণিজ্য এলাকা। সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে তোলার উদ্দেশেই এই কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। এই লক্ষ্যে ২০০৪ সালের ৬ জানুয়ারি ইসলামাবাদে ১২তম সার্ক শীর্ষ সম্মেলনে সদস্য রাষ্ট্রগুলোর পররাষ্ট্রমন্ত্রীগণ সাফটা চুক্তি স্বাক্ষর করেন। পরবর্তীতে ঢাকায় অনুষ্ঠিত সার্কেও ১৩তম শীর্ষ সম্মেলনে ২০০৬ সালের ১জানুয়ারি থেকে তা কার্যকর করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এতে সার্কভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে পারস্পরিক ব্যবসা-বাণিজ্য উন্নয়নকল্পে পরস্পরকে অগ্রাধিকারমূলক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। এটা বাস্তবায়িত হবে কতগুলো প্রক্রিয়া দ্বারা; যেমন-১. সার্কের সদস্য রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে পারস্পরিক বাণিজ্য উদারীকরণ কর্মসূচি; ২.প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা; ৩. পরামর্শকরণ ও বিবাদ নিষ্পত্তি পদ্ধতি; ৪. নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থাদি; ৫. রুল্‌স অব অরিজিন সুনির্দিষ্টকরণ; এবং ৬.বাণিজ্যে বাধাসমূহ দূরীকরণে আলাপ-আলোচনা। এই সুযোগ-সুবিধার অন্যতম হচ্ছে সদস্যভূক্ত দেশসমূহের মধ্যে পণ্য আমদানি-রফতানির ক্ষেত্রে বাণিজ্যশুল্ক রহিতকরণ বা হ্রাস করা।

সাপটার (SAPTA) **গুরুত্ব:**

৬. সাপটা চুক্তি সার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সার্কের সদস্য রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে আন্তঃরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক জোরদার করার ক্ষেত্রে সাপটা চুক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৭. আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৃহৎ রাষ্ট্রগুলো কর্তৃক সংরক্ষণবাদী নীতি গৃহীত হওয়ার ফলে দক্ষিণ এশীয় রাষ্ট্রসমূহের বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থায় আন্তঃবাণিজ্য বৃদ্ধির উদ্দেশে সাপটা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

৮. প্রাথমিকভাবে সার্কভুক্ত দেশগুলো বাণিজ্যের ক্ষেত্রে নীতিগতভাবে ১০% হারে শুল্ক হ্রাস করতে সম্মত হয়েছে। এর ফলে আন্তঃরাষ্ট্র বাণিজ্যকে অধিকতর উৎসাহ প্রদান করা হয়েছে।

৯. সাপটা চুক্তির ফলে সার্কভুক্ত দেশগুলোর যৌথ উদ্যোগে শিপিং, সার, বিদ্যুৎশক্তি প্রভৃতি ক্ষেত্রে শিল্প প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে।

১০. সাপটা চুক্তি কার্যকর হওয়ার পর দক্ষিণ এশীয় অঞ্চলে একটি মুক্ত বাণিজ্য এলাকা গড়ে ওঠার সম্ভাবনা সৃষ্টি হবে।

সাভাক (SAVAC)

ইরানের শাহ মুহম্মদ রেজা শাহ পাহলোভীর শাসন শেষ হওয়ার সঙ্গেই তার সিক্রেট সার্ভিস 'সাভাক' ও শেষ হয়ে যায়। ১৯৭৯ সালে ইসলামী বিপ্লবে আয়াতুল্লাহ খোমেনীর সমর্থকরা সাভাকের কোমিতেহ বিল্ডিং-এ তৈরি প্রধান কার্যালয়ে ঢুকে এর

ফাইলপত্র বিনষ্ট করে এবং সাভাক এর তৃতীয় ও শেষ প্রধান জেনারেল নিয়ামতোউল্লাহ নসীরীকে গুলো করে হত্যা করা। ১৯৫৬ সালে সিআইএ ও মোসাড-এর সাহায্যে স্থাপিত 'সাভাক'-এর প্রথম প্রধান ছিলেন জেনারেল তৈমুর বখতিয়ার।

সামগ্রিক ভারসাম্য (Total Equilibrium)

সাধারণ বা সামগ্রিক ভারসাম্য বলতে দেশের গোটা অর্থনৈতিক ব্যবস্থার ভারসাম্যকেই বোঝায়। সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনায় অর্থনৈতিক ঘটনার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, অব্যাবহিত ও সুদূর প্রতিক্রিয়াগুলোর সকলই বিবেচিত হয়। বস্তুত আংশিক ভারসাম্যের আলোচনা সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত। কীভাবে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিভিন্ন অংশগুলি পরস্পর সম্পর্কযুক্ত, কীভাবে বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ পরস্পরকে প্রভাবিত করে তা সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনায় বিবেচনা করা হয়। সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনায় বিবেচনা করা হয়। সাধারণ ভারসাম্যের আলোচনা অর্থনৈতিক সমষ্টিগত বিশ্লেষণের (Micro-economic Analysis) অন্তর্ভুক্ত।

সামন্তবাদ (Feudalism)

সামন্তবাদ দাস বা আদি গোষ্ঠীব্যবস্থাকে অপসারিত করে উদ্ভূত সমাজব্যবস্থা। সামন্তসমাজের দুই প্রধান শ্রেণি হল সামন্ত প্রভু এবং ভূতি দাস বা কৃষকেরা। সমকালীন অমাত্য এবং চার্চ বা ধর্মীয় পুরোহিতেরাও ছিল শোষক সামন্তপ্রভূদের গোত্রভূক্ত। শোষিত কৃষক বা ভূমিদাসদের কোনো রাজনৈতিক অধিকারই ছিল না। শহরগুলো ছিল মালিক, ভ্রাম্যমাণ শ্রমিক, শিক্ষানবিশ, অদক্ষ শ্রমিক প্রভৃতি অধ্যুষিত। সামন্তবাদী ব্যবস্থায় জমির মালিক ছিল ভূস্বামী বা সামন্তপ্রভূ। কৃষক বা ভূমিদাসদের জমির ওপর কোনো স্বত্ব ছিল না। সবচেয়ে বড় কথা, ভূমিবাদরা সংশ্লিষ্ট সামন্তপ্রভূর সঙ্গে ব্যক্তিগত আনুগত্যের বন্ধনে আবদ্ধ থাকতে বাধ্য ছিল এবং কার্যত তারা পরোক্ষ পণ্যরূপেই ব্যবহৃত হত, যেমন সামন্তপ্রভু তার জমিদারি বিক্রয় বা হস্তান্তরিত করে দিলে, ওই জমিদারিস্থ ভূমিদাসরাও নতুন প্রভূর হাতে হস্তান্তরিত হয়ে যেত। দাসদের সঙ্গে ভূমিদাসদের পার্থক্য ছিল এই যে, ভূমিদাসদের ক্রীতদাসদের মতো বাজারে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করা হত না এবং তারা আলাদা গৃহস্থালি, সামান্য যন্ত্রপাতি ইত্যাদি নিজেদের এ খাতওয়ারে রাখতে পারত। এই ব্যবস্থায় শ্রম-খাজনা, সেবা-খাজনা এবং কোনো কোনো ক্ষেত্রে মুদ্রা-খাজনারও প্রচলন ছিল। অধিকাংশ সময় এই খাজনা শুধু ভূমিদাসের উদ্বৃত্ত শ্রমই নয়, প্রয়োজনীয় শ্রমটুকু পর্যন্ত শোষণ করে নিত। উপরিকাঠামোর সামন্তবাদের মূল বৈশিষ্ট্য ছিল : ১. সামন্তবাদী রাষ্ট্র অনিবার্যভাবেই নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের ওপর অধিষ্ঠিত ছিল এবং ২. সমাজের আধ্যাত্মিক জীবনের ওপর ধর্মীয় আদর্শের ছিল একচ্ছত্র প্রভাব। সামন্তবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চরিত্র ছিল প্রধানত স্থবির এবং প্রযুক্তি ছিল খুবই প্রাথমিক ধরনের (সূত্র: হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

সাময়িক যুদ্ধবিরতি (Armistice)

সাধারণত যুদ্ধরত রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে স্থায়ী শান্তি-চুক্তির উদ্দেশ্যে আলাপ-আলোচনা আরম্ভ করার জন্য সাময়িক যুদ্ধবিরতি বা সাময়িক সন্ধি হয়ে থাকে। যুদ্ধে ব্যপৃত দুটি জাতি বা রাষ্ট্রের মধ্যে যুদ্ধবিরতি-চুক্তি হয়ে থাকে। সাধারণতঃ এই সন্ধি সামরিক সেনাপতিদের দ্বারা করা হয়। তবে স্থানীয় বা আংশিক স্বল্পকাল স্থায়ী যুদ্ধবিরতি-সন্ধির বিকল্প হিসেবে গ্রহণ করা হয়। কূটনৈতিক প্রতিনিধি এবং প্রধান সেনাপতিদের দ্বারা এটা সাধারণতঃ সংঘটিত হয়ে থাকে।

সামরিক আইন (Martial Law)

রাজার সেনাপ্রধান (King's Marshal) যে আইনের মাধ্যমে এই court পরিচালনা করত তাকে বলা হতো Marshal Law (Law administered by the King's Marshal)। এই Marshal Law শব্দের বানান পরিবর্তিত হয়ে পরবর্তীতে Martial Law নামে পরিচিত লাভ করে। এই Marshal Law ইংল্যান্ডে Common Law এর বিধান অনুযায়ী ছিল না; Marshal এর পরামর্শ অনুযায়ী রাজা সৈন্যদের আচরণ নিয়ন্ত্রণ ও শাস্তি বিধানের জন্য এবং জরুরি ভিত্তিতে দাঙ্গা বা বিদ্রোহ দমনের জন্য কতগুলো order বা regulation জারী করত যা court marshal কার্যকর করত। এই আইনগুলোই Marshal Law নামে পরিচিতি লাভ করে।

সামরিক গণতন্ত্র (Military Democracy)

রাষ্ট্রের উদ্ভবের সময় যে গণতন্ত্রের সূচনা হয়, সেটিকেই মরগ্যান সামরিক গণতন্ত্র নাম দিয়েছেন। প্রাচীন গ্রিসে (খ্রিস্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে নবম শতাব্দী), রোম (খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম-ষষ্ঠ শতাব্দী) প্রভৃতি এলাকায় এই গণতন্ত্রের উদ্ভব ঘটে। এই তন্ত্রকে সামরিক গণতন্ত্র বলার কারণ এই যে, এই সময় জননেতা, সামরিক নেতা ও ধর্মীয় নেতাদের হাতে ক্রমবর্ধমানহারে ক্ষমতা পুঞ্জীভূত হতে থাকে এবং নবগঠিত রাষ্ট্রের সম্পদবৃদ্ধির একমাত্র উপায় হিসাবে অন্য দেশ জয় বা লুণ্ঠন করার উদ্দেশে ক্রমাগত সামরিক অভিযান পরিচালনা করা হতে থাকে। ফলশ্রুতিতে একটি সাময়িকগোষ্ঠীই কার্যত রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব ও বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা একচ্ছত্র ভোগের সুযোগ লাভ করে। বর্তমান সময়েও অনুন্নত বিশ্বের কিছু কিছু দেশে সামরিক বাহিনীর সদস্য ও কর্তারা রাষ্ট্রক্ষমতা হস্তগত করে রাষ্ট্রীয় সুযোগ-সুবিধাদি অনেকটা একচ্ছত্রভাবেই ভোগ করেন। জনগণের নামে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত করা ও সুযোগ-সুকিধা ভোগের এই আধুনিক প্রক্রিয়াকেও অনেকে সামরিক গণতন্ত্র বলে মনে করেন। আর সামরিক বাহিনী মূল ক্ষমতায় থেকে জনগণের যে নিয়ন্ত্রিত গঠনতান্ত্রিক অধিকারাদি প্রদান করে, সেটাকেও অনেকে সামরিক গণতন্ত্র বলে অভিহিত করেন।

সামরিক শাসকচক্র (Junta)

সশস্ত্র বাহিনী কর্তৃক পরিচালিত শাসকচক্র। সশস্ত্রবাহিনী দুভাবে ক্ষমতায় আসতে পারে। ক্ষমতাসীন কোনো গোষ্ঠী বা উপদল বোঝাতেও শব্দটির প্রচলন আছে, বিশেষ করে যেখানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতির পরিবর্তে সেনানী গোষ্ঠী বলপ্রয়োগ করে রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করে। ক্ষমতাসীন সেনানী সংসদ এককভাবে সামরিক সরকারের মাধ্যমে যাবতীয় আইন প্রনয়নের ও নির্বাহী বিভাগের কাজ করে।

সামরিকীকরণ (Militarization)

কোনো জাতি বা তার অংশবিশেষকে সামরিক আদর্শ ও দৃষ্টিভঙ্গী অনুযায়ী বিন্যস্ত করা বা সামরিক বাহিনীসুলভ মনোবৃত্তিসম্পন্ন করে তোলাকে বলে সামরিকীকরণ। সাধারণত সমরনায়করা রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করলে কখনো কখনো এ-নীতি গ্রহণ করেন। আবার দেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব আক্রান্ত বা বিপন্ন হলে বা বিপন্নের সম্ভবনা দেখা দিলেও জনগণের সামরিকীকৃত করতে দেখা যায়।

সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory)

সামাজিক চুক্তি মতবাদে বিশ্বাসীদের অনুসারে রাষ্ট্র চুক্তির প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সমর্থনকারীদের অভিমতে, চুক্তি সম্পাদনের পূর্বে মানুষ আইন ও শাসনহীন অবস্থায় প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস করতো। তাদের শাসন করার কেউ ছিল না এবং কোনো নিয়ম-নীতিও মান্য করতে হত না। প্রাকৃতিক বিধানানুসারে সব পরিচালিত হত। কালক্রমে মানব মনে সন্দেহের জন্ম লাভ করে যে, কোনোটি প্রাকৃতিক আইন বা কোনোটি প্রাকৃতিক আইন নয়। তাছাড়া আইন ভঙ্গকারীকে চিহ্নিত ও শাস্তি প্রদানের কেউ ছিল না। এ কারণে নিজেদের মধ্যে চুক্তি সম্পাদনে নিয়ম অনুসারে পরিচালিত হবার জন্য একত্রিত হয়। প্রথমে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করার চুক্তি সম্পাদন করে এবং পরে তা রাষ্ট্রীয় চুক্তিনামায় পরিণত হয়। এভাবে প্রাকৃতিক আইনের স্থলে জন্মে সামাজিক আইন এবং প্রাকৃতিক অধিকারের পরিবর্তে আগমন ঘটে সামাজিক অধিকারের। চুক্তির ধারায় সরকার গঠিত এবং সরকারের মূল দায়িত্ব হয় জনসাধারণের অধিকার রক্ষণাবেক্ষণ করা। মতবাদের মধ্যে প্রাচীন ও আধুনিকত্বের সমাবেশ ঘটেছে। অর্থাৎ এর অস্তিত্ব আদিকাল থেকে আধুনিক সময় পর্যন্ত পরিলক্ষিত হয়। এর নিদর্শন প্রাচীন গ্রীসের সোফিস্টদের মতবাদের মধ্যে পরিস্ফুটিত হয়েছে। তাদের ধারণামতে, জনগণ চুক্তির শর্তে নিজেদের ক্ষমতা কোনো এক ব্যক্তির হাতে অর্পণ করে রাষ্ট্র গঠন করেছে। সুতরাং চুক্তির বিধানে ওই ব্যক্তি রাজ্য শাসন করবেন। প্রাচীন ভারতে চন্দ্রগুপ্তের অর্থমন্ত্রী কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রের (Arthasastra) মধ্যে এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়।

রাষ্ট্রচিন্তার প্রাণ পুরুষ সক্রেটিসও চুক্তির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করেন। প্লেটো তার গ্রন্থ ক্রীটোর (Crito) মধ্যে লিখেছেন যে, সক্রেটিস প্রাণদন্ডের ভয়ে জেল থেকে পলায়ন

করতে অস্বীকার করেন। এতে রাষ্ট্রের সাথে তার চুক্তি ভঙ্গ হবে বলে উল্লেখ করা হয়। মধ্য-যুগে ম্যানেগোল্ডের লেখায় উল্লেখ আছে, "যেহেতু রাজা চুক্তির ধারায় রাজ্য শাসনের দায়িত্ব পেয়েছেন, সেহেতু রাজ্যের জনসাধারণের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়েছেন সুন্দর-সুখী জীবন ব্যবস্থার নিমিত্তে"। তিনি এ দায়িত্ব পালন করতে সক্ষম না হলে চুক্তি ভঙ্গ হবে। এছাড়া ষোড়শ শতাব্দীতে অনেক লেখক এ মতের সমর্থন করেন। তার মধ্যে মর্নে, বুছালন, মেরিয়ানা ও অন্যদের নাম প্রধান। দার্শনিক হুকার Law of Ecclesiastical Polity-তে বলেছেন, মানুষ প্রাকৃতিক আইনের বশ্যতা স্বীকার ক্ষমতা কিন্তু পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে চুক্তিতে আবদ্ধ হয়। এর আরও বিদর্শন পাওয়া যায় ব্রিটেনের গৌরবময় বিপ্লবের মধ্যে। ক্রমওয়েল স্বৈরশাসনের অবসানে রাজপদের উচ্ছেদ সাধন করেন। অবশ্য ভাববাদী ব্রিটেনবাসী পুনরায় ১৬৬০ সালে রাজপদের প্রতিষ্ঠা করে। এ সময়ে অবশ্য একটি চুক্তি সম্পাদিত হয় যে, রাজা জনসাধারণের অমতে কিছু করবেন না, কিন্তু রাজপদ পুনরুত্থানের পর পূর্ববৎ স্বৈরাচারিতায় দেশ শাসন করতে থাকেন। এতে জনগণ বাধ্য হয়ে বিপ্লবের মাধ্যমে স্বৈরশাসনের অবসান ঘটায়। এর মূল কারণ রাজা জনসাধারণের সাথে চুক্তির খেলাপ করেন। হবস,লক ও রুশোর লেখনীতে আমরা সামাজিক চুক্তি বিষয়ে বিস্তারিত জানতে পাই। তিনজনের প্রকৃতির রাজ্য,শাসন ও চুক্তির বিধান আলাদা ভবে, তারা একবাক্যে স্বীকার করেছেন, রাষ্ট্র চুক্তির ফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। (সূত্র: ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

সামাজিক নিরাপত্তা (Social Security)

সামাজিক নিরাপত্তা হলো এমন একটি নিশ্চয়তা, যা সমাজ যথাযথ প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে মানুষকে কোনো বিপদের সময় সাহায্য প্রদান করে। এসব বিপদ-আপদ এমনই আকস্মিক ঘটনা যে াল্প আয়ের লোকেরা তাদের নিজেদের সামর্থ্য ও দূরদৃষ্টির সাহায্যে একাকী বা তাদেও সহযোগিদেও সহায়তায় কার্যকরভাবে মোকাবিলা করতে পাওে না, সেসব ক্ষেত্রে সমাজ ও রাষ্ট্র কর্তৃক বিশেষ ধরনের ব্যবস্থা। বেকারত্ব, অসুস্থতা বা দূর্ঘটনা, বৃদ্ধ বয়সে চাকুরি থেকে অবসর গ্রহণ, মৃত্যুর সময় কিংবা অসুস্থ অবস্থায় সরকার সংশ্লিষ্ট নাগরিকদের ভরণপোষণ, আশ্রয় ও চিকিৎসার দায়িত্ব নেয়, এই নিরাপত্তা ব্যয় যখন সম্পূর্ণরূপে রাজস্ব থেকে বহন করা হয়, তখন এটাকে বলে সামাজিক নিরাপত্তা। আর এরূপ নিরাপত্তা প্রকল্প যদি সংশ্লিষ্ট নিয়োগকর্তার ফান্ড বা কর্মচারীদের চাঁদাবাবদ অর্থ থেকে মেটানো হয়, তা হলে সেটা হয় যৌথ বীমাব্যবস্থা। লর্ড বিভারিজই সর্বপ্রথম এই সামাজিক নিরাপত্তার ধারণা প্রদান করেন। ইংরেজিতে একে বলে Social Security. সামাজিক নিরাপত্তাকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়। যেমন- সামাজিক সাহায্য ও সামাজিক বীমা। বর্তমানে সামাজসেবাকেও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্ন্তভুক্ত করা হয়।

সামাজিক বৈষম্য (Social Discrimination)

সামাজিক বৈষম্য বলতে উচ্চকুলে জন্ম, অর্থনৈতিক মর্যাদা, শিক্ষা, বৃত্তি বা পেশার জন্য সমাজের কোনো বিশেষ শ্রেণির লোকেরা যে সকল সুযোগ সুবিধা ভোগ করে তা হতে সমাজের অন্য শ্রেণির লোকদের বঞ্চিত করাকেই সামাজিক বৈষম্য বলে।

সামাজিক ভারসাম্যহীনতা (Social Imbalance)

অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক কেনেথ গলব্রেথ বেসরকারি পর্যায়ে উৎপাদিত সামগ্রীর সঙ্গে গণসেবা (Public Service) এর পরিমাণের ভারসাম্যহীনতাকে বোঝানোর জন্য সামাজিক ভারসাম্যহীনতা কথাটি প্রবর্তন করেন। তাঁর মতে, এই ভারসাম্যহীনতার দরুণই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ব্যক্তিগত পর্যায়ে প্রাচুর্য দেখা দিলেও গণসেবার ক্ষেত্রে সে-তুলনার উন্নতি সাধিত হয়নি। অবশ্য সাধারণভাবে সামাজিক ভারসাম্যহীনতা বলতে সমাজের বিভিন্ন অংশের মধ্যে আর্থ-সামাজিক বৈষম্যজনিত ভারসাম্যহীনতাকে বোঝায়।

সামাজিক সম্পদ (Social Property)

সামাজিক সম্পদ হলো সমাজের সকল সদস্যের যৌথ মালিকানাধীন সম্পদ। পুঁজিবাদী সমাজে সামাজিক সম্পদ বলতে সরকারি বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষের মালিকানাধীন ইমারত, পাঠাগার, শিল্প-পরিবহণ সংস্থা ইত্যাদিই বোঝানো হয়।

সামাজিক সম্পর্ক (Social Relationship)

সামাজিক সম্পর্ক বলতে জনগণের যৌথ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে গড়ে ওঠা পারস্পরিক সম্পর্ককে বোঝায়। মানব সমাজ বিকাশের বস্তুগত সম্পদ উৎপাদনই সামাজিক সম্পর্কের মৌল ভিত্তি। তাই উৎপাদন-সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক সম্পর্কসমূহই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক সম্পর্ক বলে বিবেচিত। বস্তুত উৎপাদনসম্পর্কই রাজনৈতিক, আইনগত এবং অন্যান্য সামাজিক সম্পর্কের চরিত্রের নিয়ামক। উৎপাদনসম্পর্কের ওপর সামাজিক সম্পর্কের নির্ভরশীলতা সম্পর্কিত উপলব্ধিই ইতিহাসের গতিধারার যথার্থ ব্যাখ্যাকে সম্ভবপর করে তোলে।

সামুরাই বিদ্রোহ (Swnurai Insargency)

সামুরাইরা হল জাপানের একটি যোদ্ধা সম্প্রদায়। তারা সাধারণত দাইমিয়ো বলে পরিচিত বৃহৎ ভূস্বামীদের সম্পদ ও স্বার্থরক্ষার কাজ করত। ১৮৬৮ সালের চার্টার অনুযায়ী দাইমিয়োরা তাদের সম্পতি সরকারের হাতে সমর্পণ করলে সামুরাইরা তাদের গুরুত্ব ও আয়ের পথ হারিয়ে ফেলে। সরকার তাদের ক্ষতিপূরণের চেষ্টা করলেও তারা সেটাকে যথোপযুক্ত বলে বিবেচনা করে না। এ-সময়ে সাতসুমোমাইগো নামক সামুরাই সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি মেইজি রাজদরবারে উচ্চপদে আসীন ছিলেন। তিনি রাজপদ

ছেড়ে দিয়ে সামুরাইদের সংগঠিত করেন এবং ১৮৭৭ সালে বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। কিন্তু আধুনিকতর অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত সরকারি বাহিনী সামুরাইদের পরাজিত করে এবং সাত সুমেমাইগো যুদ্ধে নিহত হন। এর প্রতিশোধ হিসাবে সামুরাইরা জাপানের তৎকালীর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ওকুবোকে হত্যা করে। এর ফলে রাজকীয় গার্ডদের মধ্যেই সন্ত্রাস ও ভয় দেখা দেয়। কিন্তু যুদ্ধমন্ত্রী ইয়ামাগাতা দ্রুত গার্ডবাহিনী পুনর্গঠন করেন এবং অবস্থা আয়ত্তে নিয়ে আসেন (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

সাম্প্রদায়িকতা (Communalism)

যখন একটা মানব সম্প্রদায় বা দল এমনভাবে একসঙ্গে বসবাস করে যে তাদের সাধারণ জীবনযাপন করে তাদের সাধারণ জীবনধারনের মৌলিক পরিবেশ পারিপার্শ্বিকতা একই ধরনের তখন তাকে সম্প্রদায় বলা হয়। আর কোনো সম্প্রদায় যখন ধর্মীয়, জাতিগত বা আঞ্চলিক সংকীর্ণতাকে পরিহার করতে পারে না তখন তাকে সাম্প্রদায়িকতা বলা হয়। সাম্প্রদায়িকতার অপর বৈশিষ্ট্য হল অন্য ধর্ম, জাতি বা অঞ্চলের ব্যাপারে অসহিষ্ণুতা যা প্রায়শই দাঙ্গারও রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। সাম্প্রদায়িকতার উদাহরণ হিসেবে প্যালেস্টাইনে ইহুদিদের মুসলিমবিদ্বেষ, দক্ষিণ আফ্রিকার অ্যাপার্ট-হিড, আফ্রিকার বিভিন্ন দেশে উপজাতীয় সাম্প্রদায়িকতা ইত্যাদির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বস্তুত পৃথিবীর প্রায় দেশেই কোনো-না-কোনোরূপে সাম্প্রদায়িকতার প্রভাব কমবেশি রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদ (Imperialism)

সাধারণ দৃষ্টিতে একটি দেশ কর্তৃক অপর একটি দেশের ওপর প্রভুত্ব ও শাসন কায়েম করাকে সাম্রাজ্যবাদ বলে। মার্কসীয় দৃষ্টিতে, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ, একচেটিয়া ও সর্বশেষ স্তর। এর উদ্ভব ঘটেছে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। মানবসভ্যতার গোড়া থেকেই মিশর, মেসোপটেমিয়া, আসিরিয়া, পার্সিয়াতে সাম্রাজ্য দেখা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগে রোমান, বাইজানটাইন, অটোম্যান, মোগল সাম্রাজ্য ছিল। বর্তমানকালে ইউরোপে শিল্পোন্নয়নের পর আধুনিক নেশন-স্টেটের উদ্ভব ঘটে। সেগুলোর বাণিজ্যিক প্রয়োজনে সারা পৃথিবীতে পঞ্চদশ শতক থেকে নতুন দেশ আবিষ্কার ও উপনিবেশ স্থাপনসূত্রে সাম্রাজ্যবাদ নতুন আকারে গড়ে ওঠে। বলপ্রয়োগ করে ইউরোপীয় কিছু দেশ দুর্বল অন্যান্য দেশে আধিপত্য ও শাসন বিস্তার করে। স্পেন ও পর্তুগাল বাণিজ্যিক সাম্রাজ্য গড়ে তোলে। ব্রিটেন ও ফ্রান্স ব্যবসা-বাণিজ্যের তাগিদে পদানত দেশগুলোতে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব সৃষ্টি করে। উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিমণ্ডলীতে হল্যোন্ড ও বেলজিয়াম যুক্ত হয়। ওই শতকে জাতীয় শক্তি হিসেবে গড়ে উঠতে বিলম্বের দরুন জার্মানি, জাপান ও ইতালি সাম্রাজ্যবাদী হিসেবে দাঁড়াতে পারেনি। তাই বিশ শতকে সাম্রাজ্য স্থাপনের প্রয়োজনে সামরিক সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। উল্লেখ্য,

সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিকতাবাদ অনেকাংশে সমার্থক হলেও প্রত্যয় দুটির মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। অধীনস্থ উপনিবেশগুলোতে রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার কম দেওয়া হয়। দাসপ্রথা সাম্রাজ্যবাদের অঙ্গ হলেও, প্রাচীনকালে বিজিত ভূখণ্ড মূল সাম্রাজ্যবাদী দেশের সঙ্গে একীভূত হয়ে যেত। ফলে সেগুলো আর উপনিবেশ হিসেবে বিবেচিত হত না। লেনিন ১৯১৬ সালে লিখিত তাঁর *Imperialism the highest stage of Capitalism* গ্রন্থে বলেন যে একচেটিয়া পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ ও সর্বশেষ পর্যায় হিসেবে বিগত শতকের শেষে সাম্রাজ্যবাদের উত্থান ঘটেছে যখন একচেটিয়া পুঁজিবাদ ও আর্থিক মূলধন তাকে রাজনৈতিক দিক থেকে সর্বশক্তিমান করে তুলেছে এবং পৃথিবীকে প্রধান কয়েকটি পুঁজিবাদী রাষ্ট্রের মধ্যে ভাগ করে দিয়েছে। পুঁজিবাদের অসমান উন্নয়নের ফলে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর মধ্যে উৎপন্ন সামগ্রী ও উদ্বৃত্ত মূলধন রপ্তানি ও কাঁচামাল সংগ্রহের জন্য বাজার তথা অনুন্নত দেশগুলোকে পাদানত করা এবং নিজেদের বিশ্বের সেরা শক্তি হিসেবে প্রতিপন্ন করার প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলেছে। তার পরিণাম স্থানীয় বিনাশ ও বিশ্বযুদ্ধ। লেনিনের মতে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মাধ্যমেই সাম্রাজ্যবাদের অবসান ঘটবে। লেলিন তার গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেছেন। ১. উৎপাদন ও পুঁজির পুঞ্জীভবন এমন এক স্তরে পৌঁছেছে, যার ফলে সৃষ্টি হয়েছে একচেটিয়া বা মনোপলির এবং এই মনোপলিগুলোই অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নির্ধারক ভূমিকা পালন করছে। ৩. পুঁজি রফতানি (যা পণ্য রফতানি থেকে স্পষ্টতই ভিন্নতর), বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ৪. পুঁজিপতিদের আন্তর্জাতিক একচেটিয়া সংঘ গড়ে উটেছে এবং তারা বিশ্বটাকে নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি করে নিয়েছে এবং ৫. মুষ্টিমেয় মহ' পুঁজিবাদী শক্তির মধ্যে পৃথিবীটার আঞ্চলিক বণ্টন সমাপ্ত হয়েছে। কিন্তু বস্তুত অর্থনৈতিকভাবে পৃথিবীটা এদের মধ্যে অনেকটা ভাগ হয়ে গেলেও পরস্পরের বাজার দখলের জন্য এদের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা ও দ্বন্দ্ব বিদ্যমান রয়েছে।

সাম্রাজ্যবাদের অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা ছাড়াও অন্যান্য কারণও থাকতে পারে বলে অনেকের বিশ্বাস। জাতীয়তাবাদী আগ্রাসী নীতি, নেতোদের রাজনৈতিক আধিপত্যের আকাঙ্ক্ষা এবং বিশেষ কোনো মতাদর্শ প্রচার অথবা রক্ষার তাগিদেও অপর দেশ দখলের নজির দেখা গেছে।

সাম্রাজ্যবাদ, সামাজিক (Social Imperialism)

লেনিনের মতে, যে মুখে সমাজতন্ত্রী, অথচ কাজে সাম্রাজ্যবাদী সেই হল সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী। সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নকে চীন ও চীনপন্থিরা সামাজিক সাম্রাজ্যবাদ বলে অভিহিত করত। কেননা তাদের মতে নামে সমাজতন্ত্রী হলেও সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন কার্যত সাম্রাজ্যবাদী কায়দায় লগ্নিপুঁজি খাটাত, বাজারের দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হত, অনুন্নত বিশ্বকে শোষণ করত, এমনকি বিভিন্ন অঞ্চলে সরাসরি আগ্রাসনও চালাত- যেমন, চালিয়েছিল হাঙ্গেরিতে কিংবা কিউবায়। আবার রুশ সমর্থদের মতে সোভিয়েত

ইউনিয়ন ছিল যথার্থই সামাজতন্ত্রী। কেননা, এর অভ্যন্তরীণ উৎপাদনব্যবস্থা পুঁজিবাদী ছিল না, ছিল সমাজতন্ত্রী। তবে উদ্বৃত্ত ও রফতানিযোগ্য পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজার খুঁজে বের করা রুশ জনগণের স্বার্থেই অপরিহার্য ছিল। অতএব, সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে বাজারের দ্বন্দ্ব আদৌ সাম্রাজ্যবাদী কাজ নয়; বরং তা আসলে সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী উদ্যোগ। তা ছাড়া বিভিন্ন দেশে প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে নস্যাৎ করে প্রগতির শক্তিকে সামরিক সহযোগিতাদানও আগ্রাসন নয়, বরং তা আন্তর্জাতিক বিপ্লবী দায়িত্ব। কিন্তু সোভিয়েত ইউনিয়নের অবলুপ্তি, বিভক্তি ও সমাজতন্ত্র পরিত্যাগের পর বর্তমান রাশিয়ার আর সামাজিক সাম্রাজ্যবাদী হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। বর্তমান রাশিয়া বড়জোর হতে পারে আর-এক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বলাবহুল্য, বর্তমানে (১৯৯৮) রাশিয়ার সমালোচনাকারী চীনও মার্কস-লেনিন-মাওয়ের পথ সম্পূর্ণ পরিহার করে গ্রহণ করেছে মুক্তবাজার অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকাঃ মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

সার্ক (South Asian Association for Regional Co-operation (SAARC).

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোর মধ্যে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইত্যাদি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহযোগিতার ভিত্তিতে গঠিত একটি আঞ্চলিক আন্তজাতিক সংগঠন। সার্ক-এর সদস্য হচ্ছে বাংলাদেশ, ভারত, পাকিস্তান, নেপাল, ভূটান, শ্রীলংকা মালদ্বীপ ও আফগানিস্তান। সার্ক-এর উদ্দেশ্য হচ্ছে দক্ষিণ এশিয়ার এই ৮টি রাষ্ট্রের মধ্যে অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, যোগাযোগ ও প্রযুক্তিগত সহযোহিতা বৃদ্ধি করা। সার্ক ১৯৮৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮৫ সালে ৭ ও ৮ ডিসেম্বর ঢাকায় অনুষ্ঠিত সাতটি দক্ষিণ এশীয় দেশের রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকারপ্রধানদের শীর্ষ সম্মেলনে একটি গঠনতন্ত্র বা সনদ প্রণয়নের মাধ্যমে সার্কের যাত্রা শুরু হয়। সার্ক সনদে এই সংস্থার জন্য পাঁচ স্তর বিশিষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়। স্তরগুলো হলো- ১. রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানদের শীর্ষ সম্মেলন; ২. মন্ত্রিপরিষদ; ৩. স্ট্যাডিং কমিটি; ৪. টেকনিক্যাল কমিটি; ৫. সচিবালয়। চীন, ইউরোপীয় ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, দক্ষিণ কোরিয়া, ইরান, মায়ানমার, মৌরিতাস সার্কের পর্যবেক্ষক।

সার্ক সাহিত্য পুরস্কার (SAARC Literature Prize)

দিল্লির সার্ক লেখক সচিবালয় প্রতি বছর সার্কভুক্ত দেশসমূহের একজন লেককবে আজীবন সাহিত্যকর্মের জন্য পুরস্কারের প্রবর্তন করেছে। ২০০১ সালো সার্ক সাহিত্য পুরস্কার প্রবর্তন করা হয়। বিভিন্নদেশের লেখকদের সমন্বয় গঠিত জুড়ি বোর্ড কবি শামসুর রাহমানকে ২০০১ সালের পুরস্কারের জন্য মনোনীত করে। তিনিই প্রথম সার্ক লাইফ টাইম লিটারেটি এচিভমেন্ট পুরস্কার লাভ করেন। পুরস্কারের অর্থিক মূল্য ২ লাখ ২৩ হাজার টাকা।

সার্বভৌম সংসদ (Sovereign Parliament)

সার্বভৌম শব্দের অর্থ হলো সীমাহীন, অবিভাজ্য, মৌলিক এবং চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। সার্বভৌম সংসদ প্রত্যয়ের তাৎপর্য হলো, সাংসদ আইন প্রণয়নে চূড়ান্ত ক্ষমতার অধিকারী। রাষ্ট্রবিজ্ঞানে সংসদের সার্বভৌমত্ব (Parliamentary Sovereignty) নিয়ে বিতর্ক রয়েছে। সংসদীয় সার্বভৌমত্বের দু'টি দিক রয়েছে। এক. সংসদ আইনের উৎস; দুই. সংসদ যে আইন প্রণয়ন করবে সে সম্পর্কে কোনো আদালত প্রশ্ন তুলতে পারবে না বা আদালতে সংসদ-প্রণীত আইন অবৈধ ঘোষিত হবে না। আইন প্রণয়নে সংসদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা এবং জাতীয় স্বার্থে সংসদের সীমাহীন কর্তৃত্বের স্বীকৃতি থেকেই সার্বভৌম সংসদ বা সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ধারণার উদ্ভব।
সংসদীয় সার্বভৌমত্ব ধারণাটি সমালোচিতও হয়েছে। দু'দিক থেকে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথমত. সার্বভৌমত্ব এমন একটি গুণ যা কেবল রাষ্ট্র বা জনগণের থাকতে পারে। সার্বভৌমত্ব সরকারের গুণ নয়। সরকার সীমাহীন ক্ষমতার অধিকারী হতে পারে না। সরকারের একটি অংশ হলো সংসদ। সংসদ তো সার্বভৌম হতেই পারে না। দ্বিতীয়ত. আইন প্রণয়নে সংসদের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ কিন্তু আইন বাতিল করার ক্ষমতা বিভিন্ন দেশের উচ্চ আদালতের রয়েছে। তাছাড়া, সংসদের সার্বভৌমত্ব পার্লামেন্টারি ব্যবস্থায় মন্ত্রিসভার কতিপয় ক্ষমতার জন্যও প্রশ্নের মুখোমুখি হয়েছে। সংসদ অনেক ক্ষমতার অধিকারী হলেও কার্যত মন্ত্রিসভাই সংসদ নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।

সার্বভৌমত্ব (Sovereignty)

আমরা জানি যে, রাষ্ট্র চারটি মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত যথা; জনসংখ্যা, ভৌগোলিক আয়তন, সরকার ও সার্বভৌমত্ব। এর মধ্যে সার্বভৌম ক্ষমতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এই ক্ষমতাবলে রাষ্ট্র বহিঃর্বিশ্বে স্বাধীন জাতি হিসেবে নিজেকে আত্মপরিচয় দিতে পারে। যে রাষ্ট্রের এই ক্ষমতা নেই সেটি প্রকৃতপক্ষে কোনো স্বাধীন রাষ্ট্র নয়। এটি রাষ্ট্রের প্রাণ স্বরূপ। দেহের মধ্যে প্রাণ না থাকলে যেমন সে মানুষকে মৃত বলা যায়, তেমনি সার্বভৌমত্ব না থাকলে সে রাষ্ট্রও প্রাণহীন ব্যক্তির মতো পরাধীন জনপদ মাত্র। এটি রাষ্ট্রের চরম ক্ষমতা। উৎপত্তিগত দিক বিচার করলে এ সম্পর্কে বিশ্লেষণ - করা সহজতর হয়। Sovereignty শব্দটি Superannus থেকে এসেছে এর অর্থ Supremacy বা প্রাধান্য। সুতরাং সার্বভৌমত্বের অর্থ প্রাধান্য, যে প্রাধান্য বলে অভ্যন্তরীণ ও বহির্বিশ্বে নিজের কর্তৃত্বকে বলবৎ করতে পারে। মূলত রাষ্ট্রের যা সর্বসিদ্ধান্ত সেটিই সার্বভৌমত্ব। বলা যায়, কোনো রাষ্ট্র যদি অন্য কোনো রাষ্ট্রের সাথে বিশেষ কোনো কারণের পরিপ্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক চুক্তি করতে না চায় এবং তা বাস্তবায়ন করে, সেটি হলো সে দেশের সার্বভৌম ক্ষমতা। রাষ্ট্রের ইচ্ছা এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা হলো সার্বভৌম এবং কেউ এর বিরুদ্ধে বাধার সৃষ্টি করলে সেটা অপরাধ। কোনো রাষ্ট্র এ ক্ষমতাকে কার্যকরী করতে না পারলে ধরে নিতে হবে যে, সে রাষ্ট্র তার সার্বভৌমত্ব হারিয়ে ফেলেছে। তখন কিন্তু পরিপূর্ণ রাষ্ট্রের মর্যাদা পাবে না, কেননা এর অভাবে

স্বাধীনতা থাকে না। পরাধীন রাষ্ট্র প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্র নয়। বডিন বলেন, "নাগরিক ও প্রজাদের ওপর আইনের দ্বারা আরোপিত অপ্রতিহত চূড়ান্ত ক্ষমতাকে সার্বভৌমিকতা বলে।" সার্বভৌমত্বকে রাষ্ট্রের হৃদয় বা (Heart) বলা হয়। সার্বভৌমত্ব অপ্রতিরোধ্য এ কারণে যে, এর গতিপথ কেউ রোধ করতে পারে না, যা বলে তা শর্তহীন ও লাগামহীন বলা যায়। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চলার পথে বাধা সৃষ্টি করার অধিকারী নয়। প্রত্যেকটি স্বাধীন রাষ্ট্রের নির্দেশ দেবার কর্তৃত্ব থাকে এবং এই কর্তৃত্বকে সার্বভৌমত্ব বলে। অধ্যাপক রাফায়েল বলেন যে, কোনো রাষ্ট্র সার্বভৌম-একথা বলার মানে হলো নির্দিষ্ট সমাজে রাষ্ট্রের চরম ও পরম কর্তৃত্ব রয়েছে এবং আইন সমাজের অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-কানুনের উর্ধ্বে। বক্তব্যটির সরল অর্থ হলো রাষ্ট্র সার্বভৌম প্রতিষ্ঠান হিসেবে যা বলে বা নির্দেশ দেয় সেটিই আইন এবং এসব আইন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানসমূহ মানতে বাধ্য থাকে। সার্বভৌমত্বের আদেশ আইন এবং অন্য প্রতিষ্ঠানসমূহ মানতে প্রস্তুত থাকে। সার্বভৌমত্বের আদেশ আইন এবং অন্য প্রতিষ্ঠানের আদেশকে নিয়ম-কানুন বলা যায়। মানুষ সেসব মানতে পারে বা নাও পারে কিন্তু এই আদেশ সকলের জন্য অবশ্য পালনীয়। ইংরেজ দার্শনিক পোলক বলেন, "সার্বভৌমিকতা বলতে সেই ক্ষমতাকে বুঝায়, যা অস্থায়ী নয়, অর্পিত নয় এবং এমন কোনো নিয়মের দ্বারা সীমাবদ্ধ নয়, যাকে রাষ্ট্র পরিবর্তন করতে পারে না।" এটা স্থায়ী ক্ষমতা এবং রাষ্ট্রের অস্তিত্বের মধ্যে জন্ম ও অবস্থান সার্বভৌম অর্পিত কোনো ক্ষমতা নয়, যা অন্য কর্তৃপক্ষ রাষ্ট্রকে প্রদান করতে পারে।

সার্বভৌমিকতার দুটি দিক আছে যথা: অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক। অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা বলতে বুঝায় রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা সীমারেখার মধ্যে এর কর্তৃত্ব। রাষ্ট্রের মধ্যে অবস্থিত এমন কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা সংস্থা নেই যার ওপর কর্তৃত্ব বলবৎযোগ্য নয়। কেউ এই আদেশ অবমাননা করতে পারে না। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান তা করলে রাষ্ট্র ক্ষমতাবলে নির্মম পন্থা অবলম্বনে কার্যকরী করতে পারবে। রাষ্ট্র প্রণীত আইনের সাথে কোনো প্রতিষ্ঠানের নিয়ম-নীতির বিরোধ দেখা দিলে আইন কেবল বহালযোগ্য এবং ওই সব নিয়ম-কানুন বাতিল বলে গণ্য হবে। অবশ্য বিনা প্রয়োজনে খেয়ালের বশবর্তী হয়ে সার্বভৌম ক্ষমতা কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের কাজে বিঘ্নের সৃষ্টি করবে না। আবশ্যকতাবশত সবকিছু পর্যালোচনায় না এনে রাষ্ট্র ক্ষমতা প্রয়োগ করে না। বলা যায় রাষ্ট্র আইনের সাহায্যে সার্বভৌম ক্ষমতা প্রয়োগ করে। লাস্কি অভ্যন্তরীণ সার্বভৌমিকতা সম্পর্কে বলেছেন, এ ক্ষমতা প্রত্যেক ব্যক্তি ও সমাজের প্রতি আদেশ দিতে পারে, এটা অন্য কারও আদেশ মানে না, এর ইচ্ছা কারও অধীন নয় (It issues order to all men and all associations within the area. It receives order from none of them. Its will is subject to no legal limitation of any kind.)। বাহ্যিক ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের কর্তৃত্বকে বাহ্যিক সার্বভৌমিকতা (External Sovereignty) বলে। রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেমন এ ক্ষমতার অবমাননা করতে পারে না, তেমনি বাহিরের কোনো ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা অন্য কোনো রাষ্ট্রও অশ্রদ্ধা করতে পারে না। নিজ দেশের স্বাধীনতাকে রক্ষণাবেক্ষণের জন্য একে সমুন্নত রাখতে হবে এবং তজ্জন্য বাহিরের কোনো শক্তি

যেন ক্ষতি করতে না পারে সেদিকে নজর রাখা কর্তব্য। এক্ষেত্রেও লাস্কি বলেন যে, আধুনিক রাষ্ট্র হলো সার্বভৌম রাষ্ট্র। অন্য রাষ্ট্র থেকে এটি স্বাধীন। এটা ইচ্ছা অন্যদের ওপর ব্যক্ত করতে পারে যা বর্হিশক্তির দ্বারা প্রভাবিত হয় না। অবশ্য আজকাল কোনো রাষ্ট্রই স্বয়ংসম্পূর্ণ নয়, বিভিন্ন কারণে একে অপরের সাথে মিলে মিশে চলতে হয়। মিলে মিশে চলার জন্য কিছু আন্তর্জাতিক নিয়ম অবশ্যই মান্য করা কর্তব্য। এ সবকে মানতে গিয়ে যদি দেশের সার্বভৌমিকতার অবমাননা হয়, তবে তা পরিত্যাগ করতে হবে। সুতরাং বলা যায়, এটা রাষ্ট্রের বিরাট এক ক্ষমতা, যা আভ্যন্তরীণ ও বাহিরেও একরূপ প্রাধান্য বিস্তারকারী শক্তি। আমরা এমন অবস্থায় দেশের মধ্যে বসবাস করব, যেন রাষ্ট্রের সার্বভৌম ক্ষমতার প্রতি বিঘ্নের সৃষ্টি না করে। অবশ্য চূড়ান্ত ক্ষমতা হলেও রাষ্ট্র বা সরকার স্বেচ্ছাধীন তা প্রয়োগ করতে পারে না। প্রয়োগের সাথে যৌক্তিকতা বিচার করতে হয়, অন্যথায় সরকার স্বৈরতন্ত্রে পরিণত হবে এবং অন্য রাষ্ট্রের কাছেও ঘৃণার কারণ হতে পারে। সুতরাং বলা যায়, এটি চরম হলেও স্বেচ্ছাধীন বা অযৌক্তিক কোনো ক্ষমতা নয়। সার্বভৌমত্ব ভিন্ন রাষ্ট্রের কোনো মূল্য নেই।

সার্বিয়া (Sarvia)

সার্বিয়া সাবেক ফেডারেল যুগোশ্লাভিয়া একটি প্রজাতন্ত্র। তবে এই প্রজাতন্ত্রটিই মূলত যুগোশ্লাভিয়ার মূল অংশ ও ভূখন্ড। সার্বিয়া খনিজ সম্পদ ও কৃষিকাজের জন্য প্রসিদ্ধ দেশ। বর্তমানে সার্বিয়া ও মন্টিভিডিও এই দু'টি প্রজাতন্ত্র মূল যুগোশ্লাভিয়ার অন্তর্গত রয়েছে। এখানকার জনসংখ্যা ৮৬% সার্ব। সার্বিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড। ১৯১৪ সালে সার্বিয়ার ঘটনা প্রবাহ নিয়েই প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরু হয়। ১৯৪১ সালে জার্মানি সার্বিয়া দখর করে নেয়। ১৯৪৫ সালে ২য় বিশ্বযুদ্ধের অবসানের পরে সার্বিয়া যুগোশ্লাভ ফেডারেশনে যোগ দেয়।

সি.আই.এ (Central Intelligence Agency)

সিআইএ হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা। এর পুরো নাম Central Intelligence Agency। যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন ফস্টার ডালেস ১৯৪৭ সালে এই সংস্থা গঠন করেন। এই সংস্থা প্রধানত আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরির দায়িত্বে নিয়োজিত। বিশ্বের দেশে দেশে তৎপরতা চালিয়ে গোপন সংবাদাদি সংগ্রহ, বিভিন্ন দেশের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন-সংস্থা ইত্যাদিতে এজেন্ট নিযুক্তকরণ, সরকার, রাজনৈতিক দল ও নেতাদের প্রভাবিতকরণ, বুদ্ধিজীবীদের মগজ-ধোলাই ইত্যাদি এর কর্মপরিধির অন্তর্গত। তাছাড়া বহির্বিশ্বে মার্কিন স্বার্থরক্ষার সহায়ক সংস্থা হিসেবে কাজ করা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর হত্যাকাণ্ড লড়াইয়ের যুগে এ সংস্থার ভূমিকা ছিলো অত্যন্ত ব্যাপক। মার্কিন স্বার্থ রক্ষার জন্য এ সংস্থা অনেক ক্ষেত্রে অপর দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে থাকে।। এর সদর দপ্তর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভার্জিনিয়ায় অবস্থিত। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, সিআইএ সরাসরি মার্কিন প্রেসিডেন্টের সঙ্গে যুক্ত এবং সিআইএ তার কার্যাবলীর জন্য আর কারও কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য নয়।

সিটিবিটি: (Comprehensive Test Ban Treaty (CTBT)

সি.টি.বি.টি ব্যাপকভিত্তিক পারমানবিক অস্ত্র পরীক্ষা নিষিদ্ধকরণ চুক্তি। ১৯৯৬ সালে জাতিসংঘের ৫১তম অধিবেশনে গৃহীত হয়। সম্পাদিত এই চুক্তিতে ১৫২টি দেশ স্বাক্ষর করেছে, যাদের মধ্যে মাত্র ৪১টি দেশ চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। চুক্তিটি মূলত পারমাণবিক অস্ত্রেও যে কোনো পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বা অন্য কোনো ধরনের বিস্ফোরণকে নিষিদ্ধ কওে, যা প্রকৃতপক্ষে পারমানবিক অস্ত্রের গুণগতমান বৃদ্ধিকে প্রতিহত করে। এই চুক্তির উদ্দেশ্য হচ্ছে ভয়াবহ অস্ত্র, বিশেষত আণবিক অস্ত্র নির্মাণ ও পরীক্ষা বন্ধ করা। চুক্তিটির ১৪(১) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিশ্বে পারমানবিক গবেষণা চুল্লির অধিকারী ৪৪টি দেশের প্রত্যেকটি কর্তৃক চুক্তিটি স্বাক্ষরিত ও অনুমোদিত নাহওয়া পর্যন্ত কার্যকর হবে না। চুক্তিটি স্বাক্ষরের জন্য উন্মুক্ত রাখার তিন বছরের মধ্যে কার্যকরী নাহলে ইতিমধ্যে যেসব দেশ স্বাক্ষর করেছে, তাদের নিয়ে একটি রাজনৈতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হবে , যার উদ্দেশ্য হলো চুক্তিটির কার্যকারিতা ত্বরান্বিত করার কৌশল উদ্ভাবন করা। ১৯৯৯ সালের অক্টোবর মাসে স্বাক্ষরকারী ৯২টি দেশ নিয়ে অস্ট্রিয়ার ভিয়েনাতে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। তবে পারমানবিক শক্তিধর ৫টি দেশের মধ্যে মাত্র ২টি দেশ (ফ্রান্স ও যুক্তরাজ্য) চুক্তিটি অনুমোদন করেছে। এটা একটা বড় ধরনের সমস্যা হিসেবে দেখা দেয়। চীন, রাশিয়া, যুক্তরাষ্ট্র, ভারতসহ কিছু দেশ এ-চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি। বরং ১৯৯৮ সালের মে মাসে ভারত ও পাকিস্তান একাধিক আণবিক বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ ঘটায়। অনেকে মনে করেন যে, সিটিবিটি-এর আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে আণবিক ও পারমাণবিক অস্ত্রের মালিকানা যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখে অন্য কাউকে এরূপ অস্ত্র অর্জন করতে না দেওয়া। এসব দেশ আন্তরিকভাবে চেষ্টা করে বাস্তবানুগ পদক্ষেপ গ্রহণ করলে অচিরেই চুক্তিটি বিশ্বের অধিকাংশ দেশ স্বাক্ষর ও অনুমোদন করবে এবং মানব জাতির স্বার্থে গোটা বিশ্ব পারমানবিক অস্ত্রমুক্ত হবে।

সিংহাসন প্রদত্ত ভাষণ (Speech from the Throne)

ব্রিটেনে শাসনতান্ত্রিক রীতি অনুসারে প্রত্যেক বছরের প্রথম অধিবেশনে রাজা বা রানী একটি অভিভাষণ পাঠ করেন। রাজা বা রানীপ্রদত্ত এই অভিভাষণটিকে 'সিংহাসনপ্রদত্ত ভাষণ' (Speech from the Throne) বলা হয়ে থাকে। এই অভিভাষণের মাধ্যমে সরকারের প্রধান নীতি ও কর্মসূচিসমূহ প্রণীত হয়। এর বিষয়বস্তু বা অংশ বিশেষ সম্পর্কে রাজার কোনো দায়-দায়িত্ব নেই; সকল ব্যক্তিগত মতামতের কোনো সম্পর্ক থাকে না। প্রধানমন্ত্রী ও তার ক্যাবিনেটের নির্দেশে এই ভাষণটি রচিত হয়। উল্লেখ্য যে, এই অভিভাষণটি রাজা বা রানি নিজে বা তাঁর পক্ষে লর্ড চ্যান্সেলর পাঠ করতে পারেন।

সিংহাসনত্যাগ সংকট (crisis of throne leaue)

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড ১৯৩৬ সালে মিসেস সিম্পসন নাম্নী এক মহিলাকে বিয়ে করতে চাইলে সিংহাসনত্যাগ সংকটের সৃষ্টি হয়। প্রথানুযায়ী, ব্রিটেনের

রাজা বা রানির বিয়ের আগে মন্ত্রিসভার মতামত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। মিসেস সিম্পসন মার্কিন বংশোদ্ভব একজন সাধারণ নাগরিক ছিলেন, তাছাড়া তিনি ক্যাথলিক ধর্মাবলম্বী এবং দু-দুবার বিবাহিতা ও স্বামী-তালাকপ্রাপ্ত ছিলেন। তাই প্রধানমন্ত্রী বল্ডউইন অনুভব করেন যে, যদি তাঁর সঙ্গে রাজার বিয়ে হয় তাহলে রাজার (যিনি চার্চ অব ইংল্যান্ডের সুপ্রিম গর্ভনরও বটে) সুউচ্চ সম্মানের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হবে না এবং জনগণও এই বিয়েকে মেনে নেবে না। যাই হোক, শেষ পর্যন্ত মর্গানপস্থি বিয়ে (অর্থাৎ একটি প্রাইভেট আইন, যাতে রাজার স্ত্রীকে রানি হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয় না) ব্যবস্থা অন্তর করা যায় কি না, তাও বিবেচনা করা হয়। কিন্তু ডোমিনিয়ন সরকারসমূহের সঙ্গে আলোচনার পরও তাও পরিত্যক্ত হয়। ফলে রাজার সামনে খোলা থাকে দুটি চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের যে-কোনো একটি গ্রহণ করা: হয় মিসেস সিম্পসনকে পরিত্যাগ করা অথবা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের সিংহাসন ত্যাগ করা। রাজা অষ্টম এডওয়ার্ড দ্বিতীয়টিই বেছে নেন এবং ১৯৩৬ সালের ১১ ডিসেম্বর সিংহাসন ত্যাগ করেন। অতঃপর তাঁর ছোটভাই ডিউক অব ইয়র্ক রাজা ষষ্ঠ জর্জ হিসাবে সিংহাসনে আরোহণ করেন এবং অষ্টম এডওয়ার্ড সিম্পসনকে নিয়ে ফ্রান্সে চলে যান।

সিইএসআইডি (CWSID)

জেনারেল ফ্রাঙ্কোর এক নায়কতন্ত্রে স্পেনে ৮টি সিক্রেট সার্ভিস কাজ ক্ষমতা। এদের প্রধান কাজ ছিল জেনারেলের রাজনৈতিক বিরোধীদের বিরুদ্ধে তথ্য একত্র করা এবং ফাইল তৈরি করা। ফ্রাঙ্কোর মৃত্যুর পর প্রথমে গণতান্ত্রিক প্রধানমন্ত্রী, এডোলফি সুয়ারেজ এ ফাইলগুলো নষ্ট করে ফেলেন। এর পরই সিইএসআইডি স্থাপন করা হয়। এ এজেন্সি প্রথমে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্য দুই দিকেরই গোয়েন্দা কার্য দেখা শোনা করতো। পরে একে দুইভাগে ভাগ করা হয় যাতে দুটি বিভাগ পরস্পরের ওপর নজর রাখতে পারে।

সিএনএন (CNN)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি টেলিভিশন সম্প্রচার কেন্দ্র। সিএনএন সারা বিশ্বের সংবাদ সংগ্রহ করে উপগ্রহ ভূ-কেন্দ্রের মাধ্যমে ২৪ ঘণ্টা ধরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ বিশ্বের ৯০টি দেশে সম্প্রচার করে থাকে। শুধু সংবাদ প্রচারই এর মূল লক্ষ্য, অন্য কোনো অনুষ্ঠান বা কর্মসূচি নয়। CNN-এর প্রতিষ্ঠাতা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি টেড টার্নার। সিএনএন-রে পূর্ণরূপ Cable News Network। ১৯৮০ সালের ১ জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের রাজধানী আটলান্টায় এক সাধারণ স্টুডিওতে মাত্র ২০০ জন কর্মচারী নিয়ে CNN-এর যাত্রা শুরু। প্রথম দিকে মূলত মার্কিনিরাই চ্যানেলটা দেখতে পেত। বাইরের দেশগুলোতে প্রচারের জন্য ১৯৮৪ সালে জন্ম হয় CNN ইন্টারন্যাশনালের। প্রথমে এর সদর দপ্তর স্থাপিত হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আটলান্টায়। বর্তমানে এর প্রধান কার্যালয় ওয়াশিংটন ডিসিতে অবস্থিত।

সিকিউরিটি ইন্ট্যালিজেন্স সার্ভিস (CIS)

১৯৭০ সালের আগে Royal Canadian Maunted Police (RCMP)-এর ওপরই প্রতি গোয়েন্দা কার্য-এর দায়িত্ব ছিল। জঙ্গীগচ ১৯৪৫ সালে একটি আন্তর্জাতিক গোয়েন্দাগিরি স্বাদ পায়। প্রতি গোয়েন্দা কাজের ক্ষেত্রে ১৯৭০ সালে RCMPÕর দোষগুলো ধরা পড়ে। এর ফলে একটি কমিটি তৈরি করা হয়। যারা কানাডার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা পরীক্ষা বা অনুসন্ধান করে। এই কমিটির রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে সিকিউরিটি ইন্ট্যালিজেন্স সার্ভিস গঠন করা হয়। যার নাম অস্ট্রেলিয়ান সিক্রেট সার্ভিসের সঙ্গে মিল আছে। ১৯৮১ সালে এ নতুন সংগঠনের নির্মাণ হয় আর এর প্রতি-গোয়েন্দা কার্য ও আতঙ্কবাদ বিরোধী কাজ করার ভার দেয়া হয়।

সিদ্ধান্ত নির্ণয়কারী ভোট (Casting Vote)

ফলাফল নির্ণয়কারী ভোট। যখন উভয় দিকে সমান ভোট পড়ে তখন একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য এমন ভোটের ব্যবস্থা করা হয়। সাধারণত পার্লামেন্টে স্পিকারের একটি 'কাস্টিং ভোট' থাকে। কোনো বিষয়ের ওপর পার্লামেন্টে ভোট অনুষ্ঠিত হওয়ার পর যদি দেখা যায় উভয়পক্ষে সমান ভোট পড়েছে তখন স্পিকার একটি ভোট প্রদান করে ফলাফল নির্ণয় করেন যা কাস্টিং ভোট হিসেবে বিবেচিত হয়। তবে স্পিকার যখন তাঁর কাস্টিং ভোট দেন তখন সাধারণ নিয়মে অনুযায়ী তাঁকে কোনো নির্দিষ্ট পক্ষে ভোট দেয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে হয়। এ সম্পর্কে একটি মজার ঘটনা আছে। ১৬৭৩ সারে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে একটি মুলতবি প্রস্তাবের ওপর বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয়। স্পিকার বিষয়টি ভোটে দেন। উভয়পক্ষে ১০৫ জন করে সদস্য ভোট দেন। স্পিকার মুলতবি করার পক্ষে তাঁর কাস্টিং ভোট দেন। কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে, আমি খুব ক্ষুধার্ত। তাই পক্ষে ভোট দিলাম।

সিনেট (Senate)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকা, নাইজেরিয়া ইত্যাদি দেশের আইনসভার উচ্চকক্ষের নাম সিনেট। মার্কিন সিনেট সবচেয়ে বেশি আলোচিত প্রতিষ্ঠান। মার্কিন প্রতিনিধি সভার সদস্যদের ন্যূনতম বয়স ২৫ হলেও সিনেটের সদস্যদের আরো বেশি বয়স্ক হতে হয়। একজন সিনেটর পদপ্রার্থী ন্যূনতম বয়স ৩০ বছর। প্রতিনিধি সভার সদস্য হওয়ার জন্য ন্যূনতম ৭ বছর থেকে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হয়। অথচ সিনেটরের ক্ষেত্রে এ নাগরিকত্বের সময় কমপক্ষে ৯ বছর হওয়া প্রয়োজন। মার্কিন সিনেটের মোট সদস্য সংখ্যা ১০০। প্রত্যেক ও অঙ্গরাজ্য থেকে ২ জন করে সদস্য নিয়ে (৫০ ×২ = ১০০) সিনেট গঠিত হয়। আয়তন ও জনসংখ্যা নির্বিশেষে প্রত্যেক অঙ্গরাজ্য সিনেটে প্রতিনিধি পাঠায়। যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষার ক্ষেত্রে সিনেটে প্রত্যেক রাজ্যের প্রতিনিধিত্ব একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক।

সিনেটের সদস্যরা ৬ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। প্রত্যক্ষ ভোটে সিনেট সদস্য নির্বাচন করা হয়। প্রতি ২ বছর পর সিনেটের এক-তৃতীয়াংশ সদস্য নির্বাচিত হন। কোনো রাজ্য থেকে সিনেট পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে হলে প্রার্থীকে ওই রাজ্যের স্থায়ী বাসিন্দা হতে যুক্তরাষ্ট্রের অঙ্গরাজ্যগুলোর আইনসভার উচ্চকক্ষকেও সিনেট বলে।

সিন্ডিকালিজম (Syndicalism)

সিন্ডিকালিজম হল ট্রেড ইউনিয়ন, বাণিজ্য, পেশা ও সংঘভিত্তিক সমাজবাদ। ফরাসি ধারণা 'সিন্ডিকেট' অর্থাৎ শ্রমিক ইউনিয়নের সূত্রে সিন্ডিকালিজমের এসেছে। সিন্ডিকেট-এর অর্থ ট্রেড ইউনিয়ন বা বাণিজ্যসংঘ। সিন্ডিক্যালিস্ট রা শ্লথ গতিতে সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে উৎসাহী নন। সংস্কারবাদে এদের মোহ নেই, এরা হলেন 'উত্তেজনাপ্রেমী' বোহেমিয়ান' বিপ্লবী। মার্কসবাদের অপ্রয়োজনীয় অংশকে ছাঁটাই মার্কসবাদকে সংশোধন করতে চান এই মতবাদীরা। সিন্ডিক্যালিজম হলো এমন রাষ্ট্রতত্ত্ব যা শ্রমিক সংঘকে নতুন সমাজের ভিত্তি এবং বলে মনে করে। এর মধ্যে কেউ পান বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্ব, কেউ আবিষ্কার করেন পুঁজিবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থার বিদ্বেষী একদল মানুষকে। এটি বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের একটি মতবাদ। এরা পুঁজিবাদেও বিরুদ্ধে লড়াই চালাতে চায় শ্রমিক ইউনিয়নের মাধ্যমে, সর্বাত্মক ধর্মঘট ও যত্র-তত্র হিংসাত্মক লড়াই চালিয়ে। এই মতবাদ অনুযায়ী সমাজবিপ্লব ও ভবিষ্যৎ সমাজগঠনের ভিত্তি হল ট্রেড ইউনিয়ন। নৈরাজ্যবাদের সঙ্গে এর মিল আছে বলে অনেকে একে নৈরাজ্যবাদী-সিন্ডিকালিজম (Anarcho-Syndicalism) নামেও অভিহিত করেন। এই মতবাদ শ্রমিকশ্রেনীর রাজনৈতিক দল বা তার রাজনৈতিক ভূমিকার কথা অস্বীকার করে এবং পুঁজিবাদী শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের পরিবর্তে শিল্পকেন্দ্রিক কার্যকলাপ বা ধর্মঘট ইত্যাদিকে সমর্থন করে। এই মতবাদ অনুযায়ী শ্রমিকদের ধর্মঘট করে কর্মস্থল ছেড়ে আসা ঠিক নয়; তাদের উচিত কর্মস্থল দেশব্যাপী ছড়িয়ে দিতে পারলে বিপ্লব সংঘটিত করা ও রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করা সম্ভব বলে সিন্ডিকালিস্টদের ধারণা। বিপ্লবের পর ট্রেড ইউনিয়সমূহই কলকারখানা, খনি ইত্যাদি দখল করে সমাজতান্ত্রিক নীতি অনুযায়ী সেসব পরিচালনা করবে; রাষ্ট্রের বিলোপসাধন করবে এবং ট্রেড ইউনিয়নসমূহের মিলিত সংঘই রাষ্ট্রের স্থান দখল করবে। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের প্রতিনিধিদের পরিবর্তে ট্রেড ইউনিয়নসমূহ ও তাদের প্রতিনিধিগণ সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থাদি পরিচালনা করবে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে এই মতবাদ যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, জার্মানি, ইতালি, স্পেন, আর্জেন্টিনা ও মেক্সিকোয় বিস্তার লাভ করে। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, বিশেষত ১৯১৭ সালে রুশবিপ্লবের পর এর সমর্থক সংখ্যা দ্রুত হ্রাস পায় এবং অধিকাংশ সিন্ডিকালিস্ট স্ব স্ব দেশের কমিউনিস্ট পার্টিতে যোগাদান করেন। শুধু স্পেনে এর প্রভাব আরও কিছুকাল অক্ষুণ্ন থাকে। ১৯৩৬ সালে ফ্যাসিবাদের জয়লাভের ফলে এর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সিন্ডিকেট (Syndicate)

সিন্ডিকেট এর অর্থ ট্রেড ইউনিয়ন বা বাণিজ্যসংঘ। সিন্ডিকেট কথাটি এক ধরনের শিল্প ও ব্যবসায়ী সংঘ অর্থে ব্যবহৃত হয়। শিল্প ও ব্যবসায়ী সংঘ ও প্রতিষ্ঠান একত্রিত হয়ে নিজেদের স্বার্থে চুক্তির মাধ্যমে সিন্ডিকেট গঠন করে। সিন্ডিকেটভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা অনেকখানি লোপ পায়। এর বদলে সিন্ডিকেটই মূলত তার অর্ন্তভুক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহের পণ্য বিক্রয় ও কাঁচামাল সংগ্রহ ইত্যাদির দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সিন্ডিক্যালিজম, নৈরাজ্যবাদী (Anarcho-Syndicalism)

নৈরাজ্যবাদী সিন্ডিকালিজম বা Anarcho-Syndicalism হল ট্রেড ইউনিয়নভিত্তিক নৈরাজ্যবাদী সমাজব্যবস্থা। এই মতবাদ অনুযায়ী ট্রেড ইউনিয়নই হল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগঠন এবং অর্থনৈতিক ধর্মঘটই হল শ্রমিকশ্রেণীর একমাত্র সংগ্রাম। প্রধানত ফরাসি নৈরাজ্যবাদী দার্শনিক প্রুধোঁর শিক্ষার ভিত্তিতেই এই মতবাদ গড়ে ওঠে। একসময় স্পেন, ইতালি ও ফ্রান্সে এই মতবাদ প্রবল আকার ধারণ করলেও অচিরেই তা স্তিমিত হয়ে যায়।

সিন্ধু সভ্যতা (*Sindhu* Civilization)

বিশ্বের প্রাচীণতম সভ্যতার অন্যতম সিন্ধু সভ্যতা। এর গোড়াপত্তন হয় খ্রিস্টের জন্মের আনুমানিক চার থেকে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে। সিন্ধু সভ্যতার দুটি প্রধান কেন্দ্র বর্তমান পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত সিন্ধু প্রদেশের লাকানা জেলার মহেনজোদারো এবং পাঞ্জাবের ইরাবতী নদীর তীরে হরপ্পা। বিশ শতকের গোড়ার দিকে উৎখানের ফলে এখানে যে সমস্ত প্রত্নতাত্ত্বিক বস্তু ও ধ্বংসাবশেষ আবিস্কৃত হয়েছে তার সৃষ্টি হয়েছিল সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে এবং এ সভ্যতার পত্তন হয় আনুমনিক খ্রিস্টপূর্ব ১৭০০ অব্দে। অন্যান্য সভ্যতার মতো সিন্ধু সভ্যতারও উৎপত্তি সিন্ধু নদের তীতের। পরে তা পূর্ব ও দক্ষিণ দিকে বহুদুর বিস্তৃত হয়। কারও কারও মনে, এটি ১৫ লক্ষ বর্গমাইল এলাকাজুড়ে বিস্তৃত ছিল। এই সভ্যতার সঙ্গে সবচেয়ে বেশি সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায় প্রাচীন সুমেরীয় সভ্যতার কৃষিকর্মের উন্নতি সত্ত্বেও এটি ছিল নগর ও বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতা। অনেকের ধারণা ছিল নগর ও বাণিজ্যভিত্তিক সভ্যতা। অনকের ধারণা চীন, সুমেরীয় ও মিশনের প্রাচীন সভ্যতার তুলনায় সিন্ধু সভ্যতা ছিল বেশি অগ্রসর ও উন্নত। মহেনজোদারো ও হরপ্পাতে খননকার্য চালিয়ে পাওয়া গেছে এক উন্নত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ও পোতাশ্রয়ের সন্ধান। সুপারিকল্পিত রাস্তাঘাট, আগুনের পোড়ানো ইট ও পাথরের মন্দির, সমাধিস্থ ও শিক্ষায়তনের নিদর্শনও পাওয়া গেছে এখানে। অর্থাৎ সংঘবদ্ধ নাগরিক জবিনের যাবতীয় কিছু ছিল এই সভ্যতার অন্তর্গত। হাতিয়ার যন্ত্রপাতি ছিল তামা ও বোঞ্জের তৈরি।

সুবিন্যস্ত শাসনব্যবস্থা এবং ছিল নিজস্ব চিত্রলিপি ও লিখন প্রণালী সিন্ধু সভ্যতায় ছিল। তবে এখন পর্যন্ত হরপ্পা ও মহেনজোদারোতে প্রাপ্ত লিপির পাঠোদ্ধার করা যায়নি। ফলে তাদের উৎস ও ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত জানা সম্ভব হয়নি। এদের পোশাক-

পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত ছিল কার্পাস সুতোর বস্ত্র, চাদর ইত্যাদি। দেহের শোভাবর্ধন করার জন্য তারা সোনাম, রূপা, শঙ্খ ও মূল্যবান পাথরের অলঙ্কার, পশুর হাড়, হারি দাঁতের চিরুনি, আয়না, ক্ষুর ইত্যাদি ব্যবহার ক্ষমতা। মেয়েরা বিভিন্ন সূচিকর্ম জানতো। এছাড়া পওয়া গেছে তামা ও ব্রোঞ্জের তৈরি নানা ধরনের গৃহসামগ্রী। সিন্ধু সভ্যতার প্রবর্তন কারা করেছিল এ বিষয়ে মতোান্তর আছে নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় এখানে প্রোটো-অস্ট্রালয়েড মেডিটেরিনিয়ান আলপাইন ও মঙ্গোলয়েড জনগোষ্ঠীর কঙ্কাল পাওয়া গেছে। তবে নৃতাত্ত্বিকদের ধারণা মেডিটেরেয়িান বা দ্রাবড়ি গোষ্ঠীই এ-সভ্যতার প্রবর্তক। এই সভ্যতার প্রভাব চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। পরে আর্যদের আক্রমণে খ্রিস্টপূর্ব ১৫০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে এই সভ্যতা ধ্বংস হয়ে যায় বলে মনে করা হয়। আবার প্রাকৃতিক বিপর্যয়েও এটি ধ্বংস হয়ে যেতে পারে বলে অনুমান করা হয়।

সিপাহি বিদ্রোহ (Sipahi Revolution)

১৮৫৭ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির মাধ্যমে এ দেশে ইংরেজ শাসনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়। সে সময় ইংরেজদের রাজ্যবিস্তারের নীতির বিরুদ্ধে এবং আরো নানা কারণে ভারতবাসীর মধ্যে অসন্তোষ জমে উঠতে থাকে। ইংরেজ সেনাবাহিনীর অন্তর্গত ভারতীয় সিপাহিদের সঙ্গে শাসকদের ব্যবহারেও তাদের মনে ইংরেজবিরোধী অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। তা ছাড়া সাধারণভাবে বিদেশি শাসনের প্রতি বিরূপতাও কম ছিল না।

সে সময় মারাঠাশাসক দ্বিতীয় বাজী রাওয়ের দত্তক পুত্র নানা সাহেব এবং তার মুসলমান শিষ্য আযিমুল্লাহ ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তর ভারতের নানা স্থানে জনগণকে উত্তেজিত করার চেষ্টা চালান। ঠিক এমন সময়েই ইংরেজরা সিপাহিদের মধ্যে এমন এক ধরনের বন্দুক বিতরণ করে যার কার্তুজ দাঁত দিয়ে কেটে বন্দুকে ভরতে হতো। জনরব ওঠে যে কার্তুজে শূকর ও গরুর চর্বি মেশানো আছে। এ খবরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের সিপাহিরা তাদের ধর্ম নষ্ট হবার আশঙ্কায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা ইংরেজ শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের পরিকল্পনা গ্রহণ করে।

সে সময় বঙ্গদেশের ব্যারাকপুর, রানীগঞ্জ ও বহরমপুরে সিপাহিদের ছাউনি ছিল। বিদ্রোহের আগুন প্রথম জ্বলে ওঠে ব্যারাকপুর সেনাছাউনিতে। ক্রমে এর বিস্তার ঘটে অন্যান্য ছাউনিতে। ইংরেজ শাসনের অন্যায় সম্পকে প্রচার বিভিন্ন অঞ্চলে সিপাহিদের সংঘবদ্ধ হতে সাহায্য করে।

উত্তরাঞ্চলে আরো বেশি করে ছড়িয়ে পড়ে। মীরাটে সিপাহিরা ক্ষেপে গিয়ে ইংরেজ কর্মচারীদের হত্যা করে এবং কারাপ্রাচীর ভেঙে সহকর্মীদের মুক্ত করে চল্লিশ মাইল দূরে দিল্লি পৌঁছে সিপাহিরা পুনরায় মোগল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দেয়। একে একে বিদ্রোহ দিল্লি, লক্ষ্ণৌ, মুরাদাবাদ, বেরিলি, সাহরানপুর, শাহজাহানপুরে, বদাউন, আলমোড়া, আলীগড়, মৈনপুরী, ফতেহগড়, নিমাচ (রাজপুতানা) ও নাসিরাবদে ছড়িয়ে পড়ে। সিপাহিরা ঐসব স্থানের ইংরেজদের হত্যা করে রাজকোষ লুণ্ঠন করে।

সিপাহিরা দিল্লি পৌঁছে বাহাদুর শাহ জাফরকে দেশের সম্রাট হিসেবে বরণ করে। সরদার বাহাদুর খানের নেতৃত্বে বেরিলির অধিবাসী নানা সাহেবের নেতৃত্বে কানপুরে ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। ঝাঁসীর রানী বিশ বছর বয়সী লক্ষ্মীবাঈ ইংরেজদের নির্মূল করে নিজ রাজ্য পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করে যুদ্ধে নিহত হন। ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জন্মলাভ না করায় স্বাধীনতার ওই সংগ্রাম ব্যর্থ হয়। সিমলা ও লাহোর থেকে ইংরেজ সৈন্য এসে পুনরায় দিল্লি অধিকার করে। সম্রাট বাহাদুর শাহ এবং তার বেগমকে বন্দি করে রেঙ্গুনে নিয়ে ইংরেজরা তাদের শক্তি পুনরায় সংহত করে। তবে এর ফলে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাত থেকে ভারতের শাসনভার সরাসরি ইংল্যান্ডের রানী ভিক্টোরিয়ার হাতে অর্পিত হয়। ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল হলেন রাজপ্রতিনিধি। সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে সেনাবাহিনীতে ইংরেজ সৈন্যের সংখ্যা বাড়ানো হয়।

সিপাহি যুদ্ধের পরও ইংরেজ নব্বাই বছর এ দেশে রাজত্ব করেছে। ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষকে রাজনৈতিকভাবে ভারত ও পাকিস্তানে বিভক্ত করে দিয়ে ইংরেজ ভারত ত্যাগ করে। সিপাহি বিদ্রোহ হচ্ছে ভারতের প্রথম স্বাধীনতার সংগ্রাম।

সিভিল ডিফেন্স (Civil Defence)

সিভিল ডিফেন্স হল দেশের অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। কোনো যুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে জনসাধারণের জীবন ও সম্পত্তির রক্ষার করার উদ্দেশ্য গৃহীত ব্যবস্থাই সিভিল ডিফেন্স। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে বোমাবর্ষণের আশঙ্কা দেখা দিলে এর উদ্ভব ঘটে। ব্রিটেন ও জার্মানি এ ব্যাপারে পর্যাপ্ত ব্যবস্থা নেওয়ায় এই দুই দেশে জানমালের ক্ষতি তুলনামূলকভাবে অনেক কম হয়; অথচ জাপান এরূপ কোনো ব্যবস্থা না নেওয়ার তাদের ক্ষতি হয় অনেক বেশি। সিভিল ডিফেন্স সামরিক দিক থেকেও অতীব গুরুত্বপূর্ণ এজন্য যে, কোনো দেশের জনগণ এ-ব্যাপারে প্রশিক্ষিত ও সতর্ক থাকলে, শত্রুপক্ষের পক্ষে ওই জনগণের মনোবল ভাঙ্গা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। জাতীয় কোনো দুর্যোগেও সিভিল ডিফেন্স খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আণবিক বা পারমাণবিক যুদ্ধের ক্ষেত্রে সিভিল ডিফেন্স খুব বড় ভূমিকা রাখতে না পারলেও রাসায়নিক অস্ত্র, আগ্নেয় বোমাসহ অন্যান্য অস্ত্রের বিরুদ্ধে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে।

সিভিল সার্ভেন্ট (Civil Servant)

সাধারণত সরকারি কর্মকর্তা বা আমলাদের সিভিল সার্ভেন্ট বলা হয়। আমলারা রাষ্ট্রের স্থায়ী, অরাজনৈতিক ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এবং তারা পদসোপান ভিত্তিতে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই সিভিল সার্ভেন্টরা প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে নিয়োগপ্রাপ্ত হন। অরাজনৈতিক কর্মকর্তা হিসেবে সরকারি ও রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্তসমূহ কার্যকর করেন এবং রাজনৈতিক সরকারের উত্থান ও পতন যাই হোক না

কেন তাঁরা অবসরগ্রহণের সময় পর্যন্ত চাকুরিতে বহাল থাকবে। প্রায়শই দেখা যায় যে সিভিল সার্ভেন্টরা স্থায়ী পদক্রম অনুযায়ী ও অধিকতর অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বিধায় তাঁরাই রাষ্ট্রের প্রকৃত ক্ষমতা পরিচালনা করেন এবং অনেক ক্ষেত্রে রাজনৈতিক সরকারও তাঁদের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকেন। রাজনৈতিক সরকার যত বেশি দুর্বল, অনভিজ্ঞ ও ক্ষণস্থায়ী হয়, সিভিল সার্ভেন্টরাও ততবেশি ক্ষমতা প্রয়োগ করে থাকেন। অবশ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ কিছু কিছু দেশে গুরুত্বপূর্ণ পদে সিভিল সার্ভেন্টরা রাজনৈতিকভাবে নিয়োগপ্রাপ্ত হন এবং সরকারের পরিবর্তন ঘটলে তাঁদের পরিবর্তন ঘটে যায়। পরিহাসের ব্যাপারে হল এই যে এঁদের নাম সিভিল সার্ভেন্ট বা জনগণের ভৃত্য হলেও, এঁরা প্রায় সর্বদাই জনগণের সর্বময় কর্তা বা মালিক মোক্তারের মতোই আচরণ করেন। বস্তুত সিভিল সার্ভেন্টরা রাষ্ট্রের যাবতীয় কর্মসূচি তৈরি ও বাস্তবায়ন করে থাকে, রাজনীতিবিদরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে থাকে।

সিভিল সোসাইটি (Civil Society)

সাম্প্রতিক সময়ে সিভিল সোসাইটি ধারণার সাথে পুঁজিবাদী সমাজের বাজার অর্থনীতির ধারণা অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। পূর্ব ইউরোপে সমাজতন্ত্রের পতনের সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থনীতির যে জোয়ার তৈরি হয় তারই অবশ্যম্ভাবী ফল হিসেবে অর্থনীতির বিভিন্ন উন্নয়ন সূচকের সাথে সিভিল সমাজের বিকাশ নির্দিষ্ট হয়ে যায়। এ কারণে সিভিল সোসাইটি বলতে অনেকেই বাজার অর্থনীতির সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন গোষ্ঠীকেই নির্দেশ করেন। তবে, একে এভাবে দেখা যেতে পারে যে, 'পরিবার, রাষ্ট্র ও বাজার এর মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গায় জনস্বার্থে যে সমস্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় বিভিন্ন দল ব্যক্তি কর্তৃক, তারাই সিভিল সমাজ। এ কারণে কিছু তাত্ত্বিক একে রাষ্ট্র ও বাজার এর মধ্যবর্তী স্পেসে স্থাপন করতে আগ্রহী। অন্যান্যরা একে 'ভলান্টারি সেক্টর' হিসেবে দেখেছেন, যার মাধ্যমে জনগণ তাদের মনোভাব প্রকাশ করতে এবং সরকারের দমন ও নিপীড়নমূলক কার্যক্রম প্রতিরোধ করতে পারে।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে সিভিল সোসাইটি একটি নতুন ধারণা হওয়াতে এর ক্ষেত্র ও পরিধি নিয়ে এখনও কোনো মতৈক্য পৌছানো সম্ভব হয় নি। সাধারণ ভাবে বাংলাদেশী গবেষকদের কাছে সিভিল সোসাইটি হচ্ছে বেসরকারি, অলাভজনক, অরাজনৈতিক সংগঠন, যা জনগণের স্বার্থের পক্ষে কাজ করে। তাই প্রেস, মিডিয়া, শ্রমিক সংগঠন, ধর্মীয় ও পরিবেশবাদী সংগঠনসমূহ সবই সিভিল সোসাইটির অন্তর্ভুক্ত।

অন্য আরেকটি ব্যাখ্যা হচ্ছে সিভিল সমাজ হচ্ছে রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলোর বাইরে জনগণের বা কোনো গোষ্ঠীর সংঘবদ্ধ কোনো কার্যক্রম। কেননা উপরোক্ত তিনটি প্রতিষ্ঠানই একক বা সংঘবদ্ধভাবে সকল ধরনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। ফলে রাষ্ট্র, বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলো ক্ষমতা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় একদিকে অবস্থান করে আর অন্যদিকে থাকে সাধারণ জনগণ। অতএব The society of the common masses is civil society'

সুতরাং বাংলাদেশে কর্পোরেট বাজার ও রাজনৈতিক দলগুলোকে সিভিল সমাজের বাইরে রাখা যায়, যদিও তা বিতর্কের উর্ধ্বে নয়। কেননা পশ্চিমা দর্শনে অনেক ক্ষেত্রেই বাজার এবং ক্ষেত্র বিশেষে রাজনৈতিক দলও সিভিল সমাজের অংশ। উদাহরণ হিসেবে বলা যায় যে, যুক্তরাষ্ট্রে এ দু'টিই সিভিল সমাজের অংশ, ইউরোপের অনেক দেশেই রাজনৈতিক দল সিভিল সমাজের অংশ। সিভিল সমাজের এই বৈশিষ্ট্যায়ন নির্ভর করে মূলত কোনো দেশের লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক, রাজনীতি, রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম ও দর্শন এবং সর্বোপরি কর্পোরেট বাজারের আচরণ ও জনগণের ওপর তাদের প্রভাবের ওপর।

সিমলা চুক্তি (The Simla Agreement)

সিমলা চুক্তি হলো পাকিস্তান ও ভারতের মধ্যে সম্পাদিত একটি গুরুত্বপূর্ণ চুক্তি। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর পাক-ভারত যুদ্ধের (যা আসলে ছিল বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ) প্রেক্ষিতে ১৯৭২ সালের ৩ জুলাই পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মধ্যে ভারতীয় শৈলনিবাস সিমলায় যে চুক্তি সম্পাদিত হয়, সেটাই সিমলা চুক্তি নামে খ্যাত। এই চুক্তিতে উভয় দেশ পারস্পরিক স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও আঞ্চলিক অখন্ডতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল থাকা, স্ব-স্ব সেনাবাহিনীকে স্ব-স্ব আন্তর্জাতিক সীমানার ভেতরে ফিরিয়ে নেওয়া, পারস্পরিক অপপ্রচার বন্ধ করা, দু'দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিককরণের লক্ষ্যে এবং দুই দেশের মধ্যে যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাবসা-বাণিজ্য, সাংস্কৃতিক বিনিময় ইত্যাদি শুরু করা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যাপারে ঐকমত্য প্রকাশ করে। দু'দেশের মধ্যকার বিরোধসমূহের শান্তিপূর্ণ সমাধান করা হবে দ্বি-পাক্ষিক আলাপ আলোচনার মাধ্যমে। একে অপরের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করবে না এবং তারা একে অপরের ভৌগোলিক অখণ্ডতা মেনে চলবে। তাছাড়া জম্মু ও কাশ্মিরে ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বর যুদ্ধবিরতির সময় যে সীমারেখা চিহ্নিত হয়েছে, ওই সীমারেখা উভয়েই মেনে চলবে এবং এককভাবে কোন পক্ষ চুক্তির পরিবর্তন করতে পারবে না। এই চুক্তির পরে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে সমঝোতা থাকলেও সীমান্ত সমস্যা নিয়ে দু'দেশের মধ্যে মাঝে মাঝে উত্তেজনা দেখা দেয়। **সিমলা চুক্তির প্রধান দিকসমূহ**

(ক) ভারত ও পাকিস্তান উভয়েই উভয় দেশের জাতীয় সংহতি, আঞ্চলিক অখণ্ডতা, রাজনৈতিক স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে মর্যাদা দেবে, জাতিসংঘের সনদ অনুযায়ী উভয়ই পরস্পরের আঞ্চলিক অখণ্ডতা বা রাজনৈতিক স্বাধীনতার বিরুদ্ধে হুমকি প্রদর্শন বা বলপ্রয়োগ করবে না।

(খ) উভয় দেশ তাদের নিজ নিজ সৈন্যদের স্ব স্ব দেশের আন্তর্জাতিক সীমানার মধ্যে সরিয়ে নেবে এবং ১৯৭১-এর যুদ্ধবিরতির ফলে জম্মু ও কাশ্মীরে সৃষ্ট নিয়ন্ত্রণ রেখাকে মেনে নেবে।

(গ) দুই দেশের মধ্যে সম্পর্ক স্বাভাবিক করে তোলার জন্য ধাপে ধাপে ডাক, তার, স্থল ও আকশপথে উভয় দেশের মধ্যে পুনরায় যোগাযোগ ব্যবস্থা স্থাপন করা হবে।

(ঘ) উভয়েই পরস্পরের বিরুদ্ধে বৈরী প্রচার বন্ধ করবে।
(ঙ) দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক ও অন্যান্য সহযোগিতার ব্যবস্থা করা হবে। বিজ্ঞান ও সাংস্কৃতিক বিনিময়কে উৎসাহ দেয়া হবে।
(চ) উভয়ের সমস্যাদি আলোচনার জন্য মাঝে মাঝে দুই দেশের প্রতিনিধগণ বৈঠকে মিলিত হবেন।
(ছ) এই চুক্তি কোনো দেশই একতরফাভাবে বদলাতে পারবে না।

সিয়াটো South East Asia Treaty Organisation. (SEATO)

সিয়াটোর সম্প্রসারিত রূপ হচ্ছে South East Asia Treaty Organisation. (SEATO) বা দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া চুক্তি সংস্থা। সিয়াটোর জন্ম হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় কমিউনিস্ট ভীতির মধ্য হতে। বিশেষ করে ১৯৪৯ সালে চীনে কমিউনিস্ট দলের বিজয়ের ফলে এতদঞ্চলে কমিউনিস্ট ভীতির পরিমাণ বেড়ে যায়। ফলশ্রুতিতে পাশ্চাত্য শক্তিবর্গ সিয়াটো নামক সামরিক মৈত্রীজোট গঠন করে। ১৯৫৪ সালের ৮ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বে ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলাতে যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, অস্ট্রেলিয়া, নিউজিল্যান্ড, পাকিস্তান, ফিলিপিনস ও থাইল্যান্ড-এই ক'টি দেশ যৌথভাবে এই চুক্তি স্বাক্ষর করেন। ম্যানিলায় এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় বলে এর অপর নাম ম্যানিলা চুক্তি। এর প্রধান কার্যালয় ছিল ব্যাংককে। এই সংস্থার অন্তর্গত সদস্যরা একমত হয় যে, যেকোনো সদস্যদেশ কোনো বর্হিশক্তির দ্বারা আক্রান্ত হলে বা কোনো দেশে কোনো অভ্যন্তরীণ গোলযোগ দেখা দিলে, সকল সদস্যদেশ হামলাকারী বা গোলযোগকারীর বিরুদ্ধে যৌথব্যবস্থা গ্রহণ করবে। সদস্যরাষ্ট্রগুলো অর্থনৈতিক ব্যাপারেও পরস্পরকে সহযোগিতা প্রদান করবে বলে একমত হয়। মূলত এই সংস্থার উদ্দেশ্য ছিল কমিউনিস্টবিরোধী সামরিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা। তাছাড়া এ চুক্তি লাওস, কম্বোডিয়া ও ভিয়েতনামসহ কতকগুলো দেশকে বিপদসঙ্কুল অঞ্চল বলে ঘোষণা করেন। পরবর্তীকালে এই সংস্থার সদস্যদের অনেকেই সংস্থার উপযোগিতা সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে পড়ে। ওপরন্তু সামরিক তৎপরতা পরিচালনার জন্য এই চুক্তি হলেও এ সংস্থার কোন সুনির্দিষ্ট সামরিক বাহিনী না থাকায় আশানুরূপ ফল প্রদানে সমর্থ হয়নি। ফ্রান্স ও পাকিস্তান যথাক্রমে ১৯৬৬ ও ১৯৯৭২ সালে সিয়াটো ত্যাগ করে। পাশ্চাত্য সদস্যসমূহ, বিশেষত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকায় বিরূপ ভাব প্রকাশ করে। অবশেষে ১৯৭৭ সালে সিয়াটো বিলুপ্ত হয়ে যায়।

সিয়েরা লিওন (Seiara Leion)

পশ্চিম আফ্রিকার সাব-সাহারা অঞ্চলের একটি ক্ষুদ্র দেশ হচ্ছে সিয়েরা লিওন। এর আয়তন প্রায় ৭২,০০০ বর্গকিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ৫০ লক্ষ ৩০ হাজার। দেশটি আটলান্টিক মহাসগরের কোল ঘেষে অবস্থিত। দেশটির জনগোষ্ঠী নিগ্রো সম্প্রদায়ের। সিয়েরা লিওনের রাজধানীর নাম ফ্রিটাউন। দেশটিতে দীর্ঘ আট বছর

ধরে দীর্ঘ যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সরকার ও সরকার বিরোধী সশস্ত্র গ্রুপের মধ্যে সংঘটিত সংঘাত ও হিংসাত্মক কার্যক্রম বিশ্বব্যাপী প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। ১৯৯৯ সালের শেষের দিকে এখানে United Nations Mission in Sheareleon (UNMSL)-এর অধীনে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। এরপর সরকারি বাহিনীর পাশাপাশি জাতিসংঘ শান্তিরক্ষী বাহিনী সেখানকার শান্তি ও শৃঙ্খলার দায়িত্ব গ্রহণ করে।

সিন্থেসিস (Synthesis)

থিসিস (Thesis) ও অ্যান্টিথিসিস (Anti-Thesis)-এর সমন্বয় বা সংশ্লেষণকে বলে সিন্থেসিস (Synthesis)। সিন্থেসিস থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের দ্বন্দ্ব অন্তর্মিলনের ফল। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেক সময় থিসিস ও অ্যান্টিথিসিসের সমন্বয় ঘটিয়ে সিন্থেসিস বের করা সম্ভবপর হয় না যেমন, বুর্জোয়া ও কমিউনিস্টেদের সম্মেলন বা সংশ্লেষণ ঘটিয়ে মাঝামাঝি কিছু একটা করা বুর্জোয়া বা কমিউনিস্ট কারও পক্ষেই খুব একটা গ্রহণীয় হয় না। আবার, রাজনৈতিক সিন্থেসিস যে একেবারেই হয় না, তা নয়। যেমন, কমিউনিস্ট ও বুর্জোয়া চিন্তার মাঝামাঝি অবস্থান হল সোশ্যাল ডেমোক্র্যাটদের, যদিও কমিউনিস্টরা তাদের বলে ছদ্মবেশী বুর্জোয়া। আর বুর্জোয়ারা তাদের বলে কমিউনিস্ট।অন্যান্য ক্ষেত্রেও এরূপ সিন্থেসিস হতে পারে (সূত্রঃ হারুনুর রশীদ, *রাজনীতিকোষ*, ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স, ২০১৩)।

সুখবাদ (Hedonism)

সুখবাদ অনুসারে বা আনন্দ লাভই হলো মানুষের শ্রেষ্ঠ আদর্শ। সুখবাদীদের মতে যা কিছু মানুষকে সুখ বা আনন্দ দেয়, তাই 'ভালো' আর যা দুঃখ দেয় তাই 'মন্দ'। প্রাচীন দার্শনিক এপিকিউরাস (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৪১-২৭০) প্রমুখ ছিলেন এই দর্শনের প্রবক্তা। জন স্টুয়ার্ট মিল (১৮০৬-৭৩), জেরেমি বেন্থাম (১৭৪৮-১৮৩২) প্রমূখের উপযোগবাদ (Utilitarianism)-ও মূলত এই দর্শন থেকেই উদ্ভূত। ভারতীয় দার্শনিক চার্বাকও অনেকটা সুখবাদের প্রবক্তা ছিলেন। সুখবাদীরা আত্মসুখ বা স্বল্পকালীন ইন্দ্রিয়সুখকেও পরম কাম্য বলে মনে করেন। এরূপ আত্মসুখের প্রবক্তাদের বলা হয় আত্মসুখবাদী বা Egoistic Hedonisty.

সুপরিবর্তনীয় ও দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধান (Flexible and Rigid Constitution)

লিখিত এবং অলিখিতের মাত্রার ভিত্তিতে যেমন সংবিধানকে লিখিত এবং অলিখিত হিসেবে শ্রেণিবিভাগ করা যায়, তেমনি পরিবর্তনের বিধানকে কেন্দ্র করে সুপরিবর্তনীয় এবং দুষ্পরিবর্তনীয় সংবিধানে ভাগ করা হয়। সংশোধন পদ্ধতি যখন সহজ হয় তখন তাকে সুপরিবর্তনীয় অথবা নমনীয় সংবিধান বলা হয়। অন্যদিকে সংশোধন পদ্ধতি যদি জটিল হয়, তবে তাকে দুষ্পরিবর্তনীয় বলে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে অষ্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরীর শাসনতন্ত্র ছিল অলিখিত এবং নমনীয় প্রকৃতির। ১৯২৮ সালের পূর্বে ইতালীর

শাসনতন্ত্র ছিল নমনীয়। নমনীয় সংবিধানের জন্য যে অলিখিত শাসনতন্ত্রই একমাত্র অবলম্বন তা নয়। শাসনতন্ত্র লিখিত হলেও অনমনীয় হতে পারে। ইতালীর শাসনতন্ত্র ১৯২৮ সালের পূর্বে একই প্রকৃতির ছিল। বর্তমানে ব্রিটেনই নমনীয় সংবিধানের একমাত্র উদাহরণ। ব্রিটেনে কোন শাসনতান্ত্রিক আইন সংশোধন করতে হলে পার্লামেন্টকে কোন জটিল পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় না। যে কোন সাধারণ আইনের অনুরূপ তা সংশোধন করা যায়। ব্রিটেনে সাধারণ আইন (Ordinary Law) এবং শাসনতান্ত্রিক আইনের (Constitutional Law) মধ্যে কোন পার্থক্য করা যায় না। ব্রিটেনে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যায় আইন প্রণয়নকারী ও শাসনতন্ত্র প্রণয়নকারী কর্তৃপক্ষের মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় না। ফাইনার বলেন, "গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সর্বাপেক্ষা সুপরিবর্তনীয় বলে গণ্য করা হয়" (The British is the most flexible constitution among free states)। পার্লামেন্ট যে উপায়ে সাধারণ আইন প্রণয়ন এবং পরিবর্তন করে ঠিক তেমনি শাসনতন্ত্র বিষয়ক আইন প্রণয়ন করতে পারে। আরও বলা হয় যে, ব্রিটেনের শাসন প্রকৃতি বহুলাংশে আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি ও প্রথার ভিত্তিতে ক্রমবিবর্তনের ধারায় বর্তমান স্তরে এসেছে। তাই পরিবর্তন সহজসাধ্য। স্যার আইভর জেনিংস এজন্য বলেছেন, ব্রিটিশ শাসনতন্ত্রকে সৃষ্টি করা হয়নি কিন্তু গড়ে উঠেছে (British constitution has not been made but has grown)।

আনুষ্ঠানিক দিক থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। এর সংশোধন সহজে হয় না। প্রথমত সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করতে হয়। সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করতে পারে কংগ্রেসের দুটি কক্ষের প্রত্যেকটিতে ২/৩ সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোট দ্বারা, জাতীয় আইনসভা (কংগ্রেস) কর্তৃক বা ২/৩ অঙ্গরাজ্যের অনুরোধক্রমে কংগ্রেস কর্তৃক আহুত এক সভা। এরূপে সংশোধনী প্রস্তাব আনয়ন করা হলে সেটা প্রত্যেক রাজ্যের আইনসভার নিকট অথবা প্রত্যেক রাজ্যে এ উদ্দেশ্যে আহূত সভাসমূহের নিকট উপস্থাপিত করতে হয়। যদি অঙ্গ রাজ্যগুলো ওই উদ্দেশ্যে আহূত সভার অন্তত ২/৩ অথবা আইন সভাসমূহের অন্তত ২/৩ সদস্য সংশোধনী প্রস্তাব সমর্থন করেন, তবেই কার্যকর হয়। তাই বলা যায় যে, এটা একটা জঠিল ও দুরূহ সংবিধান। সেজন্য প্রায় ২০০ বৎসরে ৩০ বার মাত্র পরিবর্তিত হয়েছে। বাংলাদেশের সংবিধান দুষ্পরিবর্তনীয়। সংসদে সদস্যের ২/৩ ভোটে সংশোধনী বিল গ্রহণ করা যায়, তবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি আবশ্যক। (দেখুন: ড. মো. মকসুদুর রহমান, *রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা*, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

সুবিধাবাদ (Opportunism)

সুবিধাবাদ কথাটি সাধরণত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহার করা হয়। ব্যক্তিগত ও গোষ্ঠীগত স্বার্থের জন্য সুবিধামতো নীতি পরিবর্তনের নামই হল সুবিধাবাদ। অনেকে মুখে আদর্শের কথা বলে, কিন্তু কার্যত সঙ্কীর্ণ স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয়ে নীতি পরিবর্তন করে, দল পরিবর্তন করে এবং বিভিন্ন আঁতাতে লিপ্ত হয়। কৌশল পরিবর্তন এবং নীতি

পরিবর্তন হুবহু এক কথা নয়। এরূপ নীতি পরিবর্তনকারীরা যতই আদর্শের কথাই বলুক না কেন এবং যে যুক্তিই দেখায় না কেন, এদেরকে সুবিধাবাদী বলেই গণ্য করা হয়। পার্থক্য এই যে, কেউ সুবিধাবাদের আশ্রয় নেয় সরাসরি, কেউ তা করে আদর্শ, জনকল্যাণ ইত্যাদির মুখোশের অন্তরালে।

সুমরেীয় সভ্যতা (*Sumerian* Civilization)

মেসোপটেমিয়ার উত্তরাংশে আক্কাদ ও দক্ষিণাংশে সুমের। এই সুমেরকে কেন্দ্র করেই আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব ৩৫০০ অব্দ নাগাদ মেসোপটেমিয়ায় এক উন্নত সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। জাতিতে অ-সেমিটিক সুমেরবাসীরাই আদি মোসেপটেমিয়ার জনক। আনুমানিক তিন হাজার খ্রিস্টপূর্বাব্দে সেমিটিক জাতির একটি শাখা দজলা-ফোরাত উপত্যকায় এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করতে শুরু করে। সমাজ ও সভ্যতার দিক দিয়ে অনগ্রসর এই সেমিটিক শাখাটিই স্থানীয় সুমেরীয়দের কাছ থেকে ঘরবাড়ি তৈরি, জলসেচ, সর্বোপরি লিখনপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করে। কালক্রমে এই সুমরেীয় ও সেমিটিক জাতির সংমিশ্রণেই প্রথমে ব্যাবলিনী পরে আসেরীয় সভ্যতার উন্মেষ ঘটে। সুমেরীয় সুসভ্য জাতি হলে সুসংহত রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তুলতে সক্ষম হয়নি। বস্তুত সুমের অধ্যুষিত প্রচীরবেষ্টিত এই সব নগর ছিল সম্পূর্ণ স্বাধীন। প্রত্যেক নগররাষ্ট্র জাগতিক এবং অধ্যাত্মিক উভয় ক্ষেত্রে রাজাই ছিল সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। তবে কেন্দ্রীয় রাজশক্তির অভাবে প্রভূত্ব স্থাপনের জন্য রাজ্যগুলো পারস্পারিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত থাকতো। এ রকম রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের মাধ্যমেই উত্তর মেসোপটেমিয়ার খ্রিস্টপূর্ব ২৪০০ অব্দে সুমের-আক্কাদ বা প্রাচীন ব্যাবিলন সাম্রাজ্য স্থাপিত হয়। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন প্রথম সারগন। তিনি জাতিতে ছিলেন সেমিটিক। সারগন প্রতিষ্ঠিত সাম্রাজ্য চারশ বছর স্থায়ী হয়। কিন্তু আনুমনিক খ্রিস্টপূর্ব ২০০০ অব্দে তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাভব না মানা সুমের জাতি অব্দে তখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ পরাভব না মানা সুমের জাতি বিদ্রোহ করে এবং সুমের-আক্কাদ অঞ্চরে প্রতিষ্ঠা করে 'নব্য সুমের সাম্রাজ্য'। এই নতুন সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট ছিলেন দুঙ্গি তিনি প্রথম সুমের জাতিকে সংঘবদ্ধ করে একটি বিধিবদ্দ আইন প্রচলন করেন। ইতিমধ্যে (খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ অব্দের কাছাকাছি) অ্যামোরীয় (Amorite) নামে সেমেটিকদের অপর একটি শাখা রাজধানী সুমেরের উত্তরে ফোরাত নদীর তীরে একটি ক্ষুদ্র গ্রাম ব্যাবলিনে এসে বসতি স্থাপন করে দুঙ্গির মৃত্যুর পর অ্যামেরীয় সেমেটিকদের শক্তিমান শাসক হাম্মুরাবি (খ্রিস্টপূর্ব ২১১৩- ২০১৮) দজলা-পৌরতা উপত্যায়কার নিম্নাঞ্চল অধিকার করে নেই এবং বিচ্ছিন্ন রাজ্যগুলোকে একত্র করে একটি কেন্দ্রীয় শাসন প্রতিষ্ঠা করেন।

অ্যাসেরীয় সামজে দাসপ্রথা প্রচলিত থাকলেও দাসদের অবস্থা মোটামুটি সচ্ছল ছিল। তবে নারীসমাজের অধিকার নানাভাবে খর্ব করা হয়। এই সামজেরই প্রথম মেয়েদের পর্দা প্রথার প্রচলন শুরু হয়েছিল। কেবল অভিজাত শ্রেণির নারীরা রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণের অধিকারী ছিল। তাদের অনেকেই প্রাদেশিক শাসনকর্তার পদও অলকৃত করেছিলেন। অ্যাসেরীয়রাই প্রথম বৃত্তের ডিগ্রি নিরূপণ এবং অক্ষাংশ ও

দ্রাঘিমাংশ নির্ণয় করতে সক্ষম হয়। জ্যোর্তিবির্দ্যার ক্ষেত্রে তাদের অবদান অতুলনীয়। তারাই প্রথম পাঁচটি গ্রহ আবিস্কার করে। চিকিৎসাবিজ্ঞান, রোগ নির্ণয় ও প্রতিকারব্যবস্থার ক্ষেত্রেও তাদের অগ্রগতি ছিল উল্লেখযোগ্য। অ্যাসেরীয়দের বলা হয় এশিয়না রোমান। রোমানরা যেমন গ্রিক সভ্যতাকে পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে দিয়েছিল, অ্যাসেরীয়রাও একই ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল ব্যাবিলনীয় সভ্যতা বিশ্বময় ছড়িয়ে দেয়ার ক্ষেত্রে।

সুমেরু বা উত্তর মহাসগার (*North* Ocean)

সুমেরু মহাসাগর বা উত্তর মহাসাগরের আয়তন প্রায় ১ কোটি ৫০ লক্ষ বর্গ বিলোমিটার। এটি উত্তর মেরুর চতুর্দিকে গোলাকার হয়ে বিস্তৃত। আয়তনের দিক দিয়ে এ মহাসাগর প্রশান্ত মহাসাগারের ১২ ভাগের এক ভাগ। মহাসগারের প্রায় সম্পূর্ণ অংশই উত্তর গোলার্ধের বৃহৎ স্থলভাগ দ্বারা পরিবেষ্টিত। মাত্র ১৭০° পশ্চিম দ্রাঘিমাংশ থেকে বেরিং প্রণালী দ্বারা প্রম্যান্ত মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। তাছাড়া গ্রিনল্যান্ড, আইসল্যান্ড ও ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জের দ্বারা এই আটলান্টিক মহাসাগরের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। এ মহাসাগরের বারিরাশি স্থায়ীভাবে তুষারার্বৃত। সুমেরু মহাসগরের গভিরতম অংশ বলে প্রমাণিত হয়েছে। এ অংশের গভীরতা ৫৪৪৬ মিটার বা ৩০৭৬ ফ্যাদম। পার্শ্ববর্তী সাগরসমূহের গভীরতা ১০০০ ফ্যাদমেরও কম। এ মহাসাগরের উপকূলে কয়েকটি অগভীর সাগর বর্তমান। অন্যান্য মহাসাগরগুলোর মতো সুমেরু মহাসাগরের মধ্যে অনেক দ্বীপ ও দ্বীপপুঞ্জ রয়েছে। এদের প্রায় সবগুলোই মহাসগরের অববাহিকায় পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে অবিস্থিত। নিউ সাইরেবেরিয়া দ্বীপপুঞ্জ, কানাডার সঙ্গল দ্বীপপুঞ্জ এবং বক্ররেখার মতো অবস্থিত সুদীর্ঘ নোভায়া জেম্বালিয়া দ্বীপের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এ মাহাসাগরের অন্তর্বর্তী মগ্ন শৈলশির কোনো কোনো স্থানে উঁচু হওয়ার দরুণ যেসব দ্বীপরে সৃষ্টি হয়েছে তাদের মধ্যে বিয়রি, স্পেটসবার্গেন, জানমায়েন বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সুযোগ ব্যয় (Opportunity Cost)

কোনো দ্রব্য উৎপাদন করতে বিভিন্ন প্রকার উপাদানের প্রয়োজন। কিন্তু এই সমস্ত উপাদানের প্রত্যেকটিকে বিকল্পভাবে বিভিন্ন উৎপাদন কার্যে ব্যবহৃত করা যেতে পারে। কোনো বিশেষ উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি বিশেষ উপাদানের 'সুযোগ ব্যয়' হলো সেই সর্বাধিক আয়ের পরিমাণ যা এই উপাদানটি অন্য কোনো উৎপাদন ক্ষেত্রে পেতে পারে।

সুয়েজ সংকট (Suez Canal Crisis)

সুয়েজ খাল ভূমধ্যসাগর ও লোহিত সাগরের সংযোগকারী খাল। ১৮৫৯ খ্রিস্টাব্দে ফরাসী ইঞ্জিনিয়ার ফার্ডিন্যান্ড ডি-লেপেম্প এই খালটি খননের পরিকল্পনা করেন এবং প্রায় ১০ বছর পরে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে এর খননকার্য শেষ হয়। এটা পৃথিবীর দীর্ঘতম

সামুদ্রিক খাল। খালটি উত্তরে ভূমধ্যসাগরের সাথে দক্ষিণে লোহিত সাগরকে যুক্ত করেছে। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১৬৬ কিলোমিটার, প্রস্থ ৫৯ মিটার এবং গভীরতা ১০ মিটার। খালটি অতিক্রম করতে প্রতিটি জাহাজের ১০ থেকে ১২ ঘণ্টা সময় লাগে। এই খালটির মধ্য দিয়ে প্রতিদিন গড়ে ৪৫ টি জাহাজ চলাচল করে। এই খালটির প্রবেশ পথে ভূমধ্যসাগলীয় অঞ্চলে পোর্ট সৈয়দ এবং সুয়েজ উপসাগরের প্রবেশ পথে পোর্ট সুয়েজ অবস্থিত। ১৯৫৬ সালে মিশরের প্রেসিডেন্ট নাসের খালটি জাতীয়করণ করলে ঈঙ্গ-মার্কিন ও ইসরাইলের সাথে মিশরের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ১৯৬৭ সালের আরব-ইসরাইল যুদ্ধের পরে ১৯৭৫ সালের ৫ জুন পর্যন্ত এই খালটির পথ বন্ধ ছিল। সুয়েজ ক্যানাল কোম্পানি নামে একটি কোম্পানি এই খালটি নিয়ন্ত্রণ করত এবং এর মধ্য দিয়ে চলাচলকারী জাহাজসমূহের ওপর শুল্ক ধার্য ও তা আদায় করত। এই কোম্পানির ৮ লক্ষ শেয়ারের মধ্যে ৩,৫৩,৫০৪টিরই মালিক ছিল ব্রিটিশ সরকার। এই কোম্পানি মূলত পরিচালিত হত ফরাসিদের দ্বারা। ১৯৬৮ সালে এই কোম্পানির কার্যকারিতার মেয়াদ শেষ হওয়ায় পর খালের নিয়ন্ত্রণভার মিশর সরকারের ওপর প্রত্যার্পণের কথা ছিল। ১৮৮৮ সালে সম্পাদিত কনস্টান্টিনোপল কনভেনশন মোতাবেক সাব্যস্ত হয়েছিল যে, যুদ্ধের সময় হোক আর শান্তির সময়ই হোক, যুদ্ধজাহাজ বা বাণিজ্যজাহাজ বা অপর যে-কোনো জাহাজের এই খাল দিয়ে গমনাগমনের ব্যাপারে কোনোকালেই কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা যাবে না। ১৯৫৪ সালের অক্টোবরে সম্পাদিত ব্রিটিশ-মিশর চুক্তি অনুযায়ী সুয়েজ খাল এলাকা থেকে ব্রিটিশ সৈন্য অপসারিত হবে বলেও সাব্যস্ত হয়। ১৯৫৬ সালের ২৬ জুলাই মিশর সরকার অকস্মাৎ কোম্পানিটিকে জাতীয়করণ করে বসে এবং বলে যে এই খাললব্ধ আয় মিসরের আসোয়ান বাঁধ নির্মানের জন্য অপরিহার্য। অবশ্য মিশর ঘোষণা করে যে, কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের শেয়ারমূল্য পরিশোধ করা হবে। এর ফলে সৃষ্টি হয় এক তীব্র উত্তেজনাকর পরিস্থিতি। ২ আগস্ট ১৯৫৬ ব্রিটিশ সরকার সুয়েজের ব্যাপারে সামরিক ব্যবস্থাগ্রহনের কথা ঘোষণা করে। লন্ডনে এবং জাতিসংঘে অনুষ্ঠিত আলাপ-আলোচনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ২৯ অক্টোবর ইসরায়েল মিশর আক্রমণ করে বসে। যুক্তরাজ্য মিশর ও ইসরায়েলকে সুয়েজ এলাকা থেকে ১০ মাইল দূরে সরে যেতে চূড়ান্তপত্র বা আলটিমেটাম প্রদান করলে মিশর তা মানতে অস্বীকার করে। ৩১ অক্টোবর ব্রিটিশ-ফরাসি সম্মিলিত বাহিনী মিশর আক্রমণ করে এবং খালের উত্তরদিকের কিয়দংশ দখল করে নেয়। অংশত জনমতের চাপে এবং অংশত সোভিয়েত ইউনিয়নের হুমকি ও সামরিক প্রস্তুতির মুখে ৬ নভেম্বর ব্রিটিশ-ফরাসিরা যুদ্ধ বন্ধ করে দেয়। ফলে উক্ত এলাকা থেকে ব্রিটিশ, ফরাসি ও ইসরায়েলের কর্তৃত্ব সম্পূর্ণরুপেই লোপ পায়। মিশর ইতিমধ্যে খাল বন্ধ করে দিয়েছিল। জাতিসংঘ মিশনের মধ্যস্থতায় ১৯৫৭ সালের এপ্রিলে খাল পুনরায় খুলে দেওয়া হয়। ১৯৫৮ সালের জুলাইতে মিশর প্রাক্তন কোম্পানির শেয়ার-হোল্ডারদের ২ কোটি ৯০ লক্ষ পাউন্ড ক্ষতিপূরণ দিতে রাজি হয়। এই খাল বোম্বাই ও লন্ডনের মধ্যে ৭,০০০ কি.মি. পথ কমিয়ে দিয়েছে। আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে এই খালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এটা প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য দেশগুলোর মধ্যে

যোগসূত্র স্থাপন করেছে। বর্তমানে এই খালটি সুয়েজ খাল কর্তৃপক্ষ (Suez Canal Authority) নামক একটি সংস্থার নিয়ন্ত্রণাধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

সূচী, অংসান (Aung San Suu Kyi)

অং সান সূচী মায়ানমারের অবিসংবাদিত গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী। তিনি মায়ানমারের স্বাধীনতার জনক অং সানের কন্যা। তিনি National League for Democracy (NLD)-এর নেত্রী হিসেবে মায়ানমারের সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে আন্দোলনে ১০৫টি রাজনৈতিক দলের নেতৃত্ব দেন। ১৯৯০ সালের সাধারণ নির্বাচনে তাঁর জোট বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু সামরিক জান্তা কর্তৃক ক্ষমতা হস্তান্তর না করে তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখেন। অংসান সূচী শান্তির ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য ১৯৯১ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কার লাভ করেন।

সেনানিবাস (Cantonment)

সেনানিবাস বা সিপাহী ছাউনি হলো দেশরক্ষার্থে নিযুক্ত স্থায়ী সৈন্যদের আবাসস্থল। এখানে রক্ষিত সৈন্যবাহিনী কোন বিশেষ সেনাপতির বা দলপতির অধীনস্থ হইয়া যুদ্ধের কৌশলাদি ও নিপুণতা অর্জনের চেষ্টা করে। ছাউনি এলাকা নিষিদ্ধ অঞ্চল বলিয়া ঘোষিত ; কারণ এখানে গোপন অস্ত্রাদি ও যুদ্ধের পরিকল্পনা-বিষয়ক দলির-দস্তাবেজ সংরক্ষিত হয়ে থাকে।

সেন্ট হেলেনা (Saint Helena)

আটলান্টিক মহাসাগরের ওপর অবস্থিত একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের নাম সেন্ট হেলেনা। এটা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল হতে ১২০০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এর রাজধানীর নাম জেমসটাউন। আয়তন ৪৭ বর্গমাইল। এর লোকসংখ্যা ৫ হাজার। এটা ব্রিটিশ কলোনী বলে অভিহিত। নেপোলিয়া বনাপার্টকে এ স্থানে নির্বাসন দেয়া হয় এবং এখানে তার মৃত্যু হয়।

সেন্ট্রাল ইনট্যালিজেন্স এজেন্সি (CIA)

'সেন্ট্রাল ইনট্যালিজেন্স এজেন্সি' বা সিআইএ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা বা গুপ্তচর-বিভাগ। বিআইএ'র পত্তন হয়েছিল মূলত ব্রিটিশদের দৌলতে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আগে আমেরিকার কোনো কেন্দ্র নিয়ন্ত্রিত গুপ্তচর সংস্থা ছিল না। ১৯৪২ সালে ব্রিটেনের চাপে পড়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ওএসএস অর্থাৎ 'অফিস অব দ্য স্ট্রাটেজিক সার্ভিস' গড়ে তোলেন দেশের গোয়েন্দাদের কাজে সংহতি ও সমন্বয় আনার উদ্দেশে। এটি পরিচালনার ভার ছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিখ্যাত যোদ্ধা ও প্রাক্তন অ্যাটর্নি জেনারেল উইলিয়াম ডোনোভার-এর ওপর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৫ সালে ওএসএস'কে সরকারিভাবে ভেঙে দেয়া হয়। কিন্তু চাকরিতে বহাল

থাকেন এর অনেক কর্মকর্তা-কর্মচারী। এদের নিয়েই প্রেসিডেন্ট হ্যারি ট্রুম্যানের উদ্যোগে রিয়ার এডমিরাল সিডনি সৌয়ার্স-এর নেতৃত্বে গঠিত হয় সেন্ট্রাল ইনট্যালিজেন্স গ্রুপ। এদের কাজ ছিল রাষ্ট্রপতির কাছে গুপ্ত খবর একত্র করে ব্যাখ্যা করা। ১৯৪৭ সালে সারা পৃথিবীতে শীতল যুদ্ধ হয়। পুর্ব ইউরোপের দেশগুলো সোভিয়েত সংঘের অধীনে বলে যায়। আমেরিকাকে রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা আইন সৃষ্টি করে নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে পুনর্গঠন করতে হয়। 'সেন্ট্রাল ইনট্যালিজেন্স গ্রুপ'-এর নাম পরিবর্তন করে 'সেন্ট্রাল ইনট্যালিজন্স এজেন্সি' করা হয়। এ নতুন সংস্থার উদ্দেশ্য চিল জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের নির্দেশে গোয়েন্দা গিরি করা এবং মূল্যবান গুপ্ত সংবাদ একত্র করে তার বিশ্লেষণ করা। এর প্রথম নির্দেশক ছিলেন এডমিরাল রোসকো হিলেন কোয়েটার। এ সংস্থায় যারা কর্মরত তাদের ভাষায় এর নাম 'দ্য কোম্পানি'। এর সদর দপ্তর অবস্থিত ভার্জিনিয়ার ল্যাঙলে শহরে। দ্বিতীয় সদর দপ্তরও ভার্জিনিয়াতেই, ম্যাকলিন অঞ্চলে। সিআইএ'তে কর্মরতদের সংখ্যা পঁচিশ হাজার। এদের বেশির ভাগই নিয়মত কাজের জন্য প্রকাশ্যে নিযুক্ত। এরা ঘটনা বা খবরাখবরের বিশ্লেষক হিসেবে কাজ করেন। গোপন কাজে নিয়োজিত গোয়েন্দা সম্পর্কে সাধারণ মানুষ কিছু জানতে পারে না। এদের চাকরি প্লানস ডিভিশন বা পরিকল্পনা বিভাগের ওপর ন্যস্ত। এরাই পরিচালনা করে আমেরিকান দূতাবাসগুলোর সিআইএ দপ্তর, যার সাংকেতিক নাম 'স্টেশন'।

সেন্সরশিপ (Censorship)

সেন্সরশিপ হলো কোনো পুস্তক, সংবাদপত্র, চিঠিপত্র, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ ও বেতারে সংবাদ আদান প্রদানের আগে সরকার কতৃক এইসব কিছুর পরীক্ষার কাজ ও ক্ষমতা। এই ব্যবস্থার উদ্দেশ্য হলো তথ্যাদিও গোপনীয়তা রক্ষা করা এবং সাধারণ নীতিবোধ ও আপত্তিকর অংশ বা দেওয়া। আবার সেন্সরশিপ বলতে কোনো রাষ্ট্র, ধর্মীয়, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান (যেমন-চার্চ) বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোনো লিখিত বা প্রকাশিত বা ধারণকৃত বক্তব্যকে নিয়ন্ত্রণ বা নিষিদ্ধ করার ক্ষমতাকে বোঝায়। ধর্মীয় ক্ষেত্রে সৃষ্টিকর্তা, প্রেরিত পুরুষ, ধর্মগ্রন্থ, ধর্ম-বিশ্বাস, ধর্মীয় আচার ইত্যাদির বিরুদ্ধে বা সমালোচনামূলক কোনো বক্তব্য বা পুস্তকাদিকে নিষিদ্ধ করে দেওয়ার জন্য সেন্সরশিপ ব্যবহার করা হয়। রাষ্ট্রীয় ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের নীতি ও স্বার্থবিরুদ্ধ পুস্তক, বক্তব্য ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সেন্সরশিপ প্রয়োগ করা হয়। ক্ষমতাসীন সরকার তার দলীয় স্বার্থেও সেন্সরশিপ প্রয়োগ করে থাকে। জনগণের স্বার্থ বা চরিত্রের প্রতি হুমকিস্বরূপ কোনো পুস্তক, নাটক, চলচ্চিত্র ইত্যাদিও সেন্সরশিপ-এর মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করা হয়। স্বৈরাচারী ও একনায়কতন্ত্রমূলক দেশে সেন্সরশিপের প্রয়োগ সবসময় বিদ্যমান থাকে। অনেক সময় পত্রিকায় খবর সেন্সর করে দেওয়া হয়। রাষ্ট্রীয় ও সামরিক গোপনীয়তা যাতে ফাঁস হয়ে না যায়, এজন্য ব্রিটিনে দাপ্তরিক গোপনীয়তা আইন (Official Secrets Act) এবং এর ডি-নোটিস (D-Notice)-এর ব্যবস্থা রয়েছে।

সোফিস্ট (Sopist)

গ্রিক 'সফিয়া' (Sopia) এবং 'সফিজম' (ঝড়ঢ়রংস) শব্দদ্বয়ের সমন্বয়ে সফিস্ট শব্দের উৎপত্তি। 'সফিয়া' ও 'সফিজম' শব্দের অর্থ যথাক্রমে জ্ঞান ও কৌশল বা দক্ষতা। প্রাচীন গ্রীসে জ্ঞান ও বিতর্কে দক্ষ এমন বিজ্ঞজনকে সোফিস্ট নামে অভিহিত করা হত। আধুনিককালে ইংরেজী (Sopist) শব্দ দ্বারা জ্ঞান ও বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞ ও বিচক্ষণ ব্যক্তিত্বকে বোঝানো হয়। মূলত খ্রীস্টপূর্ব পঞ্চম শতকে বাগ্মিতা, লোক সম্মোহনী দক্ষতা, দক্ষ তার্কিক এবং দর্শন চর্চারও একধরনের গ্রিক জনগোষ্ঠীকে সোফিস্ট বলে অভিহিত করা হয়। এরা বিশেষ কোনো দার্শনিক তত্ত্বের অনুসারী ছিলেন না, শুধু তারা তরুণ সমাজকে বুদ্ধিবৃত্তিক চিন্তা ও সমগ্র গ্রিক জাতিসত্ত্বাকে উজ্জীবিত করতে চাইতেন। জীবন ও জগত সম্পর্কে সফিস্টরা কেউবা নাস্তিক অথবা সংশয়বাদী, কেউবা আস্তিক। তারা ছিলেন কবি, ভাষাবিদ, বৈয়াকরণিক, নীতিশাস্ত্রবিদ, গণিতজ্ঞ, অলঙ্কার শাস্ত্রবিদ, দিব্যজ্ঞানী, শরীর তত্ত্ববিদ এক কথায় দলমত নিরপেক্ষ শিক্ষক। দেশের এক প্রান্ত থেকে অন্যপ্রান্তে পরিব্রাজকের মত ঘুরে বেড়াতেন এবং কখনো জনাকীর্ণ বাজার বা সমাবেশে বক্তৃতা করতেন। তাছাড়া অর্থের বিনিময়ে এবং প্রয়োজনের তাগিদে মানুষের চাহিদা মেটানোর জন্য যে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদানে প্রস্তুত ছিলেন। প্রোটোগোরাস (Protogoras) রাজনীতিবিদ হিসেবে সফলতার শিক্ষা দিতেন। প্রডিকাস (Prodicus) ব্যাকরণ ও শব্দতত্ত্ব (Grammer and etymotogy) হিপ্পিয়াস (Hippias) ইতিহাস, গণিত ও পদার্থবিদ্যা, কেলিক্লিস (Caliclis) নৈতিকতা থ্রাসিমেকাস (Thrasimececus) শাসনবিদ্যা তারা তাদের নিজস্ব দৃষ্টি-ভঙ্গিতে সতত (Honesty) বা পূণ্য (Virtue) এবং ন্যায় (Justice) এর ব্যাখ্যা দেন। যারা এই সৃজনশীলতা ও রাজনৈতিক উন্নয়নের ধারক ও বাহক ছিলেন তারা ইতিহাসে সফিস্ট নামে পরিচিত। বাংলা ভাষায় এদেরকে তার্কিক, লোকজ দার্শনিক, জ্ঞানচারক প্রত্যয়ে ভূষিত করা হয়েছে।

সোভিয়েত (Soviet)

সোভিয়েত একটি রুশ শব্দ যার অর্থ হল পরিষদ। ১৯০৫ সালের বিপ্লবের সময় সর্বপ্রথম সোভিয়েত বা 'শ্রমিক পরিষদ' উদ্ভব ঘটে। ১৯১৭ সালের রুশবিপ্লবের পর সোভিয়েতই হয় কমিউনিস্ট ক্ষমতার মূল ভিত্তি। ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত নিম্মতর পর্যায়ের সোভিয়েতসমূহ পরোক্ষ ভোটের মাধ্যমে উচ্চতর পর্যায়ের সোভিয়েতসমূহ নির্বাচিত করত। সোভিয়েতের মূল কথা রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডে আপামর জনগণের সরাসরি অংশগ্রহণ করা। সোভিয়েতের মধ্যে বিচার ও প্রশাসনিক ক্ষমতার সমন্বয় ঘটে এবং সোভিয়েত স্থানীয় ও রাষ্ট্রের প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা হিসেবে কর্তৃত্ব প্রয়োগ করে। ১৯৩৬ সালে সাংবিধানিক সংশোধনীর মাধ্যমে পরোক্ষ নির্বাচন প্রথা বাতিল করা হয় এবং সকল স্তরের সোভিয়েত জনগণ কর্তৃত্ব সরাসরি নির্বাচিত হবে বলে সিদ্ধান্ত হয়।

স্টার্ট-২ (Strategic Arms Reduction Treaty (START II)

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে এ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। ১৯৯২ সালের ৩ জানুয়ারি মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ ও রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট বরিস ইয়েলৎসিন চুক্তিটি স্বাক্ষর করেন রাশিয়ার রাজধানী মস্কোতে। চুক্তির শর্তানুসারে যুক্তরাষ্ট্র ও রাশিয়ার দূরপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র ১০ বছর (১৯৯২-২০০২) সময়র মধ্যে দু-তৃতীয়াংশ হ্রাস করা হয়।

স্টার্লিং এলাকা (Sterling Region)

১৯৩১ সালে যুক্তরাজ্য মুদ্রার ক্ষেত্রে স্বর্ণমান বা গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড বর্জন করলে কিছু কিছু রাষ্ট্রও তাদেও মাথে একাত্মতা প্রকাশ করে, তাদের স্ব স্ব মুদ্রাকে যুক্তরাজ্যের মুদ্রা বা স্টার্লিং-এর মানের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে দেয় এবং তাদের মুদ্রা ব্যাংক অব ইংল্যান্ডে রিজার্ভ রাখার সিদ্ধান্ত নেয়। এ সকল দেশকে নিয়েই স্টার্লিং এলাকা গঠিত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এবং তৎপরবর্তীকালে স্বর্ণ ও ডলারের চরম দুস্প্রাপ্যতা দেখা দিলে স্টার্লিং এলাকার সদস্যেরা বিনিময় নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে বাধ্য হয়। এই নিয়ন্ত্রণ অনুযায়ী স্টার্লিং এলাকার ভেতর বিনিময়ের স্বাধীনতা থাকলেও এটা সাব্যস্ত হয় যে, এলাকাভুক্ত কোনো দেশ দেশি ডলার আয় করলে উদ্বৃত্ত ডলার স্টার্লিং-এর জন্য ব্রিটিশ ট্রেজারিতে বিক্রি করে দেবে। যদি কোনো দেশের ডলার ব্যয় ডলার আয়ের চেয়ে বেশি হয়, তাহলে সেদেশ ব্রিটিশ ট্রেজারি থেকে স্টার্লিং-এর বদলে ডলার ক্রয় করতে পারবে। ১৯৬১ সালের পর স্টার্লিং এলাকার সীমানা কানাডা ব্যতীত কমনওয়েলভূক্ত দেশসমূহ, যুক্তরাজ্য এর উপনিবেশসমূহ, এবং মায়ানমার, আইসল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড, জর্ডান, লিবিয়া এবং পারস্য উপসাগর ও ওমান উপসাগরের উপকূলবর্তী সাতটি স্বাধীন দেশ অন্তর্ভুক্ত ছিল।

স্টুয়ার্ট যুগ (Stuart Age)

তৃতীয় অ্যাডওয়ার্ড (১৬০৩-১৭১৪ খ্রিস্টাব্দ) যখন ইংল্যান্ডের রাজা, তখন স্কটল্যান্ডে স্বাধীনভাবেই রাজত্ব করেছিলেন রবার্ট ব্রুস। তার মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ডেভিড ব্রুস স্কটল্যান্ডের সিংহাসন আরোহন করেন। কিন্তু তিনি অপু এক অবস্থায় মৃত্যুবরণ করলে তাঁর ভগ্নী মারজকীর পুত্র রবার্ট স্টুয়ার্ট ১৩৭১ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের সিংহাসন লাভ করেন। স্কটল্যান্ডের এ নতুন রাজাই স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা।

স্টুয়ার্ট যুগে জনশক্তি পার্লামেন্টের পরিচালনায় রাজশক্তির সাতে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়। স্টুয়ার্ট বংশের প্রথম রাজা প্রথম জেমস্ সাধারণ আইন বা পার্লামেন্টের বিরোধীতা করেন। স্টুয়ার্ট রাজাগণ বিশ্বাস করতেন, তারা খোদায়ী রাজাধিকারে রাজা (Theory of Divine Right of Kings)। পৃথিবীর কোনো নিয়মকানুন তারা ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের সীমা নির্দেশ করতে পারে না, তারা একমাত্র তাদের কার্যাবলীর জন্য খোদার নিকট দায়ী। প্রজাদের কর্তব্য হলো কোনো সমালোচনা বা প্রতিবাদ না করে রাজার

নির্দেশ মেনে চলা। প্রথম জেমস তাঁর রাজত্বকালে বেশিরভাগ সময়ই পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করেন নি। পক্ষান্তরে ইংরেজগণ স্টুয়ার্ট রাজাদের খোদায়ী রাজাধিকার মানতে মোটেই প্রস্তুত ছিলেন না। ফলে রাজশক্তির সাথে প্রজাশক্তির অবিরাম সংঘর্ষ ও যুদ্ধ চলে। অবশেষে বহু বাদানুবাদ ও যুদ্ধ বিগ্রহের পর জনশক্তির জয় হয়।

স্টোয়িকবাদ (Stoicism)

প্রাচীনের গ্রীসের চারটি হেলেনিষ্টিক স্কুল বা দার্শনিক মতবাদের মধ্যে স্টোয়িক স্কুল হলো চতুর্থ ও শেষ স্কুল। এই স্কুল থেকে যে মতবাদ বা দার্শনিক তত্ত্ব প্রচারিত হয় ইতিহাসে তা স্টোয়িক দর্শন বা স্টোয়িকবাদ নামে পরিচিত। এই মতবাদের লালন, পরিবর্ধন, পরিমার্জন সবকিছুই প্রধানত অ-গ্রীসিয় অধিবাসীদের দ্বারা সম্পন্ন হয় বলে এবং এর মধ্যে বহু অ-গ্রীসিয় উপাদান বা ভাবধারা প্রাধান্য লাভ করে বলে এটিকে হেলেনিস্টিক (Hellenistic) বলা হয়। খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ অব্দে স্টয়িক মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিপ্রিয়ট দার্শনিক যেনো (৩৪২-২৭০) ছিলেন এই মতবাদের প্রতিষ্ঠাতা। কখনো এথেন্স নগরীর অভ্যন্তরস্থ একটি বাগান বাড়ীর গাড়িবারান্দার নীচে বসে তাঁর শিষ্যদের বক্তৃতা দিতেন এবং বাইরের কোনো প্রকার কোলাহল তাকে বিব্রত করতে পারত না। এই গাড়িবারান্দাকে গ্রিক ভাষায় স্টোয়া (Stoa) বলে। সেই থেকে যে কোনো এবং তার অনুগামীদের প্রবর্তিত দর্শনকে নির্বিকারবাদী দর্শন যা স্টোইকবাদ বলে। স্টোয়িকবাদীদের ভাষায় `Live according to nature' ব্যক্তি প্রকৃতির বিধান মেনে জীবন যাপন করলেই মাত্র শান্তি লাভ করতে পারে। সুখের অন্বেষয়ে সুখ লাভ করা নয়। বৈরাগ্য অনুসরণ করলেই মানুষ শান্তিতে থাকতে পারে। নিয়তিকে তারা প্রাকৃতিক আইন বা প্রাকৃতিক বিধান হিসেবে উপস্থাপন করেন। তারা মানুষকে স্রষ্টা প্রদত্ত জ্ঞান এবং বিধাতার বিধানের সাথে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা করে। সেই সাথে তারা মানুষকে বিশ্বনাগরিকতায়ও উদ্দুদ্ধ করতো। জেনো এক এবং অভিন্ন পৃথিবীর স্বপ্ন দেখেন যেখানে জাতিগত ভেদাভেদ, রাষ্ট্রীয় দ্বন্দ্ব, ধনী বা গরীব, দাস বা প্রভূর সংঘাত কলহ থাকবে না। বিশ্বব্যাপী একক রাষ্ট্রকে তারা বিশুদ্ধ রাষ্ট্র বলে অভিহিত করেন। তারা রাষ্ট্রের আইনকে প্রাকৃতিক আইনের অনুরূপ বলে মত প্রচার করেন। নিয়মনীতি ও রেওয়াজের নামে রাষ্ট্রে আইন প্রণয়ন করা যাবে না। খ্রিস্ট ধর্মের মতো স্টয়িকরা প্রতিটি মানুষকে আল্লাহর সন্তান মনে করতো এবং তাদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই। সেটায়িকদের মতে, ব্যক্তি কি মর্যাদার অধিকারী ও কোন বংশোদ্ভূত সেটি বড় কথা নয়। সে কি কি সদগুণাবলীর অধিকারী সেটাই বিবেচ্য। অর্থাৎ ব্যক্তিকে তার গুণ ও সততা দিয়ে বিচার করতে হবে। যে মানুষ অন্যায় ও পাপকে বর্জন করে সত্য ও ন্যায়ের পথে জীবন পরিচালিত করে সে যত দরিদ্র ও নীচু বংশজাত হোক না কেন সম্পানীয়। প্রতিটি ব্যক্তি সমাজে দায়িত্ব পালন করবে তা প্রকৃতি নির্দিষ্ট করে দিয়েছে এবং একমাত্র সততা, ন্যায়পরায়নতা, নিষ্ঠা ও যুক্তিবাদীকে অবলম্বন করে সে তার

দায়িত্ব পালন করতে পারে। বস্তুতঃ ব্যক্তি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে নয় বরং নিজের যোগ্যতা বলে মর্যাদা অর্জন করে। ক্রিসিপ্পাস, প্যানেটিয়াস ও পোসিডোয়াস প্রমূখ স্টোয়িক দার্শনিকের নাম উল্লেখযোগ্য।

স্থগিতকারী ভেটো (Suspensive or Qualified Veto)

আইনসভা কর্তৃক গৃহীত কোনো বিল রাষ্ট্রপতির নিকট সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয় তখন তিনি বিলটিকে সরাসরি প্রত্যাখ্যান না করে বিলটিকে পুনর্বিবেচনার জন্য আইনসভার নিকট ফেরৎ পাঠাতে পারেন। রাষ্ট্রপতির এরূপ ক্ষমতাকে স্থগিতকারী ভেটো ক্ষমতা বলা হয়। ভারত, পাকিস্তান ও বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতিকে লিখিত সংবিধানে স্থগিতকারী ভেটো ক্ষমতা অর্পন করা হয়। এসকল দেশে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ফেরতপ্রাপ্ত বিলটিকে পুনরায় সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের ভোটে গৃহীত হতে হয়। ১৯৯৯ সালে বাংলাদেশে সপ্তম জাতীয় সংসদ চলাকালীন সময়ে রাষ্ট্রপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ সর্বপ্রথম দেওয়ানী কার্যবিধি (সংশোধন) আইন, ১৯৯৯ এর ক্ষেত্রে তিনি সম্মতি না দিয়ে জাতীয় সংসদে পুনর্বিবেচনার জন্য ফেরত পাঠান। কিন্তু তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার বিলটিকে জতীয় সংসদে পুনর্বিবেচনার জন্য উত্থাপন করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে রাষ্ট্রপতির ক্ষেত্রে বিলকে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতায় কংগ্রেস কর্তৃক গৃহীত হতে হবে (মার্কিন সংবিধান, অনুচ্ছেদ: ১ ধারা-৭)। অর্থাৎ আমেরিকার রাষ্ট্রপতির কাছে যখন কোনো বিল পেশ করা হয় তখন তিনি যদি সম্মতি দিতে না চান তাহলে ১০ দিনের মধ্যে তাঁর আপত্তির কারণ জানিয়ে একটি বিবৃতিসহ কংগ্রেসের সেই শাখায় তা ফেরৎ পাঠাতে পারেন যে শাখায় তা উদ্ভূত হয়েছে, তখন কংগ্রেসের উভয় কক্ষই (Senate and House of Representatives) বিলটি পুনর্বিবেচনা করে এবং উভয় কক্ষের উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্য পায় তাহলে তা রাষ্ট্রপতির স্বাক্ষর না করা সত্ত্বেও আইনে পরিণত হয়। অন্যথায় দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাধিক্য না পেলে বিলটি আইনে পরিণত হতে পারে না।

স্থলমাইনবিরোধী আন্দোলন (Anti Landmine Treaty)

স্থলমাইন হলো এক ধরনের মরণাস্ত্র যা ব্যবহারকারী ছাড়াও নিদিষ্ট সময়ের পর বিস্ফোরিত হয়। প্রধানত বিশ্বে তিন ধরনের স্থলমাইন আছে, যথা ঃ ১. ব্লাস্ট মাইন যা মাটির নিচে লুকানো এসব মাইন সামান্য চাপেই বিস্ফোরিত হয় ২. ফ্র্যাগমেন্টেশন মাইন যা মাটির ওপর পেতে এসব মাইনের বিস্ফোরণ ঘটানো হয় সংযুক্ত তাদের সাহায্যে) এবং ৩. বাইন্ডিং ফ্র্যাগমেন্টেশন মাইন এগুলো নিক্ষেপযোগ্য। গত ১৩০ বছর ধরে শত্রুকে ধ্বংস করার জন্য পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এসব মাইন পেতে রাখা হয়। সারা বিশ্বে আনুমানিক ২০ থেকে ৩০ কোটি স্থলমাইন পাতা আছে এবং এর ফলে প্রতি বছর গড়ে ২৬০০০ শিশু, নারী ও নিরীহ মানুষ প্রাণ হারাচ্ছে অথবা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। প্রতিটি স্থলমাইন তৈরি ও পাতার জন্য খরচ পড়ে মাত্র তিন ডলার; অথচ

এর একেকটি নিষ্ক্রিয় করতে খরচ হয় ১০০০ ডলার। স্থলমাইনকে বলা হয় নীরব সৈন্য। যুদ্ধ থেমে যায়, সৈন্যেরা চলে যায়, কিন্তু এই মাইন তার কাজ করেই যেতে থাকে। আশির দশকে পঙ্গু যোদ্ধা রবার্ট মিলার ভিয়েতনাম থেকে ফেরত এসে 'ভিয়েতনাম ভেটারন্স আমেরিকান ফাইন্ডেশন'-এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণের জন্য আন্দোলনের সূচনা করেন। ১৯৯১ সালে স্থলমাইনবিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন গড়ে তোলার জন্য মিলার জোডি উইলিয়ামসকে আহ্বান জানান। এই আহ্বনে সাড়া দিয়ে মার্কিন মিলার জোডি উইলিয়ামস শুরু করেন আন্তর্জাতিক স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ আন্দোলন। এই আন্দোলনের অন্যতম প্রাণপুরুষ কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী লয়েড এক্সওয়ার্দি। স্থলমাইন নিষিদ্ধকরণ আন্দোলনে অনবদ্য ভূমিকার জন্য জোডি উইলিয়ামস ১৯৯৭ সালে নোবেল শান্তি পুরস্কারে ভূষিত হন। ব্রিটেনের সাবেক প্রিন্সেস অব ওয়েলস ডায়ানাও এই আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং স্থলমাইন বিস্ফোরণে পঙ্গু ও আহতদের জন্য কাজ শুরু করেছিলেন। বর্তমানে জর্ডানের রানি নুর এই আন্দোলনের অপর নেত্রী। এখনও প্রতি ২০ মিনিটে পৃথিবীর কোনো না কোনো দেশে কেউ-না-কেউ স্থলমাইন বিস্ফোরণে প্রাণ হারাচ্ছে কিংবা পঙ্গু হয়ে যাচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে, এ পর্যন্ত ১৩৬টি দেশ স্থলমাইন ব্যবহার নিষিদ্ধকরণ, অপসারণও মওজুদ অস্ত্র ধ্বংসকরণের ব্যাপারে ঐকমত্য হয়ে অটোয়া চুক্তিতে স্বাক্ষর করেছে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, চীন, ভারত, পাকিস্তান ও ফিনল্যান্ড প্রভৃতি দেশ এখনও এ চুক্তিতে স্বাক্ষর করেনি।

স্থায়ী বাসভূমি (Domicile)

স্থায়ী বাসভূমি বা স্থায়ী বাসস্থান অর্থা যেকোনো ব্যক্তির স্থায়ী বাসস্থান, যদিও প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি অন্য জায়গায় বাস করে, অথবা সে নিজ জন্মস্থানে ফিরে আসার ইচ্ছা পোষণ করে। প্রকৃতপক্ষে সেই ব্যক্তি যেখানেই বসবাস করুক না কেন, বিধিসম্মত স্থায়ী বাসভূমি তার নিকট নানাদিক হতে গুরুত্বপূর্ণ ; কারণ এর মারফতে কর শাসনকারী কর্তৃপক্ষের অধিক্ষেত্র নির্ধারিত হয় এবং তার ভোট দেওয়ার ও অন্যান্য বৈধ অধিকার ও সুযোগসুবিধা উপভোগ করার ক্ষেত্র নির্ধারিত হয়। অন্য দেশ হতে আগত কোন ব্যক্তির স্থায়ীভাবে বসবাসের অধিকার লাভ সম্পর্কে বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন প্রকার আইন আছে।

স্থির ব্যয় (Fixed Cost)

উৎপাদনের পরিমাণের হ্রাস বৃদ্ধির ফলে যে ব্যয়ের কোন পরিবর্তন হয় না তাকে স্থির ব্যয় বলা হয়। ইহা পরিপূরক ব্যয় (Supplementary cost) বা উপরিস্থ ব্যয় (Overhaead cost) নামেও পরিচিত। যেমন–বাড়ী ভাড়া, দীর্ঘকালীন ঋণের সুদ, উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের এবং দারোয়ানের বেতন, যন্ত্রপাতির ক্ষয়পূরণ প্রভৃতি ব্যয় স্থির ব্যয়ের অন্তর্ভুক্ত। উৎপাদন কম হোক বা বেশী হোক বা সাময়িকভাবে বন্ধ থাকুক, ব্যবসায়ে টিকিয়ে থাকতে হলে প্রতিষ্ঠানকে এই সকল স্থায়ী ভাবে বহন করতে হবে।

স্নায়ুযুদ্ধ অথবা ঠান্ডাযুদ্ধ (Nerve War **অথবা** Cold War)

সরাসরি অস্ত্রপ্রয়োগের বদলে দুই প্রতিপক্ষ যখন পরস্পরকে অর্থনৈতিক, কূটনৈতিক, প্রচার, গোয়েন্দাতৎপরতা ও সামরিক হুমকিসহ বিভিন্নভাবে পরোক্ষ কায়দায় ঘায়েল বা মানসিকভাবে দুর্বল করার চেষ্টা করে, তখন এরূপ তৎপরতাকে বলে স্নায়ুযুদ্ধ বা ঠান্ডাযুদ্ধ, কেননা এরূপ তৎপরতা প্রতিপক্ষের স্নায়ুর ওপর দারুণ চাপ সৃষ্টি করে।

স্পার্টাকাস (Spartacus)

স্পার্টাকাস প্রাচীন গ্রিসের অন্তঃপাতি থ্রেসের একজন মেষপালক ছিলেন। তিনি রোমানদের ক্রীতদাসে পরিণত হন। তিনি কিছুদিন পর রোম থেকে পালিয়ে গিয়ে ক্রীতদাসদের একটি বিরোধী দলের সঙ্গে মিলিত হন। পরবর্তীতে তিনি বিরোধীদের সংগঠিত করে সমগ্র ইতালি ব্যাপী এক ক্রীতদাস বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। তাঁর নেতৃত্বে বিদ্রোহী ক্রীতদাসরা ব্যাপক ধবংসাত্মক কার্য শুরু করে। এই বিদ্রোহে হাজার হাজার মানুষ প্রাণ হারায় এবং রোম সাম্রাজ্যের বেশ কয়েকটি বাহিনী বিদ্রোহীদের হাতে পরাজিত হয়। অবশেষে খ্রিস্টপূর্ব ৭১ সালে রোমীয় সেনাপতি মার্কাস লিমিনিয়াস ক্রেসাস দাস বিদ্যোহ দমন করেন। স্বয়ং স্পার্টাকাসও এক খন্ডযুদ্ধে নিহত হন।

স্বয়ংক্রিয়তা (Automation)

মানুষ কোনো কাজ হস্তচালিত যন্ত্রের দ্বারা করানোর পরিবর্তে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্র দিয়ে করানোকে স্বয়ংক্রিয়তা বলে। রেলগাড়ি, জাহাজ, বিমান ইত্যাদি থেকে শুরু করে আধুনিক স্বয়ংচালিত কলকারখানা ইত্যাদিই হল স্বয়ংক্রিয়তার উদাহরণ। বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তির অগ্রগতির সাথে সাথে স্বয়ংক্রিয়তারও উন্নতি ঘটছে। যেমন, মানবশক্তির বদলে স্টীম, বিদ্যুৎ বা আণবিক শক্তিতে যে শুধু কলকারখানাই চলছে তা নয়-ওই যন্ত্রের চালুকরণ, বন্ধকরণ, তদারক, নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিও ক্রমশ কম্পিউটার, রোবট ইত্যাদি যন্ত্রের মাধ্যমে সম্পাদিত হচ্ছে। শুধু কলকারখানা নয়, গৃহস্থালি, বিনোদন ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ক্রমশ স্বয়ংক্রিয়তার প্রসার ঘটছে। কারও কারও মতে স্বয়ংক্রিয়তার এই বিস্তার মানুষকে বেকার ও অলস করে তুলছে, যা চূড়ান্ত বিচারে মানুষের জন্য ক্ষতিকর। আবার, স্বয়ংক্রিয়তার সমর্থকদের মতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে কর্ম ও চাহিদারও নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হচ্ছে। ফলে বেকার বা অলস হয়ে যাওয়ার কোনো সম্ভবনাই থাকছে না। তাঁরা শিল্পোন্নত দেশসমূহের কর্মমুখরতাকেই এর প্রমাণ বলে বিবেচনা করেন।

স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Self-dependent)

গ্রিক Autarkeia. শব্দের উচ্চরণ হল Autarky-এর আভিধানিক অর্থ হল 'আত্মশাসন'। কিন্তু এ-শব্দটি প্রধানত স্বয়ংসম্পূর্ণতা বা স্বয়ংম্ভরতা অর্থে ব্যবহার হয়। এর অর্থনৈতিক তাৎপর্য হল এই যে, কোনো দেশ পরনির্ভরতা পরিহার করে তার প্রয়োজনীয় প্রায়

সকল দ্রব্য নিজেই উৎপাদন করবে এবং বিদেশ থেকে আমদানি বন্ধ বা হ্রাস করবে। যুদ্ধের সময় শত্রুবেষ্টিত হয়েও যাতে কোনো দ্রব্যের অভাবে পড়তে না হয়, তার জন্য নাৎসি-জার্মানিতে এই ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছিল। অধুনা কোনো একটি ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জনকেও উক্ত ক্ষেত্রে Auturky অর্জন বলে ধরে নেওয়া হয়।

স্বরাজ পার্টি (Swaraj Party)

স্বরাজ পার্টি ব্রিটিশ ভারত বিশেষ করে যুক্তবাংলার রাজনীতির ইতিহাসে একটি অতি পরিচিত রাজনৈতিক সংগঠন। বাংলার জনপ্রিয় নেতা দেশবন্ধু চত্তরঞ্জন দাস ছিলেন এই দলের জনক। ১৯২২ সালের ৩১ ডিসেম্বর 'নিখিল ভারত স্বরাজ পার্টি গঠিত হয়। অন্য তথ্যানুযায়ী, ১৯২৩ সালের ১ জানুয়ারি গয়াতে 'কংগ্রেস-খিলাফত স্বরাজ পার্টি গটিত হয়। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস স্বরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি এবং মতিলাল নেহেরু ছিলেন সাধারণ সম্পাদক। তবে ১৯২৩ সালের ২০-২২ ফেব্রুয়ারি পার্টির সাধারণ সভায় এলাহাবাদের এর নুতন নামকরণ হয় 'স্বরাজ পার্টি। তারপর ১৯২৪ সালের ১৬-১৭ আগস্ট কলকাতায় অনুষ্ঠিত পার্টির সাধারণ সভায় দলের সংবিধান গৃহীত হয়। এর মূলনীতি ছিল বৈধ ও শান্তিপূর্ণ উপায়ে ভারতের জনগণের মাধ্যমে স্বরাজ প্রতিষ্ঠা। এ লক্ষ্যে প্রথমত দলটি পূর্ণ ডমিনিয়ন মর্যাদা দাবি করে। সর্বভারতীয় রাজনীতিতে দলটি তেমন সাড়া জাগাতে না পারলেও এটি বাংলা রাজনীতিতে একচ্ছত্র দলে পরিণত হয়েছিল। সকল ধর্মের অনুসারীদের কাছেই দলটি ছিল জনপ্রিয়। এর প্রেক্ষাপটে ১৯২৩ সালে দেশবন্ধু বাঙালি মুসলমান নেতাদের সাথে মিলে বেঙ্গল প্যাক্ট চুক্তি স্বাক্ষর করেন। রাজনেতিক ক্ষেত্রে স্বরাজ পার্টি দ্বিবিধ কৌশল নিয়েছিল। ক. কাউন্সিলের অভ্যন্তরে কার্যক্রম, খ. ভারতীয় জনগণের মধ্যে কার্যক্রম।
ভারতের নির্বাচনী রাজনীতিতেও স্বরাজ পার্টি বেশ চমক সৃষ্টি করতে পেরেছিল। ১৯২৩ সালে নভেম্বর ও ডিসেম্বর মাসের কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদ নির্বাচনের যে দুটি পার্টি প্রাধান্য বিস্তার করেছিল তার একটি স্বরাজ পার্টি এবং অন্যটি ছিল লিবারেল পার্টি কেন্দ্রীয় আইন পরিষদ নির্বাচনের ১৪৫ আসনের মেধ্য ৪০ জন ছিলেন মনোনীত সদস্য এবং বাকি ১০৫ জনের মধ্যে স্বরাজ্য দলের ছিলেন ৪৫ জন। অন্যদিকের ৪৩টি অমুসলিম আসনের ২৩টি , উত্তর প্রদেশে দলটি নিসংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়। তবে পাঞ্জাব, বিহার ও উড়িষ্যার এর অবস্থান ছিল খুবই দুর্বল। সর্বোপরি ১৯২২-২৬ সালের অইন পরিষদের অভ্যন্তরে অতিরিক্ত করারোপ ও অন্যান্য জনপ্রিয় অতি প্রণয়নের বিরুদ্ধে স্বরাজ দল অত্যন্ত সফলতার সাথে ভূমিকা রাখে। তবে ১৯২৫ সালে দেশবন্ধু মৃত্যুবরণ করলে দলটিতে ক্ষয় শুরু হলেও ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন কার্যকর হওয়ার আগ পর্যন্ত দলটির কার্যক্রম ছিল। পরবর্তীতে দলটি বিলুপ্ত হয়ে যায়।

স্বর্ণমন্দির (hold temple)

স্বর্ণমন্দির ভারতে পাঞ্জাব রাজ্যের রাজধানী অমৃতস্বরে অবস্থিত। স্বর্ণমন্দির শিখ ধর্মাবলম্বীদের পবিত্র স্থান।

স্কলাসস্টিসিজম্ (Scholasticism)

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে গির্জা রাজনীতিতে অধিকমাত্রায় হস্তক্ষেপ করার ফলে ধর্ম, নৈতিকতা, মূল্যবোধ ও আদর্শ সম্পর্কে সে ভাবমূর্তি অতীতে গড়ে ওঠেছিল তা হ্রাস পেতে থাকে। জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চায় জনগণের উৎসাহ বেড়ে যায়। তাছাড়া ইউরোপের বিভিন্ন শহরের রাজধানীতে বিদ্যাচর্চার কেন্দ্র স্থাপিত হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে মানবিক বিষয়সমূহের ব্যাপক আলোচনা হতে থাকে। এই সময়ে গির্জা সংকীর্ণতার পথ পরিহার করে বিশ্বজনীনতার দিকে অগ্রসর হয়। এবং আবব ও ইহুদী পণ্ডিতেরা অ্যারিস্টটল এর দর্শন স্পেনসহ পশ্চিমের দেশসমূহে প্রচার করেন। পদার্থবিদ্যা, জীববিদ্যা, তর্কশাস্ত্র, রাজনীতি, মনোবিদ্যা, নীতিবিদ্যা প্রভৃতি বিষয়ে অ্যারিস্টটলের ধারণা ক্রমশ প্রচারিত হতে থাকে। এতে জ্ঞানচর্চার সাথে সাথে বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপনের বা সংহতি সাধনে চেষ্টা চলতে থাকে। জ্ঞানকে একটা বিচ্ছিন্ন বস্তু হিসেবে না দেখে সামাজিক দৃষ্টি দিয়ে দেখার প্রবণতা শেষের দিকে প্রবল হয়ে ওঠে এবং ধীরে ধীরে তা ব্যাপকতা লাভ করে। প্যারিস বিশ্ববিদ্যালয়েও দেবতত্ত্ব, কলাবিদ্যা, আইন ও ভেষজবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা ও গবেষণা শুরু হয়। অতঃপর জ্ঞানের ঐক্যসাধনের প্রচেষ্টা সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে জ্ঞানের এই একত্রীকরণ প্রচেষ্টাকে স্কলাস্টিসিজ্‌ম (Schalasticism) বলা হয়। সেন্ট টমাস একুইনাস স্কলাস্টিসিজম এর অগ্রদূত হিসেবে পরিচিত।

স্বাধীনতা, সংবাদপত্রের (Freedom of Press)

যেকোনো গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে সংবাদ পত্রের স্বাধীনতা সংবিধান স্বীকৃত। সংবাদপত্রে মতামত প্রকাশের স্বাধীন ইচ্ছার ওপর কোনো সরকারি কর্তৃপক্ষের কর্তৃত্ব না থাকাকে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বলা হয়। এটা যাতে মানহানিকর, রাষ্ট্রদ্রোহমূলক বা অশ্লীল না হয়ে যেকোনো সংবাদ, সমীক্ষা, আদর্শ বা মতামত সংবাদপত্রের প্রকাশের স্বাধীনতা। সাধারণত স্বৈরাচারী ব্যবস্থাতেই সংবাদপত্রের স্বাধীনতা থাকে না। আবার, কোনো আদর্শভিত্তিক (যেমন, সমাজতান্ত্রিক) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে সেখানেও উক্ত আদর্শের স্বার্থের অজুহাতে আদর্শবিরোধী কোনোকিছু প্রকাশ করার অধিকার প্রদান করা হয় না। অনুন্নত বিশ্বে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের ব্যাপারে অধিকতর দৃশ্যমান।

স্বায়ত্তশাসন (Autonomy)

স্বায়ত্তশাসন বলতে স্ব-শাসন বা নিজেরা নিজেদের শাসনকে বোঝায়। গ্রিক শব্দ Autonomy (স্বায়ত্তশাসন বা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার) থেকে এর উৎপত্তি। কোনো পরাধীন দেশ স্বায়ত্তশাসন চাইতে পারে। আবার একই দেশের ভেতরে কোনো অঞ্চল বা প্রদেশ বা জাতিসত্তা নিজেদের স্বকীয়তা ও অধিকার রক্ষার্থে স্বায়ত্তশাসন দাবি করতে পারে।

স্বার্থবাহী গোষ্ঠী (Interest Group)

আকর্ষণীয় বিষয় হলো (Group) বা গোষ্ঠী আবিস্কার এবং রাজনীতিতে তার প্রভাব। রাজনৈতিক মঞ্চে গোষ্ঠী মতবাদ প্রায় ৫০ বৎসরেরও অধিককাল ধরে প্রচলিত আছে। এই মতবাদের প্রথম প্রবক্তা হলেন আর্থার এফ. বেন্টলী (Arthur F. Bently)। ১৯০৮ সালে প্রকাশিত বিখ্যাত গ্রন্থ The Process of Government-এ মতবাদ প্রচার করেন। পরবর্তীতে চার্লস বি. হেগেন এবং রোল্যান্ড ইয়ং এ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। ডেভিড ট্রুম্যান, ইল্যাথাম এল্যানা, পটার, ডি. উটন, এইচ. গিলজার, ভি.ও. কী প্রমুখ লেখ এ সম্পর্কে আলোচনা করেন। গোষ্ঠীকে অনেকে উপদল হিসেবে অভিহিত করেছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় গোষ্ঠী মতবাদ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। গোষ্ঠী বলতে হেগেন ও বেন্টনী কোনো সাধারণ দিকে বা লক্ষ্যে পরিচালিত মানবিক কার্যকলাপের যে কোনো সমষ্টিকেই (a mass of human activity tending in a common direction) বুঝিয়েছেন। রাজনৈতিক ব্যবস্থাপনায় সেই পদ্ধতি বা প্রক্রিয়া যাতে সকল প্রকার সামাজিক সুযোগ-সুবিধা নিয়ন্ত্রণমূলক পদ্ধতিতে বণ্টন করা হয়ে থাকে, কার্যকলাপে সিদ্ধান্তসমূহ সৃষ্টি লাভ করে, প্রত্যেক কার্যকলাপ অন্য সকল প্রকার কার্যকলাপ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় বরং কার্যকলাপের সমষ্টিই সাধারণত সিদ্ধান্ত গ্রহণে পরিচালিত হয়। কার্যকলাপের এই সকল সমষ্টিকেই গোষ্ঠী বলে।

গ্রুপের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে ট্রুম্যান বলেছেন যে, "এটা কিছু লোকের সমষ্টি যাদের মধ্যে কতিপয় সাধারণ বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান" (a collection of individuals who have some characteristics in common)| তবে গ্রুপের সদস্যদের মধ্যে যে সমজাতীয় আচরণ দৃষ্ট হয় সে কথা তিনি বলেননি। সমজাতীয় আচরণ পারস্পরিক ক্রিয়া ও সম্পর্কের ফল যা তাদের একটি শক্তিশালী একক হিসেবে কাজ করতে প্রেরণা দেয়। স্বার্থগোষ্ঠী হলো এক দল লোকের সমষ্টি, যারা সংঘবদ্ধ, যাদের কিছু সাধারণ নীতি থাকে এবং তারা সে সব আদায় করতে সচেষ্ট। গোষ্ঠী বলতে সাধারণ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী কিছু সংখ্যক লোকের সমষ্টিকে বুঝায়, যারা বিশেষ কোনো স্বার্থ বা দাবি পেশের ব্যাপারে একমতো, যারা মৌলিক রাজনৈতিক একক হিসেবে আচরণ করে এবং রাজনীতি ও দাবি-দাওয়া সম্পর্কে কম-বেশি সচেতন (A group is a collection of individuals having common characteristics, who are unanimous on particular interest of demands, who maintain uniform behaviour on that point, and who are more or less conscious about politics and their demands) গোষ্ঠী বা উপদলগুলো রাজনৈতিক ব্যবস্থায় স্বার্থ ও দাবির কথা পেশ করে এবং সেগুলোকে সরকারি সিদ্ধান্তে রূপান্তরিত এবং বাস্তবায়িত করার জন্য চাপ দেয় বলে চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure group) বলা হয়। আবার এইসব গোষ্ঠী স্বীয় স্বার্থের কথা জানায় এবং স্বার্থ আদায় করতে সচেষ্ট হয় বলে সুবিধা আদায়কারী বা স্বার্থ গোষ্ঠীও বলা হয়।

গণতন্ত্রে রাজনৈতিক দলের মতো স্বার্থকামী গোষ্ঠী অপরিহার্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতে এসব গোষ্ঠী ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করে বসেছে।

সরকারি ব্যক্তিগণের কোনো সংঘকেই সাধারণভাবে বুঝান হয়। সংঘের কিছু সাধারণ স্বার্থ থাকে এবং রাজনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে বাস্তবে প্রয়োগ এবং সরকারকে প্রভাবিতকরণে তাদের লক্ষ্য অর্জন করে। আলমন্ড বলেন যে, গোষ্ঠী বলতে "কতকগুলো লোকের সমষ্টিকে বুঝি, যারা বিশেষ স্বার্থ বা সমৃদ্ধের গ্রন্থিতে আবদ্ধ এবং যাদের মধ্যে এই বন্ধন সম্বন্ধে কম হলেও চেতনাবোধ বিদ্যমান"। গোষ্ঠীগুলোর নামকরণকে ঘিরে রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রচুর মতোভেদ আছে। অনেকে স্বার্থকামী বা স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী (Interest Group), কেউ চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী (Pressure Group) এবং কেউ কেউ সংগঠিত গোষ্ঠী (Organized Group) নামে অভিহিত করেছেন। আলমন্ড ও পাওয়েল, ডেভিড জি. উইট এবং অন্যরা স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী বলে অভিহিত করেছেন। তাদের মতে, নামকরণটি যুক্তিযুক্ত। আলমন্ড ও পাওয়েলের মতে, 'স্বার্থকামী গোষ্ঠী বলতে নির্দিষ্ট স্বার্থের বন্ধনে আবদ্ধ অথবা সুযোগ-সুবিধার দ্বারা সংযুক্ত এমন ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝি-যা এই রকম বন্ধন সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন'। এল. আর্লস এবং জন.সি. পিয়ার্স-এর ভাষায়, 'স্বার্থন্বেষী গোষ্ঠী হলো এমন ব্যক্তিসমষ্টি বা ব্যক্তির সংগঠন যা রাজনৈতিক কাঠামোর ওপর দাবি উত্থাপন এবং উত্থাপিত সিদ্ধান্ত দ্বারা সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে'। এইচ. জিগলারের কথায়, "এমন একটি সংগঠিত ব্যক্তিসমষ্টিকে বুঝায় যার সদস্যবর্গ সরকার পরিচালনায় অংশ না নিয়েও সরকারি সিদ্ধান্তের ওপর প্রভাব বিস্তারে সচেষ্ট হয়"। প্রভাব বিস্তারই প্রধান উদ্দেশ্য নয়, মুখ্য উদ্দেশ্য সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টিতে স্বীয় সুযোগ আদায় করা। এইগুলোকে সুযোগ সন্ধানী গোষ্ঠী বা উপদলও হয়তবা বলা যেতে পারে। বৃত্তিগত, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি শ্রেণিভিত্তিক স্বার্থান্বেষী বা চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায়। গোষ্ঠী বা শ্রেণিগত স্বার্থ রক্ষা করা এর প্রধান কর্তব্য। কৃষক সমিতি, বণিক সমিতি, শিক্ষক সমিতি ও শ্রমিক সমিতি এর প্রধান উদাহরণ। (বিস্তারিত দেখুন: ড. মো. মকসুদুর রহমান, রাষ্ট্রীয় সংগঠনের রূপরেখা, ঢাকা: আলেয়া বুক ডিপো, ২০১৩)।

স্বৈরতন্ত্র (Authoritarianism)

যখন শাসক ও তাঁর কর্তৃপক্ষ জনমতের তোয়াক্কা না করে যথেচ্ছারভাবে ক্ষমতা প্রয়োগ করে তখন তাকে স্বৈরতন্ত্র বা Autocracy বা Despotism বলে। আর জনমতের ও গণতন্ত্রের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত জনগণের সার্বভৌম ক্ষমতা ধ্বংস করে এক বা মুষ্টিমেয় শাসকের স্বেচ্ছাচারী শাসন প্রতিষ্ঠার মতবাদ হলো স্বৈরশাসনবাদ বা স্বেচ্ছচারবাদ। এই মতবাদের সমর্থকদের মতে গণতন্ত্র জাতিকে অনৈক্য ও দূর্বল করে; সুতরাং রাষ্ট্রকে সংহত ও শক্তিশালী করার জন্য নিরঙ্কুশ ক্ষমতার অধিকারী একক বা কতিপয় ব্যক্তিত্বের শাসন প্রতিষ্ঠা করা দরকার। স্বৈরতন্ত্র গণতন্ত্রের বিপরীত এবং প্রায়শই গণস্বার্থবিরোধী।

স্লোগান (Slogan)

প্রাচীনযুগে যখন এক সম্প্রদায়ের সাথে অন্য সম্প্রদায়ের যুদ্ধ হতো, তখন তারা তাদের সম্প্রদায়গত ধ্বনি দিতে দিতে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। এই

সম্প্রদায়গত রণধ্বনিকেই স্লোগান বলা হত। বর্তমানে যে কোনো আদর্শের বা কর্মসূচির পক্ষে উত্তোলিত সংক্ষিপ্ত অথবা জোরালো ও অর্থবহ সম্মিলিত আওয়াজকেই বলে স্লোগান। কোনো নেতা বা দলের পক্ষেও স্লোগান উত্তোলিত হতে পারে।

হব্‌সের সামাজিক চুক্তি মতবাদ (Social Contract Theory of Hobes)

টমাস হবস ১৫৮৮ সালে এক যাজক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ১৬৫১ সালে তিনি অমর গ্রন্থ "লিভিয়াথান" রচনা করেন। হবসের সময় ইংল্যান্ডের রাজনৈতিক অবস্থা মোটেও সন্তোষজনক ছিল না। রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলছিল। লিভিয়াথানের মধ্যে তিনি সামাজিক চুক্তি আলোচনা করেন। তার চুক্তির মূল বিষয় হলো, পরম অরাজক অবস্থা থেকে মুক্তি পাবার জন্য জনগণ স্বেচ্ছায় নিজেদের মধ্যে চুক্তি স্বাক্ষরে ক্ষমতা একজনের হাতে অর্পণ এবং তাকে চরম ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার দেয়। রাষ্ট্র সৃষ্টির পূর্বে তারা প্রকৃতির রাজ্যে বসবাস ক্ষমতা, সেখানে কোনো কঠোর শাসন না থাকায় কেউ কাউকে মান্য ক্ষমতা না। সে কারণে জনগণের জীবন দুর্বিষহ হয়ে উঠে। সে পাপময় জীবন থেকে পরিত্রাণ পাবার লক্ষ্যে ক্ষমতা চুক্তির বিধান অনুসারে একজনের হাতে প্রদান করা হয়। সেই একজন বা রাজা চুক্তি অনুসারে দেশ শাসনে কারো কাছে দায়ী থাকবেন না, কেননা তিনি চুক্তির কোনো পক্ষ নন। তার মতে, এমনিভাবে সমাজবদ্ধ হয়ে মানুষ চুক্তির শর্তে রাষ্ট্র গঠন করে। তার সামাজিক চুক্তি সহজে বুঝতে হলে নিম্ন বিষয় বিস্তারিত আলোচনা করতে হবে।

হরতাল (Hartal)

যেকোন ধরনের শাসন ব্যবস্থায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ ইস্যুতে সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করার একটি উপায় হলো হরতাল। হরতাল একটি গুজরাটি শব্দ। এর অর্থ হচ্ছে কোনো দাবি বা প্রতিবাদের পরিপ্রেক্ষিতে কর্মবিরতি বা ধর্মঘট। বর্তমানে, কোনো দাবি বা প্রতিবাদের ভিত্তিতে অফিস-আদালত, দোকানপাট, শিল্পকারখানা ও যানবাহন চলাচল ইত্যাদি বন্ধ করে দেওয়াকেই বলা হয় হরতাল।

হরতাল যা সর্বাত্মক ধর্মঘটের প্রকাশ। মহাত্মা গান্ধী ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে প্রথম এই শব্দটি ব্যবহার করেন। এটা হচ্ছে সরকারের বিরুদ্ধে জনগণের সম্মিলিত আন্দোলন। হরতালের সময় সকল কর্মক্ষেত্র, দোকান, আদালত বন্ধ থাকে। তবে সাধারণত এ্যাম্বুলেন্স, ফায়ারসার্ভিস, গণমাধ্যমসমূহ এর আওতার বাইরে হয়ে থাকে।

এটা সাধারণত কোনো একটা দাবি আদায় করার বা এর গুরুত্ব বোঝাতে আহ্বান করা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, দ্রব্যমূল্যের অত্যধিক বা ক্রমবর্ধমান বৃদ্ধি রোধ করার ক্ষেত্রে সরকারি দলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে এর ব্যবহার। এছাড়াও বিভিন্ন কারণে হরতাল ডাকা হয়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সরকার সমর্থিত নয়, এমন সংগঠন, কিংবা বিরোধী দল হরতালের আহ্বান করে থাকে। তবে অরাজনৈতিক কোনো দলও, সরকার-সমর্থিত হওয়াসত্ত্বেও সরকারের কোনো কাজের বিরোধিতা করতে হরতালের ডাক দিতে পারে।

হরমুজ প্রণালী (Hormuz way)

হরমুজ প্রণালী পারস্য উপসাগরের দক্ষিণে অবস্থিত। পারস্য উপসাগরের তীরবর্তী দেশসমূহের অর্থাৎ ইরাক, ইরান, কুয়েত, সৌদি আরব, বাহরাইন, কাতার, ওমান ও সংযুক্ত আরব আমীরাত প্রভৃতি রাষ্ট্রগুলির উপসাগর পার হয়ে সমুদ্রে পৌঁছার একমাত্র পথ। তাছাড়াও বিদেশি জাহাজগুলোর তাদের বাণিজ্যিক উদ্দেশে পারস্য উপসাগরীয় অঞ্চলে আসতে হলে আরব সাগর থেকে হরজুম প্রণালী অতিক্রম করতে হয়। হরমুজ প্রণালীর গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান যুগে যুগে বহুযুদ্ধের ইন্দর যুগিয়েছে। এসব যুদ্ধে বিশ্বের পরাশক্তি জড়িয়ে পড়েছে বিভিন্ন সময়ে। তার কারণ এ প্রণালীটি ৬০ কি.মি. এর বেশি চওড়া না হলেও এ পথ দিয়ে প্রতি ১০ মিনিটে একটি তেলবাহী ট্যাংকার বের হয়ে আসে। এই তেল সারা দুনিয়ার প্রয়োনীয় তেলের ৬২%। হরমুজ প্রণালীর মাধ্যমে সরবরাহকৃত তৈল পাশ্চাত্য দেশসমূহের উন্নয়নশীল কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত।

হাই-টেক পার্ক (High Tech Park)

বর্তমান বিশ্বে জ্ঞান ভিত্তিক শিল্প অতিদ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলশ্রুতিতে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে হাইটেক পার্ক নির্মিত হয়েছে। বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে কৃষি ও শিক্ষা ভিত্তিক অর্থনীতিকে জ্ঞান ভিত্তিক অর্থনীতিতে রূপান্তরের জন্য তথ্য ও বায়ো প্রযুক্তি সরকারের সর্বোচ্চ গুরুত্বসম্পন্ন সেক্টর হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। দক্ষ কর্ম পরিবেশের সুযোগ সৃষ্টি ও প্রশাসনিক সহযোগিতা প্রদানের জন্য গাজীপুরের কালিয়াকৈরে এই প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করা হয়েছে।

হাইকোর্ট অব দি পার্লামেন্ট (High Court of the Parliament)

রাজা বা রানী, লর্ডস সভা এবং কমন্স সভা সমন্বয়ে ব্রিটেনের পার্লামেন্ট গঠিত। এর পুরো নাম 'হাইকোর্ট অব দি পার্লামেন্ট' (High Court of the Parliament)। ব্রিটিশ পার্লামেন্টের ভিত্তি পত্তন হয় ১২১৩ খ্রিষ্টাব্দে। তখন রাজা জন (John) প্রত্যেক কাউন্টি থেকে চারজন করে নাইটদের আহবান করে পরামর্শ গ্রহণ করতেন। কিন্তু পার্লামেন্টের বর্তমান রূপদান করতে আগ্রহী হন সাইমন ডি মন্টফোর্ড। ১২৬৫ খ্রিষ্টাব্দে তিনি নাইটদের সমন্বয়ে এক পার্লামেন্ট আহবান করেন। তারই নীতি অনুসরণ করে ১২৯৫ খ্রিষ্টাব্দে রাজা এডওয়ার্ড আদর্শ পার্লামেন্ট (Model Marliament) স্থাপন করেন। চতুর্দশ শতকের শেষ ভাগে পার্লামেন্ট দুটি পরিষদে বিভক্ত হয়। তখন থেকেই তা আইন প্রণয়নের ক্ষমতা লাভ করে। এভাবো পার্লামেন্টের জয়যাত্রা শুরু হয়। ১৬২৮ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টে অধিকারের আবেদন (Petition of Rights) রচিত হয়। ১৬৫৩ খ্রিষ্টাব্দে পার্লামেন্টের দ্বারাই নির্বাচিত হয়ে ক্রমওয়েল 'লর্ড প্রোটেক্টর' (Lord Protector) রূপে রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তারপর ১৬৮৮ খ্রিষ্টাব্দে গৌরবময় বিপ্লবের পর পার্লামেন্ট অধিকতর ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে। ১৭০১ খ্রিষ্টাব্দে রাজা পার্লামেন্টের শক্তিকে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হন। **কমন্স সভা :** কমন্স সভা পার্লামেন্টের নিম্ন কক্ষ।

বর্তমানে কমন্স সভা ৬৫০ জন সদস্য সমন্বয়ে গঠিত। কমন্স সভার ৬৫০টি আসন যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন অংশের মধ্যে নিম্নরূপ বণ্টন করা হয়। ইংল্যান্ড ৫২৩, ওয়েলস ৩৮, স্কটল্যান্ড ৭২ও উত্তর আয়ারল্যান্ড ১৭। **লর্ড সভা :** লর্ড সভা ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দ্বিতীয় কক্ষ। উত্তরাধিকার নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এটিই পৃথিবীর একমাত্র রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। বর্তমানে ৯৪৫ জন সদস্য সমন্বয়ে লর্ড সভা গঠিত। লর্ড সভায় বিভিন্ন শ্রেণির সদস্য আছেন। (১) রাজবংশের রাজকুমারগণ লর্ডস সভার সদস্য, কিন্তু তারা সাধারণত সভার কার্যে অংশগ্রহণ করেন না, (২) ২৬ জন চার্চের লর্ড আছেন। তাদের মধ্যে ক্যান্টাররারী ও ইউর্কের আর্চবিশপও আছেন। (৩) অপ্রাপ্ত বয়স্ক ব্যতীত যুক্তরাজ্যের সকল লর্ড বংশানুক্রমিক পীরের হিসেবে লর্ড সভার সদস্য। (৪) স্কটল্যান্ডের পীয়রগণ সমবেতভাবে প্রতি পার্লামেন্টের জন্য ১৬ জন বংশানুক্রমিক পীয়র নির্বাচন করেন। (৫) কয়েকজন আজীবন পীয়র আছেন, যারা লর্ড সভার সদস্যপদ অলংকৃত করেন। তাদের ১৫ জন আপিলের লর্ড (Lords of Appeal)। সম্প্রতি ১০ জন নারীকেও লর্ড সভার সদস্যপদ দান করা হয়। এবং তা হয়েছে রনী দ্বিতীয় এলিজাবেথের রাজত্বকালে। লর্ড সভায় সর্বমোট ৪৭ জন মহিলা সদস্য রয়েছেন। তবে এ সভায় সদস্য সংখ্যা বেশি হলেও উপস্থিতির হার অত্যন্ত কম হয়। লর্ড সভার সদস্য নিযুক্ত হন নিচের সংখ্যার ভিত্তিতে। যথা : যুক্তরাজ্যের লর্ড ৮৪৯ জন, স্কটল্যান্ডের লর্ড প্রতিনিধি ১৬ জন, আয়ারল্যান্ডের লর্ড প্রতিনিধি ৪ জন, আপিল আদালতের লর্ড ১৫ জন, যাবজ্জীবন পীয়র ২৬ জন, সম্মানসূচক লর্ড ৩৫ জন। উলস্যাক নামক আসনে বসে লর্ড চ্যান্সেলর এ সভায় সভাপতিত্ব করেন। সাধারণত সপ্তাহের প্রতি মঙ্গলবার, বুধবার ও বৃহস্পতিবার এ সভার অধিবেশন শুরু হয় তবে কার্যক্রম ঘণ্টা খানেকের বেশি স্থায়ী হয় না। কোনো বিল পাস করতে হলে এ সভার অন্তত ৩০ জন উপস্থিত থাকতে হয়। লর্ড সভার অধিবেশন তার নিজস্ব কক্ষে ওয়েস্টমিনিস্টারে অনুষ্ঠিত হয়।

হাউস অব কমন্স (House of Commons)

হাউস অব কমন্স ব্রিটিশ পার্লামেন্টের দুই পরিষদের মধ্যে নিম্নতম পরিষদ। ১৯১১ এবং ১৯৪৯ সালে পার্লামেন্ট বিধির দ্বারা হাউস অব লর্ডসের ক্ষমতা হ্রাস করার ফলে বর্তমানে আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে হাউস অব কমন্সই প্রাধান্য লাভ করেছে। এর সদস্যসংখ্যা ৬৩৫ জন (ইংল্যান্ড : ৬১১+ওয়েলস : ৩৬ + স্কটল্যান্ড : ৭১ + উত্তর আয়ারল্যান্ড : ১২) যারয প্রাপ্তবয়স্কদের সার্বজনীন ভোটে সদ্যগণ পাঁচ বছরের জন্য নির্বাচিত হন। হাউস অব লর্ডসের সদস্য, চার্চ অব ইংল্যান্ডের যাজকবৃন্দ, চার্চ অব স্কটল্যান্ড ও রোমান ক্যাথলিক চার্চের যাজকবৃন্দ, সরকারের অধীনে লাভজনক কাজে বা পদে নিয়োজিত ব্যক্তি (সরকারি কর্মচারী, শেরিফ, সরকারি কাজেরত ঠিকাদার প্রভৃতি) এবং আইন দ্বারা অন্যভাবে অযোগ্য ঘোষিত ব্যক্তি ছাড়া জনগণের যে-কেউ হাউস অব কমন্সের সদস্য নির্বাচিত হতে পারেন।

হাউস অব লর্ডস (House of Lords)

হাউস অব লর্ডস ব্রিটিশ পার্লামেন্টের উচ্চতর পরিষদ। আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক লর্ডরা এর সদস্য। আর্চবিশপবৃন্দ এবং ইংল্যান্ডের ২৪টি চার্চের বিশপরা হলেন আধ্যাত্মিক লর্ড এবং রাজকীয় ডিউক; অন্যান্য ডিউক এবং আর্ল, মার্কুইস, কাউন্ট, ব্যারনসহ সকল লর্ড (যাঁরা যুক্তরাজ্যের পিয়র), তাঁরা হলেন জাগতিক লর্ড। হাউস অব লর্ডসের সদস্যপদ বংশানুক্রমিক। এ ছাড়া স্কটিশ পিয়ারদের ১৬ জন প্রতিনিধি (তাঁদের দ্বারাই নির্বাচিত), আপিলের ৯ জন লর্ড (সারা জীবনের জন্য) প্রমুখও এর সদস্য। হাউস অব লর্ডস এর সদস্যদের কোনো বেতন বা ভাতা নেই, তবে তাঁরা দৈনিক তিন গিনি খরচ নিতে পারেন। বর্তমানে এর সদস্য সংখ্যা নয় শতাধিক হলেও সাধারণত এর অধিবেশনে ৫০ জনের বেশি উপস্থিত থাকেন না। ১৯১১ ও ১৯৪৯ সালের সংশোধনী বিধির পূর্বে এই হাউসের ভেটোক্ষমতা ছিল। এই হাউসে সভাপতিত্ব করেন লর্ড চ্যান্সেলার (যিনি মন্ত্রিসভারও একজন সদস্য হিসাবে বিবেচিত)।

হাওয়ালা কেলেঙ্কারি (Hawala Scandal)

হাওয়ালা অর্থ বৈদেশিক মুদ্রায় লেনদেন বা হুণ্ডির কারবার। ১৯৯১ সালের মে মাসে ভারতের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (সিবিআই) হুণ্ডি ব্যবসায়ী সুরেন্দ্র কুমার জৈন-এর বাসভবন ও অফিসে হামলা চালিয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র ও একটি ডায়েরি জব্দ করে। এ ডায়েরি থেকে জানা যায়, সুরেন্দ্র জৈন ও তার ভাই বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উচ্চপদস্থ ব্যক্তিকে প্রায় ৬৫ কোটি রুপি ঘুষ প্রদান করেন। এ ডায়েরিতে ১১৫ জনের নাম পাওয়া যায়, যার ৬৭ জনই রাজনীতিবিদ এবং বাদবাকিরা আমলা ও পেশার লোক। এতে দেখা যায়, স্বয়ং রাজীব গান্ধীও জৈন ভ্রাতাদের কাছ থেকে ৮ লক্ষ ডলার ঘুষ নিয়েছেন। ১৯৯৬ সালের ১৬ জানুয়ারি সিবিআই প্রাথমিকভাবে ১০ জনের বিরুদ্ধে আদালতে চার্জশিট দাখিল করে। এ কেলেঙ্কারির ফলে দেশ-বিদেশে প্রবল তোলপাড় শুরু হয়। এই কেলেঙ্কারিই ছিল প্রধানমন্ত্রী নরসিমা রাওয়ের রাজনৈতিক পতনের অন্যতম কারণ।

হামাস (HAMAS)

ফিলিস্তিনের একটি সশস্ত্র গ্রুপ যা ফিলিস্তিকে ইসরাইলের দখল থেকে মুক্ত করার আন্দোলনে রত। হামাস ফিলিস্তিনি ইনতিফাদা আন্দোলন নামে পরিপিত। হামাসের প্রতিষ্ঠাতা হচ্ছেন শেখ আহমেদ আল ইয়াসিন। এই গ্রুপ পিএলও-ইসরাইল স্বায়ত্বশাসন চুক্তির ঘোর বিরোধী। কারণ তারা ফিলিস্তিনকে সরাসরি একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করতে চায়।

হিংসা (Violence)

মানুষে-মানুষে পারস্পারিক সম্পর্কে এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয়জীবনে একের ওপর অপরের জবরদস্ত আচরণ থেকে শুরু করে বলপ্রয়োগ ও রক্তক্ষয়ী হানাহানি হিংসারূপে

বিবেচিত। সভ্যতার আদিপর্ব থেকে অদ্যাবধি বিষয়টি নিয়ে নানা অভিমত আছে। হিংসাত্মক ক্রিয়াকলাপ তথা যুদ্ধ ও হানাহানির নানা তথ্য দেখা যায় মানবেতিহাসের পাতায়। তারই সমান্তরাল ধারায় ধর্ম, দর্শন, রাষ্ট্রচিন্তা, মনোবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ে হিংসা সম্পর্কে নানান আলোচনা চোখে পড়ে হিংসার আদর্শে প্রাণও দিয়েছেন অনেক সাধু ও রাজনৈতিক নেতা।

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী হবস ও রুশো হিংসা সম্পর্কে বিপরীতমুখী চিন্তা-চেতনা পোষণ করতেন। হবসের দৃষ্টিতে প্রাকৃতজীবনে মানুষের হিংসার প্রকৃতি ছিল স্বাভাবিক ; সেটা দাবিয়ে রাখার পক্ষে একটা কেন্দ্রীভূত, শক্তিশালী ও কঠোর সরকারই হলো উপযোগী। পক্ষান্তরে রুশো মনে করতেন প্রকৃতির কোলে মানুষের জীবন ছিল সুস্থ, সুন্দর ও প্রেমময়। সভ্যতার শৃঙ্খলেই মানবজীবনের নাভিশ্বাস ঘটেছে।

মার্কসীয় দৃষ্টিতে অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রেক্ষাপটে হিংসার প্রসঙ্গ বিবেচিত হয়েছে। তাদের মতে পুজিবাদী সমাজব্যস্থায় হিংসার বীজ নিহিত। কার্যত দেখা গেছে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার উচ্ছেদ হয়ে গিয়ে থাকলেও হিংসার আচরণ হ্রাস পায়নি। একদা মার্কসের শিষ্য ও পরে মুসসোলিনির দীক্ষদাতা ঝর্ঝেস সর্ল মনে করতেন যে সহিংস সংগ্রামের মধ্যদিয়েই সৃজনশীল পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত হয়।

ধর্ম, দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তার তত্ত্বগত আলোচনার পাশাপাশি ব্যবহারিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপে হিংসার প্রশ্নকে আধুনিককালে বিশ্ব-সমক্ষে সবচেয়ে সার্থকভাবে তুলে ধরেছেন মহাত্মা গান্ধী। গান্ধীর দৃষ্টিতে হিংসার অর্থ ও প্রয়োগ আরও মৌল গভীরে, যেটা জীবনের ক্ষেত্রেই প্রায় ব্যাপ্ত। তার মতে যাবতীয় পীড়ন, দমন, শক্তিমত্ততা ও জবরদস্ত শাসন হলো হিংসা। তিনি চাইতেন চিন্তায়, কথাবার্তায় ও কাজে কারও প্রতি আঘাত না হানা ; দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিবাদ ও সংঘর্ষ অনুচিত। জৈন, বৌদ্ধ, বৈষ্ণব ও সুফি ভাবধারায় স্নাত গান্ধী রাজনৈতিক জীবনে তলস্তয়ের চিন্তায় বিশেষ প্রভাবিত হন। তলস্তয়ের প্রভাবে গান্ধীয় রাষ্ট্রকে পীড়নকারী যন্ত্র হিসেবে দেখতেন; তাই তিনি চাইতেন শাসনহীন সমাজ, যেটা নৈরাজ্যবাদের নামান্তর।

হিব্রু সভ্যতা (*Hebrew* Civilization)

মধ্যপ্রাচ্য হিব্রু সভ্যতার উৎসভূমি। আজকের ফিলিস্তিন বা ইসরাইল অঞ্চলকেন্দ্রিক গড়ে ওঠেছিল এ সভ্যতা। জাতিগতভাবে হিব্রুরা ছিল একটি মিশ্রিত জাতি। হিট্টাইটদের সাথে মিশ্রণের ফলে এদের নাক ছিল লম্বা ও বক্রাগ্র, যা সেমেটিক প্রকৃতির সাথে মেলে না। যুদ্ধবিগ্রহ, কূটনীতি, স্থাপত্য এবং চিত্রকলার দিক থেকে হিব্রুরা সভ্যতার ইতিহাসে খুব অল্পই ভূমিকা রেখেছেন। কিন্তু নৈতিকতা ও দর্শীয় ক্ষেত্রে বিশ্ব সভ্যতায় হিব্রুদের অবদান ছিল যুগান্তকারী। হিব্রুদের মূল নাম সম্বন্ধে সন্দেহ রয়েছে। প্রচলিত একটি মতে 'খারিবরু' (Khabiru) বা হারিবরু (Habiru) নাম থেকেই 'হিব্রু' হয়েছে। এটি হিব্রুদের শত্রুপক্ষে দেয়া নাম। যার অর্থ বিদেশি, নিম্নবংশীয় বা যাযাবর। অপর মতে 'হিব্রু' নামটি 'ইভার (Ever) বা 'ইবার' (Eber) থেকে এসেছ। ইউফ্রেটিস নদীর অপর

তীর থেকে এর এসেছে বলেই এরূপ নামকরণ হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই এরূপ নামকরণ হয়েছে। অধিকাংশ পণ্ডিতের মতেই হিব্রুদের আদিবাস ছিল আবার মরুভূমিতে। ইসরাইল জাতি প্রথম বসতি গড়ে ওঠে উত্তর-পশ্চিম মেসোপটেমিয়াতে। ইব্রাহিম (আ)-এর নেতৃত্বে হিব্রুদের একটি দল এখানে বসতি গড়ে তোলে সম্ভবত খ্রিস্টপূর্ব ১৮০০ অব্দে। পরবর্তীকালে ইব্রাহিম (আ) এর ছেলে ইসমাইল (আ) এর নেতৃত্বে পশ্চিম দিকে অগ্রসর হয় এবং প্যালেস্টাইনের ওপর আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে।

এসময় থেকে হিব্রুরা ইসরাইলি হিসেবে পরিচিতি লাভ করে। ইসরাইলিদের কয়েকটি গোত্র অন্যান্য হিব্রুগোষ্ঠীর সাথে দুর্ভিক্ষ এড়ানোর জন্য মিশরে চলে আসে খ্রিস্টপূর্ব ১৬০০ অব্দের কিছু পরে। সেখানে তারা ফারাওয়ের দাসে পরিনত হয়। ১৩০০-১২৫০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে তাদের নতুন নেতা মুসা (আ)-এর (Moses) নেতৃত্বে হিব্রুদাসত্ব মুক্তি ঘটে, এব তারা সিনাই উপ্পীপে এসে নুতন আবাস গড়ে তোলে। হিব্রুরা জনপ্রিয় নেতা সাউল (Saul) কে নিজেদের রাজা হিসেবে গ্রহণ করে খ্রিস্টপূর্ব ১০২৫ অব্দে। তার নেতৃত্বে ক্রমাগতভাবে ফিলিস্তিনিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ সংঘঠিত হতে থাকে। পরিশেষে সাউল পরাজিত হন এবং আত্মহত্যা করেন। তার স্থান দখল করেন অপর সমরনেতা দাউদ (আ)। ধর্মীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব গ্রহণের গুনাবলী তাঁর ছিল। দাউদ (আ) (১০০০-৯৬০ খ্রিস্টপূর্ব জেরুজালেম নগরীর পত্তন করে ফিলিস্তিনদের বিতাড়িত করেন এবং এখানে একটি রাষ্ট্রকাঠামো গড়ে তোলেন। এভাবে প্যালেস্টাইন-সিরিয়া অঞ্চলে হিন্দুদের একটি শক্তিশালী ভুখণ্ড গড়ে ওঠে। দউদ (আ) এর পুত্র সুলাইমান (আ)-এর মৃত্যুর পর রাজ্যটি দুঅংশে বিভক্ত হয়ে যায়। উত্তরাংশ ইসরাইল নামেই পরিচিত থাকে দক্ষিণাংশ নাম নেয় জুদা। রাজ্য দুটি হলেও ইব্রাহিম (আ) এর বংশধর এবং মুসা (আ)-এর অনুসারী হিসেবে ধর্মের দিকে থেকে এরা একই থাকে। তাদের ভেতর বহু পয়গম্বর আবির্ভূত হয় পরবর্তী কয়েক শতকে। আসিরীয় নামক জনগোষ্ঠী ইসরাইল দখল করে খৃস্টপূর্ব সপ্তম শতকে।

অপরপক্ষে ব্যাবিলনীয়গণ জুদা দখল করে বহু ইহুদিকে বন্দি করে নিয়ে যায় ৫৮৭ বা ৫৮৬ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। নিজস্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি সংরক্ষণের চেষ্টা করে এরা। পারস্যরাজ সাইরাস ব্যাবিলন দখল করেন। তিনি ইহুদিদের জুদায় প্রত্যাবর্তন এবং ধর্মকর্ম করার অনুমতি দেন ৫৩৯ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। তবে বিদেশী শাসন তাদের ওপর চেপে থাকে। শতাব্দীর পর শতাব্দী এরা গ্রিস, মিশর, সিরিয়া দ্বারা শাসিত হয়। সিরিয়ারাজ চতুর্থ এন্টিওক তাদের ধর্মকর্মে বাধা দিলে ইহুদিরা বিদ্রোহ করে প্রায় শতববর্ষ স্বাধীনতা ভেদ করে ১৯৬৮ বা ১৯৬৭ খ্রিস্টপূর্বাব্দে। কিন্তু ৬৩ খ্রিস্টপূর্বাব্দে রোমানরা জুদা দখল করে এবং ইহুদিরা আবার বিদেশীদের শাসনভূক্ত হয়। অতঃপর আরবগণ দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চল দখল করেল ইহুদরিা তদেরও অধীনে আসেন।

এদিকে ইউরোপে খ্রিস্টধর্মের প্রসার ঘটলে সেখানার বিভিন্ন রাষ্ট্র থেকে সংখ্যালঘু ইহুদিদের বিতাড়ন শুরু হয়। কোথাও কোথাও শহরের দেয়ালবেষ্টিত স্থানে এদের বসবাসে বাধ্য করা হয়। তাদের যাতে চেনা যায় সেজন্য তাদের বিশেষ ধরনের কাপড়

বা ব্যাজ পড়তে বাধ্য করা হতো। তারা জমি ক্রয় কিংবা কারখানায় কাজ করতে পারতো না। জীবিকার্জনের জন্য তাই তারা ব্যবসায়ী এবং সুদের কারবারি হয়ে ওঠে নানা স্থান থেকে বিতাড়িত হয়ে ইহুদিরা তুরস্ক, পোল্যান্ড, রাশিয়া এবং যুক্তরাষ্ট্রে চলে যায়। এভাবে তারা সারা দুনিয়ার ছড়িয়ে পড়ে। তবুও তারা ফিলিস্তিনকেই তাদের আত্মিক শক্তি উৎসভূমি বলে মনে করে। কেউ কেউ সেখানে ফের একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা চিন্তা করতে থাকে। কালক্রমে তাদের আন্দোলন দানা বেঁধে ওঠে। 'জিওনিজম' (Zionism) নামে পরিচিত ছিল এই আন্দোলন। ১৯১৭ সালে ব্রিটিশরা তুরস্কের কাছ থেকে ফিলিস্তিন অধিকার করে নেয়। তারা বেলফোর ঘোষণার মাধ্যমে ফিলিস্তিনে একটি ইহুদি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন। আরবরা তাতে বাধা দিলে বিষয়টি জাতিসংঘে উত্থাপিত হয়। জাতিসংঘ ফিলিস্তিনকে একটি আরব এবং একটি ইহুদি রাষ্ট্রে বিভক্ত করে দুটি রাষ্ট্র স্থাপনের মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা কের। ১৯৪৮ সালের ১৪ মে অবশেষে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইহুদি নির্যাতনের পরিপ্রেক্ষিতে ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

হিরোশিমা (Hirosima)

জাপানের মধ্য হনসুতে অবস্থিত একটি শহর। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষদিকে ১৯৪৫ সালের ৬ আগস্ট এই শহরে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র প্রথম পারমাণবিক বোমার বিস্ফোরণ ঘটায়। ফলে হাজার হাজার লোক নিহত ও আহত হয়। হিরোশিমা আজও বিশ্বের জনগণের জন্য একটি আতংকিত স্থান।

হুইগ (Whig)

হুইগ ব্রিটেনের একটি গ্রুপ সদস্যদের বলা হত। এই গ্রুপই বৃটেনের শাসনতান্ত্রিক ক্রমবিকাশে একটি রাজনৈতিক দল হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। রাজা দ্বিতীয় চার্লসের সময় রাজশক্তির বিরোধী অর্থাৎ পার্লামেন্ট বা জনগণের সমর্থক হিসেবে পরিচিত ছিল এবং পরবর্তীতে এই দল থেকে লিবারেল পার্টির (Liberal Party) উদ্ভব হয়। বর্তমানেও হুইগ বলতে লিবারেল পার্টির পুরাতন সদস্যদের বোঝায়। ইংরেজী Whig শব্দটি স্কটিশ 'Whiggamaire' থেকে উদ্ভূত যার অর্থ 'horse driver' পরবর্তীতে থেকে হুইগ শব্দটি স্কটল্যান্ডে প্রটেস্ট্যান্ট ক্রিস্টিয়ানিটির (Pres by terianism) সমর্থক বোঝাতে ব্যবহার হত। সতেরশ শতকে হুইগরা গৌরবময় বিপ্লবকে সমর্থন করেন এবং ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সংস্কার সাধনে সচেষ্ট হন।

হুটু ও টুটসি (Hatu and Tutsi)

হুটু এবং টুটসি হলো দু'টি জাতি যারা আফ্রিকা মহাদেশের রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি এই দু'টি দেশের প্রত্যেকটির অধিবাসী। এই জাতিগোষ্ঠী দু'টি একে অপরের বিরুদ্ধে গৃহযুদ্ধে লিপ্ত। রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডি রাষ্ট্র দু'টি ১৯৬২ সালের ১ জুলাই বেলজিয়ামের উপনিবেশিক

শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পর থেকে রাষ্ট্রে দু'টিতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা নিয়ে হুটু ও টুটসি জাতি দু'টি প্রায়শই গৃহযুদ্ধে লিপ্ত হয়। রুয়ান্ডার অধিবাসীদের ১০% টুটসি এবং ৯০% হুটু। কিন্তু এই ১০% টুটসিরা হুটুদের ওপর শাসন চালিয়ে আসছে। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব তাদের নিত্যদিনের বিষয়। অবশেষে ১৯৯৩ সালে হুটুদের সাথে টুটসিদের এক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হতে থাকে। বর্তমান টুটসি ও হুটুদের মধ্যকার যুদ্ধ আপাততঃ বন্ধ হয়েছে এবং রুয়ান্ডা ও বুরুন্ডিতে রাজনৈতিক সমঝোতার মাধ্যমে শাসনকার্য পরিচালিত হচ্ছে।

হুন্ডি (Bill of Exchange)

হুন্ডি বা বিনিময়পত্র হলো পণ্য ক্রয়-বিক্রয়ের বাবদ প্রাপ্য টাকা দেওয়ার বরাতী পত্র। এটা এক ধরনের পণ্য ক্রয়-বিক্রয় বাবদ অন্যের প্রাপ্য টাকা শোধ করার প্রতিশ্রুতি পত্র। এটা ব্যাংকের মাধ্যম ছাড়া দুই ব্যক্তির মধ্যে টাকা লেন-দেনের মাধ্যমে হয়। এই হুন্ডির মারফত বিভিন্ন দেশের মধ্যেও ব্যবসা-বাণিজ্য ও কারবার চলে। ১১৬০ খ্রীস্টাব্দে ইউরোপের ইহুদীরা প্রথম এর ব্যবহার আরম্ভ করে। তবে হুন্ডি ব্যবস্থা ব্যাংকের বিকল্প হিসেবে ব্যবহার করা হয়। এতে সরকার টাকা বিনিময়ের মাধ্যমে যে রাজস্ব পায় তা থেকে বঞ্চিত হয়।

হেগ (Hage)

হেগ নেদারল্যান্ডের একটি অন্যতম শহর। এই শহরে জাতিসংঘের অন্যতম অঙ্গ প্রতিষ্ঠান International Court of Justice-এর সদর দপ্তর অবস্থিত। হেগ শহরটি মূলত আন্তর্জাতিক রাজনীতির একটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে প্রায়শই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

হেগেল, জন উইলহেলম ফ্রেডারিখ (George Wilhelm Frederick Hegel)

হেগেল (১৭৭০-১৮৩১) জার্মান ক্লাসিক্যাল দার্শনিকদের অন্যতম হেগেল। তিনি তরুণ বয়সে ফরাসি বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং জার্মান রাজতন্ত্র ও সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। ফরাসি বিপ্লবের ব্যর্থতা ও নেপোলিয়নের উদ্ভবের পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে। তার মধ্যে দেখা দেয় দ্বৈততা। একদিকে ইউরোপের বিপ্লবী আবহ এবং অন্যদিকে জার্মান বুর্জোয়াদের প্রতিক্রিয়াশীলতা, এ-দুয়ের প্রভাব তাঁকে দোদুল্যমান ও আপোসমুখী করে তোলে। তিনি একাধারে বস্তুবাদী ও পরম সত্তায় বিশ্বাসী ছিলেন। ১৮১২-১৬ সালে তিনি তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের দর্শন হাজির করেন। তিনিই সর্বপ্রথম পরিমাণ বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে গুণগত পরিবর্তন এবং নিরাকরণের নিরাকরণ-এর তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি কান্টের বস্তুর স্বস্থিতিশীল (Thing-in-itself) তত্ত্বেরও সমালোচনা করেন। কিন্তু তিনি তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্বের ওপর পরম সত্তাকে আরোপ করতে

গিয়ে স্ববিরোধিতার শিকার হয়ে পড়েন। সমাজ পরিবর্তন কি হওয়া উচিত, এ-ব্যাপারেও তিনি কোনো সুনির্দিষ্ট নিকনির্দেশনা দিতে ব্যর্থ হন। মার্কস তাঁর দ্বন্দ্বতত্ত্ব, ইতিহাস-সচেতনতা ও যুক্তিতন্ত্রের প্রশংসা করেন। মার্কস বলেন যে, হেগেলের বস্তুবাদ ছিল যথার্থ, কিন্তু তাঁ পা ছিল ওপরের দিকে, আমরা তাঁকে পায়ের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি (অর্থাৎ আধ্যাত্মিকতামুক্ত করেছি) মাত্র।

হেবরন হত্যাকাণ্ড (Hebron Massaure)

ইসরায়েলের হেবরনে বসতি স্থাপনকারী বারুচ গোল্ডস্টেইন নামক জনৈক ইহুদি সম্পূর্ণ বিনা উসকানিতে ঐতিহাসিক হেবরন মসজিদের ভেতরে ঢুকে বেপরোয়াগুলি চালায় এবং ১৯৯৩ সালের ২৫ ফেব্রুয়ারি হত্যাকাণ্ড মাথায় নামাজরত ৭০ জন মুসলিম হত্যা করে। এর ফলে ইসরায়েল পিএলও শান্তিচুক্তি সাময়িকভাবে স্থগিত হয়ে যায়। তবে ১৯৯৪ সালের ৩১ মার্চ হেবরনের নিরাপত্তার ব্যাপারে পিএলও ও ইসরায়েলের মধ্যে এক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

হেবিয়াস কর্পাস (Habeas Corpus)

হেবিয়াস কর্পাস ল্যাটিন কথাটির হুবহু অর্থ হচ্ছে 'সশরীরে হাজির করতে হবে'। আইনশাস্ত্র অনুযায়ী বন্দিকে আদালতে হাজির করার জন্য এবং তাকে আটক করার কারণ দর্শানোর জন্য আদালত বা বিচারক কর্তৃক জারিকৃত পরোয়ানাই হল হেবিয়াস কর্পাস। ১৬৭৯ সালে ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম এই আইন বিধিবদ্ধ করা হয়।

হোমরুল (Home Rule)

১৮৭০ সালে আইজ্যাক কট (১৮১৩-৭৯) আয়ারল্যান্ডের জন্য হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসনের দাবি উত্থাপন করেন। তাঁর হোমরুল বা স্বায়ত্তশাসন দাবির মূল কথা ছিল, ডাবলিনে এমন একটি পার্লামেন্ট প্রতিষ্ঠা করা, আয়ারল্যান্ডের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যার সর্বময় ক্ষমতা থাকেন। কটের পর জঙ্গি নেতা পার্নেল এই আন্দোলনের নেতৃত্বে আসেন। ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী গ্লাডস্টোন আয়ারল্যান্ডের হোমরুল-এর পক্ষ নেন। কিন্তু বারবার চেষ্টা করেও পার্লামেন্টে বিল পাশ করাতে ব্যর্থ হন। যা-ই হোক, ১৯২১ সালের জুন মাসে উত্তর আয়ারল্যান্ড পার্লামেন্টও স্বায়ত্তশাসন লাভ করে। কিন্তু দক্ষিণ আয়ারল্যান্ড হোমরুলের চেয়েও অধিক স্বাধীনতা দাবি করে। ১৯২১ সালের ডিসেম্বরে দক্ষিণ আয়ারল্যান্ডেকে ডোমিনিয়নের মর্যাদা প্রদান করা হয়। ১৮১৬ সালে বালগঙ্গাধর তিলক ও অ্যানি বেসান্ট ভারতবর্ষেও হোমরুল আন্দোলন শুরু করেন। পরে মহাত্মা গান্ধি, বিপিনচন্দ্র পাল প্রমুখ নেতাও হোমরুল দাবি করেন। 'হোমরুল' দাবির ভিত্তিতে মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের মধ্যে সহযোগিতার জন্য লক্ষ্ণৌচুক্তি সম্পাদিত হয় ; কিন্তু 'হোমরুল' আন্দোলনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই এই সহযোগিতারও অবসান ঘটে।

হোয়াইট পরিকল্পনা (White Plan)

১৯৪৪ সালে অনুষ্ঠিত ব্রেটন উডস কনফারেন্সের ঠিক পূর্বে মার্কিন অর্থসচিব আন্তর্জাতিক মুদ্রা ব্যবস্থাসংক্রান্ত হোয়াইট পরিকল্পনা প্রদান করেন। এই পরিকল্পনা মার্কিন পরিকল্পনা নামে খ্যাত। লর্ড কেইনস-এর মতো তাঁরও উদ্দেশ্য ছিল সহজে ভাঙানোর উপযোগী মুদ্রা এবং স্থিতিশীল বিনিময় হারের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ঘটানো। বস্তুত হোয়াইট ও কেইনসের পরিকল্পনার ওপর ভিত্তি করেই পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক অর্থ তহবিল (IMF) গঠন করা হয়।

হোয়াইট হাউস (White House)

হোয়াইট হাউস হল ওয়াশিংটনে মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি বাসভবনে অবস্থান। এই ইমারতের কাজ শুরু হয় ১৭৯২ সালে, কিন্তু এর কাজ শেষ হওয়ার আগেই প্রেসিডেন্ট ওয়াশিংটন মারা যান। ১৮০০ সালে প্রেসিডেন্ট জন অ্যাডামসই এই ইমারতের প্রথম বাসিন্দা। ১৮১৪ সালে ব্রিটিশদের সঙ্গে যুদ্ধে এর অংশবিশেষ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আগুন ও গোলাগুলির ধোঁয়ার দাগ মোছার জন্য ভবনটি মূল ধূসর রঙের ওপর সাদা রং করে দেওয়া হয়। সেই থেকেই এর নাম হয় হোয়াইট হাউস।

হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (Huseyn Shaheed Suhrawardy)

গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী (জন্ম: ৮ সেপ্টেম্বর ১৮৯২ এবং মৃত্যু: ৫ ডিসেম্বর ১৯৬৩) জনগণের প্রতি অসীম ভালোবাসা এবং গণতন্ত্রের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাই ছিল তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। দেশ ভাগের আগে ভারত ও পাকিস্তানের পাশাপাশি অখণ্ড স্বাধীন বাংলা নামে একটি 'ডমিনিয়ন রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। কলকাতা আলিয়া মাদ্রাসায় শিক্ষাজীবন শুরু করার পর যোগ দেন সেইন্ট জ্যাভিয়ার্স কলেজে। সেখান থেকে বিজ্ঞান বিষয়ে তিনি স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। যুক্তরাজ্যের অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি বিজ্ঞান বিষয়ে সম্মানসহ স্নাতক অর্জন করেন। এছাড়া সেখানে তিনি আইন বিষয়ে পড়াশোনা করেন এবং বিসিএল ডিগ্রি অর্জন করেন। এরপর ১৯২১ সালে কলকাতায় ফিরে এসে আইন পেশায় নিজেকে নিয়োজিত করেন। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শহীদ সোহরাওয়ার্দীর পথ অনুসরণ করে রাজনীতিতে পদচারণ করেন। শহীদ সোহরাওয়ার্দী বর্ণাঢ্য রাজনৈতিক জীবনের অধিকারী ছিলেন। প্রথমে তিনি যোগ দেন চিত্তরঞ্জন দাসের স্বরাজ পার্টিতে। ওই দলটি তখন মূলত ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস দলের অভ্যন্তরে একটি গ্রুপ ছিল। ১৯২৩ এর বেঙ্গল প্যাক্ট স্বাক্ষরে তার যথেষ্ট ভূমিকা ছিল। ১৯২৪ সালে তিনি কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র নির্বাচিত হন। ১৯২৮ সালে সর্বভারতীয় খিলাফত সম্মেলন এবং

সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলন অনুষ্ঠানে অগ্রণী ভূমিকা রাখেন। মুসলমানদের মধ্যে তার ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাব থাকলেও ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত মুসলিম লীগের সাথে তিনি জড়িত হননি। ১৯৩৬ সালের শুরুর দিকে তিনি 'ইন্ডিপেন্ড্যান্ট মুসলিম পার্টি' নামক দল গঠন করেন। ১৯৩৬ সালের শেষের দিকে এই দলটি বাংলা প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাথে একীভূত হয়। এই সুবাদে তিনি বেঙ্গল প্রাদেশিক মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন। ১৯৪৩ সালে খাজা নাজিমুদ্দিনের মন্ত্রিসভায় তিনি শ্রমমন্ত্রী, পৌর সরবরাহ মন্ত্রী ইত্যাদি দায়িত্ব পালন করেন। ওই বছরই দেখা দেয় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের 'অসমাপ্ত আত্মজীবনী'তে উল্লেখ আছে, 'এই সময় শহীদসাহেব লঙ্গরখানা খোলার হুকুম দিলেন। আমি লেখাপড়া ছেড়ে দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সেবায় ঝাঁপিয়ে পড়লাম। তিনি রাতারাতি বিরাট সিভিল সাপ্লাই ডিপার্টমেন্ট গড়ে তুললেন। 'কন্ট্রোল' দোকান খোলার বন্দোবস্ত করলেন। গ্রামে গ্রামে লঙ্গরখানা করার হুকুম দিলেন। দিল্লিতে গিয়ে কেন্দ্রীয় সরকারকে ভয়াবহ অবস্থার কথা জানালেন এবং সাহায্য দিতে বললেন।'

১৯৪৬ সালে বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে পাকিস্তান আন্দোলনের প্রতি তার সমর্থন এবং সহযোগিতা প্রদান করেন। পরবর্তীতে খাজা নাজিমুদ্দিন পূর্ববাংলার মুখ্যমন্ত্রী হবার পর বেশ কয়েকবার সোহরাওয়ার্দীকে 'ভারতীয় এজেন্ট' এবং 'পাকিস্তানের শত্রু' হিসেবে অভিহিত করেন। সোহরাওয়ার্দীকে পাকিস্তানের আইনসভার সদস্য পদ থেকে অপসারণ করা হয়। তাঁর অনুসারীরা অনেকে ১৯৪৮ এর শুরুর দিকে পূর্ব পাকিস্তান ছাত্রলীগ এবং ১৯৪৯ এর জুনে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ গঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ও আবুল হাশেমের নেতৃত্বাধীন তৎকালীন বঙ্গীয় প্রাদেশিক মুসলিম লীগের একাংশের সম্মেলনের মধ্য দিয়ে ১৯৪৯ সালের ২৩ জুন ঢাকার রোজ গার্ডেনে 'পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ' প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রতিষ্ঠালগ্নে পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের সভাপতি হন আবদুল হামিদ খান ভাসানী, টাঙ্গাইলের শামসুল হক সাধারণ সম্পাদক এবং শেখ মুজিবুর রহমানকে যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। অন্যদিকে, পুরো পাকিস্তানের ক্ষেত্রে সংগঠনটির নাম রাখা হয় নিখিল পাকিস্তান আওয়ামী লীগ। এর সভাপতি হন হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। ২৪ বছরের পাকিস্তান শাসনামলে আওয়ামী লীগ আতাউর রহমান খানের নেতৃত্বে দু'বছর প্রদেশে ক্ষমতাসীন ছিল এবং হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর নেতৃত্বে কেন্দ্রে ১৩ মাস কোয়ালিশন সরকারের অংশীদার ছিল। ১৯৫৩ সালে তিনি একে ফজলুল হক এবং মাওলানা ভাসানীর সাথে একত্রে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। ১৯৫৩ সালের ৪ ডিসেম্বর কৃষক শ্রমিক পার্টি, পাকিস্তান গণতন্ত্রী দল ও পাকিস্তান খেলাফত পার্টির সঙ্গে মিলে যুক্তফ্রন্ট গঠন করেন। এই যুক্তফ্রন্টের নেতা ছিলেন: ১. হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ২. মওলানা ভাসানী, ও ৩. একে ফজলুল হক। ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে মওলানা ভাসানী, আবুল কাশেম ফজলুল হক ও হোসেন

শহীদ সোহরাওয়ার্দী কর্তৃক গঠিত যুক্তফ্রন্ট অভূতপূর্ব জয়লাভ করে। ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়। তারা শুধু ৯টি আসন লাভ করে। ধর্মনিরপেক্ষতার চর্চা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগঠনটির নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। ১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ 'মুসলিম' শব্দটি বর্জন করে অসাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়। এরপর মোহাম্মদ আলী বগুড়ার মন্ত্রিসভায় সোহরাওয়ার্দী আইনমন্ত্রী নিযুক্ত হন। তিনি ১৯৫৪ সালের ২০ ডিসেম্বর হতে ১৯৫৫ সালের আগস্ট পর্যন্ত এ পদে ছিলেন। ১৯৫৫ সালের ১১ আগস্ট হতে ১৯৫৬ সালের ১ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি পাকিস্তান আইনসভায় বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান প্রণয়ণে তার ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তান পার্লামেন্টের সদস্যসংখ্যা ছিল ৮০। হোসেন শহীদ সোহ্‌রাওয়ার্দীর নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ-দলীয় সদস্য ছিলেন মাত্র ১৪ জন। রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও বলিষ্ঠ নেতৃত্বের কারণে তদানীন্তন পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট ইস্কান্দার মির্জা এই ১৪ জন পার্লামেন্ট মেম্বারের সমর্থনপুষ্ট সোহরাওয়ার্দীকে সে সময়কার পরিস্থিতির কারণে ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ প্রদান করেছিলেন। ১৯৫৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর থেকে ১৯৫৭ সালের ১১ অক্টোবর পর্যন্ত তিনি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেকার অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণে তিনি পদক্ষেপ নেন। কিন্তু তার এই পদক্ষেপ ব্যাপক রাজনৈতিক বিরোধিতার জন্ম দেয়। পূর্ব পাকিস্তানের মতো পশ্চিম পাকিস্তানেও এক ইউনিট ধারণা প্রচলনের তার চেষ্টা পশ্চিম পাকিস্তানি রাজনীতিবিদদের কারণে নস্যাৎ হয়ে যায়।

এরপর ১৯৫৮ সালে ইস্কান্দার মীর্জা পাকিস্তানে সামরিক শাসন জারী করেন। ১৯৫৯ সালের আগস্ট হতে ইলেক্টিভ বডি ডিসকুয়ালিফিকেশান অর্ডার অনুসারে তাকে পাকিস্তানের রাজনীতিতে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। পাকিস্তান নিরাপত্তা আইনে রাষ্ট্রবিরোধী কাজের অপরাধ দেখিয়ে তাকে জানুয়ারি ১৯৬২ সালের ৩০ জানুয়ারি তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং করাচি সেন্ট্রাল জেলে অন্তরীণ করা হয়। ১৯৫৮ সালের ৭ অক্টোবর পাকিস্তানে প্রথম সামরিক শাসন জারি হলেও ১৯৬২ সালের ৩১ জানুয়ারি পর্যন্ত এর বিরুদ্ধে কোনো প্রতিবাদ-বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়নি। কিন্তু সোহ্‌রাওয়ার্দীর গ্রেফতারের প্রতিবাদে ১৯৬২ সালের ১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার জগন্নাথ কলেজ এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। পরদিন বাংলাদেশের অনেক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট ও মিটিং-মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৬২ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি পাকিস্তানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মনজুর কাদির পূর্বনির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এলে বিক্ষুব্ধ ছাত্ররা মন্ত্রীকে আক্রমণ ও তার গাড়ি ভাঙচুর করেন। তুমুল আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে আইয়ুব খানের সামরিক আইন সারাদেশে অকার্যকর হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় ১৯৬২ সালের ৮ জুন সামরিক আইন প্রত্যাহার করা হয়। ৬ মাস ২০ দিন

কারাজীবনের অবসান ঘটিয়ে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী ১৯৬২ সালের ১৯ আগস্ট মুক্তিলাভ করেন। মুক্তিলাভের পরই সোহরাওয়ার্দী দেশে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের জন্য তদানীন্তন নয়জন নেতাসহ দেশব্যাপী ঝটিকা সফর শুরু করেন। এ পর্যায়ে ১৯৬২ সালের শেষ ভাগে চট্টগ্রামের লালদীঘি ময়দানে স্মরণকালের বৃহত্তম জনসভায় ভাষণ দেন। ওই বছরের অক্টোবরে তিনি আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের উদ্দেশে ন্যাশনাল ডেমোক্রাটিক ফ্রন্ট (এনডিএফ) গঠন করেন।

সূচিপত্র